বাংলা সাময়িকপত্রে আদিবাসীকথা

বাংলা সাময়িকপত্রে আদিবাসীকথা

দীপঙ্কর ঘোষ

অমরভারতী
৮সি ট্যামার লেন, কলকাতা—৭০০ ০০৯

প্রকাশক
শ্রীঅধীরচন্দ্র পাল
অমর ভারতী
৮সি ট্যামার লেন,
কলকাতা—৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ ॥ জানুয়ারি ২০০০

প্রচ্ছদ
উৎপল চক্রবর্তী

অলংকরণ
উৎপল চক্রবর্তী, নীহার ঘোষ, রাজারাম, শ্রীমহাদেব,
অনিন্দ্য সিংহ. পূর্ণেন্দু মন্ডল, টানটু পান, রমা সাহা

অক্ষর বিন্যাস
ডিজাইনার
৮সি ট্যামার লেন,
কলকাতা—৭০০ ০০৯

মুদ্রণ
ইন্দ্রলেখা প্রেস
১৬ হেমেন্দ্র লেন স্ট্রীট,
কলকাতা—৭০০ ০০৯

সাঁওতাল বিদ্রোহের সার্ধশতবর্ষে
বীর সংগ্রামীদের উদ্দেশে

কৃতজ্ঞতা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগার

বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার

জাতীয় গ্রন্থাগার

ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে। দিব্যজ্যোতি মজুমদার। রেবতীমোহন সরকার। পল্লব সেনগুপ্ত
ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী। শিবেন্দু মান্না। সোমনাথ ঘোষ। প্রদীপকুমার চক্রবর্তী
অশোক উপাধ্যায়। অরুণচাঁদ দত্ত। সুহৃদকুমার ভৌমিক
জয়ন্ত সরকার। সুবীর সুর। রমা বণিক

প্রস্তাবনা

পরাধীন পরবশ উপনিবেশ ভারতীয় উপমহাদেশের সামন্তসমাজের নিস্তরঙ্গ জীবন-ভাবনায় উনিশ শতকে সহসা ব্যাপক আলোড়ন দেখা দিল। উনিশ শতকের সেই ভাববিপ্লব পাশ্চাত্যের রেনেসাঁস-এর সমতুল কিনা তা নিয়ে প্রাজ্ঞজনদের মধ্যে বিতর্কের শেষ নেই। তবু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, সেদিনের ভারতের রাজধানী কলকাতাকে কেন্দ্র করে বাঙালির চিন্তা ও মননের জগতে উথাল-পাতাল ঢেউ জেগেছিল। পাশ্চাত্যের নতুন মানবিক দর্শন, সাহিত্য-শিল্প-ভাস্কর্য, উজ্জীবিত বিজ্ঞান গবেষণা সেদিন নব্যশিক্ষিত বাঙালিকে নতুন বোধের দুনিয়ার সন্ধান দিয়েছিল।

অসংখ্য সাময়িকপত্র প্রকাশিত হতে থাকে, এবং জাতীয়তাবাদী চেতনায় সমৃদ্ধ সেই সমাজ মাতৃভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে মুক্তি খুঁজেছিল। শুধুমাত্র সাহিত্য-সংস্কৃতি নয়, বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক চিকিৎসা, স্বাস্থ্য সচেতনতা, গো-চিকিৎসা, নারীর স্বাধিকার—কত না সাময়িকপত্র প্রকাশিত হত। এই সময়কালেই সেকালের বুদ্ধিজীবী সংস্কৃতিবান মানুষেরা প্রতিবেশী জনগোষ্ঠী সম্পর্কে উৎসাহিত হন। প্রাথমিক অবস্থার সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান-চর্চার সূত্রপাত ঘটল এইসব সাময়িকপত্রের মাধ্যমে। ইংরেজ প্রশাসক ও খ্রিস্টীয় পুরোহিতবর্গ প্রতিবেশী আদিবাসীদের জীবনচর্যা সম্পর্কে তার আগেই লিখতে শুরু করেছেন। কিন্তু সবই ইংরেজি ভাষায়। আর বাঙালি লেখকেরা ইংরেজি প্রবন্ধ-গ্রন্থ-গবেষণাপত্রের পাশাপাশি বাংলা সাময়িকপত্রে লিখতে শুরু করলেন। উনিশ শতকের সেই সুস্থ প্রবণতা বিশ শতকে আরও ব্যাপ্ত হল, আদিবাসী-চর্চার একটি আন্তরিক ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত হল।

কিন্তু এই আদিবাসী-চর্চার সবটাই কিন্তু ইতিবাচক নয়। দুটি ধারা পাশাপাশি চলছিল। কলকাতার কিছু লেখক আদিবাসী-চর্চায় মানবিক ও তথ্যভিত্তিক অভিজ্ঞতার পরিচয় দেননি। যেমন করে হৃদয়গ্রাহী ভ্রমণকাহিনি লেখা হয়, এঁরা দু-চারদিন ভ্রমণের কালে আদিবাসীদের সঙ্গে স্বল্পদিনের পরিচয়ের সুবাদে প্রবন্ধ লিখে ফেললেন। শুধু তাই নয়, আদিবাসীদের সংহত সুস্থ সমাজজীবনের কোনো পরিচয় না নিয়েই, তাঁদের সামাজিক রীতিনীতির অন্তর্গূঢ় তাৎপর্য অনুধাবন না করেই, তাঁদের সমাজ-মানসিকতার উজ্জ্বল দিকগুলি সম্পর্কে অবহিত না হয়েই প্রবন্ধ লেখা হতে লাগল। ফলে আদিবাসী জনগোষ্ঠী তাঁদের চোখে অসভ্য-বর্বর-কুৎসিত-হিংস্র প্রভৃতি অভিধায় চিত্রিত হলেন। ব্রিটিশ প্রভুরা অর্থাৎ 'ছোটো ইংরেজরা' যেভাবে আমাদের 'হিদেন', ধর্মচ্যুত, পতিত ও অসংস্কৃত ভাবত, বাঙালি বুদ্ধিজীবীর কিছু অংশের মনোভাবও এরকম প্রভুত্ব-সূচক ছিল। এই দৃষ্টিভঙ্গি শুধু একপেশে নয়, সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

আবার আর একদল সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানী ছিলেন যাঁরা অশেষ পরিশ্রমে পরম মমতায়

আদিবাসীদের জীবন-সংস্কৃতি-পাল-পার্বণ-সমাজবিধি-পঞ্চায়েত আইন-ভাষা-মৌখিক সাহিত্য বিষয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে বিজ্ঞাননির্ভর গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিখেছেন। এইসব তথ্যনিষ্ঠ পরিশ্রমী মানবতাবাদী সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীর গবেষণা থেকেই বৃহত্তর জনসমাজ জানতে পেরেছেন, যে সংস্কৃতিকে আমরা ভ্রান্তিবশত 'উচ্চতর' সংস্কৃতি বলে প্রচার করি, তার আশি শতাংশের উত্তরাধিকার লুকিয়ে রয়েছে আমাদের দেশের আদিবাসীদের মহান উজ্জ্বল ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে। গ্রন্থি উন্মোচন করে এঁরা দেখিয়েছেন আদিবাসী সংস্কৃতির কাছে আমরা 'ভদ্রজনেরা' কতটা ঋণী।

'বাংলা সাময়িকপত্রে আদিবাসীকথা' সংকলন গ্রন্থে এযাবত প্রায় অনাবিষ্কৃত গবেষণা-প্রবন্ধগুলিতে পাঠকসমাজ সেই সমৃদ্ধ সংস্কৃতির সম্ভারের সন্ধান পাবেন। পরিশ্রমী গবেষক ও অনুসন্ধিৎসু সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানী দীপঙ্কর ঘোষ দীর্ঘ অনুসন্ধানে অসংখ্য প্রায়-দুষ্প্রাপ্য বাংলা সাময়িকপত্র থেকে প্রাসঙ্গিক আদিবাসী-চর্চার শুলুকসন্ধান করে গ্রন্থটি সংকলন করেছেন। দীর্ঘ সময়কাল ধরে প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হতে থাকে। সব পত্রিকা আবার একই বানান-পদ্ধতি অনুসরণ করেনি। এইসব বিভিন্নতার কারণে সংকলনে বানান-সমতা রক্ষার তাগিদে আমরা পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রবর্তিত বানান-বিধি মেনে চলেছি। একটি বানান-পদ্ধতি তো মেনে চলতেই হয়, বিশেষ করে যে সংকলনে অনেক প্রাবন্ধিকের রচনা একত্রিত করতে হয়। পৃথিবীর অনেক আদিবাসী, ভারতবর্ষ ও অবিভক্ত বাংলার আদিবাসী সমাজের যে ব্যাপ্ত পরিচয় এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে তাতে বাংলায় আদিবাসী-চর্চার ঐতিহ্যও সমৃদ্ধ হবে নিঃসন্দেহে।

প্রদীপ ঘোষ

ভূমিকা

নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আদিবাসী-চর্চা শুরু হয় যতদূর সম্ভব ১৮৮৫ সাল থেকে। ভারতবর্ষ তখন পুরোপুরি ব্রিটিশ শাসনে। সে সময়ে আদিবাসী সমাজ-সংস্কৃতি নিয়ে যেসব লেখালেখি হয়েছে, তার অধিকাংশই বিদেশি মানুষরা করেছেন। তাঁদের কেউ উচ্চপদস্থ কর্মচারী কিংবা আমলা, কেউ বা মিশনারি আবার কেউ বা নৃতাত্ত্বিক। অধিকাংশ বিষয়ই লেখা হয়েছে ইংরাজি ভাষায়। ওই সমস্ত বিদেশিরা ওই সমস্ত বিষয় লিখতে গিয়ে যতটুকু আসল চিত্র তুলে ধরেছেন, তার থেকে অনেক বেশিই প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক স্বার্থ এবং ধর্মপ্রচারের দিকটা সামনে রেখে কাজ করে গেছেন। বলা বাহুল্য, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন বজায় রাখা ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। সেভাবেই সেগুলি লেখা হয়েছে। আর আদিবাসীদের সম্পর্কে নানারকম অবমাননাকর ভাষাও ব্যবহার করা হয়েছে সে সমস্ত লেখায়। এমনকি তাঁদের সংস্কৃতিকে নীচু চোখে দেখা হয়েছে। একবারও কেউ ভাবেননি যে বহুদিন ধরে, বিশেষ করে শিশুকাল থেকে একটা জাতি বা গোষ্ঠীর সঙ্গে ওঠা-বসা, মেলা-মেশা না করলে সেই জাতিকে সঠিকভাবে চেনা যায় না। তবে, কিছু কিছু ব্যতিক্রম যে হয়নি তা নয়, সবাইকে এ অপবাদ দেওয়া যায় না। ড. অ্যান্ড্রু ক্যাম্পবেল সাহেবের জীবনে আমরা তাই দেখি। তিনি আজীবন আদিবাসীদের মধ্যে কাজ করে গেছেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম সাঁওতালি-ইংরাজি অভিধান তৈরি করেন। শেষ বয়সে তিনি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। ডাক্তাররা বলেন, তাঁর বাঁচার আশা খুব কম। এ অবস্থায় তাঁর বন্ধুরা তাঁকে কিছুদিন ভালোভাবে থাকার জন্য তাদের বাড়িতে বিশ্রাম নিতে বলেন। উত্তরে তিনি বলেন—'যাঁদের মধ্যে আমি সারাজীবন কাটিয়েছি, তাঁদের মধ্যেই আমি শেষ জীবনটা কাটাতে চাই।' তিনি সাঁওতাল গ্রামেই তাঁদের মাঝে মারা যান এবং জঙ্গলেই তাঁকে কবর দেওয়া হয়।

যাইহোক—পরবর্তীকালে উনিশ-বিশ শতকে দেখা যায়, বিভিন্ন বাংলা সাময়িকপত্রে—বঙ্গদর্শন, বঙ্গবাণী, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাসিক বসুমতী প্রভৃতি অসংখ্য পত্র-পত্রিকায় বিদেশি লেখকদের অনুসরণ করে আদিবাসী জীবনের নানা দিক তুলে ধরা হয়েছে, বই-পত্রও প্রকাশিত হয়েছে। সহজ, সরল নিরক্ষর আদিবাসীরা ওই ধরনের ভুল তথ্য পরিবেশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাননি। তখনকার দিনে ওই ধরনের লেখার বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ করা উচিত ছিল তার গুরুত্ব হয়ত তাঁরা বুঝে উঠতে পারেননি। বিষয়টি কতখানি হতে পারে, তা আজকের সচেতন আদিবাসী ও অ-আদিবাসী সবাই ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারছেন।

পরাধীন ভারতবর্ষে আদিবাসীরা বিদেশি ইংরেজরাজের বিরুদ্ধে বার বার অস্ত্রধারণ করেছে। সেজন্য বিদেশিরাজ তাঁদের ভারতবর্ষের মূল জীবনপ্রবাহ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল, তাঁদের

সম্পর্কে নানারকম অবমাননাকর মন্তব্য করে তাঁদের সবাইয়ের কাছে হেয় করে তুলেছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সেই দৃষ্টিভঙ্গি আজ অনেকটা পালটে গেছে। আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আজ সাধারণ মানুষ জানতে চায়, জানবার আগ্রহ আছে, তবে তা সঠিকভাবে তুলে ধরা প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও তাই চায়। এজন্য পুরোনো দিনের বিভিন্ন বাংলা সাময়িকপত্র ঘেঁটে সত্তরটি প্রবন্ধ বাছাই করে বর্তমান সংকলন গ্রন্থটি প্রকাশিত হল। এ সঙ্গে জানাই, যে সমস্ত প্রবন্ধ আদিবাসী জীবন ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে খোলা মন নিয়ে লেখা হয়েছে সেগুলিই এই সংকলনে স্থান পেয়েছে।

ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে

সম্পাদকীয় ভূমিকা

পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব সর্বকালের চর্চার বিষয়। মানুষকে জানতে শারীরিক বিবর্তনের সঙ্গে সমাজ-সাংস্কৃতিক বিষয় অন্বেষণও জরুরি। আর মানুষের জীবনগাথা বোঝার মূল শর্তই হল তার উদ্ভব, বৈচিত্র্যময় জাতিবিন্যাস ও বিকাশলাভের ধারাকে জানা।

আজকের মানুষ নিয়ে সমসাময়িক আলোচনাতেই শুধু নয়, মানুষের বিকাশ ও বিস্তার নিয়ে আদিপর্বের চর্চাতেও বিতর্ক আছে। আফ্রিকাতেই মানুষের উদ্ভব এবং সেখান থেকেই বিস্তারলাভ ঘটেছে, এমনই মত এক পক্ষের। অন্য মত হল, আজকের মানুষ বহুবিধ অঞ্চলকেন্দ্রিক বিস্তারলাভ করেছিল সেই আদি পর্যায়ে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিবর্তনের ফলে মানুষ বর্তমানে *হোমো স্যাপিয়েন্স স্যাপিয়েন্স*-এ রূপান্তরিত হয়েছে বলা হচ্ছে। বর্তমান সময়ে মানুষের বিভিন্ন লক্ষণের ওপর ভিত্তি করে প্রধান গোষ্ঠী বা 'রেস'-এ ভাগ করা হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এসব জাতিগোষ্ঠীর বাসভূমি। আবার, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে যে অবয়বগত সাদৃশ্য আছে তার ওপর ভিত্তি করে নৃতাত্ত্বিক পর্যায়ভুক্ত করা যায়। নানা মানবগোষ্ঠীর মিলন ও মিশ্রণের ফলে এই গোষ্ঠীবিভাগ বা জাতিত্ব নিরূপন করা সাধারণভাবে অসুবিধাজনক হলেও মাথার আকার, মাথার চুল, দেহকাঠামোর দীর্ঘতা, গায়ের রং, চোখের রং ও বৈশিষ্ট্য, নাকের আকার, রক্তের শ্রেণি প্রভৃতিকে ভিত্তি করে বিভাগীকরণ করা হয়। মূল বিভাগ ককেশয়েড, মঙ্গোলয়েড ও নিগ্রোয়েড ব্যতিরেকে আরও নির্দিষ্টভাবে দেখতে গেলে ভারতীয় জনসমষ্টিকে প্রোটো-অস্ট্রালয়েড, দ্রাবিড়, আলপানীয়, নর্ডিক, প্রোটো-মঙ্গোলয়েড এই পাঁচটি বিভাগ করা হয়েছে। ভারতে এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে যে গবেষণা ও অনুসন্ধান আরম্ভ হয়, যার ফলে এডওয়ার্ড ট্যুইটি ডালটন-এর *ডেসক্রিপটিভ এথনোলজি অব বেঙ্গল* (১৮৭২) প্রকাশিত হয়। এরপর ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে মুম্বাইতে অ্যানথ্রোপলজিক্যাল সোসাইটি স্থাপিত হয়। ঔপনিবেশিক ভারতে ডালটনের বই এবং তারপর ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে *দ্য ট্রাইবস অ্যান্ড কাস্টস অব বেঙ্গল* শীর্ষক স্যার হারবার্ট রিজলে-র জাতিতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা প্রকাশিত হয়। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের জনগণনার জাতিতত্ত্ব সম্পর্কে প্রাপ্ত প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়ে ১৯০৮-এ প্রকাশিত *দ্য পিপল অব ইন্ডিয়া* ভারতের অধিবাসীদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ ও জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রথম প্রামাণ্য বিবরণ।

মানুষকে জানার আগ্রহে গত প্রায় দুশো বছরে চিন্তানায়কেরা যে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন তাঁদের মধ্যে চার্লস ডারউইন, কার্ল মার্কস, সিগমন্ড ফ্রয়েড এবং ক্লড লেভি-স্ট্রাউস হলেন সবচেয়ে অগ্রগণ্য। ডারউইন মানুষ নামক এই প্রজাতির মূল বোঝাপড়ার রীতিকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

মানুষের বিবর্তনের পথের স্বরূপসন্ধান করেছেন এই কালজয়ী জীববিজ্ঞানী। মার্কস যদিও প্রজাতি হিসাবে মানুষের নিজের প্রয়োজনে পথনির্দেশের ব্যাখ্যা করেছেন। এমনকি ফেড্রেরিক এঙ্গেলস-এর সঙ্গে কার্ল মার্কস যৌথভাবে ল্যুই হেনরি মর্গানের কাজকর্মের মূল্যায়নের আগেই 'আদিম সাম্যবাদ' সম্পর্কে তাঁদের ধারণা ও প্রাকৃতিক চৌহদ্দিতে সামাজিক সম্পর্কের অন্তর্গত ভাবটি দেখিয়েছেন। ফ্রয়েডের দৃষ্টিতে মানুষের আচরণগত বিবর্তন ও সম্পর্কের রূপই হচ্ছে কেন্দ্রীয় বিষয় যা এই বোঝাপড়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। মার্কস মূলত সামাজিক পদ্ধতিকে গুরুত্ব দিয়েছেন, আর ফ্রয়েড দেখেছেন এই সামাজিক বিন্যাসের সঙ্গে ব্যক্তিমানুষের সম্পর্কেব দিক। এই দুই ধারাই পরস্পরের পরিপূরক। আবার লেভি-স্ট্রাউস সচেতনভাবেই ব্যক্তি মানুষের আচরণগত দিক অথবা সামাজিক সম্পর্কের রূপবৈচিত্র্যের সূত্রকে জানতে চেয়েছেন যা ব্যক্তি মানুষ বা সমাজের গতিশীলতাকে পরখ করার সুযোগ দেয়।

সে সময়ের চিন্তাবিদরা বুঝেছিলেন যে মানুষ আদিম অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে উন্নততর হয়েছে। তাঁরা একথাও অনুধাবণ করেছিলেন যে এই অগ্রগতির পথে মানুষ অসংখ্য উদ্ভাবন ও আবিষ্কার করেছে। একশো বছরেরও আগে আমেরিকার প্রখ্যাত বিবর্তনবাদী সমাজবিজ্ঞানী ল্যুই হেনরি মর্গান বলেছেন যে সে যুগের পাথর ও হাড়ের তৈরি জিনিসের ওপর তাদের শিল্প-সাক্ষ্য, তাদের গুহাবাসের সাক্ষ্য এবং তাদের কঙ্কালগুলির নিদর্শন থেকে মানুষের প্রাচীনত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় যেসব আদি জনগোষ্ঠী আছে তাদের বর্তমান অবস্থা থেকেও একথা বোঝা যায়।

বিবর্তনবাদী মত ছাড়াও অন্যভাবে সমাজকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আর সামগ্রিকভাবে সমাজ-সংস্কৃতির রূপবৈচিত্র্য জানা এবং এইসঙ্গে যেসব মতবাদ গড়ে উঠেছে সে আলোচনা প্রাসঙ্গিক। মানুষ যখন পাথরের তৈরি আয়ুধ বা হাতিয়ার তৈরি করতে শিখেছিল তখনই যে প্রকৃত সংস্কৃতির সূচনা হয়েছিল তা বলা চলে। পাথরের আয়ুধ উন্নত থেকে উন্নততর হয়েছিল যা শিকার-কৌশলে নতুনত্ব আনে। বড়ো বড়ো পাথরের হাতিয়ার থেকে সূক্ষ্ম অস্ত্র এবং পরে ধাতুযুগে প্রবেশ ও তারপর চাষবাসের উদ্ভাবন এই ধারারই ফলশ্রুতি। প্রাগৈতিহাসিক যুগে আগুন আবিষ্কারও মানুষের বিবর্তনে এক যুগান্তকারী পর্যায়। সাংস্কৃতিক বিবর্তনের মেলবন্ধনে, বর্তমানের মানুষের বিচিত্রতায় আমরা খুঁজে চলেছি আমাদের বিবর্তন বা রূপান্তরের রকমারি পথকে।

মানুষ মূলত সাংস্কৃতিক প্রাণী হলেও শারীরিক বিবর্তনও সমান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষ জীবনের যৌক্তিকতার ব্যাখ্যা খুঁজে ফিরছে। এই প্রচেষ্টার মধ্যেই সম্ভবত গির্জা আর প্রাগৈতিহাসিক বিজ্ঞানের পুরোধা ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব জড়িয়ে আছে। অষ্টাদশ শতকে শুরু সংঘাতের চূড়ান্ত রূপ পায় ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে চার্লস ডারউইনের *দ্য অরিজিন অব স্পিসিস বাই মিনস অব ন্যাচারাল সিলেকশান গ্রন্থটি প্রকাশের পর*। মানুষের সাংস্কৃতিক বিচিত্রতা নিয়েও পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী মত প্রকাশ করেছেন যা তাদের চর্চার বিষয়কে প্রতিষ্ঠিত করে। কয়েকটি সংজ্ঞা মারফত তা বলা যেতে পারে। ব্রিটিশ নৃবিজ্ঞানী ই. বি. টাইলর ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃতির প্রথম যে সংজ্ঞা নিরূপণ করেন তা হল—মানুষের সংস্কৃতি এমন একটি জটিল সামগ্রিক সত্ত্বা যার মধ্যে সামাজিক জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্পকলা, নৈতিকতা, আইন, রীতিনীতি ও অন্যান্য

আনুষঙ্গিক কর্মদক্ষতা ও অভ্যাস বিকশিত হয়। অন্যভাবে ব্রোনিসলো ম্যালিনস্কি মানুষের কর্মপদ্ধতিকে বস্তুগত ও অবস্তুগত এই দু-ভাগে বিভক্ত করেছেন। আবার র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন সংস্কৃতিকে মূলত একটি-নিয়মকানুনের ধারা হিসাবে মূল্যায়ন করেছেন। আলফ্রেড ক্রোবার বলেছেন যে মানবগোষ্ঠীর অভ্যাস, কলাকৌশল, ধারণা এবং মূল্যবোধের সমষ্টি সংস্কৃতির সামগ্রিক রূপের গঠনকারী হিসেবে পরিচিত। মেলভিন জে. হার্সকোভিটস-এর ধারণায় সংস্কৃতি হল পরিবেশের মানুষের নির্মিত অংশ। লেসলি হোয়াইট বলেছেন যে, সংস্কৃতি হল প্রতীকধর্মী, অবিচ্ছিন্ন, ক্রমবর্ধিষ্ণু ও প্রগতিশীল প্রক্রিয়া। রুথ বেনেডিক্ট-এর মতে বহু মানুষকে যা একসূত্রে বাঁধে তাই তার সংস্কৃতি। আবার ভারতীয় নৃবিজ্ঞানী নির্মলকুমার বসুর ধারণায় সংস্কৃতি হল মানুষের জীবন কর্মধারার এক কেলাসিত দশা।

থমাস এইচ হাক্সলে ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে *অ্যান এনক্যোয়ারি ইন্টু ম্যানস প্লেস ইন নেচার* নামে একটি বই লেখেন যাতে মানুষের বিকাশ সম্পর্কে শ্রেণিবদ্ধ ও বৈজ্ঞানিক ভাবনার আলোচনা করা হয়। তিনি দেখিয়েছেন যে শিম্পাঞ্জি ও গরিলা হচ্ছে মানুষের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত জীব। আর, মানুষ ও বনমানুষের বিবর্তনের অগ্রগতি ঘটেছিল প্রায় একই নিয়ম বা পদ্ধতিতে। বর্তমানে মানুষ নিজেকে আরও আলাদা করে ভাবতে গিয়ে আধুনিক মানুষের আগের অবস্থা নিয়ানডার্থাল মানুষকে *হোমো স্যাপিয়েন্স নিয়ানডার্থালেনসিস* আর আধুনিক মানুষকে *হোমো স্যাপিয়েন্স স্যাপিয়েন্স* এই দুই উপপ্রজাতিতে বিভক্ত করেছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত মানুষের আদিরূপের জীবাশ্ম বিবর্তনের ধারাবাহিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করে। এমনিভাবে 'হোমো হ্যাবিলিস'-এর পরবর্তী পর্যায়ে 'হোমো ইরেকটাস'-এর সন্ধান পাওয়া গেছে। এইসব জীবাশ্ম দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাভা, চিন, ইউরোপের জার্মানি এবং উত্তর ও পূর্ব আফ্রিকা ইত্যাদি জায়গায় পাওয়া গেছে। হোমো স্যাপিয়েন্স মানুষের বিবর্তনের পথকে এক নতুন ধারা দিয়েছে। প্রায় ৪০ হাজার বছর আগে থেকে আধুনিক মানুষের স্পষ্ট উপস্থিতি পাওয়া যায়।

প্রাচীন গ্রিক লোকগাথায় মানুষ সৃষ্টির যে কথা আছে, তা খ্রিস্টপূর্বে সম্ভবত থ্যালস প্রথম সেইসব লোকগাথা বর্ণনা ও বিশ্লেষণকে উপেক্ষা করেন। তবে নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণে সম্ভবত প্রথম মতামত প্রকাশ করেন গ্রিক দার্শনিক জেনোফেনস—যিনি তাঁর বিস্তৃত পরিভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকেই বলেন যে সমাজ মানুষেরই নিজস্ব সৃষ্টি। পরে হেরোডটাসের মতো সুপরিচিত চিন্তাশীল পরিব্রাজক ও বিভিন্ন সামাজিক রীতির তথ্য সংগ্রাহকের লেখা থেকে পঞ্চাশটি ভিন্ন মানবগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার বর্ণনা জানা যায়। হেরোডটাসের সময় থেকে পরবর্তীকালে গ্রিক পণ্ডিতেরা সমাজ সংক্রান্ত আলোচনায় তাঁদের দৃষ্টি বেশি করে দেন। তাছাড়া ওই সমসাময়িককালে গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস ও প্লেটো উভয়েই সম্মত হয়েছিলেন যে সামাজিক আচরণ চিরন্তন মূল্যবোধেরই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। প্লেটোর মতো বিখ্যাত গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল (৩৮৪ খ্রিস্টপূর্ব—৩২২ খ্রিস্টপূর্ব) সামগ্রিক জীবনদর্শনের সঙ্গে মানুষ ও সমাজকে একীভূত করার পক্ষে মতপ্রকাশ করেন।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যখন ডারউইনবাদ প্রসারলাভ করে তখন সমাজবিজ্ঞানে দুটি বিলক্ষণ পরিবর্তন দেখা যায়, যা হল বিবর্তন তত্ত্বের প্রয়োগগত দিক এবং বিষয়গতভাবে আলাদা

অস্তিত্বের বিশেষ প্রসার। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই দশ বছরে বেশ কিছু বইও প্রকাশিত হয় যা নৃতত্ত্ব বা মানববিজ্ঞান চর্চার আদি কাজকর্ম বলা যায়। হেনরি মেইন-এর *অ্যানসিয়েন্ট ল* (১৮৬১ খ্রিস্টাব্দ) এবং *ভিলেজ কমিউনিটিজ ইন দ্য ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট* (১৮৭১ খ্রিস্টাব্দ), ই. বি. টাইলরের *রিসার্চেস ইন্টু দ্য আর্লি হিস্ট্রি অব ম্যানকাইন্ড* (১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে টাইলরেরই লেখা *প্রিমিটিভ কালচার* এবং ওই বছরেই ল্যুই হেনরি মর্গান-এর *সিস্টেমস অব কনস্যানগুইনিটি অ্যান্ড অ্যাফিনিটি অব দ্য হিউম্যান ফ্যামিলি* প্রকাশিত হয়। এ-সবই মানবচর্চার আদি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা।

মানুষের অস্তিত্বের প্রায় নিরানব্বই ভাগ সময় কেটেছে শিকার ও সংগ্রহের মধ্য দিয়ে। আজও পৃথিবীর বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিকার ও সংগ্রহের জীবনযাত্রা দেখা যাবে। মানুষের উদ্ভব ও সমাজ বিকাশের সঙ্গে ভাষার উৎপত্তিও এক বিশেষ দিকচিহ্ন। সামগ্রিকভাবে, আদিকাল থেকে মানুষের নিজের অস্তিত্বের কাহিনি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও আকর্ষণীয়। মানুষের সমাজ-সংস্কৃতির যে পরম্পরা তা বোঝা যায় সমসাময়িক আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে। আমাদের ঐতিহ্য-সন্ধান আদিবাসী জীবনচর্চার বৈচিত্র্যময় রূপ থেকে বিশেষভাবে জানা যায়। আদিবাসী জীবনচর্যার কথা তাই প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক।

পৃথিবীর সব অঞ্চলেই আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বসতি আছে। ভারতে আদিবাসী জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি দেখা যায়। ভারতীয় উপমহাদেশে আদি বসতি হিসাবে এইসব জনগোষ্ঠীরই পরিচয়, সাধারণভাবে যাদের 'আদিবাসী' বলা হয়। বৈদিক সাহিত্য ও মহাকাব্যসহ প্রাচীন ও মধ্যযুগের তথ্য থেকে নানা আদিবাসী গোষ্ঠীর কথা জানা যায়। আদিবাসী গোষ্ঠীর যা মূল বৈশিষ্ট্য হিসাবে ধরা হয়, তা হল : (ক) একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে বাস করে নিজস্ব জীবনধারণের ঐতিহ্য বহন করে; (খ) সুনির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক বিন্যাস যেমন ভাষা, আচার, ধর্মীয় বিশ্বাস, শিল্পকলার ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যতা; (গ) পেশাগত দিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রাচীন উপাদানের বিশেযত্ব দেখা যায়; (ঘ) শিক্ষার প্রসার ও অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাদপর হিসাবেই দেখা যায়। নানা ভাষা, নানা আচারক্রিয়া, নানা মত, নানা খাদ্যাভ্যাস, নানা পরিধানের এই ভারতে আদিবাসী জীবনচর্যা বৈচিত্র্যতায় পূর্ণ। সমাজ-সাংস্কৃতিক ভাবধারা ও দৈহিক আকৃতির বৈচিত্র্য শুধু এদেশ নয়, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রেক্ষাপটে রকমারি ঐশ্বর্যে আকর্ষণীয় ও সমাজ-সংস্কৃতি চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ। এশিয়া, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকা মহাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ড ও দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন আদিবাসী জীবনধারার সংস্কৃতি নৃতাত্ত্বিক ও সমাজবিজ্ঞানীদের মহার্ঘ ক্ষেত্র।

ভারতের সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলের বনাঞ্চল, মালভূমি, পাহাড়ি ক্ষেত্র ও সমতলে নানা আদিবাসী গোষ্ঠী সুদীর্ঘকাল যাবৎ বসবাস করছে। বৃহত্তর সামাজিক চৌহদ্দির জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সংযোগ-সম্পর্ক, জীবনযাপনের দৈনন্দিন চাহিদা ও সমস্যা এবং অন্য বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যেও বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবনধারা আজও স্বাতন্ত্র্যে ভরপুর।

ব্রিটিশ শাসনের সময়েই আদিবাসীদের সম্পর্কে তথ্য-সংগ্রহের প্রাথমিক সূচনা হয়। যদিও ব্রিটিশ-শাসনের আগে আদিবাসী সমাজের সঙ্গে বৃহত্তর সমাজ-ক্ষেত্রের যে সহবস্থান দেখা যায়,

পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশ অধিকারের সময় তা বহুলাংশে নষ্ট হয়। এভাবে নানা প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন সময়ে আদিবাসীদের মধ্যে দেখা যায় বিদ্রোহ। আদিবাসীদের বিচ্ছিন্ন করার প্রক্রিয়াও ছিল এই বিদ্রোহের অন্যতম দিক। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের জনগণনার তথ্যে পেশাভিত্তিক যে জাতিবিন্যাস করা হয় তাতে চাষবাস ও পশুপালন জাতির একটি 'জঙ্গালের আদিবাসী' বা 'বনবাসী' (forest tribes) বিভাগীকরণ করা হয়। সে সময়ের হিসাবে প্রায় ১ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষ এই বনবাসী হিসাবে স্বীকৃতি পায়। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের জনগণনার তথ্যে এই বিভাগ 'অ্যানিমিস্টস' (animists) হিসাবে দেখানো হয়। পরবর্তীকালে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের তথ্যে tribal animists or people following tribal religion হিসাবে পরিচিতি পায়। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের জনগণনায় এই জনগোষ্ঠীকে 'পাহাড়ি ও জঙ্গালের আদিবাসী' হিসাবে বর্ণনা করা হয়। আবার, ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের জনগণনায় 'আদিম জনজাতি' (primitive tribe) হিসাবে বর্ণনা করা হয়। এরপর ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত সরকারের অ্যাক্ট অনুসারে এই জনসমষ্টিকে 'পশ্চাৎপদ জনজাতি' হিসাবে গণ্য করা হয়। এরপর ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে এইসব পশ্চাৎপদ জনজাতি 'tribes' বা 'আদিবাসী' হিসাবে পরিচিতিলাভ করে। সে সময়ের হিসাবে এই জনসংখ্যার হিসাব ছিল প্রায় ২ কোটি ৪৭ লক্ষ। স্বাধীনোত্তর পর্বে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বিষয়ে বিভিন্ন প্রকল্পের সূত্রপাত এবং স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গিতে এই জনগোষ্ঠীকে বোঝা বা জানার প্রচেষ্টা নতুনতর সংযোগ-সন্ধানে সাহায্য করে।

বর্তমান সময়ে ২০০১ খ্রিস্টাব্দের জনগণনার হিসাবে ভারতে আদিবাসী জনসংখ্যা আট কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার দুশো চল্লিশ জন (৮,৪৩,২৬,২৪০)। ভারতের মোট জনসংখ্যার হিসাবে যা ৮.২০ শতাংশ। এর মধ্যে পুরুষ চার কোটি ছাব্বিশ লক্ষ চল্লিশ হাজার আটশো উনত্রিশ জন (৪,২৬,৪০,৮২৯) এবং মহিলার সংখ্যা চার কোটি ষোলো লক্ষ পঁচাশি হাজার চারশো এগারো জন (৪,১৬,৮৫,৪১১)। সাম্প্রতিক জনগণনায় পশ্চিমবঙ্গে আদিবাসী জনসংখ্যা চুয়াল্লিশ লক্ষ ছয় হাজার সাতশো চুরানব্বই জন (৪৪,০৬,৭৯৪); এর মধ্যে পুরুষের সংখ্যা বাইশ লক্ষ তেইশ হাজার নয়শত চব্বিশ জন এবং মহিলা একুশ লক্ষ বিরাশি হাজার আটশো সত্তর জন। এ-রাজ্যে বর্তমানে ৪০টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে আরও কিছু সংখ্যক হিসাববহির্ভূত থেকে গেছে। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মোট জনসংখ্যার ৫.৫০ শতাংশ আদিবাসী জনসংখ্যা।

'বাংলা সাময়িকপত্রে আদিবাসীকথা' প্রাক্-স্বাধীনতাকালে বাংলা সাময়িকপত্রে প্রকাশিত নৃতত্ত্ব ও আদিবাসীচর্চা বিষয়ক রচনা সংকলন। উনিশ শতকের প্রথম ভাগে বাংলা সাময়িকপত্রের সূচনাপর্ব থেকে বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়কাল পর্যন্ত লেখা এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত। নির্দিষ্টভাবে বলা যায়, প্রথম প্রকাশিত বাংলা সাময়িকপত্র 'দিগ্‌দর্শন'-এ প্রকাশিত ১৮২০ খ্রিস্টাব্দের লেখা থেকে বিশ শতকের 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত প্রবন্ধ—এই সুদীর্ঘ সময়ের নৃতত্ত্ব ও আদিবাসী আলোচনার বিষয়, বিস্তার, বৈভব, বিন্যাস এই সংকলেন অন্তর্ভুক্ত। একুশ শতকের প্রায় সূচনায় দাঁড়িয়ে বিশ শতক ও উনিশ শতকের চর্চার এক সুদীর্ঘ পরম্পরা ও উত্তরাধিকারের সন্ধান এই সংকলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আদতে এটি তিন শতকের সংযোগ-সূত্র। আদিবাসী চর্চার বৈচিত্র্যকে বহুলাংশে জানা যায় এই সংকলনে। উনিশ শতকের 'দিগ্‌দর্শন', 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ', 'সত্যার্ণব', 'সুলভ পত্রিকা', 'বঙ্গদর্শন', 'সখা', 'ভারতী' ও 'প্রদীপ' সাময়িকপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। এই সমস্ত পত্রিকার উনিশ শতকের

মোট দশটি প্রবন্ধ সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এইসঙ্গে 'অন্তঃপুর', 'নব্যভারত', 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', 'প্রবাসী', 'বাণী', 'সৌরভ', 'সাহিত্য', 'মানসী ও মর্মবাণী', 'ভারতবর্ষ', 'শান্তিনিকেতন', 'বঙ্গবাণী', 'কায়স্থ-সমাজ', 'বিচিত্রা', 'মাসিক মোহাম্মদী', 'উদয়ন', 'বঙ্গশ্রী', 'মাসিক বসুমতী', 'সোনার বাংলা' ও 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'-য় বিশ শতকে প্রকাশিত প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে এই গ্রন্থে। নির্দিষ্ট এইসব সাময়িকপত্র ছাড়া বিশ শতকে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ভাগলপুরের তৃতীয় অধিবেশন প্রকাশনায় প্রকাশিত প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধও সংকলিত হয়েছে। বিশ শতকের মোট ষাটটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। এর মধ্যে প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত মোট একুশটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। সব মিলিয়ে, বাংলা সাময়িকপত্রে আদিবাসীকথা উনিশ ও বিশ শতকের আদিবাসী জীবনচর্যার এক প্রয়োজনীয় দলিল। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সাময়িকপত্রের সূচনাকাল থেকে স্বাধীনতা-পর্ব পর্যন্ত একশো পঁচিশ বছরেরও বেশি সময়কালের বহুবিচিত্র রচনা-সম্ভার এখানে সংকলিত হয়েছে। সাতাশটি সাময়িকপত্র থেকে নেওয়া সত্তরটি প্রবন্ধে জন-জাতিবিন্যাস, ভারতের আদিবাসী, সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতি এবং আদিবাসীচর্চার রূপবৈচিত্র্যের সম্মিলিত প্রকাশ ঘটেছে এই সংকলন-গ্রন্থে।

'জন-জাতিবিন্যাস' আলোচনায় মানববিজ্ঞান চর্চার মূল সূত্রনির্দেশ আছে। মানুষের বিবর্তন ও জাতিতত্ত্ব আলোচনার বিভিন্ন দিক বর্ণনা আছে এই বিভাগের প্রবন্ধে। মোট দশটি প্রবন্ধ এই বিভাগে সংকলিত হয়েছে। প্রাগিতিহাসের আলোকে মানুষের বিবর্তন ও জাতিবৈশিষ্ট্য আলোচনার বিভিন্ন অনুসন্ধান আছে এসব লেখায়। বাংলার অধিবাসীদের পরিচয় ও জাতি-বিশ্লেষণের স্বরূপসন্ধানও আছে এই বিভাগের প্রবন্ধগুচ্ছে। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, বিরজাশঙ্কর গুহ, হরিদাস পালিত, প্রবোধচন্দ্র সেন, পঞ্চানন মিত্র, অবিনাশচন্দ্র দাস, চিত্তরঞ্জন রায় প্রমুখের রচনা এই বিভাগকে সমৃদ্ধ করেছে। সংকলনের শুরুর রচনায় 'মানব-বিজ্ঞান' সম্পর্কে আলোচনায় সংকলনের নির্দিষ্ট ভাবনা ধরা আছে—'তাহার পর আমাদের সমস্ত রকম সমাজের সংবাদ নিতে হবে; এবং তাহাদিগকে বিশ্লেষণ করে তাহার ভিতর ঐক্যসূত্র বের করতে হবে।' দীর্ঘ সময়কাল ধরে মানুষের বিবর্তন ও রকমারি জাতিবিন্যাস-চর্চা প্রয়োজনীয় দিক। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার লেখায় আছে 'মনুষ্যের আদিম অবস্থার কোনো পুরাবৃত্ত নাই। মনুষ্যজাতি এতকাল পৃথিবীতে বর্তমান আছে তাহার সহিত তুলনায় ঐতিহাসিক কাল গতকল্য আরম্ভ হইয়াছে বলিলেও অযথা উক্তি হয় না।' প্রবোধচন্দ্র সেন-এর আলোচনায় 'জন' বা tribe জনপদকথার সূত্র হিসাবে উল্লেখ করেছেন। শারীরিক বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে যে জাতিবিভাগ তাতে যে মূল বিষয় বিবেচিত হয়, মানুষের বিবিধ সংমিশ্রণ তা অনেকক্ষেত্রে বিভাগীকরণে অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভারতের মানুষের আদি ইতিহাস পর্যবেক্ষণে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে যে বিষয়-বিন্যাস দেখা যায় তা বাংলার আদি জনগোষ্ঠীর বিন্যাস, বিবর্তন ও পরিবর্তনের নানা পথের সন্ধান দেয়। বঙ্গভূমির সুদীর্ঘকালের জনজাতির চর্চা বা অন্বেষণ আদি পর্যায়ের নানা সূত্রের সন্ধান দেয়।

'ভারতের আদিবাসী' শীর্ষক বিভাগে দেশের বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বিবরণমূলক রচনা আছে। স্বাধীনতাপূর্ব সময়কালে আদিবাসী গোষ্ঠীর স্থানিক, সমাজ-সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক আলোচনার বৈচিত্র্যময় আলোচনা আছে বিভিন্ন প্রবন্ধে। জাতিতত্ত্বের পটভূমিতে বিভিন্ন

আদিবাসীগোষ্ঠীর নিজস্বতার স্বরূপসন্ধানও পাওয়া যায়। পশ্চিম ভারত থেকে শুরু করে দক্ষিণ, মধ্য, পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের নানা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আলোচনা আছে। মূল ভূখণ্ডের বাইরে আন্দামানের আদিবাসী বিষয়ক লেখাও সংকলিত হয়েছে। সে সময়ের অবিভক্ত ভারতের পূর্বভাগ বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের আদিবাসীদের আলোচনাও আছে এই বিভাগে। মোট পঁয়ত্রিশটি প্রবন্ধ এই বিভাগে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ছোটোনাগপুরের ওরাওঁ, হো, মুন্ডা, সিংভূমের কোল, নীলগিরির টোডা জাতির বিবরণসহ রাভা, নাগা, কুকি, লেপচা, চাকমা, হাজং ইত্যাদি বিভিন্ন জনজাতি আলোচনায় সমৃদ্ধ হয়েছে এই বিভাগ। অবিভক্ত ভারতের ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক সীমারেখার মধ্যে নানা আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বসবাস সে সময়ের নানা লেখায় পাওয়া যায়। ছোটোনাগপুর, সিংভূম, ময়ূরভঞ্জ, অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ত্রিপুরা, অসম, মেঘালয়, ময়মনসিংহ, আন্দামান প্রভৃতি ভূখণ্ডের বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পরিচয় পাওয়া যায়। এসব আলোচনায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর শারীরিক গঠন, গৃহস্থাপত্য, গৃহস্থালি দ্রব্য, সামাজিক রীতিনীতি, পরিবার, বিবাহ, মৃত্যু প্রভৃতি সম্পর্কিত নানা আচার, খাদ্যাখাদ্যের বিষয়, ধর্মীয় চেতনা, সংস্কার ও বিশ্বাস ইত্যাদির নানা কথা প্রতিফলিত। কোনো কোনো আলোচনায় জীবনচর্যার বিশেষ দিক নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ধর্ম, পাল-পার্বন, ভাষা, সংস্কার আলাদাভাবে আলোচনায় এসেছে। আদিবাসী জনজীবনের বৈচিত্র্যময় সমাজ-রীতিনীতির কথা নানা পটভূমিতে লেখা হয়েছে। ভারতীয় নৃতত্ত্বের সূচনাপর্বের পথিকৃৎ শরৎচন্দ্র রায় ও নির্মলকুমার বসু-সহ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, নলিনীকুমার ভদ্র, স্বর্ণকুমারী দেবী, গিরিবালা দেবী, হেমন্তকুমারী চৌধুরী, মোহাম্মদ মোদাব্বের, সতীশচন্দ্র ঘোষ, কেদারনাথ মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, সত্যকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, গিরিজাকুমার ঘোষ প্রমুখ রচনা করেছেন তাঁদের উপলব্ধি ও পর্যবেক্ষণ।

সাঁওতাল ভারতের মধ্যে অন্যতম প্রধান আদিবাসী জনগোষ্ঠী। পূর্বভারতে সংখ্যাধিক্যে এই জনগোষ্ঠীই প্রথম। এছাড়া বর্তমান পশ্চিমবঙ্গেও এই জনগোষ্ঠীর আধিক্য। শুধু সংখ্যার দিক দিয়ে নয়, চর্চা ও তুলনামূলক গবেষণায় সবচেয়ে আলোচিত নাম। উনিশ শতক থেকে এই জনজাতির সম্পর্কে সাময়িকপত্রে যে সমস্ত আলোচনা হয়েছে তার পরিচয় আছে 'সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতি' বিভাগে। জাতি হিসাবে বিবরণ; জীবনচর্যার নানা দিক; সাঁওতাল গ্রামের সরেজমিন অভিজ্ঞতা; দিনাজপুর, ময়ূরভঞ্জসহ অখণ্ড বাংলার নানা স্থানের বাসস্থানের কথা; রীতিনীতি, নাচ, গান, পুরাণ কথা, সাঁওতালি ভাষায় সংস্কৃত ও অন্য প্রাদেশিক ভাষার প্রভাব, পুজো-পদ্ধতি ইত্যাদির নানা বৈচিত্র্যময় আলোচনায় সমৃদ্ধ হয়েছে এই বিভাগ। প্রসঙ্গত, সাঁওতালদের পূজা-পদ্ধতি রচনায় বাদনা পুজো হিসাবে বলা হয়েছে, যা আসলে পরব বা সাকরাত উৎসব বলেই পরিচিত। এই উৎসব পৌষ মাসে হয় না। এ ধরনের কিছু কিছু অসংগতি সংকলনের বিভিন্ন লেখায় থেকে গেছে। যেহেতু মূল প্রবন্ধের পরিবর্তন করা হয়নি, তাই এ ধরনের বিষয়গুলি থেকেই গেছে। তবে এই বিভাগে সাঁওতালি গানসহ বিভিন্ন লেখায় শব্দের উচ্চারণগত বানান শুদ্ধি করা হয়েছে যা প্রবন্ধের নীচে উল্লেখ করা আছে। গবেষক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে এ বিষয়ে সাহায্য করেছেন। উনিশ শতকে রামব্রহ্ম সান্যাল-সহ বিশ শতকে প্রভাসচন্দ্র রায়, বিভূতিভূষণ গুপ্ত, প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়, রাকেশলোভন সেন, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, সরসীলাল

সরকার, সত্যেশচন্দ্র গুপ্ত, রণেন্দ্রবিজয় দাস, সন্তোষচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন নানা পত্রিকায়। মোট দশটি রচনা এই বিভাগে সংকলন করা হয়েছে। তবে এই বিভাগের স্বতন্ত্র উল্লেখের জন্য 'ভারতের আদিবাসী' শীর্ষক বিভাগে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

আদিবাসীচর্চার যে বহুবিস্তারী দিক তা মানবসমাজ ও সংস্কৃতি আলোচনার বৈচিত্র্যকে প্রকাশ ঘটায়। 'আদিবাসীচর্চার রূপবৈচিত্র্য' বিভাগে যে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় আছে তা শুধু নানাজাতীয় আদিবাসী গোষ্ঠীর জীবনচর্যার বহুবিচিত্র রূপ তুলে ধরে না, বাংলা ভাষায় চর্চার বিষয় ও বিশ্লেষণের গতিপ্রকৃতিকেও জানতে সাহায্য করে। প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র *দিগ্‌দর্শন*-সহ অতীতের এইসব আলোচনায় বর্তমানে হয়ত অনেক কিছুরই সন্ধান পাওয়া যাবে না—তবে সূত্রসন্ধানে এসব লেখার গুরুত্ব আছে। আর্য ও অনার্য শিল্পের কাঠামো ও পরম্পরা, সাহিত্য আলোচনাতেও আঞ্চলিক আদিবাসী সংস্কৃতির প্রভাবের প্রতিফলন, পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে আদিবাসী জনজীবন, বিবাহের বিভিন্ন রকমের রীতি অথবা মৃতদেহ নিয়ে কিছু প্রাচীন কার্যকলাপ যে আলোচিত হয়েছে এই বিভাগে তাতে মূলত আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্যময় রূপ ধরা পড়ে। অন্য বিভাগের বিভিন্ন লেখাতেও বহুক্ষেত্রে এসব বিষয় নিয়ে নানাভাবে আলোচিত হয়েছে। 'আসামের কুকি জাতি' শীর্ষক আলোচনা যেমন অন্য লেখার পরিপূরক হিসাবে এখানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কোনো কোনো প্রবন্ধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আলোচনাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তবু স্বতন্ত্রভাবে এই বিভাগীকরণে বিশেষভাবে বিষয়টির সন্নিবেশ ঘটেছে। এইসব আলোচনার উপাদানসূত্র হিসেবে অনেকাংশে দেশীয় আদিবাসী সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতের বাইরের বিভিন্ন আদিবাসী জীবনবৈচিত্র্যের নানা সন্ধান পাওয়া যায়। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও বহুলাংশে চমকপ্রদ এসব বর্ণনায় বিশ্বের নানা প্রান্তের বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পরিচয় আমরা জানতে পারি সাময়িকপত্রের পাতা থেকে। এই বিভাগের পনেরোটি লেখায় শুধু আদিবাসী জনজীবনের বৈচিত্র্যময় দিকই প্রতিফলিত হয়নি, বাংলা সাময়িকপত্রের বিস্তারী বিষয় অনুসন্ধানের নানা পথও উপলব্ধ হয়।

মানব বিবর্তনের ধারায় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অবস্থান এবং বিশ্বব্যাপী এই অবস্থানে নিজ নিজ গোষ্ঠীর রকমারি জীবনচর্যায় যে বিশিষ্টতা তা মানববিজ্ঞানের সামগ্রিক চর্চায় উল্লেখযোগ্য বিষয় এবং বহুক্ষেত্রে কৌতূহলোদ্দীপক। এই কৌতূহল, আগ্রহ ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের সমাজ-সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ার অন্বেষণ তাই চলে আসছে বহুকাল যাবৎ। বাংলা সাহিত্যচর্চার নানা প্রেক্ষাপটে উল্লেখও আছে এসবের। 'আরণ্যক' উপন্যাসে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—'আজও বিজিত হতভাগ্য আদিম জাতিগণ তেমনই অবহেলিত, অবমানিত, উপেক্ষিত। সভ্যতাদর্পী আর্যগণ তাহাদের দিকে কখনও ফিরিয়া চাহে নাই, তাহাদের সভ্যতা বুঝিবার চেষ্টা করে নাই, আজও করে না। আমি, বানোয়ারি সেই বিজয়ী জাতির প্রতিনিধি, বৃদ্ধ দোবরু পান্না, তরুণ যুবক জগরু, তরুণী কুমারী ভানুমতী সেই বিজিত, পদদলিত জাতির প্রতিনিধি—উভয় জাতি আমরা এই সন্ধ্যার অন্ধকারে মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছি—সভ্যতার গর্বে উন্নতনাসিক আর্যকান্তির গর্বে আমি প্রাচীন অভিজাতবংশীয় দোবরু পান্নাকে বৃদ্ধ সাঁওতাল ভাবিতেছি, রাজকন্যা ভানুমতীকে মুন্ডা কুলি রমণী ভাবিতেছি—তাদের কত আগ্রহের ও গর্বের সহিত প্রদর্শিত

রাজপ্রাসাদকে অনার্যসুলভ আলো-বাতাসহীন গুহাবাস, সাপ ও ভূতের আড্ডা বলিয়া ভাবিতেছি।'

জনসমাজের নানা প্রচলিত ধারণা, সমসাময়িক শিক্ষা, সংস্কার নিয়ে আদিবাসী জনগোষ্ঠী সম্পর্কে বহুদিন যাবৎ এক বিশেষ উপলব্ধি গড়ে উঠেছে। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহচর্যে গড়ে ওঠা সাঁওতালদের সম্বন্ধে গবেষণা করার জন্য একটি সমিতি ছিল। প্রতিবেশী সাঁওতালদের জীবনযাত্রার সম্যক পরিচয় জানার আগ্রহে ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচালনায় হাতে লেখা 'শান্তি' পত্রিকায় শ্রাবণ ১৩২১ সংখ্যায় এবিষয়ে রচনাও প্রকাশিত হয়। সমসাময়িক বাংলা সাময়িকপত্রে যে আদিবাসী জীবন নিয়ে লেখা হচ্ছিল তাও আমরা জানছি। এভাবে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার বিচ্ছুরণ ও তার প্রভাব, সেইসঙ্গে দেশীয় সমাজ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা দিকও সামনে চলে আসে। ইংরেজি লেখা আর এদেশীয় সাহিত্যে বাংলা ভাষার সমাজচেতনা ও নীতিবোধের উন্মেষের মধ্যে গড়ে উঠতে থাকে লেখালেখির বিস্তৃত জগৎ। ভাষা-সাহিত্য, প্রাকৃতিক বিষয়-সম্ভূত বিবিধ বিষয়, ধর্মনীতি, সামাজিক বন্ধন ও মুক্তির মধ্যে উঠে আসতে থাকে সাংস্কৃতিক নানা তথ্য। বাংলা সাময়িকপত্রে প্রকাশিত জাতি, আদিবাসী সংস্কার-সংস্কৃতি নিয়ে আলোকপাতে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাপ্রসূত ক্ষেত্রসমীক্ষালব্ধ লেখা হয়ত সবক্ষেত্রে নেই, তবে এসব প্রচেষ্টায় জনগোষ্ঠীর রীতি-বৈশিষ্ট্য যে যুগপৎভাবে তথ্যমূলক ও কৌতূহলী হতে পারে সে ধারণা তৈরি হয়েছে তা বলা যায়। বহুক্ষেত্রে প্রতিবেদনধর্মী এসব লেখা তৎকালীন বাংলা সাময়িকপত্রে নতুন উপাদান জুগিয়েছিল। সাহিত্য, ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা, প্রাণীতত্ত্ব, রসায়ণ, পদার্থবিদ্যা, আয়ুর্বেদ, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে মানবতত্ত্ব ও দর্শনের সঙ্গে মানুষের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কিত লেখাও প্রকাশিত হতে থাকে। মানুষ সম্পর্কে প্রকাশমান যে জগৎ, সেই জগতের প্রতি আস্থা এসব লেখার মধ্যে ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয়েছে।

বঙ্গসংস্কৃতি চর্চায় সাহিত্যিক, ভাষাতাত্ত্বিক, ইতিহাসবিদ, প্রত্নতত্ত্বের দিকপাল হিসাবে যাঁরা পরিচিত—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, হরিদাস পালিত, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র সেন প্রমুখের জনজাতি, ভাষাতত্ত্বসহ আদিবাসী জনজীবনের প্রেক্ষাপটে তাঁদের চর্চা সংকলনকে সমৃদ্ধ করেছে। একই সঙ্গে শরৎচন্দ্র রায়, নির্মলকুমার বসু, পঞ্চানন মিত্র, বিরজাশঙ্কর গুহ প্রমুখ নৃতাত্ত্বিকদের সেসময়ের ক্ষেত্রসমীক্ষা, গবেষণা যা তাঁরা ইংরেজিতে প্রবন্ধ বা গ্রন্থের আকারে প্রকাশ করেছেন। একই সময়কালে বাংলা সাময়িকপত্রে এসব বিষয়ই তাঁরা লিখেছেন। নৃতত্ত্বচর্চায় এই প্রচেষ্টা সম্পর্কে আমরা বহুলাংশে উদাসীন। এ সময়েরও আগে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যখন বিবিধ বিষয়ক আলোচনার প্রচেষ্টা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে আর যেখানে বাংলা সাময়িকপত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। উনিশ শতকের শেষ পর্যায়ে এবং বিশ শতকের শুরুতে যে লেখিকারাও আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বর্ণকুমারী দেবী, গিরিবালা দেবী, হেমন্তকুমারী চৌধুরীর নীলগিরির টোডা জাতি, সিংভূমের কোলজাতি ও খাসিয়া জাতি নিয়ে 'ভারতী', 'অন্তঃপুর' পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা এখানে সংকলিত হয়েছে।

উনিশ শতকে শুরু হয়ে পরম্পরাসমৃদ্ধ আমাদের বাংলা সাময়িকপত্রে খ্যাত-অখ্যাত নানা লেখকের নৈপুণ্য প্রকাশিত হয়েছে। সাময়িকপত্রের এই পরম্পরায় লেখক-লেখিকাদের সঙ্গে

সম্পাদকদের নৈপুণ্য ও স্বকীয় প্রতিভাও সাময়িকপত্রের বিষয়-বিন্যাস থেকেই জানা যায়। বর্তমান সংকলনে যে সমস্ত সাময়িকপত্র থেকে রচনা সংকলিত হয়েছে তাতে খ্রিস্টান মিশনারিরাও সূচনাকালের সম্পাদনায় যুক্ত ছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অন্নদাচরণ সেন, স্বর্ণকুমারী দেবী, হিরন্ময়ী দেবী, সরলা দেবী, হেমন্তকুমারী চৌধুরী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ বসু, অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ, কেদারনাথ মজুমদার, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, জলধর সেন, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রমথনাথ বিশী, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, মোহাম্মদ আকরম খাঁ, সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য, অনিলকুমার দে, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নলিনীকিশোর গুহ ও রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের কথা উঠে আসে।

যেসব সাময়িকপত্র থেকে সংকলনে রচনা সংকলিত হয়েছে, সেসব পত্রিকার সম্পাদক ছাড়াও অসংখ্য বিশিষ্ট সাময়িকপত্র ও খ্যাতিমান সম্পাদকের নাম অনুল্লেখ থেকে গেল। সব পত্রিকা নিয়ে অনুপুঙ্খভাবে কাজ করা সম্ভব হয়নি—অনেক পত্রিকা সহজলভ্যও নয়। এছাড়া বহু লেখায় আদিবাসী জনগোষ্ঠী সম্পর্কে আলোচনায় যে দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে তা গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। সেসময়ের অনেক পরিচিত পত্রিকার মধ্যেও এই বিষয় দেখা গেছে। যথাসম্ভব সেসব লেখাগুলো সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এসত্ত্বেও যদি কোনোভাবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে সে মনোভাবের প্রকাশ থেকে যায় তা অনবধানজনিত ত্রুটি। আদিবাসী সমাজের ঐতিহ্য ও পরম্পরার যে বর্ণাঢ্য উপস্থিতি তা আমাদের সংস্কৃতিকে শুধু বর্ণময় করেনি, আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতির মূল কাঠামো ভারত সংস্কৃতির প্রাণভোমরা হিসাবে কাজ করেছে—তা স্বীকার করা যেতেই পারে। তবু আদিবাসী সম্পর্কে হীন দৃষ্টিভঙ্গি, মন্তব্য প্রচলিত চর্চায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে জায়গা পেলেও তা সমর্থনযোগ্য নয় এবং যুক্তিসিদ্ধ বিজ্ঞাননির্ভর বিদ্যাচর্চার নিরিখে তা মান্যতা পেতে পারে না। নিজজাতির পরিচয়ের দৃষ্টিকোণেও যে উল্লেখিত হয়েছে তা থেকেও এই ধারণার বাহুল্য বোঝা যায়। 'আসামের কুকি জাতি' শীর্ষক প্রবন্ধে লালতুদাই রায় লিখেছেন—'আমি উক্ত কুকি-জাতীয় লোক। আমাদের সভ্যতা, বর্বরতা, হিংস্রতা প্রভৃতি বিষয়ে নানা গল্প, আমাদের প্রতিবেশী বাঙ্গালী পাঠকগণ শুনিয়া থাকিবেন। আমিও আজ আমাদের অসভ্য সভ্যতা সম্বন্ধে কিছু বলিতে কিছু চেষ্টা করিতেছি,—বিশেষভাবে বাঙ্গালীদের নিকট। আমার গোত্র-পরিচয় অবগত হইয়া, পাঠকগণ নিশ্চয়ই আমার সর্ববিধ ত্রুটি মার্জনা করিবেন। এই ভরসাতেই আমার এই প্রয়াস।' এভাবে নানা ভাবনা, প্রেক্ষাপট, দৃষ্টিকোণ ও বৈপরীত্যে এসব রচনা প্রকাশ পেয়েছে।

এ সবই যে সমস্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল সেসবের ছিল ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র। বর্তমান সময়ে একমাত্র সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ছাড়া সমস্ত পত্রিকারই বিলুপ্তি ঘটেছে। সেসব পত্রিকার কোনোটি বা ছিল মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত, কোনোটি শিশুপত্রিকা, কোনোটি নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক লেখায় সমৃদ্ধ। প্রকাশ সময়ের নিরিখেও কোনোটি মাসিক, কোনোটি ত্রৈমাসিক বা বাৎসরিক ছিল এসব পত্রিকা। সংকলনের প্রায় সব পত্রিকাই বঙ্গাব্দ অনুসারী হলেও, উনিশ শতকের কিছু ক্ষেত্রে খ্রিস্টাব্দ ও শকাব্দে উল্লেখিত প্রকাশকাল দেখা যায়। ব্যবহারিক সুবিধার

জন্য বঙ্গাব্দ ও শকাব্দকে বর্তমান সংকলনের প্রবন্ধের সঙ্গে খ্রিস্টাব্দও উল্লেখ করা হয়েছে। ব্রিটিশ শাসনাধীন সময়ে বাংলা ভাষায় দেশীয় সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার দিগন্ত নানা প্রতিকূলতার মধ্যেই এগিয়েছিল। তাছাড়া প্রাথমিক পর্বে হয়ত মানসিকতার প্রতিবন্ধকতাও বিশেষ করে উল্লেখ্য। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যার প্রস্তাবনাতেও তারই ইঙ্গিত—"যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ বা সাময়িকপত্র প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদিগের বিশেষ দুরদৃষ্ট। তাঁহারা যত যত্ন করুন না কেন, দেশীয় কৃতবিদ্য সম্প্রদায় প্রায়ই তাঁহাদিগের রচনা পাঠে বিমুখ।" পর পরই ঘোষণা—"আমরা এই পত্রকে সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর পাঠোপযোগী করিতে যত্ন করিব। যত্ন করিব; এইমাত্র বলিতে পারি। যত্নের সফলতা ক্ষমতাধীন। এই আমাদিগের প্রথম উদ্দেশ্য।" তবে এই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য পরবর্তী সময়ে স্বদেশপ্রেম, স্বাজাত্যবোধ থেকে স্বতোৎসারিত হয়ে নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। বিশ শতকের স্বাধীনতা-পর্ব পর্যন্ত বাংলা সাময়িকপত্র পর্যবেক্ষণ করলে এই কবুলনামার সার্থকতা বহুলাংশে মিলবে তা বলা যায়।

সংকলনে অন্তর্ভুক্ত সাময়িকপত্র ছাড়া অন্য বহু সাময়িকপত্রে জনতত্ত্ব ও আদিবাসী বিষয়ক নানা রচনা প্রকাশিত হয়েছে। 'দেশ' পত্রিকায় প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে নির্মলকুমার বসু, শশাঙ্কশেখর সরকার প্রমুখ নৃতাত্ত্বিকদের পাশাপাশি অন্য লেখকদেরও বেশ কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া 'বান্ধব', 'উত্তরা', 'তমোলুক পত্রিকা' প্রভৃতিতে বিশ শতকে প্রকাশিত প্রবন্ধের সঙ্গে উনিশ শতকে 'বঙ্গমহিলা', 'আর্যদর্শন', 'জন্মভূমি', 'রহস্য-সন্দর্ভ' প্রভৃতিতেও প্রকাশিত হয়েছে নানা লেখা। এসব লেখার মধ্যে একই লেখকের বিভিন্ন লেখা ভিন্ন ভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। আবার বিষয়বস্তুগত মিল বিভিন্ন লেখকের লেখায় দেখা গিয়েছে। তবে উনিশ শতকে সাধারণভাবে মানুষের জাতিতত্ত্ব ও কোনো আদিবাসী জনগোষ্ঠী সম্পর্কে পরিচয়মূলক লেখা থেকে পরবর্তী বিশ শতকে এর পাশাপাশি বিশ্লেষণী ও জনগোষ্ঠীর নির্দিষ্ট আঙ্গিকগত দিক যেমন ভাযা, সংগীত, সংস্কার, বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ের বিশেষ পর্যবেক্ষণের প্রতিফলন ঘটেছে। এভাবে আমাদের সমাজবিজ্ঞান চর্চার ধারার বৈশিষ্ট্য সাময়িকপত্রের কালানুক্রম থেকেও জানা যায়। অন্য জ্ঞাতব্য দিক হল, উনিশ শতকের মাঝবরাবর 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' পত্রিকায় প্রথম রেখাঙ্কন ব্যবহার দেখা গেলেও পরবর্তী সময়ে এর বহুল ব্যবহার ছিল না। বিশ শতকের ত্রিশের দশকের পরবর্তী সময়ে অলঙ্করণ ও আলোকচিত্রের ব্যবহারে আধিক্য দেখা যেতে থাকে। বর্তমান সংকলনে বহু প্রবন্ধ-সংশ্লিষ্ট রেখাঙ্কন ও আলোকচিত্র ছাপানো সম্ভব হয়ে ওঠেনি। মূল ছবি ও রেখাঙ্কন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অস্পষ্ট হওয়ায় পুনরুদ্ধার করার ক্ষেত্রে অসুবিধাজনক মনে হয়েছে। এছাড়া কিছু কিছু প্রবন্ধ লেখকের নাম লেখার সঙ্গে পাওয়া যায়নি বা ছদ্মনামেও লিখেছেন কেউ। এছাড়া সব লেখকের পরিচয় সংগ্রহ করাও সম্ভব হয়নি তাই সামগ্রিকভাবে লেখক পরিচয় দেওয়া গেল না। এসব ঘাটতি থেকে গেল।

এ সবই চর্চার গতিপ্রকৃতি, অন্বেষণ বা সংকলনের পূর্ণতা-অপূর্ণতার রূপ আর কাঠামোর তথ্যহদিস। কিন্তু সুদীর্ঘকাল ধরে অবহেলা, দারিদ্র, অশিক্ষায় পিছিয়ে পড়া আদিবাসীদের শুলুকসন্ধান কীভাবে হয়েছে এবং তা কতদূর ফলপ্রসূ হয়েছে সে অন্বেষণও তো জরুরি। আমাদের চর্চার সূত্রে এটি নিশ্চয়ই অস্বীকার করা যাবে না। নৃতাত্ত্বিকরা সাধারণভাবে সমাজকর্মী

নন এবং সমাজ-সংগঠন কর্মীরাও নির্দিষ্টভাবে নৃতত্ত্ববিদ নন—এই বিষয়টিও কর্মসূচি রূপায়ণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠে। কিন্তু কার্যকরী ও গঠনমূলক কাজ বোধহয় সমাজকর্মী ও তত্ত্ববিদদের যৌথ সমন্বয়ের মধ্যেই গতি পায়। এ সবেরই সূত্র ধরে বলা যায়, স্বাধীনতা-পর্ব পর্যন্ত বাংলা সাময়িকপত্রের আদিবাসী জীবনচর্যার বিষয়-ভিত্তিক চর্চা ও অনুসন্ধানের গতিপ্রকৃতির একটি কাঠামো অন্তত তৈরি হয়েছে। তবে বিষয়ক্রম অনুযায়ী সংকলনের রচনাবিন্যাসে কালানুক্রম রাখা যায়নি। সামগ্রিকভাবে, সংকলনের মাধ্যমে অসম্পূর্ণতা থেকে সম্পূর্ণতার কাছাকাছি পৌঁছুতে এই পরিচয় উন্মেষের সাহায্য আগামী সময়ে কাজে আসবে আশা করা যায়। আমাদের সমাজ-সাংস্কৃতিক চর্চায় এই সংকলন-গ্রন্থ প্রয়োজনীয় গ্রহণযোগ্যতা অর্জনে বিবেচিত হতে পারে।

কলকাতা, জানুয়ারি ২০০০ দীপঙ্কর ঘোষ

প্রবন্ধসূচি

॥ জন-জাতিবিন্যাস ॥

॥ ভারতের আদিবাসী ॥

॥ আদিবাসীচর্চার রূপবৈচিত্র্য ॥

॥ পরিশিষ্ট ॥



জন-জাতিবিন্যাস



মানব-বিজ্ঞান

শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়, বি-এ

মানব-বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য

এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে প্রত্যেকটি জিনিসেরই একটা ইতিহাস আছে। ইহা কী, কোথা থেকে এল, কী ছিল এবং কী করেই বা বর্তমান অবস্থায় এসে পড়েছে, সেই জ্ঞানের কথাই আমি বলছি।

ওই যে রাস্তার ধারে ক্ষুদ্র প্রস্তরের টুকরাটি পড়ে রয়েছে, বৈজ্ঞানিক কঠোর অনুসন্ধিৎসা ও অধ্যবসায়ের ফলে উহার ভিতর থেকে যে ইতিহাস বা তথ্য বের করে ফেলবে, তা অনেক উপন্যাস ও গল্পের চেয়ে অধিক আনন্দদায়ক। যদি তাহাই হয়, যদি মৃত মূক প্রস্তরখণ্ডের ইতিহাস আমরা বুদ্ধিবলে জেনে নিতে পারি, তবে জীবিত প্রাণীর ইতিহাস যে আরও সুন্দরভাবে জানতে পারব, এবং তাহা যে আরও আনন্দদায়ক হবে, তাহাতে আর সন্দেহ কী?

প্রাণীজগতে মানবই সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। এই মানুষেরও একটা বৈজ্ঞানিক ইতিহাস আছে। মানব-মণ্ডলীর একটা গোটা ইতিহাস বুঝিবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা। এখন দেখা যাক, কী করে আমরা এ বিষয়ে অগ্রসর হতে পারি। বৈজ্ঞানিক প্রণালী ছাড়া এলোমেলোভাবে যদিও অনেক তথ্য অবগত হওয়া যায়, তথাপি জ্ঞানের সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছিতে বৈজ্ঞানিক প্রণালী ভিন্ন গত্যন্তর নাই ; কেন-না তদ্‌ভাবে পর্যবেক্ষণ বেশি দূর অগ্রসর হতে পারে না। বিজ্ঞানের যুক্তি, তর্ক, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার মাপকাঠি দিয়ে প্রত্যেক তথ্যে অগ্রসর হওয়াই প্রকৃষ্ট উপায় ; এবং তদ্দ্বারাই আমরা মানব-বিজ্ঞান বুঝে

নিতে চাই। বিজ্ঞানের কাজ সত্যানুসরণ ও সত্যের আবিষ্কার করা। আমরা সত্যানুসন্ধিৎসু ; তাই আজ বিজ্ঞানের সাহায্য লইব।

যে বিজ্ঞানের সাহায্যে নৃতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, তাহার নাম Anthropology বা নৃবিজ্ঞান বা মানব-বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান মানবের গোটা ইতিহাস জানবে। মানব-বিজ্ঞান শুধু আজিকার মানবের ইতিহাস নয়, পরন্তু ক্রমবিকাশ লক্ষ করে সেই আদিম যুগ হতে আরম্ভ করে বর্তমান কালের সকল মানবের ইতিহাস জানতে চেষ্টা করবে। ইহা সমস্ত কালের—অতীত ও বর্তমান, পৃথিবীর সমস্ত অংশের সভ্য ও অসভ্য মানবের কথা জানবে। শুধু তাহাই নয়। ইহা মানবের দেহ ও মনের সকল তথ্য জানতে চেষ্টা করবে। দেহের সহিত মনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে ; আবার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে দেহ ও মনের বিস্তর সম্বন্ধ রয়েছে ; মানব-বিজ্ঞান এই বিষয়গুলাকে বাদ দিতে পারবে না। এক কথায় বলতে গেলে, এই বলা যায় যে, ইহা সমগ্র মানব-সমাজের সর্বপ্রকার ইতিহাস জানতে চেষ্টা করবে।

এখন দেখা যাক এই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য কী? উল্লিখিত বিষয়গুলার দিকে নজর রেখে, মানবের উদ্ভবের সেই শুভ মুহূর্ত হতে আজ পর্যন্ত এর দৈহিক ও মানসিক যাহা যাহা পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে, সেগুলার ধারাবাহিক একটা নকশা তৈয়ার করে, বিজ্ঞানের বিশেষ জ্ঞানকে থিওরির (theory) গণ্ডিতে আবদ্ধ না রেখে, সর্বসাধারণোপযোগী ব্যাপক কার্যকরী জ্ঞানে উন্নীত করণান্তর জগতে কল্যাণসাধন করাই মানব-বিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য। যে ক্রমবিকাশের স্রোতে মানব ভেসে চলেছে তার একটা ধারা জানবার উপায় বাহির করাই মানব-বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য।

মানব-বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য শুধু জ্ঞানের জন্যই জ্ঞানানুসন্ধান, সত্যের জন্যই সত্যানুসন্ধান। ব্যবহারিক জগতে এই বিজ্ঞান কোনো কাজে লাগবে কি না, সে বিষয়ে মানব-বিজ্ঞানবিদের কোনো লক্ষ নাই। আমরা সত্যের অনুসন্ধানে বহির্গত হয়েছি—সত্যের অনুসন্ধানই আমাদের কাজ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কি এই বিজ্ঞান ব্যবহারিক জগতে কোনো কাজে আসবে না? তা নয়। মানব-বিজ্ঞানবিদ যে তথ্য আবিষ্কার করবে, সেই সত্য অন্যান্য বিজ্ঞানের মতোই ব্যবহারিক কার্যে প্রয়োগ করা যাবে ; এবং এই বিজ্ঞানেব সত্যসমূহ প্রয়োগের ফলে মানবের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে। মানব-বিজ্ঞানের কাজ যখন মানব নিয়ে, তখন মানব সংক্রান্ত সকল বিষয়ের সহিত ইহার কিছু না কিছু সম্বন্ধ রয়েছে। যাঁহারা মানব নিয়ে কাজ করবেন, তাঁহাদের এই বিজ্ঞানের তথ্যগুলা জানা নিতান্ত আবশ্যক। বিশেষত যাঁহারা সমাজনীতি, রাজনীতি বা ধর্মনীতি আলোচনা করবেন, তাঁহাদের মানব-বিজ্ঞানের সাহায্য লওয়া একান্ত দরকার। এই বিজ্ঞানের সাহায্য না লইলে, তাঁহাদের প্রতি পদবিক্ষেপে ভুলের সম্ভাবনাই অধিক হবে ; এবং তা হলে তাঁহাদের কাজ সাফল্যমণ্ডিত না হয়ে ধুলায় ধূসরিত হবে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ কিন্তু হৃদয়বান ও সহানুভূতিসম্পন্ন কোনো লোক বিকারগ্রস্ত রোগীর দুঃখে দুঃখিত হয়ে তার খেয়াল মতো কুপথ্য দিলে, অজ্ঞাতসারে রোগীর অপকার করাই হয়। বিজ্ঞ চিকিৎসক কিন্তু রোগ নির্ণয়ান্তর, রোগীর ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর দৃকপাত না করে, উপযুক্ত চিকিৎসা দ্বারা রোগীর অশেষ মঙ্গলের

কারণ হন। মানব-বিজ্ঞানাভিজ্ঞ ব্যক্তিও ঠিক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের ন্যায় সমাজের উপকারের কারণ হয়ে থাকেন। পরন্তু ধার্মিক হৃদয়বান ব্যক্তি যদিও সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী, তথাপি অভিজ্ঞতার অভাবে সমাজের মঙ্গলসাধন করতে যেয়ে অনেক সময় অমঙ্গল করে বসেন। অতএব যাঁহারা সমাজের দুঃখে দুঃখিত হয়ে সমাজের মঙ্গল করতে যাবেন, যাঁহারা মানবকে পাপ কার্যে লিপ্ত দেখে দুঃখিত হয়ে ধর্মের প্রচারে বহির্গত হবেন, তাঁদের মনে রাখতে হবে যে, শুধু হৃদয় থাকলেই হবে না, তার সঙ্গে থাকা চাই প্রকৃত রোগ বা কারণ নির্ণয় করবার জ্ঞান. যার অভাবে অনেক সময় মঙ্গল করতে যেয়ে অমঙ্গল করে বসবেন।

আমাদের সমাজে ধর্মের নামে বহু কুসংস্কার বর্তমান থেকে আমাদের উন্নতির পথে অবিরত বাধা প্রদান করছে। এই কুসংস্কার আমাদের আত্মাকে দৃঢ়ভাবে বন্ধন করে স্বাধীনতা হরণ করে ফেলেছে। যদি আত্মার স্বাধীনতাই মানবজীবনের লক্ষ্য হয়, তবে এই সকল বন্ধন যত কমে ততই মঙ্গল। মানব-বিজ্ঞান এই বন্ধন খুলে ফেলতে অনেক সাহায্য করবে।

মানব-বিজ্ঞানের আলোচনা করলে কী উপকার হতে পারে, তাহা সংক্ষেপে বলতে গেলে এই বলা যায় যে, ইহাতে আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্র বর্ধিত হয়, কুসংস্কার দূর হয়, মানবের সকল অনুষ্ঠানগুলা সুসম্পন্ন করা যায়, নভেল নাটক পড়ার আনন্দ পাওয়া যায়, মানবের প্রতি মানবের প্রীতি বর্ধিত হয় এবং ভগবানের উপর বিশ্বাস দৃঢ় হয়।

মানব-বিজ্ঞান অল্পদিনের বস্তু। যদিও ইহা এখনও মাতৃগর্ভে অবস্থিত বললেই চলে, কিন্তু ইহার প্রসারতা দিন দিন বর্ধিত হচ্ছে। ইয়োরোপ ও আমেরিকায় এর চর্চা দ্রুতগতিতে বর্ধিত হয়ে যাচ্ছে এবং ইহার জন্য তাহারা অকাতরে অর্থ ব্যয় করছে। তাহারা বুঝেছে যে, ইহার চর্চা মানবের একান্ত আবশ্যক। শাসন বিভাগে ইহার উপকারিতা দর্শনে ভারতবর্ষে অনেক ইংরেজ সিভিলিয়ান ইহার বিষয়ে অনেক চর্চা করেন। ভারতবর্ষের মধ্যে শুধু বাঙ্গালা দেশে স্বর্গীয় স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপার্টমেন্টে সম্প্রতি এই বিজ্ঞান পড়াবার জন্য বি-এসসি, এম-এ, এম-এসসি ক্লাস খোলা হয়েছে। আজকাল লোকের দৃষ্টি এই দিকে একটু আকৃষ্ট হয়েছে। সম্প্রতি I.C.S. পরীক্ষায় এই বিষয়টি পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়েছে। এই পরীক্ষার সুবিধার জন্য সম্ভবত বাঙ্গালায় ও অন্যান্য প্রদেশের কলেজ সমূহে ইহার ক্লাস খোলা হবে। ভারতবর্ষ মানব-বিজ্ঞান চর্চার উপযুক্ত ক্ষেত্র। এখানে ইহার আলোচনা যত হয় দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল।

মানব-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়

যে ক্রমবিকাশের ধারা জানবার জন্য আমরা অগ্রসর হয়েছি, তাহা জানতে পারা সহজ নয়; কারণ, মানব-জীবন জটিলতায় পূর্ণ। সেই জন্য তাহার সম্বন্ধে জানতে হলে তাহার প্রত্যেক খুঁটিনাটি আমাদের প্রথমে জানতে হবে। অতএব মানব-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়

বিশাল ও বিস্তৃত। মানবের দেহ মন সম্বন্ধে যত বিষয় এবং মানবের চিন্তা ও কর্ম-প্রসূত যত বিষয় আছে, তাহা সকলই এই বিজ্ঞানের গণ্ডির ভিতর এসে পড়ে ; কিন্তু এলোমেলোভাবে সকল বিষয় জানতে গেলে আমাদের কোনো সুবিধা হবে না। আমাদের শৃঙ্খলার সহিত অগ্রসর হতে হবে। মানব-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় কী কী, তাহার একটা মোটামুটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। প্রাক্-ইতিহাস— (ক) শিল্পতত্ত্ব (technology) (Pre-hisotry)
(খ) চিত্রকলা (Art)

২। ভূতত্ত্ব— (ক) ভূ-বৃত্তান্ত (Geology)
(খ) ভূগোলবিদ্যা (Geography)

৩। প্রাণীতত্ত্ব— (ক) প্রাণীতত্ত্ব (Zoology)
(খ) প্রাচীন জীবজন্তু বিষয়ক বিজ্ঞান—(Palaeontology)
(গ) দেহতত্ত্ব (Anatomy)
(ঘ) মনস্তত্ত্ব (Psychology)

৪। জাতিতত্ত্ব— (ক) সমগ্র মানবজাতি সমূহের বিবরণ—(Ethnography)
(খ) মানবজাতির মূল বিভাগ ও পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ক বিজ্ঞান—(Ethnology)

৫। সমাজতত্ত্ব— (ক) সর্বপ্রকার সমাজেব বিবরণ
(খ) সামাজিক সম্বন্ধ
(গ) সমাজের আইনকানুন, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি ইত্যাদি

৬। ধর্মতত্ত্ব— (ক) সর্বপ্রকার ধর্মের বিবরণ
(খ) ব্রত, পূজা, উপাসনা ইত্যাদি
(গ) ব্রতকথা, পৌরাণিক আখ্যায়িকা, গল্প ইত্যাদি

৭। ভাষাতত্ত্ব— প্রধান প্রধান ভাষা সমূহ এবং তাহাদের সম্বন্ধ

৮। আত্মতত্ত্ব— আধ্যাত্মিক জ্ঞান, দর্শন, যোগ, সম্মোহন বিদ্যা (Hypnotism) মানসিক চর্চা (Psychic culture) ইত্যাদি

উপরিউক্ত বিষয়গুলা যদিও ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, তথাপি, এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, প্রত্যেকটির সহিত প্রত্যেকটির সম্বন্ধ রয়েছে। কেবল সুবিধার জন্য আমরা প্রত্যেকটি বিষয় পৃথকভাবে আলোচনা করেছি।

প্রথমত আমাদের জানতে হবে মানবের কখন জন্ম হয়েছে। ইতিহাসে তাহার কোনো কথা লেখা নাই। ইতিহাস বড়ো জোর ১০/১৫ হাজার বৎসর অতীতের কথা বলতে পারে। কিন্তু তাহারও পূর্বে যে মানব ছিল, তাহাব সব কথা আমরা জানব কী করে? আমরা ওই প্রাক্-ইতিহাস জানতে পারি তৎকালীন মানবের নির্মিত দ্রব্যসামগ্রী ও চিত্রকলা

দ্বারা। আর জানতে পারি তৎকালীন মানবের কঙ্কাল দ্বারা ; এবং মানবের বয়স নির্ণয় করতে পারি মাটির স্তর দেখে। সেই জন্যই আমাদের প্রাক্-ইতিহাস, ভূতত্ত্ব ও প্রাণীতত্ত্ব জানতে হবে। একখানা অস্থি, প্রস্তর বা একটি চিত্র দেখে কী করে প্রাক্-ইতিহাস জানতে পারব, তাহা পরে বর্ণিত হবে।

তারপর আমাদের জানতে হবে পৃথিবীর সকল জাতির কথা। শুধু বর্তমানের নয়, অতীতেরও সমগ্র জাতির কথা জানব। প্রত্যেক জাতির দৈহিক গড়নে একটা বিশেষত্ব আছে ; সেই দৈহিক গড়নের বিশেষত্ব বুঝতে হলে আমাদিগকে প্রাণীতত্ত্ব, প্রাচীন জীব-বস্তুতত্ত্ব, ও দেহতত্ত্ব জানতে হবে ; এবং মেপেজুখে কী করে এক জাতি হতে অন্য জাতিকে চিনতে পারা যায়, তাহাই শিখতে হবে। মস্তকের খুলি, গায়ের রং, চুল, দৈহিক গড়ন ইত্যাদির ভিতর অনেক বিশেষত্ব লুকানো রয়েছে।

মানবের জন্মস্থান কোথায় এবং এক জাতির সহিত অন্য জাতির কী সম্বন্ধ, তাহা আমাদের জানতে হবে। আজ পৃথিবীর প্রায় সমস্ত অংশেই মানব দেখতে পাই। মানব কি চিরকাল সেই সেই স্থান হতে বর্ধিত হয়ে বর্তমান অবস্থায় এসে পড়েছে, অথবা এক স্থান হতে জন্মগ্রহণ করে পরে বংশবৃদ্ধির দরুন ও অন্য কোনো প্রাকৃতিক কারণে পৃথিবীর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে? আমরা দেখতে পাই যে, ধরাপৃষ্ঠ অনবরত পরিবর্তিত হতেছে—আজ যে স্থানে সাগর, পূর্বে সেই স্থানে হয়তো দেশ ছিল ; এবং আজ যেখানে স্থল, সেই স্থানে হয়তো সাগর ছিল! আমাদের বাঙ্গালা দেশ বহু পূর্বে সাগর-গর্ভে ছিল। এবং আমরা বাঙ্গালী চিরদিন এই স্থানে ছিলাম না, অন্য কোথাও হতে এসেছি। অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে মানব এক স্থান হতে অন্য স্থানে যেতে বাধ্য হয়। আমরা যদি এই প্রাকৃতিক কারণগুলি জানতে পারি, তবে মানবের গতিবিধি জানবার অনেকটা সুবিধা হয় ; এবং তাহা লক্ষ করে আমরা জানতে পারব মানব প্রথম কোন্ স্থান হতে জন্মগ্রহণ করে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এই সব জানতে হলে আমাদের ভৌগোলিক জ্ঞান আহরণ করতে হবে—অতীত ও বর্তমানের প্রধান প্রধান শহর—দেশের জলবায়ু—নদনদী—সাগর ও স্থলের অবস্থান—জীবজন্তু ও উদ্ভিদ—খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান, মানবের পেশা—কাজ করবার যন্ত্রাদি—যাতায়াতের সুবিধা-অসুবিধা—কোন্ জাতি কর্তৃক কোন্ জাতি পরাভূত—ব্যবসা বাণিজ্য—আচার-ব্যবহার—রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান আমাদের থাকা চাই।

বিভিন্ন দেশের ভাষার আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, অনেক পুরাতন শব্দ আছে যাহা প্রায় অনেক দেশের ভাষার মধ্যে দেখা যায়। কোনো কোনো শব্দ হয়তো অনেকগুলি ভাষার মধ্যে দেখতে পাই ; আবার কোনো কোনোগুলি দেখতে পাই কম সংখ্যক ভাষার মধ্যে। যদি এক জাতি এক স্থান হতে জন্ম নিয়ে পরে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে থাকে, তবে ছড়িয়ে পড়বার পূর্বে যে যে শব্দ তাহারা ব্যবহার করত, তাহা পরবর্তী বিভিন্ন ভাষার মধ্যে দেখতে পাওয়া সম্ভব। এবং ছড়িয়ে পড়বার পরে যে সকল শব্দ প্রত্যেকটি শাখার মধ্যে উদ্ভব হয়েছে, তাহা এই সকল শাখার মধ্যে দেখতে না পাওয়াই সম্ভব। এক ভাষা হতে শব্দ ধার করে নিলে শুধু অন্য ভাষায় সেই শব্দ পাওয়া সম্ভব।

ভাষার আলোচনা করতে আমরা অনেকটা অনুমান করতে পারি যে, কোন্ জাতির সহিত কোন্ জাতির সম্বন্ধ রহিয়াছে।

তাহার পর আমাদের সমস্ত রকম সমাজের সংবাদ নিতে হবে ; এবং তাহাদিগকে বিশ্লেষণ করে তাহার ভিতর ঐক্য-সূত্র বের করতে হবে। কেন মানব সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বসবাস করে? কেমনে পারিবারিক জীবন গঠিত হয়ে ওঠে, কেমনে সমাজ গড়ে ওঠে এবং কেমনে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়? বিবাহ, আইন-কানুন, আচার-ব্যবহার কীরূপে উৎপত্তি হয়েছে? সামাজিক সম্বন্ধ কী করে গড়ে ওঠে? এই সব বিষয় আমাদের জানতে হবে।

সর্বপ্রকার ধর্মের বিবরণ, ব্রত, পূজা, পৌরাণিক আখ্যায়িকা, গল্প ইত্যাদি জেনে, আমরা জানতে চেষ্টা করব কী করে ধর্মের উৎপত্তি হল এবং মানবের সহিত ধর্মের সম্বন্ধ কী?

সর্বশেষে আমরা জানতে চেষ্টা করব আত্মা কী? নিজেকে জানা মানব-বিজ্ঞানের শেষ কথা।

ভারতবর্ষ ● পৌষ ১৩৩৩ (১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ)



আদিম মনুষ্য

এই উনবিংশ শতাব্দীতে মনুষ্যের অসীম ক্ষমতা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। এই ক্ষমতা কেবলমাত্র বুদ্ধিসম্ভূত, বস্তুত শারীরিক বলে মনুষ্য অনেক জন্তু অপেক্ষা হীনকল্প। কত শত বৎসরে মনুষ্যবুদ্ধি চালিত ও মার্জিত হইয়া যে বাষ্পীয় কল ও তাড়িতবার্তাবহ প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছে তাহা কে নির্ণয় করিবে? মনুষ্যের আদিম অবস্থার কোনো পুরাবৃত্ত নাই। মনুষ্যজাতি এত কাল পৃথিবীতে বর্তমান আছে তাহার সহিত তুলনায় ঐতিহাসিক কাল গত কল্য আরম্ভ হইয়াছে বলিলেও অযথা উক্তি হয় না। যে সকল লেখকেরা মনুষ্য সৃষ্টি খ্রিস্ট জন্মের কেবল কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বে নির্দেশ করেন তাঁহাদের মত সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক প্রতিপন্ন হইয়াছে। ভূতত্ত্ব শাস্ত্র দ্বারা সাব্যস্ত হইয়াছে যে, মনুষ্যজাতি শত শত শতাব্দী পূর্বে এই পৃথিবীতে বর্তমান ছিল।

কোনো এক জাতীয় মনুষ্য অন্য জাতীয় অধিকতর সভ্য লোকের বিনা সাহায্যে উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে পারে কি না, এ বিষয়ে পণ্ডিতদিগের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, সভ্যতা ঈশ্বর প্রদত্ত ; মনুষ্যহীনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে অসভ্য হইয়া উঠে। পক্ষান্তরে অনেকে বলেন যে, অসভ্যতাই মনুষ্যের আদিম অবস্থা ও কোনো না কোনো সুযোগ পাইয়া মনুষ্য ক্রমে ক্রমে আপন মানসিক বলে সভ্যপদারূঢ় হয়। এই দুই মতের মধ্যে কোন্‌টি সংগত তাহা মীমাংসা করা কঠিন। লিখিত ইতিহাস অতি সামান্য কাল অর্থাৎ প্রায় ২৫০০ বৎসর আরম্ভ হইয়াছে ও আফ্রিকা ও আমেরিকার অসভ্যজাতিদিগের সহিত ইউরোপীয় সুসভ্য জাতিদিগের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ প্রায় ৪০০ বৎসর ঘটিয়াছে। অধিকন্তু যে সময়ে অসভ্য জাতীয় লোকদের সহিত সভ্য জাতীয় লোকের সাক্ষাৎ হয় সেই সময় হইতেই অসভ্য জাতির অবস্থা পূর্বমত থাকে না সুতরাং ইতিহাস বা প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা উপরোক্ত দুই মতের কোনো এক মতের পোষকতা করা সুকঠিন।

পরন্তু বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন যে, যে যে স্থানে কোনো অনিবার্য প্রতিবন্ধক নাই সেই সেই স্থানে মনুষ্যের বুদ্ধি ও কার্য কুশলতা উত্তরোত্তর পরিপক্কতালাভ করিতেছে। ঐতিহাসিক কালের প্রথমে যদিও গ্রিক, রোমক ও হিন্দু জাতীয়েরা অনেক বিষয়ে প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল কিন্তু অধুনাতন ইউরোপীয়দিগের সহিত তাহাদের তুলনা হইতে পারে না। যদি মনুষ্যজাতির ক্রমশ মানসিক উন্নতি স্বীকার করা যায় তবে ইহাও স্বীকার্য হইতে পারে যে আদিম মনুষ্য ঐতিহাসিক কালের মনুষ্যাপেক্ষা বুদ্ধি ও মানসিক বলে অনেকাংশে হীনকল্প ছিল। অকাট্য প্রমাণের দ্বারা ইহাই স্থিরীকৃত হইয়াছে যে আদিমাবস্থার মনুয্যজাতি সমূহ নিঃসহায় ও আত্মরক্ষার জন্য ব্যতিব্যস্ত ছিল। তখন পৃথিবীতে এক প্রকার পশ্বাদির রাজত্ব ছিল। তখন আহারান্বেষণ ও আত্মরক্ষার জন্য মনুষ্যের যত সময় অতিবাহিত হইত। যে মানসিক বলে মনুষ্য সকল জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সেই মনের উন্নতির জন্য তাহার কিছুমাত্র সাবকাশ ছিল না।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, মনুষ্যের আদিমাবস্থার কোনো লিখিত পুরাবৃত্ত নাই। কিন্তু পুরাকালিক মনুষ্যের যে সকল চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তদ্বারা তাহাদের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক বিষয় অবগত হইতে পারা যায়। বর্তমান শতাব্দীতে অনেক ভূতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা সেই তমসাবৃতকালের অনেক বিষয় আলোকে আনিয়াছেন। অতি পূর্বকালে মানবজাতি বাটী নির্মাণকৌশল জানিত না। আত্মরক্ষার উপায়ান্তর না থাকায় গিরিগুহায় বাস করিত ; ক্রমে পর্বতাবৃত স্থান সকল অধিকৃত করিয়াছিল ও সুবিধা মতো বিল ও হ্রদে দ্বীপ নির্মাণ করিয়া তথায় বাস করিত। এই সকল গিরিগুহা প্রভৃতি আদিম বাসস্থানে ও তাৎকালিক সমাধি মন্দির সমূহে ব্যবহারোপযোগী অস্ত্রশস্ত্র ও তৈজসাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই সকল ব্যবহার্য দ্রব্যাদির দ্বারা আদিম মনুষ্যের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক বিষয় স্থিরীকৃত হইয়াছে।

ডারউইন, হক্স্লি প্রভৃতি কয়েকজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের মতে মনুষ্য বানর জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এ সিদ্ধান্ত কতদূর যুক্তিমূলক তাহা স্থির করা সহজ ব্যাপার নহে। কিন্তু মনুষ্যের আদিম অবস্থা সম্বন্ধে যতদূর অনুসন্ধান হইয়াছে, তদ্বাবা ইহাই উপলব্ধ হয় যে মনুষ্য ও বানর স্বতন্ত্র জাতি। মনুষ্য বানর হইতে উৎপন্ন হয় নাই, অথবা বানর মনুষ্যের সন্ততি নহে। ঐতিহাসিক কালে বা তৎপূর্বে বানরের অবস্থা যে কখনও উন্নতিলাভ করিয়াছে, তাহা কেহই বলিতে পারিবেন না। বানর চিরকালই শাখামৃগ আছে। তাহার হস্ত পদাদির গঠন স্বতন্ত্র। বানর কখনোই অগ্নির ব্যবহার জানে না ও শিখিতেও পারে না, বানর কখনোই রন্ধন পদ্ধতি শিখিতে পারিবে না ও এ পর্যন্ত আত্মরক্ষার্থ অস্ত্রশস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে পারিল না। পক্ষান্তরে দেখা যায় যে মনুষ্যের উন্নতির ইয়ত্তা নাই। প্রথমে মনুষ্য হীনবল নিঃসহায় কেবল আত্মরক্ষায় ও আত্মপোষণে সকল সময় অতিবাহিত করিত। অতি আয়াসে ও বহু কষ্টে দিন দিন বন্য পশুর অপক্ক মাংসে উদর পূরিত করিত, সময় বিশেষে মনুয্য মাংস বা শৃগাল ও ইন্দুরের মাংস তাহার অভক্ষ্য ছিল না। ক্রমে অগ্নির আবিষ্ক্রিয়া হইল, তখন দগ্ধ মাংস ভোজন, প্রস্তর নির্মিত অস্ত্র ও তৈজসাদির গঠন ও ব্যবহার ও পশ্বাদি পালন আরম্ভ হইল। তৎপরে মিশ্র ধাতুর ব্যবহার ও কৃষিকার্যের আরম্ভ, শেষে লৌহের আবিষ্ক্রিয়া ও কৃষিকার্যের উন্নতি। গুহাবাসী মনুষ্য

পর্যায়ক্রমে শিকারি, পশুপালক, কৃষিজীবী হইয়া শেষে বাহ্যিক সমস্ত বিষয়ে নিরুদ্বেগ হইয়া জ্ঞানোপার্জনে সক্ষম হইয়াছে। মনুষ্য প্রথমে হীনবল ও নিঃসহায় ছিল, এক্ষণে মনুষ্য পৃথিবীর অধিপতি। জ্ঞানবলে মনুষ্যের অবস্থার আরও যে কত উন্নতি হইবে তাহা কে বলিতে পারে?

ইউরোপখণ্ডে গিরিগুহা প্রভৃতি পূর্বকালিক মনুষ্যের বাসস্থানে ও সমাধি-মন্দিরে যে সকল অস্ত্রশস্ত্র ও তৈজসাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তদ্বারা পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, যে আদিম মনুষ্যের পুরাবৃত্ত দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, প্রথম প্রস্তর কাল, দ্বিতীয় ধাতু কাল। ইউরোপ সম্বন্ধে এই দুই কালের কিঞ্চিৎ বর্ণন করিয়া প্রস্তাব উপসংহার করা যাইতেছে।

১ম প্রস্তর কাল––এই কালে কোনো ধাতুর আবিষ্ক্রিয়া হয় নাই। মনুষ্য ধাতুর ব্যবহার জানিত না। এই কালের যে সকল অস্ত্র ও তৈজসাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহা সমুদায় প্রস্তর নির্মিত। কোনো কোনো অস্ত্র পশ্বাদির অস্থি বা শৃঙ্গে নির্মিত। এই কাল তিন ভাগে বিভক্ত, প্রথম কালে ম্যামথ অর্থাৎ কেশর যুক্ত হস্তী ও গুহাস্থিত ভল্লুক ও অন্যান্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জীব সকল বর্তমান ছিল। এই সকল জন্তু এক্ষণে পৃথিবী হইতে এককালে অন্তর্হিত হইয়াছে, কিন্তু এককালে তাহারাই ইউরোপের অনেক দেশের অধিকারী ছিল। মনুষ্য তাহাদের ভয়ে সশঙ্কিত থাকিত ও অতি কষ্টে সামান্য প্রস্তর নির্মিত অস্ত্রের দ্বারা আত্মরক্ষা করিত এই সময় কেবল গিরিগুহাই মনুষ্যের বাসস্থান ছিল। দ্বিতীয় কালে কেশরযুক্ত হস্তী প্রভৃতি বড়ো বড়ো পশুর চিহ্ন আর লক্ষিত হয় না। কিন্তু সমস্ত ইউরোপ তখনও হিমপ্রধান দেশ ছিল। বেনডিচর প্রভৃতি যে সকল পশু এক্ষণে হিমপ্রধান দেশে আশ্রয় পাইয়াছে, এই সময়ে তাহারা ইউরোপের প্রায় সকল দেশে বিচরণ করিত। এই কালে মনুষ্য পূর্বাপেক্ষা নির্ভয় হইয়া ছিল। গিরিগুহা ত্যাগ করিয়া পর্বতের আবৃত স্থানে অথবা হ্রদ মধ্যে দ্বীপ নির্মাণ করতঃ তথায় কাষ্ঠ ও চর্ম নির্মিত কুটির প্রস্তুত করিয়া বাস করিত। এই কালের অস্ত্র ও তৈজসাদি প্রস্তর ও বেনডিচরের শৃঙ্গ নির্মিত দেখা যায়। এই কালে শিকারোপযোগী অনেক অস্ত্র দেখা যায়, বোধ হয় এই সময়ে মনুষ্য শিকারে বিশেষ পটু ছিল। তৃতীয় পোষিত পশুর কাল। এই কালে গো অশ্ব কুক্কুর প্রভৃতি অনেক পশু মনুষ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। প্রাত্যহিক আহার বিষয়ে মনুষ্যের পূর্বমতো অনিশ্চিত ছিল না কিন্তু পশুপালনের সুবিধার জন্য সময়ে সময়ে বাস পরিবর্তন করিতে হইত। এই সময়ের প্রস্তর নির্মিত অস্ত্রাদিতে অধিক পারিপাট্য ও বুদ্ধিকৌশল লক্ষিত হয়।

২য় ধাতুকাল—এই কাল দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথমে মনুষ্য ধাতুর ব্যবহার শিখিয়াই লৌহ প্রস্তুতের পদ্ধতি শিখিতে পারে নাই। Bronze বা পিত্তল প্রস্তুত করা অতি সহজ কিন্তু খনিজাত দ্রব্য হইতে লৌহ প্রস্তুত প্রক্রিয়া সহজ নহে। ধাতুর আবিষ্ক্রিয়া হইলে পর প্রথমত কেবল পিত্তল নির্মিত অস্ত্র ও তৈজসাদির ব্যবহার দেখা যায়। এই কালের বাসস্থানে লৌহ নির্মিত অস্ত্রাদি পাওয়া যায় না ; এই কালে কৃষিকার্যের আরম্ভ হইয়া থাকিবে কারণ কেবল কৃষিকার্যোপযোগী পিত্তলের দ্রব্যাদি এই সময়েই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই কালে মনুষ্যের অনেক উন্নতি হইয়াছিল এমতো বোধ হয় কিন্তু পিত্তলের দ্রব্যাদি ব্যবহারজনিত অনেক কার্যের অসুবিধাও ঘটিত। শেষে লৌহের আবিষ্ক্রিয়া হয়। কী প্রকারে যে এই অমূল্য ধাতু প্রথমে মনুষ্যের পরিচিত হইয়াছে তাহা স্থির করা কঠিন। বোধহয় অভাব অনুভূত হইলেই মনুষ্যবুদ্ধি স্বয়ং অভাব পূরণ করে। লৌহের ব্যবহার আরম্ভ হওনাবধি মনুষ্যের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক উন্নতি ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। এই কালের পরেই ঐতিহাসিক কালের আরম্ভ। মনুষ্য জাতি লৌহের নিকট যে কত প্রকার ঋণী আছে তাহা বলা যায় না। বোধহয় লৌহের আবিষ্ক্রিয়া না হইলে ইউরোপীয় সভ্যতা মিশর, মেক্সিকো ও পেরুদেশের আদিম সভ্যতার সহিত অদ্যাবধি সমপদস্থ থাকিত।

বঙ্গদর্শন ● ভাদ্র ১২৮২ (১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দ)



ভারতে মানবের প্রাচীনত্ব ও ন্যূনাধিক চারি লক্ষ বৎসর পূর্বের কয়েকটি প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন*

শ্রীপঞ্চানন মিত্র

য ইমা বিশ্বা ভুব নানি জুহ্বদৃষির্হোতা ন্যসীদৎ পিতা নঃ।
স আশিসা দ্রবিণমিচ্ছমানঃ প্রথমচ্ছদববাঁ আবিবেশ।।
কিং স্বিদাসীদধিষ্ঠানমাবম্ভণং কতমৎস্বিৎ কথাসীৎ
যতো ভূমিং জনয়ন বিশ্বকর্মা—(ঋগ্বেদ, ১০/৮১/৮/৩)।।

যিনি এই বিশ্বভুবনে বিশ্বযজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেই আমাদিগের পিতা যে অভ্যুদয়াভিলাষীদিগের মধ্যে পরে আবিষ্ট হইয়াছিলেন, কোথায় তাঁহার অধিষ্ঠান ছিল এবং কোন্ স্থানেই বা সৃষ্টির আরম্ভ করিয়াছিলেন, এই প্রশ্ন কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বেই আমাদিগের ঋকের ঋষিদিগের প্রাণ ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল। শুধু ভারতে নহে, যেখানে সভ্যতার উন্মেষমাত্র হইয়াছে, তথায়ই মানব মিলটনের সদ্যোজাত আডামের ন্যায় আমি কীরূপে আসিলাম, কোথা হইতে আসিলাম, ইহাই প্রথমে নিজ চিন্তাশক্তির বলে ভাবিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছে। কোনো এককালে স্রষ্টাকর্তৃক জগৎসৃষ্টি-ব্যাপার এবং আডাম ও ইভ হইতে বা মানসপুত্র হইতে প্রথম সৃষ্টিকার্য আরম্ভের কল্পনা এই জিজ্ঞাসারই ফল। আবার ইহারই ধারবাহিক অনুসন্ধান, বলিতে গেলে আমাদের বিরাট দর্শন ও পাশ্চাত্য জগতের আধুনিক বিপুল বিজ্ঞান গঠন করিয়াছে। আমরা এই স্থানে দর্শনের জটিল তত্ত্ব বা ধর্মের সহজ মীমাংসা ছাড়িয়া, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কাচ লাগাইয়া এই বিষয়ে বিংশ শতাব্দীর চিন্তাস্রোত কিঞ্চিৎ বুঝিতে চেষ্টা করিব।

* নারিকেলডাঙা ইনস্টিটিউট ও বঙ্গবাসী কলেজ প্রোফেসরস ইউনিয়নে পঠিত প্রবন্ধ হইতে পরিবর্ধিত।

সকলেই জানেন যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন 'মহাপ্রলয়' উৎপত্তি (Cataclysm theory) ও বিশিষ্ট জননবাদ (Specific creation) খণ্ডন করিয়া ডারউইন প্রমুখ মনীষীগণ অভিব্যক্তিবাদ খাড়া করিতেছিলেন, তখন ইউরোপের ধর্মযাজক মহলে তীব্র প্রতিবাদ হইয়াছিল। মহাপ্রলয়ের পর নোয়ার অর্ণবপোতে (Noah's Arc) ভিন্ন ভিন্ন প্রাণী সংরক্ষিত হইয়াছিল বলিয়াই যে, এখন ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির প্রাণী বর্তমান, এই মতই তাহার পূর্বে অখণ্ডপ্রভাবে বৈজ্ঞানিক সত্যের মধ্যেও স্থান পাইয়াছিল। আবার বাইবেলের গণনানুসারে যে মাত্র খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ বৎসর পূর্বে মানব সৃষ্ট হইয়াছিল, ইহাও গ্রাহ্য হইয়া আসিতেছিল।

ফ্রান্সের বিশ্ববিশ্রুত প্রাগৈতিহাসিক তত্ত্ববিদ Boncher de Perthes প্রথমে ভূতত্ত্ববিদ Sir Charles Lyell-এর নিকট বহু প্রমাণ হাজির করিয়া, তাঁহাকে মানবের অতিপ্রাচীনত্ব, এমনকি, প্রলয়পূর্ব মানবের (Pre-glacial man) অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস উৎপাদন করেন ও তাহারই ফলে ১৮৬৩ সালে The Antiquity of Man নামক পুস্তক মানব-বিদ্যার (Anthropology) প্রথম ভিত্তি স্থাপন করে। সেই সময় হইতে নানারূপ গবেষণার ফলে আজ, এমনকি Darwinism ও Mendelism নূতন Polygenism-এর Convergent ও Divergent types-এর নিকট বিপন্ন হইতে চলিয়াছে। উহার বৈজ্ঞানিক জটিলত্ব পরিষ্কার করা আমার সাধ্যাতীত। তবে মোটামুটি বলিতে পারি, ডারউইনের মতবাদীদিগের মতে যেন মানবতত্ত্বের পক্ষে ইহাই স্বতঃসিদ্ধ হইয়া দাঁড়ায় যে, একই প্রাণস্বরূপ হইতে বিপর্যয় (Variation) হইয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন ভিন্ন প্রাণী সংগঠিত হইয়াছে, সুতরাং একই প্রকার মানব হইতে ভিন্ন ভিন্ন জাতি সৃষ্ট হইয়াছে—(যাহাকে Monogenism বলা হয়)। কিন্তু Sergi, Boule প্রভৃতি আধুনিক মানবতত্ত্ববিদগণের মত যে, পূর্বকালীন ভিন্ন ভিন্ন ঘোটকজাতি হইতে যেমন আধুনিক এক প্রকার ঘোটক (type) উদ্ভূত হইয়াছে, তদ্রূপ ভিন্ন ভিন্ন মানবশ্রেণি হইতে একই প্রকার মানব সৃষ্টির চেষ্টা চলিয়াছে এবং তাহারই সন্নিহিত ও দূরনিহিত রূপগুলিই এখন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

বৈজ্ঞানিকদিগের বিবাদ যাহাই হউক, এখন মোট কথায় দাঁড়াইয়াছে যে, আধুনিক বিজ্ঞান মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারে যে, এক দিন ঝোঁকে পড়িয়া ভগবান বলিলেন, let us make man after our own image বা "প্রজাপতিরৈক্ষিষ্ঠ বহুঃ স্যাম্ প্রজায়েয়"—আর মানবসৃষ্টি হইল, ইহা কখনোই হইতে পারে না এবং তাহার প্রমাণের জন্য শুধু যুক্তিতর্কের উপর নির্ভর করিতে হয় না, দুই চারিটি লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বের মানব-করোটি (Skull) আমাদের একেবারে নিঃসন্দেহ করিয়া দিবে। Asiatic Society-র Journal and Proceedings (June, 1919) হইতে প্রত্ন-মানববিদ্যার অনেকগুলি কথা সোজাভাবে জানিতে পারা যায়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, মনীষী ডাঃ হ্যাডন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক সভায় সভাপতিরূপে ওই বক্তৃতা করিলেও ভারতের মানব সম্বন্ধে বিশেষ কোনো উল্লেখ করেন নাই। যাহা হউক, ভারতের কথা বুঝিতে হইলে আগে এই বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের আধুনিকতম আবিষ্কারের খোঁজ রাখা দরকার বলিয়া আমি

প্রথমে আমাদের সুপ্রসিদ্ধ ভূতত্ত্ববিদ ডাঃ হ্যাডনের সরল ও সুললিত বক্তৃতার অনুবাদ দিব এবং তৎপরে ভারত-সম্বন্ধে আমার দুই একটি কথা বলিব। প্রথমেই একটি অঙ্কপাত করিয়া তিনি জীবোদ্ভব সম্বন্ধে সুন্দরভাবে বলিয়াছেন যে, "ইহা হইতে আমরা স্থির করিতে পারি যে, প্রায় ৫৫ হইতে ৭০ কোটি বৎসর পূর্বে মৎস্যের এবং প্রায় ১৫ কোটি বৎসর পূর্বে প্রথম পক্ষীর আবির্ভাব হইয়াছিল। প্রথম স্তন্যপায়ী জীব প্রায় পক্ষীর সঙ্গে বা তাহার কিয়ৎ পূর্বে উদ্ভূত হয়। কিন্তু শ্রেণি হিসাবে স্তন্যজীবনের প্রকৃষ্ট প্রকটন তৃতীয় (Tertiary) যুগেই, বিশেষত বহ্বাধুনিক (Pliocene) ও মধ্যাধুনিক (Miocene) যুগে অর্থাৎ প্রায় ৫০ লক্ষ বা এক কোটি বৎসর মধ্যেই হয়। বৃহৎ স্তন্যপায়ীর অবশেষ (remains) হিমালয় ও পাঞ্জাবে ভূরিপ্রমাণে পাওয়া যায়। স্তন্যপায়ী উদ্ভবের শেষ পরিণতি মানবের অভিব্যক্তিতেই সম্পন্ন হইয়াছে এবং কতকাল পূর্বে তাহা সম্পন্ন হইয়াছিল, এখন তাহা দেখা যাক। ভূতত্ত্ব সাক্ষ্য (Geological record) হিসাবে মানব ও অপরাপর জীবের একটি প্রধান পার্থক্য পরিলক্ষিত হইবে। কারণ, মানবেতর জীবের অস্তিত্ব তাহাদের শরীরাবশেষ বা পদচিহ্ন হইতে প্রমাণিত হইয়া থাকে ; কিন্তু তাহার স্বহস্তরচিত আয়ুধাদিদ্বারা যত পুরাতন মানবের পরিচয় পাওয়া যায়, তত তাহার শরীরাবশেষে নয়। সাধারণত মানবকৃত আয়ুধ কয়েক প্রকার,—প্রাচীনতম কালে উহা প্রস্তর এবং কিয়ৎপরে অস্থি হইতে ও তৎপরে ব্রোঞ্জ এবং সর্বশেষে লৌহ হইতে প্রস্তুত আয়ুধ পাওয়া যায়। এইরূপ মানব-আয়ুধের ধারা ধরিয়া মানবের আবির্ভাব কালকে প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত করা গিয়াছে ; যথা—প্রস্তরায়ুধ যুগ, ব্রোঞ্জায়ুধ যুগ ও লৌহায়ুধ যুগ। যেহেতু প্রস্তরায়ুধ যুগেই মানবের প্রথম আবির্ভাব হয়, সুতরাং তাহারই কথা এইখানে বলিব। পৃথিবীর সর্বত্র মানব-খণ্ডিত (Chipped by man) অনেক স্পষ্ট প্রস্তর পাওয়া গিয়াছে এবং ওইগুলিই কখনো-কখনো লুপ্ত (extinct) জীব বা মানবের অবশেষের সহিত সংস্পৃষ্ট (associated) দেখা যায়। আয়ুধগুলিকে মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়,—একটি অপেক্ষাকৃত প্রাচীনতম সংস্কারের (Culture) নিদর্শন এবং অপরটি একটি পরবর্তী যুগের যত্নসাধ্য সংস্কারবিশেষের পরিচয় দেয়। এই আয়ুধগুলির নাম প্রত্নপ্রস্তরায়ুধ (Palaeolith) ও নব্যপ্রস্তরায়ুধ (Neolith)। প্রত্ন-প্রস্তর ও নব্য-প্রস্তর ছাড়াও তৃতীয় শ্রেণির এক প্রস্তরায়ুধ আছে ;—ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে—আয়ুধের অরুণোদয় বা উষঃপ্রস্তরায়ুধ (eolith)। এইগুলি সেই দিন মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং এ প্রকার আয়ুধ মানবখণ্ডিত কিংবা প্রকৃতিজাত, ইহা লইয়া অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা এখনও চলিতেছে।

সর্বসমেত প্রাগৈতিহাসিক মানবের দশটি সংস্কার-কাল কলাতত্ত্ব কর্তৃক নিরূপিত হইয়াছে। আধুনিকতম কাল হইতে আরম্ভ করিয়া উহাদিগের ধারা এইরূপ,—

১০। লৌহায়ুধ যুগ

৯। তাম্র ও ব্রোঞ্জায়ুধ যুগ

৮। নব্যায়ুধ যুগ

৭। আজিলীয় ... ... অন্তর্বর্তী

৬। মড্‌লিনীয় } উত্তর প্রত্ন-প্রস্তরায়ুধ যুগ
৫। সলুট্রিয়
৪। অরিনাকীয়
৩। মুস্তেরীয় } প্রত্ন-প্রস্তরায়ুধ যুগ
২। আকুলীয়
১। চেলীয়

এইখানে ডাঃ হ্যাডনের সহজাধিগম্য প্রবন্ধের নিকট বিদায় লইতে হইবে। কারণ, তিনি ভূতত্ত্ব ছাড়িয়া আমাদের কলাতত্ত্ব ও মানবতত্ত্বের মধ্যে পৌঁছাইয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধ পড়িয়া বোধ হয়, যেন বিংশ শতাব্দীতে 'Tertiary man not proven' তৃতীয় স্তর মানব অপ্রমাণিত ধরিয়া বসিয়া আছেন। এ দিকে তিনি উষঃপ্রস্তরের (eoliths) অস্তিত্ব স্বীকার করিতে প্রায় প্রস্তুত, অথচ হিমযুগের পূর্বের মানব (Pie-glacial man) সম্বন্ধে যেন একটু সন্দিহান। কিন্তু চেলীয় সংস্কারের পূর্বেও যে একটি "রয়তেলীয়" বা "চেলীয়-পূর্ব" সংস্কারের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহার তিনি উল্লেখ অবধি করেন নাই। ভারতের পক্ষে উহা বিশেষ আবশ্যকীয়। কারণ, এই প্রবন্ধে ভারতবর্ষে প্রাপ্ত রয়তেলীয় বা "চেলীয়পূর্ব" সংস্কার-সংবাদ সংকলন করিয়া আপনাদের নিকট উপস্থিত করিব।

কিন্তু তৎপূর্বে অতীত যুগের মানবাবশেষের বিষয় একটু বিচার করিতে হইবে। প্রথমেই আক্ষেপের সহিত জানাইতে হইতেছে যে, পঞ্চাশ বৎসরের অধিক ধরিয়া ইউরোপীয় ভূতত্ত্ববিদগণ যে প্রাগৈতিহাসিক মানবের শরীরাবশেষ আবিষ্কার করিয়াছেন, এখানে তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান দূরে থাকুক, Records of the Geological Survey পাঠে একটু বিস্ময়কর অবহেলার পরিচয় পাওয়া যায়। ইউরোপে হিমযুগের মুস্তেরীয় গুহাবাসীদিগের অবশেষ হইতে অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। সে অনেক দিনের কথা ;—একবার বিখ্যাত Huxley-র অনুরোধে ভারত গভর্নমেন্ট জানিয়াছিলেন যে, আমাদের দেশেও ওইরূপ প্রাপ্তির বিশেষ সম্ভাবনা আছে। সে কার্নুল গুহার কথা। মান্দ্রাজ গভর্নমেন্ট তৎক্ষণাৎ ভূতত্ত্ব-বিভাগের উপর উহার অনুসন্ধানের ভার দেন এবং তৎকালীন ভূতত্ত্ববিভাগের কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট H. B. Foote এবং তাঁহার পিতা R. B. Foote ওই সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা জানাইবার চেষ্টা করেন। ভারতে উৎখাত এই একমাত্র প্রাগৈতিহাসিক গুহা এবং এখানে কোনো মানব করোটি পাওয়া যায় নাই। আমাদের দেশে আরও দুইবার পুরাতন করোটি (skull) পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া Geological Records-এ জানা যায় , কিন্তু তাহা কতকগুলি টিনেভিলি স্কালের মত হঠাৎ Dr. Jagor কর্তৃক অপহৃত হইয়া বার্লিনে স্থানান্তরিত হইল, কী কোন্ ইউবোপীয় বিশেষজ্ঞের নিকট প্রেরিত হইয়া হারাইয়া গেল বা Indian Museum-এর মধ্যে গুলাইয়া গেল, ঠিক করা সুকঠিন। আমার বোধ হয়, আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠতম বিদ্যোৎসাহী যাহা উপলব্ধি করিয়াছেন—কোনো স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ হইতে বিশেষজ্ঞ দ্বারা ইহার ধারাবাহিক অনুসন্ধান না হইলে প্রচুর অর্থব্যয়ও এইরূপভাবে বৃথা হইবে, ইহা বর্ণে বর্ণে সত্য। আরও মানবতত্ত্ব সম্বন্ধে ইহা বিশেষভাবে বলা দরকার। কারণ, পরে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, ভারতক্ষেত্রে মানবাবশেষ অনুসন্ধান কত বেশি প্রয়োজনীয়।

আমরা সকলেই জানি যে, আধুনিক মানবশ্রেণির বুদ্ধিমান মানবের Homo sapiens নামকরণ করা হইয়াছে এবং আধুনিক যাবতীয় মানব* এই বর্গ (genus) ও এই শ্রেণির (species) অন্তর্ভুক্ত বলিয়া অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকেরা বিবেচনা করেন। ইউরোপে কিন্তু কয়েক লক্ষ বৎসর পূর্বের যে কয়েকটি প্রাগৈতিহাসিক মানবাবশেষ পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে কতকগুলির শ্রেণিগত পার্থক্য বেশ দেখা যায়। যথা,—Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis, Homo meusteriensis, Homo aurignacensis (hauseri) প্রভৃতি। এগুলি আমাদের বিশেষ কার্যে আসিবে না। কারণ, সকলগুলিই ইউরোপীয় মানবজাতির অবশেষমাত্র। এই সকল মানব ঠিক আধুনিক মানবের ন্যায় না হইলেও উহাদের বর্গগত পার্থক্য পাওয়া যায় না। উহাদের প্রায় সকলেই পূর্বপ্রত্নায়ুধকালে (Early Palaeolithic) ইউরোপে বাস করিত। অধুনা উহাদেরও পূর্বের মানবপূর্ব, মানব-সম তিনটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য জীবের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। উহার মধ্যে একটি Piltdown হইতে, দ্বিতীয়টি জাভা হইতে ও তৃতীয়টি ভারত হইতে পাওয়া গিয়াছে। Piltdown Skull এখন উহার আবিষ্কর্তার সহিত জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে। উহার সম্বন্ধে এখনও যথেষ্ট মতভেদও আছে। তবে উহার নামকরণ হইয়াছে উষমানব (Eoanthropus Dawsoni)। কেহ বলেন যে, উহার সহিত মানবের বর্গগত (generic) পার্থক্য নাই। কেহ বলেন যে, Skull-এব যে কয়েক টুকরা হইতে সন্নিবিষ্ট (reconstruction) হইয়াছে, তাহা দুই জনের দুই টুকরা skull-এর অংশ। কিন্তু যিনি যাহাই বলুন, পৃথিবীর এখনকার একজন শ্রেষ্ঠতম মানব-তত্ত্ববিদ Boule-এর কথায় এখন ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, এই আবিষ্কারটি জ্ঞানের দিক হইতে বিশেষ আবশ্যকীয়—(L'Anthropologie-1915, P.66)। কারণ, ইহা নিঃসন্দেহ যে, প্রায় আট দশ লক্ষ বৎসর পূর্বেকার মানব বা মানব-সম মানব-পূর্ব জীবের প্রমাণ আজ ইহাই আমাদের সমক্ষে আনিয়াছে। কিন্তু উহা অপেক্ষা আরও কয়েক লক্ষ বৎসর পুরাতন এক মানবপূর্ব জীব (human precursor) ভারত-সন্নিহিত জাভা দ্বীপের অন্তবর্তী ট্রিনিল নামক স্থানে অধ্যাপক Dubois কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে। সকলেই জানেন যে, মানব ও বানরে অনেক আকৃতিগত সৌসাদৃশ্য আছে এবং উহাদের মধ্যে দুইটি প্রধান বৈলক্ষণ্য ও মানবীয় বিশিষ্টতা এই যে, মানব দুই হস্ত সম্পূর্ণ স্বাধীন রাখিয়া খাড়াভাবে চলিতে পারে ও দ্বিতীয়টি মানবের মস্তিষ্কের গুরুত্ব—যে জন্য মানব সর্বজীব অপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন হইতে সক্ষম হইয়াছে। কেহ কেহ এমনও বলেন যে, মানব-অভিব্যক্তির ইতিহাসে এই দুইটির বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। কোনো কোনো দেহতত্ত্ববিদ (physiologists) বলিয়া থাকেন যে, হয় বৃক্ষবাস (arboreal life) ছাড়িয়া, স্থলে যাতায়াত বিপৎসংকুল হওয়ায় বা অন্য কোনো কারণে মানব-সম কতকগুলি জীবের (authropoids) মস্তিষ্কের নিম্নভাগে আসিয়া পড়ায়, মস্তিষ্ক ও শরীরে গুরুত্বের হার (proportion) ঠিক হয় ও খাড়াচলন আরম্ভ লইয়া মানব-অভিব্যক্তির শুরু হয়। যাহাই হউক, orang outan কপির শরীর ও মস্তিষ্কের গুরুত্বের হার নির্দ্ধারিত হইয়াছে ১/১৮৩। ওইরূপ জাভার কপি-মানবের পক্ষে ১/১৪ এবং সাধারণ মানবের

* আধুনিকতম মত এই যে, মানব ভিন্ন ভিন্ন শাখাশ্রেণির অন্তর্গত এবং তাহাদের বৈলক্ষণ্য ও বিশিষ্টতার ইতিহাস এত সুদীর্ঘ যে, তাহাদিগকে আর এই Homo sapiens-এব তালিকাভুক্ত করিলে চলিবে না। (Man 1916 দ্রষ্টব্য)

পক্ষে ১/৭১। আবার জাভার কপিমানবের উরুখণ্ড হইতে ইহাও স্থির হইয়াছে যে, এই জীবটি মানব ও বানরের মাঝামাঝি। উহা খাড়াচলনে সক্ষম ছিল। সুতরাং উহাকে অনেকে মানব ও বানরের অন্তর্বর্তী বর্গের জীব বলিয়া ধরিয়া থাকেন। তবে কেহ কেহ বলেন, উহার কপি-লক্ষণ অধিক ; সুতরাং উহা মানব-কপি। আবার কাহারও মতে উহার মানব-লক্ষণ অধিক ; সুতরাং উহা কপিমানব। কিন্তু কপিই হউক, আর মানবই হউক, এই সন্ধিস্থলের জীব দক্ষিণ এশিয়াতে পাওয়া গিয়াছে এবং তাহার সার্থকতা যে কী, তাহা শীঘ্র বুঝিতে পারা যাইবে।

এবার আরও পূর্বেকার প্রায় ১২/১৪ লক্ষ বৎসর প্রাচীন মানবপূর্ব জীবাবশেষের কথা বলিব। ভারতের বিখ্যাত প্রতিভাসম্পন্ন ভূতত্ত্ববিদ ডাঃ Pilgrim আজ প্রায় চারি বৎসর হইল, সিভালিক অঞ্চল হইতে একটি সারমেশিয় কালের মানব পূর্বপুরুষের সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া জগতে ধন্য হইয়াছেন। তিনি ইহার নামকরণ করিয়াছেন, Sivapithecus indicus। দুর্ভাগ্যবশত কয়েকটি দন্তমাত্র পাওয়া গিয়াছে, করোটির কোনো অংশ বা কঙ্কালের কোনো খণ্ড পাওয়া যায় নাই। তাহা হইলে আমরা অনেকটা নিশ্চিন্তচিত্তে বলিতে পারিতাম, উহার গঠন কীরূপ বা উহার বুদ্ধিবৃত্তির অভিব্যক্তি কতটা হইয়াছিল। কিন্তু যাহা আছে, তাহা হইতে Records of the Geological Survey (1915)তে ডাঃ Pilgrim এমন সুন্দর প্রমাণ হাজির করিয়াছেন যে, Boule প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষীগণ উহা গ্রাহ্য করিয়া স্বীকার করিয়াছেন (L'Anthropologie ১৯১৬, পৃঃ ৩৯৭-৪১০ দ্রষ্টব্য)। এখন দেখিলাম যে, প্রাচীনতম মানবপূর্ব জীব ভারত হইতে পাওয়া গিয়াছে। আজকাল বোধ হয়, কেহ জোর করিয়া common cradle of mankind কোনো একস্থলে সকল মানবের জন্ম হইয়াছে, একথা বলিবেন না। তথাপি কতকগুলি স্থানেই যে উহা বেশি সম্ভবপর, তাহারও সন্দেহ নাই। কারণ, ইহা মীমাংসিত ও স্বীকৃত হইয়াছে যে, নূতন পৃথ্বীতে মানবের অভিব্যক্তি হয়—পুরাতন পৃথ্বী হইতে লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বে মানব গিয়া তথায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে মাত্র। সেই রকম অনেকেরই মত যে, ভারতক্ষেত্রে ও তৎসন্নিহিত স্থানে মানবের প্রথম আবির্ভাব হইয়াছে। তাই Sir H. H. Johnston D. Sc., F. R. S., বলিয়াছেন, —"From such meagre facts as have already been collected by scientific investigation we are led to form the opinion that the human genus was evolved from an ape-like ancestor, *most probably in India*, but quite possibly in Syria on the one hand or the Malay Peninsula or Java on the other. So far the nearest approach to a missing link has been found in the island of Java but there are slight indications pointing the *Burma or the Southern part of the Indian continent* as having been the birth place of humanity." *(The Opening up of Africa)* যদিও ভারতে কোনো প্রত্নায়ুধ যুগের মানব-কঙ্কাল পাওয়া যায় নাই, কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, তাহার অস্তিত্বের কতকগুলি সুনিশ্চিত নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। তাহা অতি প্রাচীন চেলীয়পূর্ব সভ্যতার সুনিশ্চিত নিদর্শন এবং তিনটি স্থান হইতে তাহা পাওয়া গিয়াছে। প্রথমটি ঠিক ভারতবর্ষের সীমানার বাহিরে ব্রহ্মদেশে পাওয়া গেলেও উহার সার্থকতা এত

বেশি যে, উহাকে আগে ধরিয়া লইতে হইবে। Records of the Geological Survey-র ২৭শ খণ্ডে ১০১-২ পৃষ্ঠা পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারি যে, Dr. Noeteing মধ্যাধুনিক যুগের উচ্চ স্তরে (Upper Miocene) কতকগুলি মানব-খণ্ডিত প্রস্তর দেখিতে পান। এইগুলি কতকগুলি লুপ্তমেরুবিশিষ্ট প্রাণীজাতির (vertebrate genera) ; যথা,—Rhinoceros perimense, Hippotherium antelopium প্রভৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। এইগুলিকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যথা,—(ক) অসমান খণ্ডিত প্রস্তর, (খ) ত্রিভুজাকার খণ্ডিত প্রস্তর ও (গ) চতুষ্কোণ খণ্ডপ্রস্তর।

Dr. Keith এইগুলির বিষয় এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন যে, উহাদের মানব কর্তৃক খণ্ডন সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া যায় না। অথচ এইগুলিকে বহ্বাধুনিক (Pliocene) যুগের স্তরে পাওয়া গিয়াছিল [Vide Antiquity of Man (1916) P. 257]। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, (গ) বিভাগের খণ্ডপ্রস্তরটি ইংলন্ডে ভরসেটে প্রাপ্ত উষঃপ্রস্তরের ঠিক অনুরূপ। এখানে বলিয়া রাখা যাক যে, ভূতত্ত্ববিদগণ বহ্বাধুনিক (pliocene) ও মধ্যাধুনিক (miocene) যুগের কাল মোটামুটি ৫ লক্ষ হইতে ৯ লক্ষ বৎসর মধ্যে বলিয়া স্থির করিয়া থাকেন।

এইবার ভারতে প্রাপ্ত অতি পুরাকালের নিদর্শন দ্বিতীয় খণ্ড-প্রস্তরটির আলোচনা করা যাউক। পঞ্চাশ বৎসরের কিছু পূর্বে Wynne সাহেব ওইটি গোদাবরী-তটে কতকগুলি লুপ্ত স্তন্যপায়ীর সহিত প্রাপ্ত হন। তখন প্রত্নপ্রাণীতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাঃ ফক্‌নার (Dr. Falkner) ওই প্রস্তরটি বহ্বাধুনিক বলিয়া প্রমাণ করিলেন এবং বলিলেন,—"এই স্তরটি বহ্বাধুনিক বলিবার কারণ এই যে, এ স্থানের স্তন্যপায়ী জীবজাতিগুলিও পেরিম দ্বীপের ও শিবালিক পর্বতের মধ্যাধুনিক যুগের পরবর্তী ও আমাদের যুগের পূর্ববর্তী" (Journal of the Geological Society of London. Vol. XX1)। ভারতীয় ভূতত্ত্ববিভাগের তৎকালীন অধ্যক্ষ এই সম্বন্ধে তাঁহার মত এরূপভাবে প্রকাশ করেন,—"এই খণ্ডিত প্রস্তর পাইতনের নিকটবর্তী মুঙ্গি গ্রামে পাওয়া যায়। এখানকার নদীর উপকূল প্রায় ৫০ ফুট উচ্চে অবস্থিত ও কোনো ঘনীভূত অল্লাভ আগেট প্রস্তরখণ্ডে উহার বহির্ভাগ কালো হইয়া গিয়াছে, কিন্তু স্থানে স্থানে উহার পূর্বকার মসৃণ জমি দেখিতে পাওয়া যায়। উহা একটি অসমান ত্রিভুজাকৃতি, উহার এক দিক প্রশস্ত এবং দুই ধারের মধ্যে একটি ঈষদুন্নত ক্ষেত্র আছে। সমস্তটি ঈষৎ বক্র এবং অন্তর্ভাগ ঠিক ছুরির মত দেখিয়া বোধ হয়, ঠিক শিকারের জন্য ব্যবহৃত হইত। অপর দিকটা এরূপভাবে পার্শ্বে বিস্তৃত যে, যেন বাঁটে পরাইবার জন্য ঠিক করা হইয়াছে। ধারটা যেন ব্যবহার করিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। উহা দৈর্ঘ্যে ২১/২", প্রস্থে ১/২১" মাত্র।" ডাঃ ওল্ডহ্যাম এগুলির সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু ভারতীয় প্রাণীতত্ত্বে বিশ্ববিশ্রুত Blandford সাহেব ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটিতে এই বলিয়াছিলেন,—"আমার ক্রমশ দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া আসিতেছে যে, ভারতে ইউরোপের ঢের পূর্বে মানব-নিদর্শন পাওয়া যায়। এখানে বিশেষত মানবচিহ্ন-সংশ্লিষ্ট নর্মদা ও গোদাবরী-তটের স্তন্যপায়ী জীবের অস্থি হইতে উহা বেশ প্রমাণিত হয়। কারণ, ওই প্রাণীজাতিগুলি আধুনিক কালে বা চতুর্থ যুগের (Quaternary age) ভারতীয় বা ইউরোপীয় জীব হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক।" (Asiatic Soc. Bengal. P. 144-5. 1857)।

এইবার তৃতীয়টির সন্ধান লওয়া যাক। উহার বৃত্তান্ত (Records, Geol. Survey 1873, P. 49) এ পাওয়া যায়,—"উহা বিন্ধ্যজাত quartzite-নির্মিত একটি প্রাক্-কুঠার (Celt), ধারাল, ডিম্বাকৃতি ও নর্মদা নদীর উপকূলে জল হইতে ৪ ফুট উচ্চে মাটিতে প্রোথিত অবস্থায় Hackett সাহেব কর্তৃক ভুট্রা গ্রামের নিকট আবিষ্কৃত হয়। উহা যে কত পুরাতন, তাহা উহার সহিত সংশ্লিষ্ট বহুকালাবধি লুপ্ত প্রাণীজাতিবিশেষের অস্থিকঙ্কাল হইতে প্রমাণিত হয়। ভারতীয় প্রাণীসমূহের জাতি-জীবনের পরিবর্তন গোদাবরীর খণ্ডপ্রস্তর প্রসঙ্গেও একবার উল্লেখ করিয়াছি। জিনিসটা কী, তাহা Blandford সাহেবের Asiatic Societyতে ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের নিম্নলিখিত বক্তৃতা (Vide Proceedings P. 201) হইতে কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করা যায় যথা,—"নর্মদা-তীরবর্তী প্রাণীবর্গের প্রধান পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় যে, মলয় উপদ্বীপস্থ প্রাণীবর্গের সহিত ভারতীয় জীবের ক্রমশ পূর্ববর্তীকালে ইউরোপীয় বা আফ্রিকেয় জীবতুল্য প্রাণীবর্গ দ্বারা অপসারিত হইয়াছে। যথা—Nerbudda-র বৃহৎকায় বৃষভ প্রকৃত বৃষজাতির অন্তর্গত এবং ইউরোপীয় "আদিজাতি বৃষভের" Bos primigenius-এর এত সমতুল্য যে, ভিন্ন জাতিত্বও (racial difference) আরোপ করা যায় না। কিন্তু ইহাও সুবিদিত যে, আধুনিক কালে মহিষ ব্যতীত প্রকৃত এ দেশীয় বৃষজাতিভুক্ত বলিতে গেলে সমতলশৃঙ্গা বৃষকেই ধরিতে হয় এবং উহা বক্রশৃঙ্গা হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক। আবার নর্মদায় প্রচুর প্রাপ্ত ষড়্দন্ত ও চতুর্দন্ত জলহস্তী (Hippopotamus) এখন একেবারে লুপ্ত হইয়াছে। প্রাণীতত্ত্ববিদগণ জানেন যে, এই জাতীয় পরিবর্তন এরূপ সম্পূর্ণভাবে হইতে গেলে লক্ষ লক্ষ বৎসর লাগে। সুতরাং দৃঢ় বৈজ্ঞানিক প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বলিতে পারি যে, যখন নর্মদা ও গোদাবরীর মধ্যদেশে এবং তাহাদের উপকূলে চারি লক্ষাধিক বৎসর যাবৎ লুপ্ত জলহস্তী, বৃহৎকায় বৃষ ইত্যাদি বিচরণ করিত, তখন প্রাচীন মানব তাহাদের শিকারের জন্য উষঃপ্রস্তর বা প্রত্নপ্রস্তরের আয়ুধ নির্মাণ করিত। তাহাদিগের গঠন কীরূপ, তাহা কঙ্কালের অভাবে বিশেষ বলা যায় না। তবে তাহারা যে আরও লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব হইতে খাড়া হইয়া চলিতে শিখিয়াছে ও ক্ষীণবল হইয়াও জন্তুরাজ্যে নিজের আধিপত্য বিস্তার করিতে শিখিয়াছে, তাহার সুনিশ্চিত প্রমাণ—এই হস্তীনির্মিত Wynne ও Hackett সাহেবের আবিষ্কৃত কুঠার দুইটি। তাহাদের জীবন সম্বন্ধে ভারতে ভবিষ্যতে গবেষণা হইলে অনেক কথা বলা যাইবে এবং এখন ইউরোপে ওই জাতীয় ওইরূপ (যদিও কিঞ্চিৎ পরবর্তী) স্তরের ব্যক্তিগণের স্বভাব হইতে তাহাদের আচার-ব্যবহার নিরূপণ করিলে আপাতত বোধ হয় দোষ হইবে না। আমরা জানি যে, এরূপ ব্যক্তিসকল শিকারি মাত্র (hunter) ; আরও লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে নব্য প্রস্তরায়ুধ যুগে তাহারা চাষ শিখিয়াছে। বোধ হয়, তাহারা অগ্নির ব্যবহার জানিত এবং কষ্টলব্ধ পশুমাংস অসংস্কৃত বা অর্ধসংস্কৃত অবস্থায় ভক্ষণ করিত। তাহারা যে নরখাদক ছিল, তাহা আধুনিক কালের নিম্নতম স্তরের অসভ্যজাতীয় জীবন হইতে ও প্রত্নপ্রস্তরায়ুধ যুগের Neanderthal জাতির কঙ্কালনিদর্শন হইতে অনুমান করা যাইতে পারে। তাহারা নদীর চড়ায় বাস করিত। ওই জন্য তাহাদিগকে river drift men বলা হয়। কারণ, তখনও হিমযুগ (Glacial age) আসে নাই, যাহাতে শীতের বা বৃষ্টির তাড়নায় তাহাদিগকে গুহাবাসী হইতে হইয়াছিল। ভারতে ও কার্নুলে গুহাবাসীদিগের

খবর পাওয়া যায় ; গুহার কথা পরে বলিব। এখন এই বলিয়া শেষ করা যাক যে, তাহাদিগের আয়ু যে বিশেষ বেশি ছিল, তাহা বলা যায় না। তবে শারীরিক বল ও নখ-দন্তের ক্ষমতা নিশ্চিতই অত্যধিক ছিল এবং তাহাদিগের সভ্যতার আয়ু লক্ষ লক্ষ বৎসর বলিয়া ধরা যায়। কারণ, মানবজাতি যতই সভ্য হইতেছে, ততই সভ্যতর গতি দ্রুততর (accelerating) হইতেছে। আজ পঞ্চাশ বৎসরে বিজ্ঞান-রাজ্যে বিপ্লব বহিয়া যাইতেছে। কিন্তু তখন লক্ষ বৎসরেও মানব উষঃপ্রস্তর হইতে প্রত্নপ্রস্তর বা উহা হইতে নব্যপ্রস্তরের উদ্ভব করিতে পারিতেছিল না। কিন্তু যতই যুগ লাগুক না কেন, সেই প্রথম উদ্ভাবনকার্য যে খুব সম্ভবত আমাদের পুণ্যভূমি ভারতক্ষেত্রে সমাধান হইতেছিল, ইহা ভাবিয়া আমরা কি প্রকৃতই গৌববান্বিত হই না?

এ প্রবন্ধের বৈজ্ঞানিক পরিভাষার জন্য আমি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "অভিব্যক্তিবাদ" ও শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বাঙ্গালার ইতিহাস"-এব নিকট কিয়দংশ ঋণী।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ● সন ১৩২৬ (১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ)



অতিকায় প্রত্নমানব

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস

লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বে পৃথিবীতে মানবের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা নৃতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা অবধারণ করিয়াছেন। কোথাও কোথাও ভূগর্ভে প্রত্নমানবের অস্থি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই অস্থি দেখিয়া তাহার আকার-প্রকার সম্বন্ধে একটা স্থূল ধারণাও করা হইয়া থাকে। ইয়োরোপে Homo heidelbergenesis নামক প্রত্নমানবের চোয়ালের যে অস্থি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া নৃতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, তাহার আকার প্রকাণ্ড ছিল। আধুনিক মানবের আকারের তুলনায় তাহাকে একটা giant বা রাক্ষস বলা যাইতে পারিত।

ইয়োরোপে এই মানবের বংশ বিলুপ্ত হইয়াছে। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষেও প্রকাণ্ড আকারের মানব বিদ্যমান ছিল বলিয়া কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। এই জাতীয় মানব রাক্ষস, দৈত্য, দানব প্রভৃতি নামে অভিহিত হইত। অনেকে মনে করেন, রাক্ষস, দৈত্য-দানবের বর্ণনা কবি-কল্পনা-প্রসূত। সেই বর্ণনার মধ্যে যে কবি-কল্পনা নাই, তাহা বলি না ; কিন্তু কবি-কল্পনার মূলে কিছু বাস্তবতা বিদ্যমান থাকাও অসম্ভব নহে।

দক্ষিণাপথের মহারণ্য সমূহের মধ্যে রাক্ষস নামধেয় প্রকাণ্ড আকারের মানব বাস করিত বলিয়া লোকে বিশ্বাস করিত। রামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত, যখন দণ্ডকারণ্যে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা বিরাধ ও কবন্ধ নামক ভয়ানক রাক্ষসদ্বয়ের সম্মুখে পড়িয়াছিলেন। জনস্থানেও খর দূষণ নামক রাক্ষস-রাজদ্বয়ের অধীনে সহস্র সহস্র রাক্ষস বাস করিত, এবং দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণের মনে সর্বদা সন্ত্রাস সমুৎপাদন করিত। দক্ষিণাপথ তাহাদের আদি বাসস্থান হইলেও, কেহ কেহ উত্তরাপথের অরণ্য সমূহের

মধ্যেও বাস করিত। তাড়কা রাক্ষসী সিদ্ধাশ্রমের অনতিদূরে বাস করিত, এবং মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সিদ্ধাশ্রমও মারীচাদি রাক্ষসগণ কর্তৃক সর্বদা উপদ্রুত হইত।

মহাভারত পাঠেও জানা যায় যে, ভীমসেন হিড়িম্বা নাম্নী রাক্ষসীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই হিড়িম্বার গর্ভে ভীমের ঔরসে যে পুত্র জন্মে, তাহার নাম ছিল ঘটোৎকচ। এই ঘটোৎকচ কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে পিতা ও পিতৃব্যগণের পক্ষে কুরুগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

উত্তরাপথ বা আর্যাবর্ত প্রধানত আর্যগণেরই অধিকৃত ছিল, আর দক্ষিণাপথে অনার্য মানবগণ বাস করিত। এক পঞ্চনদ প্রদেশ ব্যতিরেকে আর্যাবর্তের অধিকাংশ ভূভাগই আধুনিক। কিন্তু দক্ষিণাপথ বহু প্রাচীনকাল হইতে বিদ্যমান আছে। ভূতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা বলেন যে, পুরাকালে দক্ষিণাপথ একটি মহাদেশের অন্তর্গত ছিল। সেই মহাদেশ পূর্বদিকে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল হইতে পশ্চিমদিকে আফ্রিকার উপকূল পর্যন্ত, এবং উত্তর দিকে হিমাচলের পাদমূলস্থিত গাঙ্গেয় সাগরের দক্ষিণ উপকূল হইতে অস্ট্রেলিয়া মহাদ্বীপ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ছিল। এই বিস্তীর্ণ ভূভাগে প্রত্নমানবগণ বাস করিত। তাহারা বহু শাখায় বিভক্ত ছিল। অনেকে অনুমান করেন যে, কোল জাতীয় মানবগণ এই প্রত্নমানবের একটি শাখা, এবং দ্রাবিড় জাতীয় মানবগণ তাহার আর একটি শাখা। কিন্তু এই দুই শাখার মানবগণ দক্ষিণাপথের আদিম অধিবাসীগণের বংশধর কি না, তদ্বিষয়ে পণ্ডিতগণের মতভেদ আছে। কাহারও কাহারও মতে এই দুই জাতীয় মানবগণ প্রাচীনকালে অন্যদেশ হইতে আসিয়া দক্ষিণাপথে বাস করিয়াছিল এবং ইহাদের পূর্বে প্রকাণ্ড আকার-বিশিষ্ট রাক্ষস-জাতীয় মানবগণ বাস করিত। দক্ষিণাপথে আর্য অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রাচীন মানব-জাতি বিলুপ্ত হইয়া যায়। রামচন্দ্রের সময়েই ইহাদের সমুচ্ছেদ সাধন হয়। তাঁহার তিরোধানের পরেও যাহারা অবশিষ্ট ছিল, তাহারাও কালক্রমে বিনষ্ট হয়।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা আমাদের অনুমান মাত্র। তৎসম্বন্ধে কোনো ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে দক্ষিণাপথে যে প্রকাণ্ড আকার বিশিষ্ট মানব জাতি বিদ্যমান ছিল, দুই এক স্থলে তাহার সামান্য সামান্য আভাস পাওয়া গিয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধে আমি তৎসম্বন্ধে কিছু বলিব।

আধুনিক রাজমহাল, বীরভূম, সাঁওতাল পরগনা, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলা প্রাচীন দক্ষিণাপথের অন্তর্গত ছিল। আর্যাবর্তের পূর্বাংশ ইহাদের উত্তরদিকে অবস্থিত ছিল। ভূতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ বলেন যে, ত্রিশ হইতে পঞ্চাশ হাজার বৎসর পূর্বে আর্যাবর্তের এই অংশ হিমালয়ের পাদমূলস্থিত গাঙ্গেয়-সমুদ্রের অন্তর্গত ছিল। কালক্রমে পলিমাটি দ্বারা এই সমুদ্র পূরিত হইয়া উঠিলে, আর্যগণ পঞ্চনদপ্রদেশ হইতে ধীরে ধীরে পূর্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়া এই নবোত্থিত উর্বরাভূমি অধিকার করিয়া বসেন। তখন উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে বিন্ধ্য-পর্বতমালা—এই দুই পর্বতশ্রেণীর মধ্যবর্তী দেশ আর্যাবর্ত নামে অভিহিত হয়।

বাঁকুড়া বীরভূম প্রভৃতি জেলা দক্ষিণাপথের অন্তর্ভুক্ত থাকায়, দক্ষিণাপথের অন্যান্য

প্রদেশের ন্যায়, এই প্রদেশেও প্রত্নমানবের অস্তিত্বের চিহ্ন বিদ্যমান থাকিতে পারে। ১৮৯২ কিম্বা ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়া জেলায় এইরূপ একটি চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা রক্ষিত হয় নাই। ওই বৎসর বাঁকুড়ায় ভূরি বৃষ্টিপাত হওয়ায় নদীসমূহে প্রবল বন্যা উপস্থিত হইয়াছিল। বাঁকুড়া শহরের দক্ষিণদিকে সাত আট ক্রোশ দূরে হাড়মাসড়া নামে একটি গণ্ডগ্রাম আছে। শিলাবতী বা শিলাই নদী ইহার নিকটেই প্রবাহিত। শিলাবতীতে প্রবল বন্যা হইলে, তাহার উচ্ছলিত জলরাশি একটি নূতন খাত খনন করিয়া অন্যদিকে প্রবাহিত হয়। বন্যার জল কমিয়া গেলে লোকে কৌতূহলপরবশ হইয়া নদীর এই নূতন খাতটি দেখিতে যায়। কিন্তু অনেকেই দেখিয়া বিস্মিত হয় যে, এই নূতন খাতের এক পার্শ্বে একটি প্রকাণ্ড নরকঙ্কাল পড়িয়া আছে। লোকে সেটিকে কোনো অসুর বা দৈত্যের কঙ্কাল মনে করিয়া হাড়মাসড়ার ভূম্যধিকারী বৈদ্যবংশীয় নদ্যারচাঁদ রায় মহাশয়কে সংবাদ দেয় তিনিও তথায় গিয়া দেখেন যে, সত্যসত্যই তাহা একটি অতিকায় মানবের কঙ্কাল বটে। মাটির মধ্যে তাহা প্রোথিত ছিল ; কিন্তু বন্যার জলে মৃত্তিকা ধৌত হইয়া অপসারিত হওয়ায়, নদীর গর্ভে সেই কঙ্কালটি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এতবড়ো নরকঙ্কাল তিনি কখনও দেখেন নাই ; দড়ি ধরিয়া মাপিয়া দেখিলেন যে তাহা সাত হাত দীর্ঘ। পাছে নদীতে আবার বন্যা হইয়া সেই কঙ্কালটি বালি কিম্বা মাটি চাপা পড়ে, কিম্বা বন্যার জলে কোথাও ভাসিয়া যায়, এই আশঙ্কায় তিনি লোকজনের সাহায্যে তাহা নদীর গর্ভ হইতে তীরে উঠাইয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে উত্তোলনের সময় কঙ্কালটি চূর্ণ হইয়া যায়। তথাপি তিনি বাঁকুড়ায় আসিয়া তদানীন্তন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ব্যারো (Mr. Barrow) সাহেবকে এই অদ্ভুত কঙ্কালের কথা বলেন। আমি তখন বাঁকুড়ায় ওকালতি করিতাম। তিনি আমাদের বার-লাইব্রেরিতেও আসিয়া উক্ত অদ্ভুত কঙ্কালের কথা আমাদের সকলের সম্মুখে বলেন। ব্যারো সাহেব হাড়মাসড়া গ্রামে গিয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছি। তখন বাঁকুড়া শহরে আলোকচিত্র তুলিবার কোনো ক্যামেরা ছিল না। সুতরাং কঙ্কালের কোনো আলোকচিত্রও তোলা হয় নাই। এইরূপে একটি প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্যের অমূল্য নিদর্শনের কোনো সদ্ব্যবহার করা হয় নাই। আমরা রায় মহাশয়কে পুনঃপুন জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলাম যে, কঙ্কালটি প্রকৃত প্রস্তাবে নরকঙ্কালই ছিল, কোনো অতিকায় জন্তুর কঙ্কাল ছিল না। আমি তখন "বাঁকুড়া-দর্পণে" এই সম্বন্ধে কিছু লিখিয়াছিলাম বলিয়া স্মরণ হইতেছে।

এই ঘটনার প্রায় ২৫ বৎসর পরে, অর্থাৎ বর্তমান সময় হইতে ৮।৯ বৎসর পূর্বে যখন আমি আজিমগঞ্জে ছিলাম, সেই সময়ে বীরভূম জেলার অন্তর্গত নলহাটি স্টেশনের নিকটবর্তী পাহাড়ের পার্শ্বে এইরূপ আর একটি সাত হাত (১০।। ফিট) দীর্ঘ নরকঙ্কাল আবিষ্কৃত হওয়ার সংবাদ শুনিয়াছিলাম। কাশিমবাজারের মহারাজের পক্ষে নলহাটির পাহাড়ের নিকট প্রস্তর খনন করা হইতেছিল। প্রস্তর খননের ভার ছিল, আমার একটি বন্ধুর উপর। ইঁহার নাম শ্রীযুক্ত হরিগুরু রুদ্র। ইনি overseer ছিলেন। মধ্যে মধ্যে ইনি আজিমগঞ্জে আসিয়া আমার বাটিতে থাকিতেন। একদিন তিনি আসিয়া বলিলেন "পাথর খনন করিতে করিতে সেদিন একখানা বড়ো পাথরের নিচে একটি ১০।। ফিট দীর্ঘ নরকঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছিল। মানুষের এতবড়ো কঙ্কাল আমি কখনও দেখি নাই।

ফিতা দিয়া মাপিয়া দেখিলাম, তাহা সাড়ে দশ ফিট দীর্ঘ। কঙ্কালের সমস্ত অংশই বিদ্যমান ছিল ; কিন্তু তাহা গর্ত হইতে তুলিয়া উপরে রাখিতে রাখিতে ভাঙিয়া যাইতে লাগিল। আমার নিকট ক্যামেরা ছিল না ; নিকটে অন্য কাহারও ক্যামেরা ছিল না ; কাজেই আমি রামপুরহাটে গিয়া তত্রত্য বাঙ্গালী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট সংবাদ দিলাম, এবং তাঁহাকে এই নরকঙ্কালটি দেখিতে ও তাহার ফটো তোলাইবার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিলাম। কিন্তু তিনি আমার কথা হাসিয়াই উড়াইয়া দিলেন, এবং বলিলেন এত বড়ো কঙ্কাল মানুষের হইতেই পারে না, কোনো জানোয়ারের কঙ্কাল হইবে। রামপুরহাটের পরের স্টেশন নলহাটি ; দুই চারি ঘণ্টার মধ্যে যাইয়া ফিরিয়া আসা যায় ; তথাপি তিনি আমার সঙ্গে গেলেন না। দুই চারিদিন পরে কঙ্কালটি চূর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। তখন তাহা চূর্ণ অস্থির একটি স্তূপ হইয়াছে।" আমি রুদ্র মহাশয়ের কথা শুনিয়া তাঁহার সহিত নলহাটি যাইতে প্রস্তুত হইলাম ; কিন্তু তিনি বলিলেন "এখন গিয়া আর কী দেখিবেন? কঙ্কাল নাই। কতকগুলি চূর্ণ অস্থি একস্থানে পড়িয়া আছে।" আমি তাঁহাকে বলিলাম, "এইরূপ একটি নরকঙ্কালের ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক মূল্য যে কত অধিক তাহা আমাদেব দেশের শিক্ষিত লোকেও জানেন না। ইউরোপে এইরূপ একটি কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইলে সভ্য জগতে হুলস্থূল পড়িয়া যাইত। মুহূর্ত-মধ্যে এই অদ্ভুত আবিষ্কারের সংবাদ সমগ্র পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইত। এবং আবিষ্কারকেরাও চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিতেন।" পঁচিশ বৎসর পূর্বে বাঁকুড়ার নিকট হাড়মাসড়া গ্রামেও যে এইরূপ একটি নরকঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহা আমি তাঁহাকে বলিলাম। সেইটিও বিনষ্ট হইয়াছে, আর একটিও বিনষ্ট হইল। কিন্তু যখন একই মাপের দুইটি নরকঙ্কাল বাঁকুড়া ও বীরভূমে (প্রায় ৬০ ক্রোশের ব্যবধানে) পাওয়া গেল, তখন স্থানে স্থানে যে এইরূপ নরকঙ্কাল প্রোথিত আছে, এবং দক্ষিণাপথে যে অতিকায় প্রত্নমানবগণ বাস করিত, তদ্বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ হইল না। নলহাটিতে যে কঙ্কালটি পাওয়া যায়, তাহা একখানা বড়ো পাথরের নিচে ছিল। সম্ভবত মৃতদেহটি প্রোথিত করিয়া তাহার উপর একখানা বড়ো পাথর চাপা দেওয়া হইয়াছিল। আমার মনে হয় নলহাটির পাহাড়ের নিকট যখন একটি অতিকায় মানবের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, তখন ওই স্থানে খনন করিলে, আরও ওইরূপ কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইতে পারে। কিন্তু এইরূপ খনন কার্য ব্যয়-সাপেক্ষ। গভর্নমেন্ট এইজন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় না করিলে এবং এইরূপে খননকার্যের পরিদর্শন জন্য যোগ্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত না করিলে কখনই আশানুরূপ ফললাভ করিতে পারা যাইবে না।

অতিকায় মানবের কঙ্কাল সম্বন্ধে যে দুইটি বিবরণ আমি শুনিয়াছিলাম, তাহা এইস্থানে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলাম। বর্তমান সময়ে ইহার কোনো মূল্য নাই, তাহা আমি জানি। কিন্তু ভবিষ্যতে যদি কোথাও এইরূপ অতিকায় মানবের এইরূপ কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়, তখন এই বৃত্তান্তটি তাহার পরিপোষক প্রমাণরূপে ব্যবহৃত হইতে পারিবে।

আমাদের হিন্দুপঞ্জিকায় দেখা যায়, কলিযুগে মানুষের পরমায়ু ১২০ বৎসর, এবং মানবদেহ সার্ধত্রিহস্ত পরিমিত। দ্বাপরযুগে "নরাণাং সহস্রবর্ষ পরমায়ুঃ। সপ্তহস্ত পরিমিতো মানব দেহঃ।" ত্রেতাযুগে মানুষের পরমায়ু ছিল দশসহস্র বৎসর, আর দেহ ছিল চতুর্দশ

হস্ত পরিমিত। আর সত্যযুগে ছিল, মানুষের পরমায়ু লক্ষবর্ষ, আর দেহ ছিল একবিংশতি হস্ত পরিমিত! ত্রেতাযুগে ঋগ্বেদের অধিকার ছিল বলিয়া উক্ত হইয়াছে ; কিন্তু ঋগ্বেদে দশসহস্র বৎসর পরমায়ুর কথা কোথাও দৃষ্ট হয় না। ঋষিগণ শতবৎসর পরমায়ুর জন্যই প্রার্থনা করিতেন। সুতরাং মানবের সহস্র, দশসহস্র বা লক্ষ বৎসর পরমায়ু থাকার কথা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। আর্যগণের দেহ চিরকালই সার্ধত্রিহস্ত পরিমিত ছিল। কিন্তু তাঁহারা যখন দক্ষিণাপথে গমনাগমন করিয়া সপ্তহস্ত পরিমিত দেহ বিশিষ্ট অতিকায় মানব দেখিয়াছিলেন, তখন হয়ত মনে করিয়াছিলেন যে পূর্ব পূর্ব যুগে আরও দীর্ঘতর মানব বিদ্যমান ছিল। পৃথিবীর আদিম যুগে দীর্ঘাকার বিশিষ্ট সরীসৃপ (dinosaurs) হস্তী (mammoths) প্রভৃতি বিদ্যমান ছিল, এবং তাহাদের কঙ্কালও স্থানে স্থানে লক্ষিত হইয়া থাকে। দীর্ঘাকার মানবও সেই প্রাচীন যুগে আবির্ভূত হইয়া থাকিবে, সম্ভবত এই অনুমানের বশবর্তী হইয়াই প্রাচীন আর্যগণ পূর্ব পূর্ব যুগের অতিকায় প্রত্নমানবের কল্পনা করিয়া থাকিবেন। সপ্তহস্ত পরিমিত দেহবিশিষ্ট অতিকায় মানব তাঁহারা দক্ষিণাপথে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন ; এই কারণে তাহা তাঁহাদের কল্পনার বিষয়ীভূত হয় নাই। সাত হাত দীর্ঘ মানবকঙ্কালের যে বৃত্তান্ত উপরে লিখিত হইল, তাহা সত্য হইলে, প্রাচীন আর্যগণ দক্ষিণাপথে অতিকায় প্রত্নমানববংশ যে দেখিয়াছিলেন, তাহা সুনিশ্চিত। সম্ভবত এই মানবগণকেই তাঁহারা দৈত্য, দানব ও রাক্ষস বলিতেন।

বঙ্গবাণী ● আষাঢ় ১৩৩৩ (১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ)



জাতি-বিজ্ঞান

অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

পৃথিবীতে অনেক জাতি দেখা যায়। অনেকে অনুমান করেন, এক এক জাতির এক এক বিশেষ বর্ণ আছে। বর্ণানুসারে জাতি সকলকে তিনটি কি চারিটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়। সাধারণত ককেশীয়, মোঙ্গোলীয়, নিগ্রো ও আমেরিকান, চারি বর্ণের এই চারি জাতির অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়। ককেশীয় জাতিরা শ্বেতবর্ণের। লাপল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, (ইয়ুরোপের) তুর্কিস্তান ও হাঙ্গারির কোনো কোনো অঞ্চল ছাড়া প্রায় সমস্ত ইয়ুরোপে ককেশীয় জাতির বাস ; এতদ্ব্যতীত আশিয়ার তুর্কিস্তান, আরব, পারস্য, আফগানিস্তান, ভারতের উত্তরাঞ্চল, ইয়ুরোপীয় উপনিবেশ, আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়া, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি অঞ্চলেও বহুসংখ্যক ককেশীয় জাতি দেখিতে পাওয়া যায়।

মোঙ্গোলীয় জাতীয় মনুষ্যেরা পীতবর্ণ-বিশিষ্ট। ইহারা চিন-সাম্রাজ্য, তিব্বত, সাইবেরিয়া, বর্মা, ভাবতবর্ষের কোনো কোনো অঞ্চল, লাপল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, হাঙ্গারি ও ইয়ুরোপের তুর্কিস্তানের কোনো কোনো অঞ্চল ও গ্রিনল্যান্ডের অধিবাসী। আমেরিকানরা লোহিত জাতি। গ্রিনল্যান্ড ও আমেরিকার সর্বাপেক্ষা উত্তরে কতিপয় অঞ্চল ব্যতীত আমেরিকার প্রায় সর্বত্র ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়।

নিগ্রোরা কৃষ্ণবর্ণ জাতি। আফ্রিকার অধিকাংশ স্থলে ইহারা বাস করে।

কেহ-কেহ আদিম অস্ট্রেলিয়ান জাতিকে এতদতিরিক্ত এক বিশেষ জাতি বলিয়া গণ্য করেন। কেহ-কেহ আবার অনুমান করেন যে, মলয়-জাতীয় মনুষ্যেরা (Malayan) শ্বেত, পীত, কৃষ্ণ ও লোহিত বর্ণাতিরিক্ত কোনো বিশেষ বর্ণবিশিষ্ট। তাহারা পিঙ্গলবর্ণ-বিশিষ্ট জাতি বলিয়া উক্ত হয়। ইহারা মলয় দ্বীপপুঞ্জ, মলয় উপদ্বীপ ও মাডাগাস্কারের অধিবাসী।

কেহ-কেহ অনুমান করেন যে, বানর-জাতীয় কোনো পশু যে মানব জাতির পূর্বপুরুষ, ইহা যেমন জোর করিয়া বলা যায় না, সেইরূপ সকল জাতীয় মনুষ্য যে একই বংশ-সম্ভূত একথাও জোর করিয়া বলা যায় না। তাঁহাদের মতে বিভিন্ন মানব-বংশ, বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত হইয়া, পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে উৎপন্ন হইয়াছে।

কিন্তু সকল মানবজাতি যে এক সাধারণ বংশ-সম্ভূত, তাহা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এক প্রকার স্থিরীকৃত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করিয়াছেন, এক জাতীয় জীবের, সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতীয় জীবের সহিত জাতি-সংকর উৎপাদন করা যায় না। যদি কখনও সম্ভব হয়, তাহা হইলে, সেরূপ সংকর-জাতীয় জীবের বংশোৎপাদন ক্ষমতা থাকে না। উদাহরণস্বরূপ অশ্ব ও গর্দভে যে সংকর উৎপন্ন হয়, তাহার বংশোৎপাদন ক্ষমতা মোটেই থাকে না। এই কারণে গর্দভ আকৃতিতে অশ্বের প্রায় সমতুল্য হইলেও, অশ্ব ও গর্দভকে সমজাতীয় বলা যায় না। বিভিন্ন অঞ্চলের ও বিভিন্ন বর্ণের মানুষ যদি সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতীয় হইত, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে বর্ণ-সংকর উৎপাদন করা অসম্ভব হইত। কিন্তু তাহা না হইয়া সকল স্থলে মঙ্গলকর হইতে দেখা যায় ; সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, সকল দেশের সকল মনুষ্যই এক জাতীয়, একই মূল বংশ হইতে সকল দেশের সকল মনুষ্যই হইয়াছে।

যদি সকল মনুষ্যকে এক জাতীয় বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে বিভিন্ন অঞ্চলের মনুষ্যের বর্ণ-বিভিন্নতার কারণ অনুসন্ধান করিতে হয়। অনেকে অনুমান করেন, জলবায়ুর প্রভাবই বর্ণের একমাত্র কারণ। শীতপ্রধান দেশে বর্ণ ফরসাই হয়, আর উষ্ম অঞ্চলে বর্ণ কালো হইতেই দেখা যায়। আমরা সাধারণত দেখিতে পাই, শীত-প্রধান অঞ্চলের লোকেরাই ধবধবে ফরসা হয়, আবার ইহারাই উষ্মপ্রধান অঞ্চলে গিয়া কালো হইয়া পড়ে। কাজেই আমাদের ইহাই মনে হইতে পারে যে, জলবায়ু অনুসারেই বর্ণ হইয়া থাকে। ইয়ুরোপের সকল জায়গার জলবায়ু সমান নয়। কোনো কোনো জায়গা ঠান্ডা, কোনো কোনো জায়গা গরম। আবার কোনো কোনো জায়গা বেশি গবমও নয়, বেশি ঠান্ডাও নয়। ফ্রান্সের দক্ষিণাঞ্চল উক্ত দেশের উত্তরাঞ্চল অপেক্ষা উষ্ম। উত্তরাঞ্চলের অধিবাসীবা দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসীদের অপেক্ষা ফরসা। জার্মানি আরও ঠান্ডা দেশ, জার্মানির অধিবাসীরা ফ্রান্সের অধিবাসীদিগের অপেক্ষা ফরসা। এইরূপে দেখা যায় যে, ইয়ুরোপের যে প্রদেশ যত ঠান্ডা, সেই প্রদেশের অধিবাসীরা তত ফরসা। পক্ষান্তরে ইয়ুরোপের যে প্রদেশ যত উষ্ম, সেই প্রদেশের অধিবাসীরা তত ময়লা। ইতালি ও স্পেনের অধিবাসীরা ফ্রান্সের অধিবাসীদিগের অপেক্ষা ময়লা, এবং উক্ত দেশদ্বয়ের উত্তরাঞ্চলের অধিবাসীরা, দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসীদিগের অপেক্ষা ফরসা। শুধু তাহাই নয়, আফ্রিকা ও পূর্বভারত-দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীবর্গও উক্ত মতটির যাথার্থ্য প্রতিপাদনের অনুকূল। এই সকল তথ্যের দ্বারা মোটামুটি সাধারণ সিদ্ধান্ত এই হইতে পারে যে, বর্ণের কৃষ্ণত্ব জলবায়ুর উষ্মত্বের সহিত সম্পর্কিত ; এবং ভূমণ্ডলের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন প্রকাব জলবায়ু, মানব শরীরের বিভিন্ন বর্ণ উৎপাদন করিয়া থাকে।

কিন্তু উক্ত মতের বিরুদ্ধবাদীরা এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমের কতিপয় দৃষ্টান্ত দিয়া

উক্ত মত খণ্ডন করিতে পারেন। অত্যন্ত শীতপ্রধান অঞ্চলেও মলিনবর্ণ মনুষ্য দেখিতে পাওয়া যায়, আবার উষ্ম অঞ্চলেও গৌরবর্ণ মনুষ্য বাস করে। একই প্রকার বর্ণবিশিষ্ট বিভিন্ন মানবজাতি, নানা প্রকার জলবায়ুর অধীনে থাকিয়াও আপনাদিগের স্বাভাবিক বর্ণ রক্ষা করিয়া আসিতেছে, ইহারও দৃষ্টান্তের অভাব নাই। আবার অনেক জাতি পরস্পর বর্ণগত পার্থক্য সত্ত্বেও পরস্পর সন্নিকটবর্তী হইয়া বাস করিয়া আসিতেছে, ইহাও দেখা যায়।

১। ইয়ুরোপ, আশিয়া ও আমেরিকার সর্বাপেক্ষা শীতল প্রদেশসমূহে, এমন অনেক জাতীয় মানুষ আছে, যাহাদের বর্ণ কালো। ল্যাপল্যান্ডবাসীদিগের চুল খাটো, কালো ও কর্কশ ; তাহাদের গায়ের রং ময়লা, তারামণ্ডলও (iris) কালো। শুনা যায় গ্রিনল্যান্ডবাসীরা ক্ষুদ্রকায়, তাহাদের চক্ষু কৃষ্ণবর্ণ ; তাহাদের গায়ের রং কৃষ্ণধূসর, মুখ পিঙ্গল বা জলপাইয়ের বর্ণবিশিষ্ট ; তাহাদের চুলের রং কয়লার মত কালো। (Crantz's History of Greenland)

এশিয়ার উত্তরাঞ্চলবাসী সাময়ডিস ও আরও অনেক জাতি বর্ণসম্বন্ধে ল্যাপল্যান্ড ও গ্রিনল্যান্ডবাসীদিগের সদৃশ। দক্ষিণ আমেরিকাবাসী ইন্ডিয়ানদিগের সম্বন্ধে Humboldt যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এই তথ্যেরই দৃঢ়তা সম্পাদন করে। দক্ষিণ আমেরিকার (Torridzone) উষ্মমণ্ডলস্থ উপত্যকা সকল অত্যন্ত উষ্মাঞ্চল, কিন্তু Andes-এর Cordillera নামক সমতল ক্ষেত্র, ও দক্ষিণ নিরক্ষান্তর হইতে ৪৫ ডিগ্রি নিম্নে Chonos দ্বীপপুঞ্জ সমধিক শীতল। উত্তাপ বিষয়ে ইয়ুরোপের উত্তরাঞ্চল হইতে দক্ষিণাঞ্চলের যতটা প্রভেদ, দক্ষিণ আমেরিকার Cordillera ও Chonos দ্বীপপুঞ্জ হইতে উক্তদেশের উষ্মমণ্ডলস্থ উপত্যকা সকলের প্রায় ততটা প্রভেদ ; অথচ কী Cordillera ও Chonos দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী, কী উষ্মমণ্ডলস্থ উপত্যকা সকলের অধিবাসী, সকলেরই বর্ণ তাম্রবৎ লোহিত (Political Essay on the kingdom of New Spain)। তিনি একথাও বলেন যে, পর্বতনিবাসী আমেরিকান ইন্ডিয়ানরা বস্ত্রাবৃত থাকে ; কিন্তু তাহাদেব শরীরের যে সকল অংশ আবৃত থাকে, সেই সকল অংশের ও অনাবৃত অংশের বর্ণের পার্থক্য তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। Tiera del Fuego পৃথিবীর মধ্যে অত্যন্ত হিমপ্রধান দেশ, কিন্তু সেখানকার অধিবাসীদিগের শরীর ও কেশ কৃষ্ণবর্ণ।

উষ্মপ্রধান অঞ্চলে গৌরাঙ্গ অধিবাসী দেখিতে পাওয়া যায়। Ulloa বলেন, Carthagena অপেক্ষা Guayaquil উষ্মতর, এবং তিনি দেখিয়াছেন যে, সর্বাপেক্ষা উষ্মতম দিনে পারি নগরে যতটা উত্তাপ হয়, Carthagena-র স্বাভাবিক উত্তাপ তদপেক্ষা অধিক। অথচ Guayaquil-এর অধিবাসীরা মলিনবর্ণ নহে। বস্তুত তাহাদের রং এত ফরসা এবং তাহারা এত সুন্দর আকৃতি-বিশিষ্ট যে তাহাদিগকে, সমস্ত Quito ও Peru প্রদেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুশ্রী বলা যাইতে পারে। Humboldt-বর্ণিত বৃত্তান্ত পাঠে জানা যায় যে, Guina-র অরণ্য মধ্যে, বিশেষত অরিনকো নদীর উৎপত্তিমূলের নিকটে কতিপয় শ্বেতকায় জাতি বাস করে। আকৃতিতে তাহারা ইয়ুরোপীয়দিগের সহিত কখনও মিলিত হয় নাই। ইহাদের চতুষ্পার্শে যে সকল জাতি বাস করে, তাহারা কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট। Boroa-র

অধিবাসীরাও শ্বেতকায়। এমনকি আফ্রিকাতেও সকল স্থলে জলবায়ুর উষ্মতা বৃদ্ধির সহিত শরীর-বর্ণের কৃষ্মতা বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায় না। পৃথিবীর এই অঞ্চলে যে অপেক্ষাকৃত গৌরবর্ণ জাতিও বাস করে, আরব-দেশীয় ভ্রমণকারী ইবনে হকল খ্রিস্টীয় দশম শতকে তাহা লক্ষ করিয়াছিলেন, ও পরবর্তী ভ্রমণকারীরাও পরে তাহা সমর্থন করিয়াছেন।

সকল প্রকার জলবায়ুর প্রভাবের অধীন সুবৃহৎ ভূখণ্ডে একই প্রকার বর্ণবিশিষ্ট মানব সকল দেখিতে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে আমেরিকা মহাদেশের দৃষ্টান্তে সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দৃষ্ট হয়। এসকুইমো জাতি ছাড়া এই মহাদেশের সকল স্থলের সকল অধিবাসীরই বর্ণ তাম্র-লোহিত ; ইহাদের সকলেরই কেশ দীর্ঘ, সরল ও কৃষ্মবর্ণ। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আয়তনে অস্ট্রেলিয়ার দৃষ্টান্তও তদনুরূপ। এই দ্বীপের সর্বত্র, এমনকি অপেক্ষাকৃত শীতল অঞ্চলেও, অধিবাসীদিগের বর্ণ ঘোর কৃষ্ম। তাহাদের চুলও নিগ্রোজাতির চুলের ন্যায় কুঞ্চিত।

একই প্রকার প্রাকৃতিক অবস্থায়, এবং একই জাতীয় মানুষের মধ্যে বর্ণ-বিভিন্নতা লক্ষিত হইয়া থাকে। ইহার উদাহরণ ও প্রমাণ পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। নরওয়ে, আইসল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, ল্যাপল্যান্ডের অধিবাসীরা প্রায় একই অক্ষান্তরে বাস করে, কিন্তু তাহাদের পরস্পরের গাত্রবর্ণেব, এবং চক্ষু ও কেশ-বর্ণের সবিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ডালমাটিয়ার অধিবাসী Morlach-দিগের মধ্যে বর্ণ ও আকৃতিগত পার্থক্য খুবই দৃষ্ট হয়। Kotar-এর অধিবাসীরা এবং Seigu এবং Knin-এর সমতল ক্ষেত্রের অধিবাসীরা সুন্দব নীল চক্ষু-বিশিষ্ট, তাহাদের মুখমণ্ডল প্রশস্ত, এবং চ্যাপটা। কিন্তু যাহারা Duare ও Vergoraz-এ বাস করে, তাহাদের চুল কালো ; মুখমণ্ডল লম্বা, গায়ের রং (tawny) আপীত পিঙ্গল এবং কলেবর সমুন্নত। M. Sauchez তাতার অধ্যুষিত এবং বুশের দক্ষিণ দিকস্থ প্রদেশ-সমূহে ভ্রমণ করিতে করিতে ইয়ুরোপের অধিবাসীর ন্যায় শ্বেতকায়-বিশিষ্ট একটি জাতির সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনায় জানা যায় যে, উক্ত জাতির শরীর-বর্ণ ধবধবে সাদা অথচ তাহাদেব চক্ষু কৃষ্মবর্ণ-বিশিষ্ট। দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী কাফ্রিদের বর্ণ লৌহ ধূসর, হটেনটটদিগের বর্ণ পীত। Sibre-র মতে মাডাগাস্কার দ্বীপে ইয়ুরোপের দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসীদিগের অপেক্ষা ময়লা নয় এরূপ ফিকে জলপাই বর্ণ হইতে অত্যন্ত মলিন বর্ণ পর্যন্ত সকল প্রকার বর্ণাভাযুক্ত মানুষ দেখিতে পাওয়া যায়। শুধু গাত্রবর্ণ কেন, কেশ সম্বন্ধেও, উক্ত দ্বীপে. অনেক প্রকার ভেদ দৃষ্ট হয়। যাহাদের বর্ণ কিছু পরিষ্কার, তাহাদের চুল কালো ও সোজা, কিন্তু যাহাদের বর্ণ ময়লা, তাহাদের কেশ ছোটো ও কোঁকড়ানো।

ফিলিপাইন দ্বীপে জলপাই-বর্ণের মলয় (Malayan) জাতিও আছে, আবার এমন সকল অধিবাসীও আছে যাহারা বর্ণ ও আকৃতিতে নিগ্রোদিগের ন্যায়। যব-দ্বীপে দুই প্রকারের আদিবাসী দৃষ্ট হয়, তাহাদের আকৃতি ও বর্ণে ক্রমান্বয়ে হিন্দু ও মলয়-ভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। মলাক্কাদিগের অনেকে আবার অপেক্ষাকৃত কম কালো। যাহারা অধিকতর কৃষ্মবর্ণ-বিশিষ্ট তাহাদের কেশ পশমের ন্যায় এবং তাহারা অভ্যন্তরস্থ পার্বত্য

অঞ্চলে বাস করে। এই সকল দ্বীপের উপকূলে অপর এক জাতীয় লোক বাস করে, তাহাদের গাত্র-বর্ণ পীতাভ পিঙ্গল (Swarthy) ও চুল লম্বা ও কোঁকড়ানো। ফরমোজা দ্বীপের আভ্যন্তরিক পার্বত্য অঞ্চলে পিঙ্গলবর্ণ, কুঞ্চিতকেশ ও প্রশস্তমুখ অধিবাসীবৃন্দ দেখিতে পাওয়া যায়। চিনেরা ওই দ্বীপের উপকূল সকল অধিকার করিয়া আছে।

প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ সকলে যে সকল অধিবাসী দৃষ্ট হয়, তাহাদিগকে দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। একটি শ্রেণি অপেক্ষাকৃত ফরসা, আর একটি শ্রেণি অপেক্ষাকৃত ময়লা। অপেক্ষাকৃত মলিনকায়-বিশিষ্টদিগের কেশ পশমি ও কুঞ্চিত হইতে আরম্ভ করিতেছে। প্রথমোক্ত শ্রেণি, ওটাহাইট এবং সোসাইটি দ্বীপ মার্কুইসাস, ফ্রেন্ডলি দ্বীপ, ঈস্টার দ্বীপ ও নিউজিল্যান্ডের অধিবাসী ; দ্বিতীয় শ্রেণি, নিউ কালিডোনিয়া, টনা, নিউ হিব্রিডিস ও মালিকোর অধিবাসী। এই সকল দ্বীপের অন্যান্যসাপেক্ষ অবস্থান ও অক্ষান্তর হিসাবে প্রতিপন্ন হয় যে, শুধু যে শীতলতর প্রদেশে অপেক্ষাকৃত মলিনকায় জাতি বাস করে, তাহা নয়, ভিন্ন ভিন্ন অক্ষান্তরে একই প্রকার বর্ণ-বিশিষ্ট জাতি বাস করিতে পারে।

অত্যন্ত উষ্মাঞ্চলে যে বর্ণ মলিন হইয়া যায়, একথা অস্বীকার করা যায় না। ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, সুবিশুদ্ধ বর্ণ-বিশিষ্ট শীতপ্রধান অঞ্চলের ইয়ুরোপীয় জাতি উষ্মাঞ্চলে গিয়া বিমলিনকায় হইয়া পড়ে। তবে স্বাভাবিক সুবিশুদ্ধ বর্ণবিশিষ্ট ককেশীয় জাতি দেশ-বিশেষের জলবায়ুর প্রভাবে বিমলিনকায় হইলেও, অপর জাতীয় মানবের ওই একই প্রকার জলবায়ুর প্রভাবে যে বর্ণ হয়, সেই উভয় বর্ণের মধ্যে বিশেষরূপ প্রভেদ থাকিয়া যায় ; অর্থাৎ দেশ-বিশেষের জলবায়ুর প্রভাবে ককেশীয় জাতির বর্ণের মলিনত্ব ঘটিতে পারে, কিন্তু সমপরিমাণ মলিনযুক্ত অপর জাতি হইতে, বর্ণ-বিশেষজ্ঞ প্রথমোক্ত জাতিটিকে চিনিয়া লইতে পারে।

ককেশীয় জাতীয় মানবের ফরসা সন্তান হয়। সকল জাতির বর্ণ এক নহে ; জন্মকালে শিশুরা বিশেষ-বিশেষ জাতি-বর্ণ লইয়া জন্ম গ্রহণ করে। Ulloa বলেন, Guayaquilএ স্পেনজাতীয় শিশু অত্যন্ত ফরসা বর্ণ লইয়া জন্মগ্রহণ করে। West Indiesএর ব্যাপারও এরূপ। Long তাঁহার জেমেকার ইতিহাসে স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, শ্বেত পিতামাতা হইতে ইংল্যান্ডে যেমন সুন্দর ও স্বচ্ছকলেবর শিশুর জন্ম হয়, জেমেকায়ও ঠিক তদ্রূপ হইতে দেখা যায়। কিন্তু মুর, আরব প্রভৃতি যে সকল ককেশীয় জাতি বহুকাল ধরিয়া উষ্ম প্রদেশে বাস করিয়া আসিতেছে, তাহাদের সম্বন্ধে ঠিক ওই কথা বলা যাইতে পারে না। অথচ জন্মকালে ওই সকল জাতির সন্তানেরা শীতপ্রধান দেশের ইউরোপীয় শিশুর ন্যায় ফরসা থাকে। Russel বলেন, আলিপোর চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রদেশ সমূহের অধিবাসীরা স্বভাবত গৌরবর্ণ, এবং ওই সকল স্থলের পদস্থ স্ত্রীলোকেরা উপযুক্ত যত্ন সহকারে তাহাদের স্বাভাবিক গৌরবর্ণ রক্ষা করিয়া থাকে। Shaw বলেন, মুরদিগের সন্তানেরা অতিশয় গৌরবর্ণ। Poiret ওই মতটি সমর্থন করেন। তিনি বলেন, মুরেরা স্বভাবত কৃষ্ণকায় নয়, তাহারা গৌরবর্ণ লইয়াই জন্মগ্রহণ করে। যদি তাহারা সূর্যোত্তাপে দেহকে উন্মুক্ত না রাখে, তাহা হইলে আজীবন গৌরবর্ণ রক্ষা করিতে পারে।

ককেশীয় জাতি স্বভাবত বিশুদ্ধবর্ণ। উষ্ম প্রদেশে তাহাদের বর্ণ মলিন হইয়া যায় ; কিন্তু উষ্মাঞ্চলবাসী ককেশীয়রাও যত্ন সহকারে তাহাদের স্বাভাবিক বিশুদ্ধ বর্ণ রক্ষা করিতে পারে। যদি তাহারা জলবায়ুর প্রভাবে দেহকে উন্মুক্ত না রাখে, তাহা হইলে উষ্মাঞ্চলেও তাহারা তাহাদের গৌর কান্তি বজায় রাখিতে পারে। কিন্তু নিগ্রোজাতি শত চেষ্টায়ও তাহাদের বর্ণের কৃষ্মত্ব দূর করিতে পারে না। ইয়ুরোপীয়রা, আফ্রিকা, East Indies বা দক্ষিণ আমেরিকা, যেখানেই বসতি স্থাপন করুক না, সর্বত্রই তাহাদের বর্ণ সমান থাকে, তবে উষ্ম প্রদেশের জলবায়ুর প্রভাববশত বর্ণটা কিছু মলিন হইতে পারে। তাহারা ওই সকল দেশের অধিবাসীদিগের ন্যায় কৃষ্মবর্ণ, জলপাই বা তাম্রবর্ণ-বিশিষ্ট হয় না। তাহাদের স্বাভাবিক বর্ণটা কেবল মাত্র কিঞ্চিৎ আপাত পিঙ্গল আভাযুক্ত হয়।

নিগ্রোরা West Indies বা আমেরিকায় বাস করিয়া ওই সকল অঞ্চলের অধিবাসীদিগের ন্যায় তাম্রবর্ণ-বিশিষ্ট হয় না। তবে জলবায়ুর অপেক্ষাকৃত মৃদুতা-বশত তাহাদের বর্ণের কৃষ্মত্বের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়া থাকে। আমেরিকায়, কী ইয়ুরোপীয়, কী নিগ্রো, কী Red-Indian সকল জাতীয় শিশুই লোহিতাভ বর্ণ লইয়া জন্মগ্রহণ করে ; কিন্তু কিছুকাল পরে নিগ্রো-শিশুরা তাহাদের পিতৃমাতৃবর্ণে রঞ্জিত হয় ; Indian শিশুরা তাম্রবর্ণ-বিশিষ্ট হইয়া পড়ে, কিন্তু ইয়ুরোপীয় শিশুরা হয় গৌরবর্ণই থাকিয়া যায়, না হয় প্রখর সূর্যোত্তাপের প্রভাববশত আপিঙ্গল বর্ণাভা প্রাপ্ত হয়, তাহারা নিগ্রোদের ন্যায় কালোও হয় না, Indian-দিগের ন্যায় তাম্রলোহিত বর্ণযুক্তও হয় না। কানাডা বা আমেরিকার উত্তর অঞ্চল সকলের জলবায়ু ইয়ুরোপের উত্তরাঞ্চলের জলবায়ুর সমান ; সুতরাং ওই সকল অঞ্চলে যে সকল ইয়ুরোপীয় বাস করে, তাহাদের বর্ণ বিশুদ্ধই থাকিয়া যায়, কিন্তু ওই সকল অঞ্চলের Indian-রাও তাম্রলোহিতবর্ণ রক্ষা করে।

মোঙ্গোলীয় জাতীয়রা সুতীব্র শীতপ্রধান ল্যাপল্যান্ড ও আশিয়ার উত্তরাঞ্চলেই বাস করুক, মৃদু তাপবিশিষ্ট আশিয়ার মধ্যাঞ্চলেই বসতি স্থাপন করুক, অথবা চিনের দক্ষিণাংশের উষ্মাঞ্চলেই বাস করুক, সর্বত্রই তাহাদের স্বাভাবিক বর্ণ রক্ষা করিয়া থাকে। উষ্মাঞ্চলেও তাহাদিগকে কৃষ্মকায় হইতে দেখা যায় না।

বর্ণগত বিশেষত্বের সহিত আকৃতিগত বিশেষত্বের এমন নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে যে মোঙ্গোলীয় জাতির জলপাই বর্ণের সহিত মলয়-জাতির আকৃতি সংযুক্ত হইতে দেখা যায় না ; পক্ষান্তরে মলয়-জাতির পিঙ্গল বর্ণের সহিত মোঙ্গোলীয় জাতির আকৃতি-সংযোগও দৃষ্ট হয় না। ইথিওপীয়-জাতির কৃষ্মবর্ণ ও আমেরিকান জাতির লোহিত বর্ণ তাহাদের স্ব-স্ব জাতীয় আকৃতির সহিতই সংযুক্ত থাকে। এই সকল ব্যাপারে মনে হইতে পারে, বিভিন্ন মৌলিক জাতি, বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপন্ন হইয়া, আপন আপন মৌলিকত্ব ও বিশেষত্ব চিরকাল রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

মনুষ্যের চর্মত্বক, Epidermis ও Cutis নামক দুই স্তরে বিভক্ত। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে Malpighi সাহেব Epidermis ও Cutis-এর মধ্যবর্তী Epdermis-এর একটি কোমল অংশস্তর আবিষ্কার করেন। তিনি এই অংশস্তরটিকে rete mucosom নামে অভিহিত করেন, ও এতন্মধ্যে এক প্রকার রস সঞ্চিত দেখেন। তিনি পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন

করেন যে, এই রসই নিগ্রোজাতির শরীরস্থ কৃষ্ণবর্ণ উৎপাদন করে। পরীক্ষা দ্বারা ইহাও জানা গিয়াছে যে বিভিন্ন জাতির শরীরস্থ এই রস বিভিন্ন বর্ণের ; সুতরাং বিভিন্ন মৌলিক জাতি যে বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপন্ন হইয়া, আপন আপন মৌলিকত্ব ও বিশেষত্ব চিরকাল রক্ষা করিয়া আসিতেছে, আপাতত তাহাই মনে হইতে পারে।

চুলের বর্ণের সহিত গাত্রবর্ণের সম্পর্ক আছে। গাত্রচর্ম যে পরিমাণে পাতলা ও ফরসা হয়, চুল সেই পরিমাণে কোমল, সূক্ষ্ম ও সাদা হয়।

টিউটন-জাতীয় মনুষ্যেরা সমধিক শ্বেতকায়। উহাদের কেশও সুবিমল স্বচ্ছ। কেল্টিক জাতীয় মনুষ্যেরা তত ফরসা নহে, ইহাদের কেশও টিউটন-জাতীয় মনুষ্যের কেশ অপেক্ষা কৃষ্ণতর। টিউটনদিগের অপেক্ষা কেল্টদিগের কেশের কুঞ্চন-প্রবণতা অল্প। কেশের বর্ণের গাত্র-বর্ণের সহিত সম্পর্ক আছে বটে, কিন্তু কেশের কুঞ্চন-প্রবণতার সহিত গাত্রবর্ণের সম্পর্ক ততটা বলিয়া বোধ হয় না। পিঙ্গল-বর্ণবিশিষ্ট এমন অনেক কেল্ট-জাতীয় লোক দেখা গিয়াছে, যাহাদের কেশ কুঞ্চিত, কিন্তু মোঙ্গোলীয় ও আমেরিকান জাতীয় লোকেরা আরও অধিক ময়লা হইলেও তাহাদের কেশ লম্বা ও সোজা। দক্ষিণ-সাগর-দ্বীপপুঞ্জে যে সকল মলয় (Malay) জাতীয় লোক বাস করে, তাহাদের মধ্যে অনেকের কেশ কোমল ও কুঞ্চিত বলিয়া শুনা যায়। অক্ষিবর্ণেরও গাত্রবর্ণের সহিত বিশেষ সম্পর্ক আছে। অধ্যাপক Sommering বলেন যে, নিগ্রোজাতির চক্ষের শ্বেতাংশটা ইয়ুরোপীয়দিগের ন্যায় সমুজ্জ্বল শ্বেত নয় ; তাহা পাণ্ডু রোগাক্রান্ত ব্যক্তির ন্যায় পীতাভ পিঙ্গল। সাধারণ নিগ্রোজাতির তারামণ্ডলের (iris) বর্ণ ঘোর কালো, কিন্তু কঙ্গো নিগ্রোদের তারামণ্ডল নীলাভ বলিয়া শুনা যায়। টিউটন-জাতির গাত্রবর্ণ বিমল ধবল, কিন্তু তাহাদের বিশেষত্ব চক্ষুর নীলত্বে। ফিনল্যান্ডবাসীরা অপেক্ষাকৃত ময়লা, ল্যাপল্যান্ডবাসীরা আরও ময়লা। ফিনদিগের তারামণ্ডল (iris) পিঙ্গলবর্ণ, এবং ল্যাপল্যান্ডবাসীদিগের তাহা কৃষ্ণবর্ণ। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গাত্রবর্ণের যেমন পরিবর্তন ঘটে, অক্ষিবর্ণেরও তদ্রূপ ঘটিয়া থাকে। সদ্যোজাত জার্মান শিশুর চক্ষু সাধারণত নীল ও কেশ সুবিমল হয়, কিন্তু বড় হইয়া তাহার গায়ের রং যত ময়লা হইতে থাকে, তাহার চক্ষু ও কেশের বর্ণ অপেক্ষাকৃত তত কালো হইতে থাকে। শুধু জার্মান বলিয়া নয়, অন্যান্য জাতির পক্ষেও এ বিষয়ে এই নিয়ম।

বিভিন্ন জাতীয় পিতা মাতা হইতে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, সে সচরাচর তাহার পিতামাতার বর্ণের মধ্যবর্তী বর্ণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঘোর কৃষ্ণ কাফ্রি ও অমল ধবল ইয়ুরোপীয়ের পরস্পর সঙ্গমজাত সন্তান যদি উপর্যুপরি চারি পুরুষ ধরিয়া ইয়ুরোপীয়দের সহিত বিবাহ করিতে থাকে, তাহা হইলে তৎফলে যে সন্তান উৎপন্ন উৎপন্ন হয়, তাহার বর্ণ অমল ধবলই হয়। পক্ষান্তরে সে যদি পুরুষানুক্রমে কাফ্রি বিবাহ করে, তাহা হইলে চারি পুরুষ অন্তরে যে সন্তান উৎপন্ন হইবে, তাহার বর্ণ কাফ্রি জাতির বর্ণের ন্যায় ঘোর কৃষ্ণ হইবে। শুধু যে গাত্রবর্ণের এই রূপে পরিবর্তন হয় তাহা নহে, কেশেরও প্রকৃতি ও বর্ণ বদলাইয়া যায় ; তবে কখনো-কখনো উক্ত প্রকারের ইয়ুরোপীয় বর্ণ-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কাফ্রিজাতিসুলভ পশমি কেশ থাকিয়া যায়। আবার অনেকস্থলে এমনও ঘটে যে, উক্ত প্রকারের ঘটনায় সন্তান, পিতামাতার বর্ণের মধ্যবর্তী বর্ণ অর্জন না করিয়া কেবলমাত্র

তদুভয়ের একতরের সম্পূর্ণ বর্ণই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু দুই তিন পুরুষ পরে আবার বর্ণ পালটাইয়া লইতেও পারে। এক ইংরেজের ঔরসে এক কাফ্রি রমণীর গর্ভে যমজ উৎপন্ন হইয়াছিল। যমজের মধ্যে একটি শিশু হুবহু কাফ্রি ও আর একটি সম্পূর্ণ ইয়ুরোপীয় আকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। এক কাফ্রির ঔরসে এক ইংরেজ রমণীর গর্ভের এক সন্তান উৎপন্ন হইয়াছিল, ফল-স্বরূপ সন্তানটি মসী-কৃষ্ণবর্ণ উপঢৌকন পাইয়াছিল। আর একটি ঘটনা এই যে, একজন কাফ্রি, এক শ্বেতকায় মহিলাকে বিবাহ করিয়াছিল। তৎফলে মহিলাটির গর্ভে একটি কন্যা সন্তান জন্মিয়াছিল। কন্যাটি আকৃতি ও বর্ণে মাতারই সাদৃশ্য লাভ করিয়াছিল, তবে বিশেষের মধ্যে এই যে তাহার দক্ষিণ নিতম্ব ও উরুদেশ পিতৃবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছিল।

এই সকল ব্যাপার আলোচনা করিলে, এই স্বাভাবিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, মনুষ্যগণ স্বভাবত বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত, এবং জাতিগত বিশেষত্ব বিলুপ্ত হইবার নহে। আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, কিছুতেই জাতিগত বিশেষত্বের বিলোপ সাধন করিতে পারি না।

কিন্তু আজকাল নৃতত্ত্বজ্ঞদিগের অনুমান যে, বর্তমানকালে মানব-সাধারণের মধ্যে বিভিন্ন জাতিগত বিশেষত্ব যতই পরিস্ফুট থাকুক না কেন, প্রাথমিক মানবে তাহা আদৌ পরিস্ফুট ছিল না। প্রাথমিক অবস্থায় সকল মানবই এক জাতীয় ছিল। তাঁহারা গবেষণা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, এমন এক সময় ছিল, যখন মানব-জাতি, এখনকার মতো, পৃথিবীর সর্বত্র বিস্তৃত ছিল না। পৃথিবীর সকল জাতীয় মানবের পূর্বপুরুষেরা পৃথিবীর বিশেষ কোনো এক অঞ্চলে, একই প্রকার জলবায়ুর প্রভাবের অধীনে উৎপন্ন ও পরিবর্ধিত হইয়াছিল। কিন্তু মানব-জাতির সাধারণ জন্মস্থান সম্বন্ধে, পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে, এখনও মতভেদ দৃষ্ট হয়। তবে সাধারণত সিদ্ধান্ত এই যে, পারস্য হইতে আরম্ভ করিয়া, তিব্বত ও সাইবেরিয়ার মধ্য দিয়া মানচুরিয়া পর্যন্ত সুপ্রশস্ত মালভূমির কোনো অঞ্চলে, মায়োসিন যুগের শেষভাগে অথবা প্লায়োসিন যুগের প্রারম্ভ-কালে, সম্ভবত মানব-জাতির প্রথম বিকাশ হয়। এইরূপ কোনো এক অঞ্চলই যে মানব জাতির প্রথম বিকাশের সম্পূর্ণ উপযোগী, নৃতত্ত্বজ্ঞগণ এই ধারণাই সর্বাপেক্ষা যুক্তিসংগত বলিয়া বিবেচনা করেন।

নৃতত্ত্বজ্ঞদিগের অনুমান, প্লায়োসিন যুগের আদি মানবের শরীর লোমে আবৃত ছিল। তাহার মাথায় যে চুল ছিল, তাহার বর্ণ ছিল আলোহিত পিঙ্গল (russet brown), গাত্রচর্ম হরিদ্রাভ পিঙ্গল (yellowish brown)। কাফ্রিদের বর্ণ ঘোর কালো, কিন্তু বুশম্যান শ্রেণির কাফ্রিদের বর্ণ কিঞ্চিৎ পীতাভ। অন্যান্য কতকগুলি কাফ্রিজাতীয় মানুষের গাত্রবর্ণের পীত-প্রবণতা দৃষ্ট হয়। মোঙ্গোলীয় জাতীয় মনুষ্যেরা পীতবর্ণবিশিষ্ট। কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট জাতির বর্ণের পীত-প্রবণতা দৃষ্ট হয়, কিন্তু পীতবর্ণবিশিষ্ট জাতিকে কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট হইতে দেখা যায় না। আফ্রিকান ও অস্ট্রেলিয়ান জাতীয় শিশুর জন্মকালে গাত্রবর্ণ হরিদ্রাভ পিঙ্গল হইতে দেখা যায়। বড়ো হইয়া তাহারা কালো হইয়া পড়ে। ইহাতে অনুমান হয়, কাফ্রিদের কালো রং মানুষের স্বাভাবিক রং নহে। অত্যন্ত উষ্ম অঞ্চলে থাকে বলিয়া উহারা কালো হয়। হরিদ্রাভ পিঙ্গল বর্ণই মানুষের স্বাভাবিক বর্ণ। মানুষের বর্ণের উপর আলোকরশ্মির

একটা প্রভাব আছে। যে অনুপাতে সূর্যরশ্মি মানুষের ত্বকাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া, তদভ্যন্তরস্থ বর্ণোৎপাদক রসের সংস্পর্শে আসে, সেই অনুপাতে মানুষের শরীরের বর্ণ কালো হয়। সূর্যরশ্মির পরিমাণের হ্রাসবশত গাত্রবর্ণ শ্বেত হয়। সেই কারণে শীতপ্রধান অঞ্চলে শ্বেতকায় মনুষ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

জার্মানি ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ার অধিবাসীদিগের গাত্রচর্ম শ্বেত, তাহাদিগের চক্ষু নীল ও কেশ নির্মল। ইহার কারণ এই যে, তাহারা বৎসরের মধ্যে মোটে ১২৫০ হইতে ১৫০০ ঘণ্টা কাল সূর্য-কিরণ উপভোগ করিতে পায়। টিউটনিক জাতীয় মনুষ্যেরা মধ্য প্লাইস্টোসিন যুগ হইতে পৃথিবীর যে অঞ্চলে বাস করিয়া আসিতেছে, সে অঞ্চল কৃষ্ণবর্ণোৎপাদনের উপযোগী উত্তাপ হইতে বঞ্চিত। আলোক-রশ্মি সঞ্চিত হইয়া উত্তাপ উৎপন্ন হয়। সঞ্চিত আলোক-রশ্মি হইতে উৎপন্ন উত্তাপ যত প্রখর হইবে, ততই তাহার গাত্র চর্মের কৃষ্ণবর্ণ উৎপাদনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে ; সুতরাং যে প্রদেশ যত উষ্ম, সাধারণত সেই প্রদেশের অধিবাসীরা তত ময়লা।

মনুষ্য-শরীরে বর্ণের উপকরণ সঞ্চিত আছে, সূর্যরশ্মির সাহায্যে সেই উপকরণের দ্বারা মনুষ্য-শরীরে বর্ণ প্রতিফলিত হয়, একথা অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু জাতি-গঠন সম্পন্ন হইবার পূর্বে ওই উপকরণ সকল শরীরে একই রূপ ছিল। প্রাথমিক মানবজাতির মধ্যে জাতিগত বিশেষত্ব পরিস্ফুট ছিল না বটে, কিন্তু ইহা এক প্রকার প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, তাহাদের মধ্যে বিভিন্ন জাতিগঠনের স্বাভাবিক প্রবণতা বিদ্যমান ছিল। কালক্রমে জাতিগঠন সম্পন্ন হইয়া গেলে, বিভিন্ন জাতির বিশেষত্ব-সূচক বর্ণ ও দৈহিক গঠন স্থায়ী হইয়া পড়িয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধে সে বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা হইতে পারে না। সে বিষয়ের আলোচনার জন্য পৃথক প্রবন্ধ লিখিত হইবে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, প্লায়োসিন যুগের শেষ ভাগ হইতে, বিভিন্ন প্রকারের জাতিগত বিশেষত্ব পরিস্ফুট হইতে আরম্ভ হয়, এবং প্লাইস্টোসিন যুগের মধ্যেই, বিভিন্ন জাতিগঠন-কার্য সম্পন্ন হইয়া যায়। জাতিগঠন-কার্য সম্পন্ন হইবার পর, জাতি-সমূহের পরস্পর বর্ণ-পার্থক্য স্থায়ী হইয়া জাতিগত বিশেষত্বরূপে পরিণত হইয়াছে ; সুতরাং এখন বর্ণগত বিশেষত্ব ধরিয়া জাতি-নির্ণয় করিতে যাওয়া অসংগত বলিয়া মনে হয় না।

তবে বর্ণানুসারে জাতিভেদ বিনির্ণয়ের এক প্রধান অসুবিধা এই যে, সকল জায়গার লোকের অথবা সকলের বর্ণ সম্বন্ধে জ্ঞান একরূপ নয়। এক জনের কাছের যাহা সাদা, আর এক জনের কাছে তাহা কালো বলিয়া অনুমিত হয়। আলোক ও অন্ধকারের মধ্যে যে সম্বন্ধ, সাদায় ও কালোয় সেই সম্বন্ধ। আলোকের অভাব হইলে, তবে অন্ধকার হয়, সেইরূপ সাদার সম্পূর্ণ অভাবে কালো হয়। সকল বর্ণের মধ্যেই সাদার অস্তিত্ব আছে। যখন সাদার অস্তিত্ব একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখন আর কোনো বর্ণই থাকে না। সকল বর্ণের বিলোপ হইলে তবে কালোর উৎপত্তি হয়। কোথায় আলোর অবসান হইয়া অন্ধকার আরম্ভ হইল, তাহা বুঝা যেমন কঠিন, সাদার সম্পূর্ণ বিলোপে কালোর উৎপত্তিস্থল নিরূপণ করাও তদ্রূপ কঠিন। অন্ধকার ও আলোকের মধ্যে বস্তুগত পার্থক্য কিছুই নাই, এতদুভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য তাহা বেগ-গত। আকাশ-তরঙ্গের গতিই

আলোক। আলোক বলিয়া অন্য নূতন কিছুই নাই। সেইরূপ কালো ও সাদার মধ্যে বস্তুগত পার্থক্য নাই। আমাদের সীমাবন্ধ ইন্দ্রিয়ানুভূতি অনুসারে কালো ও সাদার মধ্যে পার্থক্য বুঝিতে হইবে। কিন্তু আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির একটা সাধারণ সীমা থাকিলেও, অনেক কারণে, সকলের ইন্দ্রিয়ানুভূতি সমান নয়। দেখা যায় অনেক কারণে উত্তাপ ও বর্ণ সম্বন্ধে অসমান অনুভূতি হয়। তন্মধ্যে একটি কারণ অভ্যাস। ইংল্যান্ড বা জার্মানির অধিবাসী ফরাসি দেশে গমন করিলে তাহার গরম বোধ হয়, কিন্তু ভারতবাসী ফরাসি দেশে গিয়া শীত বোধ করে। ইংল্যান্ড বা জার্মানির অধিবাসী, ফরাসি দেশের অধিবাসীকে বিমলিনকায় দেখে, কিন্তু ভারতবাসী তাহার বর্ণকে সুবিশুদ্ধ মনে করে। মানুষের স্বভাব এই যে, আপনার আদর্শে জগৎকে দেখিয়া থাকে। সকল অবস্থায়, সকল সময়ে, সকল ব্যক্তি, উত্তাপ ও বর্ণ সম্বন্ধে একই রূপ ধারণায় উপনীত হইতে পারে না। উত্তাপ সম্বন্ধে আদর্শ ধারণায় উপনীত হইতে হইলে, আমাদিগকে যেরূপ তাপমান-যন্ত্র ব্যবহার করিতে হয়, সেইরূপ বর্ণ সম্বন্ধে আদর্শ ধারণায় উপনীত হইতে হইলে colour scale ব্যবহার করিতে হয়।

একটি মানুষ হইতে আর একটি মানুষের সর্বতোভাবে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। একরকম দুইটি মানুষ আমরা দেখি না। আকৃতিতে, বর্ণে ও ভাবে মনুষ্যেরা সকলেই আপন আপন বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া চলে। কিছু তথাপি জাতিগত বিশেষত্ব বলিয়া একটা কিন্তু আছে। মানুষ দল না বাঁধিয়া থাকিতে পারে না, তাই জাতির সৃষ্টি হইয়া পড়ে। আমাদের শাস্ত্রে বলে 'অব্যক্তাদ্‌ব্যক্তয়ঃ সর্বে' ; ইহার অর্থ এরূপ করা যাইতে পারে,—প্রথমে সবই অব্যক্ত ছিল, সেই অব্যক্ত হইতে জগতের প্রকাশ হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য এই যে, জগতের প্রত্যেক পরমাণু, এখন যেমন আছে, সৃষ্টির পূর্বেও তদ্রূপ ছিল। একটি কম বা একটি বেশি ছিল না, কিন্তু সব ঘুমাইয়া ছিল। তাহারা একটি একটি করিয়া জাগিতে আরম্ভ করিল, আর সৃষ্টির প্রকাশ হইল। কিন্তু নিদ্রা ও জাগরণের তাৎপর্য কী? ঘুমাইয়া পড়া কাহাকে বলে? জাগিয়া উঠাই বা কী? প্রত্যেক পরমাণুর আপন আপন বিশেষত্ব আছে ; বিশেষত্বগুলি যখন সে হারাইয়া ফেলে, তখনই সে ঘুমায়। বিশেষত্ব সকলের পুনঃপ্রকাশই তাহার জাগরণ। বিশেষত্বগুলি সে কোথায় হারাইয়া ফেলে? হারাইয়া ফেলিলে তাহার অবস্থা কী হয়? বিশেষত্বই বস্তুর বস্তুত্ব। বিশেষত্বহীন হইলে বস্তুর আর কিছুই থাকে না। এমন একটা কিছু আছে, যাহাতে সকলই বিলীন হইয়া যায়। তখন আর বস্তুকে চিনিতে পারা যায় না। বস্তু যখন জাগে, আপন আপন বিশেষত্ব লইয়া পুনরুত্থিত হয়।

প্রত্যেক জীবের ব্যক্তিগত বিশেষত্ব আছে। তাহাকে তাহার ব্যক্তিত্বও বলা যাইতে পারে। প্রলয়-কালে জীব তাহার ব্যক্তিত্ব হারাইয়া ঘুমাইয়া পড়ে ; সৃষ্টিকালে আবার সে তাহার ব্যক্তিত্ব সংগ্রহ করিয়া উত্থিত হয়।

প্লায়োসিন-যুগে যখন আদিম মানুষের আবির্ভাব হয়, সে তখন তাহার সমস্ত বিশেষত্ব সংগ্রহ করে নাই। তখন তাহার যে অবস্থা, তাহাকে সহজ অবস্থা বলা যায়। ক্রমশ যতই সে তাহার আপন বিশেষত্ব সকল সংগ্রহ করিতে লাগিল, ততই তাহার ব্যক্তিত্ব ফুটিতে লাগিল।

বস্তুর স্বভাব এই যে, সে গোড়া হইতে দল বাঁধিবার জন্য ব্যস্ত হয়। ইহাই জাতি-গঠনের মূল কারণ। দল বাঁধার অর্থ পরস্পর আদান-প্রদান। এই আদান-প্রদান হইতে হইতেই ক্রমশ জাতির গঠন হয়। যদি আদান-প্রদান না হইত, জাতি-গঠন হইতে পারিত না। সকলেই পরস্পর স্বতন্ত্র থাকিত।

জীব তাহার সমস্ত ব্যক্তিত্ব ব্রহ্মসাগরে হারাইয়া ফেলিয়া, আপনহারা হয়, কিন্তু তাহার ব্যক্তিত্বের উপাদান অপর জীবের সহিত আদান-প্রদান করিয়া জাতি-গঠন করিতে পারে।

প্রত্যেক মানুষের আকৃতিগত ও বর্ণগত বিশেষত্ব আছে, কিন্তু সে অপর মানুষের সহিত তাহা মিশাইয়া দল বাঁধিবার চেষ্টা করে। তাই আমরা যে কোনো জাতির মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির আকৃতিগত ও বর্ণগত বিশেষত্ব যেমন দেখিতে পাই, তেমনি কতকগুলি জাতির মধ্যে প্রত্যেক জাতির জাতীয় আকৃতি ও বর্ণগত বিশেষত্বও দেখিয়া থাকি।

ভারতবর্ষ ● শ্রাবণ ১৩২৯ (১৯২২ খ্রিস্টাব্দ)



বাংলার ইতিহাসের কয়েকটি গোড়ার কথা

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, এম-এ

বাংলার ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে সকলের আগেই স্মরণ রাখা উচিত যে, ইতিহাসের প্রথম যুগে আমাদের দেশটি একটিমাত্র জাতির বাসভূমি ছিল না এবং একটি মাত্র নামেও পরিচিত ছিল না। আধুনিক বাংলা দেশ তখন বহুখণ্ডে বিভক্ত ছিল এবং একেক খণ্ডে একেকটি বিশেষ 'জন' বা tribe বাস করত। একেকটি জনের দ্বারা অধ্যুষিত ভূখণ্ডকে বলা হতো একেকটি 'জনপদ' এবং ওই জনপদগুলি অধিবাসী জনের নামেই অভিহিত হতো।

বাংলার ইতিহাসের যবনিকা-উদ্‌ঘাটনের সঙ্গে সঙ্গেই দেখতে পাই, এ দেশে অন্যূন ছটি জনপদে ছটি স্বতন্ত্র জন বাস করছে। প্রথমেই তাদের নাম এবং বাসভূমির একটু পরিচয় দেওয়া যাক। এই জনগুলির মধ্যে সকলের আগেই নাম করতে হয় অঙ্গাদের। বর্তমান মুঙ্গের এবং ভাগলপুর জেলায় ছিল তাদের বাস। কাজেই অঙ্গ-জনপদ বলতে ওই দুটি জেলাকেই বোঝায়। বীরশ্রেষ্ঠ কর্ণের রাজ্য হিসেবে এই অঙ্গ-জনপদের সঙ্গে আমাদের সকলেরই পরিচয় আছে। আর, অঙ্গাদের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত হচ্ছে বঙ্গারা। এই বঙ্গ-জনের নাম থেকেই আমাদের দেশের নামটি উৎপন্ন হয়েছে, কিন্তু আদিকালে বঙ্গ-জনপদ আধুনিক বাংলা দেশের দক্ষিণ অংশেই নিবদ্ধ ছিল। পূর্বে ব্রহ্মপুত্র এবং পশ্চিমে ভাগীরথী ছিল বঙ্গ-জনপদের সীমা। কোনো সময়ে ভাগীরথীর পশ্চিমতীরবর্তী তাম্রলিপ্তিও (বর্তমান মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত তমলুক) বঙ্গারাজ্যের অন্তর্গত ছিল। পরবর্তীকালে ব্রহ্মপুত্রের পূর্বে বঙ্গ-জনপদ বিস্তৃতিলাভ করেছিল এবং বর্তমান ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুর এবং সুবর্ণগ্রাম বঙ্গের কেন্দ্র বলে গণ্য হতো। অঙ্গ ও বঙ্গের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত তৃতীয় জনের নাম হচ্ছে কলিঙ্গ। এই কলিঙ্গ

জনপদ বঙ্গ-জনপদের পশ্চিম সীমা থেকে বর্তমান উড়িষ্যার কতকাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পরবর্তীকালে শুধু বৈতরণী নদীর দক্ষিণাংশই কলিঙ্গ নামে পরিচিত হতো। বর্তমান রাঢ়দেশে তখন দুটি জনপদে বিভক্ত ছিল। দক্ষিণ রাঢ়ের অধিবাসী ছিল সুহ্মরা। সমুদ্রতীরবর্তী সুবিখ্যাত তাম্রলিপ্তি-নগরী এই সুহ্মী জনপদেরই দক্ষিণাংশে অবস্থিত ছিল। রাঢ়ের উত্তরাংশের নাম ছিল ব্রহ্ম-জনপদ। (Ind. Hist. Quart, Sept, 1932; pp. 521-529) এই ব্রহ্ম-জাতির স্পষ্ট উল্লেখ পাই দশম শতাব্দীর বিখ্যাত কবি রাজশেখরের 'কাব্য মীমাংসা' নামক গ্রন্থে। কোনো কোনো পুরাণে এবং ধোয়ীর পবনদূত নামক কাব্যেও এই ব্রহ্মদের উল্লেখ আছে। মহাভারতে প্রসুহ্ম নামক জনের উল্লেখ আছে। এই প্রসুহ্ম সম্ভবত ব্রহ্ম জাতি থেকে অভিন্ন। যদি তাই হয়, তবে বলতে হবে ব্রহ্মরা সুহ্ম জনেরই একটি শাখাবিশেষ। প্রাচীন বংলার ষষ্ঠ জনের নাম হচ্ছে পুণ্ড্র। পণ্ডিতেরা মনে করেন পুণ্ড্র-জনপদ অবস্থিত ছিল উত্তর বঙ্গে, বর্তমান রাজশাহি বিভাগে। কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক (সিল্‌ভ্যাঁ লেভি) প্রাচীন উড্রজাতিকে পুণ্ড্রদের সগোত্র বলেই অভিমত প্রকাশ করেছেন।

মহাভারতের একটি উপাখ্যান থেকে জানা যায়, অসুররাজ বলির মহিষী সুদেষ্মার গর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম নামে পাঁচ পুত্রের জন্ম হয় এবং তাদের নামেই পূর্ব ভারতের ওই পাঁচটি জনপদ অভিহিত হয়। এই উপাখ্যানটি থেকে এই অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, অঙ্গ বঙ্গ প্রভৃতি পাঁচটি জন (tribe) কোনো কোনো বিষয়ে পরস্পর পৃথক হলেও এরা মূলে কোনো একই মহাজাতির (race) বিভিন্ন শাখা মাত্র। এই শাখা জাতিগুলি কোন্ মহাজাতির অন্তর্ভুক্ত সে-বিষয়ে যথাস্থানে আলোচনা করব। এখানে একথা বলা প্রয়োজন যে, খুব সম্ভবত ব্রহ্মরা সুহ্মদের ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি বা প্রশাখা বলে গণ্য হতো বলেই পূর্বোক্ত সুদেষ্মার উপাখ্যানে তাদের নামোল্লেখ নেই।

এ স্থলে একথা বলা প্রয়োজন যে, এই পাঁচটি বা ছটি জন ছাড়া আর কোনো জাতি প্রাচীন বাংলায় বাস করত না এমন মনে করার হেতু নেই। বরং আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন এদেশে বাস করত তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে তাদের উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। এখানে শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, উড্র জাতিকেও প্রাচীন বাংলার অধিবাসী জনবিশেষ বলে গণ্য করা সংগত। আর, কর্বট নামে আরেকটি ছোটো জাতি রাঢ়ের কোনও অংশে বাস করত বলে মনে করার হেতু আছে। কাজেই একথাও সহজেই অনুমান করা যায় যে, প্রাচীন বাংলায় এই সাত-আটটি জনপদ ছাড়া আরও অপেক্ষাকৃত অখ্যাত-জনপদ অবস্থিত ছিল।

আমরা পশ্চিম, দক্ষিণ এবং উত্তর বঙ্গের প্রধান জন ও জনপদগুলির উল্লেখ করলুম। কিন্তু পূর্ববঙ্গের অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার পূর্বতীরবর্তী প্রদেশের জনপদ সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ করিনি। তার কারণ, বাংলার ইতিহাসের আদি যুগে এই ভূখণ্ডের অধিবাসীদের সম্বন্ধে কোনো তথ্যই আজ পর্যন্ত জানা যায়নি। কিন্তু পরবর্তীকালে এই প্রদেশে দুটি জনপদের কথা জানা যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় দেখিয়েছেন, বর্তমান শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরা জেলা তৎকালে সমতট নামে পরিচিত ছিল। এই সমতটের দক্ষিণে অবস্থিত বর্তমান নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম জেলা নিয়ে যে ভূখণ্ড, তার প্রাচীন নাম ছিল হরিকেল, একথা মনে করার হেতু আছে। যথাসময়ে তা দেখাতে চেষ্টা করব।

প্রাচীন বাংলার এই জনদের সম্বন্ধে বৈদিক আর্যসাহিত্যে যে সমস্ত উল্লেখ আছে তার থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, বৈদিক আর্যরা এই জনদের নিরতিশয় অবজ্ঞার চোখেই দেখত। অথর্ববেদে (৫/২২/১৪) অঙ্গ এবং মগধ জনপদ দুটি তৎকালীন আর্যসভ্যতা এবং আর্যদেশের বহির্ভুক্ত বলেই গণ্য হয়েছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পুণ্ড্র জাতিকে অনার্য দস্যু বলে গণ্য করা হয়েছে। ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গজাতির প্রথম উল্লেখ পাই। সেখানে বঙ্গ, মগধ ও চেরপাদদের পক্ষী (বয়াংসি) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই উক্তির প্রকৃত তাৎপর্য কী সে বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া যায় না। বোধায়নের ধর্মসূত্রে (১/২/১৪) পুণ্ড্র এবং বঙ্গ কলিঙ্গদের দেশে গেলে পুনস্তোম বা সর্বপৃষ্ঠা নামক প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া, কলিঙ্গ-জনপদে যাবার দরুন যে পাপ হয় তার জন্যে একটি বিশেষ প্রায়শ্চিত্তের (বৈশ্বানরং হবিঃ) ব্যবস্থা আছে বোধায়নের ধর্মসূত্রে (১/২/১৫)। কিন্তু ওই ধর্মসূত্রেই অঙ্গদের সংকীর্ণযোনি অর্থাৎ মিশ্রজাতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে (১/২/১৩)। অপর একটি স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত শ্লোকে বলা হয়েছে, তীর্থযাত্রা বিনা অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গ জনপদে গেলে পুনঃ-সংস্কার গ্রহণ করা কর্তব্য। পূর্বোক্ত মহাভারতের গল্পটিতেও অঙ্গ, বঙ্গ প্রভৃতিকে অসুর-বংশোৎপন্ন বলেই গণ্য করা হয়েছে।

এই সমস্ত প্রমাণের দ্বারা একথা নিঃসংশয়েই প্রমাণিত হয় যে, অঙ্গ, বঙ্গ প্রভৃতি বাংলার প্রাচীন অধিবাসীরা বৈদিক আর্যসমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। পূর্বেই বলা হয়েছে, প্রাচীন বাংলার এই জাতিগুলিকে কোনো একটি বিশেষ মহাজাতির (race) অন্তর্গত বিভিন্ন শাখাজাতি বলে মনে করার হেতু আছে। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেও এই জাতিগুলিকে প্রায় সর্বদাই এমনভাবে এক সঙ্গে উল্লেখ করা হয়ে থাকে যার থেকে সহজেই অনুমিত হয়, এই জাতিগুলি পরস্পর জ্ঞাতিত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিল। পাণিনি ৪/১/১৭০ এবং ২/৪/৬২ বার্তিকসূত্র দ্রষ্টব্য। যাহোক, বাংলার ইতিহাসের সর্বপ্রথম গুরুতর সমস্যা হচ্ছে—অঙ্গ-বঙ্গ প্রভৃতি প্রাচীন জনগুলি কোন্ মহাজাতির অন্তর্গত এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া। নৃতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা দেহের সংগঠন-বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে এই সমস্যার বহু বিভিন্ন রকমের সমাধান করেছেন। কিন্তু ভারতীয় জাতিসমূহের মধ্যে সংমিশ্রণ-ক্রিয়া এত প্রচুর পরিমাণে সংগঠিত হয়েছে যে, দেহের সংগঠন-বৈশিষ্ট্যকে অবলম্বন করে এ প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। তাই আরেক শ্রেণির পণ্ডিতরা আধুনিক বাংলা প্রভৃতি কথিত ভাষার নিপুণ বিশ্লেষণের দ্বারা এ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মতে দেহ বৈশিষ্ট্যের চেয়ে ভাষা বৈশিষ্ট্যই এক্ষেত্রে অধিকতর নির্ভর-যোগ্য। "Racial conditions have become so complicated that it is no longer possible to analyse their constituents. Language alone has preserved a record which would otherwise have been lost.—Rapson, Cambridge History of India, Vol. I. p. 41."

ভারতীয় ভাষাসমূহের মুলপ্রকৃতির আলোচনা করলে বর্তমান সাঁওতাল পরগনা এবং ছোটোনাগপুরে কোল বা মুন্ডাজাতীয় যে ভাষা কথিত হয় তাকে আর্য এবং দ্রাবিড়ি থেকে বিভিন্ন একটি স্বতন্ত্র শ্রেণি বলে গণ্য করতে হয়। ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে এই ভাষাই ভারতের প্রাচীনতম ভাষা। দ্রাবিড়ি ভাষাসমূহের চেয়েও এ ভাষা প্রাচীনতর। এই ভাষা

যে শুধু সাঁওতাল পরগনা এবং ছোটোনাগপুরেই সীমাবদ্ধ তা নয়। পঞ্জাব থেকে বাঙ্গালা দেশ পর্যন্ত সমস্ত উত্তর ভারতে যে-সমস্ত মিশ্র ভাষা প্রচলিত আছে তাদের অনেকগুলির মূলেই ভাষাতাত্ত্বিকরা এই মুন্ডাজাতীয় ভাষার ভিত্তি আবিষ্কার করেছেন। আসামের খাসিয়া পর্বতে, উত্তর ও দক্ষিণ ব্রহ্মে, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে এবং মালয় উপদ্বীপে মোন-খ্‌মের জাতীয় যে-সমস্ত ভাষা এখনও প্রচলিত আছে পণ্ডিতদের বিবেচনায় এই ভাষাগুলিও ভারতীয় মুন্ডা বা কোল-জাতীয় ভাষার সগোত্র। তাছাড়া, বর্তমান আনাম ও কাম্বোডিয়াতেও এই শ্রেণির ভাষা প্রচলিত আছে। তার থেকেই অনুমান করা হয়, এক সময়ে (ভারতীয় ইতিহাসের নিওলিথিক বা নব্যপ্রস্তর যুগে) সুদূর ইন্দোচিন থেকে সমগ্র ভূখণ্ডে একই ভাষা প্রচলিত ছিল। এই ভাষাগুলিকে ভাষাতাত্ত্বিকরা অস্ট্রিক (Austric) এই সাধারণ নামে অভিহিত করেছেন (ওই, পৃঃ ৪৮-৪৯ ; ৬১৩)।

অস্ট্রিক ভাষাগুলির এই ভৌগোলিক সংস্থানের বিষয় বিবেচনা করলে এ অনুমান করা অসংগত নয় যে, অঙ্গ-বঙ্গ প্রভৃতি বাংলার প্রাচীন অধিবাসীরা এই অস্ট্রিকভাষী মহাজাতিরই বিভিন্ন শাখা মাত্র। এই সিদ্ধান্তের পক্ষে যে সমস্ত যুক্তি আছে এস্থলে সংক্ষেপে তার আলোচনা করব। পূর্বেই বলেছি দৈহিক গঠন-বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে ভারতীয় জনসমূহের জাতি (race) নির্ণয় করা দুষ্কর বা একেবারেই অসম্ভব। অধিকাংশ নৃতাত্ত্বিকই স্বীকার করেন, আধুনিক মুন্ডাভাষী জাতিদের এবং দ্রাবিড়িভাষী জাতিদেব মধ্যে দৈহিক গঠন বিষয়ে কোনোই পার্থক্য নেই। বস্তুত দ্রাবিড় জাতিদের আসল দৈহিক প্রকৃতি কী ছিল তাই এখন সংশয়ের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে (ওই, পৃঃ ৪১, ৪২, ৮৫ পাদটীকা দ্রষ্টব্য)।

বৈদিক যুগের আর্যরাও যে অস্ট্রিক বা মুন্ডাজাতীয় জনসমূহের বিষয় অবগত ছিলেন, সে সম্বন্ধেও কিছু কিছু প্রমাণ আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে অন্ধ্র, পুণ্ড্র, শবর প্রভৃতি কয়েকটি জাতিকে দস্যু বলে অভিহিত করা হয়েছে। আমাদের সাধারণ ধারণা এই যে, বৈদিক আর্যরা শুধু অনার্য দ্রাবিড়দেরকেই দস্যু নামে অভিহিত করত। কিন্তু একথা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। তারা আর্যেতর শত্রুজাতিকেই দস্যু বলত। তার প্রমাণ শবর জাতি। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উক্ত অন্ধ্ররা সম্ভবত দ্রাবিড়-জাতীয়। কিন্তু শবররা দ্রাবিড় জাতীয় নয়, এই হচ্ছে পণ্ডিতদের অভিমত। প্রাচীন শবরদের বংশধরেরা বর্তমানকালেও শবর নামেই পরিচিত। বর্তমান উড়িষ্যা এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির সীমান্ত প্রদেশে তাদের বাস এবং তাদের ভাষা আদিতে মুন্ডা বা অস্ট্রিক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিল তার প্রমাণ এখনও তাদের কথিত ভাষায় বিদ্যমান আছে (ওই, পৃঃ ১১৭, ১২৪)। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উল্লিখিত শবররা যদি অস্ট্রিক-জাতীয় হয়, তাহলে তাদের সঙ্গে উল্লিখিত পুণ্ড্ররাও অষ্ট্রিক-জাতীয় হওয়া বিচিত্র নয়।

আর্যরা যখন ক্রমে ক্রমে সপ্তসিন্ধু থেকে লৌহিত্য পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়ল তখন তারা স্বভাবতই এমন সব গাছপালা, ফলফুল, জীবজন্তু প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে লাগল যা তারা আগে কখনও দেখেনি এবং কাজেই যার পরিচয়-সূচক কোনো নাম আর্য ভাষায় ছিল না। অথচ তাদের একেকটি নাম তো চাই। কাজেই আদিম অধিবাসীদের দেওয়া নামগুলোই গ্রহণ করতে বাধ্য হল। বৈদিক আর্যভাষা এবং পরবর্তী

সংস্কৃত ভাষায় এমন বহু শব্দের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে যা আর্যরা মুন্ডা বা অস্ট্রিক-জাতীয় ভাষা থেকে ধার করেছিল। ওই শব্দগুলির বিশদ আলোচনা করলে বর্তমান বাংলা দেশ ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থানের অধিবাসীদের জাতি নির্ণয় করা সহজ হয় এবং তাদের আচার-ব্যবহার, ধর্মবিশ্বাস প্রভৃতি বহু বিষয়ে কিছু কিছু তথ্য জানা যায়। এই প্রণালীর ভাষাতত্ত্বের আলোচনার দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, অঙ্গ-বঙ্গ প্রভৃতি বাংলার প্রাচীন অধিবাসীরা খুব সম্ভবত অস্ট্রিকভাষী মহাজাতিরই কয়েকটি শাখা। এ নূতন পদ্ধতির ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে যাঁরা সাফল্যের সঙ্গে কাজ করেছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন বিখ্যাত ফরাসি পণ্ডিত অধ্যাপক Jean Przyluski। তাঁর অনুসরণ করে অন্যান্য পণ্ডিতরা এ পথে আরও অগ্রসর হয়েছেন। এস্থলে আমরা তাঁদের সিদ্ধান্তগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করেই বর্তমান প্রসঙ্গ সমাপ্ত করব।

উক্ত প্রকার ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার দ্বারা পণ্ডিতরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, খুব সম্ভবত কলা, নারিকেল, জাম, লাউ, বেগুন, নেবু প্রভৃতি ফলের নাম প্রথমে আর্যভাষায় ছিল না। কারণ ও সমস্ত ফলের সঙ্গে আর্যদের পরিচয়ই ছিল না। পরে ওগুলোর সঙ্গে যখন তাদের পরিচয় ঘটল তখন তারা ওদের নামগুলোও স্থানীয় আদিম অধিবাসীদের কাছ থেকেই ধার করল। পণ্ডিতদের মতে কদলী, নারিকেল, জম্বু, অলাবু, বাতিঙ্গান, নিম্বু প্রভৃতি শব্দ অস্ট্রিক ভাষার শব্দ থেকে উৎপন্ন। জীবজন্তুর মধ্যে গজ, মাতঙ্গ, গন্ডার, ময়ূর, কপোত, কাক প্রভৃতির নামও মূলে অষ্ট্রিক-ভাষাজাত বলে তাঁদের বিশ্বাস। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় মনে করেন, আধুনিক কালেও কুকুরকে ডাকবার জন্যে কিংবা লেলিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে যে তু-তু বা ছু-ছু শব্দ ব্যবহৃত হয় তাও কুকুরবাচক অস্ট্রিক শব্দ থেকেই উৎপন্ন। জৈন আচারাঙ্গ সূত্র থেকে জানা যায়, মহাবীর যখন রাঢ়দেশে এসেছিলেন তখন স্থানীয় লোকেরা 'ছুচ্ছু' শব্দ করে তাঁর প্রতি কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল। তার থেকে প্রবোধবাবু অনুমান করেন, রাঢ়ের তৎকালীন অধিবাসীরা খুব সম্ভব অষ্ট্রিকভাষী মুন্ডা বা কোলজাতীয় ছিল। আজকালও রাঢ় অঞ্চলে অনেক কোলজাতীয় লোক বাস করে। তাছাড়া, গুড়, তণ্ডুল, তাম্বুল, কম্বল, কার্পাস প্রভৃতিও অস্ট্রিক ভাষা থেকে ধার করা শব্দ বলেই অনুমান হয়। শুধু যে শব্দই ধার করা হয়েছিল তা নয়। ওই সকল দ্রব্যের ব্যবহারও ধার করা হয়েছিল। ওই সকল দ্রব্যের কোনো কোনোটা যে অস্ট্রিক-ভাষী ইন্দোচিন কিংবা দক্ষিণ এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জ থেকে আমদানি করা হয়েছিল এমন মনে করার হেতুও আছে। ওই সমস্ত আমদানি করা জিনিসের মধ্যে কামরাঙা (কর্মরঙ্গ) এবং সুপারি এই দুটির উল্লেখ করাই এস্থলে যথেষ্ট।

পূর্বেই বলা হয়েছে, বাংলার ইতিহাসের প্রথম যুগে যে সমস্ত অধিবাসীরা পূর্বভারতে তথা বাংলা দেশে বাস করত তাদের নাম অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম ইত্যাদি। বৈদিক আর্যরাও ওসব নামেই ওই জাতিগুলিকে অভিহিত করত। কারণ বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্যেই আমরা ওসব নামের প্রথম উল্লেখ পাই। অঙ্গ বঙ্গ প্রভৃতি যেসব নামে আর্যরা ওই জাতিগুলিকে অভিহিত করেছে সে নামগুলি কোন্ ভাষার শব্দ, এ প্রশ্ন সহজেই মনে জাগে। ওই নামগুলি আর্যদের দেওয়া নাম নয়, পরন্তু ওই অন আর্য জাতিদের নিজেদেরই দেওয়া নাম, একথাও সহজেই অনুমিত হয়। সুতরাং অঙ্গ বঙ্গ ইত্যাদি নামগুলিকে

আর্য শব্দ বলেই ধরে নেওয়া সংগত। খ্যাতনামা ফরাসি প্রত্নতাত্ত্বিক অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভি মনে করেন অঙ্গা-বঙ্গা, কলিঙ্গা-ত্রিলিঙ্গা, উড্র-পুণ্ড্র, পুলিন্দ-কুলিন্দ, কোসল-তোসল প্রভৃতি নাম মূলত অস্ট্রিক ভাষাজাত শব্দ। অস্ট্রিক ভাষার ব্যুৎপত্তির নিয়ম ওই শব্দগুলি সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। সুহ্ম এবং ব্রহ্ম, এই শব্দদ্বয়কেও সম্ভবত ওই নিয়ম অনুসারে অস্ট্রিক শব্দ বলে গণ্য করা যেতে পারে। পূর্বেই বলেছি বর্তমান রাঢ়ের দক্ষিণাংশ সুহ্মদের এবং উত্তরাংশ ব্রহ্মদের বাসভূমি ছিল, এরূপ মনে করার হেতু আছে। গ্রিক ভৌগোলিক টলেমির গ্রন্থে Brammakowra নামে একটি নগরের উল্লেখ আছে। অধ্যাপক Jean Przyluski দেখিয়েছেন, ওই নামটির যথার্থ রূপ হচ্ছে ব্রহ্মকুর বা বহ্মপুর (কুর=পুর) এবং তিনি বর্তমান ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত প্রোমনগরের সঙ্গে উক্ত ব্রহ্মপুরের কোনো সম্বন্ধ থাকতেও পারে এমন ইঙ্গিত করেছেন। ভামো শহরের নামটিও এই প্রসঙ্গে বিবেচ্য। তাঁর এই অনুমান যদি সত্য হয় তাহলে উত্তর রাঢ়ের অধিবাসী প্রাচীন ব্রহ্মজাতিব সঙ্গে টলেমির উক্ত বহ্মপুরের এবং বর্তমান দক্ষিণ ব্রহ্মদেশের প্রোম (বা ভামো) নগরের কোনো প্রকার সম্বন্ধ থাকা বিচিত্র নয়। যাহোক, অধ্যাপক Jean Przyluski অঙ্গা-বঙ্গা এবং উড্র-পুণ্ড্র শব্দের অস্ট্রিক ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু কুলিন্দ-পুলিন্দ, কোসল-তোসল, কলিঙ্গা-ত্রিলিঙ্গা প্রভৃতি শব্দ অস্ট্রিক-ভাষাজাত হওয়া সম্ভব বলেই তিনিও মনে করেন।

অঙ্গা-বঙ্গা প্রভৃতি জাতিবাচক নাম এবং কদলী, তাম্বুল কম্বল প্রভৃতি শব্দের ব্যুৎপত্তি থেকে অনুমান হয়, বাংলার আদিম অধিবাসীরা ছিল অস্ট্রিক-ভাষী মহাজাতিরই কয়েকটি শাখা। কাজেই ভারতীয় আর্য-সাহিত্যে অঙ্গা-বঙ্গা প্রভৃতি জাতির প্রতি যে অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে তাতে বিস্মিত হবার কারণ নেই। বাংলার প্রাচীন অধিবাসীদের অস্ট্রিক-ভাষী জাতিভুক্ত বলে মনে করার পক্ষে আরও যেসব যুক্তি আছে, এস্থলে তার কয়েকটি সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা প্রয়োজন। বাংলায় আমরা বিংশতি অর্থে 'কুড়ি' শব্দ ব্যবহার করে থাকি। আর্য বা সংস্কৃত ভাষায় 'কুড়ি' শব্দের অনুরূপ কোনো শব্দ নেই। পক্ষান্তরে কোল বা মুন্ডা ভাষায় উক্ত অর্থে 'কুড়ি' শব্দটি ব্যবহার হয়ে থাকে। মূলত এ শব্দটির অর্থ হচ্ছে মানুষ এবং মানুষের অঙ্গুলিসংখ্যা বিশ বলে কুড়ি শব্দটিও ওই অর্থেই ব্যবহৃত হচ্ছে। আবার, সাঁওতালি ভাষায় গন্ড বা গোন্ড শব্দের অর্থ চার এবং পন বা পোন শব্দের অর্থ হচ্ছে আশি। এই শব্দ-দুটি থেকেই আমাদের গন্ডা এবং পন শব্দের উৎপত্তি হয়েছে, এমন মনে করার হেতু আছে। শুধু তাই নয়। চার কড়িতে এক গন্ডা, পাঁচ গন্ডায় এক কুড়ি, চার কুড়িতে এক পন এবং এক কুড়ি, দুই কুড়ি, তিন কুড়ি ইত্যাদি ধরনের যে গণনা প্রণালী আমাদের দেশে প্রচলিত আছে তাও আসলে সাঁওতাল, কোল বা মুন্ডাদেরই গণনা পদ্ধতি বলে পণ্ডিতরা মনে করেন। আর, সাঁওতাল, কোল বা মুন্ডারা যে অস্ট্রিকভাষী জাতিরই শাখা সেকথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

আর্যরা যখন এদেশে আসে তখন তারা তিরধনুর ব্যবহার নিশ্চয়ই জানত। কিন্তু তথাপি তির বাচক 'বাণ' শব্দটি তারা অস্ট্রিকভাষা থেকে ধার করেছে, একথা মনে করার কারণ আছে। আর্যরা যে তির বা শর ব্যবহার করত তা ছিল ধাতুনির্মিত। কিন্তু অস্ট্রিক-ভাষী ভারতীয় অন্-আর্যদের বাণ ছিল বাঁশের তৈরি। তাই মনে হয় বাঁশের তির অর্থেই

বাণ শব্দটি সংস্কৃত ভাষায় গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু কালক্রমে তির এবং বাণ শব্দ একার্থবাচক হয়ে গেল।

'লাঙ্গল' শব্দটিও ওই রূপেই অস্ট্রিক ভাষা থেকে আর্য ভাষায় গৃহীত হয়েছে। এ শব্দটি ঋগ্বেদেও ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় কিংবা অভারতীয় কোনো আর্য ভাষাতেই এ শব্দটির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করা সম্ভব নয়। অভারতীয় কোনো আর্য ভাষাতেই 'লাঙ্গল' কথার অনুরূপ কোনো শব্দ নেই। অথচ অস্ট্রিক ভাষাগুলিতে অনুরূপ বহু শব্দ আছে এবং ওসব ভাষার নিয়ম অনুসারে ও-শব্দটির ব্যুৎপত্তি করাও সহজ-সাধ্য। কাজেই অনুমান হয় ও-শব্দটি ঋগ্বেদের যুগেই অস্ট্রিক ভাষা থেকে আর্য ভাষায় গৃহীত হয়েছিল। শুধু তাই নয়। লাঙ্গাল, লাঙ্গুল, লগুড় এবং লিঙ্গ শব্দ মূলত একার্থবাচক বলেই ভাষাতাত্ত্বিক Jean Przyluski সিদ্ধান্ত করেছেন এবং তাঁর মতে ওই সব-কটি শব্দই অস্ট্রিক ভাষা থেকে নেওয়া। তিনি আরও অনুমান করেন লাঙ্গল শব্দের দ্বারা পূর্বে যে কৃষি-যন্ত্র বোঝাত তা আধুনিক লাঙ্গালের অনুরূপ ছিল না। লাঙ্গল শব্দের দ্বারা পূর্বে তীক্ষ্ণাগ্র দণ্ড (বা লগুড়) বোঝাত এবং তাই কৃষির নিমিত্ত খনন-যন্ত্র রূপে ব্যবহৃত হত এবং সেজন্যই লাঙ্গল, লাঙ্গুল এবং লিঙ্গ শব্দ একার্থে ব্যবহৃত হওয়া সম্ভব হয়েছিল।

ভারতে আদিম অস্ট্রিক-জাতীয় অধিবাসীদের ভাষা থেকে 'লিঙ্গ' শব্দটি আর্য ভাষায় গৃহীত হয়েছিল, এ সিদ্ধান্তটি যদি সত্য হয় তাহলে লিঙ্গ-পূজার প্রথাও ওই আদিম অধিবাসীদের কাছ থেকেই হিন্দুসমাজে প্রবর্তিত হয়েছে, এই অনুমান করতে হয়। পূর্বোক্ত ফরাসি ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতও এই সিদ্ধান্তের পক্ষেই মত দিয়েছেন। Dr. J. H. Huttonও অনুমান করেন, লিঙ্গপূজা প্রভৃতি তান্ত্রিক ধর্ম সম্ভবত অস্ট্রিক জগৎ থেকেই ভারতে প্রবর্তিত হয়েছিল। যদি এ অনুমান সত্য হয় তাহলে বলতে হবে, বৈদিক আর্যরা শিশ্নদেবা বলে যে-জাতিদের নির্দেশ করেছে তারা ভারতের আদিম মুন্ডা বা অস্ট্রিক-ভাষী ছাড়া আর কেউ নয়। আসাম, বাংলা ও উড়িষ্যায় যে তান্ত্রিক ধর্মের প্রাধান্য দেখা যায় তার মূলে অস্ট্রিক-ভাষী ভারতীয় আদিম অধিবাসীদেরই প্রভাব থাকা অসম্ভব নয়। ডক্টর প্রাণনাথ ইদানীং দেখাতে চেষ্টা করেছেন, মহেন-জো-দাড়োর প্রাচীন সভ্যতার মধ্যেই তান্ত্রিক ধর্মের প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায়। যদি তাঁর একথা সত্য হয় তাহলে পূর্বভারতের অস্ট্রিক-ভাষী তান্ত্রিক অধিবাসীদের সঙ্গে মহেন-জো-দাড়োর সভ্যতার কোনোপ্রকার সম্বন্ধ ছিল এই অনুমানও করতে হয়। কিন্তু আমাদের প্রমাণ ও অনুমান ক্রমে কল্পনায় পরিণত হচ্ছে। সুতরাং এখানেই আমাদের বিরত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু তাহলেও বলে রাখা দরকার যে, এ কল্পনা একেবারেই নিছক কল্পনা নয়। কারণ অধ্যাপক Przyluskiও বলেছেন—"Nothing prevents us to hold that the degenerated Santals are the descendants of the people who built Harappa and Mohen-jo-Daro" (Ind. Hist. Quart. Dec. 1931, p. 737)। আর এই সাঁওতালরা যে বাংলার আদিম অধিবাসী অঙ্গ বঙ্গ প্রভৃতি জাতি সমূহের সঙ্গে জ্ঞাতিত্বসূত্রে সম্বন্ধ, একথা মনে করবার পক্ষে কী হেতু আছে তা পূর্বেই বলা হয়েছে।

পরিশেষে আর একটিমাত্র প্রশ্নের উত্থাপন করেই আমাদের প্রবন্ধ সমাপ্ত করব। আমরা দেখেছি, অঙ্গ বঙ্গ প্রভৃতি বাংলার প্রাচীনতম অধিবাসীরা খুব সম্ভবত অস্ট্রিক-ভাষী

মহাজাতির শাখা বিশেষ, আর্যরা তাদের অবজ্ঞার চোখেই দেখত এবং শত্রু বলেই মনে করত। তাদের ধর্মও ছিল আর্যবিরোধী। সম্ভবত তারা ছিল লিঙ্গ-উপাসক (শিশ্নদেবা) এবং এ জন্যও বৈদিক আর্যরা তাদের অবজ্ঞা করত। আর, বর্তমান প্রসঙ্গের পক্ষে সব চেয়ে প্রয়োজনীয় কথা হচ্ছে এই যে তারা ছিল অনার্যভাষী। তাদের ভাষা ছিল বর্তমান মুন্ডা বা কোল-জাতীয় এবং অস্ট্রিক ভাষার অন্তর্গত। কিন্তু তাদের ভাষাকে আর্যরা কী মনে করত এবং কী নামে অভিহিত করত সে বিষয়ে স্বভাবতই ঔৎসুক্য হয়। এ বিষয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতরা এখনও পর্যন্ত কেউ কিছু বলেননি। কিন্তু এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধান করা আবশ্যক। এ স্থলে আমি একটি মাত্র বিষয়ের প্রতি একটু ইঙ্গিত করেই ক্ষান্ত হব। আর্য মঞ্জুশ্রীমূলকল্প নামক প্রাচীন বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থের দ্বাবিংশ পটলবিসরে প্রাচীন ভারতীয় ভাযাসমূহ সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য আছে। ভারতীয় ভাষার ইতিহাস সংকলন করার পত্রে এই অধ্যায়টির খুবই উপযোগিতা আছে বলে মনে কবি। ওই অধ্যায়েব একটি শ্লোক উদ্ধৃত করছি—

অসুরাণাং ভবেদ্ বাচা গৌড পৌণ্ড্রোদ্ভবা সদা।
যথা গৌড়জন শ্রেষ্ঠং বৃতং শব্দাবিভূষিতম্।।

এই উক্তি থেকে মনে হয় এক সময়ে গৌড় এবং পৌণ্ড্র ভাষা আসুর শ্রেণিভুক্ত বলে গণ্য হতো। তার একটু পরেই আবাব বলা হয়েছে—"সর্বেষাং অসুরপক্ষাণাং বঙ্গা সামতটাশ্রয়াৎ"। সুতরাং বঙ্গ এবং সমতটের ভাষাও আসুর শ্রেণির। এ বিষয়ে আরও যে সব উক্তি আছে তার বিস্তৃত আলোচনায় অগ্রসর না হয়ে শুধু এইটুকুই বলতে চাই, এ স্থলে অসুর শব্দের দ্বারা খুব সম্ভব শুধু অনার্যই বোঝাচ্ছে না, বিশেষ একপ্রকার ভাষার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। সম্ভবত মুন্ডা (অতএব অস্ট্রিক) জাতীয় ভাষাকেই আসুর ভাষা বলে অভিহিত করা হয়েছে। মহাভারতের উপাখ্যানে অঙ্গ বঙ্গ প্রভৃতিকে যে অসুররাজ বলির সন্তান বলে বলে বর্ণনা করা হয়েছে তা একেবারেই নিরর্থক নাও হতে পারে। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে অসুরদের ম্লেচ্ছভাষী বলে বর্ণনা করা হয়েছে, এই উক্তিরও বিশেষ সার্থকতা থাকতে পারে। শতপথ ব্রাহ্মণেও প্রাচ্যরা অসুর বলে অভিহিত হয়েছে। এই সমস্ত উক্তির যথার্থ তাৎপর্য কী তা ভেবে দেখা উচিত। এস্থলে স্মরণ রাখা উচিত যে আধুনিক কালেও কোল বা মুন্ডা ভাষার একটি উপশাখার নাম আসুরি, এটিও পূর্ব ভারতেবই ভাষা। এই আসুরি উপভাষাটি হযতো পূর্ব ভারতের প্রাচীন আসুর ভাষারই ক্ষীণ স্মৃতিটি বহন করছে।

পূর্বোক্ত ফরাসি ভাষাতাত্ত্বিক Jean Przyluski অস্ট্রিক ভাষার বিশ্লেষণ করতে করতে এমন সন্দেহও প্রকাশ করেছেন যে সুমেরিয়ার প্রাচীন ভাষার সঙ্গে এ ভাষার কোনো প্রকার সম্বন্ধ থাকা বিচিত্র নয়। কারণ তিনি এই দুই ভাষার মধ্যে কতকগুলি সাদৃশ্য লক্ষ করেছেন। আবার, সুমেরিয়ার সঙ্গে ভারতবর্ষের মহেন-জো-দাড়োর সভ্যতার যে বিশেষ সম্বন্ধ ছিল তা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন। তাহলে মহেন-জো-দাড়ো সভ্যতার ভাষার সঙ্গে অস্ট্রিক ভাষার কি কোনও সম্পর্ক ছিল? থাকা বিচিত্র নয়। পূর্বে দেখেছি তান্ত্রিক ধর্ম মহেন-জো-দাড়ো এবং পূর্বভারত উভয়েই বিদ্যমান ছিল, এমন মনে করার হেতু

আছে। মহেন-জো-দাড়োর প্রাচীন অধিবাসীরাও শিশ্ন অর্থাৎ লিঙ্গ-উপাসক ছিল। যদি এ সব অনুমান সত্য হয় তাহলে মনে করতে হবে, এক সময়ে লৌহিত্য থেকে সিন্ধুতীর পর্যন্ত একই সভ্যতা বিস্তৃত ছিল এবং সে সভ্যতার সঙ্গে সুমেরিয়ারও যোগ ছিল। আর, এই সভ্যতার অধিকারী যারা, তাদের সঙ্গেই বৈদিক আর্যদের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়েছিল। আর্যরা হয়তো এদেরকেই অসুর বলতেন। এই সুমেরিয়া-সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টাদের সঙ্গে Assyria বা Assur দেশেরও কোনো সম্পর্ক ছিল, কেউ কেউ এমন অনুমানও করেছেন। তাঁদের এ অনুমান একেবারে ভিত্তিহীন না হতেও পারে। কিন্তু বর্তমানে কল্পনার সাহায্য ছাড়া বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণের দ্বারা এসব কথা প্রতিপন্ন করার কোনো উপায় নেই।

সিন্ধু নদের তীরে যে-প্রদেশে মহেন-জো-দাড়োর সভ্যতা এক সময়ে বিকাশলাভ করেছিল ওই প্রদেশই পরবর্তীকালে সিন্ধু-সৌবীর নামে পরিচিত হয়েছিল। বোধায়নের ধর্মসূত্র থেকে জানা যায়, তৎকালে আর্যরা সিন্ধু-সৌবীর এবং অঙ্গ-মগধের অধিবাসীদের মিশ্র জাতি (সংকীর্ণ যোনয়ঃ) বলে গণ্য করত। এই উভয় প্রদেশের মধ্যবর্তী অবন্তি, সৌরাষ্ট্র, দক্ষিণাপথ এং উপাবৃৎ দেশের লোকেরাও "সংকীর্ণ যোনি" বলে বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে পুণ্ড্র, সৌবীর এবং বঙ্গ কলিঙ্গের অধিবাসীরা একেবারে অমিশ্র অনার্য বলেই গণ্য হয়েছে। এই শ্রেণি বিভাগের যথার্থ কারণ কী, অঙ্গ-মগধের সঙ্গে সিন্ধু-সৌবীরের জাতিগত কোনো সম্পর্ক ছিল কিনা, এ বিষয়ে আরও বিশেষ গবেষণা করা আবশ্যক। আমাদের জ্ঞানের বর্তমান অবস্থায় কতগুলি hypothesis নিয়ে তথ্যের অনুসন্ধান করা ছাড়া আর উপায়ান্তর নেই।

যাহোক, অধ্যাপক Jean Przyluski, Sylvain Levi প্রভৃতি মনীষীদের গবেষণা থেকে একমাত্র এই সিদ্ধান্ত করাই সমীচীন বলে মনে হয় যে, অঙ্গ-বঙ্গ প্রভৃতি বাংলার আদিম অধিবাসীরা ছিল অস্ট্রিক-ভাষী এবং বৈদিক আর্যসমাজের সঙ্গে তাদের কোনো সম্বন্ধই ছিল না। কিন্তু এই অস্ট্রিকভাষী অনার্য জাতিরাই পরবর্তীকালে আর্যদের সম্পর্কে এসে ক্রমে আর্য-ধর্ম, আর্য-ভাষা, আর্য সমাজবিধি, এক কথায় আর্যসভ্যতাকে আত্মসাৎ করে আর্য সমাজভুক্ত হয়ে গেল। বাংলার এই আদিম অস্ট্রিক-ভাষী অনার্যরা কীরূপে শুধু আর্যসমাজভুক্ত নয়, পরন্তু আর্যদের সমাজবিধি, ধর্ম, ভাষা ও সভ্যতার পতাকাবাহী গর্বিত জাতিতে পরিণত হয়েছে তার ইতিহাস খুবই ঔৎসুক্যকর। কিন্তু সে আলোচনার স্থান এটা নয়। এখানে শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, বাংলার এই আদিম অধিবাসীদের মধ্যে যারা পুরোপুরি আর্য সমাজভুক্ত হতে পারেনি পরবর্তীকালে প্রধানত তারাই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে বাংলার বর্তমান মুসলমান সমাজ গঠন করেছে। বস্তুত বাংলার ইতিহাস আলোচনার ফলে সর্বপ্রথমে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় সেটি এই যে,—বাংলার হিন্দুরাও মূলত আর্য বংশধর নয়, বাংলার মুসলমানরাও মূলত আরব, তুর্কি কিংবা পাঠান-মোগলের বংশধর নয়। আসলে বাংলার হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই একই অস্ট্রিক-ভাষী মহাজাতি সম্ভূত—এই হচ্ছে বাংলার ইতিহাসের সর্বপ্রথম এবং বোধ করি সর্বপ্রধান তথ্য।

বিচিত্রা ● চৈত্র ১৩৩৯ (১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ)



বাঙালির জাতি-বিশ্লেষণ

শ্রীবিরজাশঙ্কর গুহ

মানবজাতিকে নানাভাবে ভাগ করা যায়। ভাষা, কৃষ্টি, দেশ ও ধর্ম প্রভৃতি নানাবিষয়ে মানুষ পরস্পরের মধ্যে বিভক্ত হইয়া আছে। দুঃখের বিষয়, ওই লক্ষণগুলার কোনোটিই স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় নয়! অবস্থাবিশেষে লোকে ভাষা, ধর্ম ও কৃষ্টির আমূল পরিবর্তন করিতে পারে—দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়াও সম্ভব। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রোরা ইহার দৃষ্টান্ত। এইজন্য মানুষের স্থায়ী শ্রেণি-বিভাগের জন্য এমন কতকগুলি বিশেষত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক, যাহা লোকে ইচ্ছামত পরিবর্তন করিতে পারে না। নৃ-তত্ত্ব বিজ্ঞানে মানবের দৈহিক বিশ্লেষণ করিয়া এমন কতকগুলি বিশেষত্বের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে যাহা কালের প্রভাবে লুপ্ত হয় না, বংশানুক্রমে টিকিয়া থাকে। মানুষের দেহগত ওই সকল মৌলিক পার্থক্য বিচার করিয়া নৃতাত্ত্বিকেরা মানুষকে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট জাতিতে (race) বিভক্ত করিয়া থাকেন। অবশ্য কোনো একটি মাত্র বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করিয়া এইরূপ জাতিবিভাগ করা চলে না, অনেকগুলি বিশেষত্ব একসঙ্গে তুলনা করিয়া এক জাতি হইতে অপরের প্রভেদ নিরূপিত হয় আবার দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলি যে-নিয়মে বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয় ও প্রাকৃতিক আবেষ্টনের প্রভাবে মানবদেহে যে-সকল পরিবর্তন ঘটে, তাহার সবগুলিই সমানভাবে স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় নহে। বংশানুক্রমের নিয়মে দেখিতে পাওয়া যায়, কতকগুলি বিশেষত্ব অপর কতকগুলি বিশেষত্ব হইতে প্রবলতর হইয়া আত্মপ্রকাশ করে; কতকগুলি আবার আবেষ্টনের প্রভাবে বদলাইয়া যায়। মানুষের শরীরের রং ওইরূপ পরিবর্তনের একটি দৃষ্টান্ত। আমাদের চামড়ার নীচে কতকগুলি বর্ণ-কণিকা (pigments) বিদ্যমান থাকে—ইহার পার্থক্যবশতই শরীরের রঙের প্রভেদ দেখা যায়। পৃথিবীর উষ্মদেশগুলিতে বাস করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইলে মানবদেহের সূর্যের উত্তাপ সহ্য

করিবার ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। এইজন্যই আমাদের চামড়ার নীচে ওইরূপ বর্ণ-কণিকার আবির্ভাব হয়। ফলে নানা জাতির মানুষের মধ্যে এতটা বর্ণভেদে লক্ষিত হয়।

নৃতত্ত্বে যে যে লক্ষণে মানুষের জাতি বিভাগ করা হয় তাহার মধ্যে মাথা, নাক ও মুখের গঠনবিষয়ক বৈশিষ্ট্যগুলিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শুধু চোখে দেখিয়া কতকটা স্থূল ধারণা হইতে ইহাদের পার্থক্য নির্ধারণ করা যায় না। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে দেহের ওই সকল অঙ্গের সূক্ষ্মভাবে মাপ লওয়া হয় ; পরে ওই মাপগুলিকে রাশিগত ভাবে তুলনা করা হইয়া থাকে। উপর হইতে মাথার খুলির দিকে চাহিয়া দেখিলে তাহার প্রস্থের সহিত দৈর্ঘ্যের যে অনুপাত (ratio) দেখা যায়, সেই অনুযায়ী মাথাকে যথাক্রমে Dolicho-cephalic (লম্বা মাথা), Meso-cephalic (মধ্যমাকৃতি মাথা) অথবা Brachy-cephalic (গোল মাথা) বলা হয়। Calipers নামক যন্ত্রের সাহায্যে মাথার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের মাপ লইয়া অনুপাত কষিয়া দেখিতে হয়। ভ্রূ দুইটির মধ্যবর্তী কল্পিত বিন্দু (glabella) হইতে মাথার পিছন দিকের অস্থির (occipital bone) শেষ সীমা পর্যন্ত একটি সরল রেখা কল্পনা করা হইলে তাহার দৈর্ঘ্যকেই মাথার দৈর্ঘ্য বলা যায়। এই সরল রেখার সহিত সমকোণ করিয়া আড়া-আড়িভাবে মাথার যে বৃহত্তম মাপটি লওয়া হয়, তাহাই মাথার প্রস্থ। এই দুই মাপ হইতে মাথার অনুপাত বা cephalic index এই ভাবে বাহির করা হয়—

$$\frac{\text{প্রস্থের মাপ} \times ১০০}{\text{দৈর্ঘ্যের মাপ}}$$

এইরূপে cephalic index-এর যে অনুপাত পাওয়া যায়, নিম্নের তালিকায় তাহার বিভিন্ন পর্যায়গুলি দেওয়া গেল—

মুণ্ডের শ্রেণি	*ক্রমের পর্যায়*
Dolicho-cephalic (লম্বা মাথা)—	৭৫.৯ পর্যন্ত
Meso-cephalic (মধ্যমাকৃতি মাথা)—	৭৬ হইতে ৮০.৯
Brachy-cephalic (গোল মাথা)—	৮১ হইতে ঊর্ধ্বে

শুধু চোখে মানুষের নাকের বিচার করিলে দেখা যায়, এক শ্রেণির নাক দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে ও উচ্চতায় বেশ সুগঠিত , কতগুলি আবার দৈর্ঘ্যে কম, প্রস্থে বা বিস্তারে অধিক, কোনোটি বা উচ্চতায় কম। এইগুলিকে যথাক্রমে দীর্ঘনাসা (leptorrhine), মধ্যমাকৃতি-নাসা (mesorrhine) এবং নিম্ন-নাসা (Platyrrhine) বলা হয়। নাসাস্থির মূল (nasion) হইতে নাকের রন্ধ্র দুইটির মধ্যবর্তী স্থান পর্যন্ত যে মাপ, তাহাই নাকের দৈর্ঘ্য। নারাসন্ধ্রের বাহিরের দুই দিক লইয়া যে মাপ তাহা নাকের প্রস্থ। ওই রন্ধ্র দুইটির মাঝখানের প্রাচীরের নীচে হইতে নাসাগ্র পর্যন্ত নাকের উচ্চতা। এই মাপগুলি হইতে নাসিকার কয়েকটি index করিয়া দেখা হয়। প্রধান indexটি এইরূপ—

$$\frac{\text{নাসা প্রস্থ} \times ১০০}{\text{নাকের দৈর্ঘ্য}}$$

নীচের তালিকায় এই index-এর পর্যায়গুলি দেওয়া হইল।

নাকের শ্রেণি	*ক্রমের পর্যায়*
Leptorrhine (দীর্ঘনাসা)—	৬৯.৯
Mesorrhine (মধ্যমাকৃতি নাসা)—	৭০ হইতে ৮৪.৫
Platyrrhine (নিম্ন-নাসা)—	৮৫ হইতে ঊর্ধ্বে

এইরূপে মাথা ও মুখের অনেকগুলি মাপ লইয়া তাহা হইতে নানাপ্রকার index কষিয়া দেখা হয়।

বর্তমান প্রবন্ধে আমরা উপরোক্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে বাঙালিদের জাতিবিভাগ করিতে চেষ্টা করিব। এ-সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণাগুলির মধ্যে কতটা সত্য আছে, তাহাও বিচার করা যাইবে।

(২)

বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বাঙালির জাতি-বিশ্লেষণের প্রথম চেষ্টা করেন স্যর হারবার্ট রিজলে। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁহার *Tribes and Castes of Bengal* নামক গ্রন্থে এই প্রচেষ্টার ফলাফল লেখা হয়। এই গ্রন্থেই রিজলে ভারতবাসীদের জাতিগত উৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁহার প্রসিদ্ধ মতগুলি প্রথম প্রচার করেন। তাঁহার সিদ্ধান্তে বাঙালিরা মঙ্গোলীয় ও দ্রাবিড় জাতিদ্বয়ের মিশ্রণে উৎপন্ন—অবশ্য উচ্চতর বর্ণগুলির মধ্যে সামান্য আর্য (Indo-Aryan) রক্ত দেখা যায়। রিজলে এই মিশ্রিত জনতার নাম দেন—মঙ্গোলো-দ্রাবিড়। উত্তরে হিমালয়, পূর্বে আসাম, পশ্চিমে ছোটোনাগপুরের পার্বত্য প্রদেশ—এই সীমানার মধ্যে বিস্তৃত সমগ্র বাংলা দেশ ও উড়িষ্যা এই জাতির বাসভূমি বলিয়া নির্ধারিত হয়। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও চট্টগ্রামের রাজবংশি মগ, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের মাল, রংপুর ও জলপাইগুড়ির কোচ প্রভৃতি লোকদের এই জাতির নিদর্শন বলিয়া রিজলে উল্লেখ করেন।

রিজলের সিদ্ধান্তের যথার্থ নিরূপণ করিতে হইলে নিম্নের প্রশ্নগুলির মীমাংসা করা আবশ্যক।

(১) উপরোক্ত লোকেরা কী পরিমাণে প্রকৃত বাঙালি জাতির নিদর্শনভূত?

(২) ব্রাহ্মণ ও কায়স্থেরা অবশ্য বাঙালি সমাজেরই উচ্চ শ্রেণির লোক, কিন্তু রিজলের নির্দিষ্ট অন্যান্য লোকদের সম্বন্ধেও কি ওই কথা খাটে?

প্রথমে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজবংশি মগদের কথাই ধরা যাক। মগজাতির যে তিনটি শাখা আরাকান হইতে আসিয়া ওই অঞ্চলে প্রবেশ করে, ইহারা তাহাদেরই অন্যতম। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহারা চিনা জাতির লোক। ইহাদের সমাজসংস্থান, গোষ্ঠীর নাম প্রভৃতিতে ইহাদের প্রকৃত উৎপত্তির যথার্থ প্রমাণ আছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসনকেন্দ্র রাঙামাটিতে রিজলের আদেশে ইহাদের মাপ লওয়া হয়। যাহাদের মাপ লওয়া হয় তাহাদের কতকগুলি

লোকের নাম ছিল—আহং, সেপ্টেটং, পংডুং, ঠাপাসু, ঠেঙ্গা। এই মঙ্গোলীয় নামগুলি হইতে বোঝা যায় যে, এই মগরা ওই অঞ্চলে বহু দিনের বাসিন্দা হইলেও আজও আপনাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াছে এবং বাঙালির সামাজিক রীতি ও নাম এখনও গ্রহণ করে নাই।

বাঁকুড়া, বীরভূম প্রভৃতি জেলার মালদের দৃষ্টান্তও লওয়া যাক। রিজলে নিজেই স্বীকার করেন যে, ইহারা রাজমহল পাহাড় হইতে এদিকে আসিয়াছে এবং সাঁওতাল পরগনার মালপাহাড়িয়া, মালে প্রভৃতির মতো একই জাতির লোক।

অতঃপর উত্তরবঙ্গের রাজবংশি কোচদের কথা উঠে। যে প্রসিদ্ধ কোচ জাতি এক সময় উত্তরবঙ্গ আক্রমণ করে, ইহারা তাহাদেরই বংশধর। রিজলে ইহাদের যেসব লোকের মাপ লন, তাহাদের—পাইয়া, লেথ্র, লোবু, আলিঙ্গা, ইউরিয়া, তাণ্ডু লোবাই প্রভৃতির—নাম মোটেই বাঙালির নহে। কর্ণেল ওয়াডেল এই শ্রেণির বহু লোকের মাপ লইয়া স্থির করেন যে, ইহারা স্পষ্টত মঙ্গোলয়েড জাতীয় লোক।

ফলে দেখা যাইতেছে, ওই সকল উপজাতিরা বাহির হইতে এদেশে আসিয়া বাংলার সীমান্তস্থিত জেলাগুলিতে কিছুকাল যাবৎ বাস করিতেছে। খাঁটি বাঙালির নিদর্শন বলিয়া তাহাদের ধরা যায় না ; এবং দৈহিক মাপ হইতে তাহাদের জাতিগত উৎপত্তি বিষয়ে যে-সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তাহা প্রকৃত বাঙালির সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে।

দৈহিক বৈশিষ্ট্যের তুলনা করিলে দেখা যায়, সাঁওতাল পরগনার মালে, মালপাহাড়িয়া প্রভৃতির ন্যায় বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের 'মাল'রা একই আদিম জাতির লোক। এই জাতিটা সাধারণত 'প্রটো-অস্ট্রেলয়েড' বলিয়া কথিত হয়। ইহাদের দেহাকৃতি খর্ব, মাথা লম্বা, নাক খাঁদা ও চওড়া। অপর পক্ষে রাজবংশি মগদের মাথা গোলাকৃতি, নাক চ্যাপটা, ও গণ্ডাস্থি অত্যধিক পরিণত। তাহাদের মুখ ও দেহে কেশরোমাদি বিশেষ নাই। তাহাদের চক্ষু বঙ্কিম ও অর্ধোন্মীলিত ; নাকের পাশে চোখের কোণ দুটি একটি বিশেষ চামড়ার ভাঁজে (epicanthic fold) আবৃত থাকে।

উত্তর-বঙ্গের কোচদের মাথা ঠিক গোলাকৃতি না হইলেও তাহাদের মুখের গঠন পূর্বোক্ত মগদের মতই মঙ্গোলীয় শ্রেণির।

ওই সকল উপজাতির সহিত তুলনা করিলে বাঙালি সমাজের ব্রাহ্মণ-কায়স্থদের নিম্নরূপ বিশেষত্ব দেখা যায়—

ইহাদের মাথা গোলাকৃতি, নাসিকা দীর্ঘ এবং উন্নত। মালদের নাকের ক্রম হইল ৮৪.৭ (Platyrrhine)।* আব ইহাদের মাত্র ৭০.৩৫ (Leptorrhine)। ইহাদের মাথার দৈর্ঘ্যের তুলনায় ব্যাস মগদের অপেক্ষা কম হইলেও ইহারা মগদের মত নিম্ননাসা (অনুপাত = ৮২.৭) লোক নহে ; মুখও ইহাদের মঙ্গোলীয় জাতির মত থ্যাবড়া নহে। মগ ও কোচদের গণ্ডাস্থির বিস্তার যথাক্রমে ১৩৭.৮ মিলিমিটার এবং ১৩২ মিলিমিটার—ইহাদের

* এখানে যে মাপগুলি দেওয়া হইল তাহা রিজলেব anthropometric data হইতে লওয়া।

মাত্র ১২৮ মিলিমিটার। মানুষের বংশানুক্রম সম্বন্ধে এমন কোনো প্রাকৃতিক নিয়ম আজও আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহাতে চ্যাপটা নিম্ন-নাসা ও থ্যাবড়া মুখবিশিষ্ট ওই দুইটি জাতির সংমিশ্রণে ব্রাহ্মণ-কায়স্থদের মত দীর্ঘ ও উন্নত-নাসা লোকের উৎপত্তি কল্পিত হইতে পারে। মঙ্গোলীয় জাতির যাহা প্রধান বিশেষত্ব—মুখ ও শরীরে কেশরোমাদির অপ্রাচুর্য এবং চর্মাবৃত অক্ষিকোণ (epicanthic fold) তাহাও এই ব্রাহ্মণ কায়স্থদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। বাস্তবিকই, বাঙালি ব্রাহ্মণ-কায়স্থাদির যে প্রকার শরীরের গঠন, সেইরূপ আকৃতি ও দৈহিক বিশেষত্ব রিজলের কথিত উপজাতিদের মিশ্রণে সম্ভূত হইতে পারে না। ইহাদের আদি ইতিহাস, ইহাদের কুটুম্বিতার সূত্রগুলি অন্যত্র খুঁজিতে হইবে।

ভারতবাসীদের দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, গুজরাট হইতে কূর্গ পর্যন্ত পশ্চিম-ভারতের সমুদ্রতট একটি গোল মাথা ও দীর্ঘোন্নত নাকবিশিষ্ট জাতি কর্তৃক অধ্যুষিত। নৃতাত্ত্বিকেরা ইহাদের আলপাইন বলিয়া অভিহিত করেন। ইহারা অবশ্য আল্পস পর্বত হইতে আসিয়া ভারতে বসবাস করে নাই। ইউরোপের জাতি-বিশ্লেষণের ফলে আল্পস অঞ্চলে এই জাতীয় লোকের প্রথম সন্ধান পাওয়া যায় বলিয়া ইহাদের ওইরূপ নাম দেওয়া হইয়াছে—পৃথিবীর সর্বত্রই এই জাতির লোক আলপাইন বলিয়া কথিত হয়। গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কানাড়া, ও কূর্গের অধিবাসীদের মধ্যে এই আলপাইন জাতিটির প্রাবল্য দেখা যায়। যতদূর জানা গিয়াছে, এই গোল মাথাবিশিষ্ট জাতি দাক্ষিণাত্যের মালভূমির ভিতর দিয়া দক্ষিণাভিমুখী হইয়া চলিলেও মালাবারে পৌঁছে নাই, পূর্বদিকে একটু ঘুরিয়া গিয়া তামিলনাড়ুতে চলিয়া গিয়াছে। সম্ভবত দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলেই ইহাদের অভিযান শেষ হইয়াছিল—পূর্বোত্তর দিকের সমুদ্রতটে তেলেগুদের মধ্যে ইহাদের প্রভাব বিশেষ অনুভূত হয় না। উত্তরাপথে, পঞ্জাবে এবং বারাণসী পর্যন্ত গঙ্গাবিধৌত প্রদেশে এই জাতির অস্তিত্ব তেমন দেখা যায় না। অপর পক্ষে বিহার প্রদেশ হইতে দক্ষিণ-বাংলার দিকে যতই নামিয়া আসা যায়, ততই এই গোল মাথাবিশিষ্ট জাতির লোক সংখ্যায় প্রবল হইয়া উঠে।

পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে এই গোল মাথা জাতির অস্তিত্বের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া রিজলে সিদ্ধান্ত করেন যে, পশ্চিমে শক এবং পূর্বে মঙ্গোলীয় রক্তে ইহাদের উৎপত্তি। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে শক-অভিযানের কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। বাংলা দেশে মঙ্গোলীয় রক্তের সংমিশ্রণে এই জাতীয় মানবের উৎপত্তির যে প্রমাণ করা যায় না তাহা পূর্বেই দেখানো গিয়াছে।

কয়েক বৎসর পূর্বে 'ইন্ডিয়ান অ্যান্টিকোয়ারি' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে ডাঃ ভান্ডারকর এই সম্বন্ধে একটি নূতন যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে গুজরাটের নাগর ব্রাহ্মণ ও বাংলার কায়স্থ সমাজের কতকগুলি পদবি এক ; যেমন—মিত্র, দত্ত, নাগ, পাল ইত্যাদি। এ অবস্থায় উভয় সম্প্রদায়ের মিল শুধু নামের পদবিতে, না দৈহিক গঠনেও, তাহা বিচার করা প্রয়োজন। রিজলের তত্ত্বাবধানে বি. এ. গুপ্তে যে মাপ লন, তাহাতে দেখা যায়, ওই নাগর ব্রাহ্মণদের গড়ে দৈর্ঘ্য ১৬৪৩ মিলিমিটার এবং বাঙালি কায়স্থদের ১৬৩৬ মিলিমিটার—অর্থাৎ প্রভেদ মাত্র ৭ মিলিমিটার বা ¹/₄ ইঞ্চি। নাগর

ব্রাহ্মণদের মাথা ও নাকের অনুপাত যথাক্রমে ৭৯.৭ ও ৭৩.১—বাঙালি কায়স্থদের ৭৮.২ এবং ৭০.৩। সুতরাং এই দুই শ্রেণির লোকের প্রভেদটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। আরও দেখা যায় যে, সংগৃহীত তথ্যে নাগর ব্রাহ্মণদের শতকরা ৬৩ জনের মাথা গোলাকৃতি এবং শতকরা ৫৩ জনের নাসিকা দীর্ঘ ও উন্নত। বাঙালি কায়স্থদের শতকরা ৬০ জনের মাথা গোলাকৃতি এবং শতকরা ৭১ জনের নাসিকা দীর্ঘ ও উন্নত।

গুজরাট, বোম্বাই ও বাংলার এইরূপ লোকের মধ্যে দৈহিক ও কৃষ্টিগত সাদৃশ্যের অর্থ তাহাদের জাতিগত ঐক্য। রিজলে যদি বাংলার সীমান্তবাসী মঙ্গোলীয় লোকদের সহিত ইহাদের তুলনামূলক আলোচনা করিতেন এবং মধ্যপ্রদেশে ভিতর দিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভারতের গোল-মাথা অধিবাসীদের মধ্যে একটি যোগসূত্র কল্পনা করিতেন, তিনিও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন। কথাটার একটু বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন।

(১) **মঙ্গোলীয় উপজাতি ও বাঙালি সমাজ**—বাংলার সীমান্তবাসী মঙ্গোলীয়দের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের বিচার করিলে দেখা যায় যে, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কোচ, কাছাড়ি, কলিতা, গারো, লুসাই ও নাগা পর্বতের অধিবাসীরা স্পষ্টত লম্বা-মাথা লোক। গোল-মাথা মঙ্গোলীয়েরা নেপাল, সিকিম এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বাস করে। বাঙালি সমাজের উচ্চস্তরে যে গোল-মাথা জাতির প্রাধান্য, তাহারা কিন্তু বাংলা দেশের মাঝামাঝি অর্থাৎ গঙ্গার 'ব'-দ্বীপ অঞ্চলে সংখ্যায় প্রবল হইয়া আছে। বাংলার উত্তর ও পূর্ব সীমান্তের দিকে যতই অগ্রসর হওয়া যায় ইহাদের সংখ্যা ততই কমিয়া যাইতে দেখা যায়। নেপাল, সিকিম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের গোল-মাথা মঙ্গোলীয় জাতি হইতে যদি এই শ্রেণির বাঙালির উদ্ভব হইত, তবে তৎসন্নিহিত ভূভাগেই ইহাদের সংখ্যাধিক্য দেখা যাইত। উত্তর-পূর্বের লম্বা-মাথা মঙ্গোলীয়েরা আদৌ ইহাদের পূর্বপুরুষ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

(২) **মধ্যভারতের ভিতর দিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আলপাইনগণের যোগসূত্র**—রিজলের সময়ে মধ্যভারতের বাসিন্দাদের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা ছিল না। প্রচলিত ধারণামতে, রিজলে যাহাদের দ্রাবিড় বলিয়াছেন, অর্থাৎ মানভূম ও সিংহভূমের মাল, মালপাহাড়িয়া প্রভৃতি প্রটো-অস্ট্রোলয়েড জাতীয় লোকেই ওই দেশভাগ অধিকার করিয়া আছে।

পূর্বাঞ্চলে এই গোল-মাথা জাতির অভিযান কোন্ পথে হইয়াছিল তাহা নির্ধারণ করিবার জন্য বর্তমান লেখক ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারির সহযোগিতায় মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের জনতাকে ব্যাপকভাবে পরীক্ষা করেন। এই উপলক্ষ্যে মালবের মালভূমি, পশ্চিম-ভারতের উপকূল, এবং দাক্ষিণাত্যের নিম্নাঞ্চলও পর্যবেক্ষিত হয়। এই অনুসন্ধানের ফলাফল অন্যত্র বিশদরূপে আলোচিত হইবে। এখানে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, রেওয়া (অর্থাৎ ৮৩° পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা) পর্যন্ত সমগ্র মালবের মালভূমিতে পূর্বোক্ত গোলাকৃতি মাথাবিশিষ্ট জাতির লোক এখনও টিকিয়া থাকিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আলপাইনগণের প্রাচীন যোগসূত্রের সাক্ষ্যস্বরূপ হইয়া আছে। আমার ছাত্রদ্বয় শ্রীমান বজ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ও অচ্যুতকুমার মিত্রের অনুসন্ধানে আরও প্রমাণ হইয়াছে যে,

বর্তমান বিহার প্রদেশের উচ্চশ্রেণির হিন্দুগণের মধ্যে এই গোল-মাথা জাতির অস্তিত্ব বিদ্যমান। বিশেষ করিয়া এই গোল-মাথা জাতির প্রভাবেই যে বাংলা দেশের জাতীয় ছাঁদটি (racial type) উদ্ভূত হইয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। পূর্বাঞ্চলে এই গোল-মাথা জাতির অভিযানের পরবর্তী যুগে অন্য জাতির জনস্রোত আসিয়া ইহাদের পূর্ব ও পশ্চিম শাখার যোগসূত্রটি নিরবচ্ছিন্ন থাকিতে দেয় নাই। কিন্তু এককালে যে ইহা বিশেষ বলবৎ ছিল, আমাদের সংগৃহীত তথ্য তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়াছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, পশ্চিম-ভারতের গোল-মাথা এবং দীর্ঘোন্নত নাসাবিশিষ্ট জাতির জনস্রোত প্রধানত দক্ষিণ-পূর্বে তামিল দেশের দিকে প্রবাহিত হইয়া যায়। তামিল দেশের উত্তরে অন্ধ্রদের মধ্যে ইহাদের প্রভাব বিশেষ অনুভূত হয় নাই। সুতরাং অন্ধ্র ও উড়িষ্যার ভিতর দিয়া ইহাদের বঙ্গাভিযান কল্পিত হইতে পারে না। পশ্চিম-ভারত ও বাংলার জাতিগত ইতিহাসের (racial history) এই প্রকার যোগসূত্র স্বীকৃত হইলে বাঙালি সমাজের উচ্চস্তরের গোল-মাথা ও দীর্ঘোন্নত নাসা বিশিষ্ট জাতির উৎপত্তির জন্য কোনো মঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণ কল্পনা করিতে হয় না।

প্রবাসী ● জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০ (১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ)



বাংলার আদিম জাতি ও সভ্যতা

(বাংলা-দিশম)

শ্রীহরিদাস পালিত

বাংলা দেশের নাম—'বাংলা' কী করে হল, এবং কাহারাই বা বাংলা (বাংলো) নামকরণ করেছিল—বাংলা তা বলতে পারে না। বাংলার লোকেরা বাংলি, (বঙ্গালী, বংগালী)। না পারবার কারণ হচ্চে এই,—এদেশের আদিম অধিবাসী যারা ছিল, তারা যে তাদের দেশের নাম একটা রেখেছিল, সেটা বলতে চাই না। এদেশে লোক ছিল, তারপর আর্যেরা এসে, এই নি-নামা দেশের নাম রেখেছিলেন—বংগ। এই বিশ্বাস করি, কেন-না—আমরা আর্যত্বের দাবি করি। আমরাই এ দেশটাকে দখল করেছিলাম এবং নামও রেখেছিলাম,—এই রকমের অহমিকা যাঁদের মগজে আছে, তাঁরা ভাবতেই পাবেন না যে, তাঁদের পূর্বে, যাদের এ দেশটা ছিল,—তারা নামহীন দেশে বাস করত না। তারা অ-আর্য হলেও, তাদের ভাষা ছিল। তাদের ভাষায় তারা এদেশের নাম নিশ্চয় রেখেছিল।

অ-আর্য আদিম জাতিদের রাখা নাম—বাংলাদেশে বিস্তর রয়েছে, তারা যখন গ্রাম, নদী পাহাড়ের নাম রাখতে পেরেছিল, তখন তাদের জন্মভূমির (জনম দিশম) নাম যে রাখেনি, এটা একটা অসম্ভব কথা।

এ দেশের আদিম আধিবাসীরা—হড়, হো (কোল) নামক জাতি, এরাই এদেশের আদিম মানব ; তারাই —তাদের দেশকে বলত—'বাংলো'। এদেশটা জলবহুল দেশ,—জলাভূমি যথেষ্ট, ছেঁচে জল ক্ষেত্রে দিতে হত না। বাং—মানে—না, লো—অর্থে বুঝায়—পাত্র ডুবিয়ে জল তোলা। তা থেকে—জল ছেঁচাও বুঝায়। যে দেশে—ছেঁচে জল দিতে হয় না, জল ছাঁচার আবশ্যক হয় না, অর্থাৎ ধান্যক্ষেত্রে জলের অভাব হয় না সেই

দেশই—"বাংলো-দিশম", ইহাই তাদের জন্মভূমি মাতৃভূমি (আয়ু-দিশম)। আর্য বৈদিকেরা—এ দেশের নামকরণ করেন নাই। একথা যেখানে আছে—"তারা নাম রেখেছিলেন"—সেটা গল্প।

পুকুর হতে জল আনো,—পুকরি খন্ লো আগুই মে। কোনো পাত্র হতে জল বা তরল কিছু ঢালাকে—'তাং' বলা হয়, 'লো'—ডুবিয়ে আনাকেই বুঝায়। কলশি থেকে জল আনো,—কান্‌ডা খন্ দাঃ তাং আগুইমে, বলতে হয়। এইজন্য, যে দেশের ক্ষেত্রে (ধান্য ক্ষেত্রে) জল ছেঁচে দিবার প্রয়োজন ছিল না, সেই দেশটির নাম, দেশের লোক রেখেছিল—বাংলো দিশম। (বাংলো দেশ) ওই রকমের ক্ষেত্রকে সম্ভবত বলা হত—'হাসা-বাংলো' বা বাংলো-হাসা (হাসা মানে খ্যাৎ বা ক্ষেত্র চাষের জমি)। তথাকথিত ক্ষেত্র সমাকীর্ণ স্থানকে—অ-আর্যগণ বলত—বাংলো দিশম। তারা গঙ্গার (গাং-গার) পশ্চিম অংশটাকে 'বাংলো' বলত, গঙ্গার পলি-ভরাট অংশ বাদে—বাংলোর পশ্চিমোত্তর অংশটাকে বলত—'আরাঃ-হাসা' কেন-না, তাহারা মাটিকে বলত—'হাসা'।

আরাঃ

'হড়-পারসি' অর্থাৎ সমেতাল ভাষাকে, তারা বলে পারসি (ভাষা)। পারসির শব্দগুলার সাহায্যেই এই প্রবন্ধের—স্থান নির্ণয় ও ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। আরা অর্থে লালবর্ণ বুঝায়—এবং "শাশাং আরাঃ" মানে—হলদে ; যে ভূভাগের মাটি লাল বা হলদে রংয়ের—সেই ক্ষেত্রকে হড় পারসি (ভাকা) তে বলে—আরাঃহাসা। তথাকথিত অংশে তাহারা বাসগৃহ নির্মাণ করিত--উচ্চ স্থান বলিয়া, সাধারণত যে জমি জলে ডুবিয়া যায় না, সেই স্থানেই তারা বাস করে। উচ্চ পাহাড়ে ভূমি তাদের প্রিয়—এই রকম স্থানকে তারা বলে—হারা বা ডুংরি।

আরাহারা বা আরাডুংরি দেশটাকে বলে সাধারণত 'আরাহারা'। এই শব্দ থেকেই হয়েছে—"রাঢ়" পাহাড়ে লাল মাটির দেশটাকে, তাদের ভাষায় বলে—'আরা বা রাঢ়া' কাব্যে দেখা যায়—অনুপমা রাঢ়াপুরী। 'রাঢ়পুরী' কোথায় ছিল, ঠিক বলা যায় না, তবে সেটি আড়া বা রাঢ়া (রাঢ়ে) দেশেই ছিল এবং তথাকার মাটি—লালবর্ণের ছিল বলেই ধারণা হয়। মল্লভূমের বিষ্ণুপুরে (বর্তমান বাঁকুড়া জেলা) বলা যাইতে পারে। অথবা শূরভূমের শুশনিয়া পাহাড় পারিপার্শ্বিক কোনো—নারও হলে হতে পারে (কর্পূরমঞ্জরী)। 'রাঢ়া' দেশটা—সেনভূম, শূরভূম, গোপভূম, মল্লভূম, তুঙ্গাভূম, ধলভূম, বীরভূম এবং সিংভূম অঞ্চল লইয়াই সম্ভবত বলা হত। এখন বর্ধমানকেই রাঢ় দেশ বলে, কিন্তু বর্ধমান অত প্রাচীন নয়। পশ্চিম বর্ধমান—রাঢ় দেশের অন্তর্গত ছিল। বিষ্ণুপুরের নামই ছিল বর্ধমান। এখন ইহাকে—পশ্চিম বর্ধমান বলে। যে নগরীর দ্বার দক্ষিণ দিকে থাকে না,—উহারই নাম—বর্ধমানপুর, ইহাই শুভ সূচক বলিয়া খ্যাত হইত। (হস্তিনাপুরকেও বলত—বর্ধমানপুর দ্বারী)।

সমেতালদেশকে

রাঢ়া বলিত, লাল মাটির দেশ বলিয়া ; সমেতাল-ভূমি নাম পেয়েছিল, সমেতশিখর দেশ থেকেই, বর্তমানে সমেত পাহাড়টিকে বলা হয়—পরেশনাথ পাহাড়। পূর্বে এর নাম

ছিল—সমেতশিখর। তারও পূর্বে হড় জাতিরা ইহাকে বলত—মারাং বুরু। কেন তারা এ নাম রেখেছিল, সেই কথাই বলতে চাই।

মারাং বুরু

অর্থে 'বড়ো-পাহাড়'। মারাং অর্থে বড়ো, এবং বুরু অর্থে—পাহাড়। এই নামটার সঙ্গে হড়েদের একটা শ্রুতি-স্মৃতি জড়িত আছে। সেটা এই—

সৃষ্টি রহস্য (হড়-ছাচ্‌তর) সেদায় (সৃষ্টির আদিতে)

আদিতে পৃথিবী জলময় ছিল,—স্বর্গ থেকে সোনার সিংহাসনে বসে এলেন—"মারাং বুরু" (স্বর্গের দেবতা) জলের উপর সিংহাসন ভাসতে লাগল, দেহের (অঙ্গের) ময়লা দুই টুকরা জলে পড়ল, তা থেকে রাজহংস ও রাজহংসী (হাঁসিল) জন্মাল, তিনি সিংহাসনটিকে পদ্মগাছে পরিবর্তন করলেন। তখন স্বর্গের দেবতা—জলচর জীবদিগকে বললেন—মাটি আনো। সকলেই পিছিয়ে গেল, কাছিমের (কূর্মের—হর) রাজাকে মাটি আনতে বললেন, সে পিঠে করে খানিকটা মাটি এনে পদ্মপাতে (পয়রানি সাকাম) রাখলে, সেই পাতায় ধরিত্রীর (ধীরতা) আদি রূপ প্রকট হল। তখন হাঁসিল দুটা ডিম—পৃথিবীর উপর পাড়ল। যথাকালে ডিম ফুটে—যুগল নরনারী নির্গত হলেন। তাঁরাই মানবের আদি পিতামাতা (এঙ্গা আপা)।

আদি পিতার নাম—পিলচু হাড়াম্ এবং আদি মাতার নাম—পিলচু বুড়্হি। হাড়াম অর্থে সাধারণত—বুড়া, বুড়ি—বুড়্হি। পিলচু প্রথম বা আদি। তাঁহারাই—পিতামহ (গড়ম আপুং) এবং পিতামহী (গড়ম আয়ু), আয়ু অর্থে মা এবং আপুং অর্থে পিতা। এঁদের বংশই—হড় জাতি। হাড়াম—পুত্রকন্যা হড় জাতি, মানুষ মাত্রেই—হড়, এবং মনুষ্য জাতিকে এরা বলে—মানুয়ী। (মনেয়ী—মনুপত্নী, এবং মনু?) হড়েদের ভাষা—হড় পারসি বা ভাকা।

মারাং বুরু

সম্বন্ধে কিছু অবগত হওয়া গেল, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে,—পাদরি মহাশয়েরা—সমেতালি ভাষায় যে বাইবেলের অনুবাদ করেছেন, তাতে মারাং বুরুকে—'শয়তান' বলেছেন, এ রকম অনুবাদ মারাত্মক ভুল, তাহার আর সন্দেহ নাই।

মারাং বুরুর—সাধারণ অর্থ হচ্ছে—বড়ো বা শ্রেষ্ঠ পর্বত, মা—র—ম্—বু—র উ যোগে মারাং বুরু হয়েছে, হরপ্পার মুদ্রাঙ্কিত চিত্র সাহায্যে যে অর্থ উৎপন্ন হতে পারে, সেই রকম অর্থ করলে পাওয়া যাবে,—

মা—সের্‌মা-মা অর্থাৎ স্বর্গের ঈশ্বরী, ইতি আদিমাতা—কিন্তু ভাবে বুঝায়, তিনি পিতা-মাতার সমবেত মূর্তি। দেবতা—মা (ঈশ্বরী), অর্থাৎ মা-বাপ দুইই। বুরু—বু হচ্ছেন—স্বর্গের দেবী। এঙ্গা+আম=আম শব্দটি ওম্, উম্ তুল্য মূল্য, এং (ইঞ—আমি) রূপান্তর। ম অ ইংম্—হতেই মারাং হয়েছে, মারাং স্বর্গের দেবতা, বু বা বুর্—উ স্বর্গের দেবী বুঝায়। মারাং বুরু—স্বর্গ দেবতা—দেবদেবীর মিলিত রূপায়ণ। সেরমার (স্বর্গের) বু-দেবী বা দেবতা। মারাং শ্রেষ্ঠ বুরু দেবতা সুতরাং সর্বশ্রেষ্ঠ স্বর্গদেবতা—মারাং বুরু। (সেরমা থেকেই কি—সরমা?)

বুরু শব্দ হতেই বোংয়া বা বোয়াং হয়েছে—বোংয়া অর্থে দেবতা, মা, বু শব্দ ঈশ্বর বাচক। তদ্রূপ বোংয়া, "চাঁদু বোংয়া" অর্থে ঈশ্বর, তিনি সেরমা (স্বর্গের) চাঁদো (চাঁদ) এবং সিন চাঁদো অর্থে সূর্য। সেরমা থেকেই সিন, চন্দ্র-সূর্য একই চিৎবস্তু (প্রাণী) একজন দেন রাত্রে আলো (নিদ চাঁদো) একজন দেন—দিনের আলো (সেতম), দুইই মারশাল (জ্যোতির্ময়)।

ঈশ্বর অর্থে—সেরমা চাঁদো (চন্দ্র সূর্য উভয়ই), চাঁদ-সূরজ—এদের ঈশ্বর বাচক, সজীববৎ কিছু। মারাং বুরু—আদি দেবতা সগুণ ব্রহ্মবৎ কল্পিত পরমেশ্বর। তাঁর সিংহাসনের (অধিষ্ঠান স্থানে) উপরই—ধরিত্রীর প্রকট হয়েছে, সেই পবিত্র ক্ষেত্রে—আদি মাতা-পিতার জন্ম হয়েছিল—সেই জন্য যে স্থানে—এই ব্যাপার সংঘটিত হয়েছিল, সেই পবিত্র ক্ষেত্রের নাম ঈশ্বরের নামেই হড়েরা রেখেছিল—মারাং বুরু, শ্রেষ্ঠ পাহাড় (পর্বত)।

মারাং বুরু—নামক ধরিত্রী স্রষ্টার নামে—অধিষ্ঠানক্ষেত্রের নামকরণ করেছিল—মারাং বুরু অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ পবিত্র পাহাড়। এই পাহাড়ই, নাম পেয়েছে বিধর্মীদের নিকট—পরেশনাথ পাহাড়। হড় মতে ভারতের এই অংশই প্রথমে, জলোপরি স্থলাকারে প্রকাশ পেয়েছে।

ভূ-তত্ত্ববিদগণের মতে,—জলময় ভারতে, সর্বপ্রথমে—পরেশনাথ ও নীলগিরির অভ্যুদয় হয়েছিল। এবং এই পরেশনাথ পাহাড়েই, একটি মহাকূর্মের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, সেটি এক্ষণে কলিকাতা যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

হড়শ্রুতি অনুসারে মারাং বুরু এবং কচ্ছপ রাজার উপাখ্যানের সহিত, তথাকথিত কূর্মাশ্মের কোনো সম্বন্ধ থাকা বিচিত্র নয়। এই শ্রুতি হতেই অবগত হওয়া যাইতেছে যে, উত্তর ভারতের মধ্যে, কেবল পরেশনাথ শৈলই জল মধ্য হইতে প্রথমে মস্তক উত্তোলন করেছিল, এবং তথায় সর্বাদি নর-মিথুনের প্রকট হয়েছিল। যদি অন্য অন্য জাতির ধর্মগ্রন্থ উক্ত, সৃষ্টিতত্ত্ব বিশ্বাসযোগ্য হয়, তাহা হইলে হড়শ্রুতি-জাত নর-অভিব্যক্তি অবিশ্বাসযোগ্য বলিবার বিশেষ কোনোই হেতু নাই। তথাকথিত মারাং বুরু অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ আদি শৈলটিকে পরবর্তীকালে সমেত গিরি বা সমেত বুরু বলা হইত। তৎপরে জৈনগুরুর সমাধি কাল হইতে, নাম রাখা হয়েছে পার্শ্বনাথ বা পরেশনাথ। হড়েদের আরাহাসা বা আরাক্ষেত্র, তথাকথিত সমেতগিরিকে কেন্দ্র করিয়া চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ জনপদকেই বলা হয়েছিল। আরাক্ষেত্রই যে প্রাচীন রাঢ়াভূমি, এই হেতু বলা যাইতে পারে। সমগ্র রাঢ়াদেশেই, হড় সমেতাল জাতিরা বাস করিত।

দামুঃ-দা

অর্থে দামোদর (বন্যার নদী) যে, পবিত্র নদ কেন, ইহাই বুঝিতে পারা যায়, যেহেতু দামোদরের জন্মভূমি মারাং বুরু, এজন্য ইহার অন্য নাম 'মারাং নাই'। পবিত্র বুরু (পাহাড়) হতে বাহির হইয়া প্রবাহিত হয়েছে, হড়েদের আদি মাতা-পিতা, এই নদতীরে বাস করিতেন—এই হড় জাতির জন্মভূমি, এবং ইহাই মারাং নাই এর জন্মতীর্থ। তোপন নাই—অন্য পবিত্র নাম। সমেতালেরা তোপন তীরে উপস্থিত হইয়াই বলে "কাটিঃ চুলুম তোপন দাঃ (জল) বহঃরে এম"মে অর্থাৎ একটু তোপন জল মাথায় দে। গঙ্গা নদীকে পবিত্র মনে করে না, মনে করে "তোপন দাঃ"কে।

প্রথমে এই নদীর পরপারে, দক্ষিণদেশে যাওয়া নিষেধ ছিল। এই জন্য হড়েদের রাঢ়া, দামোদরের দক্ষিণে ছিল না, বলা চলিতে পারে। যে সকল সমেতাল (হড়), দামোদর নদ পার হইয়া, প্রথমে দক্ষিণদেশে গিয়াছিল, হড়েরা তাহাদিগকে জাতিচ্যুত (অজাতীয়া) বলিত। এই উপলক্ষে হড়েদের মধ্যে দুইটি শ্রেণির সংগঠন হয়। দক্ষিণ দেশবাসীদের সঙ্গে, উত্তর দেশবাসীদের বিভিন্নতার ইহাই কারণ। দাক্ষিণাত্য দেশবাসী তৈলঙ্গি, কংগোদা, দ্রবিড় প্রভৃতি জাতিগুলি, হড় হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছিল। তাহাদিগকে পতিত বলিয়া, উত্তর ভারতের সমেতালেরা বিবেচনা করিত। হড়, কোল, নিষাদ, খশ প্রভৃতি জাতি যে ভাই ভাই তাহার আর সন্দেহ নাই।

কোল

কোল ও হড় এক জাতি, এরা উত্তর অঞ্চলের অধিবাসী বলিয়া "বু য় ড়" নামে খ্যাত হইয়াছিল। কোনো বিশেষ কারণে, কয়ড় হড়েদের মধ্যে কতক লোককে সিংভূম আদি পশ্চিম ও উত্তর দেশে, সামাজিকেরা পাঠাইয়া ছিল, যাহাদিগকে পৃথক ভূমে, পাঠানো হইয়াছিল, তাহাদিগকে 'কোল' বলা হইত। কোল অর্থে প্রেরণ বুঝায়, জনম দিশম হইতে যাহারা স্থানান্তরে প্রেরিত হয়েছিল তাহারাই—কোল।

কোলগণের মধ্যে, যাহারা প্রধান ব্যক্তি ছিল, তাহারা মানী ব্যক্তি, 'তুমি' শব্দের ব্যবহার হড়-ভাষায় নাই, তত্তুল্য শব্দ হচ্চে হো। সম্ভ্রান্ত কোল সর্দারদিগকে সমেতালেরা বলত—হো। এই 'হো' ক্রমশ সম্প্রদায়গত নামে পরিণত হয়ে পড়েছে। এখন দেখা যায়, কোলেদের মধ্যে মাতব্বর লোকদিগকে হো অর্থাৎ কুলীনবৎ বিবেচনা করা হয়। কোলেদের এক সামাজিকদের নাম, বর্তমানে—হো।

তুই—আ, তুমি—হো, আপনি—গো, রে (ওরে হাঁরে) এয়া, এবং মহাশয়—বাবা ইত্যাদি প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

সাধারণত হড়বংশীয়—কোল, হো এবং সমেতাল সকলেই। কালক্রমে কোলের ভাষা কিছু পৃথক হয়ে গিয়েছে ; মুন্ডা বা মুন্ডি জাতি—কোল জাতীয়, তাহারা দক্ষিণ দেশাগত বলিয়া পৃথক গণ্য হয়। গঞ্জামে পাহাড়কে 'মুন্ডি' বলে, যেমন পারলাক মুন্ডি। এদেশে মুন্ডিরা প্রথমে যেখানে অর্থাৎ যে পাহাড়ে এসে বাস করেছিল, সেই পাহাড়কে বলে নোয়া মুন্ডি।

এই, ইহা শব্দ—নোয়া ও নুই তবে প্রাণীবাচক হলে,—নুই, এবং জড় পদার্থকে 'নোয়া' বলা হয়। 'নুই, মুন্ডি'—এই মুন্ডা (ব্যক্তি) এবং 'নোয়া মুন্ডি' অর্থে এই মুন্ডি (পাহাড়) বুঝায়। ইহা এইটার প্রতিশব্দ—নোয়াটা। 'বুয়াড়' শব্দটার মানে—পাঠানো এবং ফিরে যাওয়াও হয়। বুয়াড় হতে রাঢ় হতেও পারে। কিন্তু "আরাঃ" হতেই 'রাঢ়াঃ' শব্দ বেরিয়েছে। ফিরে যা—বুয়াড়ঃ মে। ফিরে গেলে পর—বুয়াড় লেন্ খান্।

সমেতাল ভাষার তরফ থেকে, বাংলো, রাঢ়াঃ, দামোদর, কোল, হো প্রভৃতি শব্দের ব্যাখ্যা করা হল, এবং আদিম জাতি-তত্ত্বের কিছু আলোচনাও করা হল। ক্রমে অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা করাও হবে।

কায়স্থ-সমাজ ● চৈত্র ১৩৩৮ (১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ)



বাঙ্গালাদেশের আদিম অধিবাসী

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী

নৃতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ পৃথিবীর বয়সকে যে তিনভাগে ভাগ করিয়াছেন, বৎসর হিসাবে তাহাদের স্থিতিকাল নির্দেশ করিতে তাঁহারা বিশেষ রাজি নহেন। অনুমান যে হিসাবের ভিত্তি, এবং অনুমানের ক্ষেত্র যেখানে শত বা হাজার নহে—লক্ষ লক্ষ বৎসর ব্যাপী, সেখানে নির্দিষ্টরূপে কোনো কথা বলা অসম্ভব, ইহা সহজেই বুঝা যায়। ভূতত্ত্ববিদগণের হিসাব মতে নব্যজীবক যুগ হ্রস্বতম, মধ্যজীবক তাহার অপেক্ষা দীর্ঘতর, প্রত্নজীবক দীর্ঘতম। পৃথিবীর আনুমানিক বয়স দশ কোটি বৎসরকে যদি ৫+৩+২ = ১০ এই ভাবে ভাগ করা যায়, তাহা হইলে নব্যজীবকের বয়স অন্তঃতপক্ষে দুই কোটি বৎসরে দাঁড়ায়। এবং এই দুইশত লক্ষ বৎসরকে ক্রমহ্রীয়মান ৭ ভাগে ভাগ করা গেলে (৫০+৪৩+৩৬+২৯+২১+১৪+৭=২০০) হীনতর জীব হইতে Pleistocene বা অত্যাধুনিক যুগ ধরা-পৃষ্ঠে মানবের আবির্ভাব প্রায় ৪২ লক্ষ বৎসর আগে হইয়াছিল বলিয়া ধরিতে হয়। ভূতত্ত্ববিদ লোগান অনুমান করিয়াছেন, পশুর অবস্থা হইতে উন্নত হইয়া প্রস্তরাস্ত্র ব্যবহার করিবার যোগ্যতা অর্জন করিতে মানবের বহু লক্ষ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছিল। আদিম মানবের ব্যবহৃত প্রস্তরাস্ত্র পৃথিবীর সর্বত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে ; ওই সমস্ত অস্ত্র সম্ভবত চারি লক্ষ বৎসর পূর্বে ব্যবহৃত হইত।*

প্রস্তরখণ্ডের আঘাতে অপর প্রস্তরখণ্ডকে সূক্ষ্মাগ্র বা তীক্ষ্ণাগ্র করিয়া উহাকে মারাত্মক অস্ত্রে পরিণত করিবার কৌশল যেদিন আদিম মানবের আয়ত্ত হইল, সেইদিনই সে পশুজগতের স্তর ছাড়াইয়া মনুষ্য জগতের স্তরে পদার্পণ করিয়া মস্তক উন্নত করিয়া

Old bhipped Stones of India–by A. C. Logan. Page 50.

দাঁড়াইল। এই যুগকে ভূতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ প্রত্নপ্রস্তর যুগ নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই প্রত্নপ্রস্তর যুগের চিহ্ন, আদিম মানবের ব্যবহৃত অনিপুণনির্মাণ প্রস্তরাস্ত্রসমূহ, ভূ-পৃষ্ঠে সর্বত্র পাওয়া গিয়াছে। কাজেই পৃথিবীময় মানব যে সর্বত্র একই প্রথায় পশুত্ব হইতে মানবত্বে উন্নীত হইয়াছিল, সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

লক্ষ লক্ষ বৎসর প্রস্তরে অস্ত্র নির্মাণ অভ্যাসের ফলে মানব এই বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিল। ভূ-পৃষ্ঠে নানাপ্রকার পাথর পাওয়া যায়। কোনোটা খুব নরম—উহার নির্মিত অস্ত্র স্থায়ী হয় না এবং সহজেই ভাঙিয়া যায়। কোনো কোনো প্রস্তর আবার ইস্পাতের মত শক্ত। মানব ক্রমশ এই শক্ত পাথরগুলিকে চিনিতে এবং অস্ত্র নির্মাণে ব্যবহার করিতে শিখিল। ফলে তাহার নির্মিত প্রস্তরাস্ত্র তীক্ষ্ণতর, কঠিনতর, সুদৃশ্যতর এবং অধিকতর মারাত্মক হইয়া উঠিল। এই সুদৃশ্য, সুচিক্কণ প্রস্তরাস্ত্রের যুগ, ১৪/১৫ হাজার বৎসর পূর্বে আরব্ধ আমাদের সভ্যতার আরম্ভের সীমানা পর্যন্ততো পৌঁছিয়াছেই ; অনেক স্থানেই ধাতুর ব্যবহার আবিষ্কৃত হইলেও প্রস্তরাস্ত্রের ব্যবহার পরিত্যক্ত হয় নাই। এই যুগকে ভূতত্ত্ববিদগণ নব্যপ্রস্তর যুগ আখ্যা দিয়াছেন।

ইহার পর কৃত্রিম উপায়ে অগ্নির উৎপাদন কৌশল আবিষ্কারে মানব-সভ্যতায় যুগান্তর উপস্থিত হইল। কাঁচা ফলমূল বা কাঁচা মাংস খাইয়া এতদিন মানবকে বাঁচিয়া থাকিতে হইত। এখন উহা অগ্নি-পক্ক করার প্রথা মানব সমাজে দাঁড়াইল। ক্রমশ মাটির হাঁড়ি-পাতিল নির্মাণ ও আগুনে পোড়াইয়া তাহা শক্ত করিয়া লইবার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইল ; মাটি পোড়াইয়া ইট তৈয়ারি করিবার কৌশল আয়ত্ব হইল ; মানবসভ্যতা দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিল। অবশেষে ধাতুর আবিষ্কারে নূতন যুগের আবির্ভাব হইল। মানব পাথর ছাড়িয়া তামা ব্যবহার করিতে শিখিল।*

কোনো কোনো দেশে তামার সহিত টিন বা রাং মিশাইয়া ব্রোঞ্জ বা পিত্তলের অস্ত্র নির্মিত হইতে লাগিল। সর্বশেষে লোহার আবিষ্কারে বর্তমান যুগের সূত্রপাত হইল।

প্রত্নপ্রস্তর যুগ, নব্যপ্রস্তর যুগ, তাম্রযুগ এবং লৌহযুগের দৈর্ঘ্যের একটা ধারণা পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। মানব কর্তৃক এই যুগসমূহে ব্যবহৃত অস্ত্র পৃথিবীর সর্বত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষেব পর্বতময় প্রদেশ বা মালভূমিতে, যেখানে প্রস্তর বা ধাতুশিলা (Ore) সহজলভ্য, সেইখানে আদিমযুগের মানবগণের ব্যবহৃত প্রস্তর বা ধাতবাস্ত্রসমূহ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা দেশের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে পাহাড়িয়া অঞ্চলে প্রত্ন ও নব্য প্রস্তরাস্ত্র কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু ওই সমস্ত আবিষ্কার সন্নিহিত পার্বত্য প্রদেশে আবিষ্কারের প্রসার বা উদ্বৃত্ত বলিয়াই বোধ হয়। ইহাদের মধ্যে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড পাহাড়ে প্রাপ্ত প্রস্তরীভূত কাষ্ঠাংশ দ্বারা নির্মিত চমৎকার পালিশ সূক্ষ্মাগ্র একখানি বিন্ধনাস্ত্র উল্লেখযোগ্য। ইহার এক পৃষ্ঠ চ্যাপটা, অপর পৃষ্ঠ গোল, অগ্র সূক্ষ্ম, মধ্যাংশ কিঞ্চিৎ মোটা, গোড়ার দিক ক্ষীণতর। লম্বায় ইহা প্রায় ৬১/২ ইঞ্চি, পাশে ১১/২ ইঞ্চি মাত্র। দেখিতে ইহা

* আমাদের দেশে পূজায় অদ্যাপি তাম্রপাত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং তাম্রধাতু পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। মানব-স্বভাবে প্রাচীনে অনুরাগ ও অন্ধ আসক্তি চিরন্তন। আমাদের দেশের তাম্র-প্রীতি তাম্রযুগের স্মারক বলিয়াই মনে হয়। কেহ কেহ বলেন, তাম্রপাত্রে সঞ্চিত জল নাকি জীবাণুনাশক।

ঠিক একটি সরলদেহ বেগুনের মতো। ইহার উপাদান প্রস্তরীভূত কাষ্ঠ চট্টগ্রাম পাহাড়ে পাওয়া যায় বলিয়া অবগত নহি। কুমিল্লা শহরের পাঁচ মাইল পূর্বস্থ ময়নামতী পাহাড়ে কিন্তু ইহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ময়নামতী পাহাড় সীতাকুণ্ড পাহাড় হইতে ৫০/৬০ মাইল উত্তরে।

কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে এক গভীর নলকূপ খুঁড়িবার সময় তিনশত ফুট নীচের ভূস্তর হইতে একখণ্ড প্রস্তরীভূত মনুষ্যাস্থি পাওয়া যায়।* ভূতত্ত্বমতে এই ৩০০ ফুট ভূমি গঠিত হইতে ৩০০ × ৪৫০০ = ১৩৫০০০০ তেরো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বৎসর লাগিয়াছে। কাজেই এই প্রস্তরীভূত আস্থিখানিকে অতি প্রাচীনকাল হইতে বাঙ্গালার সমতল প্রদেশে মনুষ্যবসতির চিহ্ন বলিয়া ধরিতে ভূতত্ত্ববিদগণ সমুৎসুক। এই বিষয়ে বিচার্য এই যে সুপ্রাচীন যুগ হইতে সমুদ্র পৃষ্ঠের আপেক্ষিক উচ্চতার সম্ভবত বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয় নাই। সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে উচ্চ না হইয়া কোনো ভূমি মানবের বাসযোগ্য হইতে পারে না। সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে তিন ফুট মাত্র উচ্চ সুন্দরবনের সুবিস্তৃত দক্ষিণাংশ অদ্যাপি মানবের বাসযোগ্য হয় নাই। বর্তমানে কলিকাতা অঞ্চলের এবং গঙ্গার দক্ষিণস্থ প্রায় সমগ্র দেশাংশের সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে আপেক্ষিক উচ্চতা ১৮ হইতে ২১ ফুট মাত্র। সমুদ্র হইতে চারি পাঁচ ফুট উঁচু হইতেই এই অঞ্চল মনুষ্য বাসযোগ্য হইয়াছে ধরিয়া লইলে দেখা যায় যে বাসযোগ্য পাঁচ ফুটের উপরেও আরও ফুট পনেরো পলিমাটি গড়িয়া উঠিতে ১৫ × ৪৫০০ = ৬৭৫০০ বৎসর লাগিয়াছিল এবং তত বৎসর ধরিয়াই নিম্নবঙ্গ বাসযোগ্য হইয়াছে।

কাজেই তেরো লক্ষের গণনা ছাড়িয়া—গণনা ৫০/৬০ হাজারে নামাইয়া আনাই সংগত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু পঞ্চাশ হাজার বৎসরও তো অল্প কাল নহে। এই যুগের মানুষেরা পৃথিবীর সর্বত্র ব্যবহৃত প্রস্তরাস্ত্রে তাহাদের নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা দেশে তাহাদের বসতির চিহ্ন এত অপ্রচুর কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর অতি সহজেই দেওয়া চলে। বাঙ্গালা দেশ প্রস্তরহীন দেশ। প্রস্তরাস্ত্রের আবিষ্কারেই আমরা আদিম মানবের অস্তিত্ব অবগত হইতে পারিয়াছি। বাঙ্গালা দেশে সেই অস্ত্রের উপাদানের একান্ত অভাব ছিল। তাই দেখিতে পাই, ময়নামতী পাহাড়ে প্রাপ্ত নাতিদৃঢ় প্রস্তরীভূত কাষ্ঠেও অস্ত্র নির্মাণ চেষ্টা চলিয়াছিল। কাজেই বাঙ্গালার আদিম মানব অস্ত্র নির্মাণে উদাসীন ছিল না, উপাদানের অভাবেই তাহার আদিম অস্ত্র নির্মাণ চেষ্টার কোনো নিদর্শন আমাদের সময় পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছায় নাই।

কিন্তু অস্ত্র যে একমাত্র পাথর বা ধাতুতেই গঠিত হইতে পারে তাহা নহে। বাঁশের লাঠি বা শক্ত কাঠের লাঠি যে কী প্রকার মারাত্মক অস্ত্র হইতে পারে, উহাদের আঘাতের আস্বাদের সহিত পরিচিত ব্যক্তি মাত্রেরই তাহা জানা আছে। প্রস্তরাভাবে বাঙ্গালীর প্রতিভা আদিম যুগ হইতেই কাষ্ঠ বা বংশদণ্ডাস্ত্র নির্মাণে ধাবিত হইয়াছিল, সেই বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। বাঙ্গালী লাঠিয়ালের বা ঠেঙাড়্যের সহস্র সহস্র বৎসরের অভ্যাসের ফলে লাঠি

* "Memorandum on the ancient bed of the river Soane and the site of Palibothra"—by Ravenshaw, quoted by Mr. Nandalal De—in his article—"Early course of the Ganges." Indian Antiquary—1921. P. 34.

বাঙ্গালীর হস্তে যে কেমন ভয়ানক অস্ত্র হইয়া উঠিয়াছিল তাহা অনেকেরই জানা আছে। লাঠিয়ালের সুচিরাভ্যস্ত পরিণত বিদ্যার সহিতই আমরা পরিচিত এবং অদ্যাপি নূতন চর বা জমি দখল করিতে জমিদারগণ লাঠিয়ালেরই স্মরণ করেন। ঠেঙ্গাত্যে ডাকাতগণের ব্যবসায় লুপ্ত হওয়াতে বুমারেঙ নিক্ষেপকারী অস্ট্রেলিয়াবাসীগণের স্পর্দ্ধী ঠেঙা নিক্ষেপকারী ঠেঙাত্যে ডাকাতগণ দেশ হইতে লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু লাঠি পরিচালনার বিদ্যা অদ্যাপি দেশে জাগ্রত। নমশূদ্র বা ভূমিজ লাঠিয়ালগণ স্মরণাতীত কাল হইতে এই বিদ্যায় অসাধারণ কুশল। এই কুশলতা প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে অভ্যাসের ফলে অর্জিত বলিয়া যুক্তিসংগতরূপেই ধরা যায়।

বাঙ্গালা দেশের বর্তমান অধিবাসীগণকে প্রধান দুইভাগে বিভক্ত করা যায়,—প্রাগার্য এবং আর্য। প্রাগার্যগণের মধ্যে জনসংখ্যার এবং বৈষয়িক ও কর্ষণামূলক উন্নতিতে কৈবর্তগণ সর্বশ্রেষ্ঠ। কৈবর্তগণ প্রধানত দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গের অধিবাসী। নমশূদ্রগণ জনসংখ্যায় দ্বিতীয় প্রাগার্য জাতি। ইহারা প্রধানত দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের অধিবাসী। জনসংখ্যায় তৃতীয় প্রাগার্য জাতি রাজবংশিগণ প্রধানত উত্তর বঙ্গের অধিবাসী। ১৯৩১ সনের লোক-গণনায় দেখা গিয়াছে, বাঙ্গালা দেশের হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা মোট দুই কোটি বাইশ লক্ষের কিছু বেশি। ইহার মধ্যে কৈবর্ত, নমশূদ্র এবং রাজবংশিগণের মিলিত সংখ্যা প্রায় ছেষট্টি লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার, অর্থাৎ তৃতীয়াংশেরও বেশি।

এই প্রাগার্যগণ কি বিবর্তনের ফলে বাঙ্গালা দেশেই উদ্ভূত হইয়াছে? অথবা তাহারা বাহির হইতে আসিয়া বাঙ্গালা দেশ অধিকার করিয়াছে? তাহারা কি ভিন্ন ভিন্ন জাতির বংশধর, অথবা একই মূল জাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখা মাত্র? যদি ইহারা বিভিন্ন জতির বংশধর হইয়া থাকে, তবে কোন্ জাতি বাঙ্গালা দেশের আদি অধিবাসী? তাহাদের পরে কাহারা আসিয়াছিল? সর্বশেষ, আর্যগণ কবে আসিল?

এই সমস্ত প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া প্রায় অসম্ভব। আর্যকর্ষণা, আর্যধর্ম প্রাগার্যগণের মন এমন করিয়াই জয় করিয়াছে যে প্রাগার্যগণ নিজেদের গৌরবময় প্রাগার্যযুগের কথা স্মরণ করিয়া আর গৌরব বোধ করে না, ওই যুগের প্রতি মমত্ববোধ তাহারা একেবারে হারাইয়া ফেলিয়াছে। মূল চতুর্বর্ণ হইতে ব্রাহ্মণ্যধর্মের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত জাতির উৎপত্তি নির্দেশ করিয়া শাস্ত্রকারগণ দুই চারিটি ছেলে-ভুলানো শ্লোক রচনা করিয়া গিয়াছেন, প্রাগার্যগণ এই মারাত্মক মোহে বৈজ্ঞানিক সমস্তপ্রকার সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে সেই শ্লোকগুলিকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া বসিয়া আছেন। প্রাগার্য বলিয়া তাহাদিগকে কেহ বিশেষিত করিলে তাঁহার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়া দাঁড়াইতেছেন, তুমুল কোলাহলে বৈজ্ঞানিক আলোচনার কণ্ঠরোধে প্রয়াস পাইতেছেন! এই আর্যত্ব মোহ কি কোনোদিন তাহাদের ঘুচিবে না? সহজ চক্ষু, সহজ বুদ্ধি লইয়া সরল সত্যানুসন্ধান কি কোনোদিন এই প্রাগার্যসমাজের মস্তিষ্কস্থানীয় সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণেরও ব্রত হইয়া উঠিবে না? জাপানিগণ, চিনগণ, ব্রহ্মদেশবাসীগণ, সেমিটিক জাতীয় জনগণ অন্-আর্য বলিয়া কোনোদিন অগৌরব বোধ করেন বলিয়া জানা যায় না। দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়গণ আর্য সভ্যতা গ্রহণ করিয়াও দ্রাবিড় বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন না, দ্রাবিড়গণের প্রাগার্যযুগের গৌরবে মমত্ব-

বোধহীন নহেন। বাঙ্গালা দেশের প্রাগার্যগণই কি চিরদিন এই দারুণ আর্যমোহে আচ্ছন্ন হইয়া থাকিবেন?

শাস্ত্রকারগণ বর্ণসংকর বা ব্রাত্যপর্যায়ে ফেলিয়া প্রাগার্যগণকে চতুর্বর্ণের গণ্ডির মধ্যে টানিয়া আনিয়াছেন। প্রাচীন আর্য সমাজের, এমনকি, ঐতিহাসিক যুগের আর্য সমাজে পর্যন্ত অনুলোম বিবাহ, কচ্চিৎ প্রতিলোম বিবাহও প্রচলিত ছিল। কাজেই আর্য সমাজে বর্ণসংকর সংঘটন ব্যপারাটা অলীক নহে ; বর্ণমিশ্রণ জাত জনসমূহ আর্য সমাজে নির্দিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গালায় এই বর্ণসংকরত্বের প্রসারের পরিমাণ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট সত্য নির্ণয় সত্যানুসন্ধানী ব্যক্তিমাত্রেরই কর্তব্য। এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে বাঙ্গালী কাহাকে বলি, কাহার ইতিহাস লিখিতে বসিয়াছি তাহা নির্দিষ্ট করিয়া লওয়া আবশ্যক।

ইহা সর্বজনবিদিত সত্য যে ভৌগোলিক হিসাবে বাঙ্গালা দেশের সীমা নির্দেশ করা সহজ নহে। কারণ এই সীমানা যুগে যুগে পরিবর্তিত হইয়াছে। পৌরাণিক যুগে অথবা ঐতিহাসিক যুগে, এমনকি ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের পূর্বেও বাঙ্গালা দেশ বলিতে যাহা বুঝা যাইত, বর্তমানে তাহা বুঝায় না। কাজেই বাঙ্গালা দেশ ও বাঙ্গালী জাতি বলিতে কী বুঝিব তাহা স্পষ্ট করিয়া লওয়া আবশ্যক।

সৌভাগ্যক্রমে বাঙ্গালার প্রকৃত ইতিহাস রচনার পথপ্রদর্শক মনীষী বঙ্কিমচন্দ্রের এই বিষয়ে নির্দেশ রহিয়া গিয়াছে। "বাঙ্গালীর উৎপত্তি" নামক মূল্যবান প্রবন্ধের তৃতীয় পরিচ্ছেদে (বিবিধ প্রবন্ধ, পরিষৎ প্রকাশিত শত-বার্ষিকী সংস্করণ, ৩৪৬ পৃষ্ঠা) তিনি লিখিয়া গিয়াছেন—"যে লোকের মাতৃ-ভাষা বাঙ্গালা—সেই বাঙ্গালী।" এই হিসাবে সিংভূম, মানভূম, সাঁওতাল পরগনার অংশ এবং পূর্ণিয়া ও শ্রীহট্ট জেলা বাঙ্গালার অন্তর্গত। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা বর্তমান বঙ্গাদেশ এবং এই সমস্ত জেলা ও জেলার অংশ জুড়িয়া যে বিরাট বাঙ্গালী জাতি বাস করিতেছে, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় বিবৃত করিব।

১৯৩১ সনের লোক-গণনা অনুসারে সমগ্র বাঙ্গালার লোক সংখ্যা পাঁচ কোটি দশ লক্ষ সাতাশি হাজার তিনশত আটত্রিশ। ইহাদের মধ্যে দুই কোটি আটাত্তর লক্ষ দশ হাজার একশত মুসলমান। দুই কোটি বাইশ লক্ষ বারো হাজার উনসত্তর জন হিন্দু। বাকি দশ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার একশত উনসত্তর জন আর্য ধর্মের দেব-পূজক। যথা—আদিম জাতি ৫২৯৪১৯, বৌদ্ধ ৩৩০৫৬৩, খ্রিস্টান ১৮৩০৬৭, জৈন ৯৬৬৯, শিখ ৭৩৩৪, ইহুদি ১৮৬৭,, পার্শি ১৫২০, কনফিউসিয়াসের মতাবলম্বী ১৪৪৭ এবং অনির্দিষ্ট ২৮৩। মুসলমানগণের অধিকাংশই ধর্মান্তর গ্রহণকারী হিন্দু, কাজেই পৃথক পৃথক জাতির বর্ণনায় ইহাদের স্থান নাই। যথাস্থানে মুসলমান জনগণের ভিন্ন বর্ণনা প্রদত্ত হইল। হিন্দুজাতি সমূহের বর্ণনা আকারাদি ক্রমে লিপিবন্ধ হইল।



আদ্য বাঙ্গালী জাতি—মারাং-বুরু মানব

শ্রীহরিদাস পালিত

ভারতে 'মারাং-বুরু' মানবের আবির্ভাব

কাল পরিমাণ কত, ইহার নির্ণয়-চেষ্টা ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে যে নাই তাহা নহে কিন্তু সেকালের কথা প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা বলিবার উপায় নাই এবং বর্তমান বৈজ্ঞানিক নৃতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন না। স্বীকৃত হউক বা না হউক কিন্তু একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। এই রকমের আনুমানিক হিসাব নৃতত্ত্ববিদেরাও অন্য উপায়ে করিয়া থাকেন।

ভারতে চারি যুগের নামে,—সৃষ্টির একটা কাল পরিমাণ করিবার পদ্ধতি চলিত আছে। সত্যাদিযুগ পরিমাণের হিসাবও পঞ্জিকায় আছে, তবে সম্ভবত এই কালসংখ্যা নির্ণয় খুব সুপ্রাচীন নয়। ইহাও আনুমানিক হিসাব।

চালদিয়ার পঞ্জিকাতেও এই রকমের হিসাব রাখা হইত। চালদিয়ার মহাজলপ্লাবন কালটি কম করিয়া ধরিলেও খ্রিস্টজন্মের বত্রিশ হাজার বৎসরের পূর্বের ঘটনা। তখন চালদিয়া, বাবিলোনিয়া ইত্যাদি জনপদবাসীরা বিশেষ সভ্যতার কোঠায় উঠিয়াছিল।

এ সকল পৌরাণিক হিসাব, ঐতিহাসিক বা নৃতত্ত্ববিদগণ আদৌ বিশ্বাস করিতে চান না। তাহারা নানা উপায়ে ধরিত্রীর বয়স-সম্বন্ধীয় ঠিকুজি-কোষ্ঠী রচনা করিয়াছেন। তত্রাচ ইহাতে সকল পণ্ডিতের সম্মতি পাওয়া যায় নাই।

জে. কলিন ব্রাউন নামক জনৈক নৃতত্ত্ববিশারদ পণ্ডিত বিবিধ হেতু-মূলে একটা আনুমানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া বলিয়াছেন—'য়ুরোপের প্রস্তর কাল' খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চদশ লক্ষ বৎসর পূর্বের। তিনিই অনুমান করিয়াছেন—ভারতের প্রস্তব (পাষাণ-অস্ত্রকাল) যুগটি তথাকথিত কালের।

সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক, বহু বাদ-প্রতিবাদ সত্ত্বেও ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, আদি মানব যখন পাষাণ অস্ত্রাদির ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছিল, সে কালটি খুব প্রাচীন, খুব কম হইলেও ধরিয়া লওয়া গেল, বর্তমান কাল হইতে পনেরো লক্ষ এক হাজার নয় শত তেত্রিশ (১৫,০১,৯৩৩) বৎসরের প্রাচীন।

তথাকথিত কালে ভারতের লোকেরা পাষাণ-অস্ত্রশস্ত্রাদির ব্যবহার করিত। পণ্ডিতেরা পাষাণ কালকে দুই শ্রেণিতে বিভাগ করিয়াছেন। প্রাচীন পাষাণ-অস্ত্রের কাল এবং নবীন পাষাণ-অস্ত্রের কাল। দ্বিতীয় কালের পাষাণ-অস্ত্রগুলি অনেকটা সুমার্জিত সুতরাং সুন্দর। তৎপূর্ববর্তী কালে তদ্রূপ ছিল না।

ভারতের পাষাণ কাল, ১৫,০১,৯৩৩ বৎসর গত হইল বিদ্যমান ছিল। সেকালের পাষাণ-অস্ত্রাদি ভারতের নানা স্থানে, বিভিন্ন সময়ে আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেইগুলির তথ্যসহ চিত্রও প্রত্নতাত্ত্বিকগণ মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন। এ পর্যন্ত হিমালয়ের পাদমূলে, তথাকথিত নিদর্শন আবিষ্কৃত হয় নাই। ভারতের স্থানবিশেষের আবিষ্কৃত কতিপয় তথ্য নিম্নে সংক্ষেপে লিখিত হইল।

পশ্চিম রাঢ় এবং উহার পারিপার্শ্বিক

স্থান বিশেষে, কয়েক স্থানে কয়েক প্রকার পাষাণ-অস্ত্রাদির প্রাপ্তির তালিকা—

১। পরেশনাথ পাহাড়ের পাদমূলে ছেদন অস্ত্র।

২। রানিগঞ্জের বোখারোর কয়লার খাদে কুঠার।

৩। ছোটোনাগপুরের বুড়াডিহ গ্রামে কুঠার ফলক।

৪। সুবর্ণরেখার বালির চড়ায় একাধিক কুঠারফলক, (সিংভূম)

৫। চক্রধরপুরের আট ক্রোশ দূরে—ছুরিকাস্ত্র, (সিংভূম)

৬। সিংভূম চাঞবাসায় কয়েকটি পাষাণ অস্ত্র।

৭। রাঁচি (বর্তমান বিহার ও উড়িষ্যা বিভাগ) পারিপার্শ্বিক ভূ-ভাগে, বহুতর পাষাণ-অস্ত্র এবং গৃহকর্মের উপযোগী যন্ত্রপাতি।

এই ক্ষুদ্র তালিকা অবলম্বনে বলা যাইতে পারে, ওই সকল ভূ-ভাগ সুপ্রাচীন কালে রাড় (রাঢ়?) ভূমির অন্তর্গত ছিল। পরেশনাথ (পরবর্তী নাম) পাহাড়শ্রেণি, হাজারিবাগ পার্বতীয় প্রদেশ, মন্দরশৈল, মধুপুর, গিরিডি, আসানসোল, রানিগঞ্জ, রাঁচি, পুরুলিয়া, পঞ্চকোট, সিনি, চাঞবাসা প্রভৃতি ভূ-ভাগসকল, প্রাচীন হড় জাতি (সমেতাল) গণের আদি লীলাক্ষেত্র ছিল।

'মারাং-বুরু' মানব ভারতের আদিম অধিবাসী, বৈদেশিক পণ্ডিতেরা ইহাদিগকে কোলারীয়ন, দ্রাভিডিয়ান নাম দিয়া আগন্তুক জাতি মধ্যে গণনা করিয়া থাকেন। তাহারা যাহারাই হউক না কেন, বিবিধ ব্যাপারে তাহারা কাঠ এবং পাথরের নির্মিত অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিত।

নর্মদা নদীর নিকটবর্তী 'ভূত্র' নামক স্থানে—পুরাকালের সঞ্চিত কাঁকর ও বালির মধ্যে হেকেট নামক জনৈক প্রত্নতত্ত্ববিদ অতিকায় প্রাণীর কঙ্কালসহ কতকগুলি পাষাণ-অস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই সকল বিবরণ "দি ইন্ডিয়ান এম্পায়ার"-এর ৯০-৯৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে। এই উক্তি ও আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা বুঝা যায়, বিন্ধ্য পর্বতমালার দক্ষিণভাগে তথাকথিত মানবেরা একদা বাস করিত।

ওয়াইনি ও ব্রুস ফুট নামক বৈদেশিক পণ্ডিতদ্বয়, গোদাবরী এবং কিষ্কিন্ধ্যার পারিপার্শ্বিক স্থানে, বিস্তর প্রাচীন 'পাষাণ কালে'র নিদর্শন আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কার্লাইল নামক জনৈক ইংরেজ কর্মচারী বিন্ধ্যগিরির কোনো সংকট পথে এবং বাঘেলখণ্ড, রেবা ও মির্জাপুর জেলার স্থানবিশেষে ক্ষুদ্রাকার পাষাণ-অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন (দি ই এম—৯০-৯৭ পৃঃ)। তথাকথিত ক্ষুদ্রাকার দ্রব্যগুলিকে পিগমি ফ্লিন্টস (বামন-শিলা) নাম দেওয়া হইয়াছে। সম্ভবত সেগুলি শিশুর ক্রীড়নক দ্রব্য। কার্লাইল পর্বতগুহার তলদেশে ভস্ম ও অঙ্গার দেখিয়াছিলেন এবং তথাকথিত গুহার ভিত্তিগাত্রে গিরিমাটির দ্বারা নানা রকমে চিত্র লেখা ছিল। অধিকন্তু কোনো কোনো গুহায় কার্লাইল মৃতের সমাধি মধ্যে নরকঙ্কাল, মাটির পাত্রাদি এবং পাষাণ-অস্ত্রশস্ত্রাদিও আবিষ্কার করেন (ওই)। অঙ্গার দ্বারা অগ্নিদগ্ধ মৃৎপাত্র ব্যবহারের পরিচয় পাই।

দেখা যাইতেছে দক্ষিণ ভারতে 'নব-পাষাণ' কালের 'মারাং-বুরু' মানবের বিশাল উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। ব্রুস ফুটের অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে বসতি (পল্লি বিশেষ) এবং শিল্পশালার নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কর্মশালায় বিস্তর পাষাণ-অস্ত্রাদি, মৃৎ-পাত্র পাওয়া গিয়াছিল। তথাকথিত মাটির পাত্রাদি চক্রসাধিত।

অতএব 'নব-পাষাণ' কালের 'মারাং-বুরু' মানবেরা, গুহায় এবং পল্লিতে বাস করিত। ভিত্তিগাত্রে গিরিমাটি দিয়া ছবি আঁকিত। মৃতদেহের সমাধি দিত। অগ্নির ব্যবহার জানিত, চক্রসাধনে মাটির পাত্র প্রস্তুত করিত।

হাজারিবাগ এবং রাঁচির মধ্যে দামোদর নদ প্রবাহিত। এই নদেব উৎপত্তি-ক্ষেত্র হাজারিবাগ পাহাড়শ্রেণি। যে শৈলমালা হইতে দামোদর জন্মলাভ করিয়াছে, তথায় আদি বাঙ্গালী হড়জাতির আদি প্রত্নৌক। তথাকথিত পাহাড়িয়া বনভূমিতে হড়জাতি প্রথম আবির্ভূত হইয়াছে বলিয়া তাহাদের শ্রুতি আছে। হাজারিবাগ পাহাড়শ্রেণিকেই ইহারা 'মারাং-বুবু' বলিয়া থাকে। তাহাদের আদি জন্মস্থানের আদি-বন্যার নদ—'দাঃ মুদাঃ'। সংস্কৃতে উহাকেই 'দামোদর' নাম দেওয়া হইয়াছে। এই নদকে হড় জাতিরা পরম পবিত্র জ্ঞানে সম্মান ও ভক্তি করিয়া থাকে।

রাঁচি ও তার পারিপার্শ্বিক ভূ-ভাগ

হড় জাতির আদি লীলার স্থান। রাঁচি ও তাহার পারিপার্শ্বিক স্থানে যে সকল পাষাণ নির্মিত দ্রব্যাদির আবিষ্কার হইয়াছে, উহার সংখ্যা ও গৃহস্থালির উপযোগী পেষণ-যন্ত্রাদিও

দেখিলে বলিতে বাধ্য হইতে হয় যে, তথায় পাষাণ কালের চরম উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। তথাকথিত পাষাণ দ্রব্যাদির যাহারা ব্যবহার করিত, তাহারা সভ্যতার সোপানে উন্নীত হইয়াছিল এবং সেই জাতির কেন্দ্রস্থান তথায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তথায় নব-পাষাণ কালের চিহ্ন সুস্পষ্ট। তাহারা যে জাতিই হউক না কেন, তাহাদিগকে 'মারাং-বুরু' মানব নামে অভিহিত করা গেল। কেন-না হড় জাতি তথাকথিত পাহাড় শ্রেণিকে 'মারাং-বুরু' (শ্রেষ্ঠ পাহাড়) বলিয়া থাকে।

'মারাং-বুরু' মানব

গণের প্রধান কেন্দ্র রাঁচি ও তাহার পারিপার্শ্বিক ভূ-ভাগে একদা বিদ্যমান ছিল। উড়িষ্যার (বর্তমান) ঢেকানল, আংগুল, তালচের, সম্বলপুর প্রভৃতি স্থানে একাধিক পাষাণ-অস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। মাদ্রাজ প্রদেশের স্থানবিশেষে পাষাণ দ্রব্যাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ ভিনসেন্ট বল গবেষণা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—রানিগঞ্জাদির পাষাণ-অস্ত্রাদি এবং উড়িষ্যার অস্ত্রাদি একই প্রকার এবং উভয় অঞ্চলের পাষাণ-অস্ত্রাদির পাথর একই প্রকারের। অধিকন্তু মাদ্রাজের প্রস্তর অস্ত্রাদির পাথর ও আকৃতি-গঠন বাংলা দেশেরই মতো। তিনি এই তথ্য অবলম্বনে স্থির করিয়াছেন যে, দক্ষিণ দেশবাসী এবং উত্তর দেশবাসী পাষাণ-কালের মানবগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল। আমরাও সাদৃশ-উপাদান দৃষ্টে উভয় দেশবাসীর মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, ইহা বুঝিতে পারিয়াছি।

মিঃ বল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পাষাণ-মানব দক্ষিণ ভারত হইতে উত্তরে আসিয়াছিল। কেবল আমরা এই অনুমানটি গ্রহণ করিতে পারি নাই। নানা উপায়ে অবগত হওয়া যায় যে, হড়জাতির (কোল প্রভৃতি) আদি প্রত্নৌক দামোদর নদের উৎপত্তি স্থল হাজারিবাগ গিরিমালা (মারাং-বুরু), তথা হইতে রাঁচি, মানভূম, সিংভূম অতিক্রম করিয়া কালে বর্তমান উড়িষ্যা দেশে এবং কোনো কোনো দল বিন্ধ্য পর্বতমালার সংকটপথ অতিক্রম করিয়া এবং চিহ্ন রাখিয়া ক্রমশ দক্ষিণ ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। দক্ষিণ দেশ হইতে 'পাষাণ-মানব' উত্তর ভারতে আসে নাই। কোল এবং সমেতাল (হড়) একই মূল জাতির বিভিন্ন শাখা মাত্র। দক্ষিণ ভারতে হড়-কোল প্রাধান্য সর্বপ্রথমে ছিল না। হড়-কোল অ-ভারতীয় জাতিও নহে। 'প্রস্তর কাল' যদি পনেরো লক্ষ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দের হয়, তাহা হইলে তাহারাই 'মারাং-বুরু' মানব। নৃতত্ত্ববিদ্যাবিদগণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, হিমালয়ের দক্ষিণে আদিকালে মানবের আবির্ভাব হইয়াছিল। আমরা দেখিতেছি, রাঁচিকে কেন্দ্র করিয়া পাষাণ-মানবদের একটা সুবৃহৎ আড্ডা গড়িয়া উঠিয়াছিল। সেটি সুপ্রাচীন রাঢ়দেশকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। দক্ষিণ ভারতে রাঁচির মত পাষাণ-মানবগণের প্রাথমিক কেন্দ্র কুত্রাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। শস্য পেষণের মুষল রাঁচিতে পাওয়া গিয়াছে। ইহা উন্নতির পরিচায়ক।

অ-ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ, পবিত্র বাইবেলের সম্মান রক্ষার্থে বোধহয় ভারতে কোনো মানব জাতির আদি দম্পতির প্রকটের উল্লেখ করেন নাই। ধর্মশাস্ত্রের এতাদৃশ পৌরাণিক মতবাদ বর্তমান ইতিহাসে শোভা পায় না। সাম্প্রদায়িক তথাকথিত মতবাদ এখন অচল

হইয়া পড়িয়াছে। বৈদেশিক তথাকথিত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়। কোলপ্রমুখ জাতি এবং দ্রাবিড় জাতি যে অ-ভারতীয়, এ উক্তি বিশ্বাসযোগ্যও নয়। নৃতত্ত্ববিদগণের প্রচেষ্টায় সত্য ক্রমশ ব্যক্ত হইতেছে। হিমালয়ের দক্ষিণে খ্রিস্টপূর্ব পনেরো লক্ষ বৎসর পূর্বে যদি পাষাণ কালের মানব বিদ্যমান থাকার প্রমাণ হয়, তাহা হইলে তথাকথিত কালের পূর্বে ভারতে আদি মানববিশেষের প্রকট হওয়া অসম্ভব কিছুই নয়। ভূ-তত্ত্ববিদগণের মতে জলময় ভারতে, প্রথমে পরেশনাথ গিরিশ্রেণি এবং দক্ষিণ ভারতে নীলগিরিশ্রেণি মস্তক উত্তোলন করিয়াছিল। হড়-শ্রুতির মতো শ্রুতি দক্ষিণ ভারতের কোনো জাতির মধ্যে প্রচলিত নাই। নীলগিরি অঞ্চলে যে সকল প্রাচীন নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, যথা এড়ুক প্রভৃতি, সেগুলি কিঞ্চিৎ সভ্যতার নিদর্শন বহন করিতেছে।

দ্রাবিড় জাতিরা দক্ষিণ ভারতের আদি অভিনেতা। তাহারা প্রাথমিক হড়জাতির কিছু উন্নত অবস্থার লোক। বৈদিক, পৌরাণিক সাহিত্য প্রভৃতিতে—হিমালয় (উত্তরমেরু বা মেরু) প্রদেশই—আদি নর-মিথুনের প্রকটস্থল। কিন্তু ভূ-তত্ত্ববিদগণের মতে, উহা পরেশনাথ পাহাড়শ্রেণির পরবর্তী কালের। 'মারাং-বুরু' সর্বাদি শৈলমালা উত্তর ভারতের।

পুরুলিয়ার পশ্চিমে, বাঁকুড়া হইতে একশত মাইল দূরে, একটা প্রকাণ্ড গভীর খাত ছিল। ওই প্রকারের গভীর গর্ত (হ্রদ) এক সময়ে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের নানা স্থানে ছিল। সেই জলময় ভূ-ভাগে বহু শৈলশিখর দেখা যাইত। বর্তমান চিল্কাহ্রদের মধ্যে যদ্রূপ ছোটোখাটো পাহাড় দেখা যায় যাহা ক্রমশ পলি পড়িয়া ধরাপৃষ্ঠ হইতে উন্নত হইয়াছে, তদ্রূপ প্রথায় উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের শৈল পারিপার্শ্বিক ভূমিগঠিত এবং উন্নত হইয়াছে। শৈলমালার পারিপার্শ্বিক স্থান সর্বপ্রথমে প্রকট হইয়াছিল এবং অপরাংশ জলময় ছিল। 'মারাং-বুরু' শৈলমালা হইতে তথাকথিত 'মারাং-বুরু' মানবের শৈলমালা বা উহার সংলগ্ন উন্নত স্থলভাগ অবলম্বনে পশ্চিমে এবং দক্ষিণে গমন ব্যতীত অন্য উপায় ছিল না। অতএব হাজারিবাগ হইতে শৈলময় ভূ-ভাগ অবলম্বনে ময়ূরভঞ্জ হইয়া উড়িষ্যায় যাওয়াই সম্ভব, ক্রমে পূর্বঘাট শৈলমালা অবলম্বনে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি যাওয়া বিচিত্র নয়। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করা সম্ভব নয়।

তাম্র-অস্ত্রগুলি

পাষাণ-অস্ত্রের দ্বিতীয় অবস্থাতেই নির্মিত হইয়া থাকিবে, তখনও ভারতের নানাস্থানে পাষাণ-অস্ত্রের ব্যবহার চলিত ছিল। নব্য পাষাণ কালেই তাম্র-অস্ত্রের প্রবর্তনকাল ধরা চলে।* ঋগ্বেদে তাম্র শব্দের প্রয়োগ নাই। (হিস্ট্রি অব দি ভেদিক লিটারেচার—৫৫ পত্র)।

হাজারিবাগের পচম্বা নামক স্থানে তামার অস্ত্র পাওয়া গিয়াছে। মেদিনীপুর ঝাটিবনির তামাজুড়ি গ্রামে তামার অস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। ডাক্তার সইসি বারগুন্ডা তাম্রখনির নিকট

* নব-পাষাণ কালের শেষ অবস্থায়, 'ব্রোঞ্জ' নামক মিশ্র ধাতব দ্রব্যের ব্যবহার প্রচলিত হয়। পণ্ডিতেরা বলেন, ভারতে ইহার বিকাশ হয় নাই। দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি পর্বতশ্রেণির কোনো কোনো প্রদেশের প্রাচীন সমাধি (এড়ুক) মধ্যে উক্ত ধাতব দ্রব্যাদি পাওয়া গিয়াছে।

কিছু তামার অলংকার এবং একখানি তামার বৃহৎ কুঠার প্রাপ্তির কথা বলিয়াছেন। সিংভূম জেলায় পাহাড় অঞ্চলে একাধিক প্রাচীন তামার খাতের গর্ত বিদ্যমান আছে।

'দি ইন্ডিয়ান এম্পায়ার' ৯৭ পত্রে দেখা যায়—১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে মধ্য ভারতের বালাঘাট জেলার গাংগেরিয়া গ্রামের নিকটবর্তী একটা গর্ত-মধ্যে কতিপয় তামার যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল। বিশেষজ্ঞগণ স্বীকার করিয়াছেন—সেগুলি খুবই প্রাচীন। ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ বলিয়াছেন, তথাকথিত তাম্রদ্রব্যাদি খ্রিস্টপূর্ব দুই হাজার হইতে দেড় হাজার বৎসরের। এছাড়া কানপুর, ফতেগড়, মৈনপুরি এবং মথুরা ইত্যাদি জেলার স্থান বিশেষে তামার অস্ত্রশস্ত্র অনেকগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তামার খনির অভাব ভারতে নাই। হিমালয়ের দার্জিলিং হইতে কুমায়ুন পর্যন্ত তামার আকর আছে। কিন্তু এতদঞ্চলের তামার পাথর হইতে তথাকথিত তামা প্রস্তুত করিবার কোনো নিদর্শন এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

ছোটোনাগপুরের অন্তর্গত সিংভূমে (মঃ ভারতে) এবং দক্ষিণ ভারতের নেলোর জেলায় তামা যথেষ্ট বিদ্যমান রহিয়াছে। সিংভূমের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া প্রাচীন কূপ-খাত দেখিয়াছি। তথায় তামা প্রস্তুতের নিদর্শন-স্বরূপ অঙ্গাররাশি ও আবর্জনা দেখা গিয়াছে। সে সকল যে কত পুরাতন বলিতে পারা যায় না। বি. এন. আর কোম্পানি যখন রাস্তা নির্মাণ করিয়াছিল, শুনা গিয়াছে তখন তামার তাল কোনো কোনো প্রাচীন কর্মশালার নিকট পাওয়া গিয়াছিল।

তথাকথিত কালে উত্তর ভারতে সিংভূমের তামাই ব্যবহার হইত। যাহারা তাম্রশিল্পী তাহাদিগকে 'সারাক' বলা হইত। এই জাতি এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। এখন তাহাদের মধ্যে অনেকেই তাঁতের কর্ম করে। সিংভূম 'মারাং-বুরু' মানবের সুপ্রাচীন কেন্দ্র। যে সকল স্থানে তামার দ্রব্যাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সম্ভবত সে সকলই সিংভূম অঞ্চল হইতে গিয়া থাকিবে। সিংভূমবাসীরা তথাকথিত কালে যে ওই সকল জনপদে গিয়াছিল ইহা অনুমিত হয়। দক্ষিণ ভারতের নেলোর জেলায়, প্রাচীন কালে তামা প্রস্তুত হইত কি না, নিঃসন্দেহে বলা যায় না। হাজারিবাগ হইতেই তামা দক্ষিণ ভারতে গিয়া থাকিবে।

তামার পাথর হইতে যে উপায়ে তামা বাহির করা হইত, হয়ত ওই প্রণালীতে দৈবাৎ তৎসদৃশ লোহার পাথর দগ্ধ করিয়া লৌহ প্রথমে আবিষ্কৃত হইয়া থাকিবে। হাজারিবাগ অঞ্চলে লৌহপ্রস্তরের অভাব নাই। মনে হয় হাজারিবাগেই প্রথমে লৌহ আবিষ্কৃত হইয়া থাকিবে। বহু 'মারাং-বুরু' মানববংশীয় হড় প্রভৃতি জাতি লৌহ প্রস্তুত করিত। তাহাদিগকে 'লোহাড়' বলে। হাজারিবাগ পাষাণ, তাম্র এবং লৌহ-কালের পরিচয় প্রদান করে।

লৌহের ব্যবহার

সম্বন্ধে প্রত্নতাত্ত্বিকগণের অভিমত যে, খ্রিস্টপূর্ব নবম শতকে মিশরে লৌহ প্রচলিত হয় নাই। কিন্তু চালদীয় বাবিলনীয় রাজ্যে মিশরের কয়েক শতাব্দী পূর্বে লৌহের প্রচলন প্রবর্তিত হইয়াছিল। সম্ভবত তথাকথিত দেশের প্রাচীন বৈদেশিক জাতিরাই লৌহের ব্যবহার প্রবর্তিত করিয়া থাকিবে। তথাকথিত দেশের সুমারীয়-আকাদ দেশবাসীরা, আদৌ

ভারতীয় (হল, এনসিয়েন্ট হিস্ট্রি)। ঋগ্বেদে ১/১৬৩/৩৯—৭৪ টীকায় ভারতকে সর্বাদি সভ্য দেশ বলিয়া উক্তি আছে।* (দি ভেদিক লিটারেচার—৭৭ পৃষ্ঠা)। বৈদেশিক বর্ষে, হাচিন্‌স, জলি প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণের মতে পাষাণাদি কাল চতুষ্টয় অন্যূন চার হাজার বৎসর ব্যাপিয়া স্ফূর্তি পাইয়াছিল। ভারতে তদ্রূপ হইয়াছিল কিনা বলা যায় না, বোধ হয় 'প্রস্তর কালে'র পর অপেক্ষাকৃত দ্রুত গতিতে ভারতে তথাকথিত কালের পরিবর্তন হইয়া থাকিবে।

ভগবান বাল্মীকি সুগ্রীবের মুখে বলাইয়াছেন—

এতাবদ্বানরৈঃ সক্যং গন্তুং বানরপুঙ্গবাঃ।
অভাস্করমমর্যাদং ন জানিমস্ততঃ পরম।। ইত্যাদি

(রাঃ কিস্কিঃ, ৪০ সর্গ ৬৮)

সত্য হউক, কল্পনা হউক, পাইতেছি যে, ভারতের আদিম জাতিরা এশিয়ার বহু প্রদেশের খবরাখবর জানিত। সম্ভবত তথাকথিত জাতিরা ভারতের বহির্ভাগে যাতায়াত করিত।

---

* য়ুরোপের হ্রদবাসী তন্‌দানো বা ক্রন্‌গো জাতি নব-পাষাণ কালে এশিয়া খণ্ডেরই আদিম অধিবাসী। ডাক্তাব মন্‌রো বলিয়াছেন,—তাহারা সম্ভবত এশিয়ার আদিমবাসী, তাহারা কৃষ্ণসাগর এবং ভূমধ্যসাগব উপকূল হইয়া য়ুরোপে প্রবেশ করে। তাহাদের কেন্দ্র সুইজারল্যান্ডেই স্থাপিত হয়। হচিন্‌সন কৃত 'প্রি-হিস্‌টরিক ম্যান অ্যান্ড বিশট্‌স'—১৮৭ পৃঃ। এবং 'ম্যান বিফোর বিশট্‌স'—১১৯-১২৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য। এ জাতি অতি প্রাচীন মাবাং-বুবু মানবের সংকর বংশ বলিয়া ধারণা করিবার হেতু আছে।

উদয়ন ● ফাল্গুন ১৩৪০ (১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ)



ভারতের আদিবাসী



ছোটোনাগপুরের ওরাওঁ জাতি

শ্রীশরৎচন্দ্র রায়

রাঁচি জেলা ভারতবর্ষের আদিম জাতিসমূহের একটি প্রধান আবাসভূমি। ওরাওঁ দ্রাবিড়জাতির অন্তর্ভুক্ত, সংখ্যায় ইহারা আদিম জাতিদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে, বিশিষ্টতায় ইহাদের স্থান মুন্ডাদিগের পরেই। ছোটোনাগপুর স্থানটি খুব উচ্চে অবস্থিত, বনানীমন্ডিত বন্ধুর শৈলশ্রেণি ইহার চারিদিকে দেয়াল তুলিয়া রাখিয়াছে, সেই কারণেই বোধহয় এখানে বহু পুরাতন রীতি-নীতি আচার-ব্যবহার প্রভৃতি এখনও দেখা যায়।

দশ বৎসরের মধ্যে (১৯০১-১৯১১) ইহাদের সংখ্যা প্রায় শতকরা পঁচিশ জন হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯১১ সালের গণনায় খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদিগকে বাদ দিয়া ইহাদের সংখ্যা হইয়াছিল ৭৫১,৯৮৩। পুরুষ ৩৭৩,০৯৫ ও স্ত্রীলোক ৩৭৮,৮৮৮। তন্মধ্যে ১৫৭,৪১৪ জন হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়াছে, বাদবাকি ৫৯৪,৫৬৯ জনের ধর্মসম্বন্ধে কোনো নির্দিষ্ট ধারণা নাই।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে অখ্রিস্টান ওরাওঁদের সংখ্যা এইরূপ—

বেহার ও উড়িষ্যা	৪৭৪,৬৭৩
বঙ্গাদেশ	১৬৫,৬২৮
বেরার ও মধ্যপ্রদেশ	৮৩,০৪৯
আসাম	২৮,৫৮৩

কেবলমাত্র রাঁচি তেই অখ্রিস্টান ওরাওঁ-এর সংখ্যা ৩১০,১২১ ও পালামো জেলায় ৩৬,৬১১ জন।

অন্যান্য দ্রাবিড়বংশীয়দের মতো ওরাওঁদের আকৃতি খর্ব, মাথা সরু ও নাক চ্যাপটা। ইহাদের গাত্রচর্ম ঘোর বাদামি, চুল কালো খসখসে, কখনও বা সামান্য কোঁকড়ানো। মাথায় চুল যথেষ্ট থাকিলেও গাল ঠোঁট ও শরীরের অন্যান্য অংশে তেমন হয় না। সামান্য যা গোঁফদাড়ি তাও প্রায়ই বিশ বৎসর উত্তীর্ণ না হইলে বাহির হয় না। ইহাদের চক্ষু মাঝারি আকারের, চক্ষুতারকা কালো ও অক্ষিপল্লবের ব্যাস বাঁকা নয়। উঁচু চোয়াল ও পুরু ঠোঁট। পায়ের ডিম সুপুষ্ট।

খর্বাকৃতি হইলেও ইহাদের সুন্দর স্বাস্থ্য, সদানন্দ ভাব ও সারল্যহেতু যুবক-যুবতিগণকে কতকটা সুন্দর দেখায়। কিন্তু মধ্যবয়স পার হইলেই কী স্ত্রী কী পুরুষ কুশ্রী হইয়া পড়ে।

ওরাওঁ বলিষ্ঠদেহ, মাথা উঁচু করিয়া চলে। শরীরে বেশ একটা সামঞ্জস্য আছে, সে দৃঢ়ভাবে পা ফেলিয়া হাঁটে। পা দুটি সোজা কিন্তু বেড়াইবার সময় বা দৌড়াইবার সময় পায়ের আঙুলগুলি অল্প ছড়াইয়া পড়ে। বেড়াইবার সময় হাত যখন না দোলে তখন ঝুলিয়া থাকে, হাতের চেটো সামনে থাকে। সহজ অবস্থায় যখন দাঁড়াইয়া থাকে তখন হাত দুইখানি পাশে ঝুলিতে থাকে ও একটি পা আগাইয়া থাকে। নিদ্রার সময় ইহারা পাশ ফিরিয়া শয়ন করে ও আহারের সময় দুই হাঁটু উঁচু করিয়া বসে।

একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ সাধারণত দুই মণ ওজন অনায়াসে ঘাড়ে করিয়া বহন করে। এই ওজন ঘাড়ে করিয়া দিনে সে ৩০/৩৫ মাইল চলিতে পারে ; কেবল একদিন নয়, একাদিক্রমে কয়েকদিন চলিতে সমর্থ। ভারি বোঝা কাঁধে করিয়া পাঁচ ঘণ্টারও কমে একজন ওরাওঁকে তেইশ মাইল অসমান রাস্তা হাঁটিতে দেখা গিয়াছে, প্রয়োজন হইলে সে সেই দিনই আরও চলিতে সমর্থ। অথচ সে ব্যক্তি মোট বহন করিতে অভ্যস্ত বা অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন, এমন নয়।

সাধারণত ইহারা বাঁকে করিয়া মোট বহন করে। স্ত্রীলোকেরা জলের কলশ বা অন্য কিছু বহন করিবার সময় মাথায় বসাইয়া লইয়া যায়। ভারী জিনিস নড়াইতে হইলে ইহারা ধাক্কা মারিয়া নড়ায় ; টানিয়া নহে। ভারতবর্ষে সাধারণত যেভাবে কুঠার ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহারাও সেইরূপ করে, দুই হাতে হাতল ধরিয়া মাথার উপর উঠায়, তারপর কর্তনীয় দ্রব্যটির উপর আঘাত করে।

ওরাওঁ পাহাড়ে উঠিতে বেশ দক্ষ। ইহাদের ছেলেরা কতকগুলা ডালপালা লইয়া পাহাড়ে ওঠে ও সেখানে প্রত্যেকে এক একটা ডালের উপর সারি দিয়া পা ছড়াইয়া বসে ও পাহাড়ের গা বাহিয়া হড় হড় করিয়া নামিয়া আসে। এ খেলাটা ছেলেদের খুব প্রিয়। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই গাছে চড়িতে সক্ষম। কখনো-কখনো স্ত্রীকে ত্যাগ করিবার প্রধান কারণ দেখানো হয় যে সে গাছে চড়িতে পারে না। ইহারা অনেক রকম গাছের পাতা খাইয়া থাকে, উহা সংগ্রহ করা স্ত্রীর সাধারণ কাজের মধ্যে। গাছে চড়িবার জন্য ইহাদের কোনো বিশেষ রীতি বা যন্ত্রপাতি নাই।

ঘোড়ায় চড়া প্রচলিত নাই, কারণ সাধারণ ওরাওঁ-এর ঘোড়া কিনিবার সংগতি নাই। তবে ইহাদের ছেলেরা চরাইবার সময় বা ক্ষেত্রকর্ষণের পর বাড়ি ফিরিবার সময় মহিষের

পিঠে চড়ে। সাধারণত যুবকেরা দৌড়াইতে ও লাফাইতে পটু। এক টানে প্রায় তিন মাইল পথ দৌড়াইতে সক্ষম। রাঁচি জেলায় নদী ও পুকুরের অভাব। সেইজন্য অনেকে দাঁড় বাহিতে বা সাঁতার দিতে পারে না। ইহারা ভাল তির ছুঁড়িতে পারে।

ব্যায়াম যখন না করে তখন প্রাপ্তবয়স্ক ওরাওঁ চব্বিশ ঘণ্টা অনাহারে থাকিতে সমর্থ ও ব্যায়ামের সময় প্রায় বারো ঘণ্টা অনাহারে কাটাইতে পারে। সাধারণত প্রতিরাত্রে ইহারা সাত ঘণ্টা নিদ্রা গেলেও প্রয়োজন হইলে অক্লেশে সারারাত কাটাইয়া দেয়। উৎসবের সময় যুবক-যুবতিরা একরকম না ঘুমাইয়া নাচ গানে দুই তিন বা ততোধিক রাত্রি অতিবাহিত করে। অনাবৃত মস্তকে সূর্যের উত্তাপ ও ঠান্ডা উভয়ই ইহারা সহ্য করিতে পারে।

যৌবনে পুরুষ ও নারীর স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য, মনের আনন্দ, শারীরিক পরিশ্রমে আসক্তি ; আর বার্ধক্যে কর্মে অনিচ্ছা, নিরানন্দ ভাব ; ও দেবতার কোপ এড়াইয়া কোনো রকমে জীবন কাটাইয়া দিয়াছে—এই চিন্তায় নিশ্চিন্ত হইয়া সুরাস্রোতে গা ভাসাইয়া দেওয়া—ইহাই এক কথায় ওরাওঁ জীবনের মোটামুটি ইতিহাস।

দ্বিতীয় প্রস্তাব

একস্থানে কতকগুলি কুটিরের সমষ্টি, এলোমেলো বিশৃঙ্খলায় নির্মিত ইহাই হইল ওরাওঁ পল্লি। কয়েকটি আঁকাবাঁকা গলিই পল্লির মধ্যে চলাফেরার পথ। দুর্গন্ধি সার-রাখিবার গর্ত, নোংরা নর্দমা ও শূকর ও অন্যান্য গৃহপালিত পশুর অত্যাচারে আবিল বন্ধ ময়লা জলের ডোবা—এই সমস্ত পল্লির অন্তরকে যেমন অপরিচ্ছন্ন ও অপ্রীতিকর করিয়া রাখে, সুন্দর ঝোপঝাড়, মুক্ত মাঠ, ও এখানে সেখানে একটি দুটি পাহাড়, পার্বত্য ছোটো নদী বা আম্রকুঞ্জ বাহিরটিকে তেমনি রমণীয় করিয়া তোলে। ওরাওঁ পল্লিতে সাধারণের ব্যবহার্য-স্থানের (public places) মধ্যে আখড়া বা নৃত্যভূমি ও ধুমকুড়িয়া বা পল্লির অবিবাহিত পুরুষদের শয়নস্থান প্রধান।

সাধারণ ওরাওঁদের গৃহে দুইখানি করিয়া কুটির দেখা যায়। প্রত্যেক কুটিরে চারটি করিয়া মাটির দেওয়াল ও একটি দ্বার থাকে। ছাদ টালি বা খড় দিয়া আচ্ছাদিত। রাঁচি থানার এবং আশপাশের আর কয়েকটি থানার অধীনস্থ ওরাওঁ পল্লিগুলিতে টালির ছাদ বেশির ভাগ খড়ের চালের স্থান অধিকার করিয়াছে, কিন্তু রাঁচি জেলার পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমের অপেক্ষাকৃত বন্য অংশে খড়ের চালই এখনও প্রচলিত ; দেওয়ালগুলি কখনো-কখনো গাছের ডালপালা দিয়া তৈয়ারি, এবং তাহার গায়ে কর্দম ও গোময় লিপ্ত হয়। বড়ো কুটিরটি সাধারণত দুইটি প্রধান কামরায় বিভক্ত হয়, বড়ো কামরাটি শয়ন, আহার ও বন্ধনের জন্য, ও ছোটোটি ভাণ্ডাররূপে ব্যবহৃত হয়, সেখানে ধান ও অন্যান্য শস্য এবং নানা প্রকার বাসন-কোশন রক্ষিত থাকে। কুটিরের সম্মুখে একটি ছোটো বারান্দা সংলগ্ন থাকে ; এটি বৈঠকখানারূপে ব্যবহৃত হয়, এবং বৃদ্ধেরা সাধারণত এখানেই শয়ন করে। বড়ো কামরার এক কোণে একটুখানি জায়গা বাঁশের বেড়া দিয়া ঘেরা থাকে, সেখানে মুরগি রাখা হয়। ছোটো কুটিরটিতে সাধারণত গৃহপালিত পশু রক্ষিত হয়, এবং কুটির

সংলগ্ন ছোটো বারান্দাটি শূকরের খোঁয়াড়ের কাজ করে। অপেক্ষাকৃত বড়ো পরিবারে ছোটো কুটিরের মধ্যভাগও শয়নের জন্য ব্যবহৃত হয়। বাঁশের বেড়া-ঘেরা দুইধারের অংশে যথাক্রমে গৃহপালিত পশু ও পক্ষী রক্ষিত হয়। অতি দরিদ্র ওরাওঁ, যাহার কেবল একটিমাত্র কুটির সম্বল, সে বড়ো কামরাটি শয়ন, আহার ও রন্ধনের জন্য ও পাশের কামরাটি ভাণ্ডার ও শস্যরক্ষণের জন্য ব্যবহার করে। শয়নঘরের একাংশ বাঁশের বেড়া দিয়া ঘেরিয়া গোহাল তৈয়ারি হয় এবং আর এক কোণে মুরগি প্রভৃতি রক্ষিত হয়। বৃহৎ পরিবারবিশিষ্ট খুব সচ্ছল অবস্থাপন্ন ওরাওঁ-এর দুইটিরও অধিক কুটির থাকে ; কুটির কেন, রীতিমত বাড়িই থাকে ; ভিতরে একটি চতুষ্কোণ উঠান থাকে, পশ্চাতেও একটুকরা জমি থাকে, সেখানে শাকসবজি ভুট্টা প্রভৃতি জন্মানো হয়।

বর্ধিষ্ণু ওরাওঁ-এর বাড়ি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ও দেখিতে সুন্দর। বাড়ির থাম, বরগা, কাঁড় প্রভৃতি গ্রামের জঙ্গল হইতে সংগৃহীত শাল-কাঠে তৈয়ারি হয় ; গ্রামে জঙ্গল না থাকিলে নিকটবর্তী গ্রামান্তর হইতে কাঠ আনা হয়। সাধারণত কুটিরে কোনো জানালা বা একটির বেশি দ্বার থাকে না। হিন্দু প্রতিবেশির নিকটে বাস করিয়া কোনো কোনো ওরাওঁ তাহাদের অনুকরণে বাড়ির দেওয়াল জীবজন্তু মানুষ ও ফুলের ছবি দিয়া সাজায়।

ভাতই ওরাওঁ-এর প্রধান খাদ্য। সাধারণ ওরাওঁ, পরিবারের সকলের জন্য সারা বৎসর ভাতের আহার যোগাইতে সক্ষম হয় না। শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে দরিদ্র ওরাওঁ গোন্দলি সংগ্রহ করে, তাহা খাইয়া তাহারা সকলে দু-তিন সপ্তাহ কাটাইয়া দেয়। সাধারণ অবস্থাপন্ন ওরাওঁ এইসময়ে চাউল ও গোন্দলি একসঙ্গে সিদ্ধ করিয়া আহার করে। ইহার পর গোড়া বা উচ্চভূমির ধান কাটা হয় এবং অনতিকাল পরেই মাড়ুয়া সংগৃহীত হয়। কার্তিক মাসে নিম্নভূমির ধান কাটা না হওয়া পর্যন্ত মাড়ুয়াই ওরাওঁদের প্রধান খাদ্য। কার্তিক হইতে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত ওরাওঁদের প্রচুর পানাহার সঞ্চিত থাকে। সেই হেতু এই সময়েই সে তাহার ধর্ম ও সামাজিক উৎসবের অনুষ্ঠান করে ও পুত্রকন্যার বিবাহ দুঃসময়ের জন্য সঞ্চিত করিয়া রাখে। ফাল্গুন চৈত্র মাসে সংগৃহীত মহুয়াফুলের কোশগুলি দরিদ্র ওরাওঁ কর্তৃক খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন ওরাওঁ কয়েক প্রকার ডাল খায়। অল্প হলুদ ও নুন দিয়া জলে সিদ্ধ করিয়া ডাল রাঁধে। সাধারণ অবস্থার ওরাওঁ-এর কাছে ডাল একটি সুখাদ্য, বিশেষ উপলক্ষে খাইবার জিনিস। অতি দরিদ্র প্রতিদিন কোনো-না কোনো শাক ভক্ষণ করে। তাহারা ভাতের ফ্যানে শাক সিদ্ধ করিয়া একটু নুন দিয়া ভাতেব সঙ্গে তরকারির মতো খায়। সাধারণ ওরাওঁ রন্ধন করিতে তৈল ব্যবহার করে না। তবে যাহারা বিশেষ অবস্থাপন্ন, হিন্দুর প্রতিবেশী, তাহারা রন্ধন করিতে অল্পস্বল্প তৈল ব্যবহার করিয়া থাকে। তৈল সরিষা বা সুরগুজা হইতে তৈয়ারি করে। শাকসবজির মধ্যে ওরাওঁ কুমড়া, লাল আলু, বেগুন, ঝিঙে, ঢেঁড়স, মটর, মুলা, পেঁয়াজ, লংকা প্রভৃতি পাইলে ভক্ষণ করে। কয়েকখানি গ্রামে কেবল বর্ধিষ্ণু ওরাওঁ-এরা কিছু কিছু আলুর চাষ করে ; কিন্তু ইহা বিক্রয়ের জন্য, নিজের জন্য নহে। মৃত বা শিকার করা প্রায় সকল প্রকার পশুপক্ষীর মাংস আহারে ওরাওঁ আপত্তি করে না। কিন্তু উৎসবের সময় ও মধ্যে মধ্যে শিকারে যাওয়ার সময় ছাড়া, কেবল সাধারণ আহারের জন্য পশুপক্ষীর মাংস আহার করা ওরাওঁ-এর সাধ্যাতীত।

ছোটোনাগপুরের অন্যান্য আদিম অধিবাসীদের মতো ওরাওঁদেরও হাঁড়িয়া বা চাউল হইতে প্রস্তুত মদ্য প্রিয় পানীয়। দেশি মদ্য বা 'পচাই'-এর খুব প্রচলন। অত্যধিক পানাসক্তি ও চরিত্রগত সঞ্চয়বুদ্ধির অভাববশতই অনেক ওরাওঁ পরিবার ধ্বংস হইয়া গেছে।

অধিকাংশ ওরাওঁ ঘর-বুনা সুতি কাপড় ব্যবহার করে। পুরুষেরা সাধারণ কারেয়া নামক কাপড় পরে। ইহা দৈর্ঘ্যে পাঁচ হইতে ছয় গজ ও প্রস্থে এক ফুট। দরিদ্র ওরাওঁ যখন স্বগ্রামে থাকে তখন, ও অথর্ব বৃদ্ধেরা, ভাগোয়া নামক একপ্রকার সরু কাপড় নেংটি করিয়া পরে ; দৈর্ঘ্যে ইহা প্রায় এক গজ ; উরুতের মধ্য দিয়া গিয়া ইহা কোমরে পরিহিত চামড়ার দড়িতে বা কারধানি নামক রঙিন সুতায় আটাকনো থাকে। কারেয়ার প্রান্তভাগ সাধরণত লাল সুতায় তৈয়ারি চিত্রবিচিত্র নকশায় সজ্জিত থাকে, কখনো বা দোদুল্যমান লাল সুতার ঘুন্টি (ঘুনশি?) দিয়া সজ্জিত হয়। শরীরের উপরাংশ আবৃত করিবার জন্য ইহারা দেশি কাপড়ের দুই প্রকার চাদর ব্যবহার করে। ইহাদের নাম যথাক্রমে বরখি ও পেছৌরি। প্রথমটি প্রায় তিন গজ লম্বা ও দেড় গজ চওড়া, দুই ভাঁজ করিয়া ধার সেলাই করা, সেইজন্য শীতকালে ব্যবহারের উপযোগী। দ্বিতীয়টি কেবল এক ভাঁজ, সাধারণত দৈর্ঘ্যেও ছোটো। অবস্থাপন্ন ওরাওঁ শীতের সময় কম্বল গায়ে দেয়। ভ্রমণে বাহির হইলে অবস্থাপন্ন ওরাওঁ এক টুকরা কারেয়া মাথায় জড়ায়। ইহা পাগড়ির কাজ করে।

সাধারণ ওরাওঁ-রমণী বাহিরে যাইবার সময় হাড়ি বা জানামা-কিচরি নামক পাঁচ গজ লম্বা ও প্রায় দুই ফুট চওড়া একপ্রকার কাপড় পরে, ইহার একাংশ দিয়া শরীর আবৃত করে। বাড়ির মধ্যে কাজ করিবার সময় উহারা অপেক্ষাকৃত ছোটো 'শাড়ি' পরে—প্রায় আড়াই গজ লম্বা ও দুই ফুট চওড়া—তাহাতে শরীরের উপরাংশ অনাবৃত থাকিয়া যায়। ভ্রমণ বা কাহারও সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিতে যাইবার সময় ইহারা খাঁড়িয়া-কিচরি নামক স্বতন্ত্র বস্ত্রে দেহের উপরিভাগ আচ্ছাদিত করে। উহা প্রায় ছয় গজ লম্বা ও এক গজ চওড়া। দু-তিন বৎসর পর্যন্ত ওরাওঁ-শিশু উলঙ্গ হইয়া বেড়ায়। তিন বৎসর বয়স হইলে (অবস্থাপন্ন পরিবারে তৎপূর্বে এবং অতি দরিদ্র পরিবার বা জঙ্গলময় অংশে ইহার পরে) বালক একখণ্ড কারেয়া ও বালিশ একখণ্ড গাজ্জি বা পুটলি কোমরে জড়ায়, অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন পরিবারে বা বিশেষ কিছু উপলক্ষ্যে বালিকারা দেহের উপরাংশের জন্যও একখণ্ড স্বতন্ত্র বস্ত্র ব্যবহার করে। এই স্থানে বলা আবশ্যক যে জেলার অভ্যন্তর প্রদেশে কেবল পুরুষ নয়, স্ত্রীলোকেরাও কোমরের উপর বা হাঁটুর নীচে কোনো আবরণই রাখে না। এবং দরিদ্র স্ত্রীলোকের এই সামান্য কোমরে জড়াইবার বস্ত্রখণ্ডও ছেঁড়া ন্যাকড়া জোড়া দিয়া তৈয়ারি।

মুন্ডা রমণীর ন্যায় ওরাওঁ-রমণীও তাহার দেহ নানা প্রকার (সাধারণত পিতল-নির্মিত) অলংকারে ভূষিত করিতে ভালবাসে। তাহার মধ্যে তাগা, বালা, কণ্ঠহার, আংটি ও চুটকি প্রধান। পিতলের কণ্ঠহার ছাড়া নানা রঙের পুঁতির মালা গলায় পরে। কানের ফুটায় লাল রং করা একতাড়া পাকানো তালপাতা গুঁজিয়া দেয়, ইহা দৈর্ঘ্যে দেড় ইঞ্চি ও ব্যাস প্রায় পৌনে এক ইঞ্চি হইবে। নাক বা পায়ের কোনো অলংকার নাই। ওরাওঁ যুবক, ওরাওঁ যুবতির মতই দেহের প্রসাধন করিতে ভালবাসে। গলায় কতকগুলি পুঁতির মালা ; আংটা,

পিতলের গুঁজি প্রভৃতি অদ্ভুত আকারের কর্ণ-অলংকার ; কপাল বেড়িয়া পিতলের অর্ধবৃত্ত, দীর্ঘকেশ ঝুঁটিবাঁধা, তাহাতে দু-একখানা কাঠের চিরুনি গোঁজা, কখনও বা ঝুঁটির উপর একখানি ছোটো গোলাকার আরশি স্থাপিত ;—ইহাই ওরাওঁ যুবকের প্রধান ভূষণ। আজকাল ওরাওঁ যুবকেরা—বিশেষত যাহারা নগরের সন্নিকটে বাস করে—দীর্ঘ কেশ রাখা ছাড়িয়া দিতেছে। কিন্তু দীর্ঘকেশ কাটিয়া ফেলিলেও লম্বা চুলের নিদর্শন স্বরূপ এক গোছা চুন্দি বা টিকি রাখা চাই।

প্রায় সাত বৎসর বয়সে ওরাওঁ বালিকার কপালে তিনটি সমান্তর রেখা ও রগে ওইরূপ তিনটি করিয়া রেখা উলকি দিয়া অঙ্কিত করা হয়। পুনর্বার বারো বৎসর বয়সে তাহার কবজি, পিঠ, পা ও বুকে ফুল প্রভৃতির অদ্ভুত ছবির উলকি দেওয়া হয়। মালার জাতীয় স্ত্রীলোকেরা তিন-দাঁতবিশিষ্ট একটি লোহার যন্ত্র দিয়া এই উলকি পরায়। উলকির রং-এর জন্য কয়লা ও তেলের মিশ্রণ ব্যবহৃত হয়।

ওরাওঁদিগের গৃহস্থালির আসবাবপত্র ও বাসন-কোশন মুন্ডাদের মতোই।

ইহাদের প্রধান বাদ্যযন্ত্র হইতেছে নাগেরা বা গোবুর চামড়ায় ছাওয়া লোহার ঢোল, বানরের চামড়ায় ছাওয়া মান্দল বা থেল নামক মাটির ঢোল, ও ভেঁর নামক দীর্ঘ লোহার শিঙ্গা। শেষোক্তটি জোড়ায় জোড়ায় বিবাহের সময় বাজানো হয় ; মান্দল বাজানো হয় করম জাদুরা ও সাহোরাই উৎসবে এবং নৃত্যের সময়। নাগেরা শিকার-যাত্রায়, বিবাহে ও উপরোক্ত নৃত্য ও উৎসবাদিতে বাজানো হয়।

ওরাওঁ-এর সর্বপ্রধান, সর্বপ্রধান কেন একমাত্র, উপজীবিকাই হইল কৃষিকার্য। উৎপাদিত শস্যের মধ্যে ধান, মটর, কলাই, তিল, সর্ষপাদিও প্রধান। কৃষিযন্ত্র ও কৃষিআলি মুন্ডাদিগের ন্যায়। যেসব বিশেষ শস্য ওরাওঁ উৎপাদন করে তন্মধ্যে তুলাই সর্বশ্রেষ্ঠ। কোনো কোনো ওরাওঁ অল্প পরিমাণ জমিতে স্ব স্ব ব্যবহারের জন্য তামাকের চাষ করে। আখের চাষ রাঁচি (পাঁচ পরগনা) ও পালামৌ জেলার অংশবিশেষে আবদ্ধ। আখ কাটা হইলে, হয় কলহু নামক যন্ত্রে নয় চোক ঘানিতে (লম্বভাবে দণ্ডায়মান দুইটি কাঠের রোলার স্ক্রু দিয়া আঁটা, পরস্পরের গায়ে ঘর্ষণ করে) পরস্পরের আখ মাড়া হয়।

উপরোক্ত যে-কোনো যন্ত্র সাহায্যে নিংড়ানো রস বড়ো বড়ো চ্যাপটা মাটির পাত্রে চার বা ততোধিক গর্তবিশিষ্ট চুল্লির উপর জাল দেওয়া হয়। উপরে যে গাদ ওঠে তাহা লোহার ঝাঁঝরি দিয়া তুলিয়া ফেলা হয়।

তৃতীয় প্রস্তাব

অন্যান্য আদিম মানবের ন্যায় ওরাওঁদিগের সামাজিক প্রণালীও তাহাদের ধর্মবিশ্বাসের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত এবং তাহাদের অধিকাংশ সামাজিক রীতি ও ধর্মানুষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্যই হইতেছে তাহাদিগের চতুর্দিকস্থ অসংখ্য ভূতপ্রেতের কু-নজর ও অশুভ প্রভাবকে দূরে রাখিবার অবিরাম চেষ্টা। মৃত ও জীবিত মানুষের আত্মা, ভূতপ্রেত যাহাদের কোনো বিশেষ স্থান ব্যক্তি বা বস্তুর সহিত সম্বন্ধ আছে, বা ভবঘুরে ভূত যাহাদের

কোনো বিশেষ আবাসস্থান নাই—এ সবাইকে যখন দমন করা যাইবে না তখন তুষ্টি সাধন তো করিতেই হইবে।

ওরাওঁ-এরা ভুঁইহার ও রাইয়ৎ—এই দুইটি সামাজিক বিভাগে বিভক্ত। যাহারা জঙ্গল কাটিয়া গ্রাম স্থাপনা করিয়াছিল তাহাদের বংশধরেরা ভুঁইহার নামে পরিচিত। জঙ্গল কাটিবার সময় জঙ্গলের ভূতপ্রেতগণের শান্তিসুখে বাধা পড়িয়াছিল, তাই মধ্যে মধ্যে প্রেতাত্মাদিগকে বলি প্রদান করিবার ভারটা ভুঁইহারদের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। এই ভূতগুলিকে খুঁট-ভূত বলা হয়। তিন, পাঁচ, সাত বা বারো বৎসর অন্তর ইহাদের উদ্দেশ্যে কুক্কুট, ছাগল বা মহিষ বলি দেওয়া হয়। জমিতে এক স্থানে একটি কাঠের খোঁটা পুঁতিয়া প্রেতাত্মার আবাসস্থলটি চিহ্নিত করিয়া রাখা হয়। প্রত্যেক বলির পর খোঁটাটি বদলাইয়া নূতন খোঁটা স্থাপন করা হয়, এবং উহার উপরে বলি মাংসের কয়েক টুকরা একটি ফাঁপা দুই-মুখ-বন্ধ-করা লোহার পেরেক দিয়া বিঁধিয়া রাখা হয়। এই পেরেকটিকে 'সিঙ্গি' বলে। পেরেকটি পোঁতা হয় ভূতকে পাতালপ্রদেশে পাঠাইবার জন্য, সে যাহাতে পুনর্বার বলির নির্দিষ্ট সময় আসিবার পূর্বে উঠিতে না পারে! ঘটনাক্রমে যদি ইতিমধ্যে প্রেতাত্মার ক্ষুধা জাগিয়া ওঠে বা ভ্রমক্রমে নিরূপিত সময়ে বলি না দেওয়া হয় তো তাহার ক্রোধ গ্রামস্থ পশু ও লোকের মধ্যে ব্যাধি ও মৃত্যুরূপে প্রকাশিত হয়। তখন গ্রামবাসীরা মাতি বা ভূততত্ত্বজ্ঞ ওঝার সাহায্যে অবিলম্বে বাহির করিয়া ফেলে, কাহার শৈথিল্যে গ্রামে এসব দুর্ঘটনা ঘটিতেছে। সেই পরিবারের কর্তাকে খুঁট-ভূতের সহিত যে চুক্তি, তাহা পালন করিতে বাধ্য করে। ওরাওঁ গ্রামের আদিম অধিবাসীরা এইরূপ বন্দোবস্তই করিয়াছিল, এবং আজ পর্যন্ত তাহাদের বংশধরেরা গ্রামস্থ কর্ষিত ভূমির এলাকাস্থিত ভূতগুলিকে ঠান্ডা রাখিবার জন্য সেসব নিয়ম বর্ণে বর্ণে পালন করিয়া আসিতেছে। অন্যান্য ভূতপ্রেত প্রভৃতি যাহারা জঙ্গলে ও পোড়ো জমিতে বাস করে, তাহাদের সম্বন্ধেও উপযুক্ত বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল,—আদিম অরণ্যের একাংশ ইহাদিগকে উৎসর্গ করা হইয়াছিল, উহার নাম জাহের বা সর্না। গ্রাম পুরোহিত (পাহান) নিরূপিত সময়ে এখানে আসিয়া গ্রামের সকল ওরাওঁ-এর পক্ষ হইতে প্রেতাত্মার দলকে কুক্কুট বলি প্রদান করেন।

এই সকল দেবতার মধ্যে চালো পাচ্চো ও দারহা সর্বপ্রধান। খুঁট-ভূতেরা পারিবারিক দেবতা; ইহারা গ্রামদেবতা। সমস্ত গ্রামের জঙ্গল ইহাদের হস্তে নিহিত। প্রত্যেক পরিবারের পূর্বপুরুষগণের আত্মাই প্রকৃত গৃহদেবতা। ইহারা সাধারণত সদয় প্রকৃতির; সেইজন্য ইহাদের তুষ্টিসাধনের জন্য বিশেষ কোনো পূজার প্রয়োজন হয় না। গ্রামকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য পারিবারিক দেবতা ও গ্রামদেবতার তুষ্টিসাধন করা প্রয়োজন। এবং এই সকল দেবতা ও ভূতের তুষ্টিসাধন কেবলমাত্র গ্রামের ভুঁইহারের দ্বারাই হইতে পারে। কাজে কাজেই সমাজে ভুঁইহারেরই প্রাধান্য। এবং এইরূপে ওরাওঁদের মধ্যে ভূমির ভোগাধিকারও ধর্মভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত!

উপরিলিখিত দুই প্রকার দেবতা ব্যতীত ছোটোখাটো ভূত, প্রেতাত্মা প্রভৃতি অসংখ্য আছে। ইহাদের কোনো নির্দিষ্ট বাসস্থান নাই। বন্ধুভাব অপেক্ষা বৈরভাবটাই ইহাদের মধ্যে প্রবল। জন্ম, মৃত্যু বিবাহ ও অন্যান্য সময়ে ওরাওঁ যেসব সামাজিক আচার ও

ধর্মানুষ্ঠান করে তাহার অধিকাংশই এইসব সংখ্যাতীত ছোটো ভূতের শত্রুতা এড়াইবার জন্য।

এইরূপ কয়েকটি অনুষ্ঠানের উল্লেখ করিতেছি।

জন্ম—শিশুর জন্মের অল্পকাল পরেই ভূতেদের শত্রুতা ও কু-নজর এড়াইবার জন্য একটি 'কিরো' বা 'ভেলোআ' (ভল্লাতক বা ভেলা) ফল তাহার গাত্রে স্পর্শ করানো হয়। এই ফলের এক ফোঁটা রস যদি কোনো মানুষ, পশু বা পাখির চোখে পড়ে তো চোখ ফাটিয়া যাইবে, ইহাই তাহাদের বিশ্বাস। এবং ওরাওঁদের ভূতপ্রেত দেবতারও মানুষেরই মত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে বলিয়া এই ফলের রসকে তাহারাও সমান ভয় করে। 'কু-নজর' বিশিষ্ট লোকেরও এই ফলটি বিশেষ ভয়ের। কারণ, যেহেতু এই ফলের এক বিন্দু রস তাহার চোখে পড়িলে সে চিরদিনের জন্য অন্ধ হইয়া যাইবে।

জন্মের পর চতুর্থ দিনে যে শোধনক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় তাহাও ভূত এবং মন্দলোকের কু-নজর হইতে মাতা ও শিশুকে রক্ষা করিবার জন্য। এই অনুষ্ঠানটি যতদিন না সম্পন্ন হয় ততদিন মাতা ও শিশুকে বাড়ির বাহির হইতে দেওয়া হয় না। কারণ এই কয়দিনই প্রসূতি ও শিশুর উপর ভূত, ডাইন প্রভৃতির কু-নজর পড়িবার বিশেষ আশঙ্কা।

জন্মের পর অষ্টম বা নবম দিবসে ভূতের ওঝা আসিয়া ভূত ও মন্দলোকের দাঁত ভাঙিবার জন্য একটি অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে। ইহার নাম 'ডান্ডা-রেঙ্না' বা 'ভেলোআ-ফারি'। চালের গুঁড়া, কয়লার গুঁড়া ও অল্প উনানের মাটি ওঝার সামনে রাখা হয়। এই উপকরণগুলির দ্বারা মেঝের উপর সে একটি 'মায়া-ক্ষেত্র' অঙ্কিত করিয়া তাহার মধ্যস্থলে একমুঠা চাউলের উপর একটি কুক্কুট-ডিম্ব রাখে। ভেলোআ গাছের একটি ডালের এক প্রান্ত চিমটার আকারে চিরিয়া উহা ডিমের উপর আটকাইয়া দেওয়া হয়। ওঝা অঙ্কিত গন্ডির সামনে বসিয়া পূর্বদিকে মুখ করিয়া, কীরূপে পুরাকালে এই অনুষ্ঠানের উৎপত্তি হইল, মানুষ ও ভূতের সৃষ্টি হইল কীরূপে, তাহার একটা পরম্পরাগত সুদীর্ঘ বিবরণ আবৃত্তি করিয়া যায় এবং ভূত ও মন্দলোকের ক্ষতি করিবার চেষ্টাকে ব্যর্থ করিবার জন্য "ধর্মে" বা ঈশ্বরের নিকট এইরূপে প্রার্থনা করে—"হে ধর্মে! আপনার শিক্ষামত আমি মানুষ ও ভূতের জন্মবৃত্তান্ত বিবৃত করিতেছি। আমি এখন আপনাকে একটি 'জীবন' বলি প্রদান করিতেছি (একটি পদার্থ যাহার জীবন আছে কিন্তু) যাহার মাথা বা পা নাই (অর্থাৎ আমি এই ডিমটি আপনাকে বলি স্বরূপ দিতেছি)। হে ধর্মে! যদি কেহ তাহার কু-নজব বা কু-মুখ এইদিকে ফেরায় তো তাহার চোখ যেন এই কুক্কুট-ডিম্বের মত ফাটিয়া যায় (ডিমটিকে এখনি ছুরি দিয়া ভাঙিয়া ফেলা হইবে) এবং তাহার মুখ যেন এই ভেলোআ ডালের মত দুইভাগে চিরিয়া যায়।"

আবৃত্তি শেষ করিয়া ওঝা ডিমটি ছুরি দিয়া ভাঙিয়া ফেলে ও বলি স্বরূপ উহা দেবতাকে অর্পণ করে। সে তারপর ভূমি হইতে যত্নসহকারে যাবতীয় পূজার উপকরণ (কয়লার গুঁড়া, চালের গুঁড়া প্রভৃতি) উঠাইয়া লইয়া পথের উপর ফেলিয়া দেয়। এইরূপে কু-নজর প্রভৃতি হইতে বিপদের সম্ভাবনা দূরীভূত হয়।

বিবাহ—বিবাহের পরেই বধূকে যখন বরের বাড়ি লইয়া যাওয়া হয় তখন পুনর্বার ভেলোআ-ফারি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। তারপর বধূকে শীতল জলে স্নান করাইয়া দেওয়া হয় এবং গ্রামের গোড়াইত তাহার কপালে সিন্দূর রেখা অঙ্কিত করিয়া দেয়। এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হইতেছে মেয়েটিকে তাহার পিতার গ্রামের ভূতপ্রেতের নজর হইতে মুক্ত করিয়া দেওয়া।

গর্ভ—স্ত্রীলোকের যখন প্রথম গর্ভসঞ্চার হয় তখন একটি পূজা সম্পন্ন হয়। এই পূজার উদ্দেশ্য—তাহার পিতার পরিবারের প্রেতাত্মা বা গ্রামের দেবতা যাহাতে গর্ভিনী বা ভ্রূণের কোনো অনিষ্ট করিতে না পারে। মাহাতো, পাহান এবং স্বামীর গ্রামের অন্যান্য মোড়লদের সমক্ষে স্ত্রী পূর্বপুরুষগণের আত্মার উদ্দেশে ও তাহার পিতার গ্রামদেবতাদের উদ্দেশে একটি ছাগল বলি দেওয়া হয়।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া—অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় বিশেষ করিয়া ওরাওঁকে শোধনক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়, কারণ উহার সহিত মৃতের আত্মার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। বীজবপন ও শস্যকর্তন এই দুই সময়ের মধ্যে যেসব ওরাওঁ মরে তাহাদের অস্থি সমাহিত (হাড়-বোরা) করার অনুষ্ঠান হেমন্তের শস্যকর্তনের পর একটা নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই ক্রিয়া সম্পন্ন হইবার পর গ্রামবাসী সকলে একত্রে মাহাতো বা গ্রামের মোড়লের বাড়ি গিয়া হাজির হয়। মাহাতো প্রত্যেককে অল্প তেল ও হলুদবাটা দেয়। লোকেরা তেল ও হলুদ গায়ে মাখিলে মাহাতো ফুটচিরা নামক দীর্ঘ শরের গুচ্ছ দিয়া পবিত্র জল তাহাদের গায়ে ছিটাইয়া দেয়। এই উপলক্ষে এইটিই কেবলমাত্র শোধনক্রিয়া নয়। গ্রামবাসীদিগকেই কেবল শোধন করিতে হইবে তাহা নহে, গ্রামের সমস্ত অলি-গলি মন্ত্রপূত করিতে হইবে। সে কার্যটি করিতে হয় নাইগা বা পাহানকে—সে গ্রামে প্রধান পুরোহিত। পাহান গ্রামের আখড়ায় গেলে একটি লাউয়ের বসের মধ্যে জল পুরিয়া তাহার নিকট আনা হয়। জল শুদ্ধ করিয়া লইয়া বহুসংখ্যক ওরাওঁ দ্বারা পরিবৃত হইয়া সে বস্তির এক ধার দিয়া প্রবেশ করিয়া অন্যধাব দিয়া বাহির হইয়া যায়—অলি-গলি অন্ধকার কোণ প্রভৃতিতে সেই জল ছড়াইতে ছড়াইতে চলে, তারপর সমবেত গ্রামবাসীদের সামনে পাহান "বিরি-বেল্লাই" বা সূর্যদেবতার উদ্দেশ্যে একটি শ্বেত কুক্কুট বলি দেয় এবং প্রার্থনা করে—"হে ঈশ্বর! আমরা এক্ষণে এই গ্রাম শোধন করিতেছি। এখন হইতে যেন আমাদের কৃষিকার্যাদি ভালোরকম চলে। আমরা যখন ভ্রমণে বাহির হইব তখন যেন আমাদের পায়ে একটি কাঁটাও না ফোটে।" এই অনুষ্ঠানের নাম "পদ্দা-কাম্না" বা "গাঁও-বানানা"।

ওরাওঁ ভূতকে যেমন ভয় করে, ভূতের ওঝা, কু-নজর, অচেনা মানুষ ও অজানা দেশের মন্দ প্রভাবকেও তেমনি ভয় করে। ভ্রমণে বাহির হইবার সময় ওরাওঁ ডান হাতের তালুর উপর অল্প ধুলা তুলিয়া লয়, তাহার উপর মন্ত্র (বন্ধনী) পড়ে ও ফুঁ দিয়া চতুর্দিকে হস্তস্থিত ধুলা উড়াইয়া দেয়। এরূপ করিলে সে নাকি ভূত ও কু-নজর হইতে রক্ষা পাইবে।

ভূতের ওঝা বা প্রেতসিদ্ধ ব্যক্তি যদি আজ্ঞাবহ ভূতের সাহায্যে কাহারও অনিষ্ট

করিতে বদ্ধপরিকর হয় তো সে ব্যক্তি তাহার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মন্ত্র (বন্ধনী) আওড়াইয়া সরিষা, তুলার বিচি ও কয়েক মুঠা চাউল বাড়ির চারিদিকে ছড়াইয়া দেয়।

কয়েদি জেল খাটিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলে এক বিশেষ শোধনক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া তবে তাহাকে গৃহে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। কারণ জেলে বাস করিবার সময় সে অচেনা লোকের সঙ্গে দিন যাপন করিয়াছে এবং তাহাদের 'নজর গুজর' তাহার উপর পড়িয়াছে। যতদিন না শুদ্ধিক্রিয়া সম্পন্ন হয় ততদিন তাহাকে হয় অবিবাহিতের আবাস স্থান "ধুমকুড়িয়া" বা "জোঁথ-এড়পায়", নয় স্বগৃহের বারান্দায় বাস করিতে হয়। গ্রামের মোড়লদিগের সামনে একটি শ্বেত কুক্কুট বা ছাগল বলি দিয়া প্রত্যাগত কয়েদি উহার রক্ত অল্প পান করে। জলের মধ্যে একটুকরা সোনা ডুবাইয়া সেই জল সমবেত সকলের উপর ছিটাইয়া দেওয়া হয় এবং কয়েদি সেই জল পান করে। তারপর ভোজ। প্রত্যেক অভ্যাগতের পাতে কয়েদি এক এক মুঠা ভাত দিয়া পরিশেষে নিজে তাহাদের সহিত আহারে বসিয়া যায়।

স্পর্শদোষ, প্রেতাত্মা ও কু-নজরের ভয় প্রভৃতি আদিম বিশ্বাসের সহিত ভারতবর্ষের সর্বত্র হিন্দুসমাজে প্রচলিত ওইরূপ বিশ্বাসের তুলনা করিলে মনে হয়, আমরা যেসব শুদ্ধাচারের বড়াই করি, সম্ভবত তাহার মূল আদিম অসভ্য অবস্থার ভূত-প্রেত বিশ্বাসের মধ্যে নিহিত।

প্রবাসী ● বৈশাখ, আষাঢ়, শ্রাবণ ১৩২০ (১৯১৩ খ্রিস্টাব্দ)



ওরাওঁদের—'বানগাড়ি ও খলিহান পূজা এবং নওয়াখানি'

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি. এ.

জ্যৈষ্ঠের ভারতবর্ষে 'ওরাওঁদের সেরহুল' শীর্ষক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে, যে যে জাতির প্রধান উপায় কৃষি, তাহাদের মধ্যে দেবদেবীর পূজা উৎসবের বাহুল্য খুবই। তাহারা প্রকৃতির বিভিন্ন দৃশ্যকে, প্রকৃতির বিভিন্ন কার্যকলাপকে পূজা করে। তাহারা নানারূপ দেবতার কল্পনা করিয়া তাহাদিগকে পূজা ও উপহারে সন্তুষ্ট করে, যাহাতে তাহাদের ক্ষেত্রে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। সেই জন্যই বোধ হয়, ভারতবর্ষীয় হিন্দুদিগের মধ্যে এত দেবদেবীর বাহুল্য। সেই জন্যই পাশ্চাত্য জাতিরা আমাদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দেয় যে, ইহারা পৌত্তলিক, ইহারা কুসংস্কারান্ধ, superstitious! কিন্তু যখন তাহারাও কৃষির উপর নির্ভর করিত, তখন তাহারাও পৌত্তলিক, তাহারাও superstitious ছিল। বস্তুত, অনুসন্ধান করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, হিন্দুদিগের প্রত্যেক উৎসবের সম্বন্ধ কৃষিকার্যের সহিত সম্পূর্ণভাবে না থাকিলেও কতক পরিমাণে আছেই।

ছোটোনাগপুরের ওরাওঁরা জীবিকার জন্য কৃষিকার্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে ; তাই তাহাদের প্রত্যেক পূজা, পার্বণ, প্রত্যেক উৎসব, এমনকি সামাজিক ক্রিয়াকলাপ পর্যন্ত সমস্তই, এমনই ভাবে অনুষ্ঠিত হয়, যাহা দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, তাহারা ফল আকাঙ্ক্ষা করে একটি—প্রচুর শস্যোৎপাদন।

পূর্ব প্রবন্ধে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, ওরাওঁদের 'সেরহুল' ও আনুসঙ্গিক

পূজা ও উৎসবের উদ্দেশ্য প্রচুর শস্য উৎপন্ন করা,—যদিও তাহারা বলে যে, পূজার দিন সূর্যের সহিত 'ধরতি মাই'-এর বিবাহ হয় এবং এ উৎসব সেই জন্যই। সূর্য বৃষ্টির কর্তা, আর, 'ধরতি মাই' শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্র। জমিতে সময়ে উপযুক্ত বৃষ্টি পড়িলে ভাল শস্য উৎপন্ন হইবে; সুতরাং তাহাদের এই কথা যে সেরহুলের দিন সূর্যের সহিত পৃথিবীর বিবাহ হয় এবং সেরহুল তাহারই উৎসব—ইহার অর্থও কৃষিকার্যের সহিত জড়িত।

ধানের চাষ আরম্ভ করার পূর্বে ও পরে ওরাওঁরা কী-কী উৎসব করিয়া থাকে, এবং কীরূপ ভাবে ক্ষেত্রাধিপতি দেবতাদের সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করে, এই প্রবন্ধে তাহাই বলিব।

ওরাওঁরা চাষবাসের কাজ শেষ করিয়া, বিদেশে অর্থোপার্জনের জন্য যায়। তারপর চাষবাসের কার্য আরম্ভ হইবার পূর্বেই আসিয়া সেরহুল বা খর্দি উৎসব করে। জমিতে দুই চারিবার চাষ ফিরাইয়া লইয়া, সার দিয়া, বৃষ্টি পড়িলেই বীজ বপন করিয়া রাখে।

বপনের পূর্বে, গ্রামেও সামাজিক নেতা 'পাহান' সেই গ্রামের অধিবাসীগণের ক্ষেত্রে যাহাতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয় এই প্রার্থনা করিয়া, ক্ষেত্রাধিপ প্রমুখ দেবতাদিগের উদ্দেশ্যে কুক্কুট বলি প্রদান করিয়া তাঁহাদের প্রসন্ন করে। তারপর গ্রামের 'মাহাতো'কে* দিয়া প্রতি গৃহে সংবাদ পাঠায় যে, একটি নির্দিষ্ট দিনে রাত্রে যেন গ্রামস্থ প্রবীণ ওরাওঁরা গ্রাম্য আখড়ায় সমবেত হয়। সেই সম্মিলনিতে বীজবপন আরম্ভ করিবার দিন স্থির হয়। বীজ-বপনের প্রথম দিবসের দুই-তিন দিন পূর্বে পাহান মাহাতোকে দিয়া গ্রাম হইতে পাঁচটি পাঁচ রঙের (যথা কালো, সাদা, তামাটে, লাল ও বিচিত্র বর্ণযুক্ত) মুরগি ধরাইয়া লইয়া আসে ও সেইগুলিকে অতীব যত্নের সহিত আলোচাল খাইতে দেয়। পরে পূজার দিন স্নান করিয়া হাঁড়িয়া ও মুরগি কয়টি লইয়া গ্রাম্য দেবীমণ্ডপে 'গাঁওয়া দেওতির'** পূজা করিবার জন্য গ্রামস্থ মুখ্য ব্যক্তিগণের সহিত উপস্থিত হয়। তৎপরে সমস্ত গ্রামের অধিবাসী কী হিন্দু, কী মুসলমান ও কী ওরাওঁ সকলের মঙ্গল কামনায় কল্যাণ ও সৌভাগ্য প্রার্থনা করিয়া, 'গাঁওয়া দেওতির' আরাধনা করিয়া, পঞ্চ কুক্কুট বলি দেয়, ও সেই রক্ত ও মদ্য দিয়া দেবতার পূজা করে। তারপর পূজার উৎসর্গীকৃত আতপ চাউল, মুরগির মাংস ও মদ্য লইয়া পাহানের বাড়ি ফিরিয়া আসে; এবং সমবেত ওরাওঁরা সেই মাংস আলোচাল ও মদ্য ভক্ষণ ও পান করে। যাহারা অনুপস্থিত থাকে, তাহাদের বাড়িতে প্রসাদ পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এই উৎসবের পর, পাহান আপনার জমিতে বীজ বপন করে ও সন্ধ্যায় পঞ্চায়েত করিয়া সকলকে বীজ বপনের আদেশ প্রদান করে।

বীজ বপনের পূর্ব দিবসে প্রত্যেক ওরাওঁ আপন-আপন বাটীতে গৃহদেবতা 'বুঢ়াবুঢ়ির'*** নিকট শ্বেত কুক্কুট ও মদ্য দিয়া পূজা করে, এবং বাড়ির প্রত্যেকেই সামান্য

* মাহাতো সামাজিক ও ধর্মসম্বন্ধীয় সমস্ত কার্যের জন্য আবশ্যক দ্রব্যাদি আহরণ করে। এই কার্যের জন্য যে নির্দিষ্ট ক্ষেত্র আছে, তাহার ফসল তাহারই প্রাপ্য।

** 'গাঁওয়া দেওতি' গ্রাম্য দেবতা। এই দেবতার পূজায় হিন্দু মুসলমান সকলের সমান অধিকার।

*** 'বুঢ়াবুঢি' Family Deities.

'প্রসাদি' গ্রহণ করে। এমনকি, যদি বাড়িতে নিতান্ত দুগ্ধপোষ্য শিশুও থাকে, তাহারও মুখে মদ্য ও মাংস স্পর্শ করাইয়া দেওয়া হয়। তাহার পর রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর গৃহকর্তা, অভাব পক্ষে গৃহের কোনো প্রৌঢ় ব্যক্তি, একাকী অন্ধকারের মধ্যেই বিনা আলোক-সাহায্যে কিঞ্চিৎ বীজ লইয়া, তাহাতে সেরহুলের দিন যে কাঁকড়া উনানের উপর ঝুলাইয়া রাখা থাকে, তাহা ওই বীজের সহিত মিশ্রিত করিয়া বাটী হইতে বহির্গত হয়। তারপর নিঃশব্দের পা টিপিয়া আপনাদের শস্য-ক্ষেত্রের কোনো অংশে উপস্থিত হয়। রাস্তায় চলিবার সময়, কোনোরূপ শব্দ করা একেবারে নিষিদ্ধ। খুব সতর্কতার সহিত পশ্চাৎ দিকে না চাহিয়া চলিয়া যাইতে হয়। কারণ, ওরাওঁদের বিশ্বাস যে, সেই সময়ে তাহাদের গৃহদেবতা 'বুঢ়াবুঢ়ির' প্রতিকূল যে সকল দেবতা ও অপদেবতারা আছে, তাহারা উহাদের সৌভাগ্যের পথে বাধা-বিঘ্ন ঘটাইয়া অমঙ্গল করিতে পারে। তাহারা (অপদেবতারা) উহার পিছনে-পিছনে যাইতে থাকে। সেই জন্যই পশ্চাৎদিকে দৃষ্টি ফিরানো বারণ, পাছে তাহাদের সহিত 'চোখাচোখি' হইলে অনিষ্ট হয়। যে ব্যক্তি সেই রাত্রে বীজ লইয়া ক্ষেত্রে যায়, সে একা যাইতে ভয় পাইলে অন্য একজনকে সঙ্গে লইতে পারে ; কিন্তু পথে কথাবার্তা বলা একেবারেই নিষিদ্ধ। যদি একান্তই কথাবার্তা কহিতে হয়, তাহা হইলে এমনই ভাবে কথা বলা নিয়ম যে, কাছে অন্য কেহ থাকিলেও যেন না শুনিতে পায়। এই কার্যে বহির্গত হইবার পূর্বে গৃহ-দেবতাদের পূজা করিয়া যাইতে হয়, এবং কোনো বলি মানত করিতে হয়। ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া নিঃশব্দে বীজ জমিতে ছড়াইয়া দিতে হয় ও পুনরায় সেইরূপ সতর্কতার সহিত ফিরিয়া আসিতে হয়—ঠিক যেমন সতর্কতা যাইবার সময় অবলম্বন করা হইয়া থাকে। যদি যাইবার সময় বা ফিরিবার সময় অপর কোনো লোকের সহিত বা কোনো জানোয়ারের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া যায়, তাহা অতীব অমঙ্গলসূচক মনে করা হইয়া থাকে। যদি কেহ জানিতে পারে ও বলে যে, "অমুক ক্ষেত্রে বীজ বপন করিতে যাইতেছে বা বীজ বপন করিয়া ফিরিতেছে", তাহা হইলে সেই রাত্রের কার্য পণ্ড হইয়া যায়। পরদিবস আবার সেইরূপ ভাবে গিয়া বীজ ছড়াইয়া আসিতে হয়। আর যদি প্রাথমিক বীজ-বপন বেশ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া যায়, তাহা হইলে যে জীবটি বলির জন্য মানত রাখা হইয়াছে, তাহাকে আলোচাউল খাইতে দেওয়া হয়; এবং ধান কাটার পর বলি দিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়া রাখিয়া দেওয়া হয়।

যে ব্যক্তিকে প্রাথমিক বীজ বপন করিতে হয়, তাহাকে বীজ বপন করিবার দিন, দিনে ও রাত্রে সর্ব প্রকারে সংযম করিয়া থাকিতে হয়। আলোচাউলের ভাত খাইতে হয় ; অন্তত দুইবার, একবার প্রাতঃকালে ও একবার বীজ বপন করিতে যাইবার সময়, স্নান করিযা যাইতে হয়। পরদিন প্রাতঃকালে সেই বাড়ির সকলে গিয়া ক্ষেত্রে বীজ বপন করিবার সময় উপস্থিত থাকে। ক্ষেত্রে যে কেহই বীজ বপন করিতে পারে ; রাত্রে বীজ বপন করিতে যাইবার মতো বাঁধাবাঁধি কোনো নিয়ম নাই। তবে রাত্রে যেখানে প্রথম বীজ বপন করা হইয়াছে, সেই স্থান হইতেই বপন আরম্ভ করিতে হয়।

যখন বীজগুলি অঙ্কুরিত হইয়া বেশ বড়ো হয় ও পুনর্বার রোপণের

(transplantation) উপযুক্ত হয়, তখন ক্ষেত্রের অধিকারীকে, পাড়ার সকলকে সংবাদ দিয়া, পল্লি-স্ত্রীলোকদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া আসিতে হয়।

রোপণের প্রথম দিন প্রাতঃকালে গৃহকর্তা এক কলশি হাঁড়িয়া লইয়া গ্রামের পাহান বা পাহানের অনুপস্থিতিতে, পাহানের কোনো জ্ঞাতিকে সঙ্গে করিয়া, যে ক্ষেত্রে রোপণ আরম্ভ হইবে, সেই ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়। সেই স্থানে পাহান বা পাহানের প্রতিনিধি কলশি হইতে শালপাতার ঠোঙায় হাঁড়িয়া ঢালিয়া ক্ষেত্রে ছিটাইয়া দিতে দিতে বলে—হে মাতঃ বসুন্ধরে! এই ক্ষেত্রের শস্য যাহাতে খুব ভাল হয়, সেই জন্য তোমায় 'তাপাঁও'* দিয়া প্রার্থনা করি, যেন ক্ষেত্রকর্তার উৎকৃষ্ট ফসল হয়। এই প্রার্থনা করিয়া তিনবার হাঁড়িয়া ছিটাইবার পর, সেই কলশি হইতে কিঞ্চিৎ মদ্য নিজে পান করে ও কিঞ্চিৎ ক্ষেত্রস্বামীকে পান করিতে দেয়। কোনো কোনো গ্রামে এই সময় একটি মুরগি বলিও প্রদান করা হইয়া থাকে। তবে বলি দিবার কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নাই। ক্ষেত্রস্বামীর সামর্থ্য ও পাহানের ইচ্ছার উপর সমস্তই নির্ভর করে।

হাঁড়িয়া পান করিবার পর পাহান স্বহস্তে কয়েকটি চারাগাছ ক্ষেত্রে রোপণ করিয়া দেয়। পরে সমবেত স্ত্রীলোকেরা রোপণ-কার্য করিতে থাকে। ক্ষেত্রস্বামী ও পাহান ক্ষেত্রস্বামীর গৃহে ফিরিয়া আসে। সেইখানে ক্ষেত্রস্বামী নিজে পাহানকে স্নান করাইয়া যথাসাধ্য আহার ও মদ্য পান করিতে দিয়া কিঞ্চিৎ দক্ষিণা (/০ হইতে ।/০) পর্যন্ত দিয়া বিদায় করে। ওদিকে সমস্ত পল্লি রোপণে-প্রবৃত্ত স্ত্রীলোকদিগের সুমধুর সংগীতোচ্ছ্বাসে মুখরিত হইয়া গ্রামবাসীর প্রাণে এক নূতন আনন্দ, নূতন আশা জাগাইয়া দেয়। বস্তুত এই সময়ে ওরাওঁ গ্রামে প্রবেশ করিলে সত্যই প্রাণ প্রফুল্ল হইয়া উঠে। ইচ্ছা হয়, কবির মত প্রতি লোমকূপ দিয়া I listen till I have my fill. এই সময় হইতে ধান কাটা হওয়া পর্যন্ত আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই বিশেষ পরিশ্রম করিয়া থাকে।

এই মাত্র যে উৎসবের বিষয় বর্ণনা করা হইল, তাহার নাম 'বন-গাড়ি'।

ধানের গাছগুলির যাহাতে কোনোরূপে অনিষ্ট না হয়, সেই জন্য ওরাঁওরা খুব সতর্ক থাকে। দিনের বেলায় সকলে পালা করিয়া ক্ষেত্রে পাহারা দেয়। কখনো-কখনো দুষ্ট লোকের কুদৃষ্টি ও পাখিদের হাত হইতে গাছগুলি বাঁচাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে, একটি কালো হাঁড়ির তলদেশে চুন দিয়া সাদা-সাদা দাগ করিয়া, উলটা করিয়া একটি বাঁশের উপর রাখিয়া দেওয়া হয়। আর রাত্রে চোরের হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য মাচা তৈয়ারি করিয়া তাহাতেই একজনকে বিনিদ্র রজনী কাটাইতে হয়। বালকেরা এই সময়ে গোরু মহিষ লইয়া চরাইতে যায়। এইরূপে পশুর হাত হইতে গাছগুলি বাঁচানো হয়। দরিদ্র ওরাওঁরা এত কষ্ট করিয়া, বুকের রক্ত নিংড়াইয়া ধানগুলিকে রক্ষা করিলেও, সামান্য দুই-চারিজন ব্যতীত সকলকেই চাষের কাজ শেষ করিয়া বাংলা দেশে গিয়া, অথবা চা বাগানে গিয়া, প্রাণান্ত পরিশ্রমে মজুরি করিতে হয়। তাহার কারণ—১ম, তাহাদের অত্যধিক সরলতার জন্য গ্রাম্য উত্তমর্ণের অত্যাচার; ২য়, ছোটোনাগপুরের স্বভাবত অনুর্বর জমি।

* তর্পণের বারি।

ধানগুলি পাকিয়া আসিলে, কর্তনের পূর্বে 'খলিহান'* উত্তমরূপে গোময় দিয়া লেপন করিয়া পরিষ্কার করা হয় ও সেই স্থানে পূজা করা হইয়া থাকে। ইহার নাম খলিহানি পূজা। এই পূজা প্রথমে গ্রাম্য পুরোহিত, পাহান, আপনার খলিহানে সংসাধিত করে। পরে গ্রামস্থ অন্যান্য ব্যক্তিরা করিয়া থাকে। নির্দিষ্ট দিনে, যে মুরগি অথবা সামর্থ্য হিসাবে ছাগল, বা শূকর, বীজ বপনের সময় মানত করা থাকে, তাহা খলিহানে লইয়া আসা হয় এবং খলিহান-ভূতের নিকট বলি দেওয়া হয়। হাঁড়িয়া ও মদ্যপান এবং নৃত্যগীত যথেষ্টই হইয়া থাকে। তাহার পর শস্য কাটা হয় ও খলিহানে বহন করিয়া আনিয়া জমা করিয়া রাখা হয়। এই স্থানে ধান গাছ হইতে ছাড়াইয়া মাড়িয়া ঘরে লইয়া যাওয়া হয়। যতদিন না সমস্ত কার্য শেষ হয়, ততদিন খড়েরই একটি ছোটো ঘর তৈয়ার করিয়া দুইজন কি একজন ওরাওঁ রাত্রে শয়ন করিয়া খলিহান পাহারা দেয়। এই ঘরটির সমস্তই খড়ের এবং দুই পাশ ঢালু—যাহাতে বৃষ্টি পড়িলেও ভিতরের বিশেষ কিছু ক্ষতি না হয়। ওরাওঁরা বলে যে, এক শ্রেণির ভূত আছে, যাহার নাম 'চোর দেওয়া'। তাহারা খুব খর্বাকৃতি—কেহই এক হাতের বেশি উঁচু নয়। মাথায় তাহাদের এত বড়ো-বড়ো জটা যে, চলিবার সময় মাটিতে লুটাইয়া পড়ে। তাহাদের বর্ণ ঘোর কালো ; কিন্তু চোখ দুইটি খুব বড়ো-বড়ো, ও আগুনের ভাটার মত জ্বলজ্বল করে। ইহাদের যাহারা বশে আনিতে পারে, তাহাদেব জন্য ইহারা নানারূপ ধন-দৌলত ও ধান চুরি করিয়া আনিয়া দেয়। খলিহানে ইহারা প্রত্যহই যায় ও পাহারার লোক অন্যমনস্ক অথবা অসতর্ক থাকিলে, ধান চুরি করিয়া পলাইয়া যায়। এইজন্য খলিহানে ওরাওঁরা সমস্ত রাত্রি পাহারা দেয়।

ওরাওঁদের চাষ সংক্রান্ত আরও একটি প্রধান উৎসব 'নওয়াখানি'**। ভাদ্রমাসে যখন গোড়া ধান পাকিয়া উঠে, সেই সময় এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। গ্রামস্থ ব্যক্তিদের পূর্বেই পাহানই প্রথম আপনার 'নওয়াখানি' সম্পন্ন করে। উৎসবের দিনের দুই-এক দিন পূর্বে উষাকালেরও পূর্বে পাহান ও মাহাতো দুইজনে পার্শ্বস্থ গ্রামে শস্যক্ষেত্র হইতে কিছু ধান্য সংগ্রহ করিয়া আনে। ক্ষেত্রাধিপতির অনুমতি পূর্বাহ্নেই লইয়া রাখা হইয়া থাকে। সেই ধান্য হইতে পাহান আপনার বাড়িতে চিঁড়া প্রস্তুত করাইয়া লয় এবং 'মাহাতো'র দ্বারা গ্রামস্থ প্রবীণদিগকে ডাকাইয়া আনায়। পরে শীতল জলে স্নান করিয়া, যে ঘরে গ্রাম্য দেবতা 'চালো পাচ্চো' বা সর্নাবুড়িয়ার পবিত্র কুলা*** রাখা থাকে, সেই ঘরে প্রবেশ করিযা সেই কুলার উপর সর্নাবুড়িয়াকে আবাহন করিয়া, চিঁড়া উৎসর্গ করে ; এবং প্রসাদ আনিয়া সমবেত সকলের হাতেই কিঞ্চিৎ-কিঞ্চিৎ বিতরণ করে। যাহারা অনুপস্থিত থাকে,

* খলিহান—গৃহের নিকটেব উন্মুক্ত স্থান; কোথাও কোথাও প্রস্তরময়। এইখানে ধান 'মিশ' ও 'মাড়া' হইয়া থাকে।

** 'নওয়াখানি'—নবান্ন। এই উৎসব না করিয়া নূতন চাউল ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ।

*** এই কুলাখানি ওরাওঁদের ধর্ম সম্বন্ধীয় বিশেষ বিশেষ কাজে ব্যবহৃত হয়। যখন যে পাহান হয়, তখন তাহারই গৃহে রাখা হয়। এই কুলা দ্বারা পাহান-নির্বাচনও হইয়া থাকে। এ বিষয়ে ভবিষ্যতে আলোচনা করিব।

তাহাদের বাটীতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। তাহার পর হাঁড়িয়া ও খাত ভাওয়া হয়। পাহানই খাওয়ার সমস্ত ব্যয়-ভার বহন করিয়া থাকে।

তাহার পর গ্রামস্থ ব্যক্তিরা আপন-আপন 'নওয়াখানি' উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। তাহারাও প্রতিবেশীর ক্ষেত্র হইতে নূতন ধান্য সংগ্রহ করিয়া চিঁড়া করে এবং কোনো পূজা না করিয়াই গৃহের সকলে মিলিয়া আহার করে ও প্রচুর মদ্য পান করে। রাত্রিতে যুবক-যুবতিরা আখড়ায় একত্রিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করে ও তাণ্ডবে রাত্রি শেষ করিয়া দেয়।

ভারতবর্ষ ● কার্তিক ১৩২৯ (১৯২২ খ্রিস্টাব্দ)



ওরাওঁদের ঐতিহ্য

শ্রীশরৎচন্দ্র রায়

ঐতিহ্যকে মানিতে হইলে ওরাওঁজাতির আদি নিবাস যে দাক্ষিণাত্যে ছিল এ কথাটি মানিয়া লইতে হয়। দাক্ষিণাত্যের অধিবাসীদিগের সহিত ইহাদের জাতিগত এবং ভাষাগত অনেক সাদৃশ্যও আছে। ভাষাবিদগণের পরীক্ষার মাপকাঠিতেও দক্ষিণভারতের তামিল, উত্তরভারতের খোন্দ ও গোঁড়, বেলুচিস্তানের ব্রাহুই এবং ওরাওঁদের ভাষার ভিতরে যথেষ্ট ঐক্য পরিলক্ষিত হইয়াছে।

ওরাওঁগণের কোনো নির্দিষ্ট বাসস্থান ছিল বলিয়া মনে হয় না। তাহারা সাধারণত বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণ প্রান্তে পাহাড়ের গায়ে গায়ে ঘুরিয়া বেড়াইত। অরণ্যজাত ফলমূল এবং শিকারলব্ধ পশুই ইহাদের ক্ষুন্নিবারণের একমাত্র উপায় ছিল। রামচন্দ্রের বানরসৈন্যের মতো ইহাদেরও যুদ্ধাস্ত্র ছিল—লাঠি ও পাথর। সুতরাং ইহাদেরই পূর্বপুরুষদিগের সাহায্যে আর্য রামচন্দ্র অনার্য রাজা রাবণকে পরাজিত করিয়াছিলেন—এ সিদ্ধান্ত একেবারেই অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না।

কৃষিবিজ্ঞানের সহিত পরিচয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওরাওঁদের ভিতর শিকারের ঝোঁক অনেকটা কমিয়া আসে এবং তাহার পর হইতেই ধীরে ধীরে নর্মদার উর্বর উপত্যকা-ভূমিতে ওরাওঁপল্লির পত্তন শুরু হয়। সাধারণত দেখা যায় যে কৃষি-জীবনের সূচনার সঙ্গে সঙ্গেই জাতির ভিতর শিল্পকলা উন্মেষলাভ করে। শিল্পের সম্বন্ধে ওরাওঁদের জ্ঞান অতি পরিমিত হইলেও তাহাদের তৈরি খড়ের গদি ও খড়ের বিড়ে প্রভৃতিতে শিল্পনৈপুণ্যের আভাস স্পষ্টই বিদ্যমান। খুব সম্ভব এইস্থান হইতেই তাহারা উত্তর ভারতের দিকে অগ্রসর হয় এবং নন্দনগড়, পিপড়িগড় প্রভৃতি স্থানে কিছুদিনের জন্য

বাস করিয়া বিহারের অন্তর্গত সাহাবাদ জেলায় প্রবেশ করে। প্রবাদ, এই সময়ে করোক্ষ নামে তাহাদের কোনো প্রাচীন অধিনায়ক অত্যন্ত প্রতাপশালী হইয়া উঠে। তাহারই নাম অনুসারে এইখানে করোক্ষ বা করুষ দেশের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। কালের আবর্তনে কোল জাতীয় চেরারা যখন বিশেষ প্রবল হইয়া উঠিল, ওরাওঁরা তখন সাহাবাদ জেলা পরিত্যাগ করিয়া রোহিতাস্য বা রোটাস অধিত্যকায় আশ্রয় লয় এবং ক্রমে ক্রমে তাহা দুর্গাকারে গড়িয়া তোলে। এখানকার সুখশান্তি এবং আনন্দের কথা এখনও তাহাদের ভিতর বহু গল্পে এবং কাহিনিতে বর্ণিত হইয়া এখানকার অনেকগুলি দিনের স্মৃতিকে তাহাদের ভিতর উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে।

এই রোটাসগড়ে তাহারা সম্ভবত অর্ধহিন্দু চেরাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। কিন্তু এখানে তাহাবা আটঘাট এমন কবিয়াই বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল, পাহাড়ের প্রাচীর তুলিয়া গড়টাকে এতই মজবুত করিয়া গাঁথিয়া লইয়াছিল, যে, পুনঃপুন প্রচণ্ড আক্রমণের আঘাতেও তাহা যেমন ছিল তেমনি রহিয়া গেল—একটুও টলিল না। শত্রুরা তখন বাধ্য হইয়া দুর্গজয়ের অন্য উপায় উদ্ভাবন করিতে তৎপর হইল। ওরাওঁরাজের দুধওয়ালির পরামর্শ অনুসারে খদ্দি বা সরহুল উৎসবের দিন যখন ওরাওঁরা মদের নেশায় একান্ত বিভোর হইয়া পড়িয়াছিল তখন তাহারা অরক্ষিত গুপ্ত পথে দুর্গে প্রবেশ করিয়া তাহা অধিকার করিয়া বসে। তখন ওরাওঁরমণীগণ উৎসবের জন্য উখলিতে করিয়া চাল কাঁড়াইতেছিল ; তাহারা অমনি উখলির কাষ্ঠদণ্ড শামাট হাতে করিয়া দেশের স্বাধীনতার জন্য শত্রুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু এই নারী সৈন্যকে পরাজিত করিতে চেরাদিগকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। শত্রুসৈন্যের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই ওরাওঁ রাজা ও তাঁহার প্রজাবর্গ ভূগর্ভস্থ পথে দুর্গের বাহির হইয়া যায়। এক এক মণ তৈলপায়ী বড়ো বড়ো মশালের আলোকে আকাশের সুদূর প্রান্ত পর্যন্ত আলোকিত করিয়াও চেরারা ওরাওঁদিগের অনুসন্ধান করিয়া উঠিতে পারে নাই। ওরাওঁ ছাড়া আরও অনেকে এই রোটাস দুর্গের প্রতিষ্ঠার দাবি করে—সুতরাং একথা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন যে ওরাওঁরাই এ দুর্গের প্রতিষ্ঠাতা।

রোটাস দুর্গ পরিত্যাগের পর ওরাওঁদিগকে যে পথ অবলম্বন করিতে হয় তাহা দুর্ভেদ্য বনের ভিতর দিয়া। কোয়েল নদীর তীর ধরিয়া তাহারা প্রথমে পালামৌ, তারপর ছোটোনাগপুরে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। ছোটোনাগপুর তখন মুন্ডাদের অধিকারে। ওরাওঁদের বিশ্বাস এই মুন্ডাদের সংস্পর্শে আসিয়াই তাহারা আচারে-ব্যবহারে খাদ্যাখাদ্য বিচারে এতটা হীন হইয়া পড়িয়াছে, নতুবা তাহারা এককালে সভ্যতার উচ্চাসনেই আবূঢ় ছিল। শরীরতত্ত্ববিদদের মত কিন্তু ভিন্ন রকমেব। তাহার এই দুই জাতির ভিতর শরীরগত যথেষ্ট সামঞ্জস্য দেখিতে পাইয়াছেন। ইহাদের উভয়েরই মুখ চ্যাপটা, আকার বেঁটে, মস্তক অপরিসর, এবং নাসা বিস্তৃত। ওরাওঁদের শরীরের রং গাঢ় তাম্রবর্ণ, চুল কালো, অমসৃণ এবং সাধারণত কোঁকড়ানো। ইহাদের চক্ষু মাঝারি রকমের, এমনকি ছোটো বলিলেই চলে, চোয়াল সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়া, ওষ্ঠ পুরু এবং নাসিকা গোড়ার দিকে চ্যাপটা।

লোক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ওরাওঁরা ছোটোনাগপুরের উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত হইতে একেবারে জেলার ভিতর পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। এইরূপে প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেক গ্রামেই একজন করিয়া নেতা থাকিত। সেই নেতাই ধর্ম এবং সমাজ সম্বন্ধে ওরাওঁদিগের কর্তব্যাকর্তব্য নির্দেশ করিয়া দিত। গ্রাম্য বৃদ্ধদের বৈঠকের বা পঞ্চায়েতের হাতে বিচারের ভার ন্যস্ত ছিল। সাত, বারো, একুশ বা বাইশটি গ্রাম লইয়া এক একটি করিয়া পাড়া। এই পাড়ার কোনো একটি গ্রামের নেতাই ছিল সমস্ত পাড়াটির রাজা। অন্যান্য গ্রামের নেতারা মন্ত্রণা দ্বারা রাজাকে সাহায্য করিত। গ্রামে গ্রামে বিবাদ বাধিলে বা সমস্ত জাতির সুবিধা অসুবিধা লইয়া কোনো প্রশ্ন উঠিলে এই পাড়ার আদালতে তাহার মীমাংসা হইত। রাজা নামটার ভিতর রাজতন্ত্রের গন্ধ থাকিলেও ওরাওঁদের শাসনপ্রণালী সম্পূর্ণরূপেই প্রজাতন্ত্র ছিল। রাজারা বা নেতারা কোনো নিয়ম লঙ্ঘন করিলে তাহাদিগকে সাধারণ লোকের মতই দণ্ড গ্রহণ করিতে হইত। ওরাওঁদিগের আইন অনুসারে সমাজচ্যুতিই সর্বাপেক্ষা কঠোর দণ্ড। ওরাওঁদের প্রজাতন্ত্র অনেকটা আধুনিক সভ্যজগতের মতই ছিল। সময় এবং সুবিধা পাইলে তাহাদের প্রজাতন্ত্র যে বর্তমানের যে-কোনও প্রজাতন্ত্রের সমকক্ষ হইতে পারিত তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যায়।

অনেক দিনের পর ওরাওঁদের ভিতর আবার একটু একটু করিয়া জীবনের সাড়া জাগিয়া উঠিয়াছে। দেশের বালকদিগকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার নিমিত্ত চারিদিকে ইহাদের একটা চেষ্টার আভাস স্পষ্টরূপেই পরিস্ফুট। ইহারা নিজেরা সমবেত হইয়া চাঁদা তুলিয়া সেই অর্থের ব্যয়ে গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পাঠশালা স্থাপন করিতেছে এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য শহরে ও স্কুলকলেজে ছাত্র পাঠানোও শুরু হইয়া গিয়াছে। দরিদ্র অশিক্ষিত ওরাওঁরাও ১০ সের পরিমিত ধান ফসলের সময় ওরাওঁ-মুণ্ডা-শিক্ষা-সভায় সাহায্যরূপে দান করে। এই সমস্ত সাহায্য হইতে রাঁচিতে উচ্চশিক্ষাভিলাষী ওরাওঁ-বালকদের জন্য একটি বোর্ডিং হাউস বা ছাত্রাবাসও স্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের আত্মবোধ ও আত্মচেষ্টার সহিত খ্রিস্টপন্থী মিশনারিদের ও গভর্মেন্টের চেষ্টা যত্নযুক্ত হইয়া ইহাদিগকে দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছে।

উন্নতি লাভের জন্য সত্যকার একটা চেষ্টা ইহাদের ভিতর জাগিয়া উঠিয়াছে সে বিষয়ে আজ আর সন্দেহ করিবার কিছু নাই এবং এই সব দেখিয়া শুনিয়া এ কথা স্বতই মনে আসিয়া পড়ে যে সেদিন খুব বেশি দূরে নহে যেদিন জ্ঞানে কর্মে ইহারা ইহাদের প্রতিবেশী হিন্দু ও মুসলমানের সহিত একই স্তরে আসিয়া দাঁড়াইতে পারিবে।

প্রবাসী ● কার্তিক ১৩২১ (১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ)



মুন্ডা জাতি

শরৎচন্দ্র রায়

বঙ্গদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে ছোটোনাগপুর প্রদেশ অবস্থিত। সমতল নিম্নবঙ্গ হইতে পার্বত্য ছোটোনাগপুর প্রদেশ প্রাকৃতিক আকৃতিতে যেরূপ বিভিন্ন, ছোটোনাগপুরের আদিম অধিবাসীগণ নিম্নবঙ্গের অধিবাসীগণ হইতে তদপেক্ষা অধিকতর বিভিন্ন। ছোটোনাগপুরের আদিম অধিবাসীগণ সাধারণত কোল নামে অভিহিত হয়। এই আদিম অধিবাসীরা প্রধানত উরাওঁ, মুন্ডা ও খাড়িয়া এই তিন জাতিতে বিভক্ত। ইহাদের বাসস্থান ছোটোনাগপুর বিভাগের রাঁচি জিলা। এই জিলাকেই (Chotanagpur-proper) বা 'প্রকৃত ছোটোনাগপুর' বলা যায়। নাগবংশি রাজাদের প্রভুত্বের সময় হইতে এই নামকরণ হয়। পুরাকালে ছোটোনাগপুর 'ঝাড়খণ্ড' নামে অভিহিত হইত। বিগত ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারির সময় রাঁচি জিলার মোট অধিবাসী সংখ্যা এগারো লক্ষ সাতাশি হাজার নয়শত পঁচিশ ছিল। তন্মধ্যে পাঁচ লক্ষ নব্বই হাজার ছয়শত সাতাইশ জন উরাওঁ, তিন লক্ষ একাশি সহস্র ছয়শত আঠাইশ জন মুন্ডা এবং এক লক্ষ চারি সহস্র সাতশত বাহান্ন জন খাড়িয়া জাতি ভুক্ত। এই তিন জাতির মধ্যে মুন্ডা জাতির প্রাধান্য সর্ববাদীসম্মত। তাহারাই সর্বপ্রথমে ছোটোনাগপুর প্রদেশের জঙ্গলাদি কাটিয়া এখানে উপনিবেশ সংস্থাপন করে। এক সময় তাহারাই এই প্রদেশের ভূস্বামী ছিল এবং কর্ণেল ডালটন (Colonel Dalton) প্রভৃতি ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন, ছোটোনাগপুরের বর্তমান নাগবংশীয় রাজারাও কোল-বংশ সম্ভূত। সে যাহাই হউক উক্ত রাজবংশের উদ্ভব সম্বন্ধে নাগবংশিদের মধ্যে নিম্নলিখিত কিংবদন্তি প্রচলিত আছে।

পুরাকালে যখন রাজা জন্মেজয় সর্পযজ্ঞ দ্বারা অহিকুল নির্মূল করিতে ছিলেন, তখন পুণ্ডরীক নাগ নামক একটি নাগ-সর্প বহু কষ্টে পলায়নপূর্বক স্বীয় প্রাণ রক্ষা করে।

পুণ্ডরীক নাগ মনুষ্য মূর্তি ধারণ করিয়া বারাণসী তীর্থে গমন করিয়া তথায় পার্বতী নাম্নী এক ব্রাহ্মণ কন্যার পানিগ্রহণ করে। যদিও পুণ্ডরীক বাহ্যত সম্পূর্ণরূপে মনুষ্য মূর্তি ধারণ করিতে সফল-প্রযত্ন হইয়াছিলেন, তত্রাপি তাঁহার জিহ্বাদেশ সর্পের জিহ্বার ন্যায় দ্বিখণ্ডে বিভক্ত ছিল। অপর সকলের নিকট এই বিশেষত্ব অজ্ঞাত থাকিলেও তাঁহার কর্তিত-জিহ্বা পত্নী পার্বতীর দৃষ্টিগোচর হইতে অধিক বিলম্ব হইল না। তিনি পুনঃপুন উহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাঁহাকে ভুলাইবার জন্য পুণ্ডরীক সস্ত্রীক তীর্থ ভ্রমণে গমন করেন। পুরীধাম হইতে প্রত্যাগমনকালীন পুণ্ডরীক ও পার্বতী ঝাড়খণ্ডের পার্বত্য প্রদেশের পথ দিয়া গমন করিতেছিলেন। ওই সময়ে পার্বতী অন্তঃস্বত্বা ছিলেন। যখন তাঁহারা ঝাড়খণ্ড প্রদেশের বর্তমান রাঁচি জিলাস্থিত সুতিয়াম্বে নামক গ্রামের নিকট পৌঁছিলেন, তখন পার্বতীর প্রসব-বেদনা উপস্থিত হয়। তখন পার্বতী পুনরায় স্বামী পুণ্ডরীকের কর্তিত-জিহ্বার কারণ জানিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন। এইবার বাধ্য হইয়া পুণ্ডরীক আসন্ন-প্রসবা পত্নীর নিকট আত্ম-ইতিহাস বিবৃত করিলেন। বর্ণনা শেষ হইবা মাত্র পুণ্ডরীকের রূপ পরিবর্তিত হইল ; পুনরায় স্বকীয় সর্পরূপ গ্রহণ করিয়া নিকটবর্তী জলাশয়ে প্রবেশ করিলেন। পতি বিরহে শোকাকুলা পার্বতী সুন্দর পুত্র সন্তান প্রসবান্তে স্বীয় স্ত্রী-স্বভাব-সুলভ ঔৎসুক্যকে ধিক্কার করিতে করিতে চিতা আরোহণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

ঠিক ওই সময়েই একটি শকল-দ্বীপি ব্রাহ্মণ সূর্যদেবের প্রস্তর নির্মিত প্রতিমূর্তি লইয়া ওই পথ অতিক্রম করিতেছিলেন। তৃষ্ণার্ত হইয়া তিনি হস্তস্থিত দেবমূর্তি ভূমিতে রাখিয়া ওই জলাশয়ে পানার্থ গমন করেন। তৃষ্ণা অপনোদন করিয়া যখন সূর্যমূর্তি উঠাইতে গেলেন, তখন কোনো মতেই উহা ভূমি হইতে উঠাইতে পারিলেন না। ইহাতে তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া ব্রাহ্মণ এই বিস্ময়কর ব্যাপারের কারণ অনুসন্ধানার্থে চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অবিলম্বে আরও একটি অধিকতর বিস্ময়কর ব্যাপার তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি দেখিলেন, অদূরে একটি সদ্যোজাত শিশুর মস্তকোপরি ছত্রের ন্যায় ফণা বিস্তার করিয়া এক অজগর নাগ-সর্প শিশুকে প্রখর সূর্যকিরণ হইতে রক্ষা করিতেছে। বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে ব্রাহ্মণ এই অদ্ভুত দৃশ্য অবলোকন করিতেছিলেন, এমন সময়ে ওই নাগ সর্প তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিল। সর্প বলিল, "হে বিপ্র! ভবিষ্যতে এই শিশু এতদ্দেশের রাজা হইবেন এবং তোমার হস্তস্থিত সূর্য-দেবতা ইঁহার কুল-দেবতা হইবেন। এই শিশু ফণিমুকুট রায় নামে পরিচিত হইবেন এবং এই জনপদ নাগপুর নামে অভিহিত হইবে।" এই ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করিয়া পুণ্ডরীক নাগ পুনরায় পূর্বোক্ত জলাশয়ে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হইলেন। তখন ব্রাহ্মণ ওই শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া নিকটবর্তী এক গ্রামে প্রবেশ করিলেন। ওই সময়ে এই প্রদেশ মুণ্ডাদের অধিকৃত ছিল। মুণ্ডারাই প্রথমত জলশূন্য জঙ্গল আবাদ করিয়া এই দেশকে বাসোপযোগী করে। পরে উরাওঁ প্রভৃতি জাতিরা আর্যজাতি কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া মুণ্ডাদের দেশে আগমন করে ও মুণ্ডাদের নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া এদেশে বাস করে। প্রতি গ্রামের নেতাকে "গ্রাম মুণ্ডা" (হাড়ু মুণ্ডা) নামে অভিহিত করা হইত। তিনি গ্রামের আদিম প্রতিষ্ঠাতার বংশের প্রধান ব্যক্তি। অন্যতর প্রধান ব্যক্তিকে 'পাহান' আখ্যা দেওয়া হয়। 'পাহান' ধর্ম সম্বন্ধে গ্রামবাসীদিগের নেতা ও গ্রামবাসী মুণ্ডাদিগের পুরোহিত স্থানীয়।

দ্বাদশ বা তদূর্ধ্বগ্রাম মিলিয়া একটি 'পট্টি' গঠিত হইত, পট্টিস্থিত গ্রাম সমুহের 'গ্রাম মুন্ডা' দিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে ওই পট্টির নেতা মনোনীত করিয়া তাহাকে "মানকি" আখ্যায় আখ্যাত করা হইত। কালক্রমে "গ্রাম মুন্ডার" ন্যায় "মানকি"-র পদও বংশগত হইয়া যায়। পূর্বোক্ত শকল-দ্বীপি ব্রাহ্মণ যে গ্রামে প্রবেশ করিলেন, তথাকার গ্রাম মুন্ডাই ওই পট্টির "মানকি" ছিল। তাহার নাম মদ্রা মুন্ডা। ব্রাহ্মণ ওই শিশুকে লইয়া মদ্রা মুন্ডার গৃহে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণের অনুরোধে মদ্রা, ওই পিতৃ-মাতৃহীন শিশুকে প্রতিপালন করিতে সম্মত হইল। মদ্রারও কয়েকদিন পূর্বে প্রথম নবকুমার জন্মগ্রহণ করে। মদ্রা মানকি স্বীয় সন্তানের সহিত একত্রে ও একভাবে এই নবাগত শিশুকে অপত্য-নির্বিশেষে প্রতিপালন করিতে লাগিল। যখন উভয় শিশু বয়োপ্রাপ্ত হইল তখন মদ্রা মুন্ডা প্রতিপালিত বালককে নিজ পুত্র অপেক্ষা যোগ্যতর বিবেচনা কবিযা নিজপদে প্রতিষ্ঠিত করিল এবং যখন মানকিরা তাহাদের মধ্যে প্রধান বা রাজা নির্বাচিত করে, তখন ফণিমুকুটকেই ওই পদে বরণ করা হইল। এই ফণিমুকুটের একষট্টিতম বংশধর ছোটোনাগপুরের বর্তমান মহারাজা। ওই রাজবংশের হিসাব অনুসারে একশত একুশ সংবতে অর্থাৎ চৌষট্টি খ্রিস্টাব্দে ফণিমুকুট রাজপদে অভিষিক্ত হন। এই কাল-নির্দেশ ভ্রমশূন্য বলিয়া গ্রহণ না করিলেও, ছোটোনাগপুরের নাগবংশীয় রাজাদের আবির্ভাবকাল আনুমানিক এক সহস্র হইতে দেড় সহস্র বৎসরের মধ্যে নির্দেশ করা যাইতে পারে। তাহার পূর্ব হইতে মুন্ডা জাতি বর্তমান রাঁচি জেলার পার্বত্য ও জঙ্গলাবৃত প্রদেশ অধিকার করিয়া আছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মুন্ডা জাতির কিংবদন্তি হইতে জানা যায় যে, তাহারা ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে পুরাতন মগধরাজ্য অতিক্রম করিয়া ছোটোনাগপুরে প্রবেশ করে। এক সময়ে বিহারে কোলেরা পরাক্রান্ত জাতি ছিল। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে এবং বিহারে এখনও কোলদিগের অবস্থানের অনেক চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয়। আমরা পূর্বে বলিয়াছি, ছোটোনাগপুরের মুন্ডা, উরাওঁ ও খাড়িয়া তিন জাতি 'কোল' নামে অভিহিত হয় ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উরাওঁ জাতি কোল নহে। ভাষাতত্ত্ববিদেরা উরাওঁদিগকে 'ড্রাভিডিয়ান' জাতির অন্তর্গত বলিয়া নির্দেশ করেন। উরাওঁদের ভাষা দক্ষিণ ভারতের তামিল, তেলেগু, কানারীয় প্রভৃতি ভাষার সহিত নৈকট্য সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট এবং উরাওঁদের কিংবদন্তি হইতে জানা যায়, তাহাদের পূর্বপুরুষেরা দক্ষিণ ভারত হইতে উত্তরে গমন করে এবং পরে রোটাস-গড় অতিক্রম করিয়া মুন্ডাদের অধিকৃত ছোটোনাগপুরে প্রবেশ করে। অপর পক্ষে, ভাষাতত্ত্ববিদ পণ্ডিতদিগের মতে, ছোটোনাগপুরের মুন্ডাজাতির ভাষা ও সান্তাল, ভূমিজ, হো, বিরহোড়, কোড়োয়া, তুরি, অসুর, কুড়কু, খাড়িয়া, জুয়া, শবর ও গদভ জাতির ভাষা ফিলিপাইন দ্বীপবাসী, মালয় উপদ্বীপবাসী, মালাক্কা দ্বীপবাসী, নিকোবর দ্বীপবাসী এবং অস্ট্রেলিয়াবাসী কয়েকটি বর্বর জাতির ভাষা, আসামের খাসি জাতির, কোচিন চায়নার আনামিজ জাতির ও অপর কয়েকটি অসভ্য জাতির ভাষার সহিত সুস্পষ্ট সম্বন্ধ আছে। এই ভাষাগত সাদৃশ্য হইতে অনুমান হয়, এই সমস্ত জাতি, পুরাকালে উত্তর ভারতে একত্র অবস্থান করিত।

যখন পরাক্রান্ত আর্যজাতি উত্তর পশ্চিমস্থ গিরিবর্ত সকলের (passes) মধ্য দিয়া ভারতে প্রবেশ করেন, তখন ভারতের আদিম নিবাসী জাতিরা আর্য-পরাক্রম সহ্য করিতে

অসমর্থ হইয়া পূর্বাভিমুখে পলায়ন করে। খাসি জাতি আসামে গিয়া অবস্থান করিল। 'মন' বা তেলাঙ্গা জাতি পেগুতে উপনিবেশ স্থাপন করে। অপর কয়েকটি কোল জাতি সম্ভবত বন্য বৃক্ষ ছেদনপূর্বক তৎকাষ্ঠ নির্মিত ডোঙায় আরোহণ করিয়া নূতন প্রদেশের অন্বেষণে কেহ বা মালয় উপদ্বীপ, কেহ বা ফিলিপাইন দ্বীপ, কেহ বা নিকোবর দ্বীপ এবং অপর কেহ সুদূর অস্ট্রেলিয়া দেশে উপনীত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। মুন্ডাজাতি উত্তর ভারতের নানা স্থানে অবস্থান করিয়া অবশেষে ছোটোনাগপুরে উপনীত হয়। ঋগ্বেদ প্রভৃতিতে ভারতীয় অনার্যদিগের যে "কৃষ্ণগর্ভ", 'ঘোর চক্ষু", "বিশিপ্র", "ক্রাব্যদ" বলিয়া বর্ণনা আছে, সেই বর্ণনার সহিত মুন্ডা প্রভৃতি জাতিদিগের সৌসাদৃশ্য আজিও বর্তমান রহিয়াছে। মুন্ডারা এখনও কৃষ্ণত্বক, ঘোর চক্ষু, অনুন্নত-নাসা-বিশিষ্ট ও মাংসাশী।

নৃত্য, গীতে এবং মৃগয়ায় তাহারা সমধিক আসক্ত। পানাসক্তি ও ভবিষ্যৎ চিন্তা-রাহিত্য তাহাদের চরিত্রের প্রধান দোষ। আমোদপ্রিয় হইলেও মুন্ডারা প্রয়োজনমত অত্যন্ত পরিশ্রমশীলতার পরিচয় দেয়। যেরূপ পরিশ্রম সহকারে অনুর্বর প্রস্তর-বহুল উপত্যকাসমূহে মুন্ডারা কর্ষণোপযোগী ক্ষেত্র প্রস্তুত করে, তাহা বস্তুত অতীব প্রশংসনীয়। সততা, সত্যপ্রিয়তা ও বিশ্বস্ততা তাহাদের চরিত্রের বিশেষ গুণ। আজকাল শিক্ষা পদ্ধতির দোষে, আদালতের মানসিক-অস্বাস্থ্য-জনক ছায়ায় এবং অধিকতর বুদ্ধি-সম্পন্ন হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতির সংসর্গদোষে, অনেক স্থলে মুন্ডাদের স্বভাবসিদ্ধ সত্যপ্রিয়তার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু সে দোষ ব্যক্তিগত মাত্র—জাতিগত নহে। যে সকল মুন্ডারা উপরোক্ত বহিঃপ্রভাব হইতে দূরে আছে, তাহাদের মধ্যে এখনও এই আদিম জাতির আচার-ব্যবহার সামাজিক রীতিনীতি প্রভৃতি পর্যালোচনা করিলে মনুষ্য সমাজের ক্রমোন্নতির জীবন্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। বারান্তরে আমরা মুন্ডাদের আচার-ব্যবহার, সামাজিক রীতিনীতি প্রভৃতি যথাসম্ভব পর্যালোচনা করিব।

বাণী ● আষাঢ় ১৩১৮ (১৯১১ খ্রিস্টাব্দ)



ছোটোনাগপুরী হো

শ্রীপরমেশপ্রসন্ন রায়

বড়ো নাগপুর মধ্যপ্রদেশে, আর ছোটো নাগপুর বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে। বিহার ও উড়িষ্যার মাঝখানে চাপা পড়িয়া 'ছোটোনাগপুর' নামটির ক্রমেই ছোটো ও অপ্রকট হওয়ার সম্ভাবনা হইয়াছে।

'নাগপুর' নাম কেন? রাজা জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞে যেসব নাগ তক্ষকের সঙ্গে আসন্ন-মৃত্যু হইতে রক্ষা লাভ করেন, পুণ্ডরীক নাগ তাঁহাদের অন্যতম। আসন্ন-মৃত্যু হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া পুণ্ডরীক নানা তীর্থ পর্যটন করেন। অবশেষে কাশীতে যাইয়া তিনি ব্রাহ্মণ বালকের ছদ্মবেশে নানা শাস্ত্র অধ্যয়নপূর্বক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইলেন। তাঁহাকে আর গুরুদক্ষিণা দিতে হইল না। বরং গুরুমহাশয়ই পরম দাক্ষিণ্য সহকারে স্বীয় অনুপমা কন্যা পার্বতীকে সম্প্রদান করিয়া শিষ্যকে বিদায় করিলেন। ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণকুমার ওরফে পুণ্ডরীক নাগ আর কাল বিলম্ব না করিয়া পার্বতীকে সঙ্গে লইয়া স্বদেশ দাক্ষিণাত্য অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পার্বতীর তখন গর্ভাবস্থা, তিনি স্বামীকে জগন্নাথ তীর্থ দর্শন করার বাসনা জানাইলেন। পুণ্ডরীক পুরীর পথ ধরিয়া ঝাড়খণ্ড নামক আরণ্য প্রদেশে উপনীত হইলেন। স্ত্রীর কাছে ছদ্মবেশ আর কতদিন গোপন থাকিবে? হাজার পণ্ডিত হউন, নাগ তো বটেন, গায়ের গন্ধটা অনিবার্য। সুতরাং অল্প দিনের মধ্যেই পার্বতীর মনে একটু সন্দেহের আবির্ভাব হইলে। হা কপাল, ব্রাহ্মণের হাতেই পড়িলাম, না চণ্ডালের হাতে পড়িলাম ঠিক কী? পুণ্ডরীকের নানা শাস্ত্র 'মুখস্থ' ছিল। মুখের ভিতর শাস্ত্র থাকায় তাঁহার সর্প-জিহ্বাটি সর্বদা ঢাকা থাকিত। একদিন প্রেমালাপের পর দম্পতি-কলহ উপস্থিত। দম্পতি-কলহ কাহার ভাগ্যে না ঘটে? পুণ্ডরীক বিনাদোষে পার্বতীর প্রতি অশাস্ত্রীয় কটুবাক্য প্রয়োগ করিতেছিলেন। এই অবসরে পার্বতী পতিব মুখের ভিতর দ্বি-জিহ্বা দর্শন

করিয়া অতিশয় চকিতা হইলেন এবং বারংবার পতির প্রতি তদ্বিষয়ে প্রশ্ন-বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে দারুণ সন্দেহ উপস্থিত। পতি পরম গুরু বটেন ; কিন্তু তিনিই গুরু যিনি সন্দেহ ভঞ্জন করেন। এবার পুণ্ডরীকের অব্যাহতি নাই ; প্রশ্নের উপর প্রশ্ন— "বলো, বলো প্রাণনাথ! শীঘ্র বলো, সদুত্তর প্রদান করিয়া অধীনীর কৌতূহল চরিতার্থ করো।" পতি গর্ভিণী পত্নীর সাধ পূর্ণ করিতে ধর্মত বাধ্য। সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া পুণ্ডরীক পত্নীকে আপনার প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিলেন। আর প্রিয়তমার নিকট মুখ দেখানো দুষ্কর। তৎক্ষণাৎ তিনি স্বমূর্তি ধরিয়া সম্মুখে এক জলাশয়ের জলে ঝম্প প্রদান করিয়া লজ্জায় ডুবিয়া গেলেন। পার্বতীও তখন তীরে পুত্র প্রসব করিয়া দিঘির অতল জলে প্রাণ বিসর্জন করিলেন।

এই সময় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সূর্যদেবের পাষাণ মূর্তি মাথায় বহন করিয়া ওই পথে গমন করিতেছিলেন। রাস্তার ধারে ভালো পুকুর দেখিতে পাইলে পথিকদের পিপাসা প্রবল হয়। ব্রাহ্মণ মাথা হইতে দেবমূর্তি ভূতলে নামাইয়া পুকুরের জলে পিপাসা নিবৃত্তি করিলেন। কিন্তু তারপর মূর্তি তুলিয়া লইবার শক্তি শত চেষ্টাতেও তাঁহার আর হইল না। তিনি দ্বিতীয় পথিকের সাহায্য প্রতীক্ষায় ইতস্তত দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছেন, এমন সময়ে অদূরে উক্ত সদ্যপ্রসূত শিশুর প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, এক বৃহৎ নাগ শিশুর মস্তক বেষ্টন পূর্বক তদুপরি ফণা বিস্তার করিয়া উহাকে আতপ-তাপ হইতে রক্ষা করিতেছে। ইনিই সেই পুণ্ডরীক নাগ, শিশুর জন্মদাতা পিতা। তিনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"মহাশয়, এই শিশু এই দেশের ভাবী রাজা, আপনার সূর্যদেব ইহার গৃহ দেবতা। আপনি দেবমূর্তি স্থানান্তর করিতে পারিবেন না ; বরং আপনি রাজমন্ত্রী ও পুরোহিত হউন। ব্রাহ্মণ তথাস্তু বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। শিশুর নাম হইল ফণি-মুকুট রায়। ইনি ছোটোনাগপুরেব নাগবংশীয় রাজাদের বীজি পুরুষ। উক্ত ঘটনা হইতে তাঁহার রাজ্যের নাম নাগপুর। পূর্বনাম ঝাড়খণ্ড, রাজধানী কোকড়া। অদ্যাপি কোকড়ার রাজবাড়িতে উক্ত সূর্যদেবের পাষাণ মূর্তি বিরাজমান ; এখনও এই রাজবংশীয় পুরুষগণ বিশেষ উদ্যম ও ধৈর্য সহকারে মস্তকে সুশোভন বস্ত্র-রজ্জু বন্ধন করিয়া অপরূপ উষ্ণীষ রচনা করিয়া থাকেন। দেখিলেই বোধ হয় যেন কুণ্ডলীকৃত সর্প মস্তক বেষ্টন পূর্বক তদুপরি সম্মুখে মণিময় ফণা বিস্তার করিয়া ভাগ্যবান পুরুষ প্রবরকে দুর্ভাবনা-সন্তাপ হইতে রক্ষা করিতেছে। ছোটোনাগপুরের মহারাজার মোহর ও চাপরাশেও নাগ মূর্তি অঙ্কিত। যে স্থানে জগজ্জ্যোতি মহারাজ ফণি-মুকুট রায় জন্মগ্রহণ করেন সেস্থান সুতিয়াম্বা পরগনার অন্তর্গত পীঠরিয়া গ্রামে। এই গ্রাম রাঁচি শহরের দশ মাইল উত্তরে। প্রতি বৎসর "ইন্দ্র পর্ব" উপলক্ষে এই স্থানে এক মেলা হইয়া থাকে।

ঝাড়খণ্ডের এই রাজবংশ বহু সহস্রাব্দি পর্যন্ত শ্রীরাম সৈন্যের বংশধরদের উপর নির্বিবাদে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তারপর আধুনিক ইতিহাসের দুই একটি কথা বলা যাইতেছে। নাগ বংশের রাজা মধুসিংহ ১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবরের সেনাপতি সাহাবাজ খাঁ কর্তৃক পরাজিত হইয়া দিল্লির বশ্যতা স্বীকার করেন। অনন্তর ইং ১৭৬৫ সনে বিহারের সঙ্গে ছোটোনাগপুরও ইংরেজের করে সমর্পিত হয়। অতঃপর স্থানীয় রাজাদের মধ্যে জ্ঞাতি বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রামগড়

নামক স্থানে এক বড়ো নূতন জেলা স্থাপিত হইল। রামগড় বর্তমান হাজারিবাগ জেলার অন্তর্গত। রামগড়ে একজন ম্যাজিস্ট্রেট আসিলেন। এই নূতন বন্দোবস্তে পঙ্গাপালের মতো বহু দেশীয় কর্মচারী উজির নাজির বকশি আসিয়া কোলদের প্রতি নানারূপ অত্যাচার আরম্ভ করিল। ফলে ১৮৩১ সনে ভীষণ কোল বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। বিদ্রোহ বহ্নি নির্বাপিত হইলে ১৮৩৩ সনে "দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ" নামকরণে এস্থানে এক স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠিত হইল। তখন কলিকাতা কেন্দ্রে ধ্রুবতারা রাখিয়া দিক নির্দেশ করা হইত। এখন যাহার সংশোধিত নূতন নাম যুক্ত প্রদেশ (United Provinces) কয়েক বৎসর পূর্বে তাহারই নাম ছিল—উত্তর পশ্চিম প্রদেশ। কিন্তু এই ব্যয়সাধ্য ব্যবস্থাতেও আশানুরূপ সুশৃঙ্খলা হইল না। সুতরাং ১৮৫৪ সনে আবার নূতন করিয়া ছোটোনাগপুর কমিশনারি বিভাগ সৃষ্টি হইল। তারপর ১৮৫৭ সনের পালা। সেকথা পরে উল্লেখ করিতেছি।

ছোটোনাগপুরের অনার্যদিগকে আমরা সাধারণত ধাঙ্গড় বলিয়া থাকি। প্রকৃত নাম কোল। কোলদের তিন শ্রেণি বলা যাইতে পারে। প্রথম মুন্ডারি ; ইহারা রাঁচি ও হাজারিবাগে বাস করে। দ্বিতীয় ভূমিজ ; ইহারা মানভূম ও ধলভূমে এবং কতকটা হিন্দু ভাবাপন্ন। তৃতীয় লড়াই-কোল বা হো জাতি ; ইহারা সিংভূমের পার্বত্য প্রদেশে বাস করে। ইহা ছাড়া ওড়াওঁ বলিয়া আর এক জাতি আছে। সিংহভূম জেলা ছোটোনাগপুরের দক্ষিণ পূর্ব অংশে অবস্থিত। ইহার প্রায় চারিদিকেই পাহাড়, এজন্য এ জেলার কোলগণ (হো-জাতি) অন্য স্থানের কোলদের অপেক্ষা অসভ্য উগ্র এবং কতকটা 'যুদ্ধং দেহি' ভাবাপন্ন। সিংহভূমের হো-দের কথা কিছু বলিব মনে করিয়াই এতখানি উপক্রমণিকা করিলাম।

সিংহভূম জেলার সদর শহর চাঁইবাসা। স্থান অতি স্বাস্থ্যকর। এখনও তথায় ডাক্তাব কবিরাজের আমদানি হয় নাই ; কেবল সরকারি ডাক্তার আছেন। আর দুই ডাক্তার আছেন জল এবং বায়ু। বি-এন রেলওয়ের ঘাটশিলা ও চক্রধরপুর স্টেশন সিংহভূমের অন্তর্গত। চক্রধরপুর হইতে দক্ষিণে চাঁইবাসা ১৮ মাইল। চক্রধরপুর হইতে তোমার আমার জন্য গো-যান কিংবা "পুশপুশ" যানের ব্যবস্থা। এখন ঘোড়ার গাড়িও হইয়াছে। পাঠকগণের মধ্যে বোধ হয় কেহ কেহ 'পুশপুশ' কথাটি কী বুঝিলেন না। ইহা পুষ্পক রথ নয়। একখানি বড়ো পালকি, দুই ধারে দুই চাকা, অগ্রপশ্চাতে থাকিয়া কতগুলি মানুষ টানিয়া ও ঠেলিয়া লইয়া যায়। রাত্রে বেশ সটান লম্বা শুইয়া আরামে যাওয়া যায়। সাঁওতাল পরগনা, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানেও গাড়িতে ঘোড়ার বদলে মানুষ দেওয়া চলে ; চাবুকের আবশ্যক হয় না।

চক্রধরপুরের নিকটবর্তী একস্থানের নাম পোড়াহাট। পোড়াহাটের রাজার পূর্বপুরুষগণ প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন। শ্রীকেল্লা বা শেরাই কেল্লা ও খরশোয়াঁ নামক ক্ষুদ্র করদ রাজ্যদ্বয়ও ইঁহাদের শাসনভুক্ত ছিল। পোড়াহাটের নৃপতিগণ ক্ষত্রিয় বর্ণ ও সিংহ উপাধিধারী। ইহাদের সিংহ উপাধি হইতেই দেশের নাম সিংহভূম। এরূপ জনশ্রুতি—পূর্বের রাজাগণ সততই রুক্মিণী হরণের ন্যায় বিবাহ ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতেন, এজন্য নাগপুর, গাঙ্গপুর হইতে বহুসহস্র কোল সৈন্য আসিয়া যোদ্ধৃবেশে সুসজ্জিত থাকিত। ইহারাই বর্তমান হো।

১৮৫৭ সনে দেশব্যাপী মিউটিনির সময় ছোটোনাগপুর রামগড়ের সিপাহিরা বিদ্রোহ

হয়। তাহাদের এক দল চাঁইবাসায় ছিল ; তাহারাও ক্ষেপিয়া উঠে এবং সরকারি খাজনা খানা লুটপাট করিয়া রাঁচি যাত্রা করে। পোড়াহাটের রাজা অর্জুন সিংহ হোদের সাহায্যে তাহাদের সদলে গ্রেফতার করিয়া ইংরেজের হস্তে অর্পণ করেন। কিন্তু কিছুকাল পরে তাঁহার বুদ্ধিভ্রংশ হইল ; তিনি নিজেই বিদ্রোহী হইলেন, বহু সহস্র হো তিরধনু লইয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিল। পার্বত্য প্রদেশে সম্মুখ সমর হয় না, এজন্য বিদ্রোহানল কিছুকাল প্রজ্বলিত রহিল। ১৮৬৫ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে রাজা ধৃত হইয়া কাশীতে নির্বাসিত হইলেন। তখন উন্মত্ত হোগণ প্রশান্ত ভাব ধারণ করিল। ১৮৯০ সনে অর্জুন সিংহের কাশীপ্রাপ্তি হয়। তাঁহার পুত্রের নাম রাজা নরপৎসিংহ ; ইনি পোড়াহাটেই আছেন। আয় সামান্য। কিন্তু তাঁহাকে রাজস্ব দিতে হয় না। সম্প্রতি পথকর ধার্য হইয়াছে। ইঁহার অধীনে কেড়া ও আনন্দপুরের ঠাকুর এবং বাঁধগাও ও চৈনপুরের তালুকদারগণ। সিংহভূমে আর একটি উল্লেখযোগ্য স্থলের নাম ধলভূম। ইহা পূর্বে মানভূমের অন্তর্গত ছিল। এ স্থলে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত। স্থানের ভূম্যধিকারী ঘাটশিলার জমিদার। প্রজাদের বার্ষিক খাজনা এতটি বোদা (পাঁঠা), এত সের ঘৃত, এত মণ কাষ্ঠ ইত্যাদি। ডেপুটি বাবুরাই বাকি খাজনার মোকদ্দমা করেন। এখন ক্রমেই টাকা আনায় খাজনার পরিমাণ নির্ণীত হইতেছে।

হো-গণ এখন গভর্নমেন্টের খাস মহালের প্রজা। খাস মহালের নাম কোল্‌হান। সমগ্র কোলভূমি অনেকগুলি পীর বা উপবিভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক পীরের সামাজিক কর্তার নাম মানকি। অনেকগুলি গ্রাম লইয়া এক একটি পীর। প্রত্যেক গ্রামের মোড়লের নাম মুন্ডা। মুন্ডা ও মানকিগণ খাজনা আদায় করিয়া সরকারি খাজনা দেয়। ইহারা পুলিশের কার্যও করে। সুতরাং ইহারা অনেকটা স্বায়ত্ব শাসন উপভোগ করিতেছে। বাহিরের লোক ইহাদের কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। হো ভাষায় হো বা হোরো শব্দের অর্থ মানুষ। আর সকল হিন্দু মুসলমান বিদেশি লোক "দিকু" সংজ্ঞায় অভিহিত। কোল্‌হানে "দিকু"দের একরূপ প্রবেশ নিষেধ ; অর্থাৎ তাহারা জমিতে কোনোরূপ স্বত্ব উপার্জন করিতে পারিবে না।

হোদের মধ্যে পৃথিবী সৃষ্টির বিষয়ে এক গল্প আছে। সিংবোঙা বা সূর্যদেব ইহাদের সর্বপ্রধান উপাস্য-দেবতা। তিনিই আকাশ, মৃত্তিকা, পর্বত ও জল সৃষ্টি করিয়াছেন। বৃক্ষ এবং পশুপক্ষী তাঁহারই সৃষ্ট। অবশেষে তিনি একটি বালক ও একটি বালিকা সৃষ্টি করিয়া এক পর্বত গহ্বরে স্থাপন করেন। উহারা বড়ো হইল, কিন্তু উহাদের 'বুদ্ধি শুদ্ধি' হইল না। অথবা উহাদের যে বুদ্ধি ছিল, তাহার ভিতর শুদ্ধি ছিল ; এজন্য উহারা মিথুন ধর্ম আচরণ করিল না। তখন ভগবান সিংবোঙা উহাদের প্রবৃত্তি জাগরিত করিবার জন্য ইলি (পাচুই মদ) প্রস্তুত করিলেন। বৃদ্ধ হোগণ অল্প বয়স্ক নাতি নাতনিদের কাছে অশ্লীলভাবে সবিস্তার বর্ণনা করিয়া এই গল্পের উপসংহার করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য ইহারা পাচুই মদের পরম ভক্ত।

আদি মাতাপিতা যখন ১২টি পুত্র ও ১২টি কন্যা উৎপাদন করিলেন, তখন সিংবোঙ্গা ঠাকুর তাহাদের জন্য এক বিরাট ভোজের আয়োজন করিলেন। নূতন মানব মানবীগণ যুগল রূপে বসিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইল। যাহার যেরূপ ডিস পছন্দ হয়, খাও ; আয়োজনের

ত্রুটি নাই। প্রথম ও দ্বিতীয় যুগল—মাংস ও মহিষ মাংস ভক্ষণ করে। ইহাদের হইতে সর্বশ্রেষ্ঠ কোল জাতি (হো ও মাটকুম) উৎপন্ন হইল। ভূমিজদিগকে হোগণ 'মাটকুম' বলে। তৃতীয় নরনারী নিরামিষ ভোজন করিল, তাহারাই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতির জনক জননী। চতুর্থ যুগল—ছাগমাংস ও মৎস্য আহার করিল ; তাহারা হিন্দুদের শূদ্রজাতির মাতাপিতা। যাহারা শূকর মাংস ভক্ষণ করিল তাহারা সাঁওতাল ইত্যাদি। সর্বশেষ দম্পতির ভোজনে আসিতে বিলম্ব হইয়াছিল ; তাহারা আর কিছু না পাইয়া প্রথম ও দ্বিতীয় যুগলের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া উদর তৃপ্ত করিল। তাহাদের হইতে ঘাসি জাতির সৃষ্টি হইল। এদেশে ঘাসিরা নিকৃষ্ট জাতি, মেথরের কার্য করে, পরিশ্রমে পরাঙ্মুখ ও পরমুখপ্রত্যাশী। সিংহভূমে কুক্কুটের অভাব নাই, সকলেরই আহার্য। হৃষ্টপুষ্ট বন্য কুক্কুটগুলি বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে উড়িয়া বেড়ায়। 'ফাউল' কারি কাহার ভাগ্যে জুটিয়াছিল, গল্পে তাহার উল্লেখ নাই।

সিংবোঙ্গা (সূর্যদেব) চন্দ্রকে বিবাহ করিয়াছেন। চন্দ্র কলঙ্কিণী বা ব্যাভিচারিণী। এজন্য সূর্য তাহাকে টাঙ্গি দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করিয়া কাটিয়া ফেলেন। তাহাকেই তোমরা আমরা চন্দ্রগ্রহণ বলি। নক্ষত্রগুলি তাহাদের কন্যা। সিংবোঙ্গার পর বুড়ো বোঙ্গা প্রধান দেবতা। ইনি পাহাড়ের কর্তা। পাহাড় হইতে জল আইসে, জল বিনা কৃষিকার্য হয় না সুতরাং বুড়োর তৃপ্তার্থে পাহাড়ের উপর ছাগ মহিষ ও মোরগ বলি দিতে হয়। প্রত্যেক গ্রামে বৃক্ষাদি জঙ্গাল পূর্ণ একটি স্থান নির্দিষ্ট আছে। যেখানে গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিরাজ করেন। এক গ্রামের দেবতার অন্য গ্রামে কর্তৃত্ব নাই। ইনি গ্রামের শস্য ও মঙ্গালামঙ্গালের জন্য দায়ী। ইঁহাকে তুষ্ট রাখিতে হয়। নদী পুষ্করিণী ও কূপের পৃথক পৃথক দেবতা আছে। ইহারা অসন্তুষ্ট হইলে গ্রামে পীড়ার আবির্ভাব হয়। সুতরাং শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি করা চাই। কিন্তু কোন্ দেবতা কুপিত হইয়াছেন, কাহাকে পূজা দিতে হইবে, তাহা ঠিক করা আবশ্যক। এজন্য গ্রামের বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাগণ একত্র হইয়া একটি জলপূর্ণ পাত্রে বিন্দু বিন্দু তৈল নিক্ষেপ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে সন্দিগ্ধ দেবতাদের নাম উচ্চারণ করিতে থাকে। যাহার নামের তৈল বিন্দু ছড়াইয়া না যাইয়া বিন্দুবৎ ভাসিতে থাকে তাহার নামেই পূজা দিতে হইবে। যদি কাহারও পুত্র কন্যার ব্যারাম কিছুতেই না সারে, কিংবা অপ্রত্যক্ষ কারণে গোরু বাছুর মরিয়া যায়, তাহা হইলে প্রতিবেশী শত্রুদের মধ্যে কাহাকেও ডাইন (নাজম) স্থির করিয়া তাহার প্রাণ সংহার করা হয়। এরূপ ঘটনা বিরল নহে। হত্যাই হউক কিংবা চুরিই হউক, অপরাধ করিয়া থাকিলে ইহারা প্রায়ই সত্য গোপনের কৌশল ভুলিয়া যায়। সুতরাং সত্য নির্ণয়ের জন্য হাকিমেরা উকিলের সাহায্য যাচ্ঞা করেন না।

উপরি-উক্ত দেবতা ছাড়া পিতৃপুরুষের প্রেতাত্মাদেরও অর্চনা করিতে হয়। কারণ আহার্য না পাইলে তাহারা এখানে সেখানে ঘুরিয়া ফিরিয়া বড়ো উৎপাত আরম্ভ করে। প্রেতাত্মার নাম---হাম হো!

হোদের মধ্যে অনেকগুলি কিলি বা গোত্র আছে। সগোত্রে বিবাহ হয় না। কিলির নামগুলি জন্তুর নামানুযায়ী। যাহার যে কিলি, তাহার সেই নামীয় জন্তুর মাংস খাওয়া নিষেধ। ইহাতে বিশেষ অসুবিধা নাই। কারণ কিলিগুলি প্রায়ই সর্প, ব্যাঙ ইত্যাদির নাম। আমাদের মধ্যে যাঁহারা গয়াধামে গিয়া ফল উৎসর্গ করেন, তাঁহাদের নাকি কেহ কেহ

জাম্বুরা, আমড়া প্রভতি সুফল উসর্গ করিয়া আইসেন ; এই কড়ারে—জীবনে আর এই সুরসালগুলি খাইতে পারিবেন না।

পুরুষেরা এখনও বেশি কাপড়-চোপড় পরা ভালবাসে না। দূরবর্তী গ্রাম হইতে চাঁইবাসা সদরে আসিতে হইলে একটু গা ঢাকা গোছের বস্ত্রখণ্ড লইয়া সভ্যভব্য হইয়া আসিতে হয়। স্ত্রীলোকেরা বস্ত্র পরিধান সম্বন্ধে পূর্বাপেক্ষা শীলতা রক্ষা করিতেছে। হো রমণীদের কবরী বন্ধনের বিশেষত্ব আছে। চুলের খোঁপা কৃত্রিমতা সহকারে বড়ো করিয়া লইয়া মাথার পেছনে কিঞ্চিৎ দক্ষিণ কর্ণের দিকে (পেছনের ঠিক মাঝখানে নহে) টানিয়া বন্ধন করে এবং চুল গুঁজিয়া দেয়। কাঁসার বালা ও মল পরার এক বাতিক উঠিয়াছে। এগুলি খুব ভারী ও ছোটো ; একবার পরিলে আর জীবনে খুলিতে পারা যায় না। বাজারে বালিকারা ও যুবতিগণ কাঁসারিদের হস্তে অসহ্য লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া গহনা পরিধান করে। বহুকষ্টে ও যাতনায় পরিধান কার্য হইয়া গেলে অশ্রুসিক্ত বদনে সহসা হাসি বিকশিত হয়। তখন দেখিতে কী সুন্দর! স্ত্রীলোকের অলংকার প্রিয়তা সর্বত্র সমান।

হো রমণীগণের গোদনা বা উলকি পরিতেও উৎকট বাসনা। হে বঙ্গের নবীন পাঠকগণ, উলকি কী তাহা যদি তোমরা না জানো, তবে অবিলম্বে কাশী বা বৃন্দাবনে গমন করো। তোমাদের পিতামহী কি প্রপিতামহী যাঁহারা সেখানে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছেন, তাঁহাদের বদনমণ্ডল পরীক্ষা কর। কৃষ্ণবর্ণ হইলে সম্ভবত magnifying glass আবশ্যক হইবে। ললাট, নাসিকা প্রান্ত, বা চিবুকে নীলরেখার চিত্র দেখিতে পাইবে। উহারই নাম উলকি। সাহেবদের শ্বেতচর্মে নানা রঙের লতাপাতা, পশুপক্ষী ও "সুইট হার্টের" ছবি দেখিতে বড় সুন্দর। কিন্তু তাহা শার্ট কোটে আবৃত, আস্তিন না গুটাইলে দেখিবার সুবিধা নাই।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে মাতা পিতার ৮ দিন অশৌচ হয়। এই ৮ দিন বাড়ির অন্যান্য লোকদের অন্যত্র যাইয়া থাকিতে হয়। স্বামী স্ত্রীর জন্য রাঁধা-বাড়া করিবে। আট দিন পর বাড়ির আর সকলে ফিরিয়া আসিবে। তখন ভোজ হইয়া শিশুর নামকরণ হয়।

জ্যেষ্ঠ পুত্রকে প্রায়ই পিতামহের নাম দেওয়া বিধি? তবে একাধিক নাম বাছাই করিয়া রাখিতে হয়। নাম উচ্চারণ করিয়া জলপূর্ণ পাত্রে মটর বা কলাই ফেলিবে। যদি একটু ভাসে, ভালো। আর যদি ডুবিয়া যায়, তবে আর একটি নাম লইয়া ওইরূপ পরীক্ষা করিবে। আমাদেরও অন্নপ্রাশনের সময় ঘৃতের প্রদীপ জ্বালিয়া দুইটি নির্বাচিত নামের কোন্‌টি বহাল থাকিবে তাহার পরীক্ষা হয়। হো-দের নামকরণ সম্বন্ধে একটি বিশেষ কথা বলা যাইতেছে। খ্রিস্টান মিশনারিদের এ অঞ্চল বিশেষ কার্যক্ষেত্র। অনুগ্রহ করিয়া ইঁহারা আছেন বলিয়াই রক্ষা। নতুবা হোগণ ক্রমেই নিম্নশ্রেণির হিন্দু হইয়া যাইত। দীক্ষার সময় মিশনারিগণ খ্রিস্টান পদবিটি নামের সঙ্গে চিরকালের জন্য গাঁথিয়া দেন। যথা হরিদাস খ্রিস্টান। যেন আর কালে কস্মিনে সে কিংবা তাহার পুত্র পৌত্র স্বাজাতির দলে ভর্তি না হইতে পারে। কিন্তু হো-দের মধ্যে যাহারা খ্রিস্টান নয় তাহারাও সখ করিয়া ইংরাজি নাম গ্রহণ করে। কাপ্তেন টিকেল, টুইভেল, লেজ, ডালটন ইত্যাদি। এগুলি লোকপ্রিয় ডেপুটি কমিশনার ও অন্যান্য রাজপুরুষদের নাম। হো-রা এইরূপ সরল ভাবেই তাহাদের নামের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে।

এই সমাজে বাল্যবিবাহ ও অবরোধ প্রথা নাই। অবিবাহিতা যুবতির সংখ্যা বেশি। তাহার কারণ পণপ্রথা। কন্যার পিতা অল্প পণে বিবাহ দিতে নারাজ। এই পণ গো-মহিষাদিরূপে গৃহীত হয়। পীরের মানকি বা গ্রামের মুন্ডা প্রত্যেক কন্যার জন্য ২০ হইতে ৪০টি গোধন চাহিয়া বসেন ; যত বড়ো ঘর, তত বেশি পণ। অনুমান হয়, এই পণ প্রথা, মুদ্রা প্রচলিত হইবার পূর্ব হইতে প্রবর্তিত হইয়াছে। প্রেমিক প্রেমিকার গান্ধর্ব বিবাহও হয়। প্রকৃতপক্ষে পণপ্রথার প্রাবল্যবশত অষ্টবিধ বিবাহই প্রচলিত।

হোজনপদ দেখিতে সুন্দর। চারিদিকে বড়ো বড়ো তেঁতুল, আম্র ও কাঁঠাল বৃক্ষে সুশোভিত। গৃহগুলি ক্ষুদ্র হইলেও অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মৃন্ময় প্রাচীরগুলি সমতল ও মসৃণ। মতো ব্যক্তির সমাধিস্থলে ইহারা পাহাড় জঙ্গল সুলভ বৃহৎ প্রস্তর স্তম্ভের ন্যায় প্রোথিত করে। যে যত বড়ো, তাহার সমাধির প্রস্তর তত উচ্চ। হো-গ্রামে প্রবেশ করিলে এই সমাধি প্রস্তরগুলি প্রথমে চোখে পড়ে।

আশ্চর্যের বিষয় ইহারা দুগ্ধপান করে না। মানুষ হইয়া গোরু মহিষের দুধ খাওয়া—অতি ঘৃণার বিষয়। হাঁ, যদি খেতে হয়, মাংস খাও, কিন্তু দুধ! ছি!

হো-গণ সভ্য জাতির ন্যায় নৃত্যপ্রিয়। আমাদের আনন্দ হইলে তবে নৃত্য করি। আগে আনন্দ, তারপর নৃত্য। হো এবং অন্যান্য জাতি নৃত্য করে আনন্দলাভের জন্য। আগে নৃত্য, তারপর আনন্দলাভ। ইহারা জোছনা রজনীতে স্ত্রীপুরুষে মিলিয়া পৃষ্ঠের দিকে হাতে হাতে পরস্পর আবদ্ধ থাকিয়া তালে তালে নাচিতে থাকে। কখনো-কখনো পুরুষেরা মাদল বাজায় এবং কেবল রমণীগণ—যুবতি বালিকা বৃদ্ধা একত্র সারিবদ্ধ হইয়া নৃত্য করে। কলিকাতা হইতে বায়োস্কোপ বা আর কিছু আমোদ আনয়ন করা সকল সময় হইয়া উঠে না। এজন্য কোনো রাজপুরুষের সম্মানের জন্য পার্টি দিতে হইলে কোলদের নৃত্য প্রায়ই হইয়া থাকে। চাঁইবাসা শহরের বার্ষিক মেলায় (ডিসেম্বরে) নৃত্য করিবার জন্য অসংখ্য হো স্ত্রী-পুরুষ দূর দূরান্ত হইতে আগমন করে।

ইহারা অতি সরল। অনেকে বাজারদর বুঝে না। চাঁইবাসার জেলের নিকট সাপ্তাহিক হাটবাজার বসে। সেখানে দেখিয়াছি পাশাপাশি বসিয়া হো-বিক্রেতাগণ একই দ্রব্যের ভিন্নরূপ দর চাহিতেছে। কেহ পয়সায় দুইটা দিবে, কেহ একটা, কেহ পাঁচটা। তোমার মন হয়, ক-এর কাছে লেও ; আর যদি মন না হয়, না লেও ; আমি (খ) সে দরে দিবেক না, কিছুতেই না। সেনোমে আলপে এড়িষা (Senome alpe erisa) অর্থাৎ যাও গোল করিও না।

পাঠক! হো-ভাষা শুনিতে চাহেন? নমুনা দিতেছি।

তোমার কি নাম? *আমা চিকণ নুমু?*

তোমার বাড়ি কোথায়? *ওকো হাতুরে সেনাপেয়া?*

তুমি কি কর? *চিকনম চেকাতনা?*

এখন তবে আসি। *অইংগ নাদো চালাকানা।*

সৌরভ ● বৈশাখ ১৩২২ (১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ)



সিংভূমের কোলজাতি

শ্রীগিরিবালা দেবী

বঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে ছোটোনাগপুর পার্বতীয় প্রদেশ, ইহার পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ সীমা নিবিড় অরণ্য ও অসংখ্য পর্বতরাজিতে পরিপূর্ণ, পূর্ব সীমা বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলার সংলগ্ন। সিংভূম ছোটোনাগপুর বিভাগের অন্তর্গত। তাহার প্রধান নগর চাঁইবাসা। তাহার চারিদিকেই প্রাকার-স্বরূপ উচ্চ শৈলমালা দৃষ্টিপথে পতিত হয়। বৃহৎ বৃহৎ শাল এবং অন্যান্য আরণ্য-বৃক্ষ দ্বারা পাহাড়সকল পরিপূর্ণ। পার্বতীয় প্রদেশে মনুষ্য গমনাগমনের পথ পূর্বে একপ্রকার ছিল না বলিলেই হয়। চতুর্দিকে পর্বতসমূহ উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান—তন্মধ্যে নানাবিধ হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ। ঘোর অরণ্য, এই ভয়সংকুল বিপদপূর্ণ স্থানে একাকী পথ চলা কাহারও সাধ্যায়ত্ত ছিল না। রাস্তা যে প্রকার অসমান ও দুর্গম ছিল, তাহাতে লোকের যাতায়াতে কষ্টের পরিসীমা ছিল না। আজকাল রেলওয়ে বিস্তারিত হওয়াতে মনুষ্যের গমনাগমনের পথ অনেক সুবিধাজনক হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও এমন অনেক অরণ্যময় স্থান আছে যেখানে সূর্যের রশ্মি কখনও প্রবিষ্ট হয় না এবং দিবাভাগেও বিদেশি লোকের পক্ষে পথ চলা দুঃসাধ্য।

এই সকল অরণ্যময় পর্বতসন্নিকটে কোল জাতি নির্ভীক চিত্তে মনের আনন্দে বাস করে। এই দুর্গম জঙ্গলই ইহাদের জন্মভূমি ও প্রিয় বাসস্থান। ইহারা অনেকে একত্রিত হইয়া একস্থানে বাস করে। সচরাচর নিম্ন শ্রেণির লোকেরা যে প্রকার খড় আচ্ছাদিত মাটির ঘরে বাস করে, ইহাদের গৃহাদি অবিকল সেই প্রকারের না হইলেও প্রায় তদনুরূপ। ইহারা সমভূমি হইতে কিঞ্চিৎ উচ্চ এবং চারিদিকে ঢালু স্থানে পল্লি নির্মাণ করে। চারিদিকে ভূমি ঢালু থাকায় তাহাদিগের বাটীর নিকটে বৃষ্টির জল ও কর্দমাদি বড়ো দেখা যায় না। সুতরাং বর্ষাকালে তাহাদিগের বহুশ্রমসাধ্য ক্ষুদ্রকুটির সমূহের কোনো ক্ষতি হয়

না। ইহাদের পল্লিগুলির স্বাভাবিক জলনির্গমনোপায় অতি সুন্দর, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ইহার প্রয়োজনীয়তা সম্যক অবগত না হইলেও ইহারা স্বভাবতই পয়ঃপ্রণালীর প্রতি লক্ষ রাখে। গৃহ নির্মাণ ইত্যাদি কার্যে অর্থের বিশেষ আবশ্যক হয় না। নিবিড় অরণ্যে বৃক্ষাদির অভাব নাই, তথা হইতে গৃহনির্মাণোপযোগী সামগ্রী আনয়ন করিয়া তাহারা গৃহ নির্মাণ করে।

ইহাদের বাসস্থানের নাম কোলহান। বোধ হয়, ইহা কোলস্থানের অপভ্রংশ। লোহারডাঙ্গা জেলাতেও কোল আছে—তাহাদিগকে মুন্ডা বা গৃহস্থ কোল বলে। মুন্ডা কোল বরাবরই চাষাবাদ করিয়া থাকে। সিংহভূমির কোলদিগকে লাড়কা বা যোদ্ধা কোল বলে। ইহারা চাষবাসের তত প্রিয় নহে ; তির ধনুক লইয়া জঙ্গালে জঙ্গালে শিকার করিয়া বেড়ায়। ইংরাজ শাসনাধীন হওয়া অবধি ইহারা চাষাবাদ যাহা করে, তাহাতে বৎসরের অর্ধেকের বেশি আহার সংস্থান হয় না—অবশিষ্ট কয়েকমাস জঙ্গালে জঙ্গালে বেড়াইয়া মৃগয়া ও ফলমূলাদির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। আমার প্রবন্ধের বিষয় এই লাড়কা কোল—সুতরাং ইহার পর যাহা কিছু বলা যাইবে তাহা এই লাড়কা কোলদিগের সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে।

বাসস্থানের নিম্নভূমিতেই ইহারা শস্যাদির চাষ করে। পূর্বে বলা হইয়াছে যে শস্য উৎপন্ন হয় তদ্দারা ৭।৮ মাস ইহাদের জীবিকা নির্বাহ হয়। অবশিষ্ট ৪।৫ মাস তাহারা জঙ্গল হইতে বন্য আলু ইত্যাদি খুঁড়িয়া আনে এবং তাহা পোড়াইয়া অথবা সিদ্ধ করিয়া আহার করে। ইহা ব্যতীত মহুল ফুলও সিদ্ধ করিয়া খায়। মহুল বৃক্ষ আমাদের দেশে দেখা যায় না। ইহার ফুলগুলি সাদা ও ডিম্বাকৃতি। আস্বাদ মধুর—কিঞ্চিৎ তিক্ত। ইহারা মহুল ফলের বীজ হইতে তৈল প্রস্তুত করিয়া প্রদীপে ব্যবহার করে। এই সকল পর্বতে আলু এবং অন্যান্য বন্য ফলমূল পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয়, সুতরাং ইহাদিগকে দুর্ভিক্ষের কষ্টভোগ করিতে বড়ো একটা দেখা যায় না।

এখন দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন কোনো স্ত্রীপুরুষ জঙ্গাল হইতে কাষ্ঠ আহরণ করিয়া নিকটবর্তী শহরে বিক্রয় করে—ইহা ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্যাদিও আনিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। গভর্নমেন্ট সিংভূমের অরণ্য সকল রক্ষা করিবার বিধি করিয়াছেন। ইহাতে ইহাদিগের বিশেষ অসুবিধা হইয়াছে। বিক্রয়ার্থ জঙ্গাল হইতে কাঠ আনিতে হইলে মাশুল দিয়া অনুমতি পত্র লইয়া কাঠ কাটিতে হয়। সুতরাং ইহাদের লাভের অংশ অনেক কমিয়া গিয়াছে। তবে গভর্নমেন্টের অনুগ্রহে নিজ ব্যবহারের জন্য ইহারা কাঠ, খড় ও বাঁশ কোনো কোনো রক্ষিত জঙ্গাল হইতে আনিতে পারে।

স্ত্রীপুরুষ উভয়েই কৃষিকার্যে পরিশ্রম করে। পরিশ্রমের ভাগ বরং স্ত্রীলোকের উপরই বেশি। পুরুষেরা স্বভাবত অলস, আলস্যবশত পুরুষদিগের শরীর স্ত্রীলোকদের শরীর ন্যায় সবল নহে। স্ত্রীলোকেরা নিতান্ত শিশুসন্তানগুলিকেও ক্ষেত্রে লইয়া যায় ; এবং তাহাদিগকে একটি ক্ষুদ্র খাটিয়ায় শয়ন করাইয়া কার্যে নিযুক্ত হয়।

ইহাদের বিশ্বাস, যে ভূমিতে শয়ন করিলে অসুস্থ হইতে হয়, এজন্য ইহারা দড়ির খাটিয়া প্রস্তুত করিয়া তাহাতে শয়ন করে। কী ধনী, কী নির্ধন, সকলেরই এক একখানি খাটিয়া আছে।

ইহারা গো-মহিষাদির অতিশয় যত্ন করে। বড়ো বড়ো কাঠ দ্বারা গোয়াল ঘরের বেড়া নির্মাণ করে এবং প্রত্যেক দুইটি কাঠের মধ্যে ৪।৫ আঙুল পরিমাণে ফাঁক রাখে। মধ্যে মধ্যে ফাঁক থাকাতে, ঘরের মধ্যে বায়ু বেশ যাতায়াত করে এবং গোরুগুলিও বেশ সুস্থকায় থাকে। শক্ত বেড়া থাকাতে রাত্রিকালে হিংস্রজন্তু পালিত পশুগুলির কোনো অনিষ্ট করিতে পারে না। একবার আমরা চাঁইবাসা হইতে ৩২ মাইল দূরে একটি নির্জন পর্বত সন্নিকটে কয়েক দিন বাস করিয়াছিলাম—তথায় কোনো ক্ষুদ্র পর্বতোপরি কয়েক ঘর কোল বাস করিত। আমরা একদিন বেড়াইতে বেড়াইতে তাহাদের গৃহাদি দেখিবার অভিপ্রায়ে তথায় উপস্থিত হইলাম। তাহাদের ভাষায় আমাদিগকে কথাবার্তা কহিতে শুনিয়া তাহারা অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে আদর অভ্যর্থনা করিতে ও নানাপ্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিল। একজন কোলকে স্ত্রীপুত্র লইয়া ক্ষুদ্র পর্বতোপরি বাস করিতে দেখিলাম—সে বড়োই দরিদ্র, একটি গোরু মাত্র তাহার সম্বল। সেই গোরুটির নিকট একখণ্ড জ্বলন্ত কাষ্ঠ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, প্রত্যহ একটি ভল্লুক এই গোরুটিকে নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে তাহাদের কুটিরের সন্নিকটে আইসে, কিন্তু এই প্রজ্বলিত অগ্নি থাকায় গোয়ালগৃহের নিকট আসিতে পারে না। সকল কোলেরাই হিংস্র জন্তুর গ্রাস হইতে গো-ছাগলাদি রক্ষা করিবার এই উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। শৈশবাবস্থা হইতে এই প্রকার হিংস্র জন্তু পরিবেষ্টিত স্থানে পরিবর্ধিত হওয়ায় ইহারা হিংস্র জন্তুকে তত ভয় করে না।

পূর্বে ইহারা একরূপ অসভ্য সাধারণতন্ত্রের বশীভূত ছিল। তৎপরে ইহাদের প্রথম রাজার অধীনতা স্বীকার করিবার একটি প্রবাদ আছে ; ঘটনাক্রমে একটি বড়ো অশ্ব ইহাদের কোলহানে উপস্থিত হয়, এবং তৎসময়ের প্রধান প্রধান লোক ওই অশ্বে আরোহণ করিবার জন্য চেষ্টা করে—কিন্তু কেহই কৃতকার্য হইতে পারে নাই। তৎপর তাহারা স্থির করে, যে সেই অশ্বে আরোহণ করিয়া তাহাকে চালাইতে পারিবে সে তাহাদের রাজা হইবে। দৈবঘটনাক্রমে কোনো ক্ষত্রিয় এই অরণ্যপূর্ণ কোলহান দিয়া পুরীর জগন্নাথদেব দর্শনমানসে যাইতেছিলেন—ইহারা তাঁহাকে অনুরোধ করায়, তিনি এই অশ্বে আরোহণ করিলেন। ক্ষত্রিয়ের নিকট অশ্বারোহণ বাল্যক্রীড়া স্বরূপ, সুতরাং ইনি কোলদের রাজা হইলেন—ইনিই পোড়াহাটের রাজা।

কিন্তু তাহারা রাজাকে নামমাত্র রাজা বলিয়া মানিত, জমি কিংবা বাসভূমির জন্য রাজাকে বিশেষ কোনো কর দিত না—তবে পার্শ্বস্থ রাজাদিগের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ বাধিলে অকাতরে যুদ্ধে যোগ দিত। যুদ্ধে ইহাদের বিশেষ আনন্দ বলিয়া পোড়াহাটের রাজার সৈন্যদলভুক্ত হইতে ইহারা কোনো আপত্তি করিত না। সিপাহি বিদ্রোহের সময় পোড়াহাটের রাজা ইহাদের সাহায্যে কতকগুলি বিদ্রোহি সিপাহি ধরিয়া রাঁচির কমিশনর সাহেবের নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু হান্টার সাহেব বলেন, পোড়াহাটের রাজা পরে স্বয়ং ইহাদিগকে লইয়া বিদ্রোহী হন। ইহার কারণ কী বলা যায় না। ইংরেজরাজ ইহাদিগকে দমন করিবার জন্য কয়েক দল পল্টন পাঠান। সভ্যজাতির নিকট অসভ্যদিগের অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়া থাকে, ইহাদেরও তাহাই হইল। তিরধনুক এনফিল্ড বন্দুকের নিকট পরাস্ত হইল—কোল ইংরাজ-বশীভূত হইল এবং পোড়াহাটের রাজা বন্দি হইয়া কাশীতে

প্রেরিত হইলেন। অনেকের বিশ্বাস রাজা ইচ্ছাপূর্বক বিদ্রোহী হন নাই। বিপাকে পড়িয়া তাঁহাকে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল।

শুনিতে পাই, কয়েক বৎসর হইল পোড়াহাটের রাজার কাশীতে মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার পুত্রদিগকে গভর্নমেন্ট হইতে মাসোহারা বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং পোড়াহাট বাঙ্গালা গভর্নমেন্টের রাজ্যের এক অংশ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ইংরাজ-বশীভূত হইয়া লাড়কা কোলের যুদ্ধবৃত্তি ঘুচিয়া গিয়াছে। বর্তমান অন্যান্য জাতি হইতে ইহারা এখনও কম কর দেয় কিন্তু ক্রমে ক্রমে ইহারাও ইংরাজের অন্য অন্য প্রজার ন্যায় হইয়া উঠিতেছে। এখন বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোলহানকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছে—আর পঞ্চাশ বৎসর পর ইহারা অন্য অন্য প্রজা হইতে যে স্বতন্ত্র অবস্থায় থাকিবে, এরূপ বোধ হয় না।

ইহারা স্বভাবত নম্র। সামান্য বিষয় লইয়া কলহ করিবার প্রয়াস পায় না—এবং সহসা রাগান্বিত হয় না, তবে বিদেশীয় লোকের সঙ্গে মিশিতে ততটা ভালবাসে না। স্বজাতীয় আত্মীয়ের সহিত আমোদ-আহ্লাদে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করে। ইহাদের পূর্বের সাহস ও বলবীর্য অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে। বন্য হিংস্রজন্তু দেখিলে ইহারা ভীত হয় না সত্য, কিন্তু বিদেশীয় লোক বিশেষত সাহেব দেখিলে দূরে পলায়ন করে। স্বভাবের সন্তান, সভ্যতা হইতে দূরে থাকাই যেন ইহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ; কিন্তু যদি কেহ ইহাদের স্ত্রীজাতির উপর কোনোরূপ উৎপীড়ন করিতে উদ্যত হয়, তাহা হইলে ইহারা ক্রোধান্ধ হইয়া অত্যাচারীকে ভালোরূপ প্রতিশোধ দিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হয়।

ইহারা তির ধনুক ব্যবহার করে, এবং ইহাতে ইহাদের বিশেষ নৈপুণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ধনুর্বাণ দ্বারা ইহারা পক্ষী ইত্যাদিও শিকার করে, বাটীর বাহির হইতে হইলেই ইহারা তির ও ধনুক লইয়া বাহির হয়। ইহারা শরসন্ধানে এত পটু যে ইহাদের লক্ষ প্রায় ভ্রষ্ট হয় না। সাহেবদের বড়োদিন উপলক্ষে চাঁইবাসায় প্রতি বৎসর একটি মেলার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তথায় একদিন নানারূপ ক্রীড়া ও তামাশা প্রদর্শিত হয়। ধনুর্বিদ্যায় কোলেরাই জয়ী হইয়া পুরস্কার প্রাপ্ত হয়।

ইহাদের গঠন সুন্দর ও শরীর বলিষ্ঠ। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরা অধিক পরিশ্রম করে বলিয়াই তাহাদের শরীর অধিকতর দৃঢ় ও সবল। স্ত্রীলোকেরা বড়ো বড়ো ভারি বোঝা অনায়াসে মস্তকে বহন করিয়া আনে—এই প্রকার বোঝা মস্তকে করিয়া সঙ্গিনীদের সহিত কথাবার্তা কহিতে কহিতে হাসি হাসি মুখে ৪।৫ ক্রোশ অতিক্রম করিয়া আইসে।

ইহাদের কেহ কেহ কৃষ্ণবর্ণ। কিন্তু বর্ণ কৃষ্ণ হইলেও ইহাদের মুখে বেশ একটু লাবণ্য আছে। কাহারও কাহারও আবার কুঞ্চিত কেশ, উজ্জ্বল চক্ষু, বলিষ্ঠ দেহ। দেখিতে বেশ সুশ্রী বোধ হয়। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ দেখিতে বাঙ্গালীর ন্যায় এবং সুন্দর গৌরবর্ণ। কথিত আছে, ছোটোনাগপুরের উন্নত ভূমি হইতে যখন ইহারা সিংভূমে আইসে, তখন সিংভূমে অনেক জৈনের বাস ছিল। এখনও এখানে অনেক মথুরাবাসী গোয়ালা এবং অন্য অন্য কয়েক প্রকার হিন্দু জাতি দেখা যায়, তাহাদের গঠন ও মুখশ্রী বেশ সুন্দর এবং তাহাদিগকে দেখিলে আর্যবংশোদ্ভূত বলিয়া বোধ হয়। অনেকের বিশ্বাস যে, এই মথুরাবাসী

গোয়ালা এবং অন্যান্য জাতিরা পূর্বে জৈন ছিল এবং ইহাও অনেকের বিশ্বাস যে, অধিকাংশ জৈন কোলকর্তৃক পরাভূত হইয়া তাহাদিগের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে এবং তজ্জন্যই বর্তমান কোলদিগের মধ্যে সুশ্রী পুরুষ ও রমণী দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহারা অত্যন্ত আমোদপ্রিয় ও সর্বদা হাস্যমুখ। স্ত্রীলোকেরা ফুল বড়ো ভালবাসে, ফুল দেখিলেই আনন্দ প্রকাশ করে এবং ইচ্ছামত ফুল লইয়া মাথায় পরে। কোল রমণীরা কখনও বেণী বন্ধন করে না—কেহ কেহ অলংকার পরিয়া থাকে—মস্তকের অলংকার ভিন্ন হস্ত পদের অলংকার সকলই কাঁসা নির্মিত এবং ওজনে প্রায় ২।৩ সের। মস্তকে রূপার গহনা পরিয়া থাকে। এই প্রকার ভারী অলংকার—বিশেষ পায়ের অলংকার পরিবার সময় কোল রমণীগণ অতিশয় কষ্ট সহ্য করিয়া থাকে।

ইহাদের বুদ্ধি বেশ তীক্ষ্ণ। নিজ ভাষা ভিন্ন ইহারা অন্য কোনো ভাষাই জানিত না—তবে সম্প্রতি বাঙ্গালীর সংশ্রবে থাকিয়া কেহ কেহ বাঙ্গালা ভাষা শিখিতেছে। বাঙ্গালা ভাষা তাহারা বড়োই পছন্দ করে, দুই একটি কথা শিখিলেই মুখে আর হাসি ধরে না। ইহাদের শিক্ষার জন্য গভর্নমেন্ট কোলহানের অনেক স্থানে স্কুল ও পাঠশালা স্থাপিত করিয়াছেন। চাঁইবাসা জেলা স্কুল হইতে কয়েকটি কোল বালক এন্ট্রান্স পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়াছে।

ইহাদের ভাষা অতি সুললিত। বোঝা না গেলেও যখন ইহারা পরস্পর কথোপকথন করে, শুনিতে মিষ্ট বোধ হয়। ইহাদের ভাষায় অনুনাসিক বর্ণ সমূহের আধিক্য প্রযুক্ত এবং বঙ্গীয় বর্ণমালায় পঞ্চম বর্ণেব দ্বিতীয় বর্ণগুলি (অর্থাৎ খ, ছ, ঠ, থ, ফ) এবং শ ষ এর অভাব বোধ হয় ইহাদের ভাষার সুমিষ্টতার কারণ। ইহাদের ভাষার শব্দসংখ্যা অতি অল্প, বোধ হয় পাঁচ ছয় শতের অধিক নয়। অন্যান্য জাতির সঙ্গে মিশিবার পূর্বে ইহাদের শব্দসংখ্যা আরও কম ছিল। তৎপরে আবশ্যক মতো অন্য অন্য ভাষা হইতে ইহারা কতকগুলি শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন। জৈনদিগের সহিত মিশ্রিত হওয়ায় কতকগুলি সংস্কৃত কথাও ইহাদের ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—দারু (বৃক্ষ) তুলা (ওজন করা) কর্‌তল (করতালি) তাম্বা (তাম্র) সুতাম (সুতা) সুকু (সুখ) ইত্যাদি। উৎকলবাসী কতকগুলি লোকের বহুকাল হইতে সিংভূমে অধিবাস আছে, তজ্জন্য উৎকল ভাষার সহিত কোল ভাষা কিয়ৎ পরিমাণে মিশ্রিত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের ভাষায় কোনো অক্ষর নাই, মুখে মুখেই ইহাদের পূর্ব ইতিহাস প্রচলিত রহিয়াছে। আজকাল দেবনাগর অক্ষরে ইহাদের ভাষা লিখিত হইতেছে এবং কয়েকখানি পুস্তকও প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহাদের ধর্মপ্রণালী স্বতন্ত্র প্রকার। সূর্য ইহাদের প্রধান দেবতা এবং বিশেষ পূজনীয়। সূর্যকে ইহারা "শিং বোঙ্গা" বা "শিম্ বোঙ্গা" বলে। শিম্ ইহাদের ভাষায় কুক্কুট বুঝায় এবং বোঙ্গা অর্থাৎ ভূত বা দেবতা। কুক্কুট (শিম্) যারা ইহারা সচরাচর সূর্যের পূজা করে বলিয়া সূর্যকে "শিম্ বোঙ্গা" অর্থাৎ কুক্কুটগ্রাহী দেবতা বলে। পূজায় অধিক মন্ত্র নাই। তবে ইহাদের দেবতার উপর কতটা নির্ভরতা, তাহা ইহাদের মন্ত্র দ্বারা বেশ বুঝা যায়। মন্ত্রের অর্থ এই "আমরা বিপদে পড়িয়াছি, আমাদের পীড়া হইয়াছে, তোমায় এই কুক্কুট উৎসর্গ করিয়া বলি দিতেছি, তুমি ইহা গ্রহণ কর এবং আমাদিগকে এই ক্লেশ হইতে মুক্ত

কর। তুমি আমাদের বিপদ হইতে উদ্ধার না করিলে আমাদিগকে কে উদ্ধার করিবে—আমাদের আর কে আছে। অতএব আমাদের এই বলিতে সুপ্রসন্ন হও এবং বিপদ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর।" ইহারা মধ্যে মধ্যে সূর্যের নিকট মহিষও বলি দিয়া থাকে। উহাদের পুরোহিত বলিদানান্তে মহিষের মস্তক ও কয়েক খণ্ড মাংস লইয়া সূর্যের দিকে মুখ করিয়া উপরোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করে।

আজকাল কোলদিগের মধ্যে অনেকে খ্রিস্ট ধর্ম অবলম্বন করিতেছে—প্রকৃত বিশ্বাসের জন্য তাহারা যে খ্রিস্টান হইতেছে, ইহা ঠিক বলা যায় না। চাঁইবাসায় শুনিয়াছিলাম যে লোহারডাঙ্গা জেলায় একদিনে বহুসংখ্যক কোল খ্রিস্টান হইয়াছিল। শুনা যায়, খ্রিস্টান পাদরিগণ উপরোক্ত কোলদিগকে বুঝাইয়াছিলেন যে, খ্রিস্ট ধর্ম রাজধর্ম। তোমরা খ্রিস্টান হইলে তোমাদিগকে কর দিতে হইবে না। এই প্রলোভনে পড়িয়া তাহারা অনেকে খ্রিস্টান হইতে স্বীকৃত হইল। তৎপর পাদরি সাহেব একটি বিস্তৃত মাঠে উহাদিগকে একত্রিত করিলেন এবং একটি আম্রশাখা জলে সিক্ত করিয়া তাহাদিগের মস্তকোপরি সিঞ্চন করিয়া তাহাদিগকে খ্রিস্টান করিলেন। তাহারা খ্রিস্টান হইয়া পাদরিদিগের কথানুসারে কর দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় লোহারডাঙ্গায় যে মোকদ্দমাদি হইয়াছিল, তাহা অনেকেই সংবাদপত্রে পড়িয়া থাকিবেন।

ইহারা দিবাভাগে ভাত প্রায় খায় না, ভাত পচাইয়া এক প্রকার মদ প্রস্তুত করে, তাহা খাইয়াই দিবসে ক্ষুধা নিবৃত্তি করে। এইরূপে প্রস্তুত মদকে ইহারা ডিয়েং বলে। ইহা দেখিতে অনেকটা আমানির ন্যায়—ডিয়েং মদ প্রস্তুত করিবার প্রণালী বেশ সহজ—কয়েকটা গাছের শিকড় কাটিয়া ছোট ছোট সাদা কদমার ন্যায় প্রস্তুত করে। এবং দুই এক দিন ভাত জলে ভিজাইয়া রাখিয়া উহার কয়েকটি তাহাতে মিশ্রিত করে এবং তাহার দুই তিন দিন পরে উহা ব্যবহারোপযোগী হয়। ইহা অধিক পরিমাণে খাইলে মত্ততা জন্মে ; কিন্তু ইহারা ক্ষুধা নিবৃত্তি জন্য যতটুকু খায়, তাহাতে ইহাদের জ্ঞান বিলুপ্ত হয় না। তবে কোনো পর্ব বা উৎসব উপলক্ষে কেহ কেহ এই ডিয়েং অধিক পবিমাণে খাইয়া প্রায় সংজ্ঞাহীন হয়। স্ত্রীলোকেরাও সময় সময় অতিরিক্ত ডিয়েং পান করিয়া থাকে। সন্তান জন্মিবামাত্র ইহারা সন্তানের মুখে একটু ডিয়েং স্পর্শ করায়। ইহাদের বিশ্বাস, জন্মাবধি এই প্রকার মদ খাইতে অভ্যাস না করিলে ভবিষ্যতে খাইতে পারিবে না। এইরূপে সন্তানের বয়োঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ডিয়েঙের মাত্রাও বৃদ্ধি করা হয়। প্রসূতি প্রসবান্তে আট দিন অশুচি বিবেচনা করে, এই অশুচিকালে স্বামী, প্রসূতি এবং নবপ্রসূত সন্তান ব্যতিরেকে গৃহের অন্যান্য ব্যক্তিরা স্থানান্তরে যাইয়া বাস করে এবং তদন্তে সকলে গৃহে আসিয়া ভোজ ও নৃত্য গীত আমোদ করিয়া থাকে। এই দিনেই সন্তানের নামকরণ হয়—সচরাচর পিতামহের নাম পৌত্র পাইয়া থাকে। নামকরণের সময় একটি হাঁড়িতে জল রাখিয়া, সন্তানের পিতামহের নামোচ্চারণ করিয়া একটি কলাই ওই জলে ফেলিয়া দেয়—যদি কলাইটি ভাসিতে থাকে তবে সন্তানের ওই নাম রাখা হয়। নতুবা বারংবার ওইরূপ পরীক্ষা করিয়া যে নামে কলাইটি ভাসিতে থাকে, সেই নাম রাখে।

ইহারা গোরু, মহিষ, কুক্কুট, শূকর, মৎস্যাদি এবং কুম্ভীরও খাইয়া থাকে। বড়ো বড়ো

ইন্দুর ইহাদের উপাদেয় খাদ্য। সিংভূমে একপ্রকার বড়ো ইন্দুর আছে ; ইহারা তাহা পাইলে অত্যন্ত আনন্দিত হয় এবং চারি পাঁচ পয়সা মূল্যেও ইহা ক্রয় করিতে প্রস্তুত হয়। ইহারা গোমাংস অত্যন্ত সন্তোষের সহিত আহার করে, কিন্তু গোদুগ্ধ ইহাদের নিকট অখাদ্য বলিয়া পরিত্যক্ত।

শহরে এবং শহরের চতুষ্পার্শে যাহারা বাস করে, তাহাদিগের পরিচ্ছদ প্রায় বাঙ্গালীর ন্যায়। কিন্তু ইহারা সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করে না। অরণ্যমধ্যে যাহারা বাস করে, তাহারা এক খণ্ড অপ্রশস্ত কৌপীন ভিন্ন অন্য কোনো বস্ত্র প্রায় ব্যবহার করে না। শীতকালেও কেহ কেহ অনাবৃত দেহেই থাকে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ইহাদের মধ্যেও সভ্যতা প্রবেশ করিতেছে। জঙ্গালে থাকিয়াও দুই একজন প্রশস্ত বস্ত্র দ্বারা দেহাবৃত করিয়া থাকে। কেহ কেহ বা মোটা চাদর গায়ে দিয়া শীত নিবারণ করে। কোনো কোনো কোলকে শীতকালে অনাবৃত দেহে বক্ষে রৌদ্র লাগাইতে দেখা যায়—তখন সে শকুনির পক্ষের ন্যায় হাত দুইটি উচ্চ করিয়া সূর্যের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া থাকে। শীতকালে ইহারা খাটিয়ার উপর খড় বিছাইয়া শয়ন করে এবং খাটিয়ার নিচে আগুন রাখিয়া দেয়—ইহার দ্বারা মাঘের দারুণ শীত কতকটা নিবারিত হয়। শীতাধিক্য হইলে কেহ কেহ বা বাহিরের গৃহদ্বারের নিকট একখণ্ড কাষ্ঠে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া রাখে। কোলদের আনন্দময় প্রকৃতি, এজন্য তাহারা অল্পেতে কষ্ট অনুভব করে না। যাহার যে অবস্থা সে তাহাতেই সুখী। নৃত্য গীতাদিতে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করে বলিয়া তাহাদের জীবন আনন্দে ও প্রফুল্লতায় পরিপূর্ণ।

ইহাদের বিবাহ হওয়া কষ্টসাধ্য। অধিকাংশ কোলরমণীদিগকে চির কৌমার্যে অতিবাহিত করিতে হয়। কন্যার পিতামাতা বরের নিকট অধিক পণ প্রার্থনা করাতে ইহাদের শীঘ্র বিবাহ ঘটিয়া উঠে না। পূর্বে পঞ্চাশ ষাটটি গোরু বিবাহের পণ ছিল। এই অত্যাধিক পণের নিয়মবশত দরিদ্র কোলদের পক্ষে বিবাহ একরূপ অসম্ভব হইয়াছিল। বিবাহে এই প্রকার কষ্ট দেখিয়া একজন ডেপুটি কমিশনর ডাঃ হেজ সাহেব তাহাদের পল্লির প্রধান প্রধান লোকদিগকে একত্রিত করিয়া এক জোড়া বলদ, একটি গাই ও সাতটি টাকা পণ নির্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। এই পণ স্থিরীকৃত হইবার পর দরিদ্র লোকদিগের মধ্যে এখন পূর্বনিয়মানুযায়ী পণের কঠিন নিয়ম দেখা যায় না। কিন্তু মধ্যবিত্ত এবং ধনী কোলদিগের মধ্যে ডেপুটি কমিশনার সাহেবের নিয়ম বড়ো খাটে না। তাহারা পূর্ব নিয়মেই বিবাহের পণ আদায় করিয়া থাকে। পণের এই কঠোর নিয়মবশত ইহাদের বিবাহ হওয়া বড় দুষ্কর, তজ্জন্য অনেক সুশ্রী কোলরমণীকেও অবিবাহিতা থাকিতে হয়। যদি কেহ তাহাদের সৌন্দর্যের বিষয় কখনও উল্লেখ করে—তবে তাহারা মুখখানি ম্লান করিয়া দুঃখের হাসি হাসিয়া বলে, "আমাদের যখন বিবাহই হইতেছে না, তখন আর এই সৌন্দর্যে কী ফল।" ইহাদের বিবাহের বিশেষ কোনো প্রক্রিয়া নাই ; কোনো যুবক বিবাহ করিতে অভিলাষী হইলে একটি যুবতিকে পছন্দ করে এবং স্বীয় পিতার নিকট বিবাহের মত প্রকাশ করে। পিতা তদনুসারে গ্রামের কয়েকজন প্রধান প্রধান লোকসহ কন্যার পিতার নিকট বিবাহের কথা উত্থাপন করিয়া পণ ধার্য করিয়া আইসে। সমুদায় নির্ধারিত হইলে নির্দিষ্ট দিনে কন্যার আত্মীয়গণ এবং গ্রামের অন্যান্য লোক ও যুবক যুবতিগণ সকলে একত্রে কন্যাকে সুসজ্জিত করিয়া লইয়া নৃত্যগীত করিতে করিতে বরের গ্রামের দিকে যাইতে থাকে; এ

দিকে বরের আত্মীয়গণ ও গ্রামের অন্যান্য ব্যক্তিগণ বরের সহিত নাচ গান করিতে করিতে গ্রামের বাহিরে আসিয়া উহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া গ্রামে লইয়া যায়। তাহার পর স্বামী স্ত্রী অন্যান্য সকলের সহিত একত্রে নৃত্য করিতে থাকে। পরে ভোজন ও ডিয়েং পান আরম্ভ হয়। স্বামী ও স্ত্রীকে ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে ডিয়েং পান করিতে দেওয়া হয় এবং পরস্পর ডিয়েং পরিবর্তনান্তর অল্প পরিমাণে পান করে। ইহা হইলেই বিবাহ কার্য সম্পন্ন হইল। স্ত্রী তিন দিন স্বামীর সহিত বাস করিয়া পলায়ন করিয়া যায়, স্বামী তাহার অনুসন্ধানার্থে বাহির হয় এবং তাহাকে দেখিলেই বলপূর্বক গৃহে লইয়া আইসে। এই পলায়ন পালাতেই স্বামী বেচারার প্রাণান্ত হয়। ইহারা স্ত্রীকে জীবনের পবিত্র সঙ্গিনী স্বরূপ জ্ঞান করিয়া উভয়ে মনের সুখে সংসার যাত্রা নির্বাহ করে। কোনো বিপদআপদ উপস্থিত হইলে স্বামী স্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করে; এবং সংগত বোধ হইলে তদনুসারে কার্য করিয়া থাকে।

কোলেরা মৃতদেহ দাহ করে এবং অবশিষ্ট অস্থি গৃহে আনিয়া একটি হাঁড়ি পূর্ণ করিয়া যে ঘরে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়েরা সর্বদা দেখিতে পাইবে, এমত স্থানে হাঁড়িটিকে একমাস ঝুলাইয়া রাখে। মাসান্তে একটি গর্ত খনন করিয়া তন্মধ্যে হাঁড়িটি স্থাপিত করে, এবং মৃত ব্যক্তির দ্রব্যাদি ও কতকগুলি আহারীয় বস্তু উহার মধ্যে রাখিয়া প্রোথিত করে এবং তদুপরি একখানি প্রস্তর স্থাপন করে। কেহ কেহ সমাধির উপরে এক এক খানি স্তম্ভাকৃতি প্রস্তরও স্মরণ-চিহ্ন স্বরূপ রাখিয়া দেয়। ইংরাজ এবং অন্য অন্য জাতির কবর প্রস্তরের প্রথা এই অসভ্য জাতির মধ্যে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। মাঘ মাসে ইহাদের শস্যাদি কাটা হইয়া গৃহজাত হইলে ইহাদের মাঘি-পর্ব আরম্ভ হয়। এই পর্ব ইহাদের সর্ব প্রধান। প্রায় পনেরো দিন পর্যন্ত ইহারা এই পর্বে আমোদ করে। নৃত্য গীত বাদ্য এবং ডিয়েং পান দিবারাত্র অবিরাম চলিতে থাকে। বাদ্যের গুম গুম শব্দে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত হয়। সেই একঘেয়ে বাজনার তালে তালে স্ত্রীপুরুষ একত্রে হস্তে হস্তে শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং আনন্দে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতে থাকে। দশ বারো হইতে প্রায় একশত স্ত্রীপুরুষ এই প্রকারে একত্রে নৃত্য করে। ইহারা কখনও উচ্চকণ্ঠে গান করে না। স্ত্রীলোকদের স্বর কোমল ও মধুর। ইহাদের গানগুলি অতি সংক্ষিপ্ত, দুই তিনটি পদের অধিক নয়। কিন্তু গানের সুর বড়োই শ্রুতিমধুর। এই পর্ব সময়ে ইহারা এত অধিক পরিমাণে ডিয়েং পান করে যে ইহাদের হিতাহিত জ্ঞান প্রায় থাকে না এমনকি সেই সময়ে ইহারা অনেকটা পশুর প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। সচরাচর এই পর্বের দুই তিন মাসের মধ্যে ইহাদের বিবাহাদি সম্পন্ন হয়। এই পর্ব ভিন্ন ইহাদের আরও ছয়টি পর্ব আছে; কিন্তু আর কোনোটিতে ইহারা এত স্ফূর্তি প্রকাশ করে না।

প্রত্যেক গ্রামের প্রধান ব্যক্তিকে মুন্ডা বলে এবং দশ হইতে পঁচিশ গ্রাম লইয়া একটি পিড়; প্রত্যেক পিড়ে একটি মানকি পূর্বে শাসনকার্য চালাইত। ইংরাজ আমলে এই মানকি ও মুন্ডাগণ গভর্নমেন্টের রাজস্ব আদায় করিয়া দেয় এবং তজ্জন্য তাহারা পাবিশ্রমিক স্বরূপ শতকবা আঠাইশ টাকা পায়। অন্য অন্য স্থানের ন্যায় গভর্নমেন্টকে রাজস্ব আদায় করিতে কোনো গোলমাল কিংবা জমাজমি নিলাম করিতে হয় না। কোলদের বিশেষ গুণ এই যে, তাহারা যাহাতে প্রতিশ্রুত হয়, তাহা প্রাণপণে সম্পাদন করিয়া থাকে। পূর্বে এই

মুন্ডা মানকিরা বিচার ও সকল প্রকার বিবাদ মীমাংসা করিত। এখনও সামান্য সামান্য বিবাদের মীমাংসা করে এবং অনেকটা পুলিসের কার্যও করিয়া থাকে। কাহারও গ্রামে কোনো ফৌজদারি মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে ইহারা আসামিকে আদালতে হাজির করিয়া দেয়। কোলদের মধ্যে এই মানকি ও মুন্ডার বিশেষ সম্মান আছে, তাহারা ন্যায় বিচার করিতে চেষ্টা করে, এবং তাহাদের অধীনস্থ সকলে তাহাদের বিচারে সন্তুষ্ট হয়। সচরাচর মানকির ও মুন্ডার পুত্র মানকি ও মুন্ডা হয়। কিন্তু পুত্র বালক অথবা অনুপযুক্ত হইলে সেই বংশ হইতে সকলে মিলিয়া অন্য একজনকে বাছিয়া লয়। ইংরাজ আদালতে বিচারকদিগকে বিচার করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। যে দোষী সে সকল কথাই খুলিয়া বলে ; কোনো কথা গোপন করে না। যদি কোনো মোক্তার কিংবা উকিল কোনো কথা সাক্ষীদিগকে শিখাইয়া দেয়, তাহা পর্যন্ত অকপটচিত্তে বলিয়া ফেলে এবং যে শিখাইয়া দেয় তাহারও নাম বলিয়া দেয়। সুতরাং উকিল মোক্তারদিগকে বিশেষ সাবধানে থাকিয়া কার্য করিতে হয়। ইহাদের সাক্ষ্য দিবার সময় উহাদের ভাষায় যে শপথ দেওয়া হয়, তাহা বিচিত্র। উহার অর্থ এই, "যদি তাহারা মিথ্যা কথা বলে, তবে অন্ধ হইবে এবং সর্প অথবা ব্যাঘ্র কর্তৃক বিনষ্ট হইবে—ইত্যাদি।"

ইহাদের সৃষ্টিবৃত্তান্ত কৌতুকাবহ। ওতে বোড়াম এবং শিং বোঙ্গা নামক দুই দেবতা ছিলেন। ইঁহারা পৃথিবীতে স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং ইহারাই প্রস্তর মৃত্তিকা ও জল দ্বারা পৃথিবী, তরু লতাদি এবং গ্রাম্য পশুসকল প্রথমে সৃষ্টি করিলেন। তৎপরে অরণ্যের পশু-পক্ষী সৃষ্ট হইল। যখন দেবতাদ্বয় দেখিলেন যে পৃথিবী মনুষ্যের বাসোপযোগী হইয়াছে, তখন তাঁহারা একটি বালক ও বালিকা সৃষ্টি করিলেন এবং একটি উপত্যকার পার্শ্বস্থ গিরিগহ্বর তাহাদিগের আবাসস্থল নির্দেশ করিয়া দিলেন। সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছানুরূপ প্রেম এই বালক বালিকার মনে উদয় না হওয়ায় তিনি তাহাদিগকে ডিয়েং প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিক্ষা দিলেন এবং তাহারা ওই ডিয়েং খাইয়া হর্ষোৎফুল্লমনে দিনযাপন করিতে লাগিল। কালক্রমে উহাদের দ্বাদশটি পুত্র এবং দ্বাদশটি কন্যা জন্মিল। তৎপর শিং বোঙ্গা মহিষ, গোরু, শূকর, কুক্কুট ও শাকসবজির দ্বারা একটি ভোজের আয়োজন করিলেন এবং বালক বালিকাদিগকে বিবাহ দিলেন। প্রত্যেক স্ত্রীপুরুষ নিজ নিজ খাদ্যদ্রব্য মনোনীত করিয়া লইতে লাগিল। প্রথমে চারিজন গো ও মহিষ মাংস ভক্ষণ করিল—তাহারা কোল ও ভূমিজ জাতিতে পরিগণিত হইল। দুইটি শাকসবজি আহার করিল, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় তাহাদের বংশোদ্ভূত। যাহারা ছাগ মাংস ও মৎস্য ভক্ষণ করিল তাহারা শূদ্র, যে দুই জন কচ্ছপাদি ভক্ষণ করিল তাহারা ভুঁইয়া এবং চারিজন শূকরের মাংস আহার করিল, তাহারা সাঁওতাল হইল। অবশিষ্ট দুইজনের আহারীয় দ্রব্যের কোনো অংশ না থাকায় তাহারা প্রথম দুইজনের উচ্ছিষ্ট খাদ্য দ্রব্যের কতক অংশ গ্রহণ করিয়া আহার করিল—ইহারা ঘাসিজাতি (মেথর) হইল।

ইহাদের কতকগুলি কুসংস্কার আছে। তন্মধ্যে ডাইনে বিশ্বাসই প্রধান। মনুষ্য এবং পালিত পশুদের মধ্যে পীড়াধিক্য হইলে উহা ডাইনের কার্য বলিয়া ইহারা বিশ্বাস করে, এবং ওঝা দ্বারা ডাইন স্থির করিয়া তাহার উপর নানারূপ উৎপীড়ন করিতে থাকে। ইংরাজাধীন হইবার পূর্বে ইহারা ডাইনদিগকে হত্যা করিত ; কিন্তু এখন এইপ্রকার হত্যার

কথা বড়ো শোনা যায় না। ওঝাকে ইহারা "শোকা" বলে, উক্ত "শোকা" কখনো-কখনো পীড়া সকল ভূতের কীর্তি বলিয়া নির্দেশ করে। সেরূপ বিবেচিত হইলে ইহারা মুরগি ইত্যাদি বলি দিয়া ভূতের দৌরাত্ম্য হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চেষ্টা করে। পূর্বে সকল জাতির মধ্যেই ডাইনে বিশ্বাস ছিল। অপরাপর জাতির বিশ্বাসে ডাইনি একটি কদাকার বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ; কিন্তু ইহাদের মধ্যে কী পুরুষ, কী স্ত্রী, কী যুবা, কী বৃদ্ধ, কী সুশ্রী, কী কুৎসিত সকলেই ডাইন হইতে পারে। একবার কোনো গ্রামে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হওয়ায় "শোকা" আসিয়া আটজন স্ত্রীলোককে ডাইনি স্থির করিল। তাহাদের উপর এরূপ নিষ্ঠুর অত্যাচার হইতে লাগিল যে তাহারা অবশেষে নিতান্ত কাতর হইয়া সকল প্রকার উপদ্রব তাহাদের কৃত বলিয়া স্বীকার করিল। তাহাদের মধ্যে একটি যুবতি এই উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া একটি গভীর কূপে পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল।

এখন ইহাদের মানসিক বৃত্তির বিষয় কয়েকটি কথা লিখিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ইহারা সত্যবাদী ও সত্যপ্রিয়। ইহারা যে কাজ নীচ বলিয়া মনে করে, তাহা কদাপি করিতে সম্মত হয় না। ইহাদের আত্মসম্মান জ্ঞান এবং অভিমান প্রচুর পরিমাণে আছে। পূর্বে বলা হইয়াছে যে ইহাদের স্ত্রীলোকের উপর বিদেশি লোক অত্যাচার করিলে ইহারা তাহার প্রাণনাশ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। অন্য কারণেও ইহাদের মনে কষ্ট দিলে সেইরূপ কার্য করিয়া থাকে। ইংরাজের অধীন হওয়া অবধি ইহাদের মধ্যে হত্যা-সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস হইয়া আসিতেছে। কিন্তু আত্মহত্যার সংখ্যা ইহাদের মধ্যে অত্যন্ত অধিক। ইহারা মনে কোনোরূপ কষ্ট পাইলে এমনকি কাহারও সততা অথবা সত্যবাদিত্বে সন্দেহ করিলে আত্মহত্যা করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও কুণ্ঠিত হয় না। স্ত্রীলোকদের অভিমান আরও বেশি। যৎসামান্য কথার জন্যও মনে কষ্ট পাইলে ইহারা আত্মহত্যা করিতে প্রস্তুত। যদি স্বামী অথবা অন্য কোনো আত্মীয় কোনো কর্কশ কথা বলে, অথবা তিরস্কার করে, তবে সর্বদা যে হাস্যমুখী ও প্রফুল্ল সেও একেবারে ম্রিয়মানা হইয়া পড়ে ; এবং যদি শীঘ্র তাহার মনস্তুষ্টি না করা হয় তবে নিশ্চয়ই সে আত্মহত্যা করিয়া মনোকষ্ট দূর করে। শুনা যায়, একটি যুবতির প্রস্তুত খাদ্য তাহার পিতৃব্য খাইতে অস্বীকার করে। তাহাতে সে আত্মহত্যা করিবার জন্য বিষ পান করিয়াছিল।

অন্যান নীচ জাতির ন্যায় কোল রমণীরা কলহ প্রিয় নহে। সকলের মধ্যে সদ্ভাব ও সৌহার্দ্য দেখিতে পাওয়া যায়। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সাতিশয় প্রণয়, উভয়ের ভালবাসা নয়নে ও বাক্যে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। কেহ কাহারও প্রতি কর্কশ কথা প্রয়োগ করে না অথবা কেহ কাহারও নিকট কোনো কথা সংগোপন করে না। ইহারা অসভ্য হইলেও এবং ইহাদের ভাষায় মনের সকল ভাব প্রকাশিত না হইলেও ইহারা সুখ ও শান্তি পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিয়া থাকে। এই অসভ্য ও অশিক্ষিত কোলজাতির মধ্যে দাম্পত্য প্রেম সভ্যজাতির অপেক্ষা বেশি পরিমাণে বিরাজিত।

ভারতী ● ভাদ্র ১৩০০ (১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দ)



কোল-জাতির সংস্কৃতি

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভারতবর্ষের সংস্কৃতি কয়েকটি বিভিন্ন এবং স্বতন্ত্র জাতির নিজ নিজ বিশিষ্ট সংস্কৃতির সমন্বয়ের ফল। ভারতের অধুনাতন অধিবাসীদের পূর্ব-পুরুষ বিভিন্ন প্রকারের মানব, বিভিন্ন যুগে বাহির হইতে আসিয়া ভারতে উপনিবিষ্ট হইয়াছিল ;—ভারতের মধ্যে কোনো প্রকার মানব উদ্ভূত হইবার প্রমাণ এ-তাবৎ পাওয়া যায় নাই। যে যে বিভিন্ন জাতির জনগণ ভারতে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিল, তাহাদের সম্বন্ধে নবীনতম মতবাদ, ভারত সরকারের প্রাণীতত্ত্ব-বিভাগের নৃতত্ত্ববিদ ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিরজাশংকর গুহ মহাশয়ের রচিত ক্ষুদ্র কিন্তু মূল্যবান পুস্তক The Racial Elements in the Indian Population (Oxford Pamphlets on Indian Affairs, no. 22) মধ্যে পাওয়া যাইবে। দৈহিক গঠন ধরিয়া আলোচনা করিয়া আপাতত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে যে, ভারতে ছয়টি বিভিন্ন জাতির মানুষ তাহাদের নয়টি শাখায় বিভিন্ন কালে ভারতে আসিয়াছে ; এবং ইহাদেরই মিশ্রণে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীগণের উদ্ভব ঘটিয়াছে। এই মিশ্রণ-ক্রিয়া কোথাও বা গভীরভাবে হইয়াছে, কোথাও বা উপর-উপর হইয়াছে। এই ছয়টি জাতি হইতেছে এই : (১) কৃষ্ণবর্ণ হ্রস্বকায় দীর্ঘকপাল ঊর্ণাকেশ পৃথুনাসিক উচ্চহনু স্থূলাধর Negrito নেগ্রিটো বা নিগ্রোবটু জাতি—উষঃপ্রস্তর যুগে আফ্রিকা হইতে স্থলপথে আরবদেশ হইয়া ইহাদের ভারতে আগমন ঘটে ; এই জাতি সভ্যতার নিম্নতম স্তরে ছিল, পরবর্তী জাতিদের আগমনে ইহারা বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছে, ভারতে ক্কচিৎ ইহাদের কিঞ্চিৎ অবশেষ মাত্র পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে ইহাদের ভাষা এখন সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত। (২) Proto-Australoid "প্রাথমিক দাক্ষিণাকার" জাতি—ইহারা মধ্যমাকার, শ্যামবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ, পৃথুনাসিক, দীর্ঘকপাল জাতি—পশ্চিম-এশিয়া হইতে ইহারা আসে, এবং সমগ্র ভারত

জুড়িয়া ইহাদের প্রসার হয়। ভারতের মধ্যেই এই জাতির মানুষ নিজ বিশিষ্টতা অর্জন করে, এবং পরে ভারত হইতে অতি প্রাচীনকালে ইহাদের এক দল, দক্ষিণের মহাদ্বীপ অস্ট্রেলিয়ায় গিয়া উপনীত হয়, এবং তদনন্তর অন্য দল পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে ও Indonesia বা দ্বীপময় ভারতের দ্বীপপুঞ্জে, Melanesia বা কৃষ্মদ্বীপপুঞ্জে এবং Polynesia বা পুরুদ্বীপপুঞ্জে প্রসৃত হয়, ও নানা ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোকের সহিত মিশ্রিত হইয়া ওই সমস্ত অঞ্চলের আধুনিক অধিবাসীরূপে পরিণত হয়। এই Proto-Australoid বা "প্রাথমিক দাক্ষিণাকার" মানব ভারতের প্রায় সর্বত্র নিম্নশ্রেণির জনসমূহের মধ্যে বিদ্যমান, এবং বহুশঃ ইহারা পরে আগত নানাজাতির মানুষের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। ভাষায় ইহারা কী ছিল তাহা জানা যায় না ; তবে অনুমান হয়, ইহাদের ভাষা (এই ভাষাকে Proto-Austric বা "আদি দাক্ষিণ' ভাষা নাম দেওয়া যায়) ভারতখণ্ডে আধুনিক কোল বা মুন্ডা শ্রেণির ভাষায় পরিণত হইয়াছে,—যে ভাষা সাঁওতাল, মুন্ডা, হো, কোর্‌কু, কোরবা, শবর, গদব প্রভৃতির রূপ গ্রহণ করিয়াছে, এবং আসামে মোন-খ্‌মের শ্রেণির ভাষা খাসিয়াতে রূপান্তরিত হইয়াছে। ভারতের বাহিরে ইহাদের ভাষা, মোন-খ্‌মের, ইন্দোনেশীয় বা মালাই শ্রেণির ভাষা এবং মেলানেশীয় ও পলিনেশীয় ভাষা রূপে বিদ্যমান। কোল-জাতি অন্য জাতির লোকেদের সঙ্গে অল্প-বিস্তর মিশ্রিত হইলেও মুখ্যত এই "প্রাথমিক দাক্ষিণাকার" জাতির বংশধর ; এই কোলদিগের সংস্কৃতির কিঞ্চিৎ আলোচনা এই প্রবন্ধে করা যাইতেছে। (৩) "প্রাথমিক দাক্ষিণাকার" জাতির পরে আসে শ্যাম বা শ্বেতাভ-বর্ণ মধ্যমাকার দীর্ঘকপাল সরলনাসিক Mediterranean বা ভূমধ্যসাগরীয় জাতির লোক। ইহাদের আদি বাসভূমি হইতেছে পূর্ব-ভূমধ্যসাগরের দেশ—এশিয়া মাইনর, সিরিয়া ও পালেস্তিন, মিশর, গ্রিস ও Ægean ঈজিয়ান সাগরের দ্বীপপুঞ্জ। দৈহিক সমাবেশে কিঞ্চিৎ পৃথক ইহাদের তিনটি শাখা ভারতে আসে। ইহারাই ভারতে নাগরিক সভ্যতার পত্তন করে; এবং অনুমান হয়, দ্রামিড় বা দ্রাবিড় ভাষা ভারতে ইহাদের দ্বারাই আনীত হয়। সিন্ধু ও পাঞ্জাবের মহেন-জো-দাড়ো প্রভৃতি স্থানের নাগরিক সভ্যতা, যাহার সূত্রপাত সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০০ বৎসর হইতে, তাহা ইহাদেরই কীর্তি বলিয়া মনে হয়। ভারতীয় সভ্যতার বিকাশে, হিন্দুধর্মের রূপ-গ্রহণে, দ্রাবিড়দের আনীত উপাদান বিশেষ মূল্যবান। (৪) চতুর্থ জাতির মানব যেটি ভারতে আসে সেটি হইতেছে Western Brachycephals অর্থাৎ "পাশ্চাত্য হ্রস্বকপাল" জাতি ; ইহাদেরও তিনটি শাখা ; অনুমান হয়, ইহারা এবং (৫) Nordic বা "উদীচ্য" নামে বৈজ্ঞানিকগণ-কর্তৃক আখ্যাত একটি জাতির মানবগণ, আর্য-ভাষা লইয়া ১৫০০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দের পরে ইরান ও আফগানিস্থানের পথ ধরিয়া এশিয়া-মাইনর ও মেসোপোতামিয়া হইতে ভারতে আগমন করে। ভাষা ইহাদের এক ছিল ; কিন্তু জাতি হিসাবে এই "পাশ্চাত্য হ্রস্বকপাল" জাতি ও "উদীচ্য" জাতি ছিল একেবারে পৃথক ; সম্ভবত আর্য-ভাষা ছিল উদীচ্যদেরই ভাষা, উদীচ্যদের সংস্পর্শে আসিয়া হ্রস্বকপালগণ পরে এই ভাষা গ্রহণ করে। উদীচ্যগণ ছিল দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ ঋজুনাসিক হিরণ্যকেশ ও নীলচক্ষু। বৈদিক সভ্যতার ও ধর্মের এবং বৈদিক সাহিত্যের মূলসূত্র ইহারাই এদেশে আনয়ন করে, এবং পরবর্তীকালে ইহাদেব ভাষাই সংস্কৃত প্রাকৃত ও "ভাষা" রূপে ভারতীয় মিশ্র সভ্যতার প্রধান বাহন হইয়া দাঁড়ায়। উপরের এই পাঁচ প্রকার মৌলিক

জাতির মানুষদের সকলেই পশ্চিম হইতে আসিয়াছিল ; পরে পূর্ব ও উত্তর হইতে, আসাম ও ব্রহ্ম সীমান্তের পথে এবং হিমালয় অতিক্রম করিয়া আসে (৬) Mongoloid বা "মোঙ্গোলাকার" জাতির মানুষ ; ইহারা পীতবর্ণ, পৃথুনাসিক, উচ্চহনু, সূক্ষ্মনেত্র, কৃষ্মকেশ ; দীর্ঘকপাল, হ্রস্বকপাল ও বিশিষ্ট-মোঙ্গোল বা ভোট-মোঙ্গোল ভেদে, ইহারা তিনটি শাখায় পড়ে। এই মোঙ্গোলাকার বা মোঙ্গোল শ্রেণির মানুষ কেবল উত্তর-পূর্ব ভারতে ও দক্ষিণ হিমবন্ত প্রদেশেই মিলে, এবং ওই অঞ্চলের জনগণের মধ্যে এই উপাদান বেশি করিয়া পাওয়া যায়। আর্যগণ কর্তৃক পর্বতবাসী মোঙ্গোল-জাতীয় মানব প্রথম-প্রথম "কিরাত" নামে অভিহিত হয়।

ভারতীয় জনগণের মধ্যে অধিকতর (২), (৩), (৪) ও (৫) জাতির মানবের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে ; ভারতের সভ্যতা—বাস্তব বা ভৌতিক সভ্যতা, মানসিক প্রকৃতি, আধ্যাত্মিক বোধ বা বিচার—এ সমস্তই হইতেছে Proto-Austric বা "আদি দাক্ষিণ" (অথবা সংক্ষেপে Austric বা "দাক্ষিণ"), দ্রাবিড় ও আর্য ভাষীদের সম্মিলিত জীবনের ফল। উত্তর ভারতে সিন্ধু ও গঙ্গার দেশে যাহারা পাশাপাশি বাস করিতে থাকে এমন দাক্ষিণ, দ্রাবিড় ও আর্য ভাষী জনগণ, রক্তে ও সভ্যতায়, ধর্মে ও সংস্কৃতিতে মিশ্রিত হইতে আরম্ভ করে। দ্রাবিড়দের আগমনের পর হইতেই মনে হয় এই মিশ্রণ দ্রাবিড় ও দাক্ষিণদের মধ্যে আরব্ধ হয় ; এবং পরে আর্যেরা আসিয়া উপস্থিত হইলেও এই মিশ্রিকরণ বা জাতীয় সমীকরণ অব্যাহত ভাবে চলিতে থাকে, ও খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রকের পূর্বার্ধেই এই সমীকরণ নিজ বিশিষ্ট পথে চালিত হয়, আর্যভাষী হিন্দু বা প্রাচীন ভারতীয় জাতি তখন দাক্ষিণ, দ্রাবিড় ও আর্যের মিশ্রণের ফলে প্রথম নিজ বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করে।

পূর্ব-ইরানে—পূর্ব-পারস্যে ও আফগানিস্থানে—এবং পাঞ্জাব প্রদেশে যে দ্রাবিড় জনগণের সঙ্গে পশ্চিম এশিয়া ও মেসোপোতামিয়া হইতে আগত আর্যদের সংঘাত ঘটে, তাহাদের দুইটি জাতীয় নাম ছিল—"দাস" ও "দস্যু"। সম্ভবত এই দুইটি নাম একই পর্যায়ের, এই দুইটির মূলে একই অজ্ঞাতার্থ "দস্" শব্দ বা ধাতু বিদ্যমান। ঋগ্বেদে এই "দাস" ও "দস্যু" শব্দদ্বয় জাতিবাচক নাম-হিসাবে পাওয়া যায়। আর্য ও দ্রাবিড়ের প্রথম সংঘাতের যুগে, বিদেশি শত্রু আর্যের কাছে প্রতিরোধ-পরায়ণ অনার্য দস্যুর আর্য সম্বন্ধে বৈরিভাব মনে করিয়া, "দস্যু" এই নামটি 'লুণ্ঠনকারী' অর্থে আর্যের ভাষায় রূঢ়ি হইয়া যায় ; তেমনি বিজিত "দাস" জাতির নর-নারী আর্যের ঘরে কেনা-গোলামের কাজে বহুশঃ অবনমিত হওয়ায়, "দাস" নামটি 'ক্রীতদাস' বা 'ভৃত্য' অর্থ গ্রহণ করে। ইউরোপেও তেমনি Slav শ্লাব জাতির লোকেরা একসময়ে জরমানিক জাতির লোকেদের দ্বারা বিজিত হইয়া এত অধিক পরিমাণে ক্রীতদাস পর্যায়ে নীত হইত যে, জরমান প্রভৃতি পশ্চিম ইউরোপের ভাষায় জাতিবাচক নাম Slav বা Sklav হইতে 'দাস'-বাচক slave, Sklav শব্দ উদ্ভূত হয়। "দাস"-জাতির লোকের সঙ্গে যুদ্ধ, "দস্যু-হত্যা" বা যুদ্ধে "দস্যু"-জাতির হনন—এ সমস্ত ঋগ্বেদের যুগের লক্ষণীয় ব্যাপার ছিল। এই প্রথম সংঘাতের পরে, আর্য ও দ্রাবিড়ের মিলন ক্রমে অবশ্যম্ভাবীরূপে ঘটিতে থাকে।

Austric-ভাষী Proto-Australoid বা দাক্ষিণ জাতির লোকদের আর্যগণ প্রথম

হইতেই "নিষাদ" নামে অভিহিত করিত বলিয়া অনুমান হয় ; "শবর" ও "পুলিন্দ" এই নাম দুইটিও ইহাদের সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইত। অস্ট্রিক বা দাক্ষিণ বা নিষাদ জাতির লোক নগরিয়া সভ্যতার ধার ধারিত না বলিয়াই মনে হয়, ইহাদের হাতে ভারতের কৃষিমূলক ও গ্রামনিবদ্ধ সভ্যতাই গড়িয়া উঠে। নাগরিক সভ্যতার পত্তন ঘটে দ্রাবিড়দের হাতে। আর্যেরা প্রথমত যাযাবর ছিল—শর্য্যাত মানব প্রভৃতি তাহাদের গোত্রপতি "গ্রামেণ চচার"—অর্থাৎ নিজ-নিজ "গ্রাম" বা কুল বা গোত্র (ইংরেজিতে যাহাকে tribe বা clan বলে তাহা) লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইত ; অনেকগুলি "গ্রাম", সাধারণ শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করিবার জন্য যখন একত্র হইত, তখন হইত "সংগ্রাম"—বিভিন্ন গোত্রের যুদ্ধার্থ মিলিত হওয়া। আর্যদের পশ্চিম এশিয়ায় ও মেসোপোতামিয়ায় উপনিবিষ্ট হওয়ার পরে, পশু (অর্থাৎ গো মেষ অশ্ব ও উষ্ট্র) পালনের সঙ্গে সঙ্গে যব গোধূম ও ব্রীহির কর্ষণ আরম্ভ হয়। এই কৃষিও তাহারা ভারতে আরও বেশি কবিয়া আশ্রয় করিতে থাকে। নগরের পত্তন দাস-দস্যু বা দ্রাবিড়দের দেখাদেখি আর্যদের মধ্যে আরম্ভ হয় ; আর্যভাষার "পুর্, পুর, পুরী" শব্দ মূলে নগর-বাচক ছিল না, ইহার মৌলিক অর্থ হইতেছে 'গড়' বা 'সুরক্ষিত স্থান' ; এবং সংস্কৃত "নগর" শব্দ যে মূলে দ্রাবিড় শব্দ, ইহার প্রথম অর্থ প্রাচীন তমিল প্রভৃতি ভাষায় ছিল 'বাসভূমি. প্রাসাদ', এই শব্দের এইরূপ নিরুক্তিও সম্প্রতি প্রস্তাবিত হইয়াছে [দ্রষ্টব্য, T. Burrow, Some Dravidian Words in Sanskrit, *Transactions of the Philological Society* for 1945, London 1946, pp. 107-108]।

নিষাদ বা দাক্ষিণ জাতি, সাঁওতাল প্রভৃতি আধুনিক কোল জাতির পূর্বপুরুষ, এক সময়ে সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত ছিল, ইহা নৃতত্ত্ববিদগণের অভিমত। দ্রাবিড়েরা বেশির ভাগ উপনিবিষ্ট হয় পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে—এইসব অঞ্চলে ইহাদের ঘন বসতি হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়, এবং সেইজন্য এখানে ইহাদের ভাষা প্রবল হইয়াছিল। ধীরে ধীরে আর্যভাষার প্রসারের ফলে, পাঞ্জাবে ও সিন্ধু প্রদেশে দ্রাবিড় ও দাক্ষিণ উভয় শ্রেণির ভাষার লোপ ঘটে ; কেবল বেলুচিস্তানে ব্রাহুইদের মধ্যে এই দ্রাবিড়ের ক্ষেত্রের এক অবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। দক্ষিণ ভারতে কর্ণাট অন্ধ্রদেশ দ্রাবিড়দেশ বা তমিলনাড়ু এবং কেরলে এখনও অবিচ্ছিন্নভাবে দ্রাবিড়-ভাষার একচ্ছত্র সাম্রাজ্য বিদ্যমান। রাজপুতানায় ও মালবে দ্রাবিড়দের অপেক্ষা দাক্ষিণদেরই প্রসার বা বাস অধিক ছিল বলিয়া মনে হয়—এই অঞ্চলের ভিল-জাতি (মধ্য-যুগের আর্যভাষায়, প্রাকৃতে, যাহাদের "ভিল্ল" বলিয়া অভিহিত করা হইত) এখন আর্য গুজরাটি রাজস্থানি ও মালবি বুলি গ্রহণ করিয়াছে বটে, কিন্তু ইহারা কোল-শ্রেণির অনার্যই ছিল—বহ্রাড় বা বেরার প্রদেশের কোর্‌কুগণ এখন এই অঞ্চলের দাক্ষিণ অধিবাসীদের একটি অবশেষরূপে বাঁচিয়া আছে। পাঞ্জাবে ও গঙ্গার উপত্যকায়, আফগানিস্থান হইতে পূর্ববঙ্গ ও আসাম পর্যন্ত, প্রথম আগত দাক্ষিণদের পাশেপাশে নবাগত দ্রাবিড়দেরও বাস হইয়াছিল। কিন্তু রাজপুতানা-মালব হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত, গঙ্গার দেশের দক্ষিণে অরণ্য ও গিরিসংকুল কৃষিবিরল অঞ্চলে, মধ্য-ভারতে, ছোটোনাগপুরে, উড়িষ্যায় ও মধ্য-দাক্ষিণাত্যে, দাক্ষিণ-কোল জাতিরই প্রসার বেশি হইয়াছিল—যদিও ইহাদের প্রতিবেশীরূপে অনুরূপ আরণ্য শবর বা ব্যাধ সংস্কৃতির অধিকারী দ্রাবিড় জনগণও বাস করিত। এই হেতু, আমরা এই

অঞ্চলে এখন যেমন কোর্‌কু, কোরবা, মুন্ডা, হো, ভূমিজ, বিরহড়, সাওঁতাল, গদব, শবর প্রভৃতি কোলভাষী গণসমূহকে দেখিতে পাই, তেমনি গোন্ড, কন্ধ, বা কুই, কুড়ুঁখ বা ওরাওঁ এবং মালের বা মাল-পাহাড়ি প্রভৃতি দ্রাবিড়ভাষী আরণ্য জাতির লোকেদেরও পাই।

গঙ্গার তীরের কৃষি-প্রধান সমতলক্ষেত্রের অধিবাসী দাক্ষিণ জাতির লোক এবং তাহাদের প্রতিবেশী দ্রাবিড় জাতির লোক—হয় তো ইহাদের মধ্যে, অর্থাৎ প্রাচীন কালের দাস-দস্যু-দ্রমিড় এবং নিষাদ-ভিল্ল-কোল্ল-শবর-পুলিন্দগণের মধ্যে, প্রথমটায় সংঘাত ঘটিয়াছিল ; পরে ইহাদের পাশাপাশি অবস্থান শান্তিপূর্ণ ভাবেই হইয়াছিল, যেমন আমরা ছোটোনাগপুরে ওরাওঁ ও মুন্ডাদের দেখি। তবে একসঙ্গে দুই বিভিন্ন জাতির এবং ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষ গঙ্গার দেশে পাশাপাশি থাকায়, তৃতীয় জাতি এবং ভাষা ও সংস্কৃতির, অর্থাৎ আর্যদের ভাষা ও সংস্কৃতির পক্ষে, স্থান করিয়া লওয়া ও এই দুই প্রকার অনার্য ভাষাকে কোণঠাসা করিয়া ক্রমে তাহাদের স্থান দখল করিয়া লওয়া সহজ হইয়াছিল। ক্রমে উত্তর ভারতে আর্যের সঙ্গে দাক্ষিণ ও দ্রাবিড়ভাষী মিলিয়া, ভাষায় এক হইয়া গেল ; কোলভাষী দাক্ষিণ জনগণ উত্তর ভারতের আর্যভাষী জনগণে পরিণত হইল।

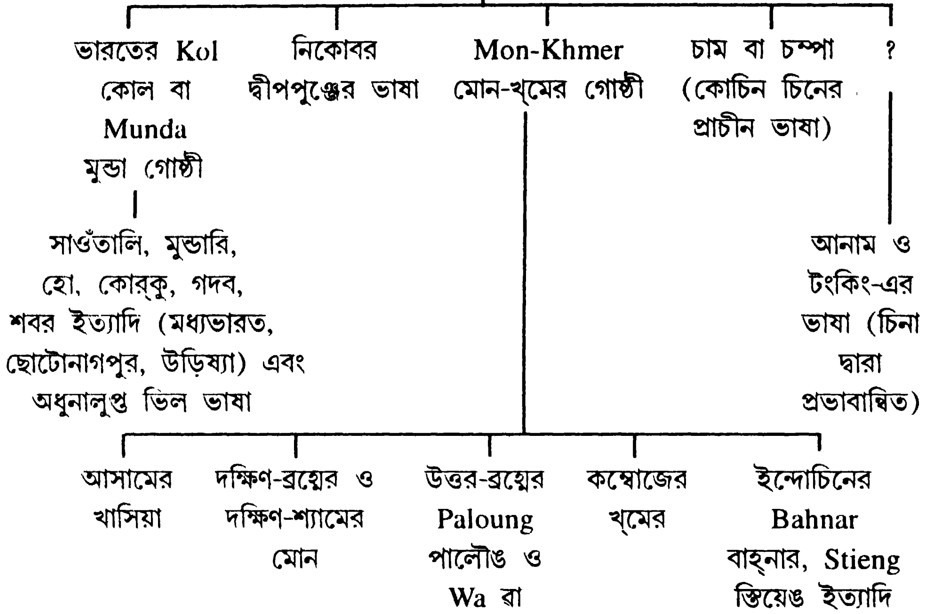
ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা দ্বারা এই দাক্ষিণ কোল-জাতির সংস্কৃতির, ভারতীয় সভ্যতায় ইহাদের দ্বারা আনীত উপাদানের, কিছু কিছু পরিচয় আমরা পাইতে পারি। এই জাতির লোকেরা প্রথমটায় 'জুম' চাষের মতো চাষ করিত—সূক্ষ্মাগ্র বৃহদাকার যষ্টিখণ্ড দ্বারা ভূমিতে গর্ত খুঁড়িয়া তাহাতে বীজ দিয়া চাষ করিত। নেপালের নেবার জাতির মত কোদালি দিয়া মাটি কোপাইয়া চাষ করাও সম্ভবত তাহাদের রীতি ছিল। পরে, খুব সম্ভবত দ্রাবিড়-ভাষীদের কাছে. তাহারা লাঙলে গোরু মহিষ জুড়িয়া রীতিমত ধান চাষ করিতে শিখে। কেবল নদীমাতৃক অঞ্চলেই, কৃষি দাঁড়াইয়াছিল ইহাদের সংস্কৃতির মুখ্য আধার বা প্রতিষ্ঠাভূমি। অরণ্যময় পার্বত্য প্রদেশে কিন্তু ইহারা প্রধানত শবর বা ব্যাধের জীবনযাপন করিত। পরে চাষও সেখানে অল্প-স্বল্প করিত। সমতল নদীমাতৃক দেশে ও অন্যত্র ইহারা কতকগুলি স্থানীয় ফল ও শাক তরকারির চাষও করিত—যেমন কলা, নারিকেল, লাউ, কুমড়া, বেগুন, লেবু। পান ও সুপারির ব্যবহার ইহাদের নিকট হইতেই ভারতীয় সভ্যতায় গৃহীত হয়। সম্ভবত প্রথমে ইহারাই ভারতের অরণ্যাবৃত দেশে হাতিকে পোষ মানায়। তুলার কাপড় প্রথমত এই দাক্ষিণ জাতির মানুষেই তৈয়ারি করে। ইহাদের অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে তিরধনুক প্রধান ছিল।

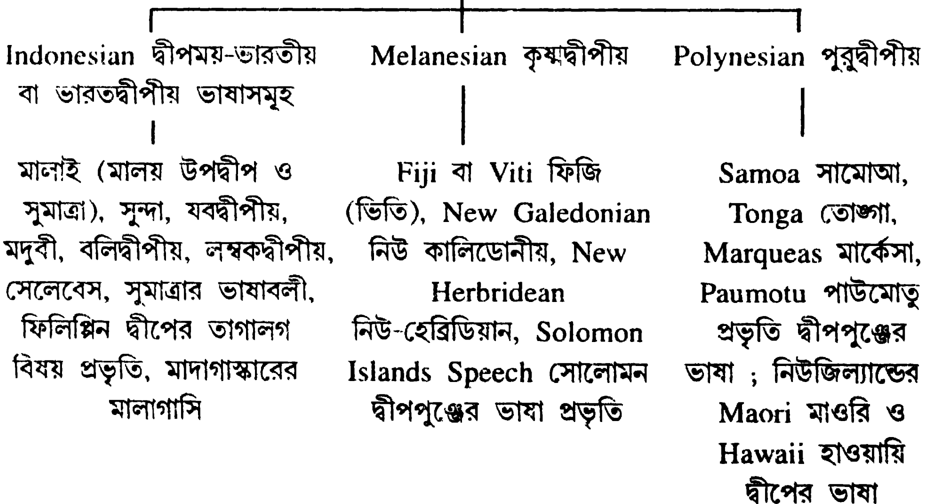
দাক্ষিণ জাতির মানসিক ও আধ্যাত্মিক এবং ধার্মিক জীবন সম্বন্ধে আমাদের প্রাচীন প্রমাণ তেমন কিছুই নাই। বৈদিক সাহিত্য হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যযুগ পর্যন্ত সংস্কৃতাদি সাহিত্যে কচিৎ কখনও দুই-চারিটি কথা বা আভাস যাহা পাওয়া যায়, তাহা লইয়া বিচার তো করিতেই হয় ; এতদ্ভিন্ন ভারতের ও ভারতের বাহিরের দাক্ষিণ ভাষা-ভাষী জনসমূহের ভাষা, রীতি-নীতি, ধর্ম ও অনুষ্ঠান, মানসিক প্রবণতা ও ধর্ম-বিশ্বাস—এই সবেরও আলোচনা করিতে হয়।

দাক্ষিণ শ্রেণির ভাষাগুলিকে এইভাবে শ্রেণিবন্ধ করা হয়। এগুলি দুইটি প্রধান বিভাগে

পড়ে—(১) Austro-Asiatic বা দক্ষিণ-আসিয়াস্থিত, ও (২) Austronesian বা দক্ষিণ-দ্বীপপুঞ্জাশ্রয়ী।

এই দুই বিভাগের অন্তর্গত ভাষাগুলির পরস্পরের সম্বন্ধ ও এগুলির অবস্থান নীচে দেওয়া দুইটি বংশলতিকা দ্বারা দেখানো যাইতেছে।





এইসমস্ত বিভিন্ন ও তৎসংশ্লিষ্ট সংস্কৃতির আলোচনার আধারে, আদিযুগের দাক্ষিণ সংস্কৃতি ভারতবর্ষে কী ভাবের ছিল তাহার বিচার ও অনুমান করা চলে। তবে মোটামুটি বলা চলে যে ধর্ম-জগতে লিঙ্গ-প্রতীকে পূজা আংশিকভাবে দাক্ষিণ জাতির দান। পুনর্জন্মবাদ দ্রাবিড়দের নিকট হইতে না হইয়া দাক্ষিণদের নিকট হইতে প্রাপ্ত বলিয়া মনে হয়—আর্যদের মধ্যে পুনর্জন্মবাদ উদ্ভূত হয় নাই বলিয়াই মনে হয় ; আর্য মতে, মৃতব্যক্তি পিতৃলোকে বা এক অনির্দিষ্ট পরলোকে পূর্বপুরুষদের সঙ্গে মিলিত হইত ; এই প্রকার আবছা-আবছা ধারণাই তাহাদের সম্বল ছিল। খাদ্যাদি সম্বন্ধে ধার্মিক নিষেধ—taboo—দাক্ষিণদের মধ্যে বিশেষ প্রবল ছিল। বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধে কতকগুলি ধারণা দাক্ষিণদের নিকট হইতেই হিন্দু পুরাণে গৃহীত হইয়াছিল। বিশ্বপ্রপঞ্চকে অণ্ডবৎ (ব্রহ্মাণ্ড-বৎ) কল্পনা, এবং মৎস্য কূর্ম বরাহ প্রভৃতি অবতারের কল্পনা, মূলত ইহাদেরই বলিয়া মনে হয়। চন্দ্রের তিথি ধরিয়া কাল নিরূপণও সম্ভবত ইহাদেরই রীতি ছিল। কতকগুলি উপাখ্যান (যেমন মৎস্যগন্ধার উপাখ্যান) মূলে দাক্ষিণ জাতির। Totemism বা কোনো মানবেতর প্রাণীকে মানববংশ-বিশেষের আদিপুরুষরূপে কল্পনা ইহাদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। মৃতের বৃক্ষসমাধি (মহাভারতে যাহার উল্লেখ আছে), এবং মৃতের উপর স্তূপ রচনা, ইহাও দাক্ষিণ জাতির মধ্যে প্রচলিত রীতি ছিল। পূর্ব ভারতে হিন্দু বিবাহে 'স্ত্রীআচার', এবং সিন্দূর হরিদ্রা প্রভৃতির ব্যবহার, দাক্ষিণ জাতিরই রীতি ছিল বলিয়া মনে হয়। বাঙ্গালাদেশে (বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে) যে ধর্মপূজা প্রচলিত আছে, তাহার সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের কোনো যোগ নাই ; অনুমিত হয় যে, এই ধর্মপূজা হইতেছে বঙ্গাদেশের অধিবাসী দাক্ষিণ-জাতির বিশিষ্ট বস্তু ; প্রচলিত ধর্মের বিকৃত অবশেষ। এই ধর্মের দুইটি প্রধান অনুষ্ঠান হইতেছে লুইয়ের নামে পাঁঠা উৎসর্গ করা এবং ধর্মের গাজন—এই দুইটি বস্তু প্রাচীন দাক্ষিণ জাতির লোকেদের মধ্যে প্রচলিত ধর্মপূজার সঙ্গে হিন্দু বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনেক কিছু মিলিয়া গিয়া জিনিসটিকে সম্পূর্ণ মিশ্রিত বা হিন্দু-ভাবাপন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। [এ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য মৎপ্রণীত প্রবন্ধ, India and Polynesia : Austric Bases of Indian Civilisation and Thought—*Bharata-Kaumudi* (Studies in Indology in honour of Dr. Radha Kumud Mookerji) Part I, Allahabad 1945, pp. 193-208]।

ইহা তো হইল মিশ্র ভারতীয় সভ্যতায় প্রাচীন নিষাদ বা দাক্ষিণ-জাতির আহৃত উপাদানের কথা। নিষাদ বা প্রাচীন দাক্ষিণ-জাতির ভাষার—প্রাচীন যুগের কোল ও মোন-খ্মের গোষ্ঠীদ্বয়ের দাক্ষিণ ভাষার শব্দ কীভাবে প্রাকৃত সংস্কৃত ও আধুনিক আর্য ভাষায় প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারও আলোচনা কিছু কিছু হইয়াছে। [লক্ষণীয়—ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচির Pre-Aryan and Pre-Dravidian in India : Calcutta University, 1929 : Jean Przyluski ঝাঁ পশিলুস্কি, Jules Bloch ঝ্যুল ব্লক ও Sylvain Levi সিল্‌ভ্যাঁ লেভি কর্তৃক লিখিত কতকগুলি ফরাসি প্রবন্ধের অনুবাদ ও তৎসঙ্গে মুদ্রিত অন্য কতকগুলি প্রবন্ধ ; এবং মৎপ্রণীত প্রবন্ধ Two New Indo-Aryan Etymologies, *Zeitschrift fuer Indologie,* Berlin, 1932, এবং Non-Aryan Elements in Indo-Aryan, *Journal of the Greater India Society,* 1936, Vol. III, pp. 43 ff ; দ্রাবিড় ভাষায় আগত দাক্ষিণ ভাষার শব্দের আলোচনা কোচিন

এরনাকুলম-এর অধ্যাপক ল-ব রামস্বামী অয়্যর তাঁহার একটি প্রবন্ধে ইতিপূর্বে করিয়াছেন।]

ভারতের কোল-বংশীয় দাক্ষিণ-জাতির ও কোল-ভাষার সম্বন্ধে হঙ্গেরীয় লেখক Vilmos Hevesy ভিলমশ হেভেশি কিছুকাল হইল একটি নূতন মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, কোল-ভাষা Ural উরাল (অথবা Finno-Ugrian ফিন্নো-উগ্রীয়) গোষ্ঠীর সহিত সম্বন্ধ—ভারতের বাহিরের মোন-খ্‌মের ও Austronesian দক্ষিণ-দ্বীপাশ্রয়ী ভাষাগুলির সঙ্গে নহে। হেভেশির মতে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে এই Finno-Ugrian ফিন্নো-উগ্রীয়-ভাষী কোনো জাতি নিজ ভাষা লইয়া ভারতে আসে, এবং ভারতের আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে মিলিত হইয়া কোল-জাতিতে পরিণত হয়। ফিন্নো-উগ্রীয় ভাষা-গোষ্ঠীতে আসে—Hungarian হঙ্গেরীয় বা Magyar মজর, Finn ফিন, Esth এস্ত্, Lapp ল্যাপ, এবং রুশ-দেশের কতকগুলি স্বল্প-সংখ্যক লোকের মধ্যে প্রচলিত আদিম-জাতীয় ভাষা, যথা Vogul ভোগুল, Ostyak ওস্ত্যাক, Mordvin মোর্দ্‌ভিন, Cheremis চেরেমিস, Siryen সির্‌য়েন প্রভৃতি ; এবং এই গোষ্ঠী, Altaic আলতাই-গোষ্ঠীর ভাষা তুর্কি মোঙ্গোল মাঞ্চু প্রভৃতির সহিত সংযুক্ত। হেভেশির এই মত এখনও ভাল করিয়া যাচাই করিয়া দেখা হয় নাই—তবে মনে হয়, এই মত যুক্তি বা বিচার-সহ নহে, দাক্ষিণ ভাষাসমূহের যে বংশ-চিত্র পূর্বে দেওয়া হইয়াছে, তাহাই এখনও মানিতে হয়,—ফিন্নো-উগ্রীয় গোষ্ঠীর সহিত কোল ভাষার সংযোগ এখনও প্রমাণিত হয় নাই-ই বলিতে হয়।

আধুনিক কোল-জাতি, সুপ্রাচীন দাক্ষিণ বা নিষাদ-জাতির বংশধর। ভাষাগত অল্প-বিস্তর পার্থক্য ধরিয়া এই জাতির গণ-সমূহকে কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, তন্মধ্যে সর্বপ্রধান হইতেছে এই কয়টি : (১) সাওঁতাল, সংখ্যায় প্রায় ২৭ লাখ ; দাক্ষিণ, দ্রাবিড় ও মোঙ্গোল নির্বিশেষে ভারতের Aborigines আদিবাসী বা ভূমিপুত্র গণ-সমূহের মধ্যে সাঁওতালদের সংখ্যা সবচেয়ে অধিক। সাওঁতাল পরগনায়, মানভূমে, সিংহভূমে, বাঙ্গালা দেশে, উড়িষ্যায় এবং আসামের চা-বাগানসমূহে সাওঁতালদের বাস ; (২) মুন্ডারি-ভাষী মুন্ডাজাতি, সংখ্যায় ৬৷৷০ লাখ, রাঁচিকে কেন্দ্র করিয়া ইহাদের বাস ; (৩) হো, সংখ্যায় ৪৷৷০ লাখ, চাঁইবাসার আশেপাশে ইহাদের অধিষ্ঠান-ভূমি ; (৪) খাড়িয়া, ১ লাখ ৮০ হাজার ; (৫) ভূমিজ, ১ লাখ ১৩ হাজার ; (৬) কোর্‌কু—বহ্রাড় (বেরার) ও মধ্যপ্রদেশ, ১ লাখ ৬০ হাজার ; এবং উড়িষ্যায় (৭) শবর, ১ লাখ ১৬ হাজার ও (৮) গদব, ৪৪ হাজার।

ইউরোপীয় ভাষাতাত্ত্বিকদের পরিভাষায়, Austric অর্থাৎ দাক্ষিণ ভাষার অন্তর্গত Austro Asiatic বা দক্ষিণ-আসিয়াস্থিত বিভাগের এই কোল-শাখাকে Munda "মুন্ডা" নামে সাধারণত অভিহিত করা হয়। কিন্তু "মুন্ডা" নামটি তেমন উপযোগী নহে। ভারতবর্ষে ইহা কেবল কোল-জাতির একটি বিশিষ্ট গণকে বুঝাইতে প্রযুক্ত হয়—রাঁচির আশপাশের কোল জাতীয়দের জন্য সীমিত এই নামকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহারের কোনো আবশ্যকতা নাই। Kol "কোল" এই নামটি ইহা অপেক্ষা অধিকতর উপযোগী। উড়িয়া, বাঙ্গালী ও বিহারিরা "কোল" বলিলে, দ্রাবিড়-ভাষী ওরাওঁ, কন্ধ এবং মাল-পাহাড়িদের বাদ দিয়া, মুন্ডা, হো, সাওঁতাল, ভূমিজ, খাড়িয়া, কোর্‌কু প্রভৃতিদেরই বুঝে ; সুতরাং এই ব্যাপক

সংজ্ঞা ব্যবহার করাই ভাল। কোলদের নাম হইতে ছোটোনাগপুরের একটি অঞ্চলের নাম হইয়াছে "কোল্‌হান" অর্থাৎ কোলদের দেশ (যেমন "ভোটান" = ভোটদের দেশ, "গোন্ডবানা" = গোন্ডদের দেশ, "রাজপুতানা" = রাজপুতদের দেশ, "ইরান" বা "এরান" = আর্যদের দেশ)। আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার এই "কোল" শব্দটি, মধ্যযুগের ভারতীয় আর্যভাষার (প্রাকৃতের) "কোল্ল" শব্দ হইতে উদ্ভূত । মধ্যভারতের অরণ্যপর্বতবাসী অনার্য নিষাদগণকে এখন হইতে দেড় হাজার বছর আগে "ভিল্ল" ও "কোল্ল' বলিয়া উল্লেখ করা হইত। "কোল" শব্দটি অর্বাচীন সংস্কৃতেও পাওয়া যায়—ইহার অর্থ হইতেছে 'শূকর'—এটি একটি জাতিবাচক নামের ঘৃণাপ্রকাশক অপপ্রয়োগ মাত্র। সাওঁতালেরা নিজেদের "হড়" বলে, মুন্ডারা বলে "হোড়ো", হো-রা বলে "হোও" বা "হো" (হো-ভাষায় ড়-ধ্বনি লোপ পায়), এবং কোর্‌কু-রা বলে "কোরো" ; উহাদের ভাষায় এই শব্দের অর্থ হইতেছে—'মানব বা মানুষ'। বহু জাতির মধ্যে স্বকীয় নাম হিসাবে তাহার ভাষায় এই শব্দের অর্থ হইতেছে—'মানব বা মানুষ'। বহু জাতির মধ্যে স্বকীয় নাম হিসাবে তাহার ভাষার মানব-বাচক শব্দ ব্যবহৃত হইত, "কোল" জাতি তাহাদের মধ্যে অন্যতম। কোল-জাতির দৃষ্টিতে, সমগ্র মানব-জাতি দুইটি বিভাগে বিভক্ত—এক, সত্যকার মানব, "হোড়ো, হড়, কোরো", যাহাদের ভাষা বুঝি, ও যাহারা আমাদের আপন জন ; এবং দুই, যাহাদের ভাষা বুঝি না, যাহারা পর, তাহারা হইতেছে Diku "দিকু"। ইহা যেন প্রাচীন আর্যদের বা হিন্দুদের "আর্য" ও "ম্লেচ্ছ" বা "বর্বর", গ্রিকদের Hellenes ও Barbaroi, ইহুদিদের Benim Israel ও Goyim বা Gentiles অর্থাৎ 'জাতি-সমূহ', জরমানিক জাতির Thiudiskoz ও Walhoz, শ্লাবদের Slavu ও Nyemetsu, আরবদের "আরব" ও "আজম"—এইরূপ 'স্বজাতি' ও 'বিজাতি' এই দুই ভাগে মানব-জাতিকে বিভক্ত করার মতো। এখন, ইহা অনুমিত হয় যে আধুনিক কোল-ভাষীদের "হোড়ো, হড়, কোরো" প্রভৃতি শব্দের একটি প্রাচীন রূপ, দেড়-হাজার দুই-হাজার বৎসর পূর্বে আর্য-ভাষীদের কানে যেরূপ শুনাইয়াছিল, তাহারই আধারে প্রাকৃতের "কোল্ল" শব্দ গঠিত হইয়াছে। অর্থাৎ "কোল্ল" শব্দকে প্রাচীন কোল-ভাষায় মানব-বাচক শব্দ বলিয়া ধরিতে পারি ; তাহারই আধুনিক রূপ, এই জাতির স্বকীয় নামের অন্যতম প্রাচীন রূপ বলিয়া, এই জাতির পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী নাম। Kolarian বলিয়া একটি নাম ইংরেজিতে ইহাদের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইত, কিন্তু অর্থহীন বলিয়া তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

কোলদের জ্ঞাতি, সমতল নদীমাতৃক পাঞ্জাব, হিন্দুস্থান ও বাঙ্গালা দেশের অধিবাসী দাক্ষিণ-জাতির নানা গণ, দেশের অন্য জাতীয় অধিবাসী দ্রাবিড় ও আর্যদের সঙ্গে মিশিয়া এখন উত্তর ভারতের হিন্দু (অথবা মুসলমান-ধর্মান্তরিত) জনসমূহের মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে, এ কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। বন ও পাহাড়ের দেশ মধ্য-ভারত ও ছোটোনাগপুরে ইহাদের সংস্কৃতি একটু অন্য ধরনের হইতে বাধ্য হয়—কৃষি ও পশু (গো, মহিষ, শূকর) পালনের সঙ্গে সঙ্গে মৃগয়া ইহাদের আজীবিকার একটি প্রধান উপায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু কৃষিকে (বিশেষত গো-মহিষ ও লাঙল যোগে) ধান চাষকে ইহারা সভ্য জীবনের ও উন্নত জীবনের প্রথম অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত হইতেছিল। ইহারা ধীরে ধীরে মধ্য-ভারতের ও ছোটোনাগপুর ঝাড়খণ্ডের অরণ্যকে কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করিতেছিল।

ইহাদের আদিম সংস্কৃতি, ধর্মমত প্রভৃতি, নানা দিকে পরিবর্তিত হইয়া যায় ; Bir-Buru "বির-বুরু", অর্থাৎ অরণ্য ও পর্বতের মধ্যে বাস করার দরুন, Ote-Serma "অতে-সের্‌মা" অর্থাৎ ধরিত্রী ও আকাশ, অথবা দ্যাবা-পৃথিবী, আসমান-জমিন বা স্বর্গ-মর্ত সম্বন্ধে ইহাদের ধারণাও পরিবর্তিত হয়—বিশিষ্ট প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিকের মধ্যে ইহারা একটি স্বকীয় বিশিষ্টতা লাভ করে। কোলদের জীবনযাত্রা-পদ্ধতি ও সংস্কৃতি তাহাদের অধুনা-অধ্যুষিত দেশ ছোটোনাগপুরের অরণ্য ও পর্বত-অঞ্চলেই গড়িয়া উঠিয়াছে।

বাঙ্গালার প্রত্যন্ত বা সীমান্ত প্রদেশে এই দেশ ; বাঙ্গালার "সামন্ত" বা "সমন্ত" অর্থাৎ সীমাসংলগ্ন ভূখণ্ডে যে কোল জনগণ বাস করিত, দ্বিসহস্রাধিক বর্ষ পূর্বে বাঙ্গালা দেশের আর্য-ভাষীরা তাহাদের নাম দেয় "সামন্ত-পাল", এবং প্রাকৃত "সবঁন্তরাল" শব্দের মধ্য দিয়া ইহা আধুনিক বাঙ্গালায় "সাওঁতাল" এই শব্দের রূপ ধরিয়াছে। "মুন্ডা" শব্দ তাহাদের পশ্চিমে অবস্থিত কোল জনগণের নাম—ইহা আর্যভাষার শব্দ—মূলে অনার্য হওয়া সম্ভব—কিন্তু ইহা এই জাতির লোকেদের প্রধানদের সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়। সাওঁতালদের মধ্যে সম্মানসূচক পদবি হইতেছে "মাঝি", ইহাও আর্যভাষার শব্দ—"মধ্য-মধ্যিক" হইতে উৎপন্ন ; অনুরূপ অর্থের শব্দ হইতেছে ভদ্রব্যক্তি-বাচক বাঙ্গালা মুসলমান পদবি "মিয়াঁ" যাহার অর্থ ফারসি ভাষায় হইতেছে 'মধ্য' বা 'মধ্যস্থ'।

মধ্য-যুগের বাঙ্গালা উড়িয়া বিহারি বা হিন্দি সাহিত্যে কোলদের কোনো উল্লেখ নাই। আর্য-ভাষার প্রসার ধীরে ধীরে কোল-অধ্যুষিত প্রদেশকে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর করিয়া ফেলিতেছিল, কিন্তু এই ভাষা-সংঘাতের কোনো ইতিহাস নাই। আর্যভাষীর সংস্পর্শে আসিয়া ইহারা নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতি হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছিল, এবং প্রায় সর্বত্র হিন্দুসমাজের নিম্নস্তরের জাতিগুলিতে পরিণত হইতেছিল। হয়তো কচিৎ ইহাদের রাজা বা স্থানীয় ভূম্যধিকারী, ব্রাহ্মণ্যধর্ম গ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয় বলিয়া ধীরে-ধীরে গৃহীত হইতেছিল—কিন্তু ভাষা-ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে, সাংস্কৃতিক অধঃপতনই হইতেছে ইহাদের অতি আধুনিক ইতিহাস।

প্রাচীনকালে অরণ্যবাসী কোলদের সম্বন্ধে, অর্থাৎ ভিল্ল-কোল্ল-নিষাদ-শবর-পুলিন্দদের সম্বন্ধে, আমাদের পূর্বপুরুষগণ খুব বেশি কৌতূহল দেখান নাই। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে বাণভট্ট তাঁহার "শ্রীহর্ষচরিত" গ্রন্থের অষ্টম উচ্ছ্বাসে জনৈক শবর-যুবকের বর্ণনা খুঁটিনাটির সহিত করিয়াছেন। বিন্ধ্যাচলের শবরগণ স্থানীয় দেবী বিন্ধ্যবাসিনীর উদ্দেশে নরবলিদানের সময় উপস্থিত হইয়াছেন—হয় তো বা ইহার বর্ণনা "গউড়বহ" নামে নবম শতকের প্রাকৃত-কাব্যে পাওয়া গেল ; হয় তো কোনো পুরাণে কেবল ইহাদের নামমাত্র উল্লিখিত হইল। পুরাণে নানা স্থানে পুলিন্দ শবর প্রভৃতিদের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা উপাখ্যান আছে। "কথাসরিৎসাগর" গ্রন্থে মধ্যভারতবাসী পুলিন্দদের সম্বন্ধে বর্ণনা পাওয়া যায়। "বৃহৎকথা-শ্লোকসংগ্রহ" পুস্তকে ইহাদের মধ্যে প্রচলিত বেশ কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনির বিবরণ পাওয়া গিয়াছে।

ইউরোপীয় বিদ্বজ্জনের কৌতূহল ইহাদের সম্বন্ধে আমাদের প্রথম নূতন করিয়া সচেতন করিয়া দিল, বিগত শতকের মধ্যভাগ হইতে। ইংরেজ রাজ্য স্থাপিত হওয়ার কিছু পরেই,

ছোটোনাগপুরে ইহাদের সংস্পর্শে ইংরেজ রাজপুরুষদের আসিতে হইল ; এবং তৎপরে বিগত শতকের দ্বিতীয় অর্ধ হইতে খ্রিস্টীয় মিশনারিগণও ইহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন। তখন ইহাদের ভাষা রীতি-নীতি ধর্ম প্রভৃতির চর্চা আরম্ভ হইল। মিশনারিরা বাঙ্গালা ও দেবনাগরি এবং রোমান অক্ষরে ইহাদের ভাষা লিখিয়া এবং ইহাদের ভাষায় বাইবেল আদির অনুবাদ করিয়া, এবং ইহাদের মধ্যে প্রচলিত মৌখিক পুরাণ-কাহিনি গান ছড়া প্রভৃতি ধীরে-ধীরে সংগ্রহ করিয়া, ইহাদের ভাষায় সাহিত্যের সৃষ্ট ও সংরক্ষণ করিলেন, এবং খ্রিস্টান ধর্মের সাহায্যে হিন্দু সমাজের নিম্নস্তরে ইহাদের বিলীন হইয়া যাওয়া অনেক অংশে বন্ধ করিয়া দিলেন। ক্রমে বিদেশি মিশনারিদের দলের বাহিরে, আমাদের মধ্য হইতেই ইহাদের সম্বন্ধে দরদি অনুসন্ধিৎসু ও ইহাদের অকৃত্রিম বন্ধু বাহির হইলেন ; কোল ও অন্য বন্য জাতিদের এইরূপ উদারহৃদয় প্রেমীদের মধ্যে রাঁচির স্বর্গীয় রায়বাহাদুর শরৎচন্দ্র রায় মহাশয়ের পুণ্য নাম প্রথম করিতে হয়। ইঁহার পূর্বে বাঙ্গালী সরকারি কর্মচারীদের কেহ-কেহ ইহাদের সম্বন্ধে সহানুভূতির দৃষ্টিতে আলোচনা করেন, যেমন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—কোলদের বর্ণনা করিয়া লেখা ইঁহার সরস ভ্রমণ-কথা "পালামৌ" ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বাহির হয়। তাহার পরে সাওঁতালদের ও কচিৎ অন্য কোল জনগণের জীবনকথা লইয়া বাঙ্গালী লেখকের ছোটো গল্প বাহির হইয়াছে, সাওঁতাল রূপকথার সংগ্রহ এবং কচিৎ কবিতার অনুবাদও বাঙ্গালায় বাহির হইয়াছে। বাঙ্গালী শিল্পী সাওঁতাল ও অন্য কোলদের সংস্পর্শে আসিয়া বিশেষ প্রীতির সঙ্গে তাহদের জীবনের চিত্র আঁকিয়াছন। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর মতো শিল্পীর কথা বলিতে হয়—নন্দলালের আঁকা রঙিন ও একরঙা বহু চিত্র ও রেখাঙ্কন সাওঁতালি জীবন ও সাওঁতালি মেয়ে পুরুষদের লইয়া, এই জাতির সম্বন্ধে তাঁহার অসীম স্নেহভাবের পরিচায়ক। শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী কলাভবনের শিল্পীরা এ বিষয়ে তাঁহাদের গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন,—তাঁহাদের তুলিকায় সাওঁতালি জীবনের ছবি অক্ষয় হইয়া থাকিবে। নন্দলাল ও তৎশিষ্যগণের বহু বহু প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত চিত্রে সাওঁতাল জীবনের নানা দিক প্রদর্শিত হইয়াছে—বেশির ভাগ ইহাদের ঘরোয়া জীবন ; যেমন সাওঁতাল যুবক বাঁশি বাজাইয়া চলিয়াছে, সঙ্গে তাহার স্ত্রী বা প্রণয়িনী ; সাওঁতাল রাখাল বালক ; সাওঁতাল শিশু ও মাতা ; সাওঁতাল মেয়েদের সারি দিয়া গমন ; নাচের দৃশ্য ; ধান রোয়া ও ধান কাটার দৃশ্য ; সাওঁতাল ঘরবাড়ি, গ্রাম ; ইত্যাদি ইত্যাদি। বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য নন্দলালের বৃহৎ চিত্র, মাদল-বাদকের সঙ্গে কয়েকটি সাওঁতাল কন্যার নৃত্য—ইহা তাঁহার এক মহনীয় কৃতি। শিল্পী শ্রীযুক্ত যামিনী রায়ও সাওঁতালকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই—বহু পূর্বে আঁকা তাঁহার একখানি ছোটো ছবি উল্লেখযোগ্য—পাহাড়ে নদীর জল জমিয়া একটি ছোটো ও স্থির জলাশয়ের সৃষ্টি করিয়াছে, মাথায় পলাশ ফুল গুঁজিয়া প্রসাধন কার্যে নিরত একটি সাওঁতাল মেয়ে আরশির মতন তাহাতে নিজের মুখ দেখিতেছে ; সাওঁতালি নাচের দৃশ্যও তিনি তাঁহার নিজ বিশিষ্টতাময় রেখাপাতের দ্বারা অঙ্কিত করিয়াছেন। মোট কথা, আধুনিক শিক্ষিত বাঙ্গালীর চোখে সাওঁতাল বা কোল জীবন তাহার আদিম সারল্য লইয়া একটি আদরের বস্তু, এমনকি কতকটা যেন আদর্শ জগতের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইউরোপীয় লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গি মুখ্যত বস্তুতান্ত্রিক ও

বৈজ্ঞানিক ; সাওঁতালি ও অন্য কোল ভাষার মৌখিক সাহিত্য, এবং কোল জীবন, ধর্মবিশ্বাস, সংস্কৃতি প্রভৃতি লইয়া যেসব বই ও প্রবন্ধ ইংরেজি ও অন্য ইউরোপীয় ভাষায় লিখিত হইয়াছে, সেগুলির বৈজ্ঞানিক মূল্য অসাধারণ, সেগুলি নানা তথ্যের ভাণ্ডার ; এই বৈজ্ঞানিক সাহিত্য রচনায় দুই-চারিজন ভারতীয়ের—বাঙ্গালীর—দানও আছে।

পরম্পরাগত আদিম জীবনের ধারা যথাসম্ভব অব্যাহত রাখিয়া আসিয়াছে বলিয়া কোল-ভাষী জনগণকে ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন জাতি বলা চলে। প্রাচীন জাতি ও বনচারী জাতি বটে—কিন্তু ইহারা অতি পরিচ্ছন্ন জাতি, নানা নৈতিক গুণে মণ্ডিত জাতি, সম্পূর্ণরূপে ভালোবাসার যোগ্য জাতি। তাহাদের আদিম এবং অজ্ঞ বনবাসী অবস্থায় তাহাদিগকে শিশু-মনোবৃত্ত বলা চলে—সরল, সত্যবাদী, সৎ এবং সব বিষয়ে সোজাভাবে তাহারা বিচার করিতে ও চলিতে অভ্যস্ত। কিন্তু আমাদের ধনমূলক 'সভ্যতা' এখন তাহাদের সারল্য নষ্ট করিতে লাগিয়া গিয়াছে। তাহাদের নূতন অভাব দেখা যাইতেছে ; ভারতের অন্য অংশ হইতে অর্থনৈতিক ও অন্য দিকে তাহারা আর স্বতন্ত্র থাকিতে পারিবে না। তাহাদের সারল্যের ও অজ্ঞানের সুবিধা লইয়া হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে ভারতীয় এবং রোমান-ক্যাথলিক ও প্রটেস্টান্ট অথবা জারমান-বেলজীয়-ইংরেজ-নির্বিশেষে বিদেশীয় "দিকু"রা তাহাদের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নানা হানি করিয়াছে। কিন্তু এখনও তাহারা কোমল প্রকৃতির এবং শান্তিপ্রিয় মানবই রহিয়াছে ; তাহারা কঠোর পরিশ্রমী, নিজেদের সামান্য অভাব-মোচনে নিজেরাই তৎপর, এবং তদুপরি সদানন্দ জাতি ; তাহারা সকলেই মাদল-বাজানো, নাচ ও গান ভালবাসে, এবং সময় পাইলেই তাহার দ্বারা চিত্তবিনোদন করে। তাহাদের পারিবারিক জীবন সাধারণত নিষ্পাপ, প্রকৃতির আবেষ্টনীর মধ্যে তাহারা স্বস্থ এবং স্বাভাবিক জীবন যাপন করে। নর-নারীর প্রেম ইহাদের কবিতায় ও রূপকথায় একটা লক্ষণীয় অংশ জুড়িয়া আছে,—ইহাদিগের দৃষ্টিভঙ্গি দেখিয়া ইহাদিগকে romantic বা রমন্যাসপ্রিয় জাতি বলিতে পারা যায়। আমাদের আধুনিক নগরিয়া সভ্যতার নানা পঙ্কিলতা ও আবর্জনার পাশে ইহাদের এই সরল বন্য বা গ্রাম্য জীবন পবিত্র ও কাব্যময় বলিয়া মনে হয়। বিহারের সুপরিচিত সিভিলিয়ান আদিবাসীদের দরদী বন্ধু শ্রীযুক্ত W. G. Archer আর্চার সাহেব ওরাওঁ-দের কথা লইয়া রচিত তাঁহার অতি সুন্দর পুস্তক *The Blue Grove* (London, 1940)-এ দ্রাবিড়-ভাষী ওরাওঁদের সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা এক-ই প্রাকৃতিক আবেষ্টনী এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত কোলদের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য : A few notes should be added on Uraon 'character'. To the earliest observers, a capacity for cheerful hard work was the most notable character of the Uraons ; and a sturdy gaiety, an exultation in bodily physique and a sense of fun are still their most obvious qualities. These are linked to a fundamental simplicity—a tendency to see an emotion as an action, and not to complicate it by postponement or obligation ... the final picture is of a kindly simplicity and smiling energy.

কোলদের ধর্মকে আধুনিক নৃতত্ত্ব-বিদ্যায় Animism অর্থাৎ "অজ্ঞাত-দেবশক্তি-বাদ"

পর্যায়ে ফেলা হইয়াছে। এই মত বা বাদ বা বিশ্বাস অনুসারে, প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে এক অদৃষ্ট অজ্ঞাত দৈবী শক্তি বা আত্মা কার্যকর হইয়া সদা-বিদ্যমান আছে। সেই শক্তি কখনও মানুষের শত্রু, কখনও মিত্র ; নানাভাবে পূজা-উপচারের দ্বারা, সেই শক্তিকে, শত্রু হইলে দূর করা বা শান্ত রাখা, এবং মিত্র হইলে তাহাকে পরিপোষক করিয়া রাখা, এই ধর্মের অনুষ্ঠান রূপে দেখা দেয়। কোলেরা পর্বত, নদী, বৃক্ষ, প্রভৃতিতে, ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর মধ্যে অবস্থিত বলিয়া কল্পিত দেবশক্তি বা দেবতাত্মা বা দেবপ্রাণের বিভিন্ন প্রকাশ বা মূর্তিকে, Bonga "বোঙ্গা" বা "বঙ্গা" নামে অভিহিত করে। আকাশ পাহাড় ভূমি নদী বন গ্রাম বাড়ি মাঠ—সর্বই অদৃশ্য বোঙ্গাদের অধিষ্ঠান-ভূমি ; আবার বিশেষ করিয়া পাহাড়ে বনে গিরিগুহায় গাছের মধ্যে, পাহাড়িয়া নদী বা ঝরনার মধ্যে, এবং মাটির ভিতরেও দেবতারূপে কল্পিত এই বোঙ্গাদের বাস। সকল বোঙ্গার উপরে কিন্তু একজন পরম বোঙ্গা, প্রধান দেবতা বা পরমেশ্বর আছেন, Singi-Bonga "সিঙ্গি-বোঙ্গা", Sin-Bonga "সিঞ্‌-বঙ্গা" বা Sing-Bonga "সিং-বোঙ্গা" ; ইহাঁকে আর্যভাষীদের ভাষায় সাঁওতালেরা কখনো-কখনো "ঠাকুর বাবা" বলিয়াও অভিহিত করে। ইহার কাছে সাঁওতাল ও অন্য কোলদের চরম আবেদন উদ্দিষ্ট হয়। সিং-বোঙ্গা হইতেছেন সমস্ত বিশ্বের অদৃষ্ট সৃষ্টিকর্তা, সকলের পালক, পোষক ও শাসক, সকলের চেয়ে মহান প্রধান দেবতা, মানুষের পাপ-পুণ্যের, সকল কাজের দ্রষ্টা ও সাক্ষী ; মানুষ দুঃখ-কষ্টে তাঁহার কাছে প্রার্থনা জানাইয়া আরাম বা স্বস্তি পায়, এবং তিনি আপৎকালে মানুষকে প্রতীকারের উপায় জানাইয়া দেন। এই পরমেশ্বর পরমাত্মা হইতেছেন, কোলদের ভাষায়, "মারাঙ্-উতেনি"—'সকলের চেয়ে মহান' ; তাঁহাকে "হানি" অর্থাৎ 'উনি, ওই পুরুষ' বলিয়া অনেক সময়ে অভিহিত করা হয়। এই পরমাত্মার প্রচলিত নাম "সিং-বোঙ্গা" শব্দের "সিং"-অর্থে দিন, বা সূর্য ; ইঁহাকে সূর্যের অধিষ্ঠাতা আলোকের দেব বলিয়া উল্লেখ করা হয়। আলোর সঙ্গে ইঁহার যোগ স্মরণ করিয়া কোল-জাতীয় "সোকা" বা "দেওঁড়া" অর্থাৎ পুরোহিত ও ভবিষ্যদ্‌বক্তারা কখনো-কখনো সিং-বোঙ্গার উদ্দেশে সাদা মোরগ বা পাঁঠা বলি দিয়া থাকে। সিং-বোঙ্গা আর সমস্ত বোঙ্গার স্রষ্টা। "বোঙ্গা" শব্দ আজকাল সাধারণত দেবতা অর্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু Korwa কোর্‌বা প্রভৃতি দুই-একটি ভাষার নজিরে এবং মুন্ডারি প্রভৃতি ভাষার প্রাচীন প্রয়োগ দেখিয়া মনে হয়, "বোঙ্গা" শব্দের মূল অর্থ ছিল 'চাঁদ'। আজকাল সাঁওতালি মুণ্ডারি প্রভৃতিতে 'চাঁদ' ও 'সূর্য' উভয়কেই বুঝাইবার জন্য আর্যভাষার শব্দ "চান্দো, চান্দুক" শব্দ ব্যবহৃত হয় ; এবং চাঁদের জন্য "বোঙ্গা" শব্দ ব্যতিরেকে অন্য দুইটি শুদ্ধ কোল শব্দ আছে—খাড়িয়া ও জুয়াঙ, "লেরাঙ" শবর "আঙাই", গদব "আঙায়িতা"। "সিং" অর্থে 'দিন বা সূর্য' ; "ঞিন্দা, নিদা" অর্থে 'রাত্রি' ; এইজন্য চাঁদ অর্থে "ঞিন্দা চান্দো" বা "ঞিন্দা বোঙা" শব্দও কোল-ভাষায় (সাওঁতালি ও মুন্ডারিতে) পাওয়া যায়। "সিং-বোঙ্গা" (অথবা "সিং-চন্দো"—"চান্দো" এখানে 'সূর্য' অর্থে) অর্থাৎ 'দিনের বা আলোর দেবতা', যেন পরমেশ্বর বা দেবরাজ, এবং "ঞিন্দা চান্দো" অর্থাৎ রাত্রির দেবতা' চন্দ্রদেবী হইতেছে দেবতাদের রানি, সিং-বোঙ্গার স্ত্রী—সাওঁতালি ও অন্য কোল পুরাণে এইরূপ কল্পনা আজকাল পাওয়া যায়। "সিঞ্" = 'আলো, বা দিন, বা সূর্য', "ঞিন্দা" = 'আঁধার,বা রাত' ; এই দুইটি শব্দের এই প্রাচীন অর্থ এখনও সাঁওতাল সমস্ত

পদ "সিঞ্‌-ঞিন্দা"-তে ও মুন্ডারি "ঞিন্দা-সিঙি"-তে মিলে—"সিঞ্‌-ঞিন্দা" ও 'ঞিন্দা-সিঙি" মানে 'দিন-রাত', 'অনবরত'। মূল কোল-জাতির কল্পনায়, আমাদের 'আলো ও ছায়া শিব-শিবানী'র মত ঐশী শক্তির দুইটি বিকাশ রূপেই জ্যোতিঃ ও তমঃ অনুভূত হইয়াছিল, ইহা এই শব্দ দুইটি হইতে অনুমান করা অসংগত হইবে না। যাহা হউক, সিং-বোঙ্গার কল্পনায়, যে-কোনো সভ্য সমাজের মানুষের উপযোগী একটি দেব-কল্পনায় কোল-জাতি আসিয়া উপনীত হইয়াছিল, তাহা বুঝা যায়। প্রধান দেবতা সিং-বোঙ্গা এবং নানা অপ্রধান বোঙ্গা বা দেবতা ব্যতীত, কোলদের মধ্যে পিতৃপুরুষ বা প্রেতগণের সম্বন্ধেও বিশ্বাস আছে, এবং এই পিতৃপুরুষদের পূজার অনুষ্ঠানে কবিত্বময় বা কল্পনাপ্রবণ দৃষ্টিরও পরিচয় পাওয়া যায়। এখন কোলদের মধ্যে ধার্মিক ও সামাজিক জীবনে নানা হিন্দু ভাব ও অনুষ্ঠান প্রবেশ করিয়া গিয়াছে, এবং এখন ইহাদের মধ্যে খাঁটি কোল জিনিস ও হিন্দু জিনিস পৃথক করিয়া বিশ্লেষ করা কঠিন। লৌকিক বা গ্রাম্য হিন্দু ধর্ম-বিশ্বাসে ও অনুষ্ঠানে কোল (বা প্রাচীন দাক্ষিণ জাতির) জগৎ হইতে লব্ধ বহু ব্যাপার যে নিজ স্থান করিয়া লইয়াছে, তাহাও নিঃসন্দেহ। এ বিষয়ে পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

'সভ্যতা' বলিতে আমরা সাধারণত যাহা বুঝি, অর্থাৎ পার্থিব-বস্তু-নিষ্ঠ যান্ত্রিক সভ্যতা, যাহার ফলে বড়ো-বড়ো বাড়ি-ঘর, মন্দির-ইমারত, উচ্চ কোটির শিল্প, সাহিত্য, নাট্য, দর্শন, বিজ্ঞানের প্রসার প্রভৃতি—তাহা কোলদের নাই ; কিন্তু স্বকীয় প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিকের মধ্যে শান্তিতে ও মনের সুখে বাস করিবার উপযোগী মানসিক সংস্কৃতি তাহাদের আছে, তদুপযোগী সাধনও তাহারা গড়িয়া তুলিয়াছে। তাহাদের ভাষার সঙ্গে ও সমবেত জীবনের সঙ্গে এই সংস্কৃতি জড়িত। কোল জীবনে বিভিন্ন ঋতুতে পর্ব ও অন্য অনুষ্ঠান, তাহাদের হাট ও মেলা, তাহাদের নাচের রীতি, তাহাদের বাঁশি ও মাদল বাজানো এবং গান, তাহাদের সরল এবং আদিম মণ্ডন-শিল্প, তাহাদের ফুল ও রঙের প্রতি প্রীতি, বংশানুক্রমে প্রবাহিত তাহাদের গান কবিতা ছড়া ও রূপকথা এবং পুরাণকথার ধারা, এবং চারিদিকে আরণ্য প্রকৃতির সম্বন্ধে তাহাদের মনঃকল্পিত ভাবজগৎ ও চিত্তের রসানুভূতি—এই-সমস্তের মাধ্যমে এই-সংস্কৃতি সংরক্ষিত হইয়া আছে। এই-সমস্ত জীবনধারা ও ভাবধারাই ইহাদের জীবনকে ইহাদের নিকটে শোভন ও উপভোগ্য করিয়া রাখিয়াছে। এই-সমস্তকে নষ্ট করিয়া দিয়া, যদি কেবল ভৌতিক বা পার্থিব 'সভ্যতা', যাহার মুখ্য আবেদন হইতেছে দৈহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি, তাহা আসিয়া যদি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে সভ্যতার মধ্যেও মানুষ বর্বর হইয়া পড়ে। এরূপ 'সুসভ্য বর্বর' ইউরোপে ও আমেরিকায় দুর্লভ নহে, ভারতেও দুর্লভ নহে ; এই বর্বরেরা ধন এবং ধনায়ত্ত শক্তি ব্যতীত আর কিছুই বুঝে না। কিন্তু কোলদের জীবন আর তাহার সেই আদিম অবস্থায় থাকিতে পারিতেছে না। বাহিরের জগৎ—তাহাদের দেশে অর্থগৃধ্নু হিন্দু ও মুসলমান দিকুদের দলে-দলে আগমন এবং খ্রিস্টান মিশনারিদের বহুস্থলে অজ্ঞ এবং অন্ধ ধর্মপ্রচারের তাগিদ—তাদের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া তাহাদের বিভ্রান্ত করিয়া দিতেছে।

বিশেষভাবে সজ্ঞান এবং দলগত স্বার্থ-প্রণোদিত সক্রিয় চেষ্টা না থাকিলেও, হিন্দু ভাবধারা সহজ ভাবে ধীরে-ধীরে কোলদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে—হিন্দু প্রতিবেশীদের দেখাদেখি কোলেরা তাহাদের অনেক কিছু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই গ্রহণ করিয়াছে। ইহাতে

কোল-জীবনের প্রতিষ্ঠায় বা বুনিয়াদে আঘাত পড়ে নাই। কিন্তু খ্রিস্টান ধর্মের আগমনে তাহা হয় নাই। বিভিন্ন খ্রিস্টান ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে (এই শ্রেণির সমস্ত ধর্মমতেই এটি দেখা যায়) একটি বর্বরোচিত মনোভাব বিদ্যমান—পারমার্থিক সত্য তাহাদের একচেটিয়া সম্পত্তি, পরমেশ্বর কেবল তাহাদেরই হাতে নিজেকে ধরা দিয়াছেন। সুতরাং অন্য কোনো প্রকার ধার্মিক অনুভূতি তাহারা বুঝিতে চেষ্টাও করিবে না, এবং নির্মম ভাবে তাহার ধ্বংস করিলেই ঈশ্বরের অভিপ্রেত কার্য করা হয় (ঈশ্বরের কী অভিপ্রায় তাহা কেবল তাহারাই জানে, আর কেহ নহে), পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য স্থাপিত হয়। ইহার সঙ্গে-সঙ্গে আছে—ইউরোপীয় পার্থিব সভ্যতার দম্ভ, কোল প্রভৃতি আদিম আরণ্য সংস্কৃতির প্রতি ঘৃণাভাব। ইহার ফলে, অন্য নানা পশ্চাৎপদ জাতির মতো কোলদের সমূহ হানি হইয়াছে। হয়তো তাহারা পার্থিব জগতে কতকগুলি সুখ ও সুবিধা পাইয়াছে ; কিন্তু তাহার পরিবর্তে তাহাদের দুরপনেয় আত্মদৈন্য ঘটিয়াছে ; এবং এই আত্মদৈন্যের অর্থই হইতেছে আত্মাবনতি। আদিম জাতির মনোভাব যাহারা বুঝে না, সম্পূর্ণ বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে উদ্ভূত অন্য প্রকারের ভাবজগৎ বা চিন্তাজগৎ এবং জীবন-পদ্ধতির কোনো কোনো অংশ যাহারা একটি আদিম জাতির ঘাড়ে চাপাইয়া দিতে বদ্ধপরিকর, তাহাদের হাতে কোলদের মতো জাতিকে ছাড়িয়া দেওয়া একটি অমার্জনীয় অপরাধ হইয়াছে।

আমি নর-দেব বা ব্রহ্ম-নারায়ণ রূপে পূজিত মহাপুরুষ যিশু-খ্রিস্টের শিক্ষা ও আদর্শের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলিতেছি না। Skrefsrud (স্ক্রেফ্‌সরুড), Hoffmann (হফমান), Bodding (বডিং), Nottrott (নোট্‌রোট) প্রভৃতি জ্ঞানী ও পণ্ডিত পাদরিরা কোলদের ভাষা চর্চায় ও তাহাদের সংস্কৃতি এবং সাহিত্যের সংরক্ষণে যাহা করিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা চিরকাল কোলদের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়া থাকিবেন, কোলদের বন্ধুরাও তাঁহাদের প্রতি তাঁহাদের প্রাপ্য সম্মান দিবেন। কিন্তু ব্যক্তিগত-ভাবে তাঁহাদের কৃতিত্ব যাহাই হউক না কেন, প্রথম যুগে 'খ্রিস্টান সভ্যতার প্রসার' যে রীতিতে হইতেছিল, তাহাতে, যাহাদের মধ্যে এই সভ্যতার প্রসার ঘটিত তাহারা আত্মসম্মানজ্ঞান হারাইত, নিজেদের সম্পূর্ণরূপে অসহায়, ইউরোপীয়দের প্রসাদ-পুষ্ট বলিয়াই ভাবিত ; এবং তাহাদের মধ্যে এই ধারণা আসিত যে, সাহেবদের আগমনের পূর্বে তাহাদের ইতিহাস হইতেছে আত্মঘাতী অজ্ঞতার ইতিহাস। সুখের বিষয়, মিশনারিদের অনেকে এখন স্থানীয় কোল পারিপার্শ্বিকের মূল্য উপলব্ধি করিতেছেন। ইহার ফলে, নিজ ভাষা ও নিজ কোল সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য এবং নিজ গ্রামীণ সরল জীবন-পদ্ধতি সম্বন্ধে সচেতন এবং গৌরবভাব-পোষণকারী খ্রিস্টান কোল, এবং নিজধর্মে প্রতিষ্ঠিত অখ্রিস্টান ও অহিন্দু কোলও দেখা যাইতেছে। এইরূপ আত্মদৈন্য-মুক্ত কোল পুরুষ ও স্ত্রী, সকল সমাজের মানব কর্তৃক শ্রদ্ধার সহিত অভিনন্দনের পাত্র।

উচ্চ কোটির মানসিক সংস্কৃতির পথে চলা কোলদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তাহারা নিজে হইতে কোনো লিপিবিদ্যার উদ্ভাবন করে নাই, এবং অতি সাম্প্রতিক কালের পূর্বে প্রতিবেশী হিন্দুদের কাছ থেকেও গ্রহণ করে নাই। সেই হেতু তাহাদের সাহিত্যের সংরক্ষণ ও পরিবর্ধন ব্যাহত হইয়াই ছিল। খ্রিস্টান মিশনারিরা প্রথমটায় বাঙ্গালা ও নাগরি এবং উড়িয়া লিপিতে ও পরে রোমান লিপিতে তাহাদের ভাষা লিখিয়া তাহাতে সাহিত্য সৃজন ও সাহিত্য সংরক্ষণের পথ প্রস্তুত করিয়া দেন। সজ্ঞান ও সচেতনভাবে সাহিত্য-সর্জনার

পথে তাহাদের সংস্কৃতি এখনও চালিত হয় নাই। কিন্তু তাহাদের মধ্যে গান-বাঁধা ও গল্প-বলার রীতি বিশেষ ভাবে বিদ্যমান। স্নিগ্ধ-গম্ভীর-ঘোষ মাদল ("দুমাং") ও উন্মাদনাকর বাঁশের বাঁশরি বাজাইয়া নাচ ও গান ইহাদের জীবনের এক সুন্দর রীতি। পাদরি নোটরোট, পাদরি হফমান, এবং স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র রায় মহাশয়ের মুন্ডারি গীতির সংগ্রহ ও অনুবাদের সাহায্যে বাহিরের জগতের কাছে এই আদিম ও সুমধুর প্রকৃতি-বিষয়ক এবং প্রেম-বিষয়ক কবিতার উৎসমুখ উন্মোচিত হইয়াছে, এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীতি-কবিতার রস আস্বাদন করা আমাদের পক্ষে এখন সম্ভবপর হইয়াছে। W. G. Archer আর্চার সাহেবের চেষ্টায় মুন্ডারি খাড়িয়া সাওঁতালি ও হো ভাষায় চারি খণ্ডে যে কোল-জাতির কয়েকটি বিভিন্ন শাখার মধ্যে প্রচলিত গীতি-কবিতার সংগ্রহ বিহার প্রাদেশিক সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলিকে প্রাচীন ভারতের আর্যদের গীতি কবিতার ও ছড়ার সংগ্রহ ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদের সহিত তুলিত করা যায় ; এইভাবে সংগৃহীত অভিনব সমগ্র 'কোল্ল-বেদ-সংহিতা'-র ইংরেজি অনুবাদ বাহির হইলে, মানব-সংস্কৃতির ইতিহাসে একটি মূল্যবান কার্য সাধিত হইবে। সাঁওতালিদের অনুরাগী বাঙ্গালী সাহিত্যিকের দ্বারাও দুই-দশটি সাঁওতালি গান সংগৃহীত ও অনূদিত এবং প্রকাশিত হইয়াছে।

সাঁওতালের চিত্ত সংগীত-রস-রসিক বটে, কিন্তু সাঁওতাল নিজের মানসিক প্রকাশ, গান বা কবিতা অপেক্ষা মনে হয় যেন কথা ও কাহিনিতেই বেশি করিয়া করিয়াছে। এ হিসাবে মুন্ডারা গীতি-কবিতার রাজা। মুন্ডারি-ভাষায় রচিত কতকগুলি গান, সরল ও আদিম কবিতার অতি মনোহর নিদর্শন রূপে বিশ্বসাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য। চিনাদের ও জাপানিদের মধ্যে যে ধরনের প্রকৃতির সম্বন্ধে স্পর্শকাতরতা দেখা যায়, ইহাদের কবিতাতেও সেইরূপ ভাব বিরল নহে। ভারতীয় কাব্যোদ্যানে ইহাদের কতকগুলি প্রেমের কবিতা হইতেছে কোমলবর্ণময় ও সুমধুর-সৌরভযুক্ত পুষ্প। এইগুলির মধ্যে কথোপকথন-মূলক দুই-পাঁচটি কবিতা আছে, সেগুলির মধ্যে নিহিত বন ও পাহাড়ের আদিম অধিবাসীদের অশিক্ষিত কলাকৌশল এবং তাহার আনুষঙ্গিক স্বভাবজাত কারুকার্য, ভাবের সারল্য ও শুদ্ধি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ কতকগুলি কোল (মুন্ডারি) ভাষার পদ দেওয়া যাইতেছে।

১। চিকান্ বাহা বাহা-লেনা-ম্ মাইঁ?
বাহা বাহা সোআনাম্।
চিকান্ দাণ্ডিঃদ্ দাণ্ডিঃদ্ লেনা-ম্ মাইঁ?
দাইলি দাইলি সিরিন্জাম্।

২। বাহাতে চি উমেন্-তানা-ম্?
বাহা বাহা সোআনাম্।
দাণ্ডিঃদ্-তে চি রেআরান্-তানা-ম্?
দাইলি দাইলি সিরিন্জাম্। [পাদরি হফমানের সংগ্রহ হইতে]

১। কোন্ ফুলে তুমি উঠেছ, কন্যা?
তুমি যে ফুলের মতন সৌরভময়।

কোন্ ফুলের গোছায় তুমি বড় হয়ে উঠেছ, কন্যা?
ফুলের গোছার মতো তুমি সৌরভে ভরে উঠেছ।

২। (কি বা) তুমি কি ফুলের মধ্যে স্নান করে থাকো, কন্যা,
(যে) তুমি ফুলের মতন সৌরভময়?
(কি বা) তুমি কি ফুলের গোছার মধ্যে নেয়ে থাকো কন্যা,
(যে) তুমি ফুলের গোছার মতো সৌরভে ভরে উঠেছ?

আর একটি কবিতায় মুন্ডা প্রেমিক যুবা তার প্রেমের পাত্রী কন্যাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছে—কবিতাটি স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র রায় মহাশয় সংগ্রহ করেন ও ইংরেজি কবিতায় ইহার অনুবাদ করেন—

বো তামা রিসা রিসা
সুপিদ্-কেদাম্ রাঙ্গা নাচা,
ঞিন্দা-সিঙি, বাগে-ম্ গুতুতানা,
নামা নাগেন্ জিগে জিতানা।
আন্দু তাদা-ম্, সাকোম্ তাদা-ম্,
হোতোরে দো হিসির্-মেনা,
পোলা-তা-ম্ দো চিল্‌কা সাবিতানা,
নামা নাগেন্ জিগে লোতানা।

ঢেউ-খেলানো চুলের ভারে তোমার মাথা কী সুন্দর,
লাল দড়িতে মাথার চুল কেমন গোল খোঁপায় বাঁধা!
রাত-দিন, তুমি ফুলের মালা গাঁথো—
তোমার তরে আমার মন পোড়ে, আমার হৃদয় কাঁপে।
তোমার হাতে কাঁকন আর তাড় কেমন সুন্দর দেখায়,
তোমার গলা বেড়ে আছে কী সুন্দর হাঁসুলি!
তোমার পায়ে "পোলা" কী সুন্দর ঝুমঝুম করে,
তোমার তরে আমার মন দহে, ভয়ে কাঁপে!

নীচের মুন্ডারি কবিতাটিতে প্রথম অংশ কুমারী কন্যা তাহার প্রেমাস্পদকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছে, এবং দ্বিতীয় অংশ হইতেছে যুবকের উত্তর—

(কুড়ি) নাতা-মাতা বির্-কো তারালে, নালোহোম্ নির্‌জা বাগিঙ্গা,
রামেকান্ মারেচারে, নালোহোম্ নজর রারাইঙ্গা।
কাচিহোম ঞেলে লেদিঙ্গা, সেঙ্গেল্-লে কাইঙ্ জুলেতান্‌রে?
কাচিহোম্ চিনা লেদিঙ্গা, দাঃক্-লে কাইঙ্ লিঙ্গিতান্‌রে?

(কোড়া) কাগে চোআইঙ্ ঞেলেজাদ্‌মে নোতে-রে দো নোতে দুগ্‌গার
কাগে চোআইঙ্ চিনাজাদ্‌মে—সিঙ্-মা-রে দো সিঙ-মা কোআঁসি।

(কুমারী) গহন বনের মধ্যে, কুমার, তুমি পলিয়ে যেও না, আমাকে ফেলে যেও না;
এই বিশাল তেপান্তর মাঠের মাঝে, কুমার, আমাকে ফেলে পালিয়ে যেও না।

আমাকে কি তুমি দেখ নাই, কুমার, যখন আমি আগুনের মতো জ্বলে উঠি?
আমাকে কি তুমি দেখ নাই, কুমার, যখন আমি জলের মতো গলে যাই?
(কুমার) সত্যই আমি তোমায় দেখিনি, কারণ তখন পৃথিবী জুড়ে ছিল ধুলা আর আঁধি ;
সত্যই আমি তোমায় দেখিনি, কারণ আকাশে তখন ছিল মেঘের মতো কোয়াসা॥

শিকারের আনন্দ নীচের কবিতাটিতে সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে (শরৎচন্দ্র রায় মহাশয়ের ইংরেজি অনুবাদ হইতে)

ওই মহুয়া গাছের তলায় ওই রে ওই হরিণ-শিশু চরে ;
বন-পথ দিয়ে নীচু হয়ে ব্যাধ যুবক চলে, হেঁট হয়ে চলে।
মহুয়ার মিষ্টি ফলেব লোভে হরিণ হোথায় আসে, হরিণ ঘোরে ;
হরিণের গায়ে বাণ বিঁধবার তরে ব্যাধ হঠাৎ দাঁড়ায় খাড়া হয়ে, হাতে ধনুক নিয়ে ;
মহুয়ার ছায়ার তলে যায় পড়ে হরিণ-শিশু, হঠাৎ পড়ে ;
ওই শোনো, ব্যাধ খুশি গলায় আনন্দের ধ্বনি করে, খুশির রা কাড়ে।

আনন্দের মধ্যেও যে দুঃখের বীজ আছে, হরিষে বিষাদের ভাব এইরূপে মুন্ডা কবি প্রকাশ করিতেছে—

একাসি-কো পিবি-বে দো বুতু-তেকো সেসেন্‌তানা, বুতুতেকো সেসেন্‌তানা,
তেরাসি-কো বাদিরে দো বানাম্‌-তেকো তুদাঙ্‌ তানা, বানাম্‌তেকো তুদাঙ্‌ তানা।
বুতু-তেকো সেসেন্‌তানা, বুতু চুটিহুলাঃক্‌ জানা, বুতু চুটিহুলাঃক্‌ জানা,
বানাম্‌ তেকো তুদাঙ্‌তানা—বানাম্‌-দাণ্ডি দোরাঙ্‌জানা, বানাম্‌-দাণ্ডি দোরাঙ্‌জানা।

একাশির টিলা-ভুঁইয়ে পথিকেরা যায় বাঁশির সুরে, বাঁশির সুরে ;
তিরাশির নামাল-ভুঁইয়ে পথিকেরা যায় দোতারার তালে, দোতারার তালে।
বাঁশির সুরে চলে তারা, হায়, বাঁশির মুখ গেছে ভেঙে, বাঁশির মুখ গেছে ভেঙে ;
দোতাবার তালে যায় গো তারা, হায় দাণ্ডী তার হয়েছে চুর, হয়েছে চুর।

বিবাহের কন্যার মুখ দিয়া মুন্ডা কবি বলিতেছে—

বা-তৈঙ্‌-মে গা নেআঙ্‌ বা-তৈঙ্‌-মে হো!
ডালি-তৈঙ্‌-মে গা নাপাঙ, ডালি-তৈঙ্‌-মে।
সারজোম্‌-বা-তে নে-আঙ্‌, বা-তৈঙ্‌-মে্‌ হো।
সূড়া-সাংগেন্‌-তে গা নাপাঙ্‌ ডালি-তৈঙ্‌-মে।

ওগো মা, ফুল দিয়ে আমায় সাজাও, ফুল দিয়ে সাজাও ;
বাবা গো, মাথায় দাও ফুলের মুকুট, মাথায় ফুলের মুকুট।
শালের ফুলে, মা গো, আমায় দাও সাজিয়ে :
শালের কচি ডালে, বাবা গো, মুকুট বানাও আমার তরে, মুকুট আমার তরে।

নাচের আহ্বান করিয়া যখন মাদলে ঘা পড়ে, তখন কোল যুবক-যুবতিদের দেহে মনে যে সাড়া পড়িয়া যায়, বহু পূর্বে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার "পালমৌ"-য়ে তাহার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এই কবিতাটি এই নাচের আনন্দের রসে পরিপূর্ণ—

কোট-কারাম্বুতে মাদল বাজে ;
আমার হৃদয় নাচে, ওই আওয়াজে—ওই আওয়াজে।
বারিগারায় করতাল ঝমঝম করে—
আনন্দে আমার হৃদয় যেন লাফ দেয়, যেন লাফ দেয়।
কোট-করাম্বুতে মাদল বাজে—
ত্বরা করো, প্রিয়া আমার, চলো যাই নাচে, চলো যাই নাচে।
বারিগারায় খরতাল খনখন করে—
ওঠো, প্রিয়া আমার, ছাড়ো উদাস ভাব, চলো যাই নাচে।।

সাওঁতাল যুবকও অনুরূপ ভাবে গায়—

(মাদলের) বাজনা শুনে,
মন আমার যেন তাওয়ার তাপে তাতে।।

মুন্ডারির মত সুন্দর-সুন্দর কবিতা সাঁওতালিতে তত বেশি পাওয়া যায় না। ছয়-সাত ছত্রের কবিতা মুন্ডারিতে যথেষ্ট পাওয়া যায়, কিন্তু সাঁওতালি কবিতা দুই ছত্র, বড়ো জোর চারি ছত্রেরই বেশি ; পাঁচ-ছয় ছত্রের অবশ্য দুর্লভ নয়। আজকাল মুন্ডা ও সাঁওতাল কবিরা বড়ো-বড়ো কবিতা ও গান লিখিতেছেন। মালাই জাতির Pantum "পান্তুম" কবিতার মত, জাপানি Tanka "তাঙ্কা" আর Uta "উতা"র মত, সাঁওতালিদের সাহিত্যিক বোধ বা অনুভূতি, এইরূপ ছোটো কবিতার মধ্যেই সীমিত। শান্তিনিকেতনে স্বর্গীয় সন্তোষচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এইরূপ সাওঁতালি কতকগুলি কবিতার সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেগুলির বাঙ্গালা অনুবাদও করিয়াছিলেন ; তাহার কয়েকটি এই সংখ্যায় ছাপা হইল। রবীন্দ্রনাথকেও এইরূপ কবিতার সৌন্দর্য খুশি করিয়াছিল এবং Visva-bharati Quarterly-র ১৯২৫ এপ্রিল সংখ্যায় সন্তোষ-বাবুর সংগ্রহ হইতে কতকগুলি কবিতার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত চারুলাল মুখোপাধ্যায় এম-এ বি-এল মহাশয় "দেশ" পত্রিকাতে কতকগুলি সুন্দর সাওঁতাল কবিতার বঙ্গানুবাদ মূলের সহিত প্রকাশিত করেন। W. G. Archer আর্চর সাহেবের প্রকাশিত সংগ্রহও ইংরেজি অনুবাদের অপেক্ষায় রহিয়াছে। এইরূপ কয়েকটি সাওঁতালি কবিতার অনুবাদ দেওয়া যাইতেছে ; এগুলিতে ঘরোয়া জীবনের সুখদুঃখের কথা বিশেষ নিষ্কপট ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

পতিকর্তৃক পরিত্যক্তা স্ত্রী বলিতেছে—

আমি ভাত রাঁধি, আমি বেন্নন রাঁধি, ওর পাতে খুব ঢেলে দিই।
তবুও ও বলে, এ বউ আমি ঘরে রাখবো না।।

মাতৃহারা পুত্র মায়ের জন্য খেদ করিতেছে—

হায় হায়, আগেকার দিনে
কোথাও থেকে আমরা ঘরে ফিরে আসার সময়ে
দোয়ারের ধারে মা থাকত বসে—
বাচ্ছা ময়নার মত আমাদের পেয়ে আদর করত।।

শ্রীযুক্ত চারু-বাবুর সংগ্রহ হইতে দুইটি সাঁওতালি গান—

বুরুরে নাতাল-বাহা, দলপ্-দলপ্ নাতাল-বাহা।
জাহা লেকাতেইঞ্ তিরকৃগিয়া হরিঞ্ চিপিরেঃ সুতদ কচেরেঃ
জাহা লেকারেইঞ্ বাহাইগিয়া।

পাহাড়ের উপরে নাতাল ফুল, ধুলছে নাচছে নাতাল ফুল।
আমি সুন্দরী নই, খোঁপার দুই ধারে ফুল দোলে—
আমি সুন্দরী নই, কিন্তু ওই ফুল চুলে আমি গুঁজবো।।

নাম্-দ কিসাঁড়্-হপন্ নিঞ্-দ রেঙ্গেঃচ্
হপন্ চেকা লেকাতে-ম্ বুলাও।
কিদিঞ্ নালো সাবিম্ বাগ, সারিনালো,
সারিম হমবা, বানা হড়্-গে চংলাং সমান্‌গিয়।।

কন্যা। ধনীর ছেলে তুমি, গরিবের মেয়ে আমি, কী করে আমায় ভোলালে?
তরুণ। কেঁদো না, মনে ব্যথা পেয়ো না, আমরা দুজনে দুজনার সাথি।

মনে হয়, জীবনের সব দিক লইয়া টুকরা-টাকরা অভিজ্ঞতা বা চিত্রাঙ্কন সাঁওতালদের কবিতায় অধিক করিয়া পাওয়া যায়। অনুষ্টুপ বা গাথা ছন্দে রচিত সংস্কৃত ও প্রাকৃত কবিতায়, প্রাচীন তমিল পদে, হিন্দির দোহায়, অনেক সময়ে এইরূপ বাচংযমতার সঙ্গে প্রেম বা প্রাকৃতিক দৃশ্য বা জীবনের কোনো অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কবির দর্শন বা উপলব্ধির যে প্রকাশ আমরা দেখিতে পাই, সাঁওতালি, মুন্ডারি প্রভৃতি কোল-ভাষার এইসব ছোটো ছোটো কবিতা যেন সেই পর্যায়ের।

আজকালকার বিভিন্ন গণের ছেলেমেয়েরা (কী মুন্ডারি, কী সাঁওতাল, কী হো) তাহাদের প্রাচীন গানগুলি ভুলিতে বসিয়াছে। তবে কোল-সমাজের বাহিরের—ভারতীয় ও ইউরোপীয়—সাহিত্য-রসিকদের আলোচনার ফলে, শিক্ষিত কোল দুই-চারিজন যাঁহারা আছেন তাঁহাদের মনে এ বিষয়ে দরদ আসিতেছে। কিন্তু ইহার চেয়ে আবশ্যক বা প্রার্থিত হইতেছে এমন ব্যবস্থা, যাহাতে অশিক্ষিত কোল জনসাধারণ নিজেদের পিতৃপুরুষ হইতে প্রাপ্ত এই রিক্‌থ হেলায় হারাইয়া না ফেলে। এজন্য আবশ্যক, তাহাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং শান্তিময় জীবনযাত্রা। কিন্তু এই দুইটি বস্তু এখন পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র দুর্লভ হইয়া পড়িতেছে।

কোল জাতির পুরাণ কথা ও ইহাদের মধ্যে প্রচলিত গল্প ও কাহিনি আংশিকভাবে সংগৃহীত হইয়াছে। সাওঁতালদের মধ্য হইতেই বেশি করিয়া এইসব কথা ও কাহিনি পাওয়া গিয়াছে, এবং দুমকায় স্কান্ডিনেভীয় মিশনারিদের চেষ্টাতেই কয়েক খণ্ডে এইগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৭০-৭১ সালে স্কান্ডিনেভীয় মিশনারি Rev. L. O. Skrefsrud স্ক্রেফরুড সাহেব, কলেয়ান (কল্যাণ) নামে একজন বৃদ্ধ সাওঁতাল গুরু অর্থাৎ পুরোহিতকে পান, এবং তাহার নিকট হইতে সাঁওতালদের পুরাণ-কথা ও জীবন-যাত্রার পদ্ধতি এবং সামাজিক রীতি-নীতির কথা যাহা শুনেন তাহা লিখিয়া লন, ও ১৮৮৭ সালে মূল

সাঁওতালি ভাষায় রোমান অক্ষরে এই বই প্রকাশিত করেন—এই বইয়ের নাম দেন "হড়্‌কো-রেন্ মারে-হাপ্‌ড়াম্-কো-রেআঃক কথা" অর্থাৎ 'সাঁওতালদের পূর্বপুরুষদের কথা'। এই বইখানির একাধিক সংস্করণ হইয়াছে, ইহা শুধু সাঁওতালির মূল্যবান নিদর্শন, এবং ইহা একাধারে সাঁওতাল পুরাণ ও স্মৃতি গ্রন্থ। এই বই ছাড়া স্কান্ডিনেভীয় মিশনারি পরলোকগত Rev. P. O. Bodding বডিং সাহেব, Oslo অসলো এবং Copenhagen কোপেনহেগেন হইতে কয়েক খণ্ডে সাঁওতালি উপাখ্যান, মূল সাঁওতালি ও ইংরেজি অনুবাদ সমেত প্রকাশিত করিয়াছেন। বডিং সাহেব সাঁওতালদের জীবন সম্বন্ধে কতকগুলি মূল্যবান প্রবন্ধও লিখেন। মুন্ডাদের কথা লইয়া রোমান ক্যাথলিক পাদরি Hoffmann হফমান সাহেব ১৪ খণ্ডে বিরাট এক মুন্ডারি বিশ্বকোষ Encyclopaedia Mundarica পাটনা হইতে প্রকাশিত করিয়াছেন (১৯৩০-৩২ সাল)।

এ সম্পর্কে সবচেয়ে লক্ষণীয় হইতেছে সিংহভূম (চাইবাসা) জেলার ঘাটশিলার অন্তর্গত কাড়ুয়াকাটা গ্রামে অধিবাসী রামদাস মাঝি টুডু মহাশয়ের সংকলিত বই "খেরওয়াল-বংশা-ধরম-পুথি"—বহু বৎসর পূর্বে ৬৮ পৃষ্ঠার বড়ো আকারের এই বইখানি, সাঁওতালি ভাষায় বাঙ্গালা অক্ষরে ছাপাইয়া তিনি প্রকাশিত করেন। ইহাতে নিজ হইতে তিনি সাঁওতাল পুরাণের সৃষ্টি ও অন্য বিষয় সংক্রান্ত কতকগুলি পুরাতন ও স্বরচিত গান সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, কাঠে-খোদাই ছবি কতকগুলিও দিয়াছেন, তাহা হইতে দেবতা-সম্বন্ধে সাঁওতালদের দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক কালে কী দাঁড়াইয়াছে তাহা দেখা যায়। এই বই এখন প্রায় অপ্রাপ্য—কিন্তু ইহা নিজ সংস্কৃতির প্রতি বর্ণজ্ঞানযুক্ত কোলের শ্রদ্ধার প্রথম নিদর্শন।

বডিং সাহেবের সাঁওতাল গল্পের সংগ্রহের কতক অংশের ইংরেজি অনুবাদ ১৯০৯ সালে সিভিলিয়ান Cecil Henry Bompas কর্তৃক *Folklore of the Santals* নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। Rev. Dr. Campbell ক্যাম্পবেল নামে আর একজন মিশনারি ১৮৯১ সালে কতকগুলি সাঁওতালি কাহিনি প্রকাশ করেন। এইসব সংগ্রহের সব গল্পগুলিই কিছু লক্ষণীয় নহে। কতকগুলি গল্প ভারতের সাধারণ সম্পত্তি—জাতক, হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্রের মতো পশুপক্ষীকে অবলম্বন করিয়া নীতিকথা ; কতকগুলি আবার সাধারণ রূপকথা, যাহা বাঙ্গালা হিন্দি প্রভৃতি আর্য-ভাষাতেও পাওয়া যায়। কতকগুলি গল্প বিশেষভাবে সাঁওতালদের জীবন লইয়া। এই-সমস্ত গল্পের মধ্যে সবচেয়ে লক্ষণীয় এবং চিত্তগ্রাহী হইতেছে বোঙ্গাদের লইয়া কতকগুলি গল্প, যেগুলি সাঁওতাল সংস্কৃতির বিশেষ পরিচায়ক। এই ধরনের গল্প বেশি সংখ্যায় মিলে—একদিকে মানব তরুণ বা তরুণী, অন্যদিকে "বোঙ্গা-কুড়ি" বা "বোঙ্গা-কোড়া"—দেবকন্যা বা দেবকুমার—এবং ইহাদের মধ্যে ভালোবাসার কথা লইয়া গল্প। এইরূপ গল্পের কাঠামো বা মূল কথাবস্তু মাত্র দুই-চারি প্রকারের পাওয়া যায়। একটি সাধারণ কথাবস্তু হইতেছে এই ধরনের—সখীদের সঙ্গে সাঁওতাল-কন্যা বনে গিয়াছে শাকপাতা তুলিতে ; সেখানে এক তরুণ বোঙ্গার সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ, এই বোঙ্গা-কোড়া বাস করে পাহাড়ের গুহায়, কন্যা তাহার পত্নীরূপে সেখানে গিয়া তাহার সঙ্গে পরম সুখে বাস করিতে থাকে ; কিন্তু তাহার আত্মীয়বন্ধুদের কাছে এই বোঙ্গা-সঙ্গ প্রীতিকর না লাগায় তাহাদের চেষ্টা হয়, যাহাতে বোঙ্গাকে মারিয়া ফেলিয়া বা তাহাকে ঠকাইয়া, কন্যাটিকে আবার ঘরে ফিরাইয়া আনিতে পারে ; কখনো-

কখনো তাহারা কৃতকার্যও হয় ; কিন্তু বোঙ্গা তাহার মানবী স্ত্রীকে ছাড়িবে না—কন্যা বাপের বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া পীড়িত হয় এবং প্রাণত্যাগ করে, এবং এইরূপে বোঙ্গা-লোকে গিয়া তাহার বোঙ্গা-পতির সহিত মিলিত হয়। আবার এই ধরনের গল্পও কতকগুলি পাওয়া যায়—তরুণ সাঁওতাল রাখাল, পাহাড়ের কোলে বনে গোরু মহিষ চরাইতেছে ; জ্যোৎস্নার রাত্রে বনের মধ্যে সে বাঁশি বাজাইতেছে ; বোঙ্গা-কন্যা তাহাকে দেখিয়া, তাহার প্রেমে পড়িয়া সুন্দরী মানব-কন্যার রূপে আসিয়া তাহাকে দেখা দেয়। ইহা যেন প্রাচীন বৈদিক উর্বশী ও পুরূরবা, গ্রিক পুরাণ-কথা দেবী Aphrodite আফ্রোদিতে ও রাখাল রাজপুত্র Ankhises আঙ্খিসেস, এবং টিউটনিক জাতির Valkyrie বা রণদেবী Alvit আলভিট ও তরুণ কারু-শিল্পী Weland ৱেলান্ড-এর কাহিনির অনুরূপ সুন্দর ও কাব্যময় কাহিনি। সাওঁতালি উপাখ্যানের বোঙ্গা-কন্যা একটি পাহাড়িয়া নদীর উৎসের মধ্যে বাস করে ; সাওঁতালি কথাকার উৎসটির ছোটো একটুখানি বর্ণনামনয় চিত্র দিয়াছেন—'বোঙ্গা-কন্যার বাসস্থান উৎস-মুখের তীরে গাছে প্রচুর লাল রঙের সুগন্ধি আকাড় ফুল ফুটিয়া আছে।' রাখাল তরুণ জলে নামে, গাছ হইতে কন্যার জন্য ফুল তুলিবার উদ্দেশ্যে ; জলে নামার সঙ্গে-সঙ্গেই রাখাল বোঙ্গা-কন্যার শক্তির মধ্যে আসিয়া পড়ে—কন্যা যেন কোনো জাদুমন্ত্রে তাহার প্রেমিককে সম্মোহিত করিয়া জলের ভিতর লইয়া যায় ও নিজেদের বোঙ্গা-লোকে আনিয়া উপস্থিত করে। সেখানে বোঙ্গাদের বসিবার আসন হইতেছে কুণ্ডলী-পাকানো বড়ো-বড়ো সাপ, এবং থাবা পাতিয়া বসা বাঘ আর চিতা হইতেছে বোঙ্গাদের শিকারের কুকুর। বোঙ্গারা মাঝে-মাঝে এইসব কুকুর লইয়া বনে শিকার করিতে যায়, তাহাদের শিকারের পশু হইতেছে বনের ভিতরের কাঠুরিয়া মানুষ। কচিৎ সাঁওতাল তরুণ বোঙ্গা-লোক হইতে মানব-লোকে ফিরিয়া আসে, এবং সাধারণ মানুষের মতো আর পাঁচজনের সঙ্গে বাস করে, বিবাহও করে, কিন্তু তাহার বোঙ্গা-স্ত্রীর সহিত মাঝে-মাঝে সে বনের ভিতরে অথবা পাহাড়িয়া নদী বা পুষ্করিণীর তলে গিয়া মিলিত হয়। তাহার বোঙ্গা-স্ত্রীর অলৌকিক জ্ঞান ও শক্তির প্রভাবে সেও ভবিষ্যদ্‌বাণী করিতে সমর্থ হয়, এবং সে জনসমাজে সম্মানিত "জান-গুরু" বা ভবিষ্যদ্‌বক্তা হইয়া দাঁড়ায়, ও সকলের সম্মানের পাত্র হয়, অর্থশালী হয়। প্রাচীন রোমের পুরাণ-কথায় উৎস-বাসিনী দেবী Egeria এগেরিয়ার উপাখ্যান আছে, ইনি রোমের রাজা Numa নুমার পত্নী হন, এবং ইহারই প্রসাদে নুমা ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেন—এই সাওঁতালি উপাখ্যানও ওই ধরনের।

বোঙ্গাদের কখনো-কখনো দুষ্ট প্রকৃতির ছেলে-ছোকরার ভাবে দেখা হয়—ইহারা নানাভাবে মানুষকে বিপদে ফেলিয়া বা অপদস্থ করিয়া আনন্দ পায় ; কিন্তু মানুষেও কখনো-কখনো ইহাদিগকে নিজ বুদ্ধিবলে কায়দায় আনিতে পারে। মধ্যযুগের উত্তর-ইউরোপে বামন দেবযোনির সম্বন্ধে যে-সমস্ত গল্প আছে, এই সাঁওতালি গল্পগুলি তদনুরূপ। বোঙ্গাদের এই প্রকারের চরিত্র-কল্পনার পিছনে, হয়তো সাঁওতালদের পূর্বপুরুষ প্রাচীন Austric বা দক্ষিণ জাতির আগমনের পূর্বে ভারতে যে বামনাকার Negroid নিগ্রোবটু জাতি বাস করিত, তাহাদের স্মৃতি বিদ্যমান আছে। ভারতে বৈদিকযুগে আর্যগণ বনের অধিষ্ঠাত্রী "অরণ্যানী দেবী"কে দেখিয়াছিলেন ; এখনও সুন্দরবন অঞ্চলের বাঙ্গালী হিন্দু

ও মুসলমান কাঠুরিয়া ও কৃষক "বনবিবি"র কল্পনা করে। বৈদিক আর্যের কল্পনায়, বন, পর্বত, হ্রদ সমস্ত ছিল দেবতাদের অধ্যুষিত, অপ্সরা ও গন্ধর্বদের বিচরণভূমি। প্রাচীন গ্রিকেরা Dryad বা বৃক্ষকাদেবী, Naiad অর্থাৎ অপ্সরা বা জলদেবী এবং Nereid বা সাগরদেবীর অধিষ্ঠান সর্বত্র দেখিত ; তাহাদের চোখে, বনের মধ্যে Pan পান-দেব এবং Dionusos দিওনুসস ও তাঁহার গণ, Satyr "সাতির" নামে আরণ্য অর্ধ-পশু-অর্ধ-মানব দেবযোনি ও Bacchanate দিব্যোন্মাদযুক্ত রমণীবৃন্দ বিচরণ করিত। কোল-জাতীয় লোকেরা তেমনি বনে, পাহাড়ে, নদীতে, জলাশয়ে, বোঙ্গা-কোড়া ও বোঙ্গা-কুড়িদের দেখিত, এখনও দেখিয়া থাকে ; তাহাদের ছোটো-ছোটো গ্রাম ঘিরিয়া, মধ্য ও পূর্বভারতের অনাদিকালের অরণ্যে এখনও এইসব দেবযোনির বাস তাহারা দেখে। মুন্ডা দেবলোকে এই সমস্ত দেবতার খবর শরৎচন্দ্র রায় মহাশয় দিয়াছেন,—"বুরু-বোঙ্গা"—ইনি পাহাড়ের অধিষ্ঠাতা বোঙ্গা (ইহাঁর এক সাধারণ না "মারাঙ-বুরু" অর্থাৎ 'মহাগিরি'—আজকাল কোনো কোনো অঞ্চলে সাঁওতালেরা "মারাঙ বুরুকে শিবের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করে) ; "ইকির-বোঙ্গা"—গভীর জলের মধ্যে ইহাঁর বাস ; "নাগা-বোঙ্গা"—টিলাভূমি ও পাহাড়ের খাদ ইহাঁর বিচরণ-স্থান ; "দেসৌলি-বোঙ্গা"—ছায়াশীতল তরুবহুল সুন্দর বনভূমি ইহাঁর বাস ; "চন্দর-ইকির-বোঙ্গা"—ইহাঁর নিবাস স্ফটিকোজ্জ্বল জলময় ঝরণার তীরে ; এবং "চান্দি-বোঙ্গা"—ইহাঁর বেদি হইত কুঞ্জবনে, খোলা মাঠে ও পাহাড়ের মাথায়।

সমস্ত বিষয়ের বৈজ্ঞানিক আলোচনার উপযোগী করিয়া, কোল ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চাকে একটি discipline অর্থাৎ বিশেষ ধরনের মানসিক কসরৎ বা ব্যায়াম, অথবা শ্রমসাপেক্ষ শিক্ষা রূপে ধরা যায়। নূতন মানবিকতার বা মানব-প্রীতির দৃষ্টি লইয়া আমাদের দেশের Aborigines অর্থাৎ আদিবাসী বা ভূমিপুত্রদের জীবনের প্রতি অবলোকন করা আরম্ভ হইয়াছে—নৃতত্ত্ববিদ্যার আলোচনার ইহা এই যুগের একটি লক্ষণীয় সুফল। স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র রায়, Verrier Elwin ভেরিয়ার এলউইন, শ্যামরাও হিবলে, W. G. Archer আর্চর, ইহাঁরা এই কাজে পথপ্রদর্শক বা পথিকৃৎ। ভারতের আদিম জনগণের সাংস্কৃতিক জীবনের কোনো অংশ এই অবলোকন এবং আলোচনা হইতে বাদ দিলে চলিবে না। ইহাদের দৃষ্টিভঙ্গি—ইহাদের ভাষার মাধ্যমেই প্রধান বা মুখ্য প্রকাশ লাভ করে। কোল-জাতিরও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয় ইহাদের ভাষায় ; মানুষের চিন্তার ধারা এক সম্পূর্ণ নূতন খাতে ইহাতে প্রবাহিত দেখা যায়—কোল-ভাষায় গতি-ধারা, আর্য বা দ্রাবিড় ভাষার ধারা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ভারতের একটি আদিম বা প্রাচীন জাতির মনোভাবের পরিচয় ইহা হইতে পাওয়া যাইবে। কোল-ভাষার কতকগুলি রীতি মৈথিলি, বাঙ্গালা প্রভৃতি আধুনিক আর্য ভাষাতেও সংক্রামিত হইয়াছে ; তাহার বিচার করিতে গেলে, এবং আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষাশ্রয়ী সংস্কৃতির পূর্ণ আলোচনা করিতে গেলে, কোল-জগতের খবর লওয়া অপরিহার্য।



ওড়িষ্যার আদিম অধিবাসী

শ্রীভূপতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

পশ্চিম ওড়িষ্যার দুরধিগম্য পর্বতমালার অভ্যন্তরে মানবজাতির একটি প্রাচীনতম অধ্যায়ের পরিচয় পাওয়া যায়। আধুনিক সভ্যতার প্রভাব হইতে বহু দূরে কত আদিম জাতিপুঞ্জ তাহাদের প্রাচীন আচার-ব্যবহার এখনও অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে যাহারা পার্বত্যবাস ত্যাগ করিয়া সমতল ভূমিতে নামিয়াছে, তাহারা হিন্দুদিগের সংস্পর্শে আসিয়া অনেক পরিমাণে হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে ও উদার হিন্দুসমাজের প্রশস্ত বক্ষে ক্রমশ স্থান লাভ করিয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাহাদিগের প্রাচীন আচার-ব্যবহার একেবারে পরিত্যাগ না করিয়া হিন্দু রীতিনীতির সহিত সমন্বয় করিয়া লইয়াছে। বর্বর অবস্থা হইতে হিন্দু সমাজে উন্নয়নের এই তিনটি সোপান কয়েকটি জাতির মধ্যে সুস্পষ্ট ভাবে লক্ষিত হয়।

ইহাদিগের মধ্যে ভূঁএগ্রা, জুয়াঙ্গা ও খন্দ জাতি উল্লেখযোগ্য।

ভূঁএগ্রাগণ ছোটোনাগপুরে, ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ কেওনঝর, গাঙপুর প্রভৃতি করদ-রাজ্যে, মধ্যপ্রদেশের সরগুজা ও যশপুরে বাস করে। 'ভূঁএগ্রা' শব্দের অর্থ—ভূমিজ বা ভূমি হইতে উৎপন্ন। ভূঁএগ্রা শব্দ অন্যত্র অন্য অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে—যথা, বঙ্গের বারোভূঁএগ্রা।

ভূঁএগ্রা জাতি কোন্ বংশের (Race) অন্তর্ভুক্ত ইহা লইয়া মতভেদ হইয়াছে। ভূঁএগ্রাদের আদিম ভাষা লোপ পাইয়াছে, সুতরাং ভাষাগত সাদৃশ্য কোন্ বংশের ভাষার সহিত, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। ভূঁএগ্রা জাতির সহিত দ্রাবিড়বংশীয় 'শবর' জাতির অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে বলিয়া Colonel Dalton ভূঁএগ্রাকে দ্রাবিড় বংশভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু Dr. Greerson তাঁহার Linguistic Surveyতে প্রমাণ করিয়াছেন যে, শবর ভাষার কোলবংশীয় 'খাড়িয়া' ও 'জুয়াঙ্গা' ভাষার সহিত সাদৃশ্য আছে। সুতরাং ভূঁএগ্রাকে

কোলবংশীয় বলিয়া সন্দেহ হয়। উভয়ের আচার-ব্যবহার আলোচনা করিলে এই সন্দেহ বদ্ধমূল হয়। দৈহিক সাদৃশ্যও যথেষ্ট আছে—কোনো ভূঁঞাকে হঠাৎ দেখিয়া কোল বলিয়া মনে করা বিচিত্র নহে। ছোটোনাগপুরের মুন্ডা ও লড়কা-কোলদিগের মধ্যে এই প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, তাহারাই আদিম অধিবাসী ভূঁঞাদিগকে বিতাড়িত করিয়া সেখানে বসবাস করিয়াছিল। এখনও কোনো কোনো দেবমন্দিরে কেবল ভূঁঞাই পূজারি হইতে পারে।

ভূঁঞাগণ ভারতবর্ষের বহু প্রদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। Buchanan Hamilton ভাগলপুরের 'ভাঙ্গিয়া' জাতিকে ভূঁঞাদিগের জ্ঞাতি বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ইহারা অশ্ব, মূষিক প্রভৃতি মাংস খাইত, মদ্যপান করিত। ইহাদের উপাস্য দেবতা ছিল—'বীর' বা মৃত পূর্বপুরুষ।

Sir Edward Gait-এর আসামের ইতিহাসে লিখিত আছে যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অহোমবিজয়ের পূর্বে চুটিয়া ও ভূঁঞাগণ আসামে প্রবল ছিল। শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের মতে এই ভূঁঞা ও চুটিয়া ওড়িশার ভূঁঞাদিগের শাখা। 'ছোটো' নাগপুর (বা চুটিয়া নাগপুর) এই চুটিয়াদের নামানুসারেই হইয়াছে। Buchanan Hamilton বলেন যে, দিনাজপুরে বারো জন ভাঙ্গিয়া বা ভূঁঞা আসিয়া আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল।

অতএব, সুদূর আসাম হইতে মধ্য প্রদেশের রায়পুর পর্যন্ত ভূঁঞা উপনিবেশের চিহ্ন মধ্যে মধ্যে লক্ষিত হয়। কোনো বিস্মৃত অতীতে হয়ত এই সমগ্র ভূখণ্ড ভূঁঞাদিগের অধিকারে ছিল।

এখনও ওড়িষ্যা ও ছোটোনাগপুরের অনেক রাজ-পরিবারে ভূঁঞাদিগের আধিপত্য দেখা যায়, যথা বামড়া ও কেওনঝর। বামড়া রাজবংশের আদি পুরুষকে ভূঁঞা ও খন্দগণ পাটনা রাজপরিবার হইতে শৈশবে অপহরণ করিয়া বামড়ায় প্রতিষ্ঠিত করে। আজকালও ভূঁঞারা বামড়া রাজপরিবারের সেবা করিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করে।

ওড়িষ্যার ভূঁঞাগণ ময়ূরভঞ্জাধীশ্বরের পূর্বে প্রজা ছিল। পার্বত্য আবাস হইতে সুদূর ময়ূরভঞ্জে প্রতি বৎসর কর দিতে যাওয়া অপমানজনক ও কষ্টসাধ্য বলিয়া ভূঁঞাগণ একটি স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করিতে সংকল্প করে। ময়ূরভঞ্জরাজের একটি শিশুপুত্রকে রাজধাত্রীর সহায়তায় অপহরণ করিয়া ইহারা তাহাকে সযত্নে লালনপালন করে। গোয়ালা, নাপিত, রজক প্রভৃতিকে আনাইয়া তাহাদিগকে গ্রামে বাস করায়। রাজপুত্রের খাদ্য ব্রাহ্মণে পাক করিত এবং কোনো ভূঁঞা আহারকালে উপস্থিত থাকিত না। পাছে ভূঁঞাদিগের স্পর্শ দ্বারা রাজার ভোজনপাত্র অপবিত্র হয়, এই ভয়ে মৃৎপাত্রে তাঁহাকে আহার করিতে হইত এবং সেই পাত্র প্রত্যহ একজন ভূঁঞা ভাঙিয়া ফেলিত। এই প্রথা এখনও কেওনঝর রাজপরিবারে প্রচলিত আছে।

ভূঁঞাগণ কেওনঝরে রাজাদিগের রাজ্যাভিষেকের সময় উপস্থিত থাকে। Colonel Dalton ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে একটি অভিষেকে উপস্থিত ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন—

> "প্রাসাদের বাহিরের একটি প্রশস্ত কক্ষে তীর্থ-সলিলপূর্ণ ঘট ও শাস্ত্রীয় বিধানানুযায়ী মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি আনা হইল। ব্রাহ্মণ সম্মুখে বসিলেন। তাঁহাদিগের পশ্চাতে অনেকগুলি

> প্রধান ভুঁঞা পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করিয়া বসিল। তাহার পর রাজা ধনঞ্জয় ভঞ্জ প্রবেশ করিয়া সমবেত ব্যক্তিগণকে পান মশলা, মিষ্টান্ন ও মাল্যাদি বিতরণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। অল্পক্ষণ পরে ভুঁঞাদিগের জাতীয় বাদ্য বাজিয়া উঠিল—রাজা এক জন বলিষ্ঠ ভুঁঞা সর্দারের স্কন্ধে আরূঢ় হইয়া প্রবেশ করিলেন। তখন উপস্থিত ভুঁঞাগণ রাজার দণ্ড, পতাকা, চামর লইয়া তাঁহার চারিদিকে দাঁড়াইল। একজন সর্দার একটি পাহাড়ি লতা আনিয়া রাজার পাগড়িতে বাঁধিয়া দিল—ইহাই ভুঁঞাজাতির দেওয়া শিরোপা। ভাটগণ জয়গান করিল ও ব্রাহ্মণগণ বেদ পাঠ করিলেন। প্রাচীনতম ভুঁঞা সর্দার রাজার ললাটে চন্দনের টীকা দিল। তাহার পর রাজার ব্রাহ্মণ বেবর্তা (মন্ত্রী) ও উপস্থিত ব্রাহ্মণগণ টীকা দিলেন। রাজা রাজতরবারি গ্রহণ করিলেন। একটি বলিষ্ঠ ভুঁঞা-যুবক তাঁহার সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিল। রাজা তাঁহার স্কন্ধ তরবারি দ্বারা স্পর্শ করিলেন। সে তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া পলাইল, এবং তিন দিন পরে ফিরিল। এই প্রথা পূর্বের নরবলির কথা স্মরণ করায়। ভুঁঞাগণ তাঁহাদের ভেট আনে—চাউল, কলাই, ঘৃত, দুধ ও মধু।
>
> তাহার পর প্রাচীনতম ভুঁঞা সর্দার রাজাকে সম্বোধন করিয়া এই মর্মে বক্তৃতা করিল—আমরা আমাদের চিরন্তন প্রথা অনুসারে তোমার হাতে এই রাজ্যের ও ইহার অধিবাসীর সুখ দুঃখের ভার অর্পণ করিলাম। আশা করি, সত্য ও ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করিয়া এই কার্য সম্পাদন করিবে।"

ভুঁঞাদের মুখ বেশ গোল, ঠোঁট পুরু, কপাল সরু। গালের হাড় উচ্চ। নাক উন্নত নহে। দেহের বর্ণ ঘোর কৃষ্ণ নহে। শারীরিক গঠন খুব দৃঢ়, দেহের বলও অসীম। পুরুষগণ মাথার সম্মুখ দিক কামায় পশ্চাতে দীর্ঘ কেশ রাখে, সময় সময় লাল চিরুনি দিয়া মাথার উপর জড়াইয়া রাখে। পুরুষগণ কৌপীন পরে। কাজ করিবার সময় ইহারা কাঁধ হইতে একখণ্ড চামড়া ঝুলাইয়া দেয়, ইহাতে ভারী দ্রব্য উঠাইতে সুবিধা হয়। গলায় এক থাক বা দুই থাক বাঁশের টুকরার মালা পরে। কেহ কেহ ব্রাহ্মণের মতো পৈতাও পরে।

ইহারা বিশ্বাসী ও অতিথিপরায়ণ। সভ্যতার সংস্পর্শে না আসাতে ইহারা এখনও সরল, সাধু ও স্বাধীনতাপ্রিয়। অতিথি দেবতা। গ্রামে কোনো আগন্তুক আসিলে সব গ্রামবাসী তাহার পরিচর্যায় তৎপর হয়। গ্রামে একটি সাধারণের অর্থে নির্মিত গৃহ থাকে। সেখানে অতিথিকে থাকিতে দেওয়া হয়। অভ্যাগত যদি কোনো রাজকর্মচারী হন, তাহা হইলে গ্রামের স্ত্রীলোকগণ কাষ্ঠাসন ও হলুদ জল লইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করে। অতিথি যতদিন ইচ্ছা গ্রামে থাকিতে পারেন।

ইহাদের জাতীয় ঐক্য আছে। কোনো কার্য উপলক্ষে যদি জাতির সকলকে আহ্বান করা হয়, তাহা হইলে প্রত্যেককেই আসিতে হইবে। না আসিলে জাতিকে অপমান করা হইল, জ্ঞান করা হইবে। ইহাদের জাতীয় ঐক্য আছে বলিয়াই সহজে ইহাদের কোনো অধিকার কাড়িয়া লওয়া সম্ভব নহে। এই কারণেই সামান্য ত্রুটি হইলেই ইহারা বিদ্রোহী হয়।

ভুঁঞাগণ কুক্কুট, কীট পতঙ্গাদি খাইলেও হিন্দুরা তাহাদিগকে নীচ, অস্পৃশ্য বলিয়া ঘৃণা করে না—বরং 'জল আচরণীয়' বলিয়া তাহারা গৃহীত হয় ও হিন্দু পরিবারে ভৃত্য রূপে কার্য করিতে পায়।

ভূঁএগ্রা স্ত্রীলোকগণ গ্রাম্য তাঁতির বোনা মোটা শাড়ি পরে, কিন্তু মাথায় কাপড় দেয় না। ইহারা বাহু ও কাঁধে উলকি করে। ইহাদের অলংকার বড়ো অদ্ভুত রকমের—কান ও নাকে পিতলের ফুল, গলায় নানা রঙের পাথরের হার—হাতে অনেকগুলি পাতলা পিতলের বালা।

ইহাদিগের বিশ্বাস যে, প্রত্যেক পর্বত, নদী, ঝরনা এক এক দেবতার অধীনে। তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত ঘৃত, চাউল ও কুক্কুট উপহার দেওয়া হয়।

ইহাদিগের চারিটি প্রধান দেবতা—দাসম পাট. বামনি পাট, কইসব পাট ও বোরাম। প্রথম তিন জন ভ্রাতা—ইহাদের প্রস্তর মূর্তি পূজিত হয়। বোরামই সর্বপ্রধান—ইহার অপর নাম ধরম বা সূর্য। বোরামই সৃষ্টিকর্তা, সুতরাং ধান রোপনের সময় শুভ্র কুক্কুট বলি দিয়া পূজা করা হয়। পীড়ার সময় দাসম পাটের নিকট ছাগ বলি দেওয়া হয়। ইহাদিগের বিশ্বাস, সূর্য ও চন্দ্র সজীব দেবতা, বিদ্যুৎ ও অগ্নি সূর্যের সন্তান ; নক্ষত্র চন্দ্রের সন্তান। এক দিন চন্দ্র সূর্যকে নিমন্ত্রণ করেন। সূর্য পরম পরিতোষের সহিত আহার করিলেন। তখন চন্দ্র বলিলেন যে, অতিথিসেবার নিমিত্ত তিনি নিজের সন্তানগুলিকে মারিয়া রন্ধন করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া সূর্য গৃহে ফিরিয়া নিজের সন্তানগুলিকে বধ করিয়া আহার করিলেন, কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অগ্নি একটি বৃক্ষে গিয়া লুকাইল ও কন্যা বিদ্যুৎ ইতস্তত ছুটিতে লাগিল, সুতরাং সূর্য তাহাকে ধরিতে পারিলেন না। রাত্রে নক্ষত্রগুলিকে আকাশে দেখা গেল—তখন সূর্য বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি প্রতারিত হইয়াছেন। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি অভিশাপ দিলেন যে, মাসে ১৫ দিন চন্দ্র মরিবে। সেই জন্য দিনে নক্ষত্র দেখা যায় না, কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্র অদৃশ্য হন ও বৃক্ষের ঘর্ষণে অগ্নি উৎপাদিত হয়।

যাহারা সভ্যতার আলোক একেবারেই পায় নাই, তাহারা এখনও পৃথিবী-দেবতা (রম্ভা), ব্যাঘ্রদেবতা, শস্যদেবতা ও গ্রামদেবীর পূজা করে। Dalton বলেন যে, রামায়ণে বর্ণিত হনুমানের অনুচর ইহারাই ছিল। ইহারা পর্বোপলক্ষে হনুমানের কীর্তিগাথা গান করে। ইহাদের এক শ্রেণির নাম—'পবন অংশ।'

গ্রামের কুমার-কুমারী গৃহে রাত্রিবাস করে না। যুবকগণ 'ধাঙড়বাসা' বা 'মন্দরঘরে' থাকে। যুবতিগণ একজন প্রৌঢ়ার তত্ত্বাবধানে ধাঙড়নি ঘরে বাস করে। এইরূপ অভিভাবকহীন হইয়া রাত্রি যাপন করিলেও ইহাদিগের মধ্যে নীতিবিরুদ্ধ কার্য কদাচিৎ ঘটে।

এই ধাঙড়-ঘরের নিকটে একটি উন্মুক্ত প্রান্তরই গ্রামে নৃত্যভূমি। যুবকগণ ধাঙড়-ঘর হইতে বাদ্যযন্ত্রাদি লইয়া নৃত্যভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইলে, যুবতিগণ সুসজ্জিতা হইয়া যোগদান করে। কিছুকাল নৃত্য-গীত হইবার পর যে যাহার গৃহে ফিরিয়া যায়।

সময় সময় এক গ্রামের যুবকগণ অন্য গ্রামের যুবতিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায়। তখন তাহারা সেই গ্রামের নৃত্যভূমিতে উপস্থিত হইয়া বাজনা বাজাইয়া আগমন ঘোষণা করে। সেই বাদ্য শুনিয়া যুবতিগণ দৌড়িয়া আসে। তখন নৃত্য-গীত আরম্ভ হয়। এই সময় সেই গ্রামের কোনো পুরুষ গৃহের বাহির হয় না! যুবকগণ ঢাকের মত একপ্রকার বাজনা

('চাঙ্গা') বাজাইতে বাজাইতে বৃত্তাকারে ঘুরিতে থাকে—সেই বৃত্তের মধ্যে যুবতিগণ অনুচ্চ স্বরে একটি সুমিষ্ট গান গাহিতে থাকে। মধ্যে মধ্যে রহস্য বিদ্রূপও চলে, উচ্চ হাস্যেও সেই স্থান ভরিয়া যায়। যখন সকলে ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখন নৃত্য-গীত কিছুকাল বন্ধ থাকে। এই সময় যুবকগণ তাহাদিগের আনীত উপহার চিরুনি, মিষ্টান্ন পুষ্পাদি যুবতিগণকে দেয়। যুবতিগণও স্বহস্তে রন্ধন করিয়া অতিথিসেবা করে। ভোজের পর সারারাত্রি আবার নৃত্য-গীত চলিতে থাকে এবং প্রভাতের পূর্বেই অনেক যুবকই তাহাদের জীবনসঙ্গিনী নির্বাচন করে। এই নির্বাচনের চিহ্ন স্বরূপ প্রণয়িনীর চুলে ফুল গুঁজিয়া দেয় ও নিজের গলা হইলে একগাছি পাথরের মালা খুলিয়া তাহাকে পরাইয়া দেয়। ইহার পর সেই বালিকাটি যুবকের ফুলমিত্র হইল এবং অন্য কাহাকেও সে বিবাহ করিতে পারিবে না।

প্রভাতে যুবকগণ নাচিতে নাচিতে বিদায় গ্রহণ করে, যুবতিরাও তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিকটবর্তী নদীতীর পর্যন্ত যায়। যুবকেরা নদী পার হইলে, উভয়ে দুই তীর হইতে ছড়া কাটে, হাস্য পরিহাস করে। একটি ভুঁইয়া-গীতের মোটামুটি অনুবাদ দেওয়া হইল—

যুবক

ওগো, কাঞ্চন ফুল এখানে আন
আমবা যে শুনব তোমাদের গান

যুবক

রান্নার যোগাড় করিগে যাই
এখানে গান গাইব না ভাই

যুবতি

ওগো, ও রাধার ছোট্ট সুন্দর দূতী
শোনাও মধুর গান, মোদের এ মিনতি

যুবতি

ধরোনা মোদের, ওই রূপের ফাঁদে
সত্যি, ভাই, তোমার তরে পরাণ কাঁদে

যুবক

এক রত্তি মেয়ে কিন্তু কথায় পাকা বুড়ি
অবাক করলে, খুঁজে না পাই তোমার জুড়ি

যুবতি (মানভরে)

আহা! পাখিরা গান গায়, আর যায় উড়ে
আজ এত আনন্দ, কাল তোমরা কত দূরে

যুবতি (প্রেমভরে)

হাঁগো, এবার রঙিন মাছ গেঁথেছি
যাব কোথা, আমরা এবার মজেছি

যুবক (সানন্দে)

মেঘ যায় উড়ে, দিনের ফোটে আলো
এস বন্ধু, নাচ গাও, সেই বাসি ভালো

যুবক

না গো না, ভুলব না মুখের কথায়
তোমরা এস মোদের খড়ো বাসায়

যুবতি

পাখিরা গাহিছে সুখে
পড়ে রইব কী দুখে
বাপ মা ছেড়ে যাব চলে
তোমাদেরি হাত ধরে।

(১) বিবাহ—যুবতিগণও যুবকগণের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসে। প্রণয়িনীগণ তাহাদিগের প্রণয়ীর বাসগৃহাদি দেখিয়া যায়। ইহার পরেই যুবকগণ পুনরায় সেই গ্রামে নাচিতে যায়। নৃত্য-গীত যখন পূর্ণবেগে চলিতেছে তখন, পূর্বমন্ত্রণা অনুসারে যুবক তাহার প্রণয়িনীকে সঙ্গে লইয়া স্বগ্রামে ফিরিয়া আসে। গ্রামেব বাহিরে যুবতিকে রাখিয়া তাহার

গৃহে যাইয়া মাতা ব্যতীত অপর কোনো আত্মীয়াকে সব কথা বলে। সেই আত্মীয়া আসিয়া বধূকে গৃহে লইয়া যায়। সেখানে যুবকের মাতা বরবধূর কপালে হলুদের ফোঁটা দেয়। ইহার পরদিবস বিবাহোৎসব (হাঁড়ি-সরা) অনুষ্ঠিত হয়। ইহা আমাদের বৌ-ভাতের অনুরূপ। বধূ একটি নূতন হাঁড়িতে অন্ন পাক করিয়া সকলকে খাইতে দেয়।

(২) "ঝিকা" বিবাহ—নৃত্যোৎসবের সময় যদি কোনো যুবক কোনো বালিকার প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে গৃহে গিয়া তাহার অভিপ্রায় সকলকে জানায়। যদি তাহার পিতা এই প্রস্তাবে সম্মত হয় ও তাহার কন্যাপণ (তিনটি বলদ, কিছু ধান ও কাপড়) দিবার সামর্থ্য থাকে, তাহা হইলে পাত্রের আত্মীয়গণ কন্যার পিতাকে সব কথা জানায়। কন্যাকর্তার সম্মতি পাইলে, যুবক তাহার বন্ধুবান্ধবকে লইয়া কন্যার গ্রামে যায়। সে নিজে গ্রামের বাহিরে থাকে ও দুই জন সহচরকে, কন্যার পিতাকে তাহার আগমনবার্তা জানাইতে পাঠায়। কন্যাকর্তা জঙ্গল হইতে কাঠ আনিতে, তাহার কন্যাকে বলে। কন্যা গ্রামের বাহিরে পদার্পণ করিলেই, পাত্র তাহার হাত ধরিয়া লইয়া পালায়। কন্যার সহিত যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা কন্যাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করে। বিফল হইয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া কহে যে, বাঘে তাহাদের সঙ্গিনীকে লইয়া গিয়াছে। তখন কন্যার আত্মীয়- স্বজন অস্ত্রশস্ত্রাদি লইয়া ব্যাঘের অন্বেষণে পাত্রের গ্রামে যায়। পাত্রের পিতা আসিয়া তাহাদিগকে বলে যে, 'যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, এখন আমাদিগের যাহা করিতে পার কর।' বলাবাহুল্য, ইহার পর পান ভোজনে অতিথিগণ আপ্যায়িত হইয়া সানন্দে ফিরিয়া যায়।

(৩) মাঞ্জি বিবাহ—বরের পিতা মাতা কর্তৃক নির্বাচিত কন্যাকে বিবাহ করিতে রাজি হইলে, বর তাহার বন্ধুবান্ধবগণকে লইয়া বিবাহ করিতে যায়। এই বিবাহ অপেক্ষাকৃত সুসভ্য ভুঁইয়াদের মধ্যে প্রচলিত আছে।

(৪) যুবক তাহার প্রণয়িনীর অভিভাবকের সম্মতি না পাইলে অনেক সময়ে বন্ধুবান্ধবকে লইয়া বলপূর্বক কন্যাকে অপরহণ করিবার চেষ্টা করে। ইহার ফলে দুই দলে যুদ্ধ বাধে—পাত্র জয়ী হইলে কন্যাকে লইয়া যাইতে পারে।

রায়বাহাদুর শ্রীশরৎচন্দ্র রায় বিহার ও ওড়িশা রিসার্চ সোসাইটির জার্নালে ভুঁইয়াদের বিবাহ-গীতের নমুনা দিয়াছেন। আমরা তাহার মূল ও অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

বন পুরাই পুবাই
খজুর মূল দিসাই
সাব্রি বেরা ধাঙ্গড় ধাঙ্গড়ি
আমার বেরা বুড় হাই

অর্থাৎ, যখন জঙ্গালের গাছ পোড়ান হয়

খেজুরের গুঁড়িই বাকি থাকে
সেই রকম প্রত্যেক যুবক এক যুবতি পায়
কেবল আমার জোটে এক বুড়ি।

(৫) বিধবা বিবাহ ইহাদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। ছোটো ভাই বিধবা ভ্রাতৃজায়াকে

বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু যদি এই বিধবা অপর কাহাকে বিবাহ করে, তাহা হইলে, পুত্র কন্যার উপর কোনো অধিকার আর থাকে না।

ভুঁঞাদের বিবাহ-বন্ধন নানা কারণে ছিন্ন হয়—যথা, স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য হইলে, গৃহকর্ম না করিলে, কলহ করিলে বা পরপুরুষানুরক্ত হইলে।

গ্রামের পুরোহিতই মাঙ্গি বিবাহের প্রধান উদ্যোগী ; কারণ, তাঁহার এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে অর্থাগম হয়। বর কন্যা হলুদ জলে স্নান করিয়া, নব বস্ত্র ও অলংকার পরিয়া বেদিতে বসে। পিতা বা কোনো নিকট-আত্মীয় কন্যার হাতে একটি টাকা দিয়া বলে,—'আমার যথাসর্বস্ব দিয়ে তোকে আশীর্বাদ করছি যে, তুই ভাগ্যবতী হ'। স্বামীর বিশ্বাসভাজন হ'।' তৎপরে প্রৌঢ়াগণ কন্যার মস্তকে আতপ চাউল সিঞ্চন করিয়া ঘৃত দীপ লইয়া বরণ করে। যে ঘরে বর কন্যার বাসর হয়, পুরোহিত (দেহুরি) পূর্বেই সেই ঘরে দুধ ও আতপ চাউল দিয়া দেবতার পূজা করেন, তাহার পর এক মৃৎপাত্র জলপূর্ণ করিয়া ঘরের এক পার্শ্বে রাখা হয়। ইহাদিগের বিশ্বাস যে, পূর্বপুরুদিগের আত্মা সেখানে পিপাসা নিবারণ করিবার নিমিত্ত আসিবে ও বর কন্যাকে আশীর্বাদ করিবে।

কুঠার ও তিরধনুক ইহাদিগের প্রধান অস্ত্র। তিরের মুখে লোহার বাঁকানো ফলা দেওয়া হয়, যাহাতে দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে সহজে বাহির হইবে না। পক্ষী বধের নিমিত্ত ভোঁতা কাঠের তির ব্যবহৃত হয়। ইহাদের তরবারি বাঁকা, দূরে নিক্ষেপ করিয়া ইহারা গোলাকার লোহার চাকতির দ্বারা পশুর গতিরোধ করিয়া থাকে।

অরণ্যাচ্ছাদিত পর্বতের পাদদেশে নদীতীরে ভুঁঞা গ্রামগুলি অবস্থিত। গ্রামের চতুষ্পার্শে কাঁঠালের বন। ঠিক মধ্যস্থলে একটি প্রশস্ত রাস্তা গ্রামকে দুই ভাগে বিভক্ত করে—তাহার উভয় পার্শ্বে বাড়িগুলি। মোড়ল ও অন্যান্য প্রধানদিগের গৃহ গ্রামের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। গ্রামের বাহিরে পান, কোল প্রভৃতি নীচ জাতির বাস—ইহারা ভুঁঞাদের ভৃত্য। মোড়লের গৃহের নিকট দরবার বা মণ্ডপ ঘর। এখানে গ্রামের অবিবাহিত যুবকগণ রাত্রি যাপন করে—ইহার নিকটে নৃত্যভূমি।

ভুঁঞাগণ অনেকগুলি গোত্রে বিভক্ত। গোত্রপতির নামানুসারে গোত্রের নামকরণ হয়। কতকগুলি পরিবার লইয়া এক একটি গোত্র। পিতার জীবদ্দশায় সম্পত্তিতে পুত্রের কোনো অধিকার নাই।

অনেকগুলি গোত্র লইয়া একটি দল গঠিত হয়। দলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বলবান যে, সেই দলপতি হয়। দলপতির বিশেষ কোনো অধিকার নাই, কেবল ভোজের ও শিকারের সময় তাঁহাকে সকলে নিজের ভাগ হইতে কিছু কিছু দিয়া সম্মানিত করে।

চুরি ধরা পড়িলে, চোরকে অপহৃত দ্রব্য ফিরাইয়া দিতে হয়। দাগি চোরকে জাতিচ্যুত করা হয়। দাঙ্গায় কেহ আহত হইলে, প্রধানগণ উভয় পক্ষকে তিরস্কার করে, তাহার পর একটি জ্বলন্ত মশালে থুথু ফেলিয়া নিভাইয়া দেয়, ইহা শান্তি স্থাপনের চিহ্ন।

অপরাধী ধরিবার নিমিত্ত অনেক প্রকার পরীক্ষা প্রচলিত আছে। (১) এক তাম্রখণ্ড

ফুটন্ত গোবর জলের মধ্যে ফেলা হয়। আসামিকে সেই জলের ভিতর হইতে হাতে করিয়া সেই তাম্র তুলিতে হইবে—অক্ষত অবস্থায়। (২) একটি উচ্চ বৃক্ষের নিকট এক বৃত্ত অঙ্কিত করা হয়। সেই বৃক্ষের উচ্চ শাখার উপর আসামিকে এক পাত্র দুধ ও চাল লইয়া উঠিতে হয়। তাহার পর শাখাকে সজোরে দোলাইয়া দেওয়া হয়। এই অবস্থায় বৃত্তের মধ্যে তাহাকে দুধ এমন ভাবে ঢালিতে হইবে, যেন বাহিরে একটুও না পড়ে। (৩) দুই হাতে এক সের ভারী গলিত লোহা ধরিয়া কিছু দূর যাইতে হইবে।

সমাজে ভূঁঞাদিগের স্থান সর্বত্র সমান নহে। কোনো স্থানে ভূঁঞাদের প্রাধান্য এখনও অব্যাহত আছে, সেখানে তাহারা 'জল আচরণীয়'। আবার কোনো স্থানে তাহারা অস্পৃশ্য—গ্রামের বাহিরে বাস করিতে বাধ্য হয়।

ভূঁঞাগণই এই প্রদেশের আদিম অধিবাসী। আর্যগণ আসিয়া ইহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া বসবাস করেন। যে প্রদেশে আর্যগণ অধিক সংখ্যায় আসিয়া বসবাস করিলেন, সেখানে আদিম অধিবাসীগণ হীনবল হইয়া দাসত্ব করিতে বাধ্য হয়—সেখানে তাহারা এখনও অস্পৃশ্য, ঘৃণ্য।

ছোটোনাগপুরে আর্যগণ অল্প সংখ্যায় আসিয়াছিল, সুতারং অধিবাসীগণ সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হয় নাই। সেইজন্য ইহাদিগের আচার-ব্যবহার বিশেষ পরিবর্তিত হয় নাই—অনেকাংশে ইহারা ইহাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে পারিয়াছে। এখানে ইহারা হিন্দু সমাজে স্থান পাইয়াছে, এবং কৃষিকর্মই ইহাদের জীবিকানির্বাহের উপায়। এখানে অনেকগুলি মন্দিরের সেবাইত ইহারাই—ব্রাহ্মণের সেখানে কোনো অধিকার নাই।

সাহিত্য ● কার্তিক ১৩২৭ (১৯২০ খ্রিস্টাব্দ)



ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে প্রাচীনকালের মানব

শ্রীনির্মলকুমার বসু

ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের ভিতর দিয়া বুঢ়াবলঙ্গা নামে একটি নদী বহিয়া গিয়াছে, ময়ূরভঞ্জের রাজধানী বারিপদা শহর তাহারই পূর্বকূলে অবস্থিত। নদীটি সিমলিপাল নামক পর্বতপুঞ্জের মধ্যে উত্থিত হইয়া বালেশ্বর জেলায় চাঁদিপুরের নিকট সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। নদীর যে-অংশ পাহাড়িয়া অঞ্চলে অবস্থিত সেখানে বর্ষার সময়ে ইহা তিরবেগে ছুটিয়া চলে কিন্তু পাহাড় ছাড়িয়া সমতলভূমিতে পড়িলে আঁকিয়া-বাঁকিয়া মন্থর গতিতে প্রবাহিত হয়। এক সময়ে সিমলিপাল পর্বতমালা আরও উচ্চ ছিল, কালক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া এখন মাত্র তিন বা সাড়ে-তিন হাজার ফুটে পর্যবসিত হইয়াছে। ইহার উচ্চতম শৃঙ্গ বর্ষায় মেঘের দ্বারা আবৃত থাকে বলিয়া মেঘাসনি (৩৮২৩ ফুট) নাম লাভ করিয়াছে। সিমলিপাল হইতে বর্ষার সময়ে যেসব কাদামাটি ও পাথর ধুইয়া আসে তাহা যুগের পর যুগ সঞ্চিত হইয়া পূর্বাঞ্চলে বিস্তীর্ণ সমতলভূমির সৃষ্টি করিয়াছে, ইহার কতক অংশ ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের অন্তর্গত, অবশিষ্ট বালেশ্বর জেলার মধ্যে অবস্থিত, অথচ এক সময়ে যে এই স্থানেই সমুদ্র প্রবাহিত হইত তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

বারিপদা শহর নদীগর্ভ হইতে প্রায় ত্রিশ ফুট ঊর্ধ্বে অবস্থিত। অতিরিক্ত বৃষ্টি হইলে শহরের নীচু অংশ কখনো কখনো নদীর দ্বারা প্লাবিত হয়, কিন্তু সচরাচর জল অতদূর ওঠে না। শীতকালে নদীর জল শুকাইয়া গেলে গর্ভের মধ্যে অথবা তটভূমির নিম্নতম স্তরে একপ্রকার পাথর বাহির হইয়া পড়ে। ইহাকে স্থানীয় লোকে অসুরহাড়িয়া বলিয়া থাকে, কেন-না ইহার রং কতকটা হাড়ের মত এবং পাথরটির মধ্যে অনেক ছোটোবড়ো গর্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কোনো কোনো অংশ আবার বাস্তবিকই হাড়েরই মতন মনে

হয়। এই পাথরের বিষয় ভূতত্ত্ববিদ প্রমথনাথ বসু মহাশয় বোধহয় সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরে অধ্যাপক হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এবং অপর কয়েক জন পরীক্ষা করিয়া অসুরহাড়িয়ার মধ্যে সমুদ্রজীবী মৎস্যের দাঁত, অয়েস্টার নামক একপ্রকার শামুক এবং অন্য দু-এক প্রকার জীবের দেহাবশেষ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অতএব এক সময়ে এই স্থানে সমুদ্র বর্তমান ছিল এবং তাহার তলদেশে নানাবিধ জীবজন্তুর দেহাবশেষ সঞ্চিত হইয়া অসুরহাড়িয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। কালক্রমে পলি পড়িতে পড়িতে সমুদ্র দক্ষিণ-পূর্বে দিকে সরিয়া যায় এবং সমগ্র স্থানটি উচ্চ সমতল ভূমিতে পরিণত হয়। তারই উপরে আজ মানুষের চেষ্টায় একটি সুরম্য নগরী স্থাপিত হইয়াছে।

কিন্তু এমন এক সময় ছিল যখন মানুষ আজকার মত সভ্য ও সমৃদ্ধ হয় নাই। তখন তাহারা চাষবাস পর্যন্ত জানিত না, বনের ফলমূল আহরণের দ্বারা জীবনধারণ করিত অথবা বুদ্ধিবলে পশুপাখি শিকার করিয়া তাহাদের মাংস ভক্ষণ করিত। বারিপদা শহরের নীচে যে পলি সঞ্চিত হইয়া আছে তাহার মধ্য হইতে ময়ূরভঞ্জ-রাজ্যের প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত পরমানন্দ আচার্য এবং ওরম্যান নামক জনৈক আমেরিকান নৃতত্ত্ববিদ, উভয়ে মিলিয়া প্রাচীন কালের কয়েকটি পাথরে তৈয়ারি কুঠার খুঁজিয়া পান। বারিপদার উত্তর-পশ্চিম কোণে, প্রায় এগারো মাইল দুরে, কুলিঅনা নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। দেড় বৎসর পূর্বে কুলিঅনায় পুষ্করিণী-খননের সময়ে ওইরূপ আরও কতকগুলি শস্ত্র আবিষ্কৃত হয়। অল্প দিন পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব-বিভাগের কর্মীগণ ভূস্তর-খননের দ্বারা সেখানে প্রাচীন ইতিহাসের আরও কিছু উপাদান সংগ্রহ করেন। সেই উপলক্ষে ময়ূরভঞ্জের গ্রামবাসীদের বিষয়েও কিছু কিছু নূতন তথ্য সংগৃহীত হয়।

কুলিঅনা গ্রামটি একখণ্ড উচ্চ সমতল ভূমির উপরে প্রতিষ্ঠিত। ইহার আশপাশে নীচু মাটিতে চাষ হয়, কিন্তু উঁচু জমি অত্যন্ত কঠিন এবং কাঁকরে ভরা বলিয়া চাষ-আবাদ সম্ভব নহে। শাল, আসন, কেন্দু, চার, চরলা, অতান্ডি প্রভৃতি নানাবিধ বন্য বৃক্ষলতায় ইহার পার্শ্ববর্তী দেশ আচ্ছন্ন। বনের মধ্যে ইতস্তত রাজসরকার পথনির্মাণের জন্য কাঁকরের খাদ খনন করিয়াছেন। এগুলিকে ওড়িয়া ভাষায় গুড়ি-খাদান বলে। গুড়ি খাদানগুলি কাটিবার সময়ে প্রায়ই প্রাচীন যুগের পাথরে তৈয়ারি অস্ত্রাদি বাহির হয়। কুলিঅনা গ্রামে এবং নিকটবর্তী প্রতাপপুর, কলাবাড়িয়া, নুয়াবেড়ি, সান্ডিম প্রভৃতি গ্রামে সর্বসমেত প্রায় সাত শত যন্ত্র বা অস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঠিক কতকাল পূর্বে এই সকল অস্ত্র ব্যবহৃত হইত তাহা সমস্যার বিষয়, তবে সচরাচর এগুলি ভূপৃষ্ঠের দুই হইতে পাঁচ-ছয় ফুট গভীর স্তরে পাওয়া যায়। দু-একটি দশ ফুট গভীর স্তর হইতেও পাওয়া গিয়াছে।

মাটির নীচে বিভিন্ন স্তরের কোন্‌টি কোন্‌ সময়ে গঠিত হইয়াছিল তাহা নির্ধারণ করিবার জন্য আমাদিগকে চারিদিকের গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া মাটি এবং পাথর পরীক্ষা করিতে হয়। পরীক্ষার ফলে দেখা গেল কুলিঅনার পূর্বদিকে প্রায় দুই-তিন মাইল অন্তরে আরও উচ্চভূমি বর্তমান রহিয়াছে। এক সময়ে এইখানে ছোটোখাটো পাহাড়ের শ্রেণি ছিল এবং সেই পর্বতমালা হইতে প্রাচীনকালে একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হইয়া বুড়াবলঙ্গার সহিত সম্মিলিত হইত। কালক্রমে পবর্তটি লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, কিন্তু জমির ঢালু পরীক্ষা

করিলে এখনও সেই নিশ্চিহ্ন পার্বত্য স্রোতস্বিনীর পথ আবিষ্কার করা যায়। সেই নদী এককালে যে-সকল নুড়ি ও কাদা মিশাইয়া স্তরের পর স্তর রচনা করিয়াছিল, আমরা তাহারই মধ্যে পাথের নির্মিত কুঠার ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র কুড়াইয়া পাই।

প্রাচীন কালে মানুষ নদীস্রোতের কাছাকাছি বাস করিতে ভালোবাসিত। তাহারা তখনও মাটি পোড়াইয়া জলের পাত্র নির্মাণ করিতে শিখে নাই, সেই জন্য তাহাদিগকে জলের কাছে, হয়ত বনের ভিতরে, বাস করিতে হইত। ময়ূরভঞ্জের মত ফ্রান্স, স্পেন, ইংল্যান্ড, আফ্রিকার পূর্ব এবং দক্ষিণ অঞ্চলে, ভারতবর্ষের মধ্যে মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশেও একই আকারের অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গিয়াছে। নৃতত্ত্ববিদগণ অনুমান করেন যে ইহার দ্বারা মানুষ প্রধানত শিকার করিত এবং চামড়া হইতে মাংস ছাড়াইয়া তাহা নানারূপে ব্যবহার করিত।

ময়ূরভঞ্জের জঙ্গালে, বিশেষত সিমলিপাল পর্বতের পার্শ্ববর্তী দেশে, খাড়িয়া নামে একটি আদিম জাতি বসবাস করে। ইহারা বনের ফলমূল আহরণ এবং অরণ্যজাত ধুনা, মধু, মোম প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া অন্য জাতির নিকটে বিক্রয় করে। সেই পয়সায় নুন ও কাপড় কেনে অথবা রাজাকে খাজনা দেয়। খাড়িয়া জাতি গাছে উঠিতে খুব ওস্তাদ। হাতে একখানি কুঠার লইয়া ইহারা প্রায় খাড়া গাছেও সহজে উঠিয়া যায়। প্রথমে এক দিকে গাছের গুঁড়িতে কোপ মারিয়া পায়ের বুড়া আঙুল রাখিবার মত জায়গা করিয়া লয়। তাহার পর অপর হাতে কুঠার লইয়া আরও উপরে কোপ মাপে, সেখানে অন্য পায়ের বুড়া আঙুলে ভর দিয়া কিছু উপরে উঠিয়া যায়। এইরূপে ক্রমাগত কোপ দিতে দিতে বহু উঁচু গাছেও খাড়িয়াগণ উঠিতে পারে। এ-বিদ্যায় ময়ূরভঞ্জে তাহাদের জোড়া আর মেলে না।

এক দিন কুলিঅনায় আমরা কয়েক জন খাড়িয়ার সহিত কথাবার্তা বলিয়াছিলাম। তাহাদের নিকটে শুনিলাম যে বনে তাহারা বিভিন্ন ঋতুতে চার, কেন্দু প্রভৃতি নানাবিধ ফল সংগ্রহ করিয়া থাকে। আবার মাটির ভিতরে খামালুর মত অনেক প্রকার কন্দমূল সংগ্রহ করে। মাটির ভিতরে মূল কিন্তু সবগুলি সহজলভ্য নহে। কোনো কোনো লতার মূল পর্যন্ত পৌঁছিতে এক মানুষের বেশি গভীর গর্ত করিতে হয়। পুরুষেরা খন্তা লইয়া মাটি কাটে এবং ঝুড়িতে মাটি তুলিয়া দেয়, খাড়িয়া মেয়েরা সেই মাটি ফেলিতে থাকে। অবশেষে হয়ত বড় একখণ্ড মূল সংগৃহীত হয়, তখন সকলে মিলিয়া তাহা ভক্ষণ করে।

ঝুড়ি নির্মাণ করিবার উপাদানও গ্রামবাসীগণ বনের লতাপাতা হইতে সংগ্রহ করিয়া লয়, সব সময়ে বাঁশ দিয়া নির্মাণ করে না। আমরা পৌষ মাসে কুলিঅনায় খননকার্যের জন্য গিয়াছিলাম, তখন বনে একটি লতায় স্তবকে স্তবকে সাদা ফুল ফুটিয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম। এই লতার সাহায্যে গ্রামের মধ্যে লোকে ঝুড়ি বুনিয়া লয়, ইহার নাম অতান্ডি। বনের মধ্যে বহুবিধ গাছের ফল হইতে ময়ূরভঞ্জের অধিবাসীগণ তৈল নিষ্কাশন করিয়া থাকে। ভেলা, বাঘনখির ফল, মহুয়া ও রেড়ির বীজ এবং শিয়ালকাঁটার সরিষা হইতে নানা উপায়ে ইহারা তেল বাহির করিতে জানে। তাহাদিগকে এজন্য কলুর শরণাপন্ন হইতে হয় না। শুকনা তাতের দ্বারা অথবা বীজগুলিকে ছেঁচিয়া ফুটাইয়া অথবা ভাপানোর

পর দুই খণ্ড কাঠের মধ্যে নিষ্পেষিত করিয়া তাহারা যে কী সহজে তৈল সংগ্রহ করে তাহা দেখিলে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়। কোনো তেল ঔষধের জন্য ব্যবহৃত হয়, কোনোটি গাড়ির চাকায় দিবার জন্য, কোনোটি রন্ধনকার্যে প্রয়োগের জন্য সংগৃহীত হইয়া থাকে।

কিছু দিন পূর্বেও ময়ূরভঞ্জে একটি প্রাচীন শিল্প জীবিত ছিল, এখন তাহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সিমলিপাল পর্বতের মধ্যে লৌহের উৎকৃষ্ট খনি আছে। এখানকার কামার জাতি পূর্বে দুইটি পায়ে চালানো হাপরের সাহায্যে ছোটো চুল্লিতে লোহা গলাইত। কিন্তু লৌহ গলানোর জন্য অনেক কাঠকয়লার প্রয়োজন হয়। রাজ্যে বনসম্পদ সংরক্ষণের জন্য আজকাল সরকার তাহাদিগকে কাঠকয়লা পোড়াইতে দেন না বলিয়া লৌহশিল্পটি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এখনও এমন দু-চার জন বৃধ্ধ কারিগর আছে যাহারা নিজে হাতে লোহা গলাইয়াছে, কিন্তু আজ তাহাদের একান্ত দুরবস্থা। কেহ চাষবাস ধরিয়াছে, কেহ বা কেনা লোহায় যন্ত্রপাতি নির্মাণ করিয়া গ্রামবাসীর নিকট বিক্রয় করে।

বনের মধ্যে স্বীয় বুদ্ধিবলে এবং পরস্পরের সাহচর্যের দ্বারা ইহারা সকলে বাঁচিয়া থাকে, পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা-দ্বেষ করিলে ইহাদের পক্ষে বাঁচিয়া থাকাই কঠিন হইত, তাই গ্রামের দরিদ্র অধিবাসীগণের মধ্যে সামাজিকতার বোধ শহরের মধ্যবিত্ত অধিবাসীগণ অপেক্ষা হয়ত বেশি। গ্রামের মধ্যে ঢাক-ঢোলের বাজনা শুনিতে পাওয়া যায়। যাহারা অপেক্ষাকৃত 'সভ্য' হইয়াছে তাহারা হরিনাম সংকীর্তন করে, তদপেক্ষা 'অসভ্য' জনে মনের আনন্দে নাচগান করিয়া থাকে।

খাড়িয়াদের মতো বাথুড়ি নামে অপর একটি জাতি কুলিঅনার নিকটবর্তী অঞ্চলে বাস করে। বাথুড়িরা দরিদ্র হইলেও খাড়িয়া জাতি অপেক্ষা অবস্থাপন্ন। বাথুড়িরা চাষবাস করে, পাথর বা কাঠের জাঁতায় তেল পিষিয়া লয় এবং অসুখ করিলে বনের ওষধি-সংযোগে তাহার চিকিৎসা করিয়া থাকে। বাথুড়িদের নানাবিধ নাচগান আছে। চাঙ্গু নামে ইহাদের এক প্রকার চর্ম-নির্মিত বাদ্যযন্ত্র আছে। বসন্তকালে চাঙ্গু পিটিয়া বাথুড়ি যুবকগণ গ্রামে গ্রামে নাচ দেখায়। স্বীয় গ্রামে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে সম্মিলিতভাবে নৃত্য করে। ময়ূরভঞ্জে সাঁওতালের সংখ্যা কম নহে। সাঁওতালগণ অপরাপর জাতি হইতে অপেক্ষাকৃত স্বতন্ত্রভাবে বাস করে। তাহাদেরও নাচগান আছে এবং সাঁওতাল গ্রামে মাদলের শব্দ রোজ সন্ধ্যাবেলা শুনিতে পাওয়া যায়। শীতকালে কুলিঅনায় সাঁওতালদের কুকুড়া-উড়া নামে একটি বিখ্যাত পরবের অনুষ্ঠান হয়, সারারাত নাচগান চলিতে থাকে এবং ক্রোশ-ক্রোশান্তর হইতে নানা জাতির লোক সেই মেলা দেখিতে আসে।

আমরা যে-সকল পাথরের অস্ত্র মাটি খুঁড়িয়া পাইয়াছিলাম, তাহা লইয়া খাড়িয়া, বাথুড়ি, ভূমিজ প্রভৃতি সকলের সঙ্গেই আলোচনা করিতাম। আজকাল সকল জাতিই লোহার যন্ত্রাদি ব্যবহার করে। পাথরের মধ্যে যাঁতা, শিল-নোড়া, থালা, বাটি ও তেল পিষিবার জাঁতার অংশ বিশেষ নির্মিত হয়। সেইজন্য পুরাকালের পাথরের অস্ত্রগুলি ইহাদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত বস্তু। তাহারই মধ্যে যেগুলি ঘষিয়া মাজিয়া পালিশ করা হইত, ময়ূরভঞ্জের গ্রামাঞ্চলের লোকে এখনও সেগুলিকে সংগ্রহ করিয়া থাকে। তবে পূর্বকালে লোকে নিত্য প্রয়োজনের জন্য উহা ব্যবহার করিত, ইহারা তাহার লৌকিক ব্যবহার কিছু

জানে না। এগুলিকে অলৌকিক পদার্থ বলিয়া কল্পনা করে। পালিশ করা পাথরের কুঠারকে উড়িয়া ভাষায় চড়কপথর বলে, ইহার অর্থ বাজ-পাথর। ইহাদের ধারণা বজ্রপাতের সময়ে মাটির উপরে একখণ্ড এইরূপ পাথর বর্ষিত হয়। অনেকের বিশ্বাস চড়কপথর কুড়াইয়া পাইলে ঘরে রাখা উচিত, তাহাতে গৃহস্বামীর মঙ্গল হয়।

পাথরের অস্ত্রাদির ব্যবহার কত কাল হইল লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, আমাদের নিকটে আজ তাহা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেকালের মানুষের জীবনযাত্রার কাহিনি আমাদের নিকটে বিস্ময়ের সামগ্রীতে পরিণত হইয়াছে। মাটি খুঁড়িলে আমরা এইরূপে প্রাচীন সভ্যতার বহু নিদর্শন খুঁজিয়া পাই। ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের মধ্যেই অন্যান্য অঞ্চলে প্রস্তর-যুগের পরে তাম্রযুগের আবির্ভাবের সংবাদ পাওয়া যায়। তখনও মানুষে লোহা গলাইতে শিখে নাই, তামার দ্বারা কুঠার এবং বর্শাফলক নির্মাণ করিয়া লইত। এরূপ তামার একখণ্ড কুঠারফলক কয়েক শত বৎসর পূর্বে হয়ত কেহ কুড়াইয়া পাইয়াছিল। পরবর্তী কালে কোনো রাজা জনৈক ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়া দানপত্র সেই তাম্রফলকে উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন। গড়পদা নামক গ্রামের সেই ব্রাহ্মণপরিবার উত্তরকালে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন, কিন্তু আজও তাঁহাদের গৃহে প্রাচীন কালের উৎকীর্ণ দান-লিপিটি সযত্নে রক্ষিত আছে।

ময়ূরভঞ্জের ইতস্তত আমরা এইরূপ প্রাচীন সভ্যতার নানাবিধ নিদর্শন দেখিতে পাই। তদ্ভিন্ন গ্রামবাসীদের মধ্যে পূর্বকালের শিল্পকর্ম তো এখনও ক্ষীণকায় অবস্থায় কিছু কিছু বাঁচিয়া আছে। চেষ্টা করিলে হয়ত ইহা হইতে আমাদেরও শিখিবার মত জিনিস পাওয়া যায় এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা নূতন নূতন শিল্পের প্রবর্তন করিতে পারিলে গ্রামের যথেষ্ট আর্থিক উন্নতিও সাধিত হয়।

প্রবাসী ● আশ্বিন ১৩৪৭ (১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ)



ময়ূরভঞ্জের পার্বত্যজাতি

শ্রীফণীন্দ্রনাথ বসু

ময়ুরভঞ্জে যেসব হিন্দু বাস করেন, তাঁরা হয় বাঙালি না হয় উড়িয়া। সেখানে উড়িষ্যাবাসীদেরই প্রভাব বেশি। হিন্দু ছাড়া যারা সেখানে সাধারণত বাস করে তারা সেখানকারই পার্বত্য জাতি। ময়ুরভঞ্জের এক অংশ সিংভূমের দিকে বলে সেখান থেকে কিছু কিছু বাঙালি ও কূর্মি ময়ুরভঞ্জে আশ্রয় নিয়েছে। আর অপর দিকে উড়িষ্যার লোকেরা সেখানে গিয়ে নিজেদের প্রভূত্ব বিস্তার করেছে। পার্বত্য জাতিদের আমরা সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথম ভাগ, যারা হিন্দু সভ্যতা ঠিকভাবে গ্রহণ করেনি, যদিও তারা হিন্দুসভ্যতার সংস্পর্শে এসেছে, যেমন সাঁওতাল, কোল প্রভৃতি। আর দ্বিতীয়, যারা হিন্দু সভ্যতা গ্রহণ করে নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দিচ্ছে, যেমন ভুঁইয়া, বাথুড়ি, পুরাণ, ভূমিজ, পান প্রভৃতি। এদের আদমশুমারির সময় সরকার অর্ধ হিন্দু বলে গণ্য করে। এছাড়া যারা আছে, যেমন উড়িয়া ব্রাহ্মণ, করণ, গোড়, মহন্ত এরা পুরামাত্রায় হিন্দু। সুতরাং এখানে আমরা একদল লোক পাচ্ছি যারা সভ্যতার গন্ডির বাইরে ; আর একদল, যারা সভ্যতার গন্ডির মধ্যে আসছে ক্রমশ, ও অপর একদল যারা একটা সভ্যতার গন্ডির মধ্যেই রয়েছে।

হিন্দুধর্মের নামে একটা নালিশ আছে যে, হিন্দুধর্মে বিজাতীয় লোকেরা প্রবেশ করতে পায় না। কিন্তু ময়ুরভঞ্জে আমরা বেশ স্পষ্ট দেখতে পাই কেমন ভাবে পার্বত্য জাতিরা নিজেরাই ক্রমশ হিন্দুর আচার-ব্যবহার গ্রহণ করছে ও কিছুকাল পরে নিজেদের হিন্দু বলে বড়ো গলায় ঘোষণা করছে ও উপবীত গ্রহণ করছে। এই সব জাতিকে হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করবার জন্য কোনো সভাসমিতি করতে হয়নি, কোনো আন্দোলন করতে হয়নি, তারা

আপনা থেকেই হিন্দুধর্মের গণ্ডির ভিতরে প্রবেশ করছে। অনেক সময় দেখা গেছে যে, ময়ুরভঞ্জের কোল বা সাঁওতালরাও নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দিতে চায়। ভুঁইয়া, বাথুড়ি, পুরাণ এই সব জাতিরা বৈষ্ণব ধর্ম অনুসরণ করে। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় তারা খোল-করতাল নিয়ে ভূমিতে নানারকম আলপনা এঁকে সংকীর্তন করে। সকলের চেয়ে মজার জিনিস এইটি যে, হরিনাম সংকীর্তনের সময় তারা বাংলা কীর্তন করে। আর মহন্তরা বা পানেরা "করম-পূজার" সময় যেসব গান করে সেগুলিও বাংলা। উড়িষ্যার অন্যান স্থানেও যেমন চৈতন্যদেবের প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব দেখা যায়, ময়ূরভঞ্জের সংকীর্তনেও সেই প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। আর মহন্তরা করমপূজার সময় যেসব বাংলা গান করে, সেগুলি বোধ হয় সিংভূম বা মানভূম হইতে গিয়াছে। আর একটি লক্ষ করিবার বিষয় এই যে—ভুঁইয়া, বাথুড়ি, পুরাণ, ভূমিজ প্রভৃতির পুরোহিত উড়িয়া ব্রাহ্মণ, কিন্তু মহন্তদের পুরোহিত হচ্ছে বাঙালি ব্রাহ্মণ। এইসব বাঙালি ব্রাহ্মণদের নামের শেষে "ঠাকুর" শব্দ ব্যবহার করা হয়, যেমন গৌর ঠাকুর। বাংলা দেশেও সেই প্রথা এখনও আছে, অনেক সময় পুরোহিতকে "ব্রাহ্মণ ঠাকুর" বা "ঠাকুর মশাই" বলা হয়। যা হোক, মনে হয় মহন্তদের ব্রাহ্মণ পুরোহিতও বাংলা দেশ থেকে আমদানি। হিন্দুমন্দিরে এ সকল জাতিই পূজা দিতে আসে। এমনকি খিচিং-এর ঠাকুরানির মন্দিরে সাঁওতাল কোলরাও মুরগি মানত করে পূজা দেয়।

আমরা যেমন সাধারণত লোকেদের আর্য বা অনার্য অথবা সভ্য ও অসভ্য এই দুই ভাগে করি, তেমনি ময়ুরভঞ্জের লোকেদের মধ্যেও সভ্যতার পরিমাণ নির্দেশের জন্য দুটি বিভাগ আছে। একটি "হাটুয়া" অর্থাৎ যারা সাধারণত সভ্যতার দাবি করে, যেমন উড়িয়া ব্রাহ্মণ, করণ প্রভৃতি ; অপরটি "কলাপিটিয়া" অর্থাৎ যারা সভ্যতার স্তরে এখনও পৌঁছে নাই, যেমন ভুঁইয়া, পুরাণ, বাথুড়ি প্রভৃতি। কিন্তু কোনো কোনো স্থানে ভুঁইয়ারাও নিজেদের "হাটুয়া" বলে দাবি করেছে। এর কারণ বোধ হয় এই যে, তাহারও উড়িষ্যাবাসীদের মতো দ্রুত সুসভ্য হয়ে উঠছে। সেজন্য অনেক স্থলে তারা নিন্দনীয় প্রথা ত্যাগ করছে, যেমন, অনেকে নিষিদ্ধ মাংস বা মদ্য খাওয়া ত্যাগ করেছে। অনেকে আবার সুসভ্য হবার জন্য নিজেদের যে নাচের প্রথা আছে, তাও ছেড়ে দিচ্ছে। অনেকে আবার মুখে স্বীকার করে না যে তাদের মধ্যে নাচের প্রথা আছে, যদিও উৎসবের সময় নিজেদের মধ্যে নাচ হয়। এখনও ভূমিজদের মধ্যে যে-রকম নাচের প্রথা রয়েছে, তা দেখে মনে হয় যে, এ নাচ সাঁওতাল বা কোল নাচ অপেক্ষা অনেক খারাপ। সাঁওতাল বা কোলদের নাচে যে স্বচ্ছন্দ ভাব ও গতি দেখতে পাওয়া যায়, এদের নাচে তা পাওয়া যায় না। বরং সাঁওতাল বা কোল মেয়েরা যেমন স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দভাবে নাচে যোগ দেয়, এদের মধ্যে তার যথেষ্ট অভাব দেখা যায়। শুধু একটি মাত্র মেয়ে এই নাচে পুরুষদের সঙ্গে যোগ দেয়, এবং সেই মেয়েও কাপড়-চোপড়ে সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত হয়ে দেখা দেয়। এখানেই এই সব জাতিদের উপর হিন্দুসভ্যতার কুফল দেখা যায়। যেখানে মেয়েদের অবাধ ও স্বচ্ছন্দ গতি ছিল, সেখানে হিন্দুসভ্যতার ফলে অবাধ গতি আড়ষ্ট হয়ে গেছে।

শুধু এই নয়, হিন্দু সমাজের অন্য কুফলও তাদের মধ্যে দেখা গেছে। হিন্দুসমাজে যে

ছুৎমার্গ এত অনিষ্টসাধন করেছে, সেই ছুৎমার্গ এদের মধ্যে প্রবেশ করেছে। অনেক স্থানে এই ছুৎমার্গ খুব প্রবল আকার ধারণ করেছে। যেমন হিন্দুসমাজে উচ্চনীচ জাতিভেদ আছে, এদের মধ্যেও তেমনি আছে। ভুঁইয়া, পুরাণ, বাথুড়ি,—এরা নিজেদের উচ্চজাতি বলে মনে করে এবং ভূমিজ বা পানকে স্পর্শ করতেও চায় না। স্পর্শ করলে যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় এই এদের ধারণা। প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেন এদের উড়িয়া ব্রাহ্মণ—যাকে অনেক সময় "ব্রহ্মা" বলা হয়। সেজন্য পুরাণ বা বাথুড়িরা নীচজাতির সঙ্গে কাজ পর্যন্ত করতে চায় না।

এইসব জাতিদের মধ্যে ভুঁইয়াই সকলের শ্রেষ্ঠ। কেয়ঞ্জর রাজ্যে ভুঁইয়ারা রাজার অভিষেকের সময় রাজাকে "রাজতিলক" পরিয়ে দেয়। অনেকে মনে করেন যে, ভুঁইয়ারাই আগে ময়ূরভঞ্জের রাজা ছিল, পরে তাদের হাত থেকে "ভঞ্জ" রাজারা রাজশক্তি কেড়ে নিয়েছে। খিচিং-এ যে ঠাকুরানির মন্দির আছে তাতে ভুঁইয়ারা অনেক উচ্চপদ পেয়েছে। সেই মন্দিরে ব্রাহ্মণ পুরোহিত থাকা সত্ত্বেও, একজন ভুঁইয়া পুরোহিত আছে। তাকে "দেহুরি" বলা হয়। এছাড়া আরও অনেক ভুঁইয়া কর্মচারী সেই মন্দিরে নিযুক্ত আছে। এইসব কাজের জন্য তারা ব্রহ্মোত্তর উপভোগ করে। এজন্য ভুঁইয়ারা সাধারণত অন্য জাতি অপেক্ষা বেশি সম্মান পায়। ভুঁইয়ারা নানা "খিলি" বা শ্রেণিতে বিভক্ত। এক খিলির লোকে সেই খিলির মেয়ের বিবাহ করতে পারে না। কতকগুলি খিলির নাম—(১) অসুরাঢ় (২) কান্তি (৩) কাশিয়াড় (৪) বাঢ়মুণ্ডী (৫) নারেঙ্গি প্রভৃতি। এদের বিশ্বাস যে এরা পশ্চিম দিক থেকে এসেছে, এবং প্রথম যারা আসে তারা বারো ভাই ছিল, সেই অনুসারে এদের মধ্যে বারো খিলির নাম হয়েছে। এদের মধ্যে জনশ্রুতি আছে যে এরা ভূমি থেকে হয়েছে বলে এদের ভুঁইয়া বলা হয় এবং নাগভূমিকে মাথায় করে রাখে বলে এদের "নাগেশ" গোত্র। এদের সমাজবন্ধন খুব সুদৃঢ়। সমস্ত ভুঁইয়াদের সমাজ-নেতা যিনি হন, তাঁর নাম "ভল্‌ভাই"। ময়ূরভঞ্জের সকল ভুঁইয়ারা একত্র মিলিত হয়ে সমাজের নেতা ভল্‌ভাইকে নির্বাচন করে, পরে রাজা সেই নির্বাচনে নিজের সম্মতি জানান। ভল্‌ভাইয়ের সাহায্যের জন্য আর একজন কর্মচারী থাকে, তার নাম "ডাকুয়া"। ডাকুয়ার কাজ সভা আহ্বান করা। যখন বিশেষ প্রয়োজনে সব ভুঁইয়াদের ডাকার দরকার হয়, তখন ডাকুয়া সকলকে একস্থানে সমবেত করায়। সেখানেই সামাজিক সব প্রশ্নের মীমাংসা হয়। এছাড়া আর একজন কর্মচারী আছে, তার নাম—"পাণিপাত্র"। যখন কোনো সামাজিক ভোজ হয়, তখন পাণিপাত্রই সকলের প্রথমে অগ্নিদেবকে ভোজ্যদ্রব্য অর্পণ করে নিজে খান।

বাথুড়িরা এখনও অনেক স্থানে জমিদাররূপে আছে। করণজিয়া, আদিপুর, দাসপুর ও সিমলিপালে বাথুড়ি জমিদার এখনও দেখা যায়। এরা অন্যদের চেয়ে কিছু পরিমাণে শিক্ষিত। এরাও নানা খিলিতে বিভক্ত। পুরাণদেরও নানা খিলি আছে, যেমন—সি, ধড়, দেও, ধীর প্রভৃতি। এছাড়া এদের গোত্র আলাদা, সেই সব গোত্রের নামে আমরা নানারকম জন্তুর নাম পাই ; যেমন "শাল" অর্থাৎ মাছ, "খুন চড়ই" অর্থাৎ পাখি, "নাগ" অর্থাৎ সাপ। পুরাণদের সামাজিক নেতা যিনি তাঁকে "বাবু" বলা হয়, তাঁহার সহায়তার জন্য "করণ" আছে। অনেক সময় সমাজ-নেতা আর একজন কর্মচারী নিযুক্ত করেন, তাকে

বলা হয় "দেশপ্রধান"। দেশপ্রধানের অধীনে যে কর্মচারী থাকে তাকে বলা হয় "মহানায়েক"।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে ভূমিজ ও পান এদের মধ্যে নীচ জাতি বলে বিবেচিত হয়। ভুঁইয়া পুরাণ ও বাথুড়িদের ব্রাহ্মণ পুরোহিত আছে, কিন্তু ভূমিজ ও পানদের পুরোহিত নাই। পানদেরও নানা রকম খিলি আছে, ভূমিজদেরও আছে। পানদের পূজা ও বিবাহাদি কাজ "বোষ্টুমে" করে, বোষ্টুমের অধিকার কেবল এই জাতির মধ্যেই বিস্তৃত। ভূমিজদেরও পূজাদি উড়িয়া ব্রাহ্মণে করে না, "দেহুরি" করে। একটু মজা এই যে ভুঁইয়া পুরাণ ও বাথুড়িদেরও দেহুরি পুরোহিত আছে, আবার উড়িয়া ব্রাহ্মণ পুরোহিত আছে। যখন হিন্দু দেবদেবীর পূজা হওয়া দরকার, তখন ব্রাহ্মণ এসে শাস্ত্রবিধান মতো পূজা করে, কিন্তু যখন নিজেদের জাতীয় পূজার দরকার তখনই দেহুরির ডাক পড়ে। সেজন্য এদের পূজা পার্বণেব মধ্যে দুটি স্তর আমরা পাই, এক স্তর হচ্ছে হিন্দু সমাজ থেকে আমদানি, আর এক স্তর হচ্ছে এইসব জাতির আদিম পূজাপার্বণ। একদিকে যেমন হিন্দু সমাজ এইসব জাতির উপর নিজের প্রভাব বিস্তার করেছে, হিন্দুদের লক্ষ্মীপূজা, সরস্বতী পূজা, জীমূতবাহন পূজা, করম রাজার পূজা, ত্রিনাথদেবের পূজা, মকর পরব, নবান্নের উৎসব ("নুয়া খাওযা") যেমন এইসব জাতির মধ্যে প্রবেশ করেছে, তেমনি এদের যে আদিম পূজা তাও ওই দেশেব হিন্দুসমাজে প্রবেশ করেছে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে—"বাবখণ্ডা"। সাধারণত গ্রামের সর্দারের বাড়ির কাছে একটি চালাঘরে বারখণ্ডার পূজা হয়। সেখানে কতকগুলি মাটিব মূর্তি, বিশেষ করে মাটির ঘোড়া রাখা আছে। যখন কারও অসুখ করে বা কোনো বিপদ হয়, তখন অসুখ বা বিপদ থেকে মুক্তিলাভ করবাব জন্য এখনও পূজা "মানত" করে ও বিপদ থেকে উদ্ধার পেলে যথাসাধ্য পূজা দেয়। এখানকার পুরোহিতকে দেহুরি বলা হয়। এখনও ভুঁইয়া, পুরাণ, বাথুড়িদের সঙ্গো হিন্দুরাও এমনকি ব্রাহ্মণবাও পূজা দিয়ে থাকে। এছাড়া দেহুরিরা "বড়ামের"ও পূজা করে। এখানেও হিন্দুরা পূজা দিতে সংকোচ বোধ করে না।

প্রবাসী ● চৈত্র ১৩৩৫ (১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ)



জুয়াঙ্গ জাতি

শ্রীনির্মলকুমার বসু

উড়িষ্যা প্রদেশটিকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়। সমুদ্রের কূলে যে সমতল অংশটি আছে তাহাকে স্থানীয় লোকেরা মোগলবন্দি বলিয়া থাকে এবং তাহারা পশ্চিমে যে গভীর অরণ্যময় পার্বত্য প্রদেশ আছে তাহাকে গড়জাত বলে। উড়িষ্যা প্রদেশ মোটের উপর পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম হইতে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ঢালু। উড়িষ্যায় নদীর সংখ্যা বহু। কলিকাতা হইতে পুরী যাইতে হইতে কত যে বড়ো বড়ো নদী পড়ে তাহার ঠিকানা নাই। সুবর্ণরেখা, ব্রাহ্মণী, বৈতরণী, মহানদী প্রভৃতি তাহাদের মধ্যে প্রধান। তাহা ছাড়া শাখা-প্রশাখা যেগুলি আছে, তাহাদের সংখ্যা দশ বারোটির কম নহে। এই সকল নদী গড়জাতের পার্বত্য অংশ ভেদ করিয়া আসিয়াছে। পাহাড়ের মধ্যে যেখান দিয়া নদী বহিয়া যায়, সেখানকার দৃশ্য অতি রমণীয়। কোথাও বা গভীর খাদ, দুই পাশে ঘন বনে ঢাকা পাহাড়, বায়ুচলাচলের অভাবে সমস্ত স্থানটি একরকম ভিজা গরমে ভর্তি হইয়া আছে ; আবার কোথাও-বা নদী বেশ প্রশস্ত হইয়া গিয়াছে, মাঝে বালুর চরে চকাচকি বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে অথবা কুমির শুষ্ক কৃষ্ণবর্ণ কাঠের মত পড়িয়া আছে, অথবা হাঁ করিয়া রোদ পোহাইতেছে। দুই পাশে ঘন শালের বন, ঈষদুন্নত জমির উপর যেন সবুজের ঢেউ খেলিয়া গিয়াছে। এমন দৃশ্য ওড়িশার গড়জাতের বহু স্থানে দেখা যায়।

মোগলবন্দিতে যে-সকল উড়িয়া-ভাষাভাষী চাষিরা বাস করে তাহারা বহুদিন ধরিয়া গড়জাতের নদীর ধারে নিজের নিজের বসতি বিস্তার করিতেছে। পাড়ের জমি উর্বরা, অল্প চেষ্টায় সেখানে ভাল ফসল হয় বলিয়া তাহারা নদীর কূল ছাড়িয়া দূরে যাইতে চায় না। সেখানেই গ্রাম বাঁধে, ক্রমে মন্দির নির্মাণ করে, রাজা হয়, গড় হয়, আর স্থানীয় লোকেরা নদীর কূল ছাড়িয়া ক্রমশ জঙ্গলের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে চলিয়া যায়। বহুদিন ধরিয়া

এমনি একটা সম্বন্ধ উড়িয়াদের সহিত শবর, কোল প্রভৃতি জাতির চলিয়া আসিতেছে। তাহারা জঙ্গলে শিকার করিয়া খায়, অল্পস্বল্প চাষ করে. তাহাও তেমন ভাল নয়। প্লাবনে যখন নদীর তীরে থাকা কঠিন হয় তখন জঙ্গলিরা বনের মধ্যে সরিয়া পড়ে।

চাষিরা ইহাদের ঘৃণা করে, ছোঁয় না অথচ যখন কাজের দরকার হয় তখন ইহাদের সাহায্য লইতেও ছাড়ে না। জুয়াঙ্গ ইহাদেরই মধ্যে একটি জাতি। আমি যখন প্রথম জুয়াঙ্গাদের মধ্যে যাই তখন তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কি কুলির দরকার?" আমি যে তাহাদের ভাষা শিখিতে আসিয়াছি, তাহাদের সঙ্গে মিশিতে আসিয়াছি একথা তাহারা আদৌ বিশ্বাস করিল না। ক্রমে আলাপসালাপের পর যখন তাহাদের মধ্যে বসিয়া গানবাজনা শুনিতেছি তখন পার্শ্ববর্তী গ্রামের এক জন ব্রাহ্মণ জনমজুরের খোঁজে একদিন সেখানে আসিয়া পড়িল। সে তা ভাষা শেখার কথা শুনিয়া হাসিয়াই ফেলিল। বলিল, 'বাবু ওদের তো ভাষা নাই। বাঁদরেরা যেমন কুঁই-কাঁই করে, ওদেরও সেই রকম ঠার আছে।' ভাবিলাম, হায় রে, সুখে দুঃখে পাশাপাশি থাকিয়াও মানুষে এমন করিয়া মানুষের সহিত ব্যবধান সৃষ্টি করে, তাহাকে মানুষ বলিয়া পর্যন্ত ভাবিতে পারে না, ইহার চেয়ে দুঃখের কথা আর কিছু হইতে পারে না।

জুয়াঙ্গেরা উড়িয়া বোঝে, বলিতে পারে। তবে সে উড়িয়া কটক-পুরীর উড়িয়ার মতো শুদ্ধ নয়, প্রথমে উচ্চারণের পার্থক্যের জন্য একটু বুঝিতে কষ্ট হয়, ক্রমে কানে সহিয়া যায়। নিজেদের মধ্যে কিন্তু তাহারা আপন ভাষা বলে। সেই ভাষা কতকটা কোল, কতকটা খড়িয়া ভাষার মত। তাহা শিখিবার জন্য একবার আয়োজন করিয়া পাল-লহড়া নামে একটি ক্ষুদ্র গড়জাতে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

পাল-লহড়া রাজ্যের পূর্ব প্রান্তে অর্ধচন্দ্রকার রূপ ধারণ করিয়া একটি পর্বতশ্রেণি আছে। তাহার নাম মাল্যগিরি। যেন মালার মত রাজ্যের এক প্রান্ত বেড়িয়া আছে বলিয়া তাহার এই নাম। ঘন বনে মাল্যগিরির পাদদেশ আচ্ছন্ন, মধ্যে মধ্যে ছোটো নদীনালা তাহা ভেদ করিয়া গিয়াছে। বাঘ ভালুকের তো কথাই নাই, হাতি, বন্য মহিষ প্রভৃতি জন্তুরও এখানে অভাব নাই। তাহাদের পায়ের চাপে শবরদের ধানখেতগুলি মথিত হইয়া যায়, অতি কষ্টে ফসলের তিন-ভাগের একভাগ বাঁচাইতে পারিলেই চাষিরা যথেষ্ট পাইয়াছি মনে করে। একদিন রাত্রে তাঁবুতে শুইয়া আছি, একশত গজ দূরে নদীর ধারে হঠাৎ খুব টিন বাজিতে লাগিল। পরের দিন শুনিলাম রাত্রে আখের খেতে হাতি আসিয়াছিল, তাহাকে তাড়ানোর চেষ্টায় চাষিরা অত চেঁচামেচি করিয়াছিল। এমন প্রায়ই হইত।

বনের মধ্যে সারাদিন কাজের পর যখন বেড়াইতে যাইতাম তখন হয়ত বা হঠাৎ কোনো ভারী খুরবিশিষ্ট জন্তুর পায়ের আওয়াজ পাইলাম। বনের অন্তরালে যেন কেহ কাহাকেও সবেগে অনুসরণ করিতেছে। তাহার পরেই হঠাৎ হরিণের গলার ডাক পাইলাম। বুঝিলাম কোনো হরিণ হয়ত তাহার সঙ্গিনীর পিছনে দৌড়াইতেছে ও নিমেষের মধ্যে সমস্ত উপত্যকাটি ঘুরিয়া আসিতেছে। হরিণীরা খানিক ছুটিয়া যায় আবার দাঁড়ায়, আবার ছোটে আবার দাঁড়ায়, যেন নিরীহ ভালো মানুষটি। হরিণ হঠাৎ তাহাকে সন্ধান করিয়া তিরবেগে লতাপাতার ফাঁকে ফাঁকে ছুটিয়া চলে, দেখিতে না পাইলে ডাকে, এমনি করিয়া তাহাদের মধ্যে খেলা চলে।

গ্রামের পাশে সারগাদা। সময়ে অসময়ে হঠাৎ সেদিকে নজর পড়িলে দেখিতাম বন্য কুক্কুটেরা মহানন্দে তাহার উপর ভোজ লাগাইয়াছে। গ্রামের মোরগের মতই দেখিতে, তবে মাথার ঝুঁটি কিছু ছোটো, শরীরের গড়ন আরও ছিপছিপে ধরনের। নিঃশব্দে খায়, মাঝে মাঝে ঝটাপটি করে, তাহাও গলা খুলিয়া এবং হঠাৎ ভয় পাইলে সশব্দে উড়িয়া গিয়া গাছের ডালে আশ্রয় লয়। তাহার পরক্ষণেই আবার কোথায় মিলাইয়া যায়, ধরা যায় না।

এমনিধারা বনজঙ্গালের মধ্যে জুয়াঙ্গাদের বাস। আমি একটি বিশাল তেঁতুল গাছের কাছে তাঁবু ফেলিয়াছিলাম। বনে প্রায়ই হনুমানের হুপ-হাপ শব্দ শোনা যাইত, কিন্তু তেঁতুলগাছে তেঁতুলে ভর্তি, একদিনও তাহাতে আসিয়া বসিত না। আশ্চর্য হইয়া একদিন শবরদের জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা বলিল, "বাবু, এ গাঁয়ে যে জুয়াঙ্গোরা বসবাস করে, তাহাদের ত্রিসীমানার মধ্যে হনুমান আসিবে না।" তাহারা নাকি বানর হনুমান খুব পছন্দ করে। একবার একটিকে পাইলে গ্রামসুদ্ধ লোক মিলিয়া যতক্ষণ না তাহাকে মারিতেছে ততক্ষণ রক্ষা নাই।

বাস্তবিক জুয়াঙ্গেরা সবই খায়। সকালে উঠিয়া পুরুষেরা বনে কাঠ কাটিত, চুপড়ি তৈয়ারি করার জন্য বাঁশ আনিতে চলিয়া যায়, আর স্ত্রীলোকেরা ফল-মূল, কন্দ, লালপিঁপড়ার ডিম প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে যায়। লালপিঁপড়ার ডিম তাহাদের খুব প্রিয় খাদ্য। আগে জুয়াঙ্গোরা বনে শিকার করিয়া খাইত, আজকাল সে-সব জঙ্গাল রাজার খাস হইয়া যাওয়ায় শিকার বন্ধ হইয়াছে, তাহাদের দুর্দশার সীমা নাই। কোনো রকমে বাঁশের জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া দিন গুজবান করে।

জুয়াঙ্গাদের গ্রামগুলি ছোটো। কোনোটিতে দশ ঘর, কোনোটিতে বা দুই-তিন ঘর মাত্র লোকের বাস। গ্রামের মধ্যে একটি করিয়া চার চালা ঘর থাকে, তাহাকে বলে মজাং অথবা দরবার। অতিথিসজ্জন আসিলে এখানেই আশ্রয় দেয়, গল্পগুজব করে। আবার এই ঘরেতেই তাহাদের যাহা কিছু পূজাপাট তাহারও করে। গ্রামের যত অবিবাহিত পুরুষ তাহাদের মজাঙে থাকিতে হয়। হঠায় শত্রু আসিলে তাহারাই সকলকে ডাকিয়া দিবে ও যুদ্ধের প্রথম চোট নিজেরাই গ্রহণ করিবে। মজাংই হইল জুয়াঙ্গাদের বৃহত্তর সামাজিক জীবনের কেন্দ্র। প্রতি সন্ধ্যায় মজাঙের সম্মুখে খোলা জমিটুকুতে স্ত্রীলোকেরা হাত ধরাধরি করিয়া নাচে এবং পুরুষেবা সম্মুখে ছাড়াছাড়িভাবে তাল রাখিয়া তাহাদের সহিত চাঙ্গু বাজাইতে থাকে। মজাং-ঘরের যে দুইটি খুঁটি, জুয়াঙ্গাদের বিশ্বাস তাহাতেই জগতের আদি কারণ বুঢ়াম বুঢ়া ও বুঢ়াম বুঢ়ির বাস। তাহার কাছে কালো রঙের মুরগি বলি দিতে হয়। অথচ তিনি স্বয়ং তেজোময়, অগ্নিতে তাঁহার অধিষ্ঠান। মজাঙে সর্বদা কুণ্ডের মধ্যে যে আগুন জ্বলিতে থাকে তাহা তাঁহারই কৃপায় হইতেছে। চাঙ্গুর চামড়া বাজাইবার আগে যখন আগুনে সেঁকিয়া লইতে হয় তখন তিনিই আসিয়া চাঙ্গুতে অধিষ্ঠিত হন, চাঙ্গুর আওয়াজ তাঁহারই গলার আওয়াজ। আগুনের তাপ না লইলে চাঙ্গু কি নিজের শক্তিতে বাজিতে পারে?

একদিন জুয়াঙ্গাদের একটি পূজা দেখিতে গেলাম। পূজার উপকরণ অতি সামান্য, মন্ত্র তদপেক্ষা সরল। আমি যাহাতে তাহাদের ভাষা সহজে শিখিতে পারি এই জন্য পূজা দেওয়াইয়াছিলাম। মানি নামে আমার শিক্ষক, ও গ্রামের অগ্রণী, স্নান করিয়া একটু আগুন জ্বালিল, তাহাতে ধুনা দিল ও শালপাতার একটি প্রদীপ করিয়া তাহা সূর্যের দিকে একটু

উঁচু করিয়া ধরিয়া বলিল "সত্যা যেমতো মাসিকে তলে বাহাসিন্দরি উপরে ধর্ম দেবতা, বাবুরে আইঙ্গা দাগাতাইঙ্গো সামুইসেরে। বেগাবেগি মোরনে ঠাররে।"

অনুবাদ—"নীচে বসুন্ধরা সত্য, উপরে ধর্মদেবতা, তিনিও সত্য। তোমাদের কাছে প্রার্থনা করিতেছি, বাবুকে আমাদের ভাষা শীঘ্র আনিয়া দাও।"

তাহার পর আরম্ভ হইল পূজার পালা। ভিজানো আলোচাল পিণ্ডের মত নয়টি জায়গায় মাটিতে রাখা হইল এবং তাহার পর দুইটি কালো মুরগি তাহার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইল। মুরগি দুটি চাল খাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ধরিয়া বলি দেওয়া হইল ও রক্ত মজাঙের চাঙ্গুর উপর ছড়াইয়া দেওয়া হইল। পূজাও শেষ হইল। তাহার পর সারাদিন ধরিয়া খাওয়াদাওয়া ও নাচগান চলিতে লাগিল।

পূজার মন্ত্র যেমন সোজা, দেবতার কাছে চাওয়াও তেমনি সরল ধরনের। দেবতার মধ্যেও কোনো বাছাই নাই, সবাই ভাল, সকলকেই সন্তুষ্ট করিতে হয়। চালের পিণ্ড দিবার সময়ে মানি বলিতে লাগিল—

গলা বুঢ়াম বুঢ়া পায়ে সেনা
তলে বাহাসিন্দরি আমডে পায়েসেনা
লক্ষ্মী দেবতা আমডে পায়েনা
যেতেক বুঢ়ারিকি, গলা বাবুকে
ঠাররে মেডেঞ্চেনাতে, আফে
পায়েসেনায়েতে

—আচ্ছা বুঢ়াম বুড়া নাও
নীচে বসুন্ধরা তুমিও নাও
লক্ষ্মী দেবতা তুমিও নাও
যত দেবতারা! আচ্ছা বাবুকে
ভাষা আনিয়া দাও (?) তোমরা সকলে
নিয়ে নাও

সহজ ঋজু ভাষা, কোনো গোলমাল নাই, যে-কেহ পূজা করিতে পারে, কেবল বিবাহিত হইলেই হইল। এমনিধারা সহজ জীবন জুয়াঙ্গোরা যাপন করে। বাহিরের লোকের সঙ্গে তাহাদের খুব বেশি সম্পর্ক নাই। পাহাড়, জঙ্গল, জীবজন্তুর সহিত সাক্ষাৎ কারবার রাখে। ইহাদের জীবন যে সুখের তাহা নহে। দারিদ্র্য আছে, অনাহার আছে, রোগ আছে, অত্যাচার আছে, তবু সন্ধ্যায় নাচগান লইয়া, মদ্যপান করিয়া একরকম করিয়া দিন তাহাদের কাটিয়া যায়। দুঃখের কথা তাহারা বেশি ভাবে না, দুঃখকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে ; কেবল দুঃখের অরণ্যের মধ্যে ফাঁকে ফাঁকে যতটুকু সুধা পাওয়া যায় তাহাকেই কাঙালের মত নিঃশেষে শোষণ করিয়া লয়, অনাহার অত্যাচারের কথা ভাবিয়া সেটুকু আনন্দকে পঙ্কিল করিতে চাহে না।

প্রবাসী ● আশ্বিন ১৩৪০ (১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ)



গারোদের কথা

শ্রীহরিপদ রায় বি, এস-সি

ব্রহ্মপুত্র নদ আসামের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া এক সুন্দর উপত্যকা-ভূমির সৃষ্টি করিয়াছে। এই উপত্যকার দক্ষিণ সীমায় যে পর্বতমালা সগর্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহারই পশ্চিমাংশে গারো-পাহাড় জেলা অবস্থিত। ইহার উত্তর ও পশ্চিমে গোয়ালপাড়া—দক্ষিণে মৈমনসিংহ জেলা ও পূর্বে খাসিয়া পাহাড় বিরাজ করিতেছে। ইহার আয়তন প্রায় ৩১৪০ বর্গমাইল। এখানেই অধিকাংশ গারো বাস করিয়া থাকে। ইহার সন্নিকটস্থ জেলাতেও সময়-সময় গারোদের দেখা যায়।

গারোদের দৈহিক গঠন সাতিশয় মনোরম। তাহারা সুগঠিত, বলবান ও কর্মঠ। তাহাদের নাসিকা খর্বাকৃতি, চক্ষু ক্ষুদ্র ও তারকার রং সাধারণত নীল ; ললাট অপ্রশস্ত ও চক্ষুর ভ্রু যেন সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। তাদের মুখ-গহ্বর বৃহৎ, ওষ্ঠ পুরু, মুখমণ্ডল গোলাকৃতি ও ক্ষুদ্র। তাহাদের গাত্রবর্ণ ঘোর কৃষ্ণ না হইলেও খাসিয়াদের অপেক্ষা কিছু ময়লা।

গারোদের পরিচ্ছদ অতি প্রাচীন ধরনের। ইহারা ৬ ইঞ্চি প্রশস্ত ও প্রায় ৬/৭ ফুট লম্বা নীল ডোরা-ডোরা দাগবিশিষ্ট বাদামি রঙের কাপড় কটিতটে নেংটির মতো ব্যবহার করে আর তাহাদের সম্মুখভাগে প্রায় ১ ফুট কাপড় ঝুলঝুল করিয়া ঝুলিতে থাকে। ইহাকে তাহারা "গান্ডো" বলে, কখনো-কখনো গারোরা "গান্ডোর" এই ঝুলঝুলে অংশ নানা কারুকার্যখচিত করিয়া থাকে। কখনও বা ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পিত্তলের ফলক দিয়া, কখনও আবার সাদা গোল শঙ্খ বা ক্ষুদ্র শ্বেত-প্রস্তর দ্বারা ইহাকে তাহারা সুশোভিত করিতে চেষ্টা করে। গারোদের ভিতরে পুরুষেরাও গহনা ব্যবহার করে। সময় সময় তাহাদের মস্তকেও ৪/৫ ইঞ্চি চওড়া ও পূর্বোক্তরূপ কারুকার্যখচিত অলংকার দেখিতে পাওয়া যায়। লম্বা-লম্বা

চুলগুলি মুখে পড়িয়া পাছে তাহাদিগকে ভয়ানক দেখায়, এই ভয়ে তাহারা চুলগুলিকে যথাস্থানে রাখিবার জন্যই এই গহনা ব্যবহার করে। সর্দাররা কিন্তু রেশমের পাগড়ি ব্যবহার করে। আর তাহাদের কোমরবন্ধের সহিত একটি থলি ও একটি জাল ঝুলানো থাকে। থলির ভিতরে তাহাদের টাকা পয়সা থাকে, আর জালের ভিতর তাহাদের তামাকের নল ধরাইবার সরঞ্জাম থাকে। তাহারা তাদের কানেও দুই রকম রিং ব্যবহার করে—এক রকম কানের নিম্নে কোমল অংশে ও আর-এক রকম কানের উপরের দিকে দেখিতে পাওয়া যায়। উপর-কানের গহনার নাম "নাদিরং" ও নিম্নের গহনার নাম "নাডংবি"। এগুলি সাধারণত পিত্তল নির্মিত। তাহারা প্রত্যেক কানে এই প্রকার প্রায় ৩০/৪০টি রিং ব্যবহার করিয়া থাকে। গারোদের গলাতেও গোল-গোল লাল কাচের মালা দেখিতে পাওয়া যায়।

গারো পুরুষ অনেকটা সুশ্রী হইলেও গারো-রমণী দেখিতে ভয়ানক কুৎসিত। তাহারা স্থূল ও খর্বাকৃতি। তাহাদের মুখে কমনীয়তা নাই বলিলেই হয়। তাহাদের পরিচ্ছদের ভিতরে একখানা ১৫ ইঞ্চি প্রশস্ত ময়লা লাল কাপড়। কাপড়ের মধ্যে-মধ্যে অনেকগুলি সবুজ বা সাদা ডোরা দাগ আছে। ইহাই তাহাদের কটিতট আবেষ্টন করিয়া থাকে। সম্পূর্ণ উরুদেশ তাহাতে ঢাকা থাকে না। মেয়েরাও পুরুষদের মত গলায় গহনা ব্যবহার করিয়া থাকে। এই গহনাগুলি দেখিতে অনেকটা পুরুষদের গহনার মতোই। পুরুষদের মতো কানেও তাহারা পিতলের রিং ব্যবহার করে। তাহাদের নীচের কানে প্রায় ৫০/৬০টি রিং দেখিতে পাওয়া যায়। রিংগুলির ভারে যখন কান কাটিয়া যাইয়া রিংগুলি পড়িয়া যাইবার উপক্রম হয়, তখন তাহারা সরু দড়ি দিয়া সেগুলিকে মাথার সাথে বাঁধিয়া দেয়। সর্দার-পত্নীর বেশ অন্যান্য মেয়েদের অপেক্ষা একটু স্বতন্ত্র, তাহারা সাধারণত ১৩/১৪ ইঞ্চি প্রশস্ত ও প্রায় ২ ফুট লম্বা কাপড় দিয়া তাহাদের মস্তক আবৃত করিয়া রাখে। সেই কাপড়ের শেষভাগ তাহাদেব পিঠের উপর বেণীর ন্যায় লম্বিত হইতে থাকে। গারোদের ভিতরে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই কর্মঠ। মেয়েরাও পুরুষদের মতো ভার বহন করিতে পারে ও নানারকম শক্ত কাজ করিয়া থাকে।

গারোরা প্রায় সবরকম জন্তুই খাইয়া থাকে এমনকি কুকুর, ব্যাঙ, সাপ প্রভৃতি কোনোটাই তাহাদের অখাদ্য নয়। তাহারা অতিরিক্ত মদ্য পান করিয়া থাকে। শিশুরা গিলিতে শিখিবামাত্রই তাহাদের মদ্য পান করানো হয়। তাহারা অনেক রকম মদ্য ব্যবহার করিয়া থাকে। তবে ভাত পচাইয়া যে মদ্য হয় তাহাই তাহারা সাধারণত পান করে। তাহারা খাদ্যদ্রব্যকে আমাদের মত রান্না করে না, সামান্য একটু গরম হইলেই খাদ্য তাহাদের আহারের উপযুক্ত হয়। তবে তাহারা ভাতকে খুব সুসিদ্ধ করে ; আর মাংস এক রকম কাঁচাই ভক্ষণ করে।

প্রত্যেক গারোরই প্রায় দুখানা বাড়ি আছে—একখানা গ্রামের ভিতরে—আর একখানা তাহার মাঠে। যে সময়ে শস্য উৎপন্ন হয়, সে কয়মাস তাহারা মাঠে বাস করে। যাহাতে বন্য জন্তুরা শস্য নষ্ট না করিয়া ফেলে, সেই জন্যই তখন তাহারা সেখানে বাস করে। তারপর শস্য সংগৃহীত হইলে তাহারা আবার গ্রামে ফিরিয়া আসে ও সেখানে আর-এক

শস্যকাল পর্যন্ত বাস করে। পাছে বৃহৎ-বৃহৎ হস্তী শস্য খাইতে আসিয়া তাহাদের কোনো ক্ষতি করে, এই ভয়ে তাহারা মাঠের গৃহগুলিকে প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড বৃক্ষের মাথার উপরে নির্মাণ করে। এই গৃহগুলিকে তাহারা 'বোরাং" বলে। তাহাদের গ্রামের গৃহগুলি "ছাউং" নামে পরিচিত। তাহারা মাটির উপরে আবর্জনাদি ফেলিয়া ৩/৪ ফুট উঁচু করে এবং তাহার উপরে এগুলি নির্মাণ করে। এগুলি দৈর্ঘ্যে ৩০ হইতে ১৫০ ফুট পর্যন্ত ও প্রস্থে ১০ হইতে ৫০ ফুট পর্যন্ত হইয়া থাকে। উভয় প্রকার গৃহই ঘাস-খড় বা মাদুর দিয়া ছাওয়া হয়। সর্দারদের গৃহগুলি দেখিতে অতি মনোরম।

গারোরা প্রধানত কৃষিকার্যের দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে।

তাহাদের চেহারা দেখিয়া মনে হয় যেন তাহারা খুব ক্রোধী, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। তাহারা খুব শান্ত ও নম্রস্বভাব। তাহাদের ব্যবহারে কোনোরকম কৃত্রিমতা নাই। তাহারা কখনও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না। যখন তাহারা মদ্য পান করে, তখন তাহাদিগকে অতিশয় প্রফুল্ল বলিয়া মনে হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞান বিলুপ্ত না হয়, সে পর্যন্ত তাহারা ছেলেমেয়ে, স্ত্রীপুরুষ সবাই একসঙ্গে মদ্য পান করিতে থাকে, আর একযোগে নাচিতে আরম্ভ করে।

তাহাদের নাচও অদ্ভুত রকমের। ২৫/৩০ জন লোক একজনের পশ্চাতে আর-এক জন এই রকম করিয়া দাঁড়ায় এবং প্রত্যেকে তাহার পূর্ববর্তী লোকের কোমরবন্ধ ধরিয়া রাখে। তারপর এক পায়ে ভর দিয়া লাফাইতে লাফাইতে চক্রাকারে ঘুরিতে থাকে, আর বাজনার তালে-তালে গান করে। বাজনা সাধারণত বুড়োরা ও ছেলেরা বাজায়। পুরুষদের অপেক্ষা মেয়েদের নাচ আর একটু ভিন্ন রকমের। মেয়েরা নাচিবার সময় একজনের পশ্চাতে আর-এক জন দাঁড়ায় না—তাহারা সারি দিয়া পরস্পরের হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়ায় ও পূর্বোক্তরূপ লাফাইতে থাকে—গানের তালে-তালে তাহারা একহাত নামায়, আর সঙ্গে সঙ্গে অন্য হাত তোলে। পর্ব উপলক্ষে তাহাদের এই নাচ দুই-তিন দিন ব্যাপিয়া থাকে। সেই সময় তাহারা খুব মদ্য পান করে ও ভূরি-ভোজন করিয়া থাকে।

গারোদের ভিতরেও নকল যুদ্ধ-প্রথা চলিত আছে। তাহাদের যুবারা সময় সময় ঢাল ও তরবারি লইয়া সকলের সামনে নিজ-নিজ সমর-শক্তির পরিচয় দিয়া থাকে। গারোরা ভৌগোলিক বিভাগ অনুসারে তাহাদিগকে বিভক্ত করিয়াছে, তদ্ব্যতীত তাহাদের ভিতরে ৩টি বিভিন্ন গোত্র পরিদৃষ্ট হয়—যথা, মমিন (Momin), মারাক (Marak) ও সঙ্গাম (Sangma)। আমাদের ন্যায় গারোদেরও বিভিন্ন গোত্র ব্যতীত বিবাহ হয় না!

২/৪টি ব্যতিক্রম ভিন্ন সাধারণত বিবাহের প্রস্তাব মেয়ের পক্ষ হইতেই উপস্থিত করা হয়, ছেলের পক্ষ হইতে হয় না। মেয়ে প্রথমত একটি ছেলেকে পছন্দ করে ও তাহা তাহার পিতা, ভ্রাতা বা খুল্লতাতের গোচরীভূত করে। তখন তাহারাই বিবাহ ঠিক করে। কন্যা নিজে কখনও বিবাহ ঠিক করে না। গারোদের বিবাহ বিষয়ক আর একটি অদ্ভুত প্রথা প্রচলিত আছে। এ-প্রথা কেবল গারোদের দুইটি ভৌগোলিক বিভাগ—আবেং ও

মেটাবেংদের ভিতরেই দেখিতে পাওয়া যায়। মেয়ের বাড়ি হইতে যখন প্রথম বিবাহের প্রস্তাব আসে, তখন প্রথমত ছেলে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া তৎক্ষণাৎ দৌড়াইয়া পলায়ন করে ও গ্রামের বাহিরে কোথাও লুকাইয়া থাকে। তারপর তাহার একদল বন্ধু-বান্ধব তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করে ও তাহার নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন তাহারা তাহাকে টানিতে-টানিতে পুনরায় গ্রামে লইয়া আসে। তারপর আবার দ্বিতীয়বার সে পূর্বোক্তরূপ পলাইয়া যায় ও পুনরায় ধৃত হইয়া গ্রামে আনীত হয়। কিন্তু তৃতীয় বার যদি ছেলে পলায়ন করে, তবে বুঝিতে হইবে তাহার এই বিবাহে সম্মতি নাই ; আর যদি এবার না পালায় তবে বুঝিতে হইবে যে, সে সম্মত।

গারোদের বিবাহে পিতামাতার বিশেষ সম্মতির প্রয়োজন হয় না। যুবক-যুবতিরা তাহাদের ইচ্ছামতই বিবাহ-বন্ধনে বন্ধ হয়। তবে পিতামাতার সম্মতি একটা প্রথামাত্র। যদি পিতামাতারা সন্তানের ইচ্ছানুযায়ী বিবাহে সম্মতি না দেয়, তবে গ্রামের অন্যান্য লোক আসিয়া যেমন করিয়া হউক পিতামাতাকে সম্মত করে। এমনকি অনেক সময় প্রহার করিয়াও তাহাদের সম্মতি লওয়া হয়।

পূর্বেই বলিয়াছি, গারোদের ভিতরে অনেকগুলি বিভাগ আছে। এক এক বিভাগে এক-এক রকম বিবাহপ্রথা। তবে আমি আমার জনৈক আসামী বন্ধুর নিকট যে-রকম বিবাহ প্রথা শুনিয়াছি, তাহাই এস্থলে বিবৃত করিব।

বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষ উভয়ে সম্মত হওয়ার পর একটা দিন ঠিক হয়। সেইদিন কন্যাপক্ষের লোক বরকর্তার বাড়িতে আসিয়া বিবাহের দিন, তারিখ ও ফলাহার ভোজনের দ্রব্যাদি ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তির নামের তালিকা ঠিক করে। তারপর সেই রাত্রে তাহারা খুব আমোদ-আহ্লাদ করিবার পর বিদায় লয়। বিবাহের দিনে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা প্রথমে কন্যাপক্ষের বাড়িতে যায়। বরকন্যার বাড়িতে আসিয়া বিবাহ করাই অধিকাংশ গারোদের প্রথা। খাদ্য, পানীয়াদি প্রস্তুত হইলে ও সকল নিমন্ত্রিত ব্যক্তি উপস্থিত হইলে পর তাহারা একযোগে গান ও নাচ আরম্ভ করে, আব মধ্যেমধ্যে মদ্য পান করে। আর এক দল মেয়ে কনেকে নদীর ধারে লইয়া যায়, তাহাকে উত্তমরূপে স্নান করায় ও পুনরায় বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়া সুন্দর সুন্দর গহনা দ্বারা তাহাকে সাজাইয়া দেয়। সাজানো শেষ হইলে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের জানানো হয়। তখন তাহারা গান বন্ধ করে। তারপর তাহাদের একদল মদ, খাবার, বাদ্য, ভাণ্ড ও একটি মোরগ ও একটি মুরগি লইয়া শোভাযাত্রা করিয়া কন্যার বাড়ি হইতে বরের বাড়িতে যায়। পুরোহিত মোরগটি ও মুরগিটি বহন করিয়া লইয়া যায়। তাহাদের পশ্চাতে-পশ্চাতে কন্যাও একদল স্ত্রীলোক-পরিবেষ্টিত হইয়া বরের বাড়িতে যায়। সেখানে কন্যা ও তাহারা সঙ্গের মেয়েরা ছাউং-এর এক কোণে ঠিক দরজার নিকটে বসে। তারপর ধীরে ধীরে অন্যান্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরাও বরের বাড়ির দিকে অগ্রসর হয়। মেয়েদের ঠিক বিপরীত দিকে ঘরের আর-এক কোণে পুরুষেরা বসে। পুরুষেরা তখন পুনরায় গান ও নাচ আরম্ভ করে, তারপর বরকে আহ্বান করা হয়। বর কিন্তু অন্য এক কুঠরিতে থাকে। কাজেই সে যেন হারাইয়া গিয়াছে, এরূপভাবে তাহার অনুসন্ধান করা হয় ও তাহাকে খুঁজিয়া পাইবামাত্র লোকেরা

চিৎকার করিয়া ওঠে। তখন তাহারা তাহাকে নদীর ধারে লইয়া যায়, উত্তমরূপে স্নান করায় ও তারপর গৃহে ফিরিয়া তাহাকে যুদ্ধ-সজ্জায় সজ্জিত করে। ইহা শেষ হইলে মেয়েরা পুনরায় কন্যাকে তাহার নিজের বাড়িতে লইয়া যায় ও সবাই একত্রে কন্যাকে বেষ্টন করিয়া বসে। বরের বাড়িতে অবস্থিত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা কন্যার এই পৌঁছানো সংবাদ পাইবামাত্র মদ্য ও খাদ্যাদি লইয়া বরসমতে কন্যার বাড়িতে প্রস্থান করিবার উপক্রম করে। ইহাতে বরের পিতা, মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনেরা অত্যন্ত কাঁদাকাটি করিতে থাকে—বরকে তাহাদের হাত হইতে মুক্ত করিয়া লইবার জন্য কিছুক্ষণ বল-প্রয়োগ করিয়া থামিয়া যায়। তৎপর কন্যার পিতা অগ্রে পথ-প্রদর্শকরূপে, তারপর বর ও তাহার পশ্চাতে কন্যা-পক্ষীয় অন্যান্য লোক বরের বাড়ি হইতে যাত্রা করে ; কন্যার বাড়িতে তাহারা ঢুকিবামাত্রই সবাই চিৎকার করিয়া ওঠে ও বরকে লইয়া গিয়া কন্যার ঠিক দক্ষিণ পাশে বসাইয়া দেয়। তারপর পুরোহিত যে পর্যন্ত থামিতে না বলে, সে পর্যন্ত তাহারা সকলেই গান করিতে ও নাচিতে থাকে। ইহার পর সকলে নিস্তব্ধ হইলে পুরোহিত বর-কনের সামনে যাইয়া কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। তাহাতে সেখানে উপস্থিত সকলেই "নুমা নুমা" এই বলিয়া উত্তর দেয়। এইরকম করিয়া কয়েক মিনিট অতিবাহিত হইবার পর মোরগ ও মুরগি দুইটিকে তথায় আনা হয়। তখন পুরোহিত তাহাদের ডানা ধরিয়া শূন্যে উঁচু করিয়া ধরে ও তাহাদের দিকে চাহিয়া আবার কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। তাহার উত্তরেও সকলেই "নুমা নুমা" বলিয়া উত্তর দেয়। তারপর কতকগুলি শস্য আনিয়া মোরগ ও মুরগি উভয়ের সামনে ছড়াইয়া দেওয়া হয়। তখন তাহারা তাহা খুঁটিয়া খাইতে আরম্ভ করে। এই সুযোগে পুরোহিত একখণ্ড যষ্ঠি দ্বারা ঠিক তাহাদের মস্তকে আঘাত করিয়া তাহাদের মারিয়া ফেলে। উপস্থিত ব্যক্তিরা তখন তাহার দিকে তাকাইয়া থাকার পর চিৎকার করিয়া ওঠে, তারপর পুরোহিত একখানা ছুরি দিয়া প্রথমে মোরগের ও তৎপরে মুরগির পশ্চাদ্দেশ কাটিয়া ফেলিয়া নাড়ি বাহির করিয়া ফেলে। সকলেই তখন "নুমা নুমা" বলিয়া হর্ষধ্বনি করিতে থাকে। গারোরা মনে করে, তাহাদের বিবাহের শুভাশুভ এই শেষোক্ত প্রথাটির ওপরই বিশেষভাবে নির্ভর করে। যদি যষ্ঠির আঘাতের সঙ্গে মোরগ ও মুরগির দেহ হইতে রক্তপাত হয়, বা যদি নাড়ি বাহির করিবার সময় কোন নাড়ি ছিঁড়িয়া যায়, তবে তাহারা সে বিবাহকে অশুভকর বলিয়া আশঙ্কা করে। পূর্বোক্ত প্রথাগুলি যথারীতি সম্পন্ন হইলে পর বর ও কন্যা একপাত্রে মদ্য পান করে ও সেই মদ্যপাত্র উপস্থিত অন্যান্য লোকদিগকে দেয়। তখন তাহারা সকলে মিলিয়া ভোজন ও স্ফূর্তি করিতে থাকে।

গারোদের ভিতরে স্ত্রীলোকেরই প্রাধান্য বেশি। গারোরা মারা গেলে তাদের নিজের ছেলেরা উত্তরাধিকারী হয় না, উত্তরাধিকারী হয় তাহাদের ভাগিনেয়রা।

গারোরাও হিন্দুদের মতো মৃতদেহের সৎকার করিয়া থাকে। সাধারণ গারোদের মৃতদেহ সৎকারের মধ্যে কোনো বিশেষ নূতনত্ব নাই। তবে উচ্চপদস্থ গারো বা গারো সর্দার বুনিয়াদের কথা স্বতন্ত্র। তাহাদের কেহ যদি মারা যায়, তবে তাহার সৎকারের সময় একটি বৃহৎ বলি দেওয়া হয় ও মৃতদেহের সহিত ওই বৃষ-মুণ্ডটিও দাহ করা হয়। কখনও-কখনও বৃষ-বলির পরিবর্তে নর-বলিও দেওয়া হয়।

"বুগা" ও "ছিবক" ব্যতীত প্রায় অন্যান্য সকল গারোদের ভিতরেই আর-একটি অদ্ভুত প্রথা আছে। কোনো বাড়িতে কেহ মারা গেলে প্রথমে গারোরা তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করে ও তৎপরে মৃত ব্যক্তির বাড়ির সামনে তাহার স্মৃতি-রক্ষার্থ কাষ্ঠের স্মৃতি-স্তম্ভ প্রোথিত করে। এই স্মৃতি-স্তম্ভগুলি তাহাদের নিকট "কিমা" নামে পরিচিত। এই "কিমা"তে মৃত মনুষ্যটির মুখের প্রতিকৃতি ক্ষোদিত করা হয়।

গারোরা মহাদেবের পূজা করিয়া থাকে, কোনো কোনো গ্রামে গারোরা সূর্য ও চন্দ্রের পূজা করিয়া থাকে। ধর্ম-সম্বন্ধীয় অন্য কোনো ক্রিয়া-কলাপের পূর্বে তাহাদের ধর্মে বলির ব্যবস্থা আছে। এই বলির পশু সাধারণত বৃষ, ছাগল, শূকর, মোরগ বা কুকুর—এই বলি তাহাদের দেবতার সামনে হইয়া থাকে, গারোরা ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করিয়া থাকে।

দোষ করিলে গারোদের সাধারণত জরিমানা দিতে হয়। গারোদের সর্দাররা "বুনিয়া" নামে পরিচিত। এই বুনিয়ারাই প্রায় সব বিবাদের মীমাংসা করিয়া থাকে।

প্রবাসী ● জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩ (১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ)



গারো পল্লিতে একদিন

রাজকার্যে আদিষ্ট হইয়া আমাদিগকে একবার কতকদিনের জন্য দুর্গাপুর থাকিতে হয়। দুর্গাপুর সুসঙ্গ পরগনার সম্মানিত রাজাদিগের রাজধানী। সুসঙ্গ ময়মনসিংহ জেলার উত্তর সীমানায় অবস্থিত। সেখানে অনেকগুলি পাহাড় আছে, তাহা ইতঃপূর্বে সুসঙ্গের মহারাজারই খাসদখলে ছিল। সে পাহাড়ে রাজাদিগের হাতিধরার খেদা ছিল ; প্রতি বৎসর বহু হস্তী ধৃত হইত। ইংরেজ গবর্নমেন্ট ১৮৬৯ সনে Hill Act পাশ করতঃ উক্ত পাহাড়গুলি সুসঙ্গ রাজ্যের হস্তচ্যুত করিয়া খাস করিয়া লইয়াছেন। পাহাড়গুলি গারো পাহাড়ের সংলগ্ন গারো হিল জেলার ও ময়মনসিংহ জেলার সীমান্ত চিহ্ন এলোমেলোভাবে উভয় পাহাড়ের মধ্য দিয়া সংস্থাপিত হইয়াছে। সেই সীমান্ত চিহ্ন দুর্গাপুর রাজভবন হইতে ৬।৭ মাইল অন্তর উত্তরে অবস্থিত। দুর্গাপুরের চতুষ্পার্শ্ববর্তী প্রজাদিগের মধ্যে গ্যারো এবং হাজঙের (হাইজঙের) সংখ্যাই অধিক। হাজংগণ সাধারণত সমতলক্ষেত্রে বাস করে, গারোদিগের অধিকাংশেরই বাসস্থান উচ্চ উচ্চ টিপির উপর। কোনো কোনো স্থানে বৃক্ষের উপরেও দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা সন্ধ্যার প্রাক্কালে দুর্গাপুরে পঁহুছিয়াছিলাম। আষাঢ় মাস। প্রাবৃট লক্ষ্মীর ঘন জলধর সমাচ্ছন্ন সান্ধ্য গগন ক্রোড়ে নিবিড় ঘন তরুরাজি সমন্বিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পাদদেশে ক্ষুদ্র রাজধানীখানা বড়োই মনোরম দেখাইতেছিল। রাজধানীর পাদ প্রক্ষালন করিয়া পার্বতী সোমেশ্বরী তরঙ্গ-ভঙ্গে অঙ্গ দোলাইয়া প্রবাহিত হইতেছিল। সাহেবেরা (ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ ও ডাক্তার সাহেব প্রভৃতি) এ পারেই রহিলেন। আমরা নদী পার হইয়া রাজধানীর ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিলাম। বর্ষায় সোমেশ্বরীর স্রোত বড়োই প্রবল হয়। তাই এখানে তখন কোনো নৌকার বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে না। কোন্দা নৌকাই এখানকার প্রচলিত স্রোতযান। বড়ো বড়ো গাছের এক একটি বাকল দ্বারা এক এক একটি

কোন্দা প্রস্তুত হয়। গারো এবং অন্যান্য পার্বতীয় জাতি ইহার পরিচালন কার্যে বড়োই অভ্যস্ত। চারিটি কোন্দা একত্র বাঁধিয়া তাহার উপর তক্তার পাটাতন আঁটিয়া আমাদের পারাপারের জন্য এক খেয়া প্রস্তুত করা হইয়াছিল।

পরদিন আমরা আমাদিগের নির্ধারিত কর্তব্য সম্পাদনে তৎপর হইলাম। মহা ঘটা পড়িয়া গেল। রাজধানীতে হস্তীর অভাব নাই। রত্নমালা মণি মাণিক্য খচিত করি-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আমরা বিদ্রোহী দমনে অভিযান করিলাম। শূন্য-পৃষ্ঠ কতকগুলি হস্তীও আমাদিগের অনুসরণ করিল। আমরা পাহাড়ের পর পাহাড়, গ্রামের পর গ্রাম পার হইয়া চলিলাম। সাহেবেরা ইত্যবসরেই তাহাদের স্ব স্ব গুণপনার পরিচয় দিতে ত্রুটি করেন নাই। দুইটি শৃগাল শিশুকে অনায়াসেই বধ করিতে সমর্থ হইলেন।

দ্বিপ্রহরের কিছুপূর্বে আমরা আসিয়া এক গারোর টঙে (বাড়িতে) অতিথি হইলাম। মহারাজার বন্দোবস্ত গুণেই আমাদের কোনো বিষয়ে কোনো অসুখ হইতে পারে নাই। আমাদের পঁহুছিবার পূর্বেই গারো ও অন্যান্য অধিবাসীরা আসিয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছিল। গারোরা মহারাজকে দেখিয়া যথেষ্ট সম্ভ্রমসূচক অভিবাদনাদি করিল। সাহেব অন্যান্যের প্রতি যেন তাহারা ভ্রূক্ষেপই করিল না। গ্রামের বা দেশের যাহারা প্রতিনিধি হইয়া আসিয়াছে, তাহারাই সাহেবের সহিত অগ্রসর হইয়া আলাপ করিল। তাহাদের সহিত কথাবার্তায় বুঝিলাম, তাহারা নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য অকাতরে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা এমনকি নরহত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। স্বার্থসিদ্ধির জন্য অসৎ পথ অবলম্বন প্রয়াসী হইলেও তাহারা সরল বিশ্বাসের সহিত সকল কার্য করিয়া থাকে, কৌশলের ও মিথ্যার প্রশ্রয় দেয় না।

গারো জাতি রাজভক্ত। সে ভক্তি ভাবে, ভয়ে নয়। ভয় তাহাদের মনে একেবারেই নাই।

গারোদিগের বাসস্থানগুলি বড়ই অপরিষ্কার। তাহারা ঘরে টং বা মাচা বাঁধিয়া দোতলার উপর বাস করে। নিচে অপরিষ্কার জঞ্জাল, তাহাতে তাহাদের ভ্রূক্ষেপও নাই। ঘরগুলি ও অপরিষ্কার এবং বায়ু গমনাগমনের পথ শূন্য।

বৃক্ষোপরি গৃহগুলি যেন অরণ্যচর কোনো মহাপ্রাণীর গৃহ বলিয়া মনে হয়। পর্বতের নিম্নদেশ হইতে উত্থিত কোনো বৃক্ষের সমান্তরাল কাণ্ডে পর্বত গাত্র হইতে বংশদণ্ড পাতিত করিয়া মঞ্চ প্রস্তুত করতঃ তাহার উপরে ছনের চাল ও চতুষ্পার্শ্বে দরমার বেড়া আঁটিয়া স্বর্গরাজ্যে যেন একটি ক্ষুদ্র জীব নিবাস বাঁধিয়া লয়। অরণ্যচর হিংস্রক জন্তুদিগের উপদ্রবেই নাকি তাহাদিগকে এরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়।

গারোদিগের মধ্যে একতা এবং একপ্রাণতার অভাব নাই। উহারা বাঙ্গালীর ন্যায় স্ব স্ব প্রধান নহে। সমাজের মধ্যে একজনের উপর প্রাধান্য সংস্থাপন কবিয়া অপর সকলে নিরাপদে থাকিতে ভালোবাসে। "নখমা" বা প্রধান ব্যক্তি যাহা করিবে, তাহাতে কাহারও আপত্তি থাকে না। সামাজিক শাসন সংরক্ষণের ভারও তাহাদের হস্তেই ন্যস্ত থাকে।

সেদিন সেই মহারণ্যের মধ্যে, সমাজের অধস্তন অসভ্য বর্বর জাতি হইতে রাজপুরুষেরা

যে সৎসাহস, একপ্রাণতা ও নির্ভীকতার পরিচয় পাইয়া আসিয়াছিলেন, পরাধীন ভারতের কোনো জাতি হইতেই রাজপুরুষ ইংরেজ এইরূপ ব্যবহার পাইতে প্রত্যাশা করিতে পারেন না।

তাহাদের সরল বিশ্বাসের নিকট আমাদের রাজনীতির কূটসূত্রগুলি ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। বিদ্রোহীদিগকে পাঁচ দিবসের জন্য চিন্তা করিতে অবকাশ দিয়া আমরা রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলাম।

পরদিন প্রাবৃটলক্ষ্মী গড়াইয়া পড়িলেন। ঘোর ঘনঘটায় জগন্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া বারিপাত হইতে লাগিল। বিশ্বগ্রাসী আহবে সোমেশ্বরী গর্জন করিয়া উঠিল। উচ্ছৃঙ্খল জল-কল্লোল দেখিতে দেখিতে তটরেখা অতিক্রম করিয়া রাজধানীর উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া চলিল। আমরা ভয়ে ভয়ে মরিয়া হইয়া রহিলাম। ভয় হইয়াছিল বটে কিন্তু সেই ভয়ের পার্শ্বেই যে একটা অনির্বচনীয় সৌন্দর্য ও কৌতূহল মনোমধ্যে জাগ্রত হইয়াছিল, তাহা অতীব মনোরম।

দুই দিন অবিশ্রান্ত বর্ষণের পর বারিপাত বন্ধ হইল। সঙ্গে সঙ্গে সোমেশ্বরীর বিশ্বগ্রাসী মূর্তিও অন্তর্হিত হইল। আমরা নিশ্চিন্ত হইলাম।

নির্দিষ্ট দিবসে গারো প্রতিনিধিরা আসিয়া রাজধানীতে সমবেত হইল। কিন্তু সেদিনও বিশেষ কিছুই হইল না। আরও কয়েকদিনের সময় দেওয়া হইল।

ইত্যবসরে আমরা আমাদের সুদীর্ঘ দিবসগুলির একটা সদ্ব্যবহারের অনুষ্ঠান করিলাম। পাহাড় পরিভ্রমণ এবং গারোদিগের সামাজিক আচার-ব্যবহার ও অভ্যন্তরীণ অবস্থা পরিজ্ঞাত হইবার বাসনা বড়ই বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল। তদনুসারে ব্যবস্থা করিয়া তৎকার্যে নিযুক্ত হইলাম। এইরূপে এক একদিন, এক এক দিক করিয়া আমাদের কার্য সমাধা করিতে লাগিলাম।

একদিন আমরা লস্কর ভঙ্গোর কুঠি দেখিতে চলিলাম। ভঙ্গা, গারোদিগের বিচারক। তাহার কুঠি গারোহিল জেলায় অবস্থিত, দুর্গাপুর হইতে ৮ মাইল উঃ পঃ কোণে। ৫/৬ মাইল চলিয়াই আমরা ময়মনসিংহ জেলার সীমানা অতিক্রম করিলাম।

আমরা ভঙ্গোর বাজারে উপনীত হইলাম। আমাদের সৌভাগ্যবশত সেদিন হাটবার ছিল। বাজারে প্রবেশ করিয়া আমাদের আকবর শাহের মোহিনীমেলার প্রসঙ্গ মনে পড়িল। গারো বালিকা এবং যুবতিতে বাজার খানা ভরপুর। যুবতি বিক্রয় করিতেছে, বালিকা ক্রয় করিতেছে। বালিকা বিক্রয় করিতেছে, যুবতি ক্রয় করিতেছে ; যেন এ গিরি-প্রাচীর অভ্যন্তরে আসিয়া এক অভিনব স্বর্গীয় স্বাধীনতা শিক্ষা সভ্যতা ও স্ত্রীস্বাধীনতার লীলাভূমি বৃটনের স্বাধীনতাকে ধিক্কার দিয়া এক অভিনব স্ত্রীস্বাধীনতার রাজ্য সৃষ্টি করিয়াছে।

ভঙ্গোর হাটে প্রধানত গারোদিগের শিল্পজাত ও কৃষিজাত জিনিসই বিক্রীত হয়। তাহাদের কৃষিজাত জিনিসের মধ্যে ধান, চাউল, কলাই, মাকাজুয়, চিংড়া, ফুটি, আলু, তরমুজ ইত্যাদিই প্রধান। শিল্পজাত জিনিস—কাপড়, ছালা, কাপড়ের থলি, বাঁশের দরমা,

বেতের জিনিস ইত্যাদি। গারোদিগের প্রস্তুত কাপড় তাহাদেরই পরিবার উপযুক্ত। ঠিক বিলাতি টিকনের ন্যায় শক্ত, বহর ১ হস্ত অপেক্ষা অধিক সাধারণত হয় না। ইহাই তাহাদিগের একমাত্র লজ্জা নিবারণ পক্ষে সাহায্য করিয়া থাকে। ওই বস্ত্র খণ্ড পুরুষগণ নেংটির ন্যায় ব্যবহার করে এবং রমণীগণ নাভির নিম্নে কটিদেশের চতুর্দিকে ঘেরিয়া পরিধান করে। উহা রমণীগণের জানু স্পর্শ করিতে কদাপি অধিকারী। তাহারা অন্যান্য অঙ্গে প্রায় কোনো প্রকার বস্ত্র ব্যবহার করে না। তাহাতে সাক্ষাৎ কালে আমরাই লজ্জা বোধ করিলাম বটে কিন্তু তাহারা অনুমাত্রও লজ্জিত বা সংকোচিত হইল না। কোনো রমণী তাহার স্তন্যপায়ী শিশুটিকে পৃথক বস্ত্রখণ্ডে আবৃত করিয়া স্বীয় বক্ষস্থলে বন্ধন করত স্তন পান করাইতে করাইতে পয়সা হস্তে ইতস্তত ভ্রমণ করিতেছে। কেহ বা নিদ্রামগ্ন শিশুকে পৃষ্ঠদেশে রক্ষা করিয়া খরিদ বিক্রিতে নিযুক্ত।

এই স্ত্রীলোকগুলি হাট করিয়া যখন বক্ষস্থলে সন্তান বাধিয়া পৃষ্ঠে বোঝাই মোট লইয়া ঊর্ধ্বে পর্বত গাত্রে আরোহণ করে তখন সে দৃশ্য দেখিলে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়।

বাজারে পশুপক্ষীও যথেষ্ট বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত ছিল। তাহাদের মধ্যে হরিণ, শূকর, ময়ূর, ময়না, মদনা, টিয়া প্রভৃতিরই আমদানি অধিক। এই সমস্ত পশুপক্ষী প্রায়ই বৈদেশিক ক্রয়কারিদিগের নিকট বিক্রীত হইয়া থাকে। গারোদিগের প্রস্তুত বেত এবং বাঁশের জিনিস বড়োই শক্ত এবং মনোরম। অনেক বৈদেশিক ক্রেতা ভঙ্গোর হাটে বেত বাঁশ তুলা প্রভৃতি ক্রয় করিতে আসিয়া থাকে।

গারোদিগের নিজ ব্যবহারের জিনিস তাহারা নিজেরাই প্রস্তুত করিয়া লয়। তাহাদিগের প্রধান খাদ্য চাউল ; তাহাও নিজেরাই কৃষিকার্য দ্বারা উৎপন্ন করিয়া লয়। যে পরিবারে কর্মক্ষম পুরুষ লোকের অভাব বা কোনো কোনো প্রতিকূল কারণে কোনো বিষয় সংগ্রহ করিতে অক্ষম, তাহারা এক জিনিস বিক্রয় করিয়া তৎমূল্যে অন্য জিনিস ক্রয় করিয়া লয়।

গারোদিগের পুরুষেরা হল চালনা, শিকার এবং কাষ্ঠ সংগ্রহ ইত্যাদি পুরুষোচিত কার্য করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা গৃহকার্য করিয়া অবসরক্রমে পুরুষদিগের সাহায্য করিয়া থাকে। এমনকি হল চালনায়ও তাহাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিতে দেখা যায়।

বাজারে উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে পচা মৎস্যের আমদানিই খুব বেশি। যে কোনো স্থানের অবিক্রিত মৎস্য, বিক্রেতেরা পচাইয়া ভঙ্গোর হাটে বিক্রয় করিতে লইয়া যায়। পচা মৎস্য গারোদিগের বড়োই প্রিয়। যে কোনো খাদ্য দ্রব্য তাহারা পচাইয়া খাইতে ভালবাসে।

গল্পচ্ছলে বর্তমান মহারাজা বাহাদুরের নিকট শুনিয়াছি, স্বর্গীয় মহারাজাদিগের খেদায় বাহির হইবার দিনে রাজবাড়িতে গারোদিগের একটা প্রকাণ্ড রকমের ভোজ হইত, সেই ভোজের পূর্ব হইতে মৎস্য এবং হরিণ, ছাগ প্রভৃতির মাংস সংগ্রহ করিয়া তাহা পচাইয়া রাখা হইত। ভোজের দিনে ওই সমস্ত পচা মৎস্য এবং মাংস প্রচুর লংকাসংযোগে অর্ধ পক্ক অবস্থায় খাইয়া তাহারা বড়োই সন্তুষ্ট হইত। মধ্যে মধ্যে তাজা মৎস্যের ব্যঞ্জন দেওয়া হইত বটে কিন্তু তাহা তাহারা বড়ো পছন্দ করিত না। সেই পচা মৎস্যের দুর্গন্ধ সত্বর আমাদিগকে বাজার ছাড়িতে বাধ্য করিল। আমরা ভঙ্গোর কুঠিতে উপস্থিত হইলাম।

ভঙ্গোর গৃহে উপস্থিত হইয়া জানিলাম লস্কর ভঙ্গা আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে রাজধানীতে চলিয়া গিয়াছে। তাঁহার জামাতা গৃহে উপস্থিত ছিল। আমাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিল। তাঁহার বিশাল দ্বিতল আটচালায় আমাদের বিশ্রাম স্থান নির্ধারিত হইল।

গৃহটি বেশ পরিষ্কার। হলটা খুব প্রশস্ত। চতুর্দিকে আয়নার জানালা। প্রতি খামে খামে হরিণ-শৃঙ্গ এবং তদুপরি আর্ট স্টুডিয়োর সুরঞ্জিত দেবদেবীর চিত্র। আমরা হলে প্রবেশ করিলাম। লস্করের যুবতি কন্যা তাহার স্বাভাবিক উলঙ্গদেহ লইয়া আসিয়া আমাদের তীক্ষ্ণ আগ্রহ দৃষ্টিকে সংকোচিত করিয়া দিল; আমরা দৃষ্টি অবনত করিলাম। হলের ভিতরের আসবাবপত্র অতি সামান্য, একখানা টেবিল, খান কয়েক চেয়ার ও এক খানা লৌহখাট। জানিলাম, এ ঘর তাহাদের ব্যবহার জন্য নহে। দেখিলাম, অন্যান্য সাধারণ গারোদিগের ন্যায় তাহাদেরও টং বা চাঙ পূর্ব কথিতরূপে অতি সামান্যভাবে নির্মিত।

সেই স্বভাব-সুন্দরী বন বালিকা আমাদের জন্য সহস্তে তাম্বুল চয়ন করিয়া আনয়ন করিল। একখানা রিকাবিতে প্রদত্ত হইল। পান আশু, সুপারি অর্ধকাটা চুনপাত্র বারিবিহীনে বিদীর্ণ-বক্ষ। আমরা যথাসম্ভব যত্নে সেই অপ্রত্যাশিত উপঢৌকন গ্রহণ করিলাম ও বিমল আনন্দে চর্বণ করিতে লাগিলাম। এদিকে লস্কর জামাতা তামাকু লইয়া সম্বর্ধনা করিলেন। কেহ কেহ তাহারও মর্যাদা রক্ষা করিতে ইতস্তত করিলেন না।

এই স্থানে আমরা বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া গারোদিগের আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি সম্বন্ধে অনেক কৌতূহলাবহ গল্প শুনিয়া সেদিনের জন্য বিদায় হইলাম।

সৌরভ ● চৈত্র ১৩২০ (১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ)



খাসিয়া জাতি

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী চৌধুরী

খাসিয়া স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে লিখিবার পূর্বে খাসিয়া পাহাড় ও খাসিয়া জাতির জন্মস্থান বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা করা আবশ্যক। খাসিয়া পর্বত আসাম প্রদেশের মধ্যে জলবায়ু সম্বন্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান। সমুদ্র হইতে এই পর্বতের উচ্চতা প্রায় পাঁচ বা ছয় সহস্র ফিট। প্রাকৃতিক দৃশ্যও স্থানে স্থানে অতি মনোহর। কোথাও অত্যুচ্চ পর্বতশৃঙ্গ শোভা পাইতেছে, কোথাও পাষাণ ভেদ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্মলা নির্ঝরিণী প্রবাহিত হইতেছে, কোথাও বা বৃক্ষলতা-শূন্য তুঙ্গ পর্বতমালা বিরাজ করিতেছে। আসামের শাসনকর্তা চিফ কমিশনার সাহেবের বাসস্থান শিলং পাহাড়, আসামের রাজধানী। অতি পূর্বে চেরাপুঞ্জিতে রাজধানী ছিল। চেরাপুঞ্জি অতিবৃষ্টির জন্য পৃথিবীর মধ্যে বিখ্যাত। সেই জন্য শিলঙে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। গত ১৮৯৭ সনের ভীষণ ভূমিকম্পে খাসিয়া পর্বতের অধিকাংশ স্থান অল্পাধিক পরিমাণে নষ্ট হইয়াছে। খাসিয়া পর্বত শীতপ্রধান দেশ। অত্যধিক শীতে বৃক্ষলতা শুকাইয়া যায়। পুনরায় বসন্তঋতুতে নবপত্র পুষ্পে প্রকৃতি সুসজ্জিতা হইয়া বড়োই মনোরম শোভা ধারণ করে। যে সুমধুর কমলালেবুকে লোকে "শিলেটের কমলা" বলে, তাহার প্রকৃত জন্মস্থান খাসিয়া পর্বত। কমলালেবু, মধু, রবার, তেজপাতা, দারুচিনি, গোলমরিচ, চুনের পাথর ও পাথুরে কয়লা প্রভৃতি এই পর্বত হইতে দেশান্তরে প্রেরিত হয়। খাসিয়া পর্বতে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা ও সর্দার আছেন. ইংরাজ রাজত্ব বিস্তারের পূর্বে খাসিয়া জাতি অতি অসভ্য ছিল ; কিন্তু ইংরাজ রাজের অধীনে আসিয়া অনেক সভ্য হইয়াছে। পর্বতের স্থানে স্থানে অনেকগুলি পরিবার মিলিয়া পল্লি নির্মাণ করিয়া বাস করে। আলু, কচু, ভুট্টা, ধান, জোয়ার প্রভৃতি শস্য এবং কদলী, পেঁপে, কাঁঠাল, লেবু প্রভৃতি ফল চাষ করে। শূকর, মুরগি, ছাগল, ভেড়া, গোরু পুষিয়া তাহা বিক্রয় করিয়া জীবনধারণ করে।

বর্তমান সময় অনেকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকরি করে। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই অর্থ উপার্জন করে। ঠিকা ও মুটে মজুরির কাজই অধিক পরিমাণে করিয়া থাকে। যে পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে তদ্রূপ সঞ্চয় করিবার অভ্যাস তাহাদের নাই। ইংরাজদিগের আগমন হইতে তাহারা অনেক বিলাসের বস্তু ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে, তাহাতে অনেক অর্থব্যয় করিয়া থাকে। পরিচ্ছন্নতার ভাব এই জাতির মধ্যে বড়ো অল্পই দেখা যায়। আজকাল কেহ কেহ পরিচ্ছন্নতা শিখিতেছে। এমন লোক আছে যাহারা বৎসরে একদিনও স্নান করে না। ইংরাজি সভ্যতার আদর্শে আজকাল পরিচ্ছন্নতা কেহ কেহ শিখিতেছে।

খাসিয়া নারীগণ সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাহারাই গৃহসংসারের কর্ত্রী, কন্যাগণ পিতামাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। স্ত্রীলোকেরা পুরুষের ন্যায় প্রায় সকল কাজ করে, স্বাধীনভাবে সর্বত্র যাতায়াত করে। বিবাহ সম্বন্ধে পাত্রপাত্রীর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ নাই। স্বামীর মৃত্যুর পর যখন ইচ্ছা স্ত্রীলোকে বিবাহ করিতে পারে। তবে অনেক স্থলে পিতামাতার মতানুসারে কার্য হয়। অতি অল্প ব্যয়ে খাসিয়া বিবাহ সম্পন্ন হইতে পারে, তবে যাহাদের শক্তি আছে তাহারা অধিক ব্যয়ও করে। চিরকুমারী খাসিয়া রমণীও দেখিতে পাওয়া যায়।

খাসিয়ারা যদিও এক সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে কিন্তু তাঁহার পূজা করে না। তাহাদের মধ্যে পৌত্তলিকতার লেশ মাত্র নাই। তথাপি ইহাদের মধ্যে অনেক কুসংস্কার রহিয়াছে। ইহারা ভূত প্রেতে বিশ্বাস করে এবং রোগের সময় আরোগ্য লাভের জন্য, ভূত প্রেতকে সন্তুষ্ট করিতে চাহে। তজ্জন্য মুরগি বলি ও মন্ত্রপূত ডিম ভাঙিবার প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। ধন লাভের জন্য ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ একপ্রকার কাল্পনিক সর্পের পূজা করে, সেই সর্পকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য গোপনে মানুষ বধ করিয়া রক্ত গ্রহণ করে। ইংরাজ শাসনের প্রভাবে বর্তমান সময়ে এরূপ মানববধের সংখ্যা অনেক হ্রাস হইয়াছে। অনেক খাসিয়া স্ত্রীপুরুষ খ্রিস্টধর্ম অবলম্বন করিয়াছে। জাতিভেদ ইহাদের মধ্যে নাই। সকল জাতির সহিত আহারাদি ও বিবাহ চলিতে পারে। অন্যান্য অসভ্য জাতির ন্যায় ইহাদের আহারাদি সম্বন্ধে কোনো আচারবিচার নাই। যদিও প্রায় সকল প্রকার পশু মাংসই ইহারা আহার করে। কিন্তু ইহাদের সকল সময়ের প্রধান খাদ্য ভাত ও শুকনো মাছ। মহাভোজের সময় শূকর এবং গোবধ হইয়া থাকে। সুরাপান ও ধূমপান পুরুষদিগের মধ্যে খুব প্রবল। বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া আজীবন স্ত্রীপুরুষ সকলে দিবারাত্রি তাম্বুল চর্বণ করিয়া থাকে। পানের সঙ্গে কেবল একটু চুন, একপ্রকার গাছের শিকড় ও কাঁচাসুপারি খায়। প্রত্যেক স্ত্রীপুরুষের গলার সহিত একটা থলে ঝুলানো থাকে তাহাতে বাঁশের ছোটো চোঙায় পান, পিতলের বা রূপার ডিবাতে চুন একখান ছুরি ও কতকগুলি কাঁচা সুপারি থাকে। পথে চলিতে চলিতে বা কাজ করিবার সময় মধ্যে মধ্যে পান খায়। অতিরিক্ত পান খাওয়াতে ইহাদের ওষ্ঠ ও দন্ত কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। আজকাল চা পানের অভ্যাসও অনেকের হইয়াছে। খ্রিস্টান প্রচারিকাদের সাহায্যে খাসিয়া মেয়েরা নিজের ব্যবহারোপযোগী সেমিজ, জ্যাকেট, ফ্রক পিনাফোর টুপি প্রভৃতি সেলাই, মোজা কম্ফোর্টর প্রভৃতি পশমের কাজ শিখিয়া বেশ অর্থ উপার্জন করিতেছে। পূর্বে ইহারা সেমিজ জ্যাকেট

ও ফ্রকের ব্যবহার জানিত না। কেবল আসামবাসীদের প্রস্তুত এঁড়ি ও মোগা বস্ত্রের কয়েক খণ্ডের দ্বারা সর্বাঙ্গ আবৃত করিত। তবে ইহা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, অসভ্য জাতি হইলেও খাসিয়া নারীর পরিচ্ছদ পরিধান প্রণালী অনেক সুসভ্য জাতির রমণীদের অপেক্ষা সুরুচিসম্পন্ন ও দেখিতে সুন্দর। খাসিয়াদিগের মধ্যে খাসিয়া পর্বতের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলবাসী খাসিয়া রমণীদের বস্ত্র পরিধান প্রণালীর বিভিন্নতা আছে। সর্বাপেক্ষা চেরাপুঞ্জি ও শিলঙের খাসিয়া রমণীদের পোশাক পরিধান সুন্দর ও পরিপাটি। ইহারা ক্রমেই অত্যন্ত বিলাসী ; যাহা উপার্জন করে তাহার অধিকাংশ অর্থ সুন্দর মূল্যবান বস্ত্র ক্রয় করিতে ব্যয় করে। শিশুদিগকে অত্যন্ত যত্নের সহিত লালনপালন করে। অতি শৈশবকালে প্রত্যহ তিনবার স্নান করাইয়া থাকে। ফ্রক মোজা টুপি পরাইয়া শিশুকে পৃষ্ঠে একখণ্ড বস্ত্রের দ্বারা বাঁধিয়া লইয়া বেড়ায়। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরক্ষণেই তাহাকে কদলী ভক্ষণ করায়। কদলী অতি উপাদেয় বস্তু, জন্মাবধি কদলী ভক্ষণ করিয়া খাসিয়া শিশু খুব বলিষ্ঠ ও সুন্দর হয়। খাসিয়া রমণীদের শরীর খুব বলিষ্ঠ ও দৃঢ়। ইহারা খুব পরিশ্রমী। দেখিতে অধিকাংশ গৌরাঙ্গী ইহাদের গঠন মঙ্গোলিয়ানদের মতো, হাত পা সুগোল চক্ষু ছোটো। প্রায় সকল প্রকার পরিশ্রমের কাজ রমণীরা স্বহস্তে করে। ইহাদের মধ্যে ছোটো-বড়ো ভেদাভেদ নাই। কোনো প্রকার পরিশ্রম করা ইহারা লজ্জাজনক বোধ করে না। স্বহস্তে কাপড় ধোয়া বাগানে কোদাল লইয়া চাষ করা, বন হইতে জ্বালাইবার জন্য কাঠ কাটিয়া আনা, বাজার বা অন্যত্র হইতে পিঠে ঝুড়িতে করিয়া জিনিসপত্র বহন করা প্রভৃতি সকল কার্যই নিজেরা করিয়া থাকে। দাস-দাসী রাখিবার প্রথা পূর্বে খুব কম ছিল। বর্তমান সময় অবস্থাপন্ন পরিবারে ইংরাজ ও বাঙ্গালীদের অনুকরণে দাস দাসী রাখা হইতেছে। সাধারণত, বালক বালিকা ও স্ত্রীলোকেরাই বাসার চাকরি করে। ইহাদের স্বাবলম্বনের ভাব বড়োই চমৎকার। কেহ কাহারও মুখাপেক্ষী হইতে চায় না। অশীতিবর্ষিয়া বৃদ্ধামাতাও স্বীয় গর্ভজাত সন্তানের উপর নির্ভর করে না। যদি গৃহের বাহিরে গিয়া পরিশ্রমের কোনো কাজ করিতে না পারে তাহলে মুরগি, ছাগল, শূকর ও গাভি পুষিয়া তাহার দ্বারা কিছু কিছু উপার্জন করিবে, নতুবা গৃহপ্রাঙ্গণে আলু কদলী কচু ভুট্টা প্রভৃতি স্বহস্তে চাষ করিয়া তাহাতে জীবনধারণ করিবে ; কাহারও দ্বারস্থ হয় না। এই কারণে ভিক্ষুক সংখ্যা খাসিয়া পাহাড়ে খুব কম। আজকাল বিদেশীয় অলস ভিক্ষুক লোকদেব দৃষ্টান্তে শিলং শহরের মধ্যে খাসিয়ারাও ভিক্ষাবৃত্তি শিখিতেছে। ইহাদের মধ্যে যেমন পরের গলগ্রহ হইবার ভার নাই, তেমনি ইহারা কাহাকেও আশ্রয়দান বা সাহায্য করিতেও জানে না। কৃতজ্ঞতা ও সত্যপবায়ণতা নাই। স্বার্থপরতা খুব প্রবল। ইহারা খুব আমোদপ্রিয় জাতি, স্ত্রীপুরুষ বালক বালিকা বৃদ্ধ যুবা সকলে একত্রে মিলিয়া নানা প্রকারে আমোদ করে। সরল প্রফুল্ল ও চঞ্চলমতি ইহারা খুব সংগীত প্রিয় এবং তাহাদের কণ্ঠস্বরও সুমধুর। যদিও তাহাদের নিজের কোনো নির্দিষ্ট সুর তাল বা সংগীত নাই ; তথাপি তাহারা পথে-ঘাটে এবং নানা কাজের সময় নিজের ইচ্ছামত সুরে ডি ডি ডি করিয়া গান করে। খ্রিস্টানেরা ইংরাজি সুরে গান করে এবং আজকাল অনেকে বাঙ্গালা সুরে ব্রহ্মসংগীত গান করিতে শিখিয়াছে। শিক্ষা সম্বন্ধে অতি অল্পকালের মধ্যে ইহারা যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছে। ইহাদের ভাষায় পূর্বে কোনো পুস্তক বা লিখিবার প্রণালী ছিল না। ইংরাজ অধিকারের পর খ্রিস্টান মিশনারিদের

অদম্য চেষ্টা ও অধ্যবসায় গুণে খাসিয়া জাতির মধ্যে জ্ঞানালোক প্রবেশ করিয়াছে। ইংরাজি অক্ষরে ইহাদের ভাষার পুস্তক লিখিত হয়। পুস্তকের সংখ্যা অতি কম। খ্রিস্টধর্ম সম্বন্ধীয় পুস্তকই অধিকাংশ। সম্প্রতি ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধীয় কয়েকখানা পুস্তক ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। স্ত্রীশিক্ষাও কিয়ৎ পরিমাণে উন্নতি লাভ করিতেছে। অধিকাংশ খাসিয়ারা স্বীয় ভাষায় লিখিত পুস্তক পাঠ করিতে পারে। অনেক স্ত্রীলোকও মোটামুটি পুস্তক পাঠ করিতে শিখিয়াছে। এই বৎসর কয়েকটি বালিকা নিম্ন প্রাইমারি ও উচ্চ প্রাইমারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। খাসিয়া যুবকগণও বি এ, এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। খ্রিস্টানদের সাহায্যে নানা স্থানে বালক বালিকাদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। একজন সম্ভ্রান্ত খাসিয়া ভদ্রলোক গভর্নমেন্টের কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সম্প্রতি স্বজাতির উন্নতির জন্য খুব চেষ্টা করিতেছেন। তিনি খাসিয়া বালক বালিকাদিগকে বাঙ্গালা ভাষা শিখাইবার জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার একটা ছাপাখানাতে খাসিয়া মেয়েদের কম্পোজিটার ও প্রিন্টারের কার্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন মেয়েদের দ্বারা অল্প ব্যয়ে সুন্দর পরিষ্কার কাজ পাওয়া যায়, মেয়েরা তাহাদের কর্তব্য পালনে পুরুষদের অপেক্ষা অধিক যত্নশীলা।

পরিবারে কাহারও মৃত্যু হইলে মৃত ব্যক্তির শব ২।৩ সপ্তাহ বা ততোধিক সময় গৃহে রক্ষিত হয়। মৃত ব্যক্তির যত আত্মীয়কুটুম্ব নিকটের ও দূরের সকলে উপস্থিত হইলে শবকে একটি কাষ্ঠ নির্মিত সিন্দুকের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া শ্মশানে লইয়া দাহ করা হয়। অবশেষে অস্থিগুলি সংগ্রহ করিয়া পৃথক স্থানে প্রোথিত করিয়া তদুপরি স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ সুদীর্ঘ একটি প্রস্তর দাঁড় করাইয়া দেয়। খাসিয়া পর্বতের নানা স্থানে এরূপ শিলাস্মৃতিচিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয়। খ্রিস্টান খাসিয়ারা শবকে দাহন করে না। কেবল সমাধি দেয়। মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি তাহার কন্যাই পাইয়া থাকে। পিতার ধনে পুত্রের অধিকার নাই। মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধোপলক্ষে তাহার আত্মীয়েরা কয়েকটা শূকর বলি দিয়া খুব সমারোহের সহিত ভোজ দেয়।

অন্তঃপুর ● জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮ (১৯০১ খ্রিস্টাব্দ)



রাভা জাতির বিবরণ

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

গারো পাহাড়ের উত্তরপার্শ্বস্থ অপেক্ষাকৃত সমতল প্রদেশে রাভা জাতির বাসস্থান। এইস্থান গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত। আজকাল ইহারা অনেক স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মঙ্গোলীয় জাতির সহিত ইহাদের কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে। গোলাকৃতি মুখমণ্ডলে চ্যাপটা নাক, উদ্গত চোয়াল, চুল মোটা মোটা ও রুক্ষ, গায়ের রং পাঙ্গাশে। গারোদের মত ইহাদের দেহ এত বলিষ্ঠ ও রুক্ষ নহে। মেয়েরা গারো মেয়েদের অপেক্ষা দুর্বল। পুরুষদিগের পোশাক অনেকটা বাঙ্গালাদেশের কৃষকদিগের মতো হাঁটুর উপর পর্যন্ত কাপড় পরা। স্ত্রীলোকেরা হাঁটুর নীচ পর্যন্ত ঝুলানো একখানা কাপড় পরে এবং আর একখণ্ড বস্ত্রদ্বারা বক্ষস্থল ঢাকিয়া রাখে। রাভাজাতি সাতটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। (১) পাতিরাভা, (২) রংডনিয়া, (৩) মৈতোরিয়া, (৪) দহুরিয়া, (৫) সঙ্গা, (৬) কোচ ও (৭) বৈতলিয়া। রাভা স্ত্রীলোকেরা হাতে রূপার বালা ও গলায় রূপার হার পরে। রংডনিয়া রাভা স্ত্রীলোকেরা উপর কানে প্রায় দুই ইঞ্চি লম্বা এক প্রকার অলংকার পরিধান করে। এই অলংকারের নাম “বোলা”। কোনো বিশেষ উৎসব উপলক্ষে “বোলা” ব্যবহৃত হয়।

রাভাজাতি কোনো বিশেষ ধর্মাবলম্বী নহে। তাহারা গোমাংস ভক্ষণ করে না কিন্তু কুক্কুট ও বরাহের মাংস খায়। তাহাদের কতকগুলি পৃথক দেবতা আছে. দেবতাদিগের কোনো প্রকার মূর্তি নাই ; তাহাদিগের সংখ্যা প্রায় কুড়িটি। নিম্নে তাহাদিগের কয়েকটির নাম দেওয়া গেল।

বাইমাবৈ—ইনি জন্মের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা। জলাশয়ের সমীপে এই দেবতার পূজা করিতে হয়। পূজায় ছাগ ও হংস বলি দিবার নিয়ম আছে। বরাহ কিংবা কুক্কুট বলি দেওয়া নিষিদ্ধ।

বাইখো বা খোক্সিবাই—ইনি শস্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ইনি দেবতাদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা বলিয়া গণ্য। বৎসরে একবার ভাদ্রমাসে এই দেবীর পূজা হয়। এই উপলক্ষ্যে প্রায় ছয় সাত দিন পর্যন্ত খুব আমোদ-আহ্লাদ হয়। এই সময় তাহারা চাউল হইতে প্রস্তুত এক প্রকার মদ্য পান করে। প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন করিবার জন্য ইহারা দেবীর নিকট খুব হৃষ্টপুষ্ট একটা বরাহ বধ করে। বৎসরে একবার মাত্র এই দেবীর পূজা করিবার নিয়ম থাকিলেও অনাবৃষ্টি কিংবা অতিবৃষ্টি হইলে পুনরায় ইহার পূজা দেওয়া হয়।

হাসংবাই—এই দেবী কলেরা বসন্ত প্রভৃতি রোগ নিবারণের জন্য পূজিতা হন। ইনি বোধ হয় আমাদের শীতলা দেবীরই রূপান্তর। গ্রামের পুরোভাগে এই দেবীর অর্চনা করা হয়। একটি বরাহ ও দুই তিনটি কুক্কুট এই দেবীর উদ্দেশে বধ করিবার নিয়ম আছে।

দরমংবাই—ইনি ধন ও স্বাস্থ্যের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা। দরমং নামক পাহাড়ে ইহার বাসস্থান বলিয়া কথিত। বিবাহের ভোজের জন্য যে সমস্ত শূকর বধ করা হয় তন্মধ্যে প্রথমটি এই দেবতার নামে উৎসর্গ করা হয়।

কালীবাই—ইনি আমাদের কালীমাতা ঠাকুরানি ; পূজার সময় পাঁঠা বলি দেওয়া হয়।

মাসী লক্ষ্মীবাই—শস্যক্ষেত্রে দুইটি বরাহ বধ করিয়া লক্ষ্মীদেবীর পূজা করা হয়।

বাহুল্য ভয়ে সমস্ত দেবতার নাম এই স্থলে উল্লেখ করিতে পারিলাম না। সমস্ত দেবতার নামের পক্ষেই "বাই" শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কোনো অসুখ-বিসুখ হইলে ইহারা মনে করে দেবতা অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। তখন ওঝার ডাক পড়ে। ওঝা আসিয়া একবাটি জলের মধ্যে দুইটা ধান ফেলিয়া বাটিটা নাড়িতে থাকে। ইহাতে যদি ধান দুইটা একসঙ্গে মিলিত হয় তাহা হইলে বুঝা গেল ওই রোগ নিবারক দেবতা অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। তখন তাহার সন্তোষ বিধানের নিমিত্ত পূজা দেওয়া হয়।

স্ত্রীলোক গর্ভবতী হইলে গর্ভস্থ সন্তানের সুখ-প্রসবের জন্য "বাই মাবই" দেবতার পূজা দেওয়া হয়। শিশুর জন্ম হইলে ধাত্রী বাঁশের তোয়াল দ্বারা নাড়িচ্ছেদ করে ও গর্ভের ফুল কলাপাতা মুড়িয়া মাটিতে পুতিয়া রাখে। শিশুর জন্মের পনেরো দিন—কোনো কোনো স্থানে একমাস পরে একটা ভোজ দেওয়া হয় ও শিশুর নামকরণ হয়। এইদিন শিশুর ধাইমা তাহার মস্তকে ধান দূর্বা দিয়া আশীর্বাদ করে। শিশুর মাতা কর্তৃক নাম রক্ষিত হয়। কোনো কোনো রাভা সম্প্রদায়ে নামকরণের এক অদ্ভুত নিয়ম আছে। শিশুর নাভিনাল পড়িয়া যাওয়ার পঞ্চমদিনে পিতা তাহার বন্ধুবান্ধবদিগকে নিজ বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে। নিমন্ত্রিতগণ উপস্থিত হইলে শিশুর পিতা একটি কুক্কুট কোনো আত্মীয়ের হস্তে প্রদান করে। আত্মীয়টি একটা কলার ডাঁটা দিয়া কুক্কুটটাকে এক একটি আঘাত করে ও এক একটি নাম উচ্চারণ করে। যে আঘাতে কুক্কুটটির প্রাণবায়ু বহির্গত হয় সেই আঘাতের সময় উচ্চারিত নামটিই শিশুর রাখা হয়। শিশুর নাভিনাল না পড়িয়া যাওয়া পর্যন্ত মাতা অশুচি থাকে ; অশুচি অবস্থায় স্ত্রীলোক রান্নাঘরে যাইতে পারে না। ইহাদের বিশ্বাস কোনো ব্যক্তির মৃত্যু হইলে সে পুনরায় সেই বংশেই জন্মগ্রহণ করে। কোনো মৃত আত্মীয় নবজাত শিশুরূপে পুনরাগমন করিল কিনা তাহা তাহারা কোনো প্রক্রিয়া দ্বারা জানিতে

ইচ্ছা করে না। শিশুকে মন্দ বলিলে কিংবা প্রহার করিলে সে যদি ক্রন্দন করে তাহা হইলে কোনো মৃত আত্মীয় পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া তাহারা মনে করে।

রাভাদিগের মধ্যে বিবাহে পণ লওয়ার প্রথা আছে। বরপক্ষ কন্যা পক্ষকে পণ প্রদান করে। পিতামাতা কিংবা আত্মীয়স্বজন কর্তৃকই বিবাহ স্থির হয়। বিবাহের প্রস্তাব স্থির হইয়া গেলে বরপক্ষ চাউল, সরিষার তৈল ও সিন্দুর লইয়া বিবাহের শুভ দিন স্থির করিবার জন্য কন্যা পক্ষের বাড়ি যায়। চাউল কনেকে প্রদান করিবার রীতি আছে। বিবাহে কন্যার কোনো প্রকার অমত না থাকিলে চাউল গ্রহণে আপত্তি করে না। সরিষার তৈল কনের চুলে মাখাইয়া দেওয়া হয় ও কপালে সিন্দুরের টিপ দেওয়া হয়। বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেলে বরপক্ষ ফিরিয়া আসে। বিবাহের দিন বরের আত্মীয়স্বজন স্ত্রীপুরুষ সকলেই কনের বাড়িতে যায় ও তাহাকে পাত্রের বাড়িতে লইয়া আসে। বিবাহ পাত্রের বাড়িতেই সম্পন্ন হয়। বিবাহের দিন কুক্কুট মাংস ও চাউলের মদ্য দ্বারা গ্রামস্থ সকলকে ভোজ দিবার নিয়ম আছে।

ইহাদিগের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে। যে কোনো বিধবা তাহার দেবরকে বিবাহ করিতে পারে, ভাসুরকে পারে না। রাভাদিগের মধ্যে বিবাহভঙ্গের প্রথাও আছে। স্বামী স্ত্রী উভয়ের সম্মতি থাকিলে বিবাহ ভঙ্গে কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু স্বামী ইচ্ছা করিয়া স্ত্রী ত্যাগ করিলে তাহাকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কিছু টাকা দিতে হয়। বিবাহ ভঙ্গের পর সে পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারে। ইহাদিগের মধ্যে বহুবিবাহ ক্বচিৎ দেখা যায় ; প্রথমা স্ত্রী নিঃসন্তান কিংবা গৃহকার্যে অসমর্থ হইলে স্বামী দ্বিতীয়বার বিবাহ করে। রাভাদিগের কোনো-কোনো সম্প্রদায়ে স্বগোত্র বিবাহও প্রচলিত আছে। অনেককে মাতুলকন্যা বিবাহ করিতে দেখা যায়। কোনো কোনো সময় মাতুল ভাগিনেয়ের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিয়া তাহাকে গৃহজামাতা করিয়া রাখে।

স্বাভাবিক মৃত্যু হইলে পোড়ানো হয় কিন্তু কলেরা, বসন্ত কিংবা অপমৃত্যু হইলে মৃতদেহ গোর দেওয়া হয়। কিন্তু ব্যাঘ্র দ্বারা কোনো ব্যক্তি হত হইলে তাহাকে দাহ করা হয়। মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া যাওয়ার পূর্বে পিতৃপুরুষদিগকে চাউলের মদ্যদ্বারা তর্পণ করে। দাহকার্য শেষ হইয়া গেলে মৃতব্যক্তির অস্থি লইয়া আসে। চিতার চারিদিকে ঘরের চাল বসাইয়া দেয় ও চারি কোণে চারিটি বাঁশ পুতিয়া একটা বস্ত্রখণ্ডের চারিকোণা চারিটি বাঁশের আগায় বান্ধিয়া দেয়। পূর্বে অবস্থাপন্ন ব্যক্তির মৃত-সৎকার খুব ধমধামের সহিত হইত। এবং নানাপ্রকার নৃত্যগীতাদি সহকারে অস্থি বহন করিয়া "তুরাহাকারে" লইয়া যাইত। "তুরাহাকার" পর্বতগাত্রে ক্ষোদিত গর্ত। এই স্থানে মৃত ব্যক্তির ভস্মাবশেষ রক্ষিত হইত।

মৃত-সৎকার করিয়া আত্মীয়স্বজন মৃত ব্যক্তির বাড়িতে আসিয়া ঘরের মেঝেতে একখানি কাপড় বিস্তৃত করে। মৃত ব্যক্তি পুরুষ হইলে কাপড়খানা পুরুষের, আর স্ত্রীলোক হইলে স্ত্রীলোকের হওয়া চাই। কাপড়ের উপর মদ্য ও খাদ্য দ্রব্য রাখিয়া মৃতব্যক্তির আত্মাকে সেগুলি আহার করিবার জন্য আহ্বান করা হয়। ইহার এক মাস পর পুনরায় এইরূপ অনুষ্ঠান করিয়া মৃতব্যক্তির আত্মার উদ্দেশে এই বলা হয় যে, সে যেন এই পরিবারকে

কোনোরূপ ভয় প্রদর্শন না করে এবং তাহাদের কথা একেবারে ভুলিয়া যায়। ধনী পরিবারে বৎসরান্তে আত্মীয়স্বজনদিগকে আহ্বান করিয়া গৃহজাত চাউলের মদ্য দ্বারা ভোজ প্রদান করে। আহারান্তে স্ত্রীপুরুষ সকলে একসঙ্গে নৃত্য করে এবং মৃতব্যক্তির আত্মাকে উদ্দেশ করিয়া এই বলিয়া গান করে "রাভাদিগের ধনী-পরিবারে তুমি জন্মগ্রহণ করিও, কোনো প্রকার বৃক্ষলতাদি হইয়া জন্মগ্রহণ করিও না, তাহা হইলে লোকে তোমাকে অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিবে, কোনো প্রকার পশুপক্ষী হইয়া জন্মগ্রহণ করিও না, তাহা হইলে লোকে তোমাকে মারিয়া খাইবে, তুমি গোরু হইয়া জন্মগ্রহণ করিও না, তাহা হইলে তোমাকে লাঙল টানিতে হইবে ইত্যাদি।"

ছোটো ছেলেপিলের মৃত্যু হইলে তাহার হাতের কিংবা পায়ের অঙ্গুলি একটু কাটিয়া পরে সৎকার করে। তাহাদের বিশ্বাস যদি সেই মৃত শিশুর আত্মা পুনরায় সেই পরিবারে জন্মগ্রহণ করে তাহা হইলে তাহার অঙ্গের কাটা চিহ্নদ্বারা তাহাকে চিনিতে পারা যাইবে। যদি কোনো নবজাত শিশুর অঙ্গুলিতে ওইরূপ কাটা চিহ্ন দৃষ্ট হয় তাহা হইলে তাহারা মনে করে সেই মৃত শিশুর আত্মা পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

রংডনিয়া রাভা সম্প্রদায় পূর্বে গারো পাহাড়ে বাস করিত। গারোদিগের সহিত তাহাদের কয়েকবার যুদ্ধ হইয়াছিল ; পরিশেষে রংডনিয়া সম্প্রদায় পরাজিত ও গারো পাহাড় হইতে সমতল প্রদেশে বিতাড়িত হইয়াছে। তাহারা বলে তাহাদের তাহাদের পূর্ব বাসস্থান 'সুমংসাং' নামক স্থানে ছিল। সোমেশ্বরী নদী ও উপত্যকাকে গারো ভাষায় সুমংসাং বলে। গারোদিগের 'অন্টাং' সম্প্রদায়ে ও রংডনিয়া রাভাদিগের ভাষায় অনেক সাদৃশ্য আছে। গারো পাহাড়ের দক্ষিণ অংশে 'অন্টাং' সম্প্রদায়ের বাস আর গারো পাহাড়ের উত্তর প্রান্তে রংডনিয়া রাভাদিগের বাস। বহুদূর ব্যবধানে স্থিত এই দুই জাতির ভাষায় অনেক সাদৃশ্য দেখিয়া তাহারা পূর্বে একস্থানে বাস করিত এইরূপ অনুমান করা অসংগত নহে।

রাভাজাতি খুব সরল। বিশেষভাবে সভ্যজাতির সংস্পর্শে আসে নাই বলিয়া এখনও খুব বিশ্বস্ত, প্রতারণার বিষয় মোটে অবগত নহে। ইহারা খুব মদ্যপ্রিয়। নিজ গৃহেই চাউল হইতে এক প্রকার মদ্য প্রস্তুত করে, ইহার নাম 'চোকো'। বিবাহই হউক আর পূজা পার্বনই হউক মদ্য অত্যাবশ্যকীয়। রাভাজাতি খুব অতিথিপরায়ণ। অবসরের সময় ইহারা মদ্যপান কিংবা গল্পগুজব করিয়া কাটায়। প্রত্যেক পরিবারেই কুক্কুট বরাহ প্রভৃতি প্রতিপালিত হয়, কিন্তু ইহাদের দৈনিক খাদ্য ডাল, ভাত, মাছ, শাকসবজি। ইহারা দুধ খায় না এমনকি স্পর্শ পর্যন্ত করে না। প্রায় প্রত্যেক দিনই স্ত্রীলোকেরা মাছ ধরে, কোনো কোনো দিন গ্রামের সমস্ত পুরুষ একত্র হইয়া মাছ ধরিতে যায়। রাভাজাতি খুব শিকারপ্রিয় কিন্তু শিকার করিতে বন্দুক ব্যবহার করে না। বনের মধ্যে জাল পাতিয়া দূর হইতে হরিণ শূকর প্রভৃতি জালের দিকে তাড়াইয়া আনে এবং শিকার জালে বদ্ধ হইলে লগুড়াঘাতে মারিয়া ফেলে।

সৌরভ ● ফাল্গুন ১৩২৪ (১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ)



মিশমি জাতি

মুদ্রারাক্ষস

মিশমি নামক অসভ্য জাতি আসামের উত্তর-পূর্ব অংশে বাস করে। দক্ষিণে ইরাবতী নদীর শাখা নেমলাং পর্যন্ত ইহাদের বসতি দেখা গিয়াছে। ইহাদের বসতি দাফাভূম নামক বৃহৎ পর্বতের পূর্ব পর্যন্ত গিয়া তৎপরে ব্রহ্মপুত্র নদের উপত্যকা দিয়া তিব্বতের সীমান্তে শেষ হইয়াছে। ইহাদের বসতি পশ্চিমে দিগারু নদী পর্যন্ত বিস্তৃত।

ব্রহ্মাণ্ডের উত্তরে ব্রহ্মপুত্রের শাখা দূ নদীর পশ্চিম দিগ্‌বাসী মিশমিগণ ইংরাজ অধিকৃত প্রদেশের সহিত বাণিজ্য করে ; উক্ত শাখানাদীর উত্তর-পূর্বদিগ্‌বাসীগণ কেবল তিব্বতীয়দিগের সহিত বাণিজ্য করে। প্রথমোক্ত মিশমিরা ধীর ও নিরীহ প্রকৃতি, কিন্তু অতিশয় চতুর ব্যবসায়ী। শেষোক্ত মিশমিগণ ইংরাজের শত্রুতাচারণ করে।

বহু ইংরাজ ও ফরাসি পর্যটক মিশমি বসতির ভিতর দিয়া তিব্বতে যাইবার চেষ্টা করিয়া তিব্বত-বন্ধু মিশমিদিগের হস্তে নিগৃহীত, লাঞ্ছিত ও বিনষ্ট পর্যন্ত হইয়াছেন।

মিশমি অধ্যুষিত প্রদেশের ন্যায় বন্ধুর, কষ্টকর, অথচ সুন্দর প্রাকৃতিক শোভাশালী দেশ আর দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ। এই প্রদেশে ভ্রমণ এক অতি কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এইজন্য মিশমিদিগের উরু ও জঙ্ঘার পেশিসকল সুগঠিত। সহস্র হস্ত গভীর খাদবাহিত উচ্ছ্বল নদী-স্রোতের উপর দিয়া ঝোলা সাঁকো দ্বারা গভীর খাদ সকল পার হইতে দৃঢ় অবয়ব ও স্নায়ুবল বিশেষ আবশ্যক, নতুবা পদে পদে প্রাণ সংশয়। যেখানে যেখানে নদী উভয়তীরস্থ শৈলরাজি দ্বারা অতি সংকীর্ণ গভীর খাদে আবদ্ধ, সেইখানেই এই সকল সেতু নির্মিত হয়। তিন চারিটি বেত একত্র জড়াইয়া রজ্জু রচনা করিয়া উহা নদীর উভয় তীরে বৃক্ষ বা শৈলে বাঁধা হয়। রজ্জুটি যতদূর সম্ভব জোরে টানিয়া সটান করিয়া বাঁধা

হয়। এই রজ্জুতে একটি চালনক্ষম বেত্রবৃত্ত ঝুলানো থাকে। তিতীর্ষু ব্যক্তি ইহার মধ্যে বসিয়া উর্ধ্বমুখ হইয়া বৃত্তটিকে রজ্জুর উপর দিয়া পিছলিয়া যাইতে দেয়। বৃত্তটি শীঘ্রই রজ্জুর মধ্যস্থলে উপনীত হয়। তারপর পারযাত্রীকে হাত ও পায়ের সাহায্যে বৃত্তটিকে রজ্জুর উপর সরাইয়া সরাইয়া তীরে পৌঁছিতে হয়। একটু অসাবধানে স্খলিত হইলেই সহস্র হস্ত নীচে পড়িয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া মৃত্যু নিশ্চিত।

মিশমিদিগের পল্লিগুলিতে কয়েকটি করিয়া গৃহ থাকে, কখনো কখনো বা সমগ্র পল্লিতে একটি মাত্র গৃহ থাকে ; কিন্তু এই গৃহগুলি এত বড়ো যে একটিতেই বহু পরিজনপূর্ণ পরিবার তাহাদের দাস ও অনুচর লইয়া থাকিতে পারে। একজন দলপতির গৃহ দৈর্ঘ্যে ৮৮ হাত এবং প্রস্থে ৮ হাত, দেখা গিয়াছিল। ইহা জমিতল হইতে উচ্চে বংশনির্মিত ও ১২টি কক্ষে বিভক্ত ছিল। স্ত্রীপুরুষ ও শিশু লইয়া শতাবধি লোক ইহাতে বাস করিত। কোনো কোনো দলপতির গৃহ ইহা অপেক্ষাও বড়ো ও অধিক কক্ষবিভক্ত হয়। সমুদয় কক্ষে প্রবেশ করিবার জন্য একটি দীর্ঘ বারান্দা থাকে ; তাহার দক্ষিণে দলপতি কর্তৃক নিহত মিথুন, হরিণ, ও শূকরের মাথার খুলি ও বামে গৃহস্থালির বাসন কোশন সজ্জিত থাকে ; পূর্বতন দলপতি কর্তৃক নিহত জন্তুকরোটি রক্ষা করাটা সম্ভ্রান্ত রীতি বলিয়া বিবেচিত হয় না। প্রত্যেক কক্ষেই একটি করিয়া চুল্লি থাকে, তাহার উপর ধূমযোগে সংরক্ষার জন্য মাংসস্থালি ঝুলানো থাকে। দলপতির গৃহই পল্লির প্রধান আড্ডা। শস্য রাখিবার গোলাঘর দূরে নির্মিত হয়।

বাণিজ্য ব্যবসায়ের জন্য মিশমিরা প্রায়ই ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহারা তাহাদের প্রতিবাসীদের মত চাষবাসে অধিক মনোযোগী নহে ; কিন্তু তাহাদের অনেক পশুপাল থাকে। তাহারা প্রতি বৎসর আসামে গোরু ক্রয় করে এবং তদ্ভিন্ন মিথুন নামক সুন্দর পার্বত্য গোরুর বৃহৎ পাল পোষণ করে। মিথুনকে উহারা 'চা' কহে। পত্নীসংখ্যার পরেই মিথুনের সংখ্যা হইতেই প্রধানত উহাদের ধনশালীতার পরিচয়। কৃষি বা দুগ্ধ যোগানের জন্য মিথুন পোষা হয় না, পরন্তু পর্ব ঘটা উপলক্ষে মিথুন বলি দিয়া মাংস খাওয়া হয় এবং মিথুনের বিনিময়ে বধূ ক্রয় করা হয়। মিথুন সকল বন্য অবস্থায় জঙ্গালে যথেচ্ছ চরিয়া বেড়ায় ; তাহাদের প্রভুরা প্রত্যহ ডাকিয়া লবণ খাওয়ায়, এবং ডাকিলে মিথুনদল তাহাদের মনিবের স্বর চিনিয়া নিকটে আসে।

বন্য একোনাইট মূল, মিশমিতিতা নামক তিক্তস্বাদ উদ্ভিজ্জ ঔষধ, এবং কস্তুরী মৃগনাভি বিক্রয় মিশমিদিগের ধনাগমের প্রধান উপায়। এই সমস্ত সামগ্রী এবং তিবৃত হইতে আনীত কয়েক প্রকার বাসন ও পশমি বস্ত্র লইয়া তাহারা প্রতিবেশী পার্বত্য জাতি ও আসামীদিগের সহিত বাণিজ্য করে। মিশমি ব্যবসায়ীগণ যাহা কিছু সঙ্গে লইয়া বেড়ায় তৎসমুদয়ই, এমনকি তাহার পরিহিত পরিচ্ছদটি পর্যন্ত, দরে পোষাইলে বিক্রয় করে।

বহুবিবাহ ইহাদের মধ্যে বহু প্রচলিত। প্রত্যেক পুরুষ যতগুলি স্ত্রী ক্রয় করিতে পারে ততগুলিই বিবাহ করিতে পারে। স্ত্রী ক্রয়ের পণ ১টি শূকর হইতে ২০টি বৃষ পর্যন্ত। কাহারও মৃত্যু হইলে তাহার স্ত্রী-গণ দায়াদ সূত্রে উত্তরাধিকারীর সম্পত্তি মধ্যে পরিগণিত হয় , কেবল উত্তরাধিকারীর মাতা অন্য নিকটতম সম্পর্কীয় পুরুষের অধিকারে যায়।

জঙ্গালের নিকট এক কুঁড়ে নির্মাণ করিয়া আসন্ন-প্রসবা স্ত্রীলোককে রাখা হয়। প্রসবান্ত অশৌচ কাল পর্যন্ত সেইখানেই থাকিতে হয়। পুত্র জন্মিলে অশৌচ কাল ১০ দিন, কন্যা জন্মিলে ৮ দিন।

পীড়া বা বিপদের সময় ভূতের তুষ্টি সাধনেই মিশমিদের ধর্মাচরণ পর্যবসিত। এবংবিধ ঘটনা উপলক্ষ্যে গৃহদ্বারে একটি পল্লব রক্ষিত হয় ; তাহা দেখিয়া আগন্তুকেরা বুঝিতে পারে যে আপাতত উক্ত গৃহে প্রবেশ ও গৃহবাসীদিগের সহিত মেলামেশা নিষিদ্ধ। দয়ালু সর্বময় কর্তা কোনো শ্রেষ্ঠ দেবতার জ্ঞান তাহাদের নাই। তাহারা সংহার-দেবতা 'মুজিদাগ্রাঃ', জ্ঞান ও শিকারের দেবতা 'দামিপাওঁ', রোগ ও ধনের দেবতা 'তবলা', এবং অনামা আরও কত কী দেবতার পূজা করে। উহাদের পুরোহিত আছে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প। ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষ্যে অনেক দূর হইতে উহাদিগকে আনিতে হয়।

একজন মিশমি দলপতির স্ত্রীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া যেরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল তাহার বর্ণনা হইতে তাহাদের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা হয়। মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই স্ত্রীলোকটির শব মৃত্তিকাপ্রোথিত করা হয়। ইহার তিনমাস পরে "শ্রাদ্ধ" হয়। কবর গৃহের নিকটেই ছিল। উহার উপর একটি ছাদ নির্মিত হইয়াছিল ; পুরোহিতের আগমনের কয়েকদিন পূর্ব হইতেই একটি ক্ষুদ্র ঘণ্টা বাজাইয়া বিষাদময় ধর্ম সংগীত গাহিবার জন্য একজন লোক নিযুক্ত হইয়াছিল। অধিকন্তু একজোড়া লোহিত বর্ণের কুক্কুট-কুক্কুটি প্রারম্ভিক বলিদান দিয়া তাহাদের রক্ত অন্য একটা অজ্ঞাত তরল পদার্থ পূর্ণ পাত্রে লইয়া মিশ্র রক্ত সাবধানে পরীক্ষিত হয় ; কারণ মিশমিদের বিশ্বাস যে এই পরীক্ষা হইতেই ভাবী ফলের শুভাশুভত্ব জানিতে পারা যায়। অবশেষে একজন সাধারণ দলপতির মত পোশাক পরিয়া, কড়ির মাল্যধারী, শিরশ্ছেদের সম্মুখে দুইটি শৃঙ্গাবৎ বিশেষ চিহ্নধারী পুরোহিত আসিলেন। দুইদিন ধরিয়া পুরোহিত ও তাঁহার পুত্র তালবৃন্তব্যজন ও ঘণ্টাধ্বনি দ্বারা কাল নিরূপণ করিয়া থাকিয়া থাকিয়া গান করিলেন ; তৃতীয় দিবসে পুরোহিত দলপতির বেশ পরিত্যাগ করিয়া পুরোহিতের বেশ ধারণ করিলেন—সে বেশ এইরূপ : গায়ে একটি আঁটা রঙিন কার্পাস কোট, একটা ছোট ঘাঘরা, চোগার মত পরিহিত একটি হরিণ চামড়া ; দক্ষিণ স্কন্ধ হইতে গাঢ় লোহিত বর্ণ রঞ্জিত ছাগলোম নির্মিত উপবীত ও বামস্কন্ধ হইতে একটি চওড়া পেটি লম্বিত ; পেটির গায়ে চারি সার ব্যাঘ্র দন্ত ও চৌদ্দটি ক্ষুদ্র ঘন্টিকা সংযুক্ত ছিল। শিরোভূষণ কড়িগ্রথিত একটি বেষ্টনী ফিতা এবং ঝুঁটিসংলগ্ন বায়ুভরে ঘূর্ণ্যমান একটি পাখির পালক।

অতঃপর পৈশাচিক তাণ্ডব। এই নৃত্যের উদ্দেশ্য যতটা সম্ভব কোলাহল করিয়া ভূত তাড়ানো। তৎপরে সমস্ত আলোক নির্বাপিত করা হইল এবং সকলে অন্ধকারে রহিল ; পুনর্বার ছাদ হইতে শূন্য-বিলম্বিত এক ব্যক্তি চকমকি পাথর ঠুকিয়া নূতন আলোক জ্বালিল। এই আলোক জ্বালিবার সময় যাহাতে কোনো প্রকারে সেই ব্যক্তি মৃত্তিকা স্পর্শ না করে তজ্জন্য বিশেষ সাবধানে থাকিতে হয়, কারণ শূন্য বিলম্বিত অবস্থায় প্রজ্জ্বলিত আলোক সাক্ষাৎভাবে স্বর্গ হইতে প্রাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হয়।

যখন কোনো সম্পন্ন ব্যক্তির কবর হয়, তখন অনেক জন্তু নিহত হয়, এবং তাহাদের করোটি কবরের চারিদিকে সাজাইয়া রাখা হয়। কবরের উপর নির্মিত ছাদের নীচে

প্রেতাত্মার জন্য পক্ক ও আম মাংস, শস্য ও সুরা এবং জীবদ্দশায় ব্যবহৃত মৃতব্যক্তির সমুদয় পরিচ্ছদ ও অস্ত্রশস্ত্রাদিও ঝুলাইয়া রাখা হয়। দরিদ্র লোকেরা বিশেষ কোনো ঘটা বা ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান না করিয়া শবদাহ করিয়া ফেলে বা নদীতে নিক্ষেপ করে।

মিশমি পুরুষেরা একখানা ছোটো কাপড় কোমরে জড়াইয়া কাছা কোঁচা দিয়া পরে, এবং গলা হইতে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা একটা কোট গায়ে দেয়। একটুকরা নীল ও লাল বা কটা ডোরা দেওয়া লম্বা কাপড় ঠিক মধ্যস্থলে দু-ভাঁজ করিয়া তাহার দুই পার্শ্বে হাত বাহির করিবার ফুটা ছাড়িয়া দুই পাশ সেলাই করিয়া থলের মতো করা হয়। গলা প্রবেশ করাইবার জন্য কাপড় বুনিবার সময়ই মাঝখানে একটু চেরা রাখা হয়।* ঘাড়ের উপর দিয়া একটি চামড়ার পেটি পরিয়া পালকাবৃত দুইটি থলি ঝুলাইয়া রাখা হয় এবং দুই পিঠে করতালের মত দুইটা পিতলের থালা সংযুক্ত থাকে। ঠিক পিঠের সঙ্গে লাগিয়া থাকে এমন উপায়ে প্রস্তুত, তদ্দেশসুলভ সাগুবৃক্ষের লম্বা কালো আঁশ দ্বারা আচ্ছাদিত, এবং তিব্বতীয় গাভির পুচ্ছশোভিত একটা থলি পিঠের দিকে ঝুলানো থাকে। একটি লম্বা সোজা তিব্বতীয় তরবারি, কয়েকটি ছুরি ও ছোরা, এবং একটি সুন্দর হালকা লম্বা সরু পালিশ করা বাঁটে ভালো লোহার ফলকযুক্ত বল্লম মিশমি পুরুষের নিত্য ব্যবহার্য অস্ত্রশস্ত্র। তাহারা মাথায় কখনও বা পশমের টুপি, কখনও বা বংশ বা বেত্র শলাকা গ্রথিত শিরস্ত্রাণ পরিয়া থাকে।

স্ত্রীলোকেরা হাঁটু পর্যন্ত লম্বমান একখানা কাপড় আলগা করিয়া কোমরে জড়ায়। গায়ে যে একটি অতি ছোটো আঙ্গিয়া বা কাঁচুলি পরে তাহাতে স্তনদ্বয় অবলম্বন পায় কিন্তু সম্পূর্ণরূপে আবৃত হয় না। তাহারা কাচ, চিনেমাটি বা মূল্যবান প্রস্তরের মালা প্রচুর পরিমাণে পরে। তাহারা মাথায় একটা পাতলা রূপার পাতের বেষ্টনী পরে ; সেই রজত শিরোবেষ্টনী কপালের উপর খুব চওড়া থাকে, এবং ক্রমশ সরু হইয়া কানের কাছে অর্ধ ইঞ্চি হইয়া মস্তকের পশ্চাতে ছোটো কড়ির মালা দ্বারা আবদ্ধ থাকে। স্ত্রী ও পুরুষ সকলেই লম্বা চুল রাখিয়া চারিদিক হইতে উঠাইয়া কপালের উপর ঝুঁটি করিয়া একটা কাঁটা দিয়া আটকাইয়া রাখে। ছোটো ছোটো বালিকারা উলঙ্গ থাকে ; কেবল কোমরের ঘুন্সি হইতে কাঠের একটি ছোটো তক্তি সম্মুখের দিকে ঝুলানো থাকে—ঠিক যেন বিক্রয়ের জন্য তাহাদের গায়ে টিকিট ঝুলাইয়া দিয়াছে।

কী স্ত্রী, কী পুরুষ, মিশমিরা পাকা তামাকখোর। তাহারা যথাসম্ভব শৈশবেই ধূমপানে অভ্যস্ত হয় এবং আহার নিদ্রার সময় ব্যতীত সর্বদাই তামাক খায়।

মিশমিরা খর্বকায়, দৃঢ়াবয়ব, গৌরবর্ণ, কর্মঠ এবং বানরের মত ক্ষিপ্রগামী। তাহাদের মুখাবয়ব মঙ্গোলীয় ও আর্য ছাঁদের মাঝামাঝি।

মিশমিরা বহু শাখায় বিভক্ত। আসামের সীমান্তে দিগারু ও দিবং নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগে

* খাসিয়া পর্বতে আমার শ্রদ্ধাভাজন এক ধর্মপ্রচারক বন্ধু আছেন। তিনি একবার আমাকে এইরূপ একটি মোটা সাদা কাপড়ের কোট উপহার দিয়াছিলেন। উহা আমি যত্নপূর্বক কয়েক বৎসর গায়ে দিয়াছিলাম।

—প্রবাসী-সম্পাদক

মিধি নামক জাতি বাস করে। তাহারা মিশমিদিগের অনুরূপ বলিয়া এবং সম্মুখের চুল কপালের উপর খাটো করিয়া কাটে বলিয়া আসামবাসীগণ তাহাদিগকে চুলকাটা মিশমি বলে।

ইহাদের আবাসভূমি সাদিয়ার উত্তর হইতে হিমালয় উত্তীর্ণ হইয়া তিব্বত সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ; অত্যুচ্চ বন্ধুর পর্বত পরিবেষ্টিত বলিয়া দুরধিগম্য। দিবং নদীর তীরবর্তী একটি খাড়া পর্বতের গা বেড়িয়া একটা তাকের মত পথ আছে, একস্থানে আবার তাহাও নাই, কেবল হাত পা আটাকাইবার জন্য পর্বতগাত্রে গোটাকয়েক গর্ত আছে—চুলকাটা মিশমির দেশে যাইবার ইহাই একমাত্র সহজ (!) পথ।

চুলকাটা মিশমিদিগকে তাহাদের প্রতিবেশীগণ বড় ঘৃণা, অবিশ্বাস ও ভয় করে। কারণ, তাহারা সুযোগ পাইলেই অপর জাতীয় শিশু ও রমণীদিগকে চুরি করিয়া লইয়া পলায়। তাহারা অত্যন্ত ধূর্ত ও প্রতারক। তাহারা মধ্যে মধ্যে বড়ো বড়ো ঝুড়িতে নানা পণ্য বহন করিয়া আপনাদের পার্বত্য দেশ হইতে নিম্ন সমতলে দলে দলে ভারশ্রান্ত নিরীহ লোকের মতো নামিয়া আসে এবং কোনো অরক্ষিত গ্রামে উপস্থিত হইয়া সুবিধা বুঝিয়া বোঝা ফেলিয়া গ্রামস্থ বহুসংখ্যক শিশু ও রমণী ধরিয়া লইয়া পাহাড়ে পালায়।

ইহাদের গ্রামে ১০ হইতে ৩০টি পর্যন্ত গৃহ থাকে। প্রত্যেক গৃহ প্রায় ৮ হাত চওড়া ৪০ হাত লম্বা। তাহাদের কাঠামো অতিশয় হালকা রকমের। গৃহের লম্বালম্বি একাংশ বারান্দার মত খোলা থাকে এবং অপরাংশ কক্ষবিভক্ত হয়। এই কক্ষগুলিতে দুই চারিটি বসিবার চৌকি থাকে ; সভ্যতার এই চিহ্নটি ভারতবর্ষের অধিকাংশ কুটিরেই দুর্লভ দর্শন।

ইহাদের দলপতিগণের নাম গাম। তাহারা 'আলুন্দি', 'আলুঙ্গা' প্রভৃতি শ্রুতিমধুর নাম ভালবাসে। দলপতিত্ব পুরুষানুক্রমিক। আপন আপন দলের উপর ইহাদের বিলক্ষণ প্রভাব আছে, কিন্তু কাহারো দেহ বা সম্পত্তির উপর কোনো ক্ষমতা নাই—অপরাধীকে দণ্ড পর্যন্ত দিতে পারে না। যদি এক দলের কোনো লোক অপর দলের কাহারও কোনো অনিষ্ট করে, তাহা হইলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির দল ইহার প্রতিশোধ লওয়াটা কর্তব্য বলিয়া মনে করে। কিন্তু কোনো ব্যক্তি স্বীয় দলের কাহারও কোনো অনিষ্ট করিলে তাহার অপরাধের দণ্ড বিধান করা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরই স্বার্থ বলিয়া বিবেচিত হয়।

পত্নীর সংখ্যায় চুল কাটা মিশমিদিগেরও ধনশালিত্বের পরিচয়। কোনো কোনো দলপতির ষোলোটি পর্যন্ত পত্নী থাকে। ইহাদের মধ্যে বৈবাহিক অনুষ্ঠান কিছুই নাই, উহা কেবল ক্রয়ের ব্যাপার। ইহাদের মধ্যে সতীত্বের আদর নাই ; ক্রেতা স্বামী প্রত্যাশা করে না যে ক্রীত পত্নী সতী হইবে বা থাকিবে। যতদিন তাহারা তাহার দাসীত্বের ব্যাঘাত না ঘটায় ততদিন তাহাদের ক্ষণিক চপলতা তাহারা গ্রাহ্যই করে না। কাহারও দ্বারা তাহাদের দাসীকর্মে ব্যাঘাত ঘটিলে স্বার্থহানি জনিত রোষ ও বৈর জন্মে কিন্তু তাহাতে স্ত্রীলোকটি কিছুমাত্র দুষ্য বিবেচিত হয় না।

মিধি বা চুলকাটা মিশমিরা বণিকজাতি। তাহারা বৃহৎ দলবন্ধ হইয়া তিব্বতের সহিত বাণিজ্য করিতে যায়। পুরুষগণ নিজে যাইতে না পারিলে পত্নীদিগকে প্রেরণ করে ; এবং

যাত্রাপথে নরনারী কীরূপ নির্বিচারে রাত্রি যাপন করে তাহা দেখিলে চুলকাটা মিশমিরা যে নারীর একনিষ্ঠতা সম্বন্ধে কীরূপ নির্বিকার তাহা বেশ বুঝা যায়।

মিধিদের রং কৃষ্ণাভ কপিশবর্ণ হইতে গৌর পর্যন্ত নানা রকমের দেখা যায়। অনেক মিধি যুবতি বেশ সুন্দরী হয় ; কিন্তু সম্মুখের চুল কপালের উপর আঁচাড়াইয়া নামাইয়া কান হইতে কান পর্যন্ত কপালের মাঝখানে খাটো করিয়া কর্তিত হওয়ায় তাহাদিগকের বড়ো কুৎসিত দেখায়। এইরূপ ধরনের চুল কাটার প্রথা প্রাচীন বঙ্গে ছিল,—তাহাকে 'থরকাটা' বলিত। কপাল থরকাটা চুলে ঢাকিয়া ছোটো দেখায় এবং দৃশ্যমান অংশটুকুও প্রায় কর্দমলিপ্ত থাকে। পশ্চাতের চুলে খোঁপা বাঁধিয়া হাড়ের শলাকা বা সজারুর কাঁটা দিয়া আটকাইয়া রাখে। পুরুষেরা বেত্র বংশ শলাকা গ্রথিত শিরস্ত্রাণ পরিধান করে। তাহাতে তাহাদের ভ্রূর উপর পর্যন্ত সমগ্র কপাল ঢাকা পড়ে, মাথাটা প্রকাণ্ড ও মুখ ভ্রূকুটি কুটিল দেখায়। তাহাদের মুখাবয়ব কদর্য মঙ্গোলীয় ছাঁচের ; মুখ চ্যাপটা ও চওড়া, নাসারন্ধ্র বিস্তৃত ও গোল এবং চক্ষু ছোটো ও টেরা। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীগণ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকায় ও সুশ্রী হয়।

মিশমিদিগের সকল শাখার মধ্যে চুলকাটারাই সর্বাপেক্ষা শিল্পনিপুণ। তাহারা কার্পাস ও পশমি বস্ত্র বুনিতে পারে। নানাবিধ পার্বত্য তন্তুমান উদ্ভিদের আঁশ বাহির করিয়া কাপড় বুনে। রিয়া তন্তুর ব্যবহার ইহারাই প্রথম আবিষ্কার করে। বিছুটিজাতীয় একপ্রকার গাছ হইতে ইহারা এমন শক্ত কাপড় তৈয়ার করে যে তাহার জামা বর্মরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহারা নানাপ্রকারের কাপড় আসামে বিক্রয় করিতে আনে ; প্রধানত লবণের বিনিময়ে বিক্রয় করে। কোনো প্রকার প্রচলিত ওজন অনুসারে ইহারা লবণ লয় না। লবণবিক্রেতার দোকানের সম্মুখে বসিয়া সতর্কতার সহিত আপনার সুরক্ষিত ঝুড়ির ভিতর হইতে বিক্রেয় জিনিসটি বাছিয়া বাহির করে এবং তাহা পায়ের আঙুলের নীচে বা হাঁটুর মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া আপনার ময়লা হাত দুইটা সাদা চকচকে নুনের মধ্যে ঢুকাইয়া দেয় এবং দুই হাতের অঞ্জলি ভরিয়া লবণ উঠাইয়া আপনার ঝুড়িতে লইতে চেষ্টা করে। কিন্তু সতর্ক লবণ বিক্রেতা হাতের এক ঘা মারিয়া অর্ধেক লবণ ফেলিয়া দেয় ; তখন উভয়পক্ষের ঘোরতর বচসা হয়। সাধারণত লবণবিক্রেতা আর অল্প লবণ দিলেই বিবাদ মিটিয়া যায়। বস্ত্র ব্যতীত চুলকাটার মোম, আদা ও লংকা প্রচুর পরিমাণে বিক্রয়ার্থ লইয়া আসে।

শিরস্ত্রাণ ব্যতীত সকল বিষয়ে ইহাদের পরিচ্ছদ অন্যান্য মিশমিদিগের মতো। কিন্তু চুলকাটা স্ত্রীগণ অন্য মিশমি স্ত্রীদিগের অপেক্ষা বৃহদায়তনের কাঁচুলি বা আঙিয়া পরে ; ইহাদের আঙিয়াগুলিতে নানাবিধ সুন্দর সূচীকর্ম করা থাকে। ঋজু তিব্বতীয় তরবারি, ধনুর্বাণ ও ছোরা ইহাদের প্রিয় অস্ত্র। মিশমীদিগের মধ্যে কেবল ইহারাই বিষলিপ্ত বাণ ব্যবহার করে। ইহারা মহিষচর্ম নির্মিত লম্বা চৌকোণা ঢাল বহন করে এবং ঢালের নীচে তূণপূর্ণ বিষদিগ্ধ বাণ থাকে। যোদ্ধারা অস্ত্র বিনিময় করিয়া শপথপূর্বক বন্ধুত্ব স্থাপন করে এবং এরূপ এক বন্ধুর যুদ্ধে পতন ঘটিলে অপর ব্যক্তি বন্ধুর মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে এবং মৃত বন্ধুর মস্তকটির পুনরুদ্ধার করিতে আপনাকে বাধ্য মনে করে।

চুলকাটা মিশমিরা গ্রাম হইতে দূরে অরণ্যে মৃতব্যক্তিগণের দেহ প্রোথিত করে।

জঙ্গালের মধ্যে এক স্থানের বৃক্ষাদি কাটিয়া পরিষ্কার করা হয়। সেইখানে অস্ত্রশস্ত্র ও পরিচ্ছদাদিসহ শব প্রোথিত করা হয়। তৎপরে কবরের উপর নৃত্য করে।

নরনারী একত্র জোড়া জোড়া জড়াজড়ি করিয়া ইংরাজের বল নাচের মত ক্ষিপ্র লঘু গতিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিবিধ লাস্য লীলা সহকারে নৃত্য করে। নাচিবার সময় রমণীর হাতে একটা ছোটো ঢোল থাকে, প্রত্যেক বার ঘুরিবার সময় তালে তালে ঢোলের শব্দ করে। এই নৃত্যোৎসব ব্যতীত অতর্কিত আক্রমণ দ্বারা শিশু সন্তান চুরি করিয়া পলায়নের নাট্যাভিনয়ও চুলকাটা মিশমিদের এক প্রধান আমোদ।

ডালটন সাহেব বলেন যে তিনি চুলকাটা মিশমিদের মতো সম্পূর্ণ ধর্মভাববিবর্জিত জাতি আর দেখেন নাই। তাহারা তাঁহার সঙ্গে ধর্মপ্রসঙ্গ আলোচনা পরলোক বা আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস প্রকাশ করে নাই। তাহারা বলে যে যেসকল ভূতের তুষ্টিসাধন করিয়া তাহারা অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করে তাহারাও তাহাদেরই মতো মরণশীল। তাহারা যদিও পর্বত নদী প্রভৃতি যাবতীয় স্থাবর জঙ্গমের একজন সৃষ্টিকর্তা স্বীকার করে, কিন্তু তাহাদের বিশ্বাস তিনি এখন বাঁচিয়া নাই। তাহাদের বিশ্বাস মানুষ মরে ও শব পোকায় খাইয়া ফেলিলেই তাহার নিঃশেষ অবসান হয়। ডালটন সাহেব যখন তাহাদিগকে বলিলেন যে তাহারা কবরের মধ্যে যে খাদ্য, অস্ত্র ও পরিচ্ছদাদি প্রোথিত করে তাহা বোধ হয় প্রেতাত্মারা পাইবে এই ধারণাতেই করে ; তখন তাহারা তদুত্তরে বলিল সেরূপ ধারণা তাহাদের আদৌ নাই ; তাহারা বলিল কেবল মৃতব্যক্তির প্রতি প্রীতির চিহ্ন স্বরূপ এই সকল জিনিস কবরে দেয় ; মৃতব্যক্তি জীবদ্দশায় যে সকল সামগ্রী ব্যবহার করিয়াছে তাহা তাহার আত্মীয়গণ ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করে না ; তাহারা জ্ঞাতির মৃত্যু দ্বারা লাভবান হইতে চাহে না।

এই প্রবন্ধটি কর্ণেল ডালটন সাহেবের বঙ্গের জাতিবিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক (Descriptive Ethnology of Bengal) হইতে সংগৃহীত হইল।

প্রবাসী ● ১৩১৪ বঙ্গাব্দ (১৯০৭ খ্রিস্টাব্দ)



চুলকাটা মিশমি

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

আসামের সীমান্তে দিগারু ও দিবং নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগে চুলকাটা মিশমিদিগের বাস। তাহাদের প্রকৃত নাম মিধি। কিন্তু তাহারা মিশমিদিগের নিকট সম্পর্কীয় বলিয়া এবং সম্মুখের চুল কপালের উপর খাটো করিয়া কাটে বলিয়া আসামবাসীগণ তাহাদিগকে চুলকাটা মিশমি বলেন। চুল কাটিবার এই ফ্যাশনটি ইংরাজদের মধ্যে এবং ইংরাজের "হনূকারী" কোনো কোনো বাঙ্গালী পরিবারে দৃষ্ট হয়। কিন্তু মিধিরাই এই ফ্যাশনটির সৃষ্টিকর্তা। তাহাদের প্রতিবেশীরা তাহাদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা, অবিশ্বাস ও ভয় করে। কারণ, তাহারা সুযোগ পাইলেই অপর জাতীয় স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে চুরি করিয়া লইয়া পলায়। তাহারা বড়ো ধূর্ত ও প্রতারক। তাহারা নিজ পার্বত্য দেশ হইতে সমতল ভূমিতে দলে দলে নামিয়া আসে। দেখিলে মনে হয় যে তাহারা বড়োই নিরীহ। আসিবার সময় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঝুড়ি বহন করিয়া আসে। মনে হয় পণ্যদ্রব্যপূর্ণ ঝুড়িগুলির ভারে যেন তাহারা অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু যখনই তাহারা কোনো অরক্ষিত গ্রামে উপস্থিত হয়, অমনি নিজ নিজ মিথ্যা বোঝা ফেলিয়া দিয়া গ্রামস্থ বহু সংখ্যক স্ত্রীলোক ও শিশুকে ধরিয়া পাহাড়ে লইয়া পলায়।

ইহাদের এক একটি গ্রামে ১০ হইতে ৩০টি পর্যন্ত গৃহ থাকে। গৃহগুলির কাঠামো অতিশয় হালকা। প্রত্যেকটি প্রায় ৮ হাত চওড়া ও ৪০ হাত লম্বা। গৃহের একটি পার্শ্ব ব্যাপিয়া কেবল একটি যাতায়াতের পথ থাকে। অপর পার্শ্বটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষে বিভক্ত। এই কক্ষগুলিতে দুই চারিটি বসিবার চৌকি থাকে। সভ্যতার এই চিহ্নটি ভারতবর্ষের অনেক কুটিরেই দৃষ্ট হয় না।

ইহাদের দলপতিগণের নাম গাম। গামেরা আলুন্দি, আলুঙ্গা প্রভৃতি সুশ্রাব্য নাম ভালবাসে। নিজের দলের উপর ইহাদের বেশ প্রভাব আছে, কিন্তু দলস্থ লোকদের সম্পত্তির উপর

ইহাদের কোনো ক্ষমতা নাই। ইহারা অপরাধীকে দণ্ড পর্যন্ত দিতে পারে না। যদি এক জাতির কোনো লোক অপর জাতির কাহারও অনিষ্ট করে, তাহা হইলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির দল ইহার প্রতিশোধ লওয়াটা কর্তব্য বলিয়া মনে করে। কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি স্বজাতীয় কাহারও অনিষ্ট করে, তাহা হইলে অপরাধীর দণ্ডবিধান, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরই কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

পত্নীর সংখ্যা চুলকাটা মিশমিদের ধনশালিতার একটা চিহ্ন। কোনো কোনো দলপতির ষোলোটি পর্যন্ত পত্নী থাকে। এ বিষয়ে ইহারা কিন্তু আমাদের দেশের কুলীন ব্রাহ্মণদিগের মতো ঐশ্বর্যশালী নহে। ডালটন সাহেব বলেন, ইহাদের মধ্যে বৈবাহিক ক্রিয়াকলাপ কিছুই নাই। ইহা কেবল ক্রয়ের ব্যাপার। ইহাদের মধ্যে সতীত্বের আদর নাই। স্বামী এরূপ প্রত্যাশা করে না যে, তাহার ক্রীত স্ত্রীলোকগুলি সতী হইবে বা থাকিবে। যদি তাহারা দাসীত্ব করে, তাহাতেই সে সন্তুষ্ট।

মিধি বা চুলকাটা মিশমিরা বণিকের জাতি। তিব্বত দেশের সহিত তাহারা প্রায়ই দলে দলে বাণিজ্য করিতে যায়। পুরুষেরা নিজে বাণিজ্য করিতে যাইতে না পারিলে পত্নীগণকে পাঠাইয়া দেয়।

মিধিদের রং কৃষ্ণাভ কপিশবর্ণ হইতে গৌর পর্যন্ত নানা রকমের দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক মিধি যুবতি বেশ সুন্দরী ; কিন্তু তাহাদের সম্মুখের চুল কপালের উপর খাটো করিয়া কর্তিত হওয়ায় তাহাদিগকে বড়ো কুৎসিত দেখায়। তাহারা পশ্চাতের চুলে খোঁপা বাঁধিয়া তাহা একটা সজারুর শল বা হাড়ের কাঁটা দিয়া আটকাইয়া রাখে। পুরুষেরা বৈদল শিরস্ত্রাণ পরিধান করে। তাহাতে তাহাদের ভ্রুর উপর পর্যন্ত ঢাকা থাকে, মাথাটা প্রকাণ্ড দেখায় এবং মুখাবয়ব অতিশয় ভ্রূকুটি কুটিল প্রতীয়মান হয়। তাহাদের মুখাবয়ব কদর্য মঙ্গোলীয় ছাঁচের ; মুখ চ্যাপটা ও চওড়া, নাসারন্ধ্র বিস্তৃত ও গোল এবং চক্ষু ছোটো ও টেরা। পুরুষদের চেয়ে স্ত্রীলোকেরা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকায় ও সুশ্রী।

মিশমিদিগের যত শাখা আছে, তন্মধ্যে চুলকাটারাই সর্বাপেক্ষা শিল্পনিপুণ। তাহারা কাপাস ও পশমের কাপড় বুনিতে পারে ; তদ্ভিন্ন পার্বত্য নানাবিধ তন্তুমান উদ্ভিদ হইতেও কাপড় বুনে। বিছুটিজাতীয় একপ্রকার গাছ হইতে তাহারা এমন শক্ত কাপড় তৈয়ার করে যে, তাহার জামা তাহাদের এবং আরবর্দিগের মধ্যে বর্মরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহারা প্রধানত নানাপ্রকারের কাপড় আসামে বিক্রয় করিতে আসে। ইহাদের ক্রয়বিক্রয় প্রথা বড়ো অদ্ভুত। ইহারা প্রধানত লবণের বিনিময়ে বস্ত্রাদি বিক্রয় করে। কোনো প্রকার প্রচলিত ওজন অনুসারে ইহারা লবণ লয় না। লবণ-বিক্রেতার দোকানের সম্মুখে বসিয়া তাহারা সতর্কতার সহিত নিজ সুরক্ষিত ঝুড়ি হইতে বিক্রেয় একটি জিনিস লয়। জিনিসটি পায়ের আঙুলের নীচে বা হাঁটুদ্বয়ের মধ্যে দাবিয়া রাখিয়া, তাহারা দুটা ময়লা হাত সাদা চকচকে নুনের ঝুড়িতে ডুবাইয়া, যতটা দুহাতে উঠে, আপনাদের ঝুড়িতে লইয়া যাইতে চেষ্টা করে। কিন্তু ইত্যবসরে লবণ-বিক্রেতা হাতের এক ঘা মারিয়া অর্ধেক লবণ তাহাদের হাত হইতে কাড়িয়া লয়। তাহার পর উভয়পক্ষে ঘোরতর বচসা আরম্ভ হয়। সাধারণত লবণ-বিক্রেতা আরও কিছু লবণ দিলেই বিবাদ মিটিয়া যায়। বস্ত্র ব্যতীত চুলকাটারা বাজারে মোম, আদা ও লংকা প্রচুর পরিমাণে লইয়া আসে।

শিরস্ত্রাণ ব্যতীত অপরাপর বিষয়ে ইহাদের পরিচ্ছদ অন্যান্য মিশমিদিগের মতো। কিন্তু

ইহাদের স্ত্রীলোকেরা অন্যান্য মিশমিদিগের অপেক্ষা বৃহদায়তন কাঁচুলি বা আঙ্গিয়া পরে। অধিকন্তু তাহাদের আঙ্গিয়াগুলি নানাবিধ সুন্দর সূচীকার্যে বিভূষিত। ঋজু তিব্বতীয় তরবারি, ধনুর্বাণ এবং ছোরা ইহাদের প্রিয় অস্ত্র। মিশমিদিগের মধ্যে কেবল ইহারাই বিষাক্ত তির ব্যবহার করে। তাহারা মহিষ-চর্ম নির্মিত চারিকোণা ঢাল ব্যবহার করে। যোদ্ধারা অস্ত্রবিনিময় দ্বারা শপথ পূর্বক বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হয়। যদি যুদ্ধে একজনের পতন হয়, তবে অপর ব্যক্তি আপনাকে প্রতিশোধ লইতে এবং মৃত বন্ধুর মস্তকটির পুনরুদ্ধার করিতে বাধ্য মনে করে।

চুলকাটারা গ্রাম হইতে দূরে অরণ্যে মৃত ব্যক্তিগণের দেহ প্রোথিত করে। জঙ্গলের মধ্যে এক স্থানের বৃক্ষাদি কাটিয়া পরিষ্কার করা হয়। সেইখানে গর্ত খুঁড়িয়া তাহাতে মৃত ব্যক্তির দেহ, অস্ত্রশস্ত্র ও পরিচ্ছদ রাখিয়া মাটি দিয়া গর্তটি ভরাট করা হয়। তাহার পর সকলে কবরের উপর নৃত্য করে।

ডালটন বলেন যে, তিনি চুলকাটাদের মতো সম্পূর্ণ ধর্মভাববিবর্জিত আর কোনো জাতি দেখেন নাই। তাহারা তাহার সঙ্গে কথাবার্তায় পরলোক বা আত্মার অমরত্বে বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস প্রকাশ করে নাই। তাহারা বলে যে, যে সকল ভূতের অনুগ্রহ লাভের তাহারা চেষ্টা করে, তাহারাও তাহাদেরই মতো মরণশীল। তাহারা যদিও বলে যে একজন সৃষ্টিকর্তা নিশ্চয়ই ছিলেন, কিন্তু ইহা কিছুতেই মানিতে চায় না যে তিনি এখনও বাঁচিয়া আছেন। তাহাদের বিশ্বাস, মানুষ মরে ও পোকায় তাহাকে খাইয়া ফেলে। ডালটন সাহেব বলেন, "যখন আমি তাহাদিগকে বলিলাম, তোমরা যে কবরের মধ্যে খাদ্যদ্রব্য ও অস্ত্রশস্ত্রাদি দাও, সে প্রথাটা বোধহয় এই ধারণা হইতে উৎপন্ন যে প্রেতাত্মারা এই সকল জিনিস আবার পাইবে ; তখন তাহারা তদুত্তরে বলিল, আদৌ না ; আমরা কেবল আমাদের মৃতজ্ঞাতির প্রতি প্রীতির চিহ্নস্বরূপ এই সকল জিনিস কবরে রাখিয়া দি। মৃত ব্যক্তি যে জিনিস ব্যবহার করিয়াছে, তাহা ব্যবহার করিতে আমাদের ইচ্ছা হয় না ; আমরা তাহার মৃত্যু দ্বারা লাভবান হইতে চাই না।"

ডালটন সাহেব চুলকাটাদের ভাষা কীরূপ বুঝিতেন, তিনি কতকাল তাহাদের মধ্যে যাপন করিয়াছিলেন এবং কত ভিন্নশ্রেণিস্থ লোকের সহিত তাঁহার কথাবার্তা হইয়াছিল, তাহা না জানিলে, তাঁহার কথা কতদূর প্রামাণিক তাহা বলা যায় না।

প্রদীপ ● বৈশাখ ১৩০৫ (১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দ)



ত্রিপুরা-রাজ্যের কতিপয় জাতি

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

মণিপুরি

পার্বত্য ত্রিপুরায় ১৬,৩৮১ জন মণিপুরি বাস করে। ইহাদের মধ্যে ৮,৭১৭ জন পুরুষ এবং ৭,৬৬৪ জন স্ত্রী। মণিপুরিগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি শ্রেণিতে বিভক্ত। ব্রাহ্মণদিগের সাধারণ পদবি ভট্টাচার্য, বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। বিদ্যানুসারে ইহাদিগের মধ্যে 'বিদ্যালংকার' 'সার্বভৌম' প্রভৃতি উপাধিও আছে। ক্ষত্রিয়গণ সিংহ উপাধি ধারণ করিয়া থাকে। শূদ্রের পদবি দে, দত্ত, কর, দাস ইত্যাদি এবং বৈশ্যের পদবি দাসগুপ্ত। ব্রাহ্মণ ব্যতীত সকল শ্রেণির মধ্যে বিধবা-বিবাহ এবং পরিত্যক্ত স্ত্রীর পুনর্বার বিবাহ প্রচলিত আছে। ইহারা হিন্দু শাস্ত্রানুসারে পঞ্জিকা দেখিয়া দিনস্থির করিয়া বিবাহ দিয়া থাকে। বিবাহের পূর্বে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধাদি করে। সাধারণত দিবাভাগেই বিবাহ-কার্য অনুষ্ঠিত হয়, তবে কখনো কখনো রাত্রিকালেও বিবাহ হইয়া থাকে। ইহাদের বিবাহে পণপ্রথা আদৌ নাই। বিবাহকালে সাম বা যজুর্বেদীয় মন্ত্র পঠিত হয়। মণিপুরিদিগের বিবাহ দ্বিবিধ—ব্রাহ্ম ও গান্ধর্ব। ব্রাহ্মবিবাহে মাতা-পিতা কন্যা নির্বাচন করিয়া থাকে। প্রায়শ পাত্র, কন্যার বাড়িতে গিয়াই বিবাহ করিয়া থাকে। তবে অর্থবান ব্যক্তিদের মধ্যে যাহারা কন্যার বাড়িতে গিয়া বিবাহ দেওয়া অসুবিধা মনে করে তাহারা কন্যাকে নিজগৃহে 'তুলিয়া' আনিয়া বিবাহ করে। কন্যাপক্ষীয়দিগের অবস্থা ভালো না হইলে বরপক্ষীয়দিগের গৃহে বিবাহের ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

কন্যা অন্তত পঞ্চদশবর্ষে পদার্পণ না করিলে ইহারা তাহাকে বিবাহযোগ্য মনে করে না। ৮/৯ বৎসর বয়সে কখনো-কখনো কন্যার বিবাহ হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা প্রশস্ত নয়।

মণিপুরিদের মধ্যে কেহ মরিলে মৃতদেহ প্রথমে ধৌত করিয়া দাহার্থ লইয়া যাইবার পূর্বে গৃহে দুইটি পিণ্ড দিয়া থাকে। একটি পিণ্ড উঠানে দেওয়া হয়, বহির্দ্বারে আর একটি পিণ্ডদানের ব্যবস্থা করা হয়।

দাহকালে ইহারা আর একটি পিণ্ড দিয়া থাকে তাহার নাম শ্মশানপিণ্ড। মণিপুরিগণ তিথি নক্ষত্র বিশেষভাবে মানিয়া চলে। অন্যান্য চাতুর্বর্ণ্য আচারসম্পন্ন জাতির ন্যায় ইহাদেরও মৃতাশৌচ ও জননাশৌচ আছে। সন্তান জন্মিলে ইহারা ছয় দিবসে ষষ্ঠী পূজা করিয়া থাকে। সাধারণত মণিপুরিরা অধিক পরিমাণে পান খাইয়া থাকে। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা গৃহের বাহিরে যায় না বটে, কিন্তু গৃহাভ্যন্তরে থাকিয়া সকলের সহিত অবাধে বাক্যালাপাদি করিয়া থাকে। ইহারা পর্দার পক্ষপাতী নয়। ইহাদের মধ্যে কোনো ব্রতাদির অনুষ্ঠান নাই। দেবতার মধ্যে মণিপুরিরা শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু, সত্যনারায়ণ ও শনির পূজা করিয়া থাকে। ইহারা বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী। নবদ্বীপ, শ্রীক্ষেত্র ও বৃন্দাবন ইহাদিগের ঈপ্সিত তীর্থ। ইহারা ঝুলন, দোল, রাস ও রথের উৎসব করিয়া থাকে। নবদ্বীপের গোস্বামিগণের নিকট ক্ষত্রিয় মণিপুরিরা দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিয়া থাকে। মণিপুরিরা তাস, ছতরং (দাবা), ছাগলকঞ্জি (পোলো) খোকঞ্জি (হকি), গিলা (হাডুডুর ন্যায় একপ্রকার খেলা) হাবি লিকন বা ছানেড়া (কড়ি) খেলিয়া থাকে। মণিপুরি স্ত্রীলোকগণ সূক্ষ্ম শিল্পনৈপুণ্যে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়া থাকে। ইহারা সূচের কাজ, জালবোনা, বস্ত্রবয়ন ও রেশমি কাজে বিশেষ পটু।

প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের সময় হইতে মণিপুরিগণ ত্রিপুরারাজ্যে ঔপনিবেশিক রূপে বাস করিতে আরম্ভ করে। ত্রিপুরা রাজবংশে কন্যাদান করিয়া ইহাদের কেহ কেহ ধনশালী ও সম্মানভাজন হইয়াছে। 'মেখ্‌লি' মণিপুরিদের নামান্তর। রাজবংশীয় ও সাধারণ মেখ্‌লি এই দুই প্রকার মণিপুরি ত্রিপুরারাজ্যে বাস করে। মণিপুরি ভাষায় মণিপুরির নাম 'মেয়তেয় পাঙান'।

(১) আসল বা খাই, (২) বিষ্ণুপুরি বা কালেসা এই নামে দুইটি বিভাগ মণিপুরিদিগের মধ্যে আছে তন্মধে প্রথম শ্রেণি অপেক্ষাকৃত সম্মানিত।

মণিপুরি স্ত্রীপুরুষ, বিশেষত স্ত্রীলোকগণ সর্বদাই পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন থাকে। সাধারণত মণিপুরি গ্রামে সেই গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী ২/৪ গ্রামের লোকের ধর্মোপাসনার নিমিত্ত একটি সাধারণ উপাসনামন্দির থাকে। সেইস্থানে নির্দিষ্ট দিনে সকলে সমবেত হইয়া উপাসনাদি করিয়া থাকে।

মণিপুরিদের মধ্যে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত লোকও কিয়ৎসংখ্যক আছে।

চাকমা

ত্রিপুরারাজ্যে চাকমাদিগের সংখ্যা ৪,৩১০। তাহারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। অধুনা ত্রিপুরারাজ্যের সোনামুড়া, বিলনিয়া ও উদয়পুর বিভাগে চাকমাগণ বাস করিতেছে। তাহাদিগের ভূতপূর্ব বাসস্থান পার্বত্য চট্টগ্রাম। লুসাই অভিযানের সময় ইহাদিগের আদিম বাসস্থানে কুলিধরার ভয় হয়, এই ভয়ে প্রায় দশ সহস্র চাকমা পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে ত্রিপুরারাজ্যে আগমন

এবং সেখানেই বাস করে। পরে ইহাদিগের মধ্যে অনেকে আবার স্বদেশে প্রতিগমন করিয়াছিল। অন্যূন ৬০ বৎসর হইবে ইহারা প্রথম বিলনিয়া অঞ্চলে আপনাদিগের বাসস্থান স্থির করে, পরে ক্রমশ অন্যান্য স্থানেও বাস কব্দিয়্বয়্বরতেছে।

সম্প্রদায় বিভাগ : এখানকার চাকমাগণ প্রধানত নিম্নলিখিত আট শ্রেণিতে বিভক্ত।

১. মলিমা ২. তন্যা ৩. বরুয়া ৪. ডিয়াছাং ৫. বুমা ৬. কোড়া ৭. বুর্দ্ধা ৮. কদুয়া ইত্যাদি। প্রথমোক্ত সম্প্রদায়ের লোকই ত্রিপুরারাজ্যে অধিক।

ইহাদিগের মধ্যে সম্প্রদায়-ভেদে সম্মানের কোনো তারতম্য হয় না। সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই পরস্পর ভোজন এবং বিবাহাদি প্রচলিত আছে। ইহাদিগের মধ্যে 'দেওয়ান' উপাধিধারী ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা সম্মানের পাত্র, 'খিজা' 'তালুকদার' ও 'কারবারি' উপাধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণও সম্মানের পাত্র, কিন্তু দেওয়ানের নিম্নে ইহাদিগের স্থান। চাকমা-রাজের প্রবর্তিত এই উপাধিগুলির সম্মান রাজ্যান্তরে আসিয়াও ইহারা পূর্বের ন্যায় বজায় রাখিয়াছে এবং এখনও ইহারা যোগ্যতানুসারে এই সকল উপাধি গ্রহণ করিতেছে।

চাকমাগণ নিরতিশয় ধূমপান করে। স্ত্রীপুরুষ সকলেই ধূমপানে অত্যন্ত আসক্ত। ইহারা চুরুটের পাইপের মত অতি ক্ষুদ্র হুক্কা ও বাঁশের হুক্কা ব্যবহার করে। মদ্যপানাদি ইহাদিগের সমাজে অপরাপর পর্বতীয় জাতির তুলনায় অতি কম। স্ত্রীলোক মদ্যপান করে না। ইহারা যে-কোনো প্রাণীরই মাংস ভোজন করে, এমনকি ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর মাংসও ইহারা বাদ দেয় না ; 'ব্যাঙাচি' 'কাঠের পোকা' 'বোলতার চাক' প্রভৃতি ইহাদিগের উৎকৃষ্ট খাদ্য মধ্যে পরিগণিত। সর্প, শুঁটকি (শুষ্ক) মাছ, মাংসও ইহাদের উপাদেয় আহার্য।

চাকমাদিগের সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ়। ইহারা অধিকাংশ সময়ে অপরাধীর বিচার ও সামাজিক গোলযোগের মীমাংসার ভার দলপতির হস্তে অর্পণ করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকে। দলপতিও যথামতি তাহার সুমীমাংসা করে। চাকমাগণ খুব কমই আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করে।

ধর্ম : ইহারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বলিয়া আপনাদিগকে পরিচিত করে, কিন্তু বৌদ্ধধর্মোচিত আচার ইহাদিগের মধ্যে একেবারেই পরিলক্ষিত হয় না বলিলেই হয়। অপরাপর পবর্তীয় জাতির ন্যায় ইহারাও নানাবিধ দেবদেবীর অর্চনা এবং বহুবিধ পশুপক্ষী 'বলিদান' করিয়া থাকে। ত্রিপুরারাজ্যের চাকমা সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো বৌদ্ধভিক্ষু বা 'বাওয়ালি' নাই। চট্টগ্রামের 'বাওয়ালি' আসিয়া কখনো-কখনো ইহাদিগকে বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন।

বিবাহ : চাকমাদিগের মধ্যে বিবাহে কন্যাপণ গ্রহণের প্রথা প্রচলিত আছে। বর কন্যার অভিভাবকগণ বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করে। ইহাদিগের মধ্যে বাল্যবিবাহের প্রথা নাই। সাধারণত কন্যার ১৫—২০ এবং বরের ১৮—২২ বৎসরের মধ্যে বিবাহকার্য সম্পন্ন হয়। বরপক্ষ হইতে কন্যার পিতা বা অভিভাবককে ৬০ টাকা হইতে ১০০ টাকা পর্যন্ত পণ দিতে হয়। সাধারণত বর কন্যার বয়সের মাত্র ২/৩ বৎসর পার্থক্য থাকে। যুবতি কখনও বৃদ্ধ বা প্রৌঢ়ের সঙ্গে পরিণীত হয় না।

চাকমাগণ সবল ও সুস্থকায়। কুষ্ঠ প্রভৃতি চর্মরোগ ব্যতীত অন্যরোগের প্রাদুর্ভাব ইহাদিগের মধ্যে নাই। সম্ভবত পচা মাংস মাছ ইত্যাদি ভক্ষণের জন্যই এইরূপ মহারোগের প্রাদুর্ভাব ইহাদিগের মধ্যে প্রবল। ইহারা মহারোগগ্রস্তকে ঘৃণা করে এবং তাহার জন্য পৃথক বাসগৃহ নির্মাণ করিয়া পরিবারস্থ যাবতীয় লোক তাহার সহিত সর্বপ্রকার সংশ্রব পরিত্যাগ করে। মহারোগীগণ কেবল দৈনিক আহার প্রাপ্ত হয়।

চাকমা স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদে একটু বৈশিষ্ট্য আছে। ইহারা 'পাছরা' পরিধান করে অঙ্গে জামা, তদুপরি 'বক্ষোবন্ধনী' এবং মস্তকে উষ্ণীষের মত একখণ্ড কাপড় ধারণ করিয়া থাকে। পুরুষগণ সাধারণত বিলাতি বস্ত্রই পরিধান করে। চাকমা স্ত্রীগণ মুক্তার মালার ন্যায় স্ফটিকের মালা গলদেশে ধারণ করে। ইহারা সর্বদা পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন থাকে এবং ফুলের বিশেষ আদর করে। চাকমাগণ জুমে শস্য উৎপাদন করে, অতি অল্পসংখ্যক লোক হল কর্ষণ দ্বারা শস্য উৎপাদন করে। ইহাদিগের জুমে যথেষ্ট শস্য উৎপন্ন হয়। ইহারা 'লং' 'কুন্দা' 'পালা' ইত্যাদি করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। সঞ্চয়পরায়ণতার অভাব ইহাদিগের মধ্যে বিশেষ পরিলক্ষিত হয়। চাকমা পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক অধিক পরিশ্রমী। অধিকাংশ কার্যের ভার স্ত্রীলোকদিগের প্রতি ন্যস্ত করিয়া পুরুষগণ নিশ্চিন্ত থাকে। চাকমাদিগের দাম্পত্য বন্ধন ও প্রেম অতি দৃঢ় ও মধুর। সাধারণ পর্বতীয় জাতির ন্যায় বীজ সংগ্রহ, শস্যবপন ইত্যাদি কার্য অনেক সময় চাকমা দম্পতি একত্রেও করিয়া থাকে।

মৃত-সৎকার ইত্যাদি : চাকমাদিগের মধ্যে মৃতদেহ মৃত্যুর পরে প্রথমেই পোড়ানো হয় না। দূরস্থ জ্ঞাতি কুটুম্বগণের সম্মিলন-প্রত্যাশায় চাকমারা ৫/৭ দিন পর্যন্ত সযত্নে ইহা রক্ষা করিয়া থাকে। এইরূপে শবরক্ষা করিবার জন্য ইহারা কাষ্ঠ দ্বারা একটি শবাধার প্রস্তুত করে, এই শবাধার দেখিতে অনেকাংশে 'কুন্দা' নৌকার ন্যায়। এই শবাধারে শবরক্ষা করিয়া তদুপরি তাহারা একখণ্ড তক্তা স্থাপন করে। ইহাতে শব হইতে ৩/৪ দিনের মধ্যে পূতিগন্ধ নির্গত হয় না। মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া দাহকার্যের সুবিধা করিয়া লয়।

কলেরা ও বসন্তরোগে কাহারও মৃত্যু হইলে চাকমাগণ তাহার সৎকার করে না। নদীস্রোতে ভাসাইয়া দেওয়া বা ভূগর্ভে প্রোথিত করা ইহার ব্যবস্থা।

কোনো ধনবান বৃদ্ধ চাকমার মৃত্যু হইলে একটি রথে করিয়া মহাসমারোহে শবদেহে শ্মশানে নীত হয়। রথের উপরে শবাধারে রক্ষিত শবদেহ স্থাপন করা হয়, মৃতব্যক্তির সম্মানার্থ তাহার আত্মীয়কুটুম্বগণ রথে যথাশক্তি অর্থ প্রদান করিয়া থাকে। ওই অর্থ, দাহকার্য শেষ হইলে বাওয়ালি, বাদ্যকর, রথ ও শবাধার নির্মাণকারীদিগের মধ্যে বিভক্ত হয়। মৃতের উত্তরাধিকারীর এই অর্থে কোনো অধিকার থাকে না।

অপরাপর পর্বতীয় জাতি হইতে পূজা প্রভৃতি বিষয়ে চাকমাদিগের একটু বিশেষত্ব আছে ; অন্য পর্বতীয়গণ রোগমুক্ত হইলে অথবা অভিলষিত সিদ্ধি লাভ করিলে, পরে পূজা করিব এইরূপ মানত করে না, কিন্তু চাকমাদিগের মধ্যে এইরূপ কামনা (মানত) করিয়া পূজা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে।

শিক্ষা ও বর্ণমালা ইত্যাদি : চাকমাগণের কথ্য ভাষা বাঙ্গালা, কিন্তু ইহাদিগের পৃথক বর্ণমালা আছে। ইহাদিগের লেখার কার্য চাকমা অক্ষরেই সম্পাদিত হইয়া থাকে। কোনো

কোনো চাকমা বাঙ্গালা লেখাপড়াও জানে ; চাকমাদিগের প্রত্যেক বৃহৎ পল্লিতে রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি পুস্তক আছে ; ওই সকল পুস্তক সুর-সহযোগে পঠিত হয় এবং পাঠকালে যথেষ্ট শ্রোতা পাঠকের চতুর্দিকে সমবেত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে অনেক শিক্ষিত চাকমা আছে।

জুলাই

ইহারা প্রায় পঞ্চাশ শ্রেণিতে বিভক্ত। ইহাদের কোনো কোনো শ্রেণির ভাষার সহিত কুকি ও মণিপুরি ভাষার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। হালাম, রিয়াং, নওয়াতিয়া, জুলাই জাতির সাধারণ নাম ত্রিপুরা শব্দের অপভ্রংশ তিপারা বা তিপ্‌রা এবং ইহাদিগের ভাষা সমুদয়ের নাম তিপ্‌রা ভাষা।

জুমকৃষি এবং জঙ্গাল আবাদই ইহাদিগের প্রধান কার্য। বুড়াছা, লাম্প্রা প্রভৃতি ইহাদিগের উপাস্য দেবতা। ইহাদিগের মধ্যে কোনো কোনো শ্রেণির লোকেরা উপস্থিত ও ভাবী বিপদশান্তির উদ্দেশ্যে নিজ নিজ উপাস্য দেবতার নিকট কুক্কুট, ছাগী ইত্যাদি বলি দিয়া থাকে। ইহারা ছাগী, কুক্কুট, গোসাপ ইত্যাদির মাংস ভক্ষণ করে। ইহাদিগের অধিকাংশ আচার-ব্যবহারই হিন্দুধর্মের অনুরূপ নয়।

একসময়ে রাজদ্রোহ অপরাধে কতিপয় ত্রৈপুর প্রজার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। তদানীন্তন ত্রিপুর-রাজমহিষী দয়াপরবশ হইয়া ত্রিপুরপতির নিকট তাহাদিগের প্রাণ ভিক্ষা চাহেন। মহিষী সন্তানহীনা ছিলেন, রাজা মহিষীর প্রার্থনা পূরণ করিলে তিনি কারামুক্ত ব্যক্তিদিগকে এক বাটি দুগ্ধ পান করিতে দিয়াছিলেন। বাটিটি রৌপ্যনির্মিত ছিল। দুগ্ধ দান করিবার পূর্বে মহিষী তাহাতে আপন স্তন স্পর্শ করাইয়াছিলেন। ওই দুগ্ধ পান করিলে তিনি বিদ্রোহীদিগকে বলিলেন, অদ্য হইতে তোমরা আমার পুত্রস্থানীয় হইলে। তিনি তাহাদিগকে কয়েকগাছি চুল চিহ্নস্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন, তদবধি তাহারা রানির জুলাই নামে পরিচিত হয়।

রিয়াং

ত্রিপুরারাজ্যে রিয়াং অধিবাসীর সংখ্যা ১৫,১১৫ ; তন্মধ্যে পুরুষ ৭,৭৪৩ ও স্ত্রী ৭,৩৭২ জন। তিপ্‌রাদিগের মধ্যে ইহারাই সর্বাপেক্ষা উগ্রস্বভাব। রিয়াংগণ ত্রিপুরারাজ্যের সোনামুড়া ও বিলনিয় বিভাগে বাস করে। ইহারা চতুর্দশ দফায় বিভক্ত ; নিম্নে উপাধিসহ দফাগুলির নাম লিখিত হইল।

দফা বা শ্রেণি	*উপাধি*
১। তুই মুইয়াফাক	১। রায়
	২। কারমা (১ম)
২। মরছুই	৩। চাপিয়া খাঁ
	৪। য্যাক্‌ছুং (১ম)
৩। মেচ্‌কা	৫। চাপিয়া
	৬। য্যাক্‌ছুং (২য)

৪। আপেত	৭। কাচকাউ (১ম) ৮। দরকালিম
৫। চরকি	৯। কাচকাউ (২য়) ১০। দৈয়াহাজরা
৬। মাসা	১১। হাজরা (১ম) ১২। কান্দা
৭। রাইচাক	১৩। দলৈ ১৪। খাসকালেম (১ম)
৮। তখ্‌মা য্যাক্‌চ	১৫। মুড়িয়া ১৬। খাসকালেম
৯। ওয়ারিং	১৭। দাওরা ১৮। কাংরেং
১০। নকখ্যাম	১৯। কারমা (২য়) ২০। দুকরিয়া
১১। চম্প্রেং	২১। ছেয়াং ক্রাক ২২। খাণ্ডল
১২। দরবং	২৩। ভাণ্ডারী ২৪। হাজরা (২য়)
১৩। সগরায়	২৫। কান্দা হাজরা ২৬। কারমা (৩য়)
১৪। রিয়াং	২৭। কাচকাউ (৩য়)

রিয়াংগণ প্রধানত মেস্কা বা মেচ্‌কা এবং মছলই সম্প্রদায়ে বিভক্ত, উল্লিখিত উপবিভাগগুলি এই দুই সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত। উক্ত চতুর্দশ দফার মধ্যে যোগ্যতা অনুসারে নিম্নলিখিত উপাধিভূষিত লোকগুলি প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। রায় ও কাচ্‌ক ইহাদিগের মধ্যে প্রধানতম ব্যক্তি। রায় উপাধিধারী ব্যক্তি এক শ্রেণির ও কাচ্‌ক উপাধিবিশিষ্ট ব্যক্তি অপর শ্রেণির নেতা।

রায় ও তাহার অধীন সর্দারগণ

১। রায়—রাজা, রিয়াংদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি রায় উপাধিবিশিষ্ট।

২। চাপিয়া খাঁ—ভাবী রায়।

৩। চাপিয়া—ভাবী চাপিয়া।

৪। দরকালিম—রায়ের পুরোহিত।

৫। দলই—রায়ের পেস্কার।

৬। ভাণ্ডারী—রায়ের দ্রব্যসমূহের রক্ষক।

৭। কান্দা—রায়ের সেবক ও ছত্র-দণ্ডধারী।

৮। দয়াহাজারী—ঢোলবাদক।

৯। মুরিয়া—সানাইবাদক।

১০। দুগ্‌রিয়া—কাড়াবাদক।

১১। দাওয়া—পূজার টলুয়া।

১২। ছিয়াক্রাক—পূজার বলির মাংসাদি বিতরণ এবং চাপিয়া খাঁর ছত্র বহন করে।

কাচ্‌ক ও তাহার অধীন সর্দারগণ

১। কাচ্‌ক—উজির।

২। ইয়াক্‌ছুং—নাজির।

৩। হাজ্‌রা—কাচ্‌কের সেবক।

৪। কাংরেং—কাচ্‌কের ছত্রধারী।

৫। কার্‌মা—ইয়াক্‌ছুং-এর সেবক।

৬। খান্‌কালিম—ইয়াক্‌ছুং-এর ছত্রধারী।

৭। খাদ্দল—আহার্য-সংগ্রাহক।

ইহাদিগের সাধারণ নাম কতর-দফা। কতর = প্রধান।

কতর-দফার লোকগুলিকে ঘরচুক্তি খাজনা দিতে হয় না।

রিয়াংগণ অবস্থাদিতে ত্রিপুরজাতির অন্যান্য শ্রেণি হইতে নিকৃষ্ট। ইহারা অতিশয় মদ্যপায়ী। ইহরা জুম কৃষিদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। কদাচিৎ কেহ ব্যবসায়াদিও করিয়া থাকে। সাধারণত বিবাহাদি বিষয়ে ইহারা ইহাদিগের মূল জাতি ত্রিপুরার নিয়মের বশবর্তী।

ইহাদিগের নেতৃবশ্যতা অতুলনীয়। জুমকাটা ও শস্যসংগ্রহের পূর্বে ইহারা সমারোহের সহিত জাতীয় দেবতার পূজা করে। খাইন বা চাঁদা করিয়া এই পূজার টাকা সংগৃহীত হয়। পূজার শেষ সময় শুধু আমোদে পর্যবসিত হয় না। তৎকালে রিয়াং সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তিদিগের একটা বৈঠক বসে, তাহাতে তাহাদের সামাজিক অবস্থাদির বিচারের মীমাংসা হইয়া থাকে। খাইনের টাকা অতিরিক্ত হইলে তাহা জাতীয় ভাণ্ডারে রক্ষিত হয়। এই টাকা হইতে কতর-দফার লোক কিছু কিছু পাইয়া থাকে। অবশিষ্ট সর্বজনীন মঙ্গল কার্যে ব্যয়িত হয়।

মগ

ত্রিপুরারাজ্যে মগের সংখ্যা ১,৪৯১। তন্মধ্যে পুরুষ ৭৭১ এবং স্ত্রী ৭৯০ জন। মগগণ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। আচার-ব্যবহারাদিতে ইহারা চাকমাগণের অনুরূপ। ইহারা ত্রিপুরারাজ্যের আধুনিক প্রজা।

জমাতিয়া

পার্বত্য ত্রিপুরারাজ্যের জমাতিয়া জাতীয় অধিবাসীর সংখ্যা ৪,৯১০, তন্মধ্যে পুরুষ ২,৬৬০ এবং স্ত্রী ২,২৫০ জন। ত্রিপুরজাতির বিভক্ত শ্রেণিগুলির মধ্যে জমাতিয়া উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। এই সকল বিষয়ে 'পুরাণ ত্রিপুরা'র নিম্নেই জমাতিয়াগণের স্থান। পরন্তু কোনো কোনো বিষয়ে শ্রেষ্ঠতায় ইহারা 'পুরাণ ত্রিপুরা'-দিগকেও অতিক্রম করিয়াছে। ইহারা উপবীত গ্রহণ করিয়া থাকে।

পূর্বে ইহারা ত্রিপুরা রাজ্যের প্রধান সৈনিকের কার্য করিত, তৎকালে জমাতিয়াগণ বড়োই উগ্রস্বভাব ছিল। ইহারা মূলত বিভিন্ন জাতীয় হইয়াও ক্রমশ ত্রিপুরজাতির অন্তর্নিবিষ্টতা লাভ করিয়াছে। এই জাতীয় ব্যক্তিগণ কর্তৃক ত্রিপুরেশ্বরের যে সৈন্যদল গঠিত হইত তাহা জমাৎ নামে পরিচিত ছিল, এই জমাৎ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত জনসাধারণ জমাতিয়া নামে অভিহিত হইত, তদনুসারে তাহাদিগের বংশধরগণও জমাতিয়া বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। সুতরাং 'জমাতিয়া' কতকগুলি জাতির সংমিশ্রণে জাত হইয়াও একটি অভিনব জাতি বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। জমাতিয়াদিগের মধ্যে পুরাণ ত্রিপুরা, নওয়াতিয়া, রিয়াং, কলই প্রভৃতি নানাজাতীয় লোকই প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ১৩৮০ খ্রিস্টাব্দে জমাতিয়াগণ ত্রিপুরেশ্বরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিল। দুই-শতাধিক জমাতিয়ার মুণ্ডপাত করিয়া ত্রিপুরাধিপতি বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন। তদবধি ইহারা শান্তস্বভাব হইয়াছে। বর্তমান কালে জমাতিয়াগণ নিরতিশয় শান্তিপ্রিয়। বিবাদ-বিসংবাদাদি ইহাদিগের মধ্যে প্রায়ই উপস্থিত হয় না, কদাচিৎ উপস্থিত হইলেও রাজকীয় ধর্মাধিকরণের সাহায্য ব্যতীত ইহারা তাহাদিগের বিবাদের মীমাংসা করিয়া থাকে।

পর্বতবাসী অন্যান্য জাতি হইতে জমাতিয়াগণের আর্থিক অবস্থা ভালো। বর্তমান সময়ে জমাতিয়াগণ জুমকৃষি পরিত্যাগ করিয়া গোরুর সাহায্যে হলকর্ষণ দ্বারা তাহাদিগের প্রয়োজনীয় শস্য উৎপাদন করিয়া থাকে।

জমাতিয়াগণ তাহাদিগের সর্ববিষয়ে সুশৃঙ্খলা সাধনের নিমিত্ত নির্দিষ্ট কালের জন্য স্বজাতির মধ্য হইতে উপযুক্ত দুই ব্যক্তিকে সর্দার বা দলপতি নির্বাচন করিয়া থাকে এবং কী সামাজিক কী অন্যান্য বৈষয়িক সকল বিষয়েই এই দুই দলপতি বা সর্দারের আজ্ঞানুবর্তী হইয়া থাকে। এই দুই পরিচালকদ্বয় চলিত ভাষায় 'মুল্লুকের সর্দার' নামে পরিচিত। নিরূপিত সময়ের অবসানে বা অপর কোনো অনিবার্য কারণে পূর্বের দলপতির পরিবর্তন হইয়া অপরকে তৎপদে অধিরোপিত করা হয়। এই সমাজপতিদ্বয় তাহাদিগের বিবাহাদির মীমাংসা ও অপরাধীর দণ্ড বিধানাদি করিয়া থাকে।

নৃত্যগীতাদি : জমাতিয়া সম্প্রদায় স্বভাবত সংগীতানুরাগী। ইহাদের স্বর-মাধুর্যও যথেষ্ট। অধিকাংশ পল্লিতেই হরি-সংকীর্তনের একটি করিয়া দল আছে। ইহাদের সংকীর্তন প্রশংসনীয়। সম্প্রতি তাহারা দুইটি যাত্রাদলের সৃষ্টি করিয়াছে। জমাতিয়া দলপতি সংস্কৃত পদাবলি গান করিতেও সমর্থ।

ধর্ম প্রভৃতি : ত্রিপুরা জেলার নুরনগর পরগনার অন্তঃপাতী মেহারি গ্রামে প্রসিদ্ধ গোস্বামী

বংশীয়গণ কিয়ৎকাল পূর্বে ইহাদিগকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছেন। ইহারা বৈষ্ণব জনোচিত তিলক ও মাল্যাদি ধারণ করিয়া থাকে। তীর্থ দর্শনাদিতেও ইহাদিগের উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়।

বৈষ্ণবধর্ম অবলম্বন করিলেও ইহারা জাতীয় বন্যদেবদেবীর পূজাগুলি পরিত্যাগ করে নাই।

রিয়াংদিগের ন্যায় ইহারা 'খাইন' করিয়া টাকা আদায় করে এবং তদ্দ্বারা জাতীয় দেবদেবীর পূজা নির্বাহ করিয়া থাকে। ইহাদিগের প্রচলিত পূজাগুলির মধ্যে শিবগৌরী পূজা, দুর্গাপূজা, ত্রিপুরাসুন্দরী পূজা ও গোমতী পূজা প্রধান। দুর্গাপূজা সর্বাংশে বাঙ্গালীদিগের প্রবর্তিত পূজার অনুরূপ। এই পূজা বাঙ্গালী পূজক দ্বারা সম্পাদিত হয়।

বিবাহ · জমাতিয়াগণের বিবাহপ্রথা প্রশংসনীয়। কন্যাপণ গ্রহণ ইহাদিগের মধ্যে প্রচলিত নাই। পরন্তু এই প্রথাকে ইহারা অতিশয় ঘৃণা করিয়া থাকে। বিবাহের জন্য নির্বাচিত পাত্র, কন্যার পিত্রালয়ে আগমন পূর্বক বিবাহ করে। বিবাহের সময় কন্যার পিতা সামর্থ্যোচিত যৌতুকাদি সহ কন্যাদান করিয়া থাকে।

দুই বৎসর কাল শ্বশুরগৃহে জামাতার অবস্থান করার প্রথা জমাতিয়া সম্প্রদায়েও প্রচলিত আছে। তবে বর ইচ্ছা করিলে, স্ত্রীকে লইয়া নিজগৃহে গমন করিতে পারে, কিন্তু এরূপ ব্যাপার কদাচিৎ হইয়া থাকে ; কারণ এই রকম ঘটনা হইলে ইহা হইতে উভয় পক্ষের মনোমালিন্য হয়।

নওয়াতিয়া বা নোয়াতিয়া

ত্রিপুরা রাজ্যে নোয়াতিয়া জাতির সংখ্যা ১৪,৪৩৭ তন্মধ্যে পুরুষ ৭,৩৯১ ও স্ত্রী ৭,০৪৬। নোয়াতিয়াগণও জমাতিয়াগণের ন্যায় মিশ্রজাতি। ইহারা বর্তমান সময়ে ত্রিপুর জাতির শাখা-বিশেষরূপে পরিণত হইয়াছে। নোয়াতিয়াগণ প্রধানত নিম্নলিখিত দফায় বিভক্ত।

১। কেওয়া।
২। মুরাসিং।
৩। আছলং।
৪। গর্জন।
৫। খালিচা।
৬। তংবাই।
৭। লাইতং।
৮। দেইলদাক।
৯। আনা ও কিয়াখরু।
১০। তোতারাম।

এই রাজ্যে প্রথমোক্ত ছয় সম্প্রদায়ের লোকই বাস করে।

ইহারা গোমতী নদীর দক্ষিণে ফেনি নদীর উত্তরে বাস করে। কেহ কেহ সম্প্রতি ফেনি নদীর দক্ষিণেও বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহাদের আচার-ব্যবহার অনেকাংশে জমাতিয়াগণের অনুরূপ। সম্প্রতি মুরাসিং প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোক ক্রমশ বৈষ্ণব-ধর্মে দীক্ষিত হইতেছে। জমাতিয়াগণের ন্যায় ইহাদিগের মধ্যেও হলকর্ষণপ্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে। ইহাদিগের বিবাহ-প্রথা রিয়াংগণের ন্যায়।

আসামী

বর্তমান কালে ত্রিপুরা রাজ্যে আসামী অধিবাসীর সংখ্যা ৯৯ জন। তন্মধে পুরুষ ৫৭ জন ও স্ত্রী ৪২ জন। মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য আসামের আহোম বংশীয় এক রাজকন্যা বিবাহ করেন। সেই সূত্র অবলম্বন করিয়া কতকগুলি আসামী এইখানে বাস করিয়া আসিতেছে।

হালাম

হালামগণ কুকি ও তিপ্‌রার মধ্যবর্তী জাতি। (মতান্তরে হালাম এবং কুকিগণ একই জাতির অন্তর্ভুক্ত। প্রথমে যে সকল কুকি ত্রিপুরেশ্বরের বশ্যতা অঙ্গীকার করিয়াছিল তাহারাই হালাম নামে অভিহিত হইয়াছে। হালামেব অপর নাম মিয়োকুকি। হালাম ভিন্ন অন্য কুকিগণ অধুনা কাঁচা কুকি আখ্যায় পরিচিত।) ত্রিপুরা রাজ্যে হালামগণের সংখ্যা (২,২১৫ তন্মধ্যে পুরুষ ১,০৯০ স্ত্রী ১,১১৫) হালামগণ নিম্নলিখিত দফা বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত—

(১) রাংখল—(রাং = রৌপ্যমুদ্রা) ইহারা গলদেশে রৌপ্য মুদ্রা পরিধান করে বলিয়া ইহাদের এইরূপ নাম হইয়াছে।

(২) কাইপেং বা কাইপেন—(কাই = বশ্যতা)। এই দফার লোকগণ সর্বপ্রথমে ত্রিপুরেশ্বরের বশ্যতা স্বীকার করে।

(৩) মরছম বা মুরছুম—(সত্যবাদী)। হালামগণের মধ্যে এই দফার লোক শ্রেষ্ঠ। ইহারা সর্বদা সত্যবাদী বলিয়া খ্যাত।

(৪) রুপনি—(যাতায়াতকারী)। ইহারা সর্বদা রাজবাড়িতে যাতায়াত করিত বলিয়া ইহারা এই আখ্যায় অভিহিত।

(৫) খুলং*

(৬) দাপ বা ভাব*

(৭) কলই বা কলয়—(হরিদ্রা)। কলয়গণ ত্রিপুরেশ্বরের ভোজনাগারের হলুদের বোঝা বহন করিত।

(৮) চড়ই বা চড়াই।*

(৯) মছবাং বা মসবাং।*

(১০) লঙ্গাই বা লাঙ্গাই।*

(১১) বংশের বা বংছের। ইহারা ত্রিপুরেশ্বরের বস্ত্রের বোঝা বহন করিত।

(১২) কর্বং। ইহারা ত্রিপুরেশ্বরের শয্যাবাহী ভৃত্য ছিল।

(১৩) মুতিলাংল।*

(১৪) বং—(ঘাতক)। ইহারা যুদ্ধের সময় সমস্ত সৈন্যের অগ্রে অগ্রে গমন করিত এবং সর্বাগ্রে শত্রুদিগকে আক্রমণ করিত।

(১৫) ছাইমাল—ভীরু বলিয়া ইহাদিগের এই নাম।

(১৬) হাওয়া—যুদ্ধের সময় হাওয়ার ন্যায় গমন করিয়া ইহারা শত্রুদিগের কার্য পর্যবেক্ষণ করিত এবং রাজ্যে সর্বদা গুপ্তচরের কার্য করিত।

(১৭) লুছুই-মুছই—ইহারা ত্রিপুরেশ্বরের ভোজনের জন্য হরিণ শিকার করিত।

(১৮) বেতু—(বেদনা-নিবারক)—যুদ্ধের সময় ইহারা আহতদিগের চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করিত।

ইহাদিগের একশ্রেণির ভাষার সহিত অপর শ্রেণির ভাষার ঐক্য নাই। কোনো কোনো ভাষার সহিত কোনো ভাষার আংশিক সাদৃশ্য আছে।

ইহাদের প্রত্যেকের জাতি-বিষয়ক উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন প্রকার শ্রেণি আছে।

হালামদিগের ত্রয়োদশ শ্রেণির মধ্যে পরস্পর বিবাহ প্রায় হয় না। কদাচিৎ কোনো শ্রেণির সহিত অপর কোনো শ্রেণির বিবাহ হইয়া থাকে।

হালামগণ গোমতী নদীর উত্তর এবং কৈলাশহরের দক্ষিণ এই দুই সীমার মধ্যবর্তী স্থানে বাস করিয়া থাকে। ইহাদিগের অপর নাম 'খিল হালাম'।

এই ত্রয়োদশ খিল ব্যতীত আরও ১০/১২ প্রকারের অতিরিক্ত হালাম আছে। তাহারা 'চড়ই' এই সাধারণ নামে অভিহিত। চড়ইদিগের ভাষাও স্বতন্ত্র। সমুদয় হালাম জাতির প্রত্যেক দফারই আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি প্রায়ই বিভিন্ন। দুই এক শ্রেণির আচার-ব্যবহার অপর দুই এক শ্রেণির অনুরূপ। হালামগণ আপনাদিগকে কুকি বলিয়া পরিচয় দিতে বড়োই ভালবাসে ; কিন্তু প্রত্যুত ইহারা কুকি নয়। ত্রিপুরারাজ্যে হালামদিগের সংখ্যা ৫,৬০১। 'সাখাচেপ' থাঙ্গাচেপ ও লাঙ্গাই আখ্যায় পরিচিত হালামগণ পূর্বকালে লুসাই জাতীয় কিরাতরাজের অধিকারে বাস করিত। লুসাইগণ হালামদিগের উপর নিরন্তর অত্যাচার করিত বলিয়া পরে তাহারা 'বুপোবই তপোইবোং' নামক পর্বতে (এই পাহাড় তৎকালে ত্রিপুরারাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল) উপনিবেশ স্থাপন করে। পূর্বোক্ত পর্বত 'হায়চেফ' বা 'হাতুফ' পর্বতের পূর্বদিকে বহুদূরে অবস্থিত। এই পর্বত হইতেই বেগবতী ধলেশ্বরী নদীর উৎপত্তি। এই সময় লুসাইপতি বুপোবই তপোইবোং পর্বতের উত্তর পূর্বকোণে অবস্থিত 'চাংছেন' পর্বতোপরি বাস করিত। হতভাগ্য হালামগণ তাহাদিগের নূতন বাসস্থানে গিয়াও অত্যাচারের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইল না; সুতরাং বাধ্য হইয়া তাহারা ত্রিপুরারাজের অধিকৃত 'আইনকুওঙ' পর্বতে আপনাদিগের বাসস্থান নির্ণয় করিল;

* তারকা-চিহ্নিত সম্প্রদায়গুলি এবং তদতিরিক্ত খামাচেপ ও ছাকাচেপ এই দুই সম্প্রদায়ের হালামগণ কৈলাশহর এবং ধর্মনগর অঞ্চলে বাস করে। স্ব স্ব বাসস্থানের ও বংশের প্রধান ব্যক্তিগণের নামানুসারে উহাদের ওইরূপ নামকরণ হইয়াছে।

কিন্তু সেখানেও লুসাইগণ তাহাদিগকে উৎপীড়িত করিতে লাগিল। হালামগণ আইনকুওঙ পরিত্যাগ করিয়া হায়চেফ পর্বতে বসতি করিল। তদবধি পূর্বোক্ত তিন শ্রেণির হালামগণ সেই পর্বতে ত্রিপুরারাজ্যান্তর্ভুক্ত অন্যান্য পর্বতে ও অরণ্যে বাস করিতেছে। মহারাজ ডাঙ্গরফার শাসনকালে হালামগণ প্রথম ত্রিপুরারাজ্যে আগমন করিয়াছিল।

মহারাজ বিজয়মাণিক্যের শাসনকালে জয়ন্তীদেশের রাজা ত্রিপুরেশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধের সময়ে বিজয়মাণিক্য সাখাচেপ ও থাঙ্গাচেপ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের হালামদিগকে আপন সৈন্যদলভুক্ত করিয়াছিলেন। অসভ্য হালামগণ যাতে রাজদ্রোহী না হয়, এইজন্য তৎকালে মহারাজ বিজয়মাণিক্য বিতস্তি পরিমিত ধাতুনির্মিত একটি হস্তী ও একটি ব্যাঘ্র তাহাদিগকে উপহাব দিয়াছিলেন। হালামগণ রাজদত্ত উপহারের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছিল। অদ্যাপি হালামগণ দেবতাজ্ঞানে উক্ত রাজদত্ত ব্যাঘ্র ও হস্তীর পূজা করিয়া থাকে।

হস্তী ও ব্যাঘ্রের পৃষ্ঠে নিম্নলিখিত শব্দগুলি উৎকীর্ণ আছে—

পূর্বাপর্যক্রমাদ ভবন্ত আত্মীয়া ইদানীং যদি বৈপরিত্যমাচরন্তি তদোপরি ধর্ম্মঃ শস্য নাশো ভবিষ্যতি পশ্চাদ্‌গজশার্দুলো।।

ইহার মধ্যে 'ভবি' পর্যন্ত গজপৃষ্ঠে ও অপবাংশ ব্যাঘ্রপৃষ্ঠে ক্ষোদিত আছে। এই উপহার প্রাপ্তির বহুকাল পরে লাঙ্গাই সম্প্রদায়ের হালামগণ ত্রিপুরেশ্বরের নিকট হইতে ধাতুনির্মিত আরোহীসমেত একটি অশ্ব পাইয়াছিল। অশ্বপৃষ্ঠে বিজয়মাণিক্য, ছত্রমাণিক্য ও উপহারপ্রাপ্ত লাঙ্গাই সর্দারের নাম ক্ষোদিত আছে।

রিয়াংগণের মতো হালামদিগের মধ্যেও 'রায়' 'কাচ্‌ক' 'গালিম' ইত্যাদি উপাধিধারী লোক আছে। ইহারাই হালামদিগের সমাজপতি অর্থাৎ নেতা। হালামগণ পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু। পর্বতীয় জাতির রমণীগণের মধ্যে হালাম জাতীয় স্ত্রীই সুন্দরী।

ইহাদিগের নির্মিত 'পাছরা' অতি সুন্দর। ইহারা বাঁশ ও বেত দিয়া বহুবিধ জিনিস নির্মাণ করিতে পারে।

ভারতী ● ফাল্গুন ১৩২৪ (১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ)



তিপ্‌রা বা তিপারা জাতি

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

নেপালের কিরান্তি জাতি কিরাতশ্রেণিভুক্ত, তিপারাগণও এই শ্রেণির অন্তর্গত। ইয়ুরোপীয় কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে, আরাকানের মুরুং জাতি যে শ্রেণির অন্তর্গত ইহারাও সেই শ্রেণির অন্তর্গত। ত্রিপুরা রাজ্যে ও ত্রিপুরা জেলার বাহিরে কেবল চট্টগ্রামের পার্বত্যপ্রদেশে এই জাতিকে বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। সারারাজ্যে ইহাদের সংখ্যা ৯৪,০৭৫। ইহাদের ৩/৪ অংশ ত্রিপুরা রাজ্যে বাস করে; অবশিষ্ট ১/৪ ভাগ চট্টগ্রামের পার্বত্যপ্রদেশে ও ত্রিপুরা জেলায় আছে। তিপারাগণ ত্রিপুরা রাজ্যের আদিম অধিবাসী। ইহারা 'পুরাণ তিপারা', 'দেশি তিপারা' ও 'জমাতিয়া' এই তিনভাগে বিভক্ত। 'নওয়াতিয়া' ও 'রিয়াং' নামে ইহাদের আরও দুইটি বিভাগ আছে, কিন্তু তাহারা আসল তিপারা নয়। নওয়াতিয়াগণ চট্টগ্রাম হইতে আসিয়া এখানে বাস করিয়াছে। রিয়াংগণ কুকিবংশ-সম্ভূত, ইহারা পূর্বে তিপারারাজগণের পালকিবেহারার কাজ করিত। ত্রিপুরা রাজ্যে তিপারা জাতির মধ্যে ৪৮,৭১৭ জন পুরুষ এবং ৪৫,২৬৩ জন স্ত্রীলোক তিপারা বা মুরুং ভাষায় কথা বলিয়া থাকে। বিগত পনেরো বৎসরের মধ্যে তিপ্‌রা ভাষাভাষী জনসংখ্যা শতকরা ২৪ করিয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পুরাণ তিপারাগণ তিপারাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত। ইহাদের নিম্নে দেশি তিপারার স্থান। তারপর জমাতিয়ার স্থান। অতঃপর নওয়াতিয়া ও রিয়াং-এর স্থান।

পুরাণ তিপারাগণ নিম্নলিখিত এগারোটি 'হদা' বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত;—

১। **বাছাল**—প্রবাদ আছে যে, ইহারা পূর্বে ত্রিপুরা রাজ্যের অধিপতি ছিল। ইহাদিগকে পরাজিত করিয়া চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ ত্রিপুরা রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। বাছালগণ পূর্বে

সুবার অধীনে 'হস্তী-খেদার' কার্য করিত। এক্ষণে ইহাদের উপর নিম্নোক্ত কার্যভার ন্যস্ত হইয়াছে—

(ক) রাজদরবারে ইহাদিগকে রৌপ্যনির্মিত 'পান' ও 'পাঞ্জা' বহন করিতে হয়। ত্রিপুরেশ্বর যখন মিছিল লইয়া কোথাও গমন কবেন, তখনও বাছালদিগকে ওই কার্য করিতে হয়। 'পান' ও 'পাঞ্জা' রাজকীয় সুলতানতের অঙ্গ।

(খ) রাজপরিবারের কোনো ব্যক্তির মৃত্যু হইলে ইহারা মৃতদেহ শ্মশানে বহন করিয়া সৎকার করিয়া থাকে।

(গ) রাজবাড়িতে পার্বত্যপদ্ধতিক্রমে কোনো পূজার অনুষ্ঠান হইলে, বংশগুচ্ছ দিয়া দেবদেবীর মূর্তি নির্মাণ এবং পূজার মণ্ডপ প্রস্তুত-করণ ইহাদের কার্য। পূজায় ইহারা জলও যোগাইয়া থাকে।

(ঘ) ত্রিপুরা রাজ্যে বিবাহকালে বিবাহ-বেদির চারিপাশে পত্রশাখাসংযুক্ত বংশ পুঁতিয়া দিবার প্রথা আছে। রাজপরিবাস্থ কাহারও বিবাহে এই কার্যে বাছালদিগেরই অধিকার।

(ঙ) প্রতি বর্ষে বিজয়ার পরদিবস অসম* ভোজন নামক অপর্যাপ্ত মদ্যপানাদিক্রিয়ার একটি অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। অনুষ্ঠানের জন্য বাছালদিগকে বংশনির্মিত দীপাধার প্রস্তুত করিতে হয়। এই উপলক্ষে যে সকল নওয়াতিয়া তিপারা নিমন্ত্রিত হয়, তাহাদিগের আহারের জন্য বাঁশের বেড়া দিয়া স্থানটিকে ঘিরিতে হয়। এ কার্যও বাছালদিগকে করিতে হয়।

২। **সিউক**—'সিউক' শব্দের অর্থ শিকারি। ইহারা রাজপরিবারের আহারের জন্য পশুপক্ষী শিকার করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ইহারা রাজদরবারের উপাধি বিতরণকালে চন্দনের পাত্র ধারণ করিয়া থাকে। রাজপরিবারস্থ ব্যক্তিগণের বিবাহ উপলক্ষে মাঙ্গলিক কার্যের জন্য ইহারা পার্বত্য অঞ্চল হইতে সধবা (এয়ো) আনয়ন করে, পাত্রীর 'পাট' ধরে এবং পাত্রীর পক্ষের "জলভরা"র কার্য করিয়া থাকে। কুয়াই-তুইয়াদিগের সহিত ইহাদিগকে চন্দ্রাতপ দিয়া বিবাহ-বেদি সাজাইতে হয়।

৩। **কুয়াই-তুইয়া**—পানসুপারি-বাহক কুয়াই-তুইয়া নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহাদিগের ছয়টি প্রধান কার্য।

(ক) দরবারে উপাধি-বিতরণকালে ফুলের মালা গাঁথা।

(খ) সিংহাসন-ঘরে প্রত্যহ ধূপধুনা দেওয়া এবং বিশেষ বিশেষ পুজোপলক্ষে রাজসিংহাসন ধৌত করা।

(গ) পূজার প্রসাদ বাঁটিয়া দেওয়া।

(ঘ) পূজার সময় মহারাজের এবং ঠাকুর-লোকদিগের বসিবার জন্য উপযুক্ত স্থানাদির বন্দোবস্ত করা।

* অসম—অপর্যাপ্ত। তিপারাগণ এই শব্দ বহুপ্রকারে উচ্চারণ করিয়া থাকে। অছম, হসম, হসন, হছম ইত্যাদি ইহার বিকৃত উচ্চারণ।

(ঙ) বিবাহের সময় পাত্রের এবং পাত্রপক্ষের 'জলভরা'র কার্য করা।

(চ) সিউকদিগের সহিত বিবাহ-বেদি সজ্জিত করা।

৪। **দৈত্যসিং বা দুইসিং**—ইহারা রাজকীয় ধ্বজা বা নিশান বহন করিয়া থাকে। পূর্বে যুদ্ধকালে ইহারা শ্বেতবর্ণের নিশান বহন করিত। এক্ষণে কেবল দরবারে, মিছিলে এবং পূজার সময় শ্বেত নিশান বহন করিয়া থাকে। এছাড়া ইহারা পূজার কাঠামো তৈয়ারি করিয়া এবং অসম-ভোজনের সময় মাংসও কুটিয়া থাকে।

৫। **হুজুরিয়া**
৬। **ছিলটিয়া** } —ইহারা মূলত একই হদার দুইটি বাজু বা শাখা। হুজুরে অর্থাৎ ত্রিপুরেশ্বরের নিকট সর্বদা উপস্থিত থাকিতে হয় বলিয়া 'হুজুরিয়া' এই আখ্যায় ইহারা আখ্যাত হয়। ইহাদিগকে উপস্থিতমতো বহুবিধ কার্য করিতে হয়। রাজপ্রাসাদ হইতে বিভিন্ন দেবালয়ে বা পূজার স্থানে বলির এবং ভোগের দ্রব্যাদি ইহাদিগকে বহন করিতে হয়।

৭। **আপাইয়া**—এই শব্দের অর্থ 'মৎস্যক্রেতা'। ইহারা পূর্বে রাজপরিবারের ব্যবহারার্থ মৎস্যাদি ক্রয় করিত। এখন ইহাদিগকে রাজবাড়ির জ্বালানি কাঠ যোগাইতে হয়।

৮। **ছত্রতুইয়া বা ছককতুইয়া**—এই শব্দের অর্থ ছত্রবাহক। ইহারা রাজদরবারের সময় চন্দ্রবাণ, সূর্যবাণ, মাহীমুরত, ছত্র, আরেঙ্গি প্রভৃতি সুলতানত বহন করিয়া থাকে।

৯। **গালিম**—ইহারা পূজক। কের, খার্চি প্রভৃতি পূজায় ইহারা পৌরোহিত্য করিয়া থাকে।

১০। **সুবে নারাণ**—পূজা এবং অসম-ভোজন উপলক্ষে মাছ কোটা ইহাদের কার্য।

১১। **সেনা**—পূর্বোক্ত দশটি সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি কেহ অগম্যাগমন করে (অর্থাৎ মাসতুতো ভগিনী, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কন্যা, পিতৃব্য কন্যা প্রভৃতিকে বিবাহ করে) তাহা হইলে তাহাকে ত্রিপুরেশ্বরের আদেশ লইয়া কুল হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়। এইরূপ অপরাধী 'সেনা' নামে অভিহিত হয়। তবে তাহার পুত্রাদি স্বজাতিকে ভোজ দিয়া পুনরায় আপনাদের 'দফা'-ভুক্ত হইয়া থাকে। ইহারা অসম-ভোজনের সময় চুল্লি প্রস্তুত করে, রন্ধনের বাসনাদি ধৌত করে এবং ঠাকুর-লোকদিগের উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করে। অসম-ভোজনের আহার্য প্রস্তুত হইলে, ইহারা দামামা বাজাইয়া নিমন্ত্রিত লোকদিগকে আহ্বান করিয়া থাকে। সেনাগণ খার্চি-পূজার সময় ঢোল বাজাইয়া থাকে।

উল্লিখিত একাদশ সম্প্রদায়ের মধ্য আন্তর্গণিক বিবাহ হইত না; কিন্তু অধুনা দৈত্যসিং, কুয়াই-তুইয়া, ছত্রতিয়া ও হুজুবিয়া ব্যতীত অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে আন্তর্গণিক বিবাহ হইয়া থাকে। এই চারি সম্প্রদায়ের মধ্যে আজকাল আন্তর্গণিক বিবাহ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তথাপি ইহারা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ করা শ্রেয় মনে করে। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আহারাদি প্রচলিত নাই, কিন্তু এরূপ আহারের দ্বারা কাহারও জাতিনাশ হয় না।

তিপ্রাজাতি নাতিদীর্ঘ, নাতিখর্ব, ইহারা প্রায়শ সবল শরীর; ইহাদের মুখমণ্ডল

সাধারণত গুম্ফ-শ্মশ্রুবিহীন, বাহু ও পদযুগল কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক রকমের স্থূল। বর্ণ ঈষৎ গৌর, নাসিকা কিছু চাপা। তিপ্রাজাতি সাধারণত অন্যান্য পর্বতীয় জাতির মত দুর্দান্ত নহে। তবে শ্রেণি-ভেদে প্রকৃতিগত সাধারণ তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে রিয়াং শ্রেণির তিপ্রাগণ অপেক্ষাকৃত উগ্রপ্রকৃতিসম্পন্ন। পূর্বে জমাতিয়াগণের উগ্রস্বভাব থাকিলেও বর্তমান কালে তাহা পরিলক্ষিত হয় না। তিপ্রা ও নওয়াতিয়াগণই ইহাদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নম্র ও মধুর স্বভাব। সকল শ্রেণির তিপ্রাই সাহসী, অকপট এবং পরদুঃখ-কাতর। কোনো প্রকারের দুষ্প্রবৃত্তি প্রায়ই তিপ্রাদিগের অন্তঃকরণে স্থান পায় না। ইহারা স্বাবলম্বনশীল ও একতাসম্পন্ন।

বাসস্থান—তিপ্রাগণ পর্বতোপরি বা অন্য কোনো নির্জন স্থানে আপনাদিগের বাসস্থান নির্মাণ করিয়া থাকে। অধিকাংশ তিপ্রা বাঁশ দিয়া দ্বিতল গৃহ নির্মাণ করিয়া তাহার উপরিতলে বাস ও নিম্নতলে পালিত পশুপক্ষী রক্ষা করে। কেহ কেহ বা একতল গৃহেও বাস করিয়া থাকে। ইহাদের গৃহের ছাদগুলি সাধারণত ছনের দ্বারা আবৃত থাকে। এক এক বাড়িতে অনেক পরিবার বাস করে। বাটীর অধিবাসীবৃন্দের সাধারণ অপরাধ এবং সামাজিক বিবাদের বিচার ও মীমাংসা করিবার জন্য প্রত্যেক গ্রামে একজন করিয়া বুদ্ধিমান মুরুব্বি বা মাতব্বর ব্যক্তি থাকে। ইহাদিগকে তিপ্রাগণ "চৌধুরি" নামে অভিহিত করিয়া থাকে। সমস্ত তিপ্রাদের সাধারণ উপাধি "ত্রিপুরা"। ইহাদের মধ্যে যাহারা ত্রিপুরেশ্বরের সন্তোষপ্রদ প্রিয়কার্য সম্পাদন করে, রাজানুগ্রহে তাহারা প্রথমে 'বড়ুয়া' উপাধি, পরে ক্রমশ 'সেনাপতি' 'কবরা' ও 'ঠাকুর' উপাধি পাইয়া থাকে। এইরূপ বিভাগের নাম 'হদা'।

কৃষিকার্য—তিপ্রাগণ জুমক্ষেত্রে নানাবিধ শস্য উৎপাদন করিয়া থাকে। ইহারা স্ত্রীপুরুষ সমানভাবে কার্য করে। বহুসংখ্যক স্ত্রীপুরুষ একত্র হইয়া জুমের জন্য নিরূপিত স্থানের বৃক্ষাদি জঙ্গল পৌষ ও মাঘ মাসে কাটিয়া ফেলে; পরে সূর্যোত্তাপে তত্রত্য তৃণলতাদি শুষ্ক হইলে চৈত্র মাসে তাহাতে অগ্নি সংযোগ করে।

বৈশাখ মাসে সেই স্থানকে বীজবপনোপযোগী করিয়া ধান্য, কার্পাস, তিল ও নানাজাতীয় তরকারির বীজ একসঙ্গে বপন করে।

জ্যৈষ্ঠ মাসে ইহারা জুম পরিষ্কৃত করিয়া থাকে। ভাদ্র মাসে ইহাদের ধান কাটা হয়। আশ্বিন হইতে অগ্রহায়ণ মাস পর্যন্ত ইহারা তিল, কার্পাস উঠাইয়া থাকে। জুমে প্রত্যেক শস্যই প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। যথাসময়ে ওই শস্য পরিপক্ক হইলে তিপ্রাগণ নিজেদের আবশ্যক অনুসারে রাখিয়া অবশিষ্ট বিক্রয় করে।

'খঁজর পা', 'মিলক্‌বাঁটা' ও 'বাঁটা' নামক মশলা বিশেষ তিপ্রাদিগের জুমে উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিগত চল্লিশ বৎসর পূর্বে দুই একজন রাজাত্মীয় ও বঙ্গকর্মচারীর চেষ্টায় তিপ্রাদিগের মধ্যেও হল-কর্ষণ দ্বারা চাষ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

বাঙ্গালীরা যে প্রণালীতে চাষ করে ইহারা তাহারই অনুসরণ করিতেছে। ইহাদিগের চাষে ধান্য, পাট, সরিষা, বেগুন, তামাক, ইক্ষু, আলু, ধনিয়া, পিঁয়াজ, মুগ, অড়হর কলাই, তিল, কার্পাস, আদা, হরিদ্রা, ভুট্টা, (তিপ্রা নাম 'মগদানা') তরমুজ, তিক্তকরলা, চিন্‌রা

নামক ফুটি, কাঁকুড়ের মতো একপ্রকার ফল, দরমফাই নামক একপ্রকার অম্লস্বাদ ফল, চালকুমড়া, মিষ্টকুমড়া ও ডেঙ্গার ডাঁটা ইত্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভাষা—তিপ্‌রাদিগের স্বতন্ত্র একটা ভাষা আছে, কিন্তু ইহাদের ভাষায় লিখিত কোনো গ্রন্থ বা স্বতন্ত্র কোনো অক্ষর নাই।

বিবাহ—তিপ্‌রাদিগের মধ্যে প্রধানঃ 'ইকনানানী' ও 'কাইজগ্‌নানী' এই দুই রকমের বিবাহপ্রথা প্রচলিত। তবে বিধবাবিবাহ ও পরিত্যক্তা স্ত্রীর পত্যন্তর গ্রহণও ইহাদিগের মধ্যে হইয়া থাকে; সুতরাং চারিপ্রকারে ইহাদিগের বিবাহ কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। বাল্যবিবাহ এই জাতির মধ্যে প্রচলিত নাই।

ইক্‌নানানী বিবাহ—বরকন্যার পরস্পর অনুরাগবশত এই বিবাহ তাহাদিগের স্বেচ্ছায় হইয়া থাকে। ইহাতে কোনোরূপ ঘটকের প্রয়োজন হয় না কিংবা মন্ত্রপাঠ প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিতে হয় না। সমর্থ হইলে সামাজিকগণকে বর বা কন্যাপক্ষ হইতে একটি ভোজ দেওয়া হয়।

কাইজগ্‌নানী বিবাহ—বাঙ্গালীদিগের ন্যায় অভিভাবকগণের ইচ্ছানুসারে ইহা সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই বিবাহে মনোনীত বা নিরূপিত কন্যার পিত্রালয়ে বিবাহের পূর্বে বর এক বৎসর কাল অবস্থান করে এবং কন্যার পিতা বা অভিভাবকের সাংসারিক কার্য নির্বাহ করে। যদি এই সময়ের মধ্যে বরের কর্মকুশলতা ও সচ্চরিত্রতা দর্শনে কন্যার অভিভাবক তাহাকে কন্যাদানের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া মনে করে, পক্ষান্তরে বর ও কন্যাকে বিবাহের উপযুক্ত বলিয়া মনে করে, তাহা হইলে বিবাহ না হইলে পাত্রের এই নির্দিষ্ট সময়ের কার্যের জন্য কন্যাপক্ষ তাহাকে পারিশ্রমিক প্রদান করিয়া থাকে। আর বিবাহ হইলে, তিপ্‌রাদিগের পুরোহিত (ওঝাই) 'রামপ্রা' বা 'লাম্‌প্রা' নামক দেবতার পূজা করে। এই পূজাতে দুইটি বাঁশ পুতিয়া তাহার উপরে একটি বাঁশ রাখে ও দুইটি বাঁশের চোঙ উপরিস্থিত বাঁশের উপর সংস্থাপন করিয়া তাহার একটিতে মদ্য ও অপরটিতে জল রাখে; এবং মোরগ বা হাঁস প্রভৃতি বলি দিয়া পূজা হইলে ওঝাই বাঁশের চোঙায় রক্ষিত জল বরকন্যার মস্তকে দেয়। ইহাই কাইজগ্‌নানী বিবাহের মাঙ্গলিক কার্য। ইহার পর কন্যা বরের ক্রোড়ে উপবিষ্ট হইয়া কন্যার মাতার প্রদত্ত একপাত্র সুরার অর্ধেক স্বয়ং পান করিয়া অপরাংশ বরের হস্তে দেয়। বর সেই উচ্ছিষ্ট মদ পান করিলেই বিবাহ সম্পন্ন হইল। সামাজিকদিগকে মদ্যাদি উপচারে ভোজপ্রদানও এই বিবাহের একটি অঙ্গ।

যদি কন্যার পিত্রালয়ে বরের বর্ষব্যাপী অবস্থান সময়ে উভয়ের প্রেম হয় এবং সেই প্রেমের পরিণামে বিবাহের পূর্বেই কন্যার সন্তান-সম্ভাবনা হয়, তাহা হইলেও এক বৎসর পরে বিবাহ হইবে, কিন্তু তাহাতে 'লাম্‌প্রা' দেবতার পূজা হইবে না। আনুষঙ্গিক অপর অনুষ্ঠানগুলিও রহিত থাকিবে। কেবলমাত্র কন্যার আনীত জলের ছিটা বর কন্যার মস্তকে প্রদান করিয়া তাহার সীমন্তে সিন্দুর দিয়া দিবে। এইরূপ হইলে ওঝাই-এর কোনো কর্তব্য থাকে না।

বিবাহের রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্বে বর অন্যত্র প্রস্থান করে, এবং দুই দিন ও একরাত্রি তথায় অবস্থান করিয়া শ্বশুরালয়ে প্রত্যাবর্তন করে।

বিধবার বিবাহ ও পরিত্যক্তার পত্যন্তর গ্রহণে উল্লিখিত উভয় প্রকার বিবাহের কোনো ব্যাপারই অনুষ্ঠিত হয় না।

তিপ্‌রাদিগের মধ্যে সামর্থ্যানুসারে একজন তিন চারিটা বিবাহ করিতে পারে। আবশ্যক বোধ করিলে ২/৪ জন অবিবাহিত স্ত্রীলোকও ঘরে রাখিতে পারে। এই রক্ষিত স্ত্রীলোকদিগের গর্ভে সন্তান জন্মিলে তিপ্‌রাগণ পুত্র কন্যা বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে। এইরূপে উৎপন্ন সন্তানগুলি বিষয়ের অতি সামান্য অংশ পাইয়া থাকে। এইরূপ রক্ষিত স্ত্রীলোকদিগকে তিপ্‌রাগণ 'কতই' বলিয়া থাকে।

ধর্ম—তিপ্‌রাদিগের মধ্যে প্রধানত চতুর্দশ দেবতার পূজা হইয়া থাকে। ইহারা ইহাদিগের পূজার সময় তিপ্‌রা ভাষায় মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া থাকে।

তিপ্‌রাগণ যে চতুর্দশ দেবতার পূজা করিয়া থাকে সেগুলি অষ্টধাতুর ১৪টি মুণ্ড মাত্র।

তিপ্‌রাগণ চতুর্দশ দেবতার নাম এইরূপ বলিয়া থাকে।

হরোমা হরিমা বাণী কুমারোগণপাবিধিঃ।
ক্ষ্মাব্ধির্গঙ্গা শিখী কামো হিমাদ্রিশ্চতুর্দশঃ।।

(শিব, দুর্গা, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিকেয়, গণেশ, বিরিঞ্চি, পৃথিবী, সমুদ্র, গঙ্গা, অগ্নি, প্রদ্যুম্ন ও হিমাদ্রি)।

এই চৌদ্দটি দেবতার পূজা হইলে পর তিপ্‌রাগণ আর একটি লৌহময় মূর্তির পূজা করিয়া থাকে। ওই মূর্তির এক হস্তে ঢাল, অপর হস্তে তরবারি। ইহার নাম 'বুড়াদেবতা'।

প্রতিদিন চৌদ্দ দেবতাব পূজা হয় না। প্রত্যহ দুর্গা, শিব ও বিষ্ণু এই তিন দেবতার স্নান ও পূজা হইয়া থাকে। পূজার কতকগুলি নিয়ম আছে। প্রাতঃকালে প্রায় নয়টার সময় তিন দেবতার বাল্যভোগ দিতে হয়। বাল্যভোগে চাল, কলা, চিনি, সন্দেশ, ঘৃত, সুপারি, পান ও দুধ দিতে হয়। পূর্বোক্ত তিন দেবতারা ভোগের সঙ্গে চণ্ডীদেবীর একটি ভোগ দিতে হয়। এই ভোগে একটি কলা, একটি সন্দেশ, এক পোয়া চাল, একটু ঘৃত দিবার নিয়ম। অতঃপর চণ্ডীপাঠ। তারপর একটি ছাগ (পাঁঠা) বলি দেওয়া হইয়া থাকে।

দ্বিপ্রহরে চৌদ্দ দেবতার তিন দেবতার রাজভোগ। ইহাতে অন্ন ব্যঞ্জন, ছাগমাংস, তিনটি ডিম্ব আবশ্যক।

অপরাহ্নে—আরতি।

নবমীর দিন দুইটি ছাগ এবং শুক্লাষ্টমীর দিন একটি ছাগ বলি দেওয়া হয় এবং একটি খাসি অন্যত্র কাটিয়া তাহা দ্বারা ভোগ হয়। পূজাতে রোহিত মৎস্য (শোলমাছ) দেওয়ারও রীতি আছে।

চৌদ্দ দেবতার পূজার জন্য তিপরাদের একটি বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। পূজার জন্য একজন প্রাচীন পূজক থাকে। তাকে তাহারা 'চন্তাই' নামে অভিহিত করে। চন্তাই-এর আদেশ অনুসারে সমস্ত কার্য নির্বাহ হইয়া থাকে। চন্তাই প্রধান প্রধান পূজার কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। চন্তাই-এর প্রতিনিধিকে ইহারা 'নারাণ' বা 'নারায়ণ' আখ্যায় অভিহিত করে।

চন্তাই-এর অধীন দেওড়াই বা গালিম নিত্য পূজা সম্পাদন করে ও বলি দিয়া থাকে। কার্যের সুবিধার জন্য গালিমগণ নিম্নবর্ণিত শ্রেণিতে বিভক্ত—যথা—

১। **খাবংতিনাই**—ইনি মহাদেবের সেবক।

২। **ঋসক্ বা ঋজক্**—দেবতাদিগকে যখন নদীতে স্নান করাইতে লইয়া যাওয়া হয়, তখন ইনি দেবতার অগ্রে 'উই উই' শব্দ করিতে করিতে গমন করেন। খার্চি পূজার অধিবাসের দিন স্নান হয়।

৩। **শিংকল খাইনাই**—ইনি দেবতার তরবারিধারণকারী সিপাহি।

৪। **দাক্লোক্তিনাই**—বড় খড়্গধারী সিপাহি।

৫। **খামকল খাইনাই**—ঢোল বাদ্যকর।

৬। **তকজাংখা খাইনাই**—খাঁচা বাইক (খাঁচার ভিতরে সাতটি পারাবত থাকে)।

৭। **বলক্লোকনানাই বা বল্কলতিনাই**—মশালধারী।

৮। **লাইকলোক খলনাই**—ইনি পাতা বিছাইয়া দেওয়াইবার কার্য করেন।

৯। **মুড়িতাম নাই**—সানাই বাদক।

১০। **মুড়ি**—ইনি খড়্গে ধার বা শান দিয়া দেন।

১১। **মুদি**—ইনি খড়্গে শান দিবার আদেশ দেন।

তিপ্রাদিগের উপাস্য দেবতা—

১। **মহাদেব ও মাদেবী (পার্বতী)**—প্রধানত তিপ্রাজাতি ইঁহাদেরই উপাসক। ইঁহাদের পূজা প্রাতঃকালেই হইয়া থাকে। পূজায় হাঁস, পাঁঠা ও পারাবতের আবশ্যক।

২। **লাম্প্রা দেবতা যুগল, (আকাশ ও সমুদ্র) (লাম্প্রাওয়াথক)**—বিবাহাদি মাঙ্গলিক কার্যে এই দেবতাযুগলের পূজা হইয়া থাকে। রোগশান্তির জন্যও ইঁহাদের পূজা হয়। ওঝাইগণ পূজার সময় ইঁহাদিগকে 'বিখাটা' ও 'আখাটা' এই দুই বিশেষ নামে অভিহিত করে। 'লাম্প্রা' পূজায় হাঁস ও পারাবত চাই।

৩। **সাঙ্গবংমা (হিমালয়)**—চতুর্দশ দেবতার মধ্যে প্রায়শই ইঁহার ও লাম্প্রার পূজা হয়। অন্য দেবগণের পূজা কদাচিৎ হইয়া থাকে। পূজায় হাঁস ও পাঁঠা দিতে হয়।

৪। **তুইমা (গঙ্গা)**—কেহ রোগাক্রান্ত হইলে তাহার আরোগ্য কামনায় সন্নিহিত নদীতে ওঝাই কর্তৃক তুইমার পূজা হইয়া থাকে। এই পূজা দ্বারা নিরূপিত হয় যে, রোগীকে কোন্ দেবতা আক্রমণ করিয়াছেন। পরে রোগশান্তির জন্য পুনর্বার নিরূপিত দেবতার পূজা হয়। এই দেবতার প্রকৃত নাম 'কালাক্ষিরাজ'। ইহা ভিন্ন অগ্রহায়ণ মাসে বিশেষভাবে তুইমার পূজা হয়। পূজায় হাঁস ও পাঁঠার ব্যবস্থা।

৫। **মালুইমা**—ধানের দেবতা, ধান্য প্রচুর পরিমাণে হওয়ার কামনায় এই দেবতার পূজা হয়। পূজায় মোরগ দিবার নিয়ম। এই দেবতাকে ওঝাইগণ 'লক্ষ্মী' বলিয়া থাকে।

৬। **খুলুমা (কার্পাসের দেবতা)**—কার্পাস উৎপত্তির কামনায় ইঁহার পূজা হয়। এই দেবতার প্রকৃত নাম 'ধনসরী'; (ধানোশ্বরী) পূজায় মোরগ ব্যবস্থা।

৭। **বুড়াছা**—রোগের উপশম কামনায় ইঁহার পূজা হয়। এই পূজায় হাঁস, পাঁঠা ও মোরগের ব্যবস্থা। ওঝাইগণ এই দেবতাকে 'কিসিনাক্রা' বলে।

৮।৯। **বনিরাও ও তুম্‌নাইরাও**—দুই ভাই বুড়াছা-এর পুত্র। বনিরাও সাধারণ নাম, ওঝাইদের নাম 'কলক্‌তু' 'ক্লক্‌তুদা'। 'তুমনাইরাও' সাধারণ ওঝাইদিগের প্রদত্ত নাম 'জম্‌দুবুন্ধ'। পূজায় হাঁস, পাঁঠা ও মোরগের ব্যবস্থা।

১০। **বুরইরক**—সাত ভগিনী। ৬টি বিবাহিতা, একটি কনিষ্ঠা অবিবাহিতা। অবিবাহিতা ভগিনী মানব লইয়া ক্রীড়া করেন। ইঁহারা ডাকিনী যোগিনী বা সাতবোন-পরি নামে বিখ্যাত।

১১।১২। **গরাইয়া ও কালাইয়া**—দুই ভাই। মহাবিষুব সংক্রান্তিতে বিশেষ সমারোহের সহিত ইঁহাদিগের পূজা হয়। এই সময়ে তিপ্‌রাগণ ৩/৪ দিন মদ্যপানে উন্মত্ত থাকে। এই পূজায় মোরগ আবশ্যক। ওঝাইগণ গরাইয়া দেবতাকে 'বিনাইগ্‌ঘ' বলে।

এতদ্ভিন্ন ইহারা হাঁস ও পাঁঠা দিয়া 'মঙ্গলচণ্ডী', ভদ্রকালী, রক্ষাকালী, ত্রিপুরাসুন্দরীর পূজা করে। মোরগ বাদ দিয়া 'লক্‌ত্রাই বড়মুড়া'র পূজা হয়। মোরগ ও শূকর দিয়া 'বিসরী'র পূজা হয়। 'যমপীড়া', 'কাইপীড়া' ও 'দরখা' নামক দেবতার পূজাও হইয়া থাকে।

ইহারা সত্যনারায়ণ, ত্রিনাথ (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর) ও শনির পূজা করিয়া থাকে। এই ওঝাইগণ বংশানুক্রমে ইহাদিগের পৌরোহিত্য করে। প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে তিপ্‌রাগণ বার্ষিক পূজার অনুষ্ঠান করে। ত্রিপুরেশ্বরের 'কের' পূজা শেষ হইলে 'পাহাড়িয়া'রা 'কের' পূজা করে। এই পূজার সময় পিষ্টকাদি খাইবার নিয়ম আছে।

মৃত্যু—ত্রিপুরাজাতীয় কোনো ব্যক্তির মৃত্যু হইলে মৃতব্যক্তির আত্মীয়গণ শবদেহ শ্মশানে আনিয়া তাহার পায়ের কাছে একটা মোরগ মারিয়া কিছু চাউলের সহিত রাখিয়া দেয়। পরে দাহকার্য সম্পাদন করে। সাধারণত বাঁশ ও বেতের চারিটা 'ঘুঘু' তৈয়ারি করিয়া মৃতের চরণতলে রাখিয়া দেওয়া হয়। শব-দাহ করিয়া ইহারা শ্মশান পরিষ্কার করে। পরে একটা তুলসি, একটা আলো, কিছু অন্ন এবং একটা মোরগ বা পারাবত সেই স্থানে রাখিয়া দেওয়া হয়।

সেই চিতাস্থানে আত্মীয়গণ ক্রমাগত ৭ দিন পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির প্রীতিকামনায় একটা মোরগ মারিয়া রাখে ও কিছু চাউল দিয়া যায়। ৭ দিন পরে চিতাভস্ম ও অস্থি সংগ্রহ করিয়া আপনাদিগের বাসস্থানের নিকটবর্তী স্থানে চিতাভস্ম রক্ষা করে এবং বাড়ির উঠানে তুলসীতলায় অস্থি রাখিয়া দেয়। চিতাভস্মের উপর একটি কুটির নির্মাণ করিয়া মৃতব্যক্তির অস্ত্রশস্ত্রাদি সেই কুটির মধ্যে সযত্নে রক্ষা করে। অস্থি যেখানে পুঁতিয়া রাখে সেখানে প্রাতঃকালে জল ও রাত্রিতে দীপ দেয়। এক বৎসরের মধ্যে অস্থি গঙ্গায় দিয়া আসে। যাহাদের সুবিধা না হয় তাহারা অন্যলোকের সহিত অস্থি গঙ্গায় দিবার জন্য

পাঠাইয়া দেয়। অষ্টাহে অথবা ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে। শ্রাদ্ধের পূর্বপর্যন্ত নিরামিষ ভোজন করে। এই সময় তিপ্‌রারা 'ধড়া' নামক একটি ছোটো নূতন বস্ত্র গলায় বাঁধিয়া থাকে। পূর্বে ইহাদের এরূপ রীতি ছিল না। শ্রাদ্ধের সময় ইহারা সাধ্যমত গাই-বাছুর ঘটি বাটি ইত্যাদি দান করিয়া থাকে।

ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ মালা ধারণ করিয়া থাকে। যাহাদের মালা আছে তাহারা মাংস খায় না। মৎস্যমাত্র খাইতে পারে। ইহাদিগের গুরু আছে, তাহার নাম 'অধিকাবী' এই অধিকারীদিগের বাস নুরনগর পরগনার প্রস্তর্গত মেহারি গ্রামে।

উৎসব—চৈত্র মাসে ইহাদিগের একটি উৎসব হইয়া থাকে। উত্তরায়ণ সংক্রান্তি, কের পূজা, সরস্বতী পূজা, বিবাহ ও শ্রাদ্ধে ইহারা উৎসব করিয়া থাকে। 'বিনায়গ্‌ঘ' পূজার সময় মাত্র ইহারা নৃত্য করিয়া থাকে। নৃত্যকালে ছোটো ছেলেরাই নাচিয়া থাকে।

ব্রত—বাঙ্গালীদিগের ন্যায় তিপ্‌রাগণ 'একাদশী', 'জন্মাষ্টমী', 'শিবচতুর্দশী' ও 'রবিব্রত' করিয়া থাকে। একাদশীর দিন বিধবারা রাত্রিতে মাত্র খায়, দিনে কিছুই আহার করে না।

ইহাদিগের স্ত্রীলোকগ তামাক ও মদ খাইতে পারে। স্ত্রীলোকেরা পান ও দোক্তা খুব বেশি খাইয়া থাকে। ইহাদের বিধবাগণ মৎস্যাদি ভোজন করিলে নিন্দার্হ হয় না।

অলংকার

কর্ণভূষণ—১। ওয়াকুম (কর্ণের নিম্ন দিকে), ২। তৈয়া (কর্ণের উপর দিকে), ৩। ভেরি (ঝুমকা)।

নাকের ভূষণ—১। কৈলি।

কণ্ঠাভরণ—১। রাংবতাং, ২। হাসলি, ৩। কাঁটি, ৪। মালা (রামকলাগাছের দানা লইয়া প্রস্তুত)।

হস্তাভরণ—১। কাসর (ইহা পিতল বা রূপার তৈরি), ২। চুড়ি (শাঁখার), ৩। ইয়াসিতাম (অঙ্গুরীয়)।

পায়ের গহনা--১। খাড়ু (রূপার)

খেলা—সাধারণত ইহাদের মধ্যে পুরুষে তাস এবং স্ত্রীলোকে তাস ও সিকুই খেলিয়া থাকে। ছেলেরা লাট্টু খেলে। লাট্টুকে ইহারা চোর বলে। ইহারা চোর-চোর খেলে। ইহাদিগের ভাষায় তাহার নাম 'বুমার-বুমা'। এতদ্ভিন্ন 'ঘুটি' (মারবেল), 'জিং' (এক প্রকার দমের খেলা), পাঁই (১৬ ঘরের খেলা), 'হারি' (জলক্রীড়া), 'বুমাকত', 'দুধু' বালকগণ খেলিয়া থাকে।*

* এই প্রবন্ধ লিখিবার সময় কোনো কোনো বিষয়ে বঙ্গদেশের ও ত্রিপুরার 'আদমশুমারি' প্রভৃতি বিবরণাবলী হইতে সাহায্য লইতে বাধ্য হইয়াছি—লেখক

ভারতী ● পৌষ ১৩২৪ (১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ)



আসামের নাগাজাতি

মুদ্রারাক্ষস

বোরি দিহিং নদীর বাম তীর, নওগাঁ জেলার কপিলি নদী, বরাক নদীর বৃহৎ দক্ষিণ বাঁক, এবং ত্রিপুরার পূর্ব সীমান্তের মধ্যবর্তী ভূভাগে নাগাদিগের বাস। ধনশ্রী নদীর পূর্ব ও পশ্চিমের নাগাদের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ লক্ষিত হয়।

নাগাদিগের নাম 'নগ্ন বা 'নাগ' শব্দের অপভ্রংশ তাহা পণ্ডিতের আলোচ্য। নাগাদের প্রকৃতি পর্যালোচনা করিলে তাহাদের নামের ব্যুৎপত্তি উভয় শব্দ হইতেই সম্ভবপর মনে হয়। নাগারা আবরণ অপেক্ষা ভূষণ অধিক ভালোবাসে এবং স্বভাব বাস্তবিকই নাগবৎ।

ধনশ্রী বা ধনেশ্বরী নদীর পূর্ব শাখা দোয়াং নদীর পূর্বদিক-বাসী নাগাগণ বহু শাখায় বিভক্ত। প্রত্যেক শাখা পুরুষানুক্রমাগত দলপতির অধীন। আপন দলের উপর দলপতির অত্যন্ত প্রভাব। তাহারা বড়ো বড়ো গ্রামে দলবন্ধ হইয়া বাস করে; কোনো কোনো গ্রামে ৩০০ ঘর গৃহস্থ থাকে। গ্রামসকল পর্বতচূড়া বা অধিত্যকার উপর বেশ নিরাপদ ও বহুদূর পর্যন্ত দর্শনসক্ষম স্থানে গঠিত হয় এবং পথসকল সুরক্ষিত ও খাড়া পর্বত গাত্রও যথাসম্ভব অগম্য করা হয়। গ্রামের মধ্যে দলপতির গৃহই বৃহৎ হয়; ২৫০/৩০০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। গ্রামের মধ্যস্থলে সর্বাপেক্ষা উচ্চ ভূমিখণ্ডের উপর সুগঠিত গৃহ দলপতির। সাধারণ লোকের গৃহ অনেক ছোটো, কিন্তু সকলগুলিই বেশ সুগঠিত। দলপতির গৃহের সম্মুখে ও অভ্যন্তরে শিকার ও বিবিধ উৎসবের স্মারক চিহ্নসকল এবং অপর একটি বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত গৃহে নৃশংসতা ও প্রতিহিংসার স্মরণীয় বস্তুসকল সজ্জিত থাকে। নরকরোটিসকল তাকের উপর সারবন্দি করিয়া সাজানো থাকে, ইহা সাম্প্রতিক বীরত্বের নিদর্শন; এবং পূর্বপুরুষদিগের হিংস্র কর্মের নিদর্শনস্বরূপ ঝুড়ি ঝুড়ি করোটিখণ্ড সকলও

রক্ষিত থাকে। নাগা রাজ্য ইংরাজ-অধিকৃত হওয়ার পর শীতল শোণিতে হত্যাকাণ্ড অনেক বন্ধ হইয়াছে।

নাগাদের মধ্যে যাহারা মুখে বিচিত্র উলকি পরিয়া মুখমণ্ডল যথাসম্ভব কদর্য করিতে পারে, তাহারাই শুধু বিবাহ করিতে পায়। এজন্য এক এক জনের মুখ অস্বাভাবিক কালো হইয়া যায় এবং গৌর মুখে অস্বাভাবিক কৃষ্ণতা অতি ভীষণ দেখায়। যতদিন না কোনো পুরুষ একটা মানুষের মাথা বা মাথার খানিকটা চামড়া সংগ্রহ করিতে পারে ততদিন তাহার উলকি পরিবার অধিকার হয় না। এই সকল মাথা বা মাথার চামড়া যে গৌরবাত্মক যুদ্ধে বা কোনো শত্রুরই সংগ্রহ করিতে হইবে তাহার কোনো মানে নাই; নিজের দল ছাড়া আর যাহার হউক এবং যে কোনো প্রকারেই সংগৃহীত হউক সকল মাথাই প্রিয়ার যোগ্য উপহার বলিয়া গণ্য হয়। বহু জাতি এই ভীষণ প্রথা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। এই প্রথার পরিবর্তে নাগাপ্রিয়ারা যে কোন্ উপহার পাইয়া এক্ষণে তৃপ্ত থাকিতেছে তাহা জানা যায় নাই।

নাগা পবর্তের বন্ধুভাবাপন্ন গ্রামসকল পরস্পরের মধ্যে দিব্য সংযোগ রক্ষা করে। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইবার পথসকল খাড়া এবং দুর্গম হইলেও পথগুলিকে আঁকাবাঁকা করিতে এবং সাঁকো নির্মাণে তাহারা বিলক্ষণ ইঞ্জিনিয়ারি নিপুণতা দেখাইয়া থাকে। পর্বতগাত্রে তাকের উপর থাকে থাকে সজ্জিত ক্ষেত্রসকলে জলসেচন দ্বারা স্থায়ী ভাবের কৃষিকার্য করে ; রবি শস্যের জন্য প্রায়ই সুন্দর মহান বনসকল নষ্ট করিয়া ফেলে; কারণ তাহাদের প্রতিবেশী অন্যান্য জাতির মত ইহারা বনদেবতাকে ভয় করে না। ইহারা গাছ কাটিয়া বন পরিষ্কার করে না, গাছগুলিতে ঘা মারিয়া মারিয়া পত্রশূন্য ও শুষ্ক করিয়া ফেলে, তৎপরে তাহাতে আগুন লাগাইয়া জমি সাফ করে এবং জমি একটু আঁচড়াইয়া বীজ বপন করিয়া দেয় এবং ইহাতেই দুই এক বৎসরের উপযুক্ত প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। গ্রাম-সন্নিহিত পথিপার্শ্বে সযত্নে আম, কাঁঠাল ও বাঁশ গাছ রোপণ করে এবং সেই সকল ছায়াশীতল স্থানে ছোটো ছোটো ঘর তৈয়ারি করিয়া শব-কঙ্কাল রক্ষিত হয়।

শব প্রথমে নৌকার মতো আকারের শবাধারে রাখিয়া গ্রামপ্রান্তে খোলা অবস্থায় গাছে টাঙাইয়া রাখে। শব সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক হইয়া গেলে অন্তেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। শব কোনো খ্যাত ব্যক্তির হইলে দুইটা মহিষ, কতকগুলা শূকর এবং বহুসংখ্যক মোরগ বলি দেওয়া হয়। নিকটবর্তী সকল গ্রাম হইতেই বন্ধুগণ যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়া, ঢাল, বল্লম ও দাত্র বা কুঠার লইয়া এবং কাঁসর ও ঢোল বাজাইতে বাজাইতে শবদেহের নিকট উপস্থিত হইয়া নাচিতে গাহিতে আরম্ভ করে। গানে তাহারা তাহাদের বন্ধু-চোর মৃত্যুদানবকে বিশ্বাসঘাতক শত্রু বলিয়া সম্বোধন করে এবং বীর বিক্রমে মৃত্যুর উদ্দেশে সকলে মিলিয়া অস্ত্র-আস্ফালন করে এবং মূল গায়েন এক এক পালা গালি বর্ষণ শেষ করিলে সকলে মিলিয়া হাঁ গো হাঁ বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠে। নৃত্যগীত ও ভোজ সমস্ত রাত্রি ও তৎপর দিন ধরিয়া চলে। অবশেষে একদল যুবতি আসিয়া পুষ্পপল্লব ছড়াইয়া ছড়াইয়া শবদেহ সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া ফেলে এবং তখন যথারীতি শবের সৎকার করা হয়। কেহ কেহ

অস্থি দাহ করে, কেহ বা কবর দেয়, কেহ বা বৃক্ষতলে ক্ষুদ্র গৃহ নির্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে অস্থিকঙ্কাল রক্ষা করে।

নাগাদিগের কোনো মন্দির বা পুরোহিত দেখা যায় নাই এবং তাহাদের যে কোনো রকম পূজাপদ্ধতি আছে তাহাও জানা যায় নাই। তাহাদের মধ্যে দৈবশক্তির যে ক্ষীণ ও অস্ফুট ধারণা আছে তাহা না থাকার সামিল , তাহাদের বিশ্বাস পরজন্মে তাহারা ঠিক এজন্মের মতোই থাকিবে।

ইহাদের বিবাহ অধিক বয়সে হয়। ইহার কারণ বিবাহাভিলাষী ব্যক্তিকে ভাবী বধূর তুষ্টির জন্য শোণিতময় উপহার সংগ্রহ করিতে হয়; এবং ইহার পরেও বধূর অভিভাবকের অনুমতি লাভের জন্য বিবাহপণের আয়োজন করিতে করিতে বরের বয়স বাড়িয়া চলে। অনেক বিবাহপণ সংগ্রহ করিতে অক্ষম যুবক শ্বশুরালয়ে দাসত্ব করিয়া পণশুল্ক শোধ করে; তখন তাহার শ্বশুর জামাতাকে সাহায্য করিয়া স্থিতি করে। নাগারা এক স্ত্রীতেই সন্তুষ্ট থাকে; স্ত্রীকে গৃহকর্মে গুরু পরিশ্রম করিতে হয়, অন্যথা তাহাদের প্রতি স্বামীগণ সদ্ব্যবহারই করে। সকল ভোজ বা সামাজিক উৎসবে পত্নীগণ স্বামীদিগের সহিত তুল্যভাবে যোগদান করিতে পারে।

নাগাদিগের সমরতাণ্ডব মিথ্যাযুদ্ধ হইতে আরম্ভ হয়। যোদ্ধাগণ বল্লম, কুঠার বা দাত্র এবং সর্বশরীর আবরণসক্ষম দীর্ঘ মহিষচর্মের বা ব্যাঘ্র প্রভৃতি পশুচর্মাবৃত বাঁশের তৈয়ারি ঢাল লইয়া বিস্তৃত হইয়া শৃঙ্খলার সহিত অগ্রসর হয়। এই সময় জমির উপর দিয়া অগ্রসর কৃষ্ণঢালের শ্রেণি ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না; এমত অবস্থায় তাহারা বাণে অভেদ্য, কিন্তু বন্দুকের গুলিতে অভেদ্য নহে। যখনা তাহারা কল্পিত শত্রুর নিকটবর্তী হয় তখন তাহারা লাফাইয়া উঠিয়া বল্লম নিক্ষেপ করে এবং তাহা দ্বারা শত্রু হত হইয়া বলিয়া ধরিয়া লইয়া এক গোছা ঘাস ধরিয়া কুঠার দিয়া মাটির চাপড়াসুদ্ধ ঘাসের গোছা কাটিয়া লয় এবং কল্পিত শত্রুর মুণ্ডের অনুকরণে স্কন্ধে ঝুলাইয়া লইয়া প্রত্যাবর্তন করে। তৎপরে বিজয়গীত ও নৃত্য আরম্ভ হয়, ইহাতে রমণীগণও যোগদান করে।

বহু নাগাপ্রধান সমতলে নামিবার সময় বাঙালির মত ভদ্র পরিচ্ছদ ধারণ করে; কিন্তু গৃহে তাহাদের জাতীয় অদ্ভুত বিচিত্র অথচ সুন্দর পোশাক পরে। বড় বড় শঙ্খ কাটিয়া তাহার মুকুট মাথায় দেয়; এবং মাথার তালুতে সূক্ষ্মাগ্র বাঁশের টুপি ময়ূরপুচ্ছ ও লাল রং করা ছাগলোমে সজ্জিত করিয়া পরে। পুঁতি, কড়ি, পিত্তল বা বেত্র নির্মিত হার, বাজু, বালা প্রচুর পরে, কিন্তু উল্লেখযোগ্য বস্ত্র একটুও পরিধান করে না। পিত্তলের পালিশ করা কোমরবন্ধের নীচে কেহ কেহ ছোটো ছোটো কড়ি দ্বারা সজ্জিত কালো কাপড়ের ছোট ঘাগরার মত পরে এবং অনেকে এই আবরণটুকুও অনাবশ্যক মনে করে। লাল রং করা বেতের বেড় পায়ে পরে। ইহাদের অস্ত্র লাল রঙের ছাগলোমভূষিত ছোটো কালো বাঁটের চকচকে কুঠার; একটা খোচ বাহির করা চওড়া ফলার বল্লম; এবং ৪/৫ ফুট লম্বা মহিষচর্মের ঢাল। বল্লমের বাটে বুরুশের মত করিয়া লোহিত লোম লাগানো থাকে। স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ নিতান্ত অনাড়ম্বর, হার ও একটা ঘাঘরা, কাহারও বা ঘাগরাও থাকে না।

প্রধান দলপতিদের বসিবার কেদারা থাকে; দলপতির কেদারা সর্বোচ্চ; যুবরাজের একধাপ ছোটো এবং পরিবারস্থ অপর পরিজনদিগের আরও ছোটো। একবার এক দলপতির পুত্র ১৫/২০ হাত উচ্চ বাঁশের মাচায় বসিয়া ইংরাজ দৌত্যের সাক্ষাৎ করিয়াছিল।

সকল নাগাপল্লির সুরক্ষিত প্রবেশ পথে এক একটা বৃহৎ অত্যুচ্চ গৃহ দেউড়ির মতো থাকে; তাহাতে একদল যুবক প্রতি রাত্রে প্রহরায় নিযুক্ত থাকে। বিপদবার্তা ঘোষণার জন্য তাহাদের নিকট আস্ত গাছ খুদিয়া তৈরি ঢাক থাকে, এবং অগ্নিসংকেতও করে।

যুবক দলপতিগণ প্রায়ই বেশ সুশ্রী হয় এবং প্রায়ই দীর্ঘায়ত পুরুষ হয়। কিন্তু সাধারণত নাগাগণ উত্তরের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা হীনশ্রী। তাহারা ক্ষুদ্রাস্থি, অপুষ্টপেশি এবং অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণবর্ণ। তাহাদের মুখ গোলাকার ও চ্যাপটা মতন এবং চক্ষু ক্ষুদ্র। বহু আসামী নাগা পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ইহাদের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে; কিন্তু মুখাকৃতি দেখিলে তাহাদিগকে চিনিয়া পৃথক করা যায়। নাগা রমণীগণ খর্বকায়, কুশ্রী এবং তাহাদের কোমর নাই, ডাগর পেট বলিয়া বুকে পেটে একাকার। রমণীগণ হয়ত গুরু পরিশ্রমে সুন্দরী হইতে পায় না।

ধনেশ্বরীর শাখা দোয়াং নদীর পূর্বপ্রদেশস্থ নাগাগণ কোনো দলপতি বা প্রধান স্বীকার করে না। জ্ঞানে বা সাধারণত ধনে শ্রেষ্ঠ বর্ষীয়ানকে তাহারা গ্রামের মুখপাত নির্বাচন করে; কিন্তু তাহাকে কোনো ক্ষমতা প্রদত্ত হয় না, এবং তাহার কথা শুনিয়া চলিতেও কেহ বাধ্য থাকে না। এই পদ বংশানুক্রমিক তো নহেই, অনেক সময় আজীবনও নহে। কখনো-কখনো বিবাদ বিংসবাদ মিটাইবার জন্য বৃদ্ধদের বৈঠক বসে, কিন্তু তাহাদের বিচার কাহাকেও কোনো বিষয়ে বাধ্য করিতে পারে না। এক দলের মধ্যে দুই জনের বিবাদ ক্রমে জ্ঞাতিযুদ্ধে পরিণত হইয়া উঠে; কিন্তু ইহাতে সমাজে যে দুঃখ আনয়ন করে তাহাই ইহার অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। কোনো বিধি নিষেধ না থাকিলেও ক্রোধ প্রকাশের ফলের ভীষণতাই সকলকে ক্রোধসংযমে বাধ্য করে। তথাপি বৎসরে দুই একবার ইহাদের যুদ্ধ-সাধ ভালো করিয়াই মিটাইয়া লয়। কোনো সুবিধাজনক সময় ও স্থান নির্দেশ করিয়া সকলে মিলিত হয় এবং এক হুটোপুটি যুদ্ধ আরম্ভ হয়; নখ দন্তাদি স্বাভাবিক আয়ুধ ছাড়িয়া দিলে সকলেই নিরস্ত্র হইয়া সকলেরই সহিত যুদ্ধ করে।

এই সকল নাগারা 'সেমিশ' নামক ধনদেবতার নিকটে মহিষ-মিথুন, গাভি প্রভৃতি বড়ো পশু বলি দেয় এবং ফসলের দেবতা 'কুচিম্পাই' শুধু ছাগ, মোরগ ও ডিম্ব বলি গ্রহণ করে। এই সকল দেবতাই মরণশীল এবং তাহাদের পরম দেবতা সৃষ্টিকর্তার কোনো ধারণা ইহাদের নাই। এ সম্বন্ধে ইহারা চুলকাটা মিশমির অনুরূপ। অনিষ্টকারী দেবতার মধ্যে 'রাপিয়ারা' প্রদান ; কুকুর ও শূকর বলি দিয়া ইহার তুষ্টিসাধন করিতে হয়। ইহার সহকারী 'কাংনিবা' ভূত অন্ধ ও অতি ক্রুর; কিন্তু সে অন্ধ, মূল্যবান ও সামান্য বলির পার্থক্য নির্ণয়ে অক্ষম বলিয়া তাহাকে অকিঞ্চিৎকর দ্রব্য দিয়া ভুলানো হয়। যখন সমগ্র সমাজের পক্ষ হইতে শুভাশুভ নির্ণয়ের জন্য তুকতাক করা হয় তখন সমগ্র পল্লির সহিত

অপরের সংস্রব নিষিদ্ধ হয়; কেহই তৎকালে গ্রামে প্রবেশ করিতে বা গ্রাম হইতে বাহির হইতে পায় না, এবং দুই দিনের জন্য সকল কার্য বন্ধ থাকে। এই অবস্থানকে 'গেন্না' বলে। যদি নূতন ক্ষেত্রকর্ষণের প্রারম্ভে গেন্না হয়, তাহা হইলে গ্রামস্থ সকল অগ্নি নির্বাপিত করিয়া দেওয়া হয় এবং তৎপরে কাষ্ঠে কাষ্ঠে সংঘর্ষণ করিয়া নূতন অগ্নি উৎপাদন করে; সেই অগ্নিতে একটি মহিষ দগ্ধ করে; মহিষ উৎসর্গ ও ভোজনের পর সেই নবোদ্ভূত অগ্নিতে মশাল প্রজ্জ্বলিত করিয়া সকলে মিলিয়া কর্তিত বন দগ্ধ করিতে যায়।

ইহাদের গৃহের সম্মুখের চাল উচ্চ হয় এবং পশ্চাতের চাল একেবারে ঢালু হইয়া মাটিতে গিয়া ঠেকে। ইহাদের গৃহে উচ্চ পোতা থাকে না। প্রতি গৃহে দুইটা করিয়া কক্ষ থাকে; ইহার একটা শয়নার্থ নির্দিষ্ট থাকে, অপরটা শূকর, মোরগ প্রভৃতির জন্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। প্রত্যেক পরিবারেই পৃথক পৃথক গৃহ থাকে; কিন্তু কুমারদিগের জন্য একটি স্বতন্ত্র গৃহ থাকে, সেখানে শিকারের জয় চিহ্ন সকল এবং যুদ্ধাস্ত্র সমূহ টাঙানো থাকে; এই গৃহই সাধারণ সরাই বা আড্ডারূপে গণ্য হয়।

নাগারা খুব নৃত্যপ্রিয়। সমরতাণ্ডবে পূর্ববর্ণিত প্রথায় যুদ্ধাভিনয় হয় ; অপর এক প্রকার নৃত্যে স্ত্রীপুরুষ একত্র হইয়া নাচে; আর এক প্রকার নাচে শুধু স্ত্রীলোকেরই অধিকার। এই শেষোক্ত নৃত্যই সর্বাপেক্ষা সুন্দর।

ইহারা অলংকার খুব ভালবাসে। বাহুতে পিত্তলের তার জড়ানো ইহাদের এক অসাধারণ অলংকার। এক প্রকার পীতাভ হরিৎ অনচ্ছ পদার্থের মালা ইহাদের খুব প্রিয়; কিন্তু সম্পূর্ণ ইহারই একছড়া মালা কাহারও নাই। পুরুষের এক টুকরা ধুতিই সম্পূর্ণ পরিচ্ছদ; স্ত্রীলোকের নাভি হইতে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা থাকে। বিবাহিতা নারীগণ দীর্ঘকেশ রক্ষা করে ও পশ্চাতে বিনাইয়া রাখে। কুমারীগণ সম্মুখের চুল সামনের দিকে আঁচড়াইয়া ভ্রূ পর্যন্ত রাখিয়া কাটিয়া ফেলে। মণিপুরি কুমারীদিগেরও এই রীতি।

কন্যার জনকজননীকে বিবাহের শুল্করূপে গাভি, শূকর, মুরগি বা সুরা দান করিলেই বিবাহ স্থির হয়। বিবাহ উপলক্ষে একটি ভোজ দেওয়া হয়। যাহারা নিমন্ত্রিত হয় তাহারা নবদম্পতির জন্য একটি গৃহ নির্মাণে সাহায্য করিয়া যায়। স্ত্রীলোকের বংশমর্যাদা বা সৌন্দর্য অপেক্ষা শারীর বলই ইহাদের সমাদৃত, কারণ পুরুষেরা দিব্য অলসভাবে বসিয়া রোদ পোহায় এবং স্ত্রীলোকদিগকে অবিশ্রাম খাটিতে হয়।

নাগারা গাছের গুঁড়ি শূন্যগর্ভ করিয়া তাহাতে শব ভরিয়া গৃহের নিকটেই প্রোথিত করে। সেই কবরস্থান নির্দেশ করিবার জন্য সেস্থানে একখণ্ড বড়ো পাথর রাখা হয় এবং এই সকল পাথরের সংখ্যাবাহুল্য হইতে সেই গ্রামের প্রাচীনত্ব প্রকাশ পায়। মৃত জনের প্রতি শ্রদ্ধাবশত ইহারা গ্রামের প্রতি নিতান্ত আসক্ত হয়।

ইহারা সর্বভুক; ব্যাং, টিকটিকি, সাপ, ইঁদুর, বিড়াল, কুকুর, বানর প্রভৃতি সকল জন্তুই ইহাদের সুখাদ্য। স্বাভাবিকভাবে মৃত জন্তুর মাংস বা হত জন্তুর মাংস ইহাদের নিকট তুল্য উপাদেয়। তাহারা প্রত্যহ ধেনো মদ পান করে। তামাকের নলের মধ্যে যে তামাকের

তেল জমে তাহাও চাঁছিয়া লইয়া জলের সহিত মিশাইয়া পান করে; এই মাদক সেবনের উপায় উহাদের নিতান্ত নিজস্ব।

উত্তর কাছাড়ের পূর্বাংশে অঙ্গামি ও কচু নাগাদের বাস। ইহাদের বিবিধ শাখা পরস্পরের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধলিপ্ত থাকে; কিন্তু এই আন্তর্বিপ্লবের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন দলের রমণীগণ পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে নির্যাতিত হইবার ভয় না করিয়া যাতায়াত করে। কিন্তু ভিন্ন জাতির সঙ্গে যুদ্ধ বাধিলে স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে সশঙ্ক থাকিতে হয়, কারণ অপর জাতির সহিত যুদ্ধের সময় স্ত্রী বা শিশু কাহাকেও শত্রুরা খাতির করে না। অঙ্গামি নাগারা সম্প্রতি বন্দুক ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছে এবং বহু বন্দুকও সংগ্রহ করিয়াছে। তাহাদের জাতীয় অস্ত্র বল্লম ও দা। তাহারা ৩/৪ হাত লম্বা ঢাল বহন করে, এই ঢাল মাদুরের মত কাঠি বুনিয়া প্রস্তুত, ব্যাঘ্র বা ভল্লুক চর্মে আবৃত, এবং ইহার কিনারা ও উর্ধ্ব ভাগ রঙিন ছাগলোম ও পালক দ্বারা ভূষিত হয়।

দোয়াং নদীর পশ্চিমদিকস্থ নাগারা মোটের উপর মণিপুরি বা চিনা শান জাতির জ্ঞাতি বলিয়া বোধ হয়। পূর্বদিকের নাগা ও কুকিরা সিংফো প্রভৃতি জাতির নিকট সম্বন্ধী মনে হয়। ভাষাতত্ত্ব বিচার করিলেও সভ্য মণিপুরি ও বর্বর কুকিদিগকে নিকট আত্মীয় মনে হয়। মণিপুরিদিগের নিজস্ব লিখিত ইতিহাসেও এই কুকিজ্ঞাতিত্ব বিবৃত হইয়াছে। ক্রমশ আমরা জাতিতত্ত্বের এই কৌতুকপ্রদ বিবরণ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।*

* এই প্রবন্ধ কর্নেল ডালটন, সি এস. আই. প্রণীত বঙ্গের জাতিতত্ত্ব (Descriptive Ethnology of Bengal) নামক পুস্তক হইতে সংকলিত হইয়াছে।

প্রবাসী ● ১৩১৪ বঙ্গাব্দ (১৯০৭ খ্রিস্টাব্দ)



নাগারাজ্যে কয়েক বৎসর

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

কোহিমা হইতে বদলি হইয়া যথাসময়ে মককচঙ্গা যাত্রা করিলাম। তৃতীয় দিবসে ডিমাপুর পৌঁছিলাম। রাত্রি দশটার সময় মণিপুর রোড স্টেশনে আসাম আপ মেইল ট্রেন ধরিলাম। ভোর পাঁচটার সময় নকাছাড়ি পৌঁছিলাম। তখনও ফরসা হয় নাই, চতুর্দিক কুয়াশাচ্ছন্ন। ডিসেম্বর মাস শীতে আপাদমস্তক কাঁপিতেছে, কতক্ষণ এদিক ওদিক পায়চারি করিতেছিলাম। স্টেশন মাস্টার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কোথায় যাবেন? বলিলাম, মককচঙ্গা। তখন তিনি বলিলেন, "আপনার জন্য নাগা আসিবে।" উত্তর দিলাম হাঁ। আমি উহাদেরই অনুসন্ধান করিতেছিলাম। কোনো সাড়া না পাইয়া একটা আরাম কেদারায় শুইয়া পড়িলাম। বেলা সাড়ে আটটার সময় চাপরাশি আসিয়া বলিল 'কুলিলোক আয়া' চক্ষু উন্মিলন করিয়া দেখিলাম উলঙ্গজীব সমুদায় আমার লগেজ বাঁধিতেছে। ভয়ের পরিবর্তে বিস্ময় ও কৌতূহল জন্মিল। চটপট সব জিনিস গুছাইয়া আমার প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আপন আপন মোট লইয়া তাহারা চলিয়া গেল। চরালিতে আহারাদি করিয়া পথ চলিতে লাগিলাম। বড়ো সুন্দর দৃশ্য! একদিকে শিবসাগর জেলার সমতল ক্ষেত্র অন্যদিকে নাগাহিলের পর্বতমালা স্তরে স্তরে চলিয়াছে। একদিকে চক্ষু যতদূর যায় শস্যশ্যামলা বিস্তৃত প্রান্তর—অন্যদিকে কানন আকীর্ণ মেঘস্পর্শী অফুরন্ত তরঙ্গায়িত শৈলশ্রেণি। পাঁচ মাইল যাইতে যাইতেই পাহাড় আরোহণ করিতে লাগিলাম। যতই যাইতে লাগিলাম বিষাদ কালিমা হৃদয় ছাইয়া ফেলিল, পাহাড় দর্শনজনিত হর্ষ অপসৃত হইতে লাগিল। একদিকে গগনস্পর্শী অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গ, অপরদিকে অতলস্পর্শী গহ্বর মাঝে অপ্রশস্ত আঁকাবাঁকা রাজপথ বৃহৎ অজগরের ন্যায় পাহাড়ের গা বহিয়া চলিয়াছে। কোথাও বা বন্য হস্তীর পদচিহ্ন ও পুরিষ দেখিয়া গা

কাঁপিয়া উঠে। স্থানে স্থানে এত জঙ্গল যে আলোকমাত্র প্রবেশের উপায় নাই। এরূপ দুর্গম স্থানেও ভগবানের অসীম করুণা পরিস্ফুট রহিয়াছে। কোথাও বা অমৃত প্রবাহস্বরূপ ঝরণা রুক্ষ পাষাণ হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া ক্লান্ত পথিকের তৃষ্ণা দূর করিতেছে। কোথাও বা অযত্ন-সম্ভূত বৃক্ষরাজি সুমিষ্ট ফলভারে অবনত হইয়া রহিয়াছে; শ্রান্ত পথিকের শ্রান্তিবিনোদন করিতেছে। এইরূপে পার্বত্য পথে পাঁচ মাইল চলিয়া একটি উচ্চ পর্বতের পাদদেশে পৌঁছিলাম। ৫ মাইল আকাবাঁকা পথ ঘুরিয়া শৃঙ্গোপরি উঠিতে হয়। এই পাহাড়টি এত উচ্চ যে নিম্নদিকে দৃষ্টিপাত করিলে চক্ষু অন্ধকারময় হয়—মাথা ঘুরিবার উপক্রম হয়। উপরে উঠিতে উঠিতে বক্ষস্থল কম্পিত হইতে থাকে। বহুকষ্টে দুরারোহ্য স্থান অতিক্রম করিয়া অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময় 'লাখুন বাংলাতে পৌঁছিলাম। নকাছাড়ি হইতে ১৮ মাইল দূর।

লাখুনি হইতে 'আউ' নাগার দেশ আরম্ভ হইয়াছে। নাগাজাতি বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত। তন্মধ্যে 'আউ' একশ্রেণি। নাগাজাতি প্রধানত (১) আউ, (২) আঙ্গামি, (৩) সেমা, (৪) লোটা, (৫) রেংমা, (৬) কাঁচানাগা, (৭) কুকিনাগা, (৮) মিরিনাগা ও (৯) মেমিনাগা শ্রেণিতে বিভক্ত। উহারা নাগাহিল, মণিপুর ও ব্রহ্মের সীমান্তে বাস করে। উহাদের ভাষা বিভিন্ন; একজাতি অন্যজাতির ভাষা বুঝে না। তাহাদের প্রচলিত রীতি-নীতিও পৃথক।

মহাভারতের বর্ণিত নাগদেশ বা নাগলোক বর্তমান নাগাপাহাড়ে অবস্থিত তাহার কতক প্রমাণ পাওয়া যায়। 'খনমাতে' নাগকন্যা উলুপীর বাড়ির ভগ্নাবশেষ আজও দৃষ্ট হয়। 'খনমা' কোহিমা হইতে এগারো মাইল দূরে। মানপুর হইতে খনমা পর্যন্ত সুড়ঙ্গ অদ্যপি বিদ্যমান আছে। এই সুড়ঙ্গের পথে বব্রুবাহনের সহিত যুদ্ধে মূর্ছিত ধনঞ্জয়ের চৈতন্য সম্পাদনার্থ নাগলোক হইতে ঔষধি আনীত হয়। এখনও খনমার নাগারা সুড়ঙ্গের নিকট বৎসর বৎসর উৎসব করিয়া তাকে। মণিপুরে সুড়ঙ্গের উপরিস্থ গৃহে প্রাচীন রাজাদের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইত। সুড়ঙ্গের মুখ অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহার ন্যায় দৃষ্ট হয়, কেহ ভয়ে প্রবেশ করিতে সাহস পায় না। 'উষার' নাম অনুসারে 'উখা' নাম হইয়াছে। উখাপাহাড়ে উষার বাড়ির চিহ্ন এখনও আছে। উখাপাহাড়ে একটি সার্ভে-পার্টির পোস্ট আছে। উক্ত পোস্টের নীচে একটি লতা পরিবেষ্টিত দীঘিকা আছে। প্রবাদ আছে একটি শ্বেত ব্যাঘ্র ওই বাড়ি পাহারা দেয়। অনেক নাগা ব্যাঘ্রটিকে দেখিয়াছে, ব্যাঘ্র কাহারও অনিষ্ট করে না। নাগারা উক্ত স্থানকে পরম পবিত্র জ্ঞান করে এবং বৃহৎ প্রস্তরের নিকট পূজা করে। তাহারা কোনো দ্রব্য উক্ত পাহাড় হইতে গৃহে লইয়া যায় না। তাহাদের বিশ্বাস সেখান হইতে কোনো দ্রব্য আনিলে পথ ভুলিয়া যায়। উখা পাহাড়ে এক মহাদেব আছেন, কতদিনের স্থাপিত কেহ বলিতে পারে না। কেহ বলেন 'উযা' মহাদেবের পূজা করিতেন। পবিত্র হৃদয়ে মহাদেব সমীপে মানস করিলে লোক সফলকাম হয়, ইহার অনেক নিদর্শন এখানে অদ্যাপিও আছে। মহাভারতে বর্ণিত প্রমীলার দেশ সেমা ও ব্রহ্মার পাহাড়ের মধ্যবর্তী কোনো স্থান বলিয়া অনুমিত হয়। সকল জাতীয় নাগাদের মধ্যে এরূপ জনশ্রুতি আছে যে মলমি পাহাড়ের নিকট (কোহিমা হইতে ৮০ মাইল দূরে) একটি মেয়ে গ্রাম আছে। সেখানে কেবল মেয়েমানুষ বসতি

করে। প্রবাদ আছে কোনো পুরুষলোক সেখানে যাইতে পারে না। যদি কেহ গ্রামের নিকটস্থ হয়, চতুর্দিক ঘনঘটাচ্ছন্ন হয় এবং মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে থাকে পথিক পথ না পাইয়া ফিরিয়া আসে। সেখানে মেয়েরা গৃহে বড়ো বড়ো কৌটায় মৌমাছি পুরিয়া রাখে, কোনো লোক গ্রামের সন্নিকটস্থ হইলে মৌমাছি ছাড়িয়া দেয়, প্রাণ ভয়ে লোক পলাইয়া যায়। গ্রামসংলগ্ন একটি স্থান আছে, সেখানে এক প্রকার 'হাওয়া' চলে তাহাকে নাগারা 'দেও' বলে। স্ত্রীলোকেরা সেখানে গেলে গর্ভবতী হয়। প্রসবান্তে মেয়ে সন্তান যত্নে প্রতিপালন করে, পুত্র সন্তান হত্যা করে।

প্রত্যেক নাগা গ্রাম একটি সুরক্ষিত দুর্গ বিশেষ। অত্যুচ্চ পর্বত শৃঙ্গোপরি নিরেট পাথরের উপর তাহাদের গ্রাম অবস্থিত। এবং রুক্ষ পাষাণের উপর গৃহ নির্মাণ করে গ্রামে একটি তৃণও জন্মে না। প্রত্যেক গ্রামের চতুর্দিকে বিস্তৃত ও গভীর পরিখা। বর্তমানে অনেক পরিখা ভরিয়া গিয়াছে কিন্তু তাহার চিহ্ন সর্বত্রই বিরাজিত। বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে গ্রাম রক্ষার্থ তাহারা এই পরিখা খনন করিত। সদাশয় ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট নাগাহিলে আসিবার পূর্বে গ্রামে গ্রামে মারামারি কাটাকাটি সর্বদা ঘটিত। পরিখার চতুর্দিকে বাঁশ ও কাষ্ঠ নির্মিত বৃহৎ প্রাচীর ছিল এক প্রান্তে বৃহৎ সিংহদ্বার তথায় কাষ্ঠনির্মিত প্রকাণ্ড দরজা। সিংহদ্বারের উপর একটি ঘর আছে উহাই গ্রামে প্রবেশ লাভ করিবার রাস্তা। প্রাচীরের চতুর্দিকে এবং সিংহদ্বারে সর্বদা পাহারা থাকিত। পরিখাতে অসংখ্য বংশ নির্মিত লাঠি পুঁতিয়া রাখিত যেন শত্রুসেনা সহজে আক্রমণ করিতে না পারে।

আউদের গ্রাম খুব বড়ো হাটের বৃহৎ বৃহৎ গলির ন্যায়। গৃহগুলি পরস্পর সংলগ্ন গ্রামের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত অসংখ্য রাস্তা দুই পার্শ্বে গৃহের সহিত গৃহ মিশিয়া অসংখ্য গৃহ-শ্রেণি চলিয়াছে। গ্রামের লোকাধিক্য অনুসারে কোথাও দুই, তিন বা ততোধিক গলি অবস্থিত। প্রত্যেকের একখানা গৃহ।

গ্রামে উঠিবার সংকীর্ণ অত্যুচ্চ নাগাপথ। বর্তমানে কোনো কোনো গ্রাম সরকারি রাস্তার উপরে অবস্থিত। নাগারা সরকারি সোজা রাস্তায় চলিলে পায় ব্যাথা করে বলিয়া থাকে। তাহারা বন্ধুর রাস্তায় চলিতেই অভ্যস্ত।

বিভিন্ন জাতীয় নাগারা বিভিন্ন প্রকার গৃহ নির্মাণ করে। কিন্তু সকল গৃহই খড় নির্মিত ও দুই চালবিশিষ্ট। আউদের গৃহ দেখিতে একটি স্টিমারের ন্যায়। গৃহের প্রস্থ দিক রাস্তার উপর অবস্থিত এবং উহাই আউ গৃহের সম্মুখে একটি দরজা এবং সাধারণ গৃহের মতো। গৃহে প্রবেশ করিয়াই ৮/১০ হাত দীর্ঘ ভিত্তিহীন খোলা জায়গা ইহা গৃহের ১ম প্রকোষ্ঠ এবং চতুর্দিকে মৃত্তিকা হইতে গৃহের চাল অবধি বাঁশের বেড়া। তৎপর সমস্ত গৃহব্যাপী ৩/৪ হস্ত উচ্চ বাঁশের মাচান এবং উক্ত মাচান গৃহের পশ্চাতে খোলা জায়গায় ১০/১২ হাত পর্যন্ত বিস্তৃত। পশ্চাৎ দিকের মাচান ভূমি হইতে ১০/১২ হাত উচ্চ এবং বাঁশের খুঁটির উপর স্থাপিত। গৃহের দৃশ্য সম্মুখে এবং পশ্চাতে দ্বিবিধ। দূরে পশ্চাৎ দিক হইতে গৃহ দেখিতে স্টিমারের ন্যায়। মাচানের চতুর্দিকে বাঁশের বেড়া সহযোগে উঠিবার সিঁড়ি ও দরজা এবং পশ্চাৎভাগে উন্মুক্ত স্থানে একটি ক্ষুদ্র দরজা

আছে। গৃহখানিতে দুইটি প্রকোষ্ঠ ও একটি উন্মুক্ত বারান্দায় বিভক্ত। মাচানের মধ্যস্থলে ৪ হাত চতুষ্কোণ জায়গা ফাঁক নিয়ে মৃত্তিকার বেদি মাচান পর্যন্ত উন্নত। উক্ত মৃত্তিকার উপর দিবারাত্রি ২৪ ঘণ্টা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত থাকে তাহাতে প্রস্তর খণ্ডোপরি আহার্য পরিপক্ক হয়। ভিতরে প্রবেশ করিলে ইঞ্জিন ঘরের মত বোধ হয়। স্ত্রীলোকেরা কখনও উহার পার্শ্বে বসিয়া সুতা কাটে, বস্ত্র বয়ন করে কখনও বা পশ্চাতে উন্মুক্ত বারান্দায় (মাচান) বসিয়া কাজ করে। অগ্নির চতুর্দিকে মাচানের উপর এক এক খণ্ড বৃহৎ কাষ্ঠের উপর তাহারা নিদ্রা যায়। তাহাদের শীত বস্ত্র নাই বলিলেই হয়, অগ্নির নিকট থাকার দরুন শীত কম বোধ হয়। অগ্নি ভিন্ন নাগারা থাকে না, রাত্রে নাগা পথিকেরা রাস্তায় অগ্নি জ্বালাইয়া শুইয়া থাকে। গৃহে অগ্নির চতুষ্পার্শ্বে দ্বিতল বিশিষ্ট ক্ষুদ্র মাচান উক্ত মাচানে কাঁচা মাছ, মাংস শুকাইয়া থাকে। এত দুর্গন্ধ বাহির হয় যে ভিতরে থাকা অসম্ভব। ঘরের বারান্দায় ধান, কলাই, তামাক পাতা ইত্যাদি রোদে শুকায়। গৃহের নিম্নে মাচানের নীচে গোরু, মিথুন প্রভৃতি থাকে। মিথুন সচরাচর জঙ্গালে থাকে কখনো-কখনো ঘরে থাকে। ঘরের প্রথম প্রকোষ্ঠে মোরগ, শূকর এবং কুকুর প্রভৃতি থাকে এবং উক্ত প্রকোষ্ঠে স্ত্রীলোকেরা ধান ভানিয়া থাকে। বৃহৎ কাষ্ঠে কতকগুলি গভীর ছিদ্র করিয়া লয় উহাই তাহাদের উদুখল। দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠ অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন। যাবতীয় আসবাব উক্ত ঘরেই রক্ষিত হয় এবং শয়ন ভোজন উহাতেই সম্পাদিত হয়। তাহাদের ধান ঘর পৃথক। গ্রামের নীচে বা এক পার্শ্বে পৃথক পৃথক ছোটো ছোটো ঘরে মাচান বাঁধিয়া বাঁশের বৃহৎ ঝুড়িতে ধান রাখে। আবশ্যক মতো বাহির করিয়া লয়। কেহ কখনও অন্যের ধানে হস্তক্ষেপ করে না।

বিবাহ করিলেই পৃথক ঘর নির্মাণ করে এবং পিতা-মাতার থেকে পৃথক হইয়া পড়ে। পিতা-মাতা না থাকিলে বিবাহকাল পর্যন্ত ভাইবোন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত একত্র থাকে। বিবাহের সময় পিতা প্রত্যেক পুত্রকে কতক জমি পৃথক করিয়া দেয়। পুত্র সস্ত্রীক কৃষিকার্য করিয়া জীবিকা নির্বাহের বন্দোবস্ত করে। পুত্রকন্যা অবিবাহিত কাল পর্যন্ত পিতার ঘরে কাজকর্ম এবং আহারাদি করে কিন্তু তাহারা পূর্ণ বয়স্ক হইলে ভিন্ন স্থানে রাত্রিযাপন করে। অবিবাহিত যুবকেরা যে স্থানে রাত্রিযাপন করে উহাকে "মরম" কহে। সমস্ত নাগা গ্রাম বিভিন্ন 'কেলে' অর্থাৎ পাড়ায় বিভক্ত। সমস্ত কেলের যুবকদের জন্য পৃথক "মরম" আছে। বালকেরা ১০/১২ বৎসর বয়সের সময় "মরমে" রাত্রি যাপন আরম্ভ করে। "মরমে" যাহারা থাকে নাগারা আসামী কথায় উহাদিগকে "মরম গোলাম" বলে।

"মরম" সমস্ত কেলের এক এক পার্শ্বে অবস্থিত এবং অন্যান্য ঘর হইতে পৃথক। "মরম" সাধারণ নাগা ঘর হইতে আকারে অনেক বৃহৎ ও নানাবিধ কারুকার্য বিশিষ্ট। সমস্ত "কেলের" অধিবাসীবৃন্দ "মরম"কে গৌরবের চক্ষে অবলোকন করিয়া থাকে ও আপনাদের সাধ্যানুসারে উহা বিভূষিত করে। মরমের সম্মুখভাগ খোলা ভূমিতে বৃহৎ বৃহৎ কাষ্ঠাসন, সম্মুখে মিথুন, গোরু, হরিণ ইত্যাদির মস্তক চতুর্দিকে স্তূপাকারে রাখে। বাঘ, ভল্লুক, মিথুন, সাপ ও নানাবিধ প্রাণীর চিত্র কাষ্ঠফলকে চিত্রিত করিয়া ঘরের সম্মুখের বেড়ার সহিত বাঁধিয়া রাখে। দ্বিতীয় কোঠায় বৃহৎ মাচানের চতুপার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উচ্চ মাচান তাহাতেই

মরম গোলামেরা রাত্রিযাপন করে। তৃতীয় প্রকোষ্ঠ গৃহের সর্বপশ্চাতে অবস্থিত; উহাতে মলমূত্র ত্যাগ করে, এত দুর্গন্ধময় যে দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করা অসম্ভব। "মরমে" সাধারণ নাগা ঘরের ন্যায় পশ্চাৎ দিকে উন্মুক্ত বারান্দা নাই। "মরমে" অবিবাহিতা বালিকারা যাইতে পারিবে না। সমস্ত কেলের বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদিগের ঘরে বয়স্থা বালিকারা বিবাহের পূর্বকাল পর্যন্ত অবস্থান করে। সেই সকল ঘরকে "রাঙ্গুলি চাঙ" (অবিবাহিতা বালিকাদের থাকিবার ঘর) কহে। সেস্থানে যুবকেরা রাত্রি যাপন করিতে পারে। যুবক যুবতির অবাধ মিলন প্রথা আছে। আউ পিতা-মাতা মেয়েদের চরিত্রের উপর কোনো দৃষ্টি রাখে না। বালিকারা ইচ্ছামত কোর্টশিপ করিয়া স্বামী নির্বাচন করে এবং তাহারা সতীত্বের মর্যাদা করে না।

সৌরভ ● শ্রাবণ ১৩৩৩ (১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ)



নাগা রাজ্যের অভিজ্ঞতা

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

নাগারা খুব মাংস প্রিয়। পুরুষেরা সাপ ও বাঘ ব্যতীত হাতি, ভল্লুক, বানর, কুকুর, মিথুন, শূকর (বন্য ও গৃহপালিত), গোরু, মোরগ, হরিণ এবং নানাবিধ পাখি ও মাছ খাইয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা মোরগ, গৃহপালিত শূকর ও মাছ খাইয়া থাকে। মাছ, মাংস জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া কিংবা আগুনে পোড়াইয়া লবণ ও লংকার সহিত খায়। বনের নানাবিধ পাতা জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া খায়। ভাত উহাদের প্রধান খাদ্য। মাছ এবং মাংস অগ্নির উত্তাপে শুকাইয়া গৃহে রাখিয়া দেয়। লবণ ও ঝাল খুব বেশি খায়। নাগা-মধু তাহাদের সর্বপ্রধান পানীয়। নাগা-মধু নাগাদের প্রস্তুত মদ্য বিশেষ। মধু নানাপ্রকার, তন্মধ্যে "রুহি" সর্বাপেক্ষা উপাদেয়। ভাত ও কোনো বন্য বৃক্ষের পাতার রসের সংমিশ্রণে মধু প্রস্তুত করে। 'লাউ' এবং বাঁশের "চোঙা" মধুর পাত্ররূপে ব্যবহৃত হয়। গৃহে কোনো অতিথি উপস্থিত হইলে প্রথমে তাহাকে মধু দ্বারা সংবর্ধনা করে। উহারা যেখানে যায় সঙ্গে ভাত, মাংস ও মধু লইয়া যায়। ক্ষুধা পাইলেই খায়। অধুনা সকলেই সিগারেট খাইতে শিখিয়াছে। অল্প মূল্যের সিগারেট নাগা হিলের সর্বত্র প্রচলিত হইযাছে। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই সিগারেট খায়। তামাক পাতা (সাদা) আউদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত এবং উহা তাহাদের প্রিয় সামগ্রী। তামাক পাতা গুঁড়া করিয়া নিজেদের প্রস্তুত কাষ্ঠ কিংবা বাঁশ নির্মিত পাইপে অগ্নি সংযোগে টানিয়া থাকে। কখনও বা শুধু পাতা মুখের ভিতর পুরিয়া রাখে, কখনও বা পানের সহিত ব্যবহার করে। আউনাগারা পানের সহিত কোনো বৃক্ষ বিশেষের ছাল তাম্বুলের ন্যায় ব্যবহার করে। এক টুকরা তামাক পাতা কিংবা একটি সিগারেট দিলে স্ত্রী, পুরুষ সকলেই অত্যন্ত খুশি হয়। রাস্তায় চলিতে প্রায়ই তাহা চাহিয়া থাকে। কখনও দুগ্ধ পান করে না। যাহারা নদীর ধারে বাস করে তাহারা মৎস্য ধরিতে

অভ্যস্ত, তাহারা বিষ প্রয়োগে মাছ মারে। এক প্রকার বৃক্ষের পাতা, এবং বীচির রস স্রোতজলে মিশায় তাহাতে মাছ মরিয়া ভাসিয়া উঠে। উক্ত রস, রসমিশ্রিত পানীয় জল এবং উক্ত রসের মৃত মাছ মানুষের পক্ষে বিষাক্ত নহে।

ইহাদের বিবাহ পদ্ধতিও অভিনব। সাধারণত যুবকদের ২০/২৫ এবং যুবতিদের ১৮/১৯ বৎসরের মধ্যে বিবাহ হইয়া থাকে। বিবাহিত দম্পতি প্রায়ই সমবয়সী হইয়া থাকে। কোর্টশিপের নিয়ম আছে। বিবাহের পূর্বে প্রায় ছয় মাস হইতে তিন বৎসর পর্যন্ত কোর্টশিপ চলে। কাহারও পাঁচ বৎসর পর্যন্ত কোর্টশিপ হয়। দীর্ঘকাল কোর্টশিপের পর একে অন্যের মনঃপূত না হইলে বিবাহ সম্পন্ন হয় না। আউদের মধ্যে কোর্টশিপ ভিন্ন কখনও বিবাহ হয় না। কোর্টশিপের সময় যুবক যুবতি স্বামী-স্ত্রীর ন্যায় পরস্পরের প্রতি ব্যবহার করে। কোর্টশিপের সময়কে আসামী ভাষায় উহারা "সাথি" করা বলে। দীর্ঘকাল কোর্টশিপের পর যুবক যুবতির বিবাহ না ঘটিলে উহা নিন্দনীয় নহে। প্রথম সাথিদের ছাড়াছাড়ি হইলে তাহারা দ্বিতীয় সাথি গ্রহণ করে। কোনো কোনো যুবতির বিবাহের পূর্বে ১০/১২ জন যুবকের সহিত কোর্টশিপ হইয়া থাকে। কাহারও একজন যুবকের সহিত কোর্টশিপ হইয়া বিবাহ হয়। বিবাহের পূর্বে কোর্টশিপ অবস্থায় যদি কোনো যুবতির গর্ভসঞ্চার হয় তবে সেই যুবককে যুবতির পাণিগ্রহণ করিতে হয়। যুবক পাণিগ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে নবজাত শিশুর খরচ পাঁচ বৎসর কাল পর্যন্ত বহন করিতে হয়। পাঁচ বৎসর পর শিশুকে যুবক পাইবে। কোর্টশিপ পিতামাতার অগোচরে সম্পন্ন হয়, দীর্ঘকাল কোর্টশিপ হইলে পিতামাতা জানিতে পারে। কোর্টশিপের পর বিবাহের ইচ্ছা হইলে যুবক আপন পিতামাতাকে জানাইবে। সর্বপ্রথম যুবকের পিতা যুবতির পিতাকে ৪/৫টা মাছ পাঠাইবে। ইহাই বিবাহের মঙ্গলাচরণ। মাছ দেওয়ার পর যুবক অন্য যুবতির সহিত এবং যুবতি অন্য যুবকের সহিত প্রণয় প্রকাশ করিতে পারিবে না। যে নিয়ম লঙ্ঘন করিবে তাহাকে জরিমানা দিতে হইবে। যুবক যুবতির ইচ্ছা হইলে জরিমানা দেওয়ার পরও বিবাহ হইতে পারে। মাছ দেওয়ার অব্যবহিত পরেই যুবকের পিতা যুবতির পিতাকে পাঁচ খাঙ ধান ও একটি খুব ভাল দাও পাঠাইয়া দিবে। ওই দিন খুব পরিষ্কার থাকিবে ও গ্রামের কাহারও মৃত্যু না ঘটে তাহা দেখিবে। ইহাই তাহাদের শুভ দিন। ধান দেওয়ার ৪/৫ দিন পরে যুবক তাহার পিতৃদত্ত অর্থে, গ্রামের একই জাতীয় লোকদের সাহায্য লইয়া আপনার গৃহ নির্মাণ করিবে। গৃহ প্রস্তুতের পর তিন দিন পর্যন্ত গৃহের আসবাব ইত্যাদির বন্দোবস্ত করিবে। চতুর্থ দিনে যুবতির মা ও তাহার স্বজাতীয়া ১০/১২ জন মেয়ে সমভিব্যাহারে যুবতিকে লইয়া যুবকের নূতন গৃহে আসিবে। যুবকের সহিত তাহার মা, তাহার জাতীয় স্ত্রীপুরুষ সকলেই আসিবে। যুবক যুবতির পিতার আসিবার নিয়ম নাই। উভয়পক্ষীয় সমাগত লোকদিগকে ভাত, মাংস ও মধু খাইতে দিবে। আহারাদির পর বরপক্ষীয় কোনো বৃদ্ধ পুরুষ একটি মুরগি লইয়া বরের মুখের নিকট ধরিয়া মন্ত্র পড়িবে। মন্ত্রের বিষয় এই—"তোমরা দীর্ঘজীবী হও, সুখে থাক, তোমাদের গৃহে যেন কোনো গোলমাল না ঘটে। তোমরা পুত্র কন্যার মুখ দর্শন কর।" মন্ত্রোচ্চারণের পর গৃহের বাহিরে মুরগিকে হত্যা করা হইয়া থাকে। বর-কন্যা ব্যতীত সকলেই উহার মাংস খায়। ওই দিন বর-কন্যা গৃহের বাহির হইতে

পারিবে না। সমাগত লোকদের অনেকেই বরের গৃহে রজনী যাপন করে। বিবাহের পর ৭ দিন বর-কন্যা একত্র শয়ন করিবে না। বিবাহের পর দিবস বর-কন্যা একত্রে কাঠ কাটিতে বাহির হয়। এক সঙ্গে একাধিক বিবাহের রীতি নাই। Divorce (ডাইভোর্স) প্রচলিত আছে এবং সর্বদাই ঘটিয়া থাকে। ডাইভোর্সের পর দ্বিতীয় স্ত্রী কিংবা দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করা যায়। সাধারণত স্বামী স্ত্রীর উচ্ছৃঙ্খলতার দরুন, স্ত্রীর বন্ধ্যাত্বে ও কলহপ্রিয়তার দরুন ডাইভোর্স ঘটিয়া থাকে। যে দোষী সে ক্ষতিপূরণের দায়ী থাকিবে। স্ত্রী দুশ্চরিত্রা কিংবা কলহপ্রিয়া হইলে স্বামী তাহাকে পরিত্যাগ করিবে এবং স্বামীর কোনো জিনিস সে প্রাপ্ত হইবে না। সন্ততি থাকিলে স্বামী রাখিয়া দিবে। দুগ্ধপোষ্য শিশু থাকিলে ৫ বৎসর পর্যন্ত স্ত্রী প্রতিপালন করিবে কিন্তু স্বামী খোরাকির জন্য দায়ী থাকিবে না। স্ত্রী বন্ধ্যা বলিয়া স্বামী তাহাকে পরিত্যাগ করিলে স্বামীর শূকর, মুরগি, ধান এবং গৃহের আসবাবের অর্ধেক স্ত্রী পাইবে। স্বামী দুশ্চরিত্র বলিয়া স্ত্রী তাহাকে পরিত্যাগ করিলে স্বামীর শূকর, মুরগি, ধান ও গৃহের সমস্ত আসবাব স্ত্রী পাইবে। স্বামীর গৃহ এবং জমিতে স্ত্রীর অধিকার নাই।

মৃতদেহের ব্যবস্থা : ধনীর মৃতদেহ গৃহ প্রাঙ্গণে এবং দরিদ্রের মৃতদেহ গৃহের সম্মুখস্থ প্রকোষ্ঠে উচ্চ মাচান বাঁধিয়া তদুপরি স্থাপিত রাখে। স্ত্রীলোক হইলে ৫ দিন, পুরুষ হইলে ৬ দিন রাখিতে হয়। ছেলেমেয়ে সম্বন্ধেও একই নিয়ম। নির্দিষ্ট দিন পরে মৃতদেহ শ্মশানে নীত হয়। আউদের শ্মশান গ্রামের নীচে রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত। সেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দু-চাল-বিশিষ্ট খড়ের ঘর ভিতরে উচ্চ মাচান চতুর্দিকে সাধারণ বেড়া। প্রত্যেক মৃতদেহের জন্য এক একটি স্বতন্ত্র গৃহ। প্রত্যেক মৃতদেহের জন্য নূতন গৃহ নির্মিত হয়। তৎপর নির্দিষ্ট দিনে শ্মশানে নীত, মৃতদেহ মাচান উপরি শায়িত অবস্থায় স্থাপন করে। আউয়েরা প্রকৃতপক্ষে মৃতদেহ শুকায়। অবস্থানুযায়ী কেহ কেহ শব-রক্ষিত গৃহের মাচানের চতুর্দিকে নানাবিধ কারুকার্যবিশিষ্ট নাগা জাঠি, দাও, কিংবা বাঁশ ও কাষ্ঠ ফলকে নানাপ্রকার জীব জন্তুর চিত্র অঙ্কিত করিয়া ঝুলাইয়া রাখে। এবং অবস্থানুযায়ী নানাবিধ পোশাক শবদেহে পরাইয়া দেয়। "মিনেনরি" (minenri)-কে আসামী কথায় আপথিয়া কহে। আপথিয়া অপঘাত হইতে উৎপন্ন। যাহারা গাছ হইতে পড়িয়া মরিয়া যায়, যাহারা জলে ডুবিয়া মরে, যাহাদিগকে বাঘে মারে, যে সকল স্ত্রীলোক সন্তান প্রসবকালীন মরে তাহাদিগকে আউনাগারা মিনেনরি কহে। তাহাদের সৎকারের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। মিনেনরিদের মৃতদেহ একদিনও গৃহে রক্ষিত হয় না। মৃত্যুর দিনই তাদের মৃতদেহ শব-রক্ষিত স্থানে নীত হয় এবং গ্রামের বৃদ্ধ স্ত্রীপুরুষেরাই উহাদের মৃতদেহ বহন করে। মিনেনরিদের গৃহের লোক ৪/৫ দিন গৃহের বাহির হয় না : এবং শবের অনুগমনও করে না। কেবল জল আনয়নার্থে দিনে একবার বাহিরে যায় এবং ৫ দিন গৃহে থাকিয়া গৃহ রক্ষিত মিথুন, গোরু, শূকর, মোরগ ইত্যাদি খায়। ৬ষ্ঠ দিবসে কোনো বৃদ্ধা স্ত্রীলোক তাহার দরজার সম্মুখীনা হইয়া ভিতরে একখণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করে, তৎক্ষণাৎ গৃহবাসীরা গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। এইরূপ নির্গমনকে নাগারা গৃহ হইতে পলায়ন করা বলে। গৃহ পলায়িত লোকেরা গ্রামপ্রান্তে ক্ষুদ্র কুটির প্রস্তুত করিয়া একমাস অবস্থান করে। গ্রামের লোকেরা তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র ও এক মাসোপযোগী চাউল, লবণ, লংকা ইত্যাদি খাদ্যাদি সংগ্রহ করিয়া দেয়। একমাস

পর্যন্ত উহারা কোনো কাজে বাহির হয় না এবং গ্রামের লোকেরা উহাদের সঙ্গো বাক্যালাপ করিতে পারে না। গ্রামের লোকেরা যে স্থান হইতে পানীয় জল আনয়ন করে, উহারা তথায় যাইতে পারিবে না ; ভিন্ন স্থানের জল পান করে। একমাস অন্তে উহারা কাজে গমন করিবে এবং নূতন গৃহ নির্মাণ করিবে। উহাদের পরিত্যক্ত গৃহ, আসবাব, টাকা-কড়ি, বস্ত্রালংকারাদি যাবতীয় জিনিস কেহ লইবে না এবং স্পর্শও করিবে না। আউ ভিন্ন অন্য জাতীয় লোকে লইতে পারে। সাধারণত পরিত্যক্ত সম্পত্তি সেমারা লইয়া থাকে। মিনেনরিদের মৃত্যু উপলক্ষ্যে গ্রামে তিন দিন গেনা নির্দিষ্ট আছে। উক্ত তিন দিন কেহ কাজে বাহির হইবে না কেবল জল আনিবার জন্য একবার বাহির হইবে এবং তৃতীয় দিবসে কাষ্ঠ সংগ্রহার্থ বহির্গত হইতে পারে। মিনেনরি ব্যতীত অন্য লোকের মৃত্যু হইলে গ্রামে দুই দিন গেনা নির্দিষ্ট আছে—যে দিন মরিবে এবং যে দিন মৃতদেহ শব-রক্ষিত স্থানে নীত হইবে। উক্ত দুইদিন কেহ কোনো কাজ করিতে পারিবে না এবং গ্রামের বাহিরে যাইবে না। আউদের বিশ্বাস গেনার দিনে কাজ করিলে গ্রামের লোকদের অকল্যাণ ঘটিবে।

সৌরভ ● ভাদ্র ১৩৩৩ (১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ)



কুকিদিগের বিবরণ

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার

বাঙ্গালার পূর্ব প্রান্তে—আসাম ও মণিপুর, চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার মধ্যে যে অরণ্যানী সুবিস্তৃত ভূমিখণ্ড বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, সেই বিস্তৃত অরণ্যে কুকিজাতির বাস। এই জাতির স্বভাব অতিশয় ভয়ংকর। ইহারা নগ্ন দেহে বিচরণ করে, সেইজন্য ন্যাংটা কুকি বলিয়াও অভিহিত হইয়া থাকে। কোনো কোনো য়ুরোপীয় ভ্রমণকারী ইহাদিগকে ভারতের আদিম অসভ্য অধিবাসী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সভ্যতালোক প্রবেশ করিবার পূর্বে সমগ্র ভারতভূমি এইরূপ অসভ্য বর্বর জাতির আবাসভূমি ছিল, ইহাও বলিতে অনেকে কুণ্ঠিত নহেন!

এই কুকিজাতি অনেক বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা, রংকুল (Rangkul) খেল্‌মা, বেচ, ছোটি, আইমোন, বংলং, পুরুম, মন্তক, কোম, কোইরে, চংসেন, (Changsen) শিমন, চুৎল, পই, শক্তি, তৌতি, লুসাই, খোংজই ইত্যাদি। ইহাদিগের মধ্যে যাহারা অপেক্ষাকৃত দুর্বল, পার্বত্য হিংস্র কুকিদিগের সহিত কলহ বিবাদে সম্পূর্ণ অসমর্থ, তাহারা নিম্নভূমিতে আসিয়া বাস করিতেছে। আসাম, শ্রীহট্ট এবং ত্রিপুরার জঙ্গলবর্জিত সমতল ভূমিতে এই সকল কুকির সংখ্যা বিরল নহে। ইহারা কাপড় পবিতে জানে এবং কতকটা প্রাদেশিক শাসনের অনুগমন করিয়া থাকে।

কুকিদিগের এক এক শ্রেণিতে বহুসংখ্যক দল বা সমাজ আছে। দলের কর্তাকে "লাম" বলে এবং সমস্ত দলের অধিনায়ককে 'প্রথম' বলে। তিব্বতীয়েরা তাহাদিগের দলের অধিনায়ককে 'লামা' বলে। সম্ভবত এই "লাম" শব্দ 'লামা' শব্দেরই অপভ্রংশ মাত্র।

কুকিরা মগদিগকে তাহাদের এক পিতার সন্তান বলিয়া মনে করে। তাহারা বলে, তাহাদিগের আদিপুরুষের দুই স্ত্রীর গর্ভে মগ ও কুকি নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হয়। কুকি-

জননী, কুকির শৈশবকালেই কালগ্রাসে পতিতা হয়, এবং তাহারা বিমাতা কর্তৃক প্রতিপালিত হইতে থাকে। বিমাতা সকল জাতিরই একরূপ। সে মগকে কাপড় পরিতে, ভালো খাইতে ও থাকিতে দিয়াছিল, কুকিকে ন্যাংটা বলে তাড়াইয়া দিয়াছিল ইত্যাদি।

বিগত লুসাই যুদ্ধের পর হইতে, কুকিদিগের দুর্ধর্ষতা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। শতাধিক বৎসর পূর্বেকার এই ভয়ংকর জাতির আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি আলোচনা করিলে, মনে যুগপৎ ভয়ের সঞ্চার হয়, শরীর শিহরিয়া উঠে। আমরা বর্তমান প্রবন্ধে সেই প্রাচীন কাহিনিরই আলোচনা করিব।

কুকিগণ, এই বিশ্বসংসারের একজন স্রষ্টা আছেন, ইহা স্বীকার করে। এবং সেই স্রষ্টা প্রতি বৃক্ষে, সর্বক্ষণ বিরাজ করে, ইহাও তাহাদিগের বিশ্বাস। চন্দ্র, সূর্যকেও তাহারা দেবতা বলিয়া মনে করিয়া থাকে। কিন্তু তাহারা ক্ষুদ্র দেবতা। ক্ষুদ্র দেবতার উপাসনাতেও যে জগৎপিতা পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা তাহারা বিশ্বাস করে।

ইহারা হিংস্র বন্য পশুর ন্যায় একে অন্যকে হিংসা করিয়া থাকে। যদি কোনো কুকি অপর কোনো কুকির প্রাণসংহার করে, তবে দলের প্রধান ব্যক্তি, বা মৃত ব্যক্তির নিঃসম্পর্কীয় কেহ উক্ত অপরাধের জন্য হত্যাকারীর দণ্ডবিধান করিতে পারে না। মৃত ব্যক্তির ভ্রাতা বা ওয়ারিশ হত্যাকারীর দণ্ডবিধান করিতে অধিকারী। তাহার ইচ্ছানুযায়ী দণ্ডবিধান উদ্যোগে কাহারও বাধা প্রদান করিবার ক্ষমতা নাই।

যদি কোনো ব্যক্তি চৌর্য অপরাধে বা অন্য কোনো দোষজনক অপরাধে অপরাধী হয়, তবে প্রধান বা 'প্রথম' ব্যক্তি তাহার যথোপযুক্ত অর্থদণ্ড করিয়া দণ্ডিত অর্থদ্বারা বাদীকে সন্তুষ্ট করতঃ উভয়ের মধ্যে সন্ধি সংস্থাপন করাইয়া দেন। অবশ্য এরূপ ব্যাপারে প্রধান ব্যক্তিও তাঁহার প্রাপ্যস্বরূপ দণ্ডিত মুদ্রা হইতে অংশগ্রহণ করিয়া থাকেন। বাদী-বিবাদীর মীমাংসার পর উভয় পক্ষের সমাজও উভয় হইতে দণ্ড ও পুরস্কার স্বরূপ দুইটি ভোজ পাইয়া থাকে। বরাহ মাংস এবং অন্যান্য অভিলষিত মাংস ও মদিরা দ্বারাই সে নিমন্ত্রণ সম্পাদিত হইয়া থাকে।

শত্রুপক্ষীয় রমণীর প্রতি কুকিদিগের ক্রোধ সর্বাপেক্ষা অধিক। শত্রু পরিবারের রমণীদিগের শিরশ্ছেদন তাহারা জীবনের প্রধান কার্য বলিয়া মনে করে। অতি প্রাচীনকালে কুকিদিগের মধ্যে এরূপ নারীহত্যার জঘন্য রীতি প্রচলিত ছিল না। ঘটনাক্রমে তাহা প্রচলিত হইয়াছে।* নারী হত্যারও ইতর বিশেষ আছে। রমণী যদি গর্ভবতী হয়, তবে তাহার হত্যাকার্য আরও অধিকতর উৎসাহের সহিত সম্পাদিত হইয়া থাকে। অনেক সময় গর্ভবতী রমণীকে আটক করিয়া রাখা হয় এবং সন্তান প্রসব হইলে, প্রসূত সন্তানের সহিত জননীর একত্রে শিরশ্ছেদন করা হইয়া থাকে। এইরূপ হত্যা ও গর্ভবতী রমণী হত্যাতে

* প্রবাদ আছে, কোনো রমণী ক্ষেত্রে আসিতে বিলম্ব হওয়ায় অপরা তাহাকে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করে। রমণী উত্তরে বলে, তাঁহার স্বামীর যুদ্ধগমনের উদ্যোগ করিয়া দিতে ও তাহার আহারাদি প্রস্তুত করিয়া দিতে তাহার বিলম্ব হইয়াছে। এই উভয় রমণীর কথোপকথন ঘটনাক্রমে শত্রুপক্ষের কর্ণগোচর হয়। ইহা হইতেই তাহারা শত্রু-রমণী হত্যাকে শত্রু-দমনের প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া মনে করে।

একেবারে দুইটি শত্রু নিপাত হয় বলিয়া কুকিগণ অধিকতর আমোদিত হয়। যদি কোনো কুকি শত্রুগৃহ আক্রমণ করিয়া সন্তানসহ একটি রমণীর মস্তক আনয়ন করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে সে একাধিক শত্রু নষ্ট করিয়াছে বলিয়া সমাজে বিশেষ সম্মান লাভ করিতে পারে।

কোনো কুকি-যুবকের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইলে, সে তাহার ভাবী শ্বশুর শাশুড়িকে নিজ বাড়িতে আনয়ন করে এবং ৪/৫টি গয়াল* উপঢৌকনস্বরূপ প্রদান করে। পাত্রীর পিতামাতা ওই গয়ালগুলি বধ করে এবং পাত্রের পিতামাতা ও আত্মীয়কুটম্বকে নিমন্ত্রণ করিয়া ওই গয়াল-মাংস দ্বারা ও অন্যান্য চর্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয় সামগ্রী, প্রধানত মদিরা দ্বারা আমোদআহ্লাদ সহকারে বৈবাহিক ভোজন সমাপন করে। এখানে পাত্রের অবস্থানুসারেই পান ভোজনের তারতম্য হইয়া থাকে।

নিজ গর্ভধারিণী ব্যতীত যে কোনো রমণী কুকিরা বিবাহ করিতে পারে। যদি কোনো বিবাহিত দম্পতি সৌহৃদ্যভাবে একত্র বাস করিতে থাকে ও তাহাদের একটি পুত্র সন্তান প্রসূত হয়, তাহা হইলে সেই স্ত্রী অপরিত্যজ্যা হইল। কিন্তু যদি তাহাদিগের পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ না করে এবং স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ সৌহার্দ্য না জন্মে, তবে সেই স্থলে স্বামী সেই স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় ভার্যা গ্রহণ করিতে পারে।

কুকিগণ স্বর্গ ও নরক বিশ্বাস করে না। তাহাদের বিশ্বাস, মৃত্যু হইবা মাত্র কোনো আত্মা (spirit) আসিয়া মৃত্য ব্যক্তির আত্মাকে বহন করিয়া লইয়া যায়। এবং সমাগত আত্মার ইচ্ছানুযায়ীই মৃত ব্যক্তির আত্মা ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জন্মান্তরে পাপের দণ্ড ও পুণ্যের পুরস্কার হইতে পারে, ইহা তাহারা স্বীকার করে না।

কুকিরা হস্তী, শূকর, হরিণ প্রভৃতি যাবতীয় জন্তুর মাংস ভক্ষণ করে। বন মধ্যে কোনো জন্তুর মৃতদেহ বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রাপ্ত হইলে তাহা সযত্নে আহরণ করিয়া আনিয়া গৃহে শুষ্ক করে এবং প্রয়োজনানুসারে ভক্ষণ করিয়া থাকে।

যখন কোনো শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান করিবার আবশ্যক হয় তখন যাত্রা করিবার পূর্বেই তাহারা শত্রুর গতিবিধি, অবস্থান ও শক্তিসামর্থ্য পর্যবেক্ষণ এবং পথঘাটের পরিচয় জন্য গুপ্তচর প্রেরণ করে। তৎপর সকল বিষয় সম্যকরূপে অবগত হইয়া রজনীযোগে শত্রুর অনুসরণ করে। যদি শত্রুপক্ষ আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া পশ্চাৎপদ হয়, তবে তাহারা অমনি শত্রুগৃহে প্রবেশ করিয়া পরিত্যক্ত স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা, সকলকেই হত্যা করে এবং ঘর, দরজা, জিনিসপত্র ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে। আক্রমণের পূর্বে যদি প্রতিযোগী পক্ষকে বলবান ও পরাক্রান্ত বলিয়া মনে করে, তবে শান্তভাবে গৃহে প্রত্যাগমন করে, কিন্তু সুযোগ অন্বেষণে বিরত থাকে না।

যদি কোনো দিন কোনো নক্ষত্রকে তাহারা চন্দ্রমণ্ডলের অতি সন্নিকটে অবলোকন

---

* গয়াল এক জাতীয় বন্য গোরু। আকৃতি অনেকটা মহিষের ন্যায়। সাধারণ গোরু হইতে বৃহৎ। দুগ্ধ গাঢ় এবং সুমিষ্ট। আজকাল চট্টগ্রামে পাহাড়ে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

করে, তবে তাহারা সেদিন কোনো না কোনো শত্রু কর্তৃক অবশ্যই আক্রান্ত হইবে বলিয়া বিশ্বাস করে, এবং সেই রজনী সকলে অতি সাবধানে সশস্ত্র প্রহরায় অতিবাহিত করে।

কুকিগণ ভয়ংকর শত্রুনির্যাতন-প্রয়াসী। শত্রুনির্যাতন মানসে তাহারা শত্রুর গন্তব্য পথের পার্শ্বে অতি গোপনভাবে লুক্কায়িত থাকে। এবং অবসব পাইলেই শত্রুশোণিতে ধরাতল অভিষিক্ত করে। ঝোপের মধ্যে লুক্কায়িত থাকাকালে যদি বিষধর সর্পও তাহাদিগকে দংশন করিয়া যায়, শত্রু মস্তকের লাভাশায় তাহাও তাহারা নিতান্ত তুচ্ছজ্ঞান করে।

যদি কোনো বিগ্রহে বা বিবাদে উভয়পক্ষ তুল্য বলশালী বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে উভয়পক্ষ হইতেই শান্তি সংস্থাপন-সূচক চিহ্ন প্রদর্শিত হইয়া থাকে, এবং একপক্ষ অপর পক্ষের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া সন্ধির শর্তাদি নির্ধারণ করে। শর্তাদি উভয় পক্ষের মনোনীত হইলে গয়াল বংশধরদিগের ধ্বংসসাধন দ্বারা চন্দ্রসূর্যের পূজা দিয়া তাহাদিগকে সাক্ষী স্বরূপ রাখিয়া সন্ধিকার্য সম্পাদিত হয়। কিন্তু উক্ত বিগ্রহে যদি কোনো পক্ষ পবাজিত হয়, তাহা হইলে, জেতৃপক্ষ বিজিত পক্ষকে নিজ শাসনাধীনে আনয়ন করে। বিজিত পক্ষও বিনা আপত্তিতে জেতার করতলগত হইয়া থাকে এবং অধীনতার চিহ্নস্বরূপ বৎসর বৎসর নির্দিষ্ট সংখ্যক গয়াল ও অস্ত্রশস্ত্র করবূপে প্রদান করিয়া থাকে।

যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে তাহারা গৃহ হইতে খাদ্য প্রস্তুত করিয়া সঙ্গে লইয়া যায়। এই সকল খাদ্য আলু ভাজা, চাউলের গুড়ি এবং বাসি ভাত। বাঁশের চুঙা ভরিয়া এই সকল আহারীয় সামগ্রী এবং চামড়ার বড়ো বড়ো কোশ ভরিয়া মদিরা সংগ্রহ করিয়া লয়। অভিযান কালে তাহারা এত দ্রুতগমন করে যে, একদিনে তাহাবা ডাক বাহকের ৩/৪ দিনের পথ অতিক্রম করিয়া যায়। তাহারা নির্দিষ্ট স্থানে রাত্রিকালে উপস্থিত হয়। এবং রাত্রিতেই শত্রু শিবির অবরোধ করিয়া থাকে। প্রভাতে আক্রমণ করে এবং হত্যাকার্য সম্পাদন করিয়া শত্রুশিরে চর্মকোশ পরিপূর্ণ করে। যদি শত্রুশোণিতে কাহারও হাত রঞ্জিত হয়, তাহা হইলে, যাহাতে গৃহে প্রত্যাগমন পর্যন্ত সেই রক্ত-চিহ্ন বিদূরিত বা ধৌত না হইয়া যায়, তাহার জন্য বিধিমতে সতর্কতা অবলম্বন করিয়া থাকে।

এইরূপ হত্যাকার্য সম্পন্ন করিয়া যখন তাহারা আহার করিতে উপবেশন করে, তাহাবা আহারীয় সামগ্রীর কতক অংশ লইয়া সেই কর্তিত মস্তক মুখে প্রদান করে এবং তৎপর আপনারা ভোজনক্রিয়া সম্পন্ন করে। ভ্রমণকালে কুকিগণ দুইবার করিয়া আহার করিয়া থাকে। এবং প্রতি দুই ঘণ্টায় নিজ নিজ কার্য বিবরণ দূতদ্বারা গৃহে প্রেরণ করিয়া থাকে। যদি কেহ কোনো শত্রুর শির কর্তন করিয়াছে বলিয়া গৃহে সংবাদ পৌঁছে, তাহা হইলে তাহার গৃহে প্রচুর আমোদ-প্রমোদ অনুষ্ঠিত হয় এবং পরিবারের সকল লোক যথাসম্ভব অলংকারপত্রে ভূষিত হইয়া ঢাকঢোল বাজাইয়া সেই বিজেতা বীরপুঙ্গবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করে। যখন উভয় পক্ষের সাক্ষাৎ হয়, তখন উভয়েই আমোদে উন্মত্ত হইয়া যায় এবং স্ত্রীপুরুষ সকলে একত্রে নৃত্য, গীত ও পান-আহার করিয়া থাকে। যদি সে পুরুষ বিবাহিত হয়, তবে তাহার স্ত্রী অলংকারপত্রে সুসজ্জিত হইয়া অপরাপর সকলের সহিত আমোদ-প্রমোদ করিয়া স্বামী সম্ভাষণে আগমন করে এবং স্বামীর মুখে মদিরা ঢালিয়া দিয়া ও স্বামীর হস্ত-প্রদত্ত মদিরা নিজ মুখে লইয়া আমোদ-আহ্লাদ করে এবং

অবশেষে মদিরা দ্বারা স্বামীর শত্রুশোণিতসিক্ত হস্ত বিধৌত করিয়া দেয়। এইরূপে তাহারা সকলে অত্যধিক আমোদে-প্রমোদে গৃহে প্রত্যাগমন করে। গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া কর্তিত মস্তক সমূহ দলপতির আঙ্গিনায় স্তূপাকারে রক্ষা করে এবং তাহার চতুর্দিকে সকলে মিলিয়া নাচিতে ও গাইতে থাকে, অতঃপর কতকগুলি গয়াল ও শূকর বধ করিয়া তাহাদিগের মাংস দগ্ধ করিয়া ভক্ষণ করে ও মদিরা পান করে।

অবস্থাপন্ন কুকিরা শত্রুশির বংশদণ্ডে বন্ধন করিয়া তাহাদের পিতা-মাতার কবরের উপর রক্ষা করে। ইহাতে তাহাদের প্রচুর সম্মান লাভ হয়। যে সকল দলপতি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত না থাকিবে, তাহারা গৃহে আনীত বন্দিদিগের শিরশ্ছেদ করিতে পারিবে।

কুকিদিগের অস্ত্রশস্ত্র তাহাদিগের মধ্যেই নির্দিষ্ট ব্যক্তিরা প্রস্তুত করিয়া থাকে। সকলে উহা প্রস্তুত করিতে পারে না। কুকিদিগের গৃহস্থালি সম্বন্ধে রমণীগণ সম্পূর্ণ রকমে দায়ী, পুরুষগণ জঙ্গল আবাদ, গৃহনির্মাণ, ক্ষেত্রকর্ষণ, যুদ্ধ, শিকার ইত্যাদি কার্য করিয়া থাকে।

কুকিরা কোনো মাস বা বৎসরের হিসাব রাখে না। তাহাদের কোনো পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে তাহারা পঞ্চম দিবসে এবং কন্যা জন্মগ্রহণ করিলে তৃতীয় দিবসে আত্মীয়স্বগণকে নিমন্ত্রিত করিয়া উপরোক্ত মতো আমোদ-প্রমোদের সহিত পান-আহার করিয়া থাকে। উৎসব আরম্ভ করিবার পূর্বে আঙিনার মধ্যে একখণ্ড বংশযষ্টি পোঁতে, তাহার সম্মুখে আনিয়া একটি গয়াল বা শূকর বধ করিয়া দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করে এবং তৎপরে তাহার মাংস দগ্ধ করে ও আমোদ-প্রমোদে পান-আহার আরম্ভ করে।

কুকিদিগের মধ্যে যাহারা খঞ্জ বা অন্ধ হয় তাহারা গৃহবাসের সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবিকা উপার্জন করে। এই প্রকারের কোনো ভিক্ষুক কোনো অবস্থাপন্ন উদারচেতা কুকির গৃহে ভিক্ষার্থে উপস্থিত হইলে, গৃহস্বামী তাহাকে বিশেষ যত্ন সহকারে গ্রহণ করে এবং সেই অতিথির আগমন উপলক্ষে ভক্তিভাবে দেবতার পূজা করে, তৎপর অতিথি-সৎকার করিয়া সামাজিক ব্যক্তিদিগকে লইয়া পান-আহার করে। এই কার্যের জন্য সমাজ তাহাকে বিশেষ সম্মান করিয়া থাকে।

কোনো কুকির মৃত্যু হইলে সকলে আসিয়া তাহাকে ঘেরিয়া উপবেশন করে। মৃতদেহ একখণ্ড বস্ত্র দ্বারা ঢাকিয়া রাখা হয়। সেই সময় একটি গয়াল ও একটি শূকর বধ করিয়া তাহার মাংস ও মদিরা শবের মুখে প্রদান করে। তৎপর অবশিষ্ট মদিরা ও মাংস মৃত ব্যক্তির আত্মার প্রসাদ বলিয়া সকলে পান ও ভোজন করে। মৃত্যুর পর এইরূপ অনেক দিন পর্যন্ত করিয়া থাকে। তাহার পর মৃতদেহকে কোনো উচ্চ মঞ্চে স্থাপন করিয়া নীচে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া তাহা অগ্নি উত্তাপে দগ্ধ বা শুষ্ক করে। ভালো রকমে ভাজা ভাজা হইলে মোটা বস্ত্রে তাহা আবৃত করিয়া একটি ক্ষুদ্র পাত্রে পুরিয়া সিন্দুকে রক্ষা করে এবং ওই সিন্দুক মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত করিয়া রাখে। কবর দিবার পর পূর্ণ এক বৎসর তাহারা ওই গোর প্রতিনিয়ত ফলপুষ্পে সুশোভিত করিয়া রাখে। কেহ কেহ অন্যান্য নিয়মেও কবর দিয়া থাকে। মৃতদেহ প্রথমত বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিয়া রাখে, তৎপর কাঠের বাক্সে ভরিয়া উচ্চ বৃক্ষে ঝুলাইয়া রাখে, মাংস খসিয়া পড়িলে হাড়গুলি ধৌত করিয়া

পৃথক পাত্রে শুকাইয়া রাখে;—আকস্মিক বিপৎপাতে তাহা উন্মোচন করিয়া অস্থি সমূহের নিকট বিপদুদ্ধার জন্য পরামর্শ গ্রহণ করে। অস্থিসমূহ অবলোকন করিয়া তাহাদের মনে যে যুক্তি উদয় হয়, তাহাই তাহারা মৃত ব্যক্তির আত্মার আদেশ বলিয়া স্বীকার করতঃ আনতমস্তকে সেইরূপ কার্য করিয়া থাকে।

স্বামীর মৃত্যু হইলে তাহার বিধবা পত্নী এক বৎসর কাল গোরস্থানে বাস করে। তৎকালে প্রত্যহ তাহার খাদ্যাদি তথায় প্রেরিত হয়। যদি সম্বৎসরের ভিতর তাহার মৃত্যু হয়, তবে সেই রমণী পরম সৌভাগ্যবতী বলিয়া বিবেচিত হয়। জীবিত থাকিলে সম্বৎসরান্তে সকলে আসিয়া তাহাকে গৃহে লইয়া যায় ও গৃহে যাইয়া আত্মীয়স্বগণ লইয়া ধূমধামের সহিত মৃতের সাম্বৎসরিক ক্রিয়া সমাপন করে।

মৃত ব্যক্তি তিনটি পুত্র রাখিয়া গেলে ১ম এবং ৩য় পুত্রই পিতার ত্যজ্য সম্পত্তির অধিকারী হয়। মধ্যম পুত্র পিতৃ সম্পত্তি দাবি করিতে পারে না। যদি নিঃসন্তান মৃত্যু হয়, তবে সম্পত্তি ভ্রাতার উপর বর্তে। ভ্রাতার অভাবে দলপতিই মৃত ব্যক্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী।

নব্যভারত ● জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯ (১৯০২ খ্রিস্টাব্দ)



কুকি

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

পার্বত্য ত্রিপুরায় ৭,৫৪৭ জন কুকি আছে। তন্মধ্যে ৩,৭৭৭ জন পুরুষ এবং অবশিষ্ট স্ত্রী। 'কুকি' ইহাদিগের, জাতীয় ভাষার শব্দ নহে। স্বভাষায় কুকিগণের জাতীয় নাম 'হ্রিয়েম'। বর্তমান সময়ে এক শ্রেণির কুকি আপনাদিগকে লুছাই নামের এক পৃথক্ সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। পূর্বে .. পশ্চিমে ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম, উত্তরে প্রাচীন কাছাড় ও মেইতেই ভূমি, দক্ষিণে আরাকান—এই চতুঃসীমার মধ্যবর্তী পার্বত্য ভূমি কুকিজাতির আবাসস্থল। ইহারা প্রধানত ২৪ ভাগে বিভক্ত ;

১। পাওতু বা পাইতু (পয়টু), ২। বংছের,
৩। বেলঠুট, ৪। থাংলুয়া,
৫। লাইফং, ৬। বংখই,
৭। মিজেল, ৮। নামতে,
৯। ছাল্যা, ১০। অমড়ই,
১১। চোটলাং (চোটলাং ও ফাট্‌লেই, ১২। খরেং।

ত্রিপুর রাজ্যের কুকিদিগেব সহিত ইহাদিগেব খুব কমই সম্পর্ক হইয়া থাকে। 'ফাট্‌লেই' শ্রেণি ত্রিপুরা জেলায় বাস কবে।)

১৩। বাইফেই, ১৪। চন্‌লেল,
১৫। বলতে, ১৬। বিয়েতে,
১৭। বালতে, ১৮। হ্রাং চস,
১৯। রাংচিয়ে, ২০। ছাইলই,

২১। জংতে, ২২। পাট্‌লেই,
২৩। বেতনু, ২৪। পাইতে।

ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত ৫ সম্প্রদায়ের কুকি ত্রিপুর রাজ্যে বাস করিতেছে। কৈলাশহর বিভাগেই প্রধানত এই রাজ্যের কুকিগণের বাস।

এই ২৪ শ্রেণির ভাষা মূলত পরস্পর বিভিন্ন নয়। প্রাদেশিক ভাষাগুলির মধ্যে যে পার্থক্য ইহাদের মধ্যেও তাহাই। কুকিদিগের আচার-ব্যবহার তিপ্‌রাদিগের আচার-ব্যবহার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং কোনো কোনো অংশে সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহাদের শ্রেণি-সমূহের মধ্যে পরস্পর আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে কোনোরূপ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহারা প্রায় যাবতীয় পশুপক্ষীর মাংস খাইয়া থাকে এবং জাতির স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে না। ইহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করে, তবে পরকাল বা পুনর্জন্ম মানে না। কুকিদিগের সকল রকম ধর্মানুষ্ঠানই রোগশান্তি প্রভৃতি ঐহিক ফলের প্রত্যাশায় হইয়া থাকে। ইহারা মনে করে যে গবয়, ছাগী, কুক্কুট প্রভৃতি বলিদান করিয়া পূজা করিলে বর্তমান বা ভবিষ্যৎ বিপদ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়। ইহাদের কোনো শ্রেণির কোনো নির্দিষ্ট স্থান নাই। দুই তিন শ্রেণি এক পর্বতে কিংবা একশ্রেণি দুই তিন পর্বতে বাস করিয়া থাকে।

শিক্ষা—কুকিগণ প্রায়শই অশিক্ষিত, তবে ত্রিপুরা রাজ্যের কুকিগণ ক্রমশ শিক্ষা লাভ করিতেছে। কুকি বালকগণের শিক্ষার জন্য সম্প্রতি এ রাজ্যে কয়েকটি পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে।

রাজা—তিন জন কুকি সর্দার ত্রিপুররাজদরবার হইতে রাজা উপাধি লাভ করিয়াছে. কুকি-রাজত্রয় বঙ্গভাষায় আলাপ করিতে সমর্থ।

ধর্ম—পাথিয়েন নামক এক ব্যক্তি সর্বপ্রথম কুকিদিগের মধ্যে ধর্মপ্রচার করে। পাথিয়েন প্রচার করিল—"একজন এই জগতের সৃষ্টিকর্তা, তিনি ভিন্ন অন্যান্য অনেক আরাধ্য দেবতা আছেন"। পাথিয়েন সামাজিক নিয়মেরও প্রবর্তন করে।

পরে তার্পা নামক আর এক ব্যক্তি প্রথম ধর্মপ্রচারকের ধর্মমত, কার্যপ্রণালী রীতিনীতি বজায় রাখিয়া পাথিয়েনের ধর্মের কিছু সংস্কার সাধন করে, সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম সম্বন্ধীয় অনেক নূতন নূতন নিয়মেরও প্রবর্তন করে।

কুকিদিগের ধর্ম তার্পা দ্বারা সংস্কৃত হইলেও বরাবর একভাবেই চলিতেছে। কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে যাহারা একটু বাঙ্গালা ভাষা শিখিয়াছে তাহাদের মধ্যে নিত্য নৈমিত্তিক আচার-ব্যবহারে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটিতেছে। হিন্দুগণ যেমন 'হরি' 'নারায়ণ' প্রভৃতি বলিয়া ভগবানকে ডাকিয়া থাকে, ইহারাও সেইরূপ তাঁহাকে 'লাচি' বলিয়া সম্বোধন করে।

কুকিগণ যখন তাঁহাদের আদি বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া 'দারলঙ' পর্বতে বাস করিতে আরম্ভ করে সেই সময় পাথিয়েন তাহাদিগের মধ্যে ধর্ম প্রচার করে। সে সাহসী যোদ্ধা বলশালী ও পরোপকারী ছিল। পাথিয়েন নিজে না খাইয়া বাড়ির সকলকে আহার করাইত। কাহারও পীড়া হইলে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তাহার পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকিত। কাহারও কোনো খাদ্যের অভাব হইলে যে কোনো উপায়ে আহার্য সংগ্রহ করিয়া দিত। কুকিরা

কাজেই তাঁহাকে পরমেশ্বরের ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। পাথিয়েন প্রথম ধর্ম প্রবর্তন করিয়াছিল বলিয়া কুকিরা তাহাদের দেব-দেবীর নামের পরে পাথিয়েনের নাম করিয়া দিত।

আরাধ্য দেবতা

১। কুকিদিগের আরাধ্য দেবতাদিগের মধ্যে 'লোচরি পাথিয়েন' একটি। 'লোচরি দেবতার' সপ্তমুণ্ড বলিয়া কুকিদের বিশ্বাস। ওই দেবতার অন্য কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। ইহার পূজা বাড়িতেই হইয়া থাকে। অবস্থানুসারে লোকে এই পূজায় হংস, মোরগ, বরাহ, মহিষ, গণ্ডার ও গবয় বলি দিয়া থাকে। এই পূজায় কোনোরূপ প্রতিমূর্তি নির্মিত হয় না, কেবল কাঁচা বাঁশ দিয়া দুইটি নিশান উচ্চ মঞ্চে উড়াইয়া দেওয়া হয়।

২। 'তুই পাথিয়েন'—এই পূজা জলের কোনো নির্দিষ্ট স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। চাউল, সাদা রঙের মুরগি, সাদা রঙের পাটা হংস এমনকি পারাবত পর্যন্ত পূজায় বলি দেওয়া হয়। কুকি ভাষায় 'তুই' শব্দে জল বুঝায়। এই পূজাপদ্ধতিতে আমাদের গঙ্গাপূজার সামান্য সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

৩। 'বাপিতে পাথিয়েন'—এই পূজায়ও কোনো প্রতিমূর্তি গঠিত হয় না তবে ইচ্ছানুসারে বলিদানের বিধি আছে—'বাপিতে' শব্দের অর্থ লছ্‌মী বা লক্ষ্মী। দেবী লক্ষ্মীস্বরূপা। ইনি কৃষিকার্যের সৃষ্টিকর্ত্রী, পালয়িত্রী, গৃহকর্ত্রী ও গৃহলক্ষ্মী। ইহারা 'জুম' করার পূর্বে ও পরে বাপিতে পাথিয়েনের পূজা করিয়া থাকে।

৪। 'খুয় পাথিয়েন'—বাড়ির সমস্ত লোক একত্র হইয়া এই পূজার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। বাড়ির ভিতর একটি নির্দিষ্ট স্থানে এই পূজা হয় এবং কুকিরা ছাগ, বরাহ, হংস, পারাবত, মহিষ, গণ্ডার বলি দিয়া থাকে। কুকিদের নিকট এই পূজাটি বড়ই আমোদজনক। ইহারা স্ত্রীপুরুষ পূজাস্থলে একত্র হইয়া মদ্য মাংসাদি ভোজন এবং নৃত্য গীতাদি করিয়া থাকে। খুয় পাথিয়েন পূজার কোনো নির্দিষ্ট সময় নাই। বৎসরের মধ্যে যে কোনো এক সময় পূজার অনুষ্ঠান হইলেই হইল। কুকিদের নিকট এই পূজা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া কোনো সদুত্তর পাওয়া যায় না। দুই-একজন কুকি ইহাকে 'কের পূজা' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে, কিন্তু ইহার সহিত 'কের' পূজার কোনোই সংশ্রব দেখা যায় না। পূজার কার্যপ্রণালী কতকটা কালী পূজার অনুরূপ। এই পূজায় কোনো প্রতিমা থাকে না। কাঁচা বাঁশেব নিশানে ফল ইত্যাদি ঝুলাইয়া কাঁচা বাঁশ সংযোগে উচ্চ মঞ্চে উড়াইয়া দেয়। দুইদিন পর্যন্ত 'খুয় পাথিয়েনের' পূজা হয়। সাধারণত তৃতীয় দিবসে এই পূজা শেষ হয়। পূজার দুই দিনেব মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের কেশরচনা (চুল আঁচড়ানো) নিষিদ্ধ। পরিধানের কিংবা ব্যবহারের বস্ত্রাদি এবং ধান্যাদি কৃষিজাত দ্রব্য রৌদ্রে দেওয়া নিষিদ্ধ। এই সময় কেহ সুতা কাটিতে কিংবা বস্ত্র বয়ন করিতে পারিবে না। অন্য বাড়ির লোক পূজা বাড়িতে প্রবেশ করিতে পারে না। পক্ষান্তরে পূজাবাড়ির লোকও অন্য বাড়িতে যাইতে পারে না। যদি কোনো অনিবার্য কারণে পূজাবাটির লোক অন্য বাড়িতে আসে তাহা হইলে তাহাদিগকে জরিমানা দিতে হয়। অবস্থানুসারে টাকা পয়সা, আহার্য দ্রব্য এমনকি মদ্য পর্যন্তও জরিমানা স্বরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তির উপর পূজার ভার ন্যস্ত থাকে,

তাহার নিকটেই জরিমানা দাখিল করিতে হয়। সাধারণত উজির বা মোক্তারই এই ভার পাইয়া থাকে।

৫। 'শিবপূজা'—কুকিদিগের মধ্যে প্রচলিত এক প্রকার পূজাকে ইহারা 'শিবপূজা'—এই আখ্যা প্রদান করিয়া থাকে। কিন্তু হিন্দুগণের শিবপূজার সহিত ইহার কোনো সামঞ্জস্য নাই। এই পূজা কুকিদিগের মধ্যে অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহাতে ব্যয়ও যথেষ্ট হইয়া থাকে।

জুম কাটার পূর্বে পল্লিবাসী জনসাধারণ মিলিত হইয়া এই পূজার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। গবয় বলি এই পূজার প্রধান উপকরণ।

এই বলির গবয়টিকে অতি নির্দয়ভাবে বিনষ্ট করা হয়।

বধ্য গবয়ের সর্বাঙ্গে চুণের ফোঁটা দিয়া পূজায় সমবেত কুকিগণ এক একটি চুণের ফোঁটাকে নিজ নিজ লক্ষ্য বলিয়া মনোনীত করে। পরে পূজান্তে কিয়দ্দূর হইতে নাচিতে নাচিতে আসিয়া তাহারা গবয়ের দেহে নিজ নিজ বল্লম নিক্ষেপ করে। যাহার বল্লম লক্ষ্য-ভেদে সমর্থ হয় সে ভাগ্যবান ও যাহার বল্লম লক্ষ্যভেদ করিতে পারে না সে দুর্ভাগা বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। লক্ষ্যভেদ কার্য শেষ হইলে অতি নিষ্ঠুরভাবে গবয়টিকে বিনষ্ট করিয়া তাহার মাংস সম্মিলিত ব্যক্তিগণ ভোজন করিয়া থাকে।

এতদ্ভিন্ন কুকিদের অনেক ছোটো ছোটো পূজা আছে। প্রত্যেক পূজায় কুকিরা নিজ ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া থাকে। এই মন্ত্রগুলি তাহারা কাহারও নিকট প্রকাশ করে না। কুকিদিগের একটা স্বাতন্ত্র্য এই—তাহারা পীড়া হইলে কোনো ঔষধ ব্যবহার করে না, রোগ-মুক্তির জন্য নানাবিধ পূজা করে এবং মোরগ, ছাগ, বরাহ, পারাবত প্রভৃতি বলি দিয়া থাকে। ইহাতেই তাহারা রোগমুক্ত হইয়া থাকে।

এক শ্রেণির কুকি কোনো নির্দিষ্ট দেব-দেবীর পূজা করে না।

জন্মোৎসবাদি

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে কুকিদিগের অশৌচ গ্রহণের বিধি নাই। ইহারা জাত-সন্তানের কল্যাণের জন্য কোনো মাঙ্গলিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে না।

অবস্থাভেদে দশ দিন হইতে তিন মাসের মধ্যে মাতা পিতা ও আত্মীয়স্বজনের পরামর্শ মতে সন্তানের নামকরণ হইয়া থাকে। কুকিগণ সেইদিন আত্মীয়বর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনে এবং সকলে সমবেত হইয়া একসঙ্গে শিকারে গমন করে, প্রত্যাবর্তন করিয়া স্ত্রীপুরুষ একত্র মদ্য মাংস ভোজন করিয়া থাকে।

রাজা, উজির, মোক্তার, প্রভৃতি অবস্থাপন্ন ব্যক্তির সন্তান হইলে রণবাদ্য ও নৃত্য গীতাদি হইয়া থাকে।

বিবাহ

কুকিদের বিবাহ দুই রকম দেখিতে পাওয়া যায়। এক প্রকার বিবাহ অভিভাবক ও পিতামাতার নির্বাচনে ও উদ্যোগে হইয়া থাকে। অপর প্রকার বিবাহে পাত্রপাত্রী উভয়ে

গোপনে আলাপ করিয়া পরস্পরের মনোনয়ন স্থির করে। তাহারা প্রকারান্তরে তাহা আপন আপন অভিভাবকের গোচর করে ; অতঃপর অভিভাবকগণ একত্র হইয়া বিবাহ স্থির করে। বিবাহ কন্যার পিত্রালয়েই হইয়া থাকে। কুকিদের বিবাহ মাত্রে বরপক্ষ হইতে পণ দিবার প্রথা প্রচলিত আছে। বরকন্যার বিবাহ কালেও পণগ্রহণ করা হইয়া থাকে, পরন্তু এ ক্ষেত্রে পণের টাকা অধিক পরিমাণেই দিতে হয়। বিবাহের পণ ২০ হইতে ১০০ পর্যন্ত দেওয়ার নিয়ম আছে। পাত্রের পক্ষ হইতে যদি বিবাহের দিন কোনো কারণে পণের টাকা দেওয়া সম্ভবপর না হয় তাহা হইলে পাত্রপক্ষ ৫/৭ বৎসরের মধ্যে কিছু কিছু করিয়া দিলেও বিবাহ-কার্য সম্পন্ন হয়। কিন্তু বিবাহের পর যেদিন বর-কন্যা এক শয্যায় শয়ন করিবে সেইদিন বরপক্ষ হইতে কন্যাকে নগদ টাকা অলংকার প্রভৃতি মূল্যবান দ্রব্য যৌতুক দিতেই হইবে। বরপক্ষকে ইহা হইতে কোনোরূপে অব্যাহতি দেওয়া হয় না। কন্যা বিবাহের পর যখন শ্বশুরবাড়ি যায়, তখন স্বামী ভিন্ন অন্য কাহারও সহিত যাইতে পারে না। শ্বশুরবাড়ি যাইবার সময় কন্যার পিতামাতা বা অন্য অভিভাবককে স্বকীয় অবস্থানুসারে (কন্যার সহিত?) বস্ত্র-শয্যাদি দিতে হয়। যে পিতামাতা যত বেশিদিন কন্যার বস্ত্র নিজালয় হইতে যোগাইতে পারিবে, বৈবাহিকদিগের নিকট তাহার তত বেশি সম্মান হইবে। বৈবাহিক সম্বন্ধে কুকিগণের পক্ষে ইহা অতি সম্মানের বিষয়।

কুকিদের মধ্যে কোনো ক্রমেই ১০ বৎসরের পূর্বে কিংবা ২৫/৩০ বৎসর বয়সের পর কন্যার বিবাহ হয় না। সচরাচর কন্যা প্রাপ্তযৌবনা এবং জুমকার্য করিতে সমর্থ হইলেই বিবাহ হইয়া থাকে। বিবাহের পর কোনো কারণবশত স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য ঘটিলে বিবাহবন্ধন ছিন্ন হইতে পারে, কিন্তু যাহার ইচ্ছায় বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইবে তাহাকে জরিমানা স্বরূপ অপর পক্ষকে নগদ ১৬ টাকা দিয়া বিবাহ-শৃঙ্খল হইতে মুক্তি লইতে হইবে। এইরূপে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইলে পর কন্যার স্থানান্তরে বিবাহ হইলে তাহাতে সমাজ প্রতিবন্ধক হয় না।

কুকিদিগের বিবাহের কোনো বিশেষ দিন, মাস, বাব প্রভৃতি কিছুই নাই। কন্যার বয়স অধিক হইলেও উভয়ের মনোনয়ন-প্রথায় বিবাহ সিদ্ধ হইয়া থাকে। ইহাদিগের বিবাহে কোনোরূপ মন্ত্রপাঠ করিতে হয় না। কন্যার বাড়িতে উভয় পক্ষের আত্মীয়স্বজন মিলিত হইয়া বর ও কন্যাকে সভাস্থলে আনয়ন করে, অতঃপর বর কন্যাকে মুখোমুখি করিয়া বসাইয়া উভয়ের মধ্যস্থলে একটি মদের কলশি রাখিয়া দেয়। ইহার পর যখন বরকন্যা দুইটি নলের সাহায্যে মদ্যপান করিতে আরম্ভ করে তখন কন্যার পিত্রালয়ের ব্যক্তিগণের মধ্যে যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সে সেখানে উপস্থিত হইয়া বরকন্যার দুই গুচ্ছ কেশ একত্র বাঁধিয়া দেয় এবং দম্পতির মদ্যপান শেষ হইবার পূর্বেই বর বা কন্যার সমবয়স্ক কেহ আসিয়া ওই বন্ধন মোচন করে এবং তাহাদিগের সঙ্গে বসিয়া মদ্য মাংস খাইয়া থাকে। আহারান্তে ওই দিনই তাহাদের বাসরশয্যা হয়। যদি কোনো কারণে যৌতুকাদির অভাব হয় তাহা হইলে ২/১ দিন পরেও বাসরশয্যা হইতে পারে।

সমাজ

কুকিদিগের মধ্যে যে কয়েকটি শ্রেণি আছে তাহাদের মধ্যে আহারাদি বিষয়ে কোনো বাধা

নাই; সকলেই একত্র ও একপাত্রে পান ভোজন কবিতে পারে। বিবাহ বিষয়ে শ্রেণি বিশেষের আপত্তি হইয়া থাকে। এইরূপ এক শ্রেণির নাম 'ঠাঙ্গুর' (?)। ইহারা রাজার জাতি। আর এক শ্রেণির নাম 'চেঙুই', ইহারাই কুকিদের পূর্বতন রাজবংশীয় ছিল। ইহাদের সহিত ঠাঙ্গুরদের বিবাহাদি হইতে পারে। বর্তমান কালে এই বংশের অধস্তন পুরুষের নাম লাল্‌বুঙ ঠোমা বাহাদুর। তৃতীয় শ্রেণির নাম 'পালিয়েন'। ইহারাও কুকিদিগের মধ্যে সম্মানিত বটে তবে রাজারা প্রায়ই ইহাদিগের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধে আবন্ধ হয় না, কিন্তু এই শ্রেণির মধ্যে সুন্দরী কন্যা থাকিলে রাজাদের মধ্যে কেহ কেহ গ্রহণ করিয়া থাকে। চতুর্থ শ্রেণির নাম রিভুঙ,—এই বংশের পূর্বতন পুরুষ (পিতা) রাজা ছিলেন। কিন্তু মাতা সাধারণ ব্যক্তির ঘর হইতে গৃহীত। পঞ্চম শ্রেণি জাদেঙ নামে পরিচিত। ষষ্ঠ শ্রেণির নাম চেইহাঙ, ইহাদের সম্মান রিভুঙদিগের অপেক্ষা কিছু কম।

সপ্তম শ্রেণি সাধারণ কুকি। ইহারা সকলেই এক ধর্মাবলম্বী; ধর্মে ও রীতিনীতিতে কোনো পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় না।

কুকিদের প্রত্যেক বাড়িতে একজন উজির কী মোক্তার থাকে ; ইহারা প্রধান স্বরূপ হইয়া উক্ত বাড়ির বিচার প্রভৃতি কার্য করিয়া থাকে। ইহাদের বিচারাধীন থাকিয়া ইহাদের পরামর্শমতেই বাড়ির সকলে কাজকর্ম করিয়া থাকে। একজন রাজার দশ বারোজন মোক্তার থাকে। একজনের অধিক উজির থাকিতেও বাধা নাই।

এক রাজার জিম্মায় দশ বারো খানা বাড়ি থাকে। যদি দুর্ভাগ্যবশত কোনো রাজার বংশ লোপ পায়, তাহা হইলে তাহার উত্তরাধিকারীই রাজ্য পাইয়া থাকে।

কুকি রাজাদের পুত্রই সাধারণত উত্তরাধিকারী হয়। পুত্র না থাকিলে ভ্রাতা, তদভাবে ভ্রাতুষ্পুত্র, তাহাও না থাকিলে ভাগিনেয় উত্তরাধিকারসূত্রে রাজত্ব পায়। কুকিদের মধ্যে পোষ্যপুত্র গ্রহণের পদ্ধতি অদ্যাপি সৃষ্ট হয় নাই।

অধুনা কৈলাশহরের এলাকায় তিন জন কুকি রাজা এবং একজন কুকি সর্দার আছে। রাজাদের নাম 'মুরচুঙ্গা রাজা', 'লালচুক্‌খামা রাজা বাহাদুর' ও 'বানকাম্পুই' রাজার পুত্র 'ঙুরচাইলিএন'। সর্দারের নাম 'লালবুঙ ঠোমা' বাহাদুর। এই চারিজনের অধীনে প্রায় ৪৮০ ঘর অধিবাসী। এক এক ঘরে ১২ হইতে ৩০ জন বাস করে।

রাজাদিগের মধ্যে মুরচুঙ্গা রাজার অধীনে জনসংখ্যা অধিক, কিন্তু ললনাই ঙুরচাইলিত্রনের আরও অধিক। মুরচুঙ্গা রাজার অধীনে ১৭৫ হইতে ২০০ ঘর অধিবাসী লালচুক্‌খমার অধীনে ১৩০ ঘর এবং বানকাম্পুই-এর অধীনে ১৭৫ ঘর।

রাজা ও সর্দারগণের কোনো নির্দিষ্ট আয় নাই। সাধারণ কুকিদের বিবাহে ইহারা পণের টাকার অংশ পায়। যাহারা কোনো কারণবশত রাজাদিগের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে তাহাদের বিবাহের পণের টাকাও পাইয়া থাকে। কোনো সম্পত্তির উত্তরাধিকারী না থাকিলে ইহারা তাহার মালিক হয়। কুকিদের মধ্যে বিধবার কন্যা সম্পত্তির অধিকারিণী হইতে পারে না। যতদিন ওই কন্যা বিবাহিত না হয় ততদিন রাজা তাহাকে প্রতিপালন করে। সম্পত্তি যাহা থাকে তাহা রাজাই গ্রহণ করে।

সাধারণত কুকি বালিকার বিবাহে পণের টাকা যাহা পাওয়া যায় তাহা পিতামাতা জ্যেঠা, খুড়া, মাতুল ও রাজা এই ছয়জনের মধ্যে সমভাবে বিভক্ত হয়। ভ্রাতা কখনো পণের টাকার অধিকারী হইতে পারে না।

কন্যা বিধবা হইলে তাহার পুনর্বার বিবাহ হইতে পারে। প্রথম স্বামীর সম্পত্তি থাকিলে (পুনর্বার বিবাহ হইলেও) সে তাহার অধিকারিণী হইবে। যদি প্রথম বিবাহের পুত্র থাকে, তাহা হইলে পুত্রই সম্পত্তি পাইয়া থাকে, কিন্তু কন্যা থাকিলে সম্পত্তি পায় না। বিধবার দ্বিতীয় স্বামীর প্রথম স্বামীর সম্পত্তিতে কোনই অধিকার থাকে না।

কুকিদের মধ্যে চোর, বদমায়েস ও মিথ্যাবাদীর সংখ্যা নিতান্ত কম। রাজাই সাধারণত কুকিদের অপরাধাদির বিচার করিয়া থাকে। রাজার বাড়ি দূরবর্তী হইলে সামান্য সামান্য বিচার বাড়ির মোক্তার অথবা উজির সম্পন্ন করে, এবং দণ্ডলব্ধ অর্থ রাজার নিকট দাখিল করে।

পূর্বে প্রথা ছিল যে, কোনো বিবাহিত রমণী অন্যাসক্ত হইলে ভ্রষ্টা নারী ও লম্পট পুরুষকে বিচারার্থ সভায় আনয়ন করা হইত, পরে উভয়কে একত্র দণ্ডায়মান করাইয়া ভ্রষ্টা রমণীর স্বামীকে দিয়া তাহার কর্ণমূল ছেদন করা হইত। সঙ্গে সঙ্গে ছেঙ নামক অস্ত্রদ্বারা লম্পট পুরুষটিকে বধ করা হইত। বর্তমান লালচুক্‌খামা রাজা বাহাদুর এই লোমহর্ষণ প্রথা বন্ধ করিয়াছেন। ইহার পরিবর্তে তিনি নিয়ম করিয়াছেন যে, দুষ্ট পুরুষ তাহার পুরুষানুক্রমে রাজার গোলাম হইয়া থাকিবে। তবে দুষ্টা স্ত্রীর এক কর্ণ কাটিয়া ফেলা হইবে। ইহার স্বামী ইচ্ছা করিলে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে। তজ্জন্য স্বামীকে কোনোরূপ ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে না। কুকিদের মধ্যে ভ্রষ্টা রমণী অত্যন্ত নিন্দার পাত্র। পরম রূপবতী হইলেও ইহাকে কেহ গ্রহণ করে না। দুষ্টা পুরুষকেও কেহ গ্রহণ করে না; সেও সাধারণের ঘৃণাভাজন হইয়া থাকে।

কেহ কোনো অবিবাহিত কন্যার সহিত কন্যার সম্মতিক্রমে সংগত হইলে উভয়কে পরিণয়শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে হয়। এরূপ স্থলে কন্যা অপ্রাপ্তবয়স্কা হইলে পুরুষের কর্ণযুগল ছেদন করাইয়া তাহাকে রাজার দাসত্বে নিযুক্ত করা হয়। আর কন্যা প্রাপ্তবয়স্কা হইলে দুষ্ট পুরুষের অবস্থানুসারে ১৬৲ হইতে ৫০৲ পর্যন্ত জরিমানা হয় এবং তাহাকে মদ্য মাংসাদি উপচারে ভোজন করাইয়া পঞ্চায়েতের সন্তোষ বিধান করিতে হয়।

বারবনিতা

কুকিদের মধ্যে বারাঙ্গনা আছে, কিন্তু বারাঙ্গনাগণ পল্লিমধ্যে স্থান পায় না ; পল্লির বহির্ভাগে তাহাদিগের জন্য পৃথক বাসস্থান নিরূপিত হয়।

অবিবাহিত বা বিপত্নীক যুবক কিংবা প্রৌঢ় ব্যক্তি ভিন্ন অপর ব্যক্তি (অর্থাৎ বালক, বৃদ্ধ কিংবা বিবাহিত যুবক) বেশ্যালয়ে গমন করিলে সে সমাজে নিন্দনীয় ও দণ্ডনীয় হইয়া থাকে।

মোক্তার বা উজির

কুকি-সমাজে জাতিহিসাবে মোক্তার বা উজির নিযুক্ত হয় না। বাড়ির মধ্যে উপযুক্ত ব্যক্তিকেই রাজা মোক্তার বা উজির নিযুক্ত করিয়া থাকে। তবে এই নির্বাচনে বাড়ির লোকদিগের সম্মতিও গ্রহণ করিতে হয়।

রাজদণ্ড নিবন্ধন যে অর্থ বাড়ি হইতে মোক্তারগণ গ্রহণ করে, তাহা তাহারা রাজার নিকট পাঠাইয়া থাকে। রাজা নিজের ইচ্ছানুসারে ইহার কিয়দংশ মোক্তারদিগকে প্রদান করে।

পুরোহিত—কুকিদিগের মধ্যে কোন্ জাতি পুরোহিত (পূজক) হইবে তাহার কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নাই ; যিনি পূজন কার্য শিক্ষা করেন তিনিই পূজা করিতে পারেন। বিশেষত নিজের কর্তব্য পূজা নিজে করিতে পারিলে তাহাতেও ক্ষতি নাই। অনেক বাড়িতে মোক্তারের প্রতিই পূজার ভার ন্যস্ত হয় এবং মোক্তার পৌরোহিত্য ইত্যাদি করিয়া থাকে।

পর্বদিন—কুকিদের কোনো পর্ব নাই। সুতরাং নৃত্য গীতাদিরও কোনো নির্দিষ্ট সময় নাই। বাড়ির মধ্যে কোনো ব্যক্তি যদি বন্য জন্তু অর্থাৎ বরাহ, শশক, গবয়, গণ্ডার, মহিষ, হস্তী, হরিণ ইত্যাদি শিকার করিয়া আনে, তবে সে বাড়ি প্রবেশ করিবা মাত্রই বাড়ির স্ত্রীপুরুষ একত্র হইয়া নৃত্যগীত করিয়া থাকে। 'গুঙ' 'রশেম' 'ঢোল' 'দারতেঙ' 'দারবু' প্রভৃতি বাদ্য বাজাইতে থাকে এবং সকলে একত্র সমবেত হইয়া মদ্য মাংস প্রভৃতি ভোজন করে। যুদ্ধ জয়ান্তে কেহ গৃহপ্রত্যাগত হইলেও ইহারা এইরূপ নৃত্যগীতাদি করিয়া মদ্য মাংস ভোজন করে।

আমোদ-প্রমোদ

ইহাদের আমোদ-প্রমোদের কোনো নির্দিষ্ট সময় নাই। অবসর পাইলেই বিশেষত ভোজ উপলক্ষে ইহারা নৃত্যগীত, বাদ্যাদির দ্বারা আমোদ-প্রমোদ করিতে থাকে। নৃত্য করিবার উপযোগী ইহাদের কোনো স্বতন্ত্র পোশাক নাই। সাক্ষাতে নৃত্যগীতাদি করিতে হইলে পোশাক সামান্যরূপে পরিবর্তন করিয়া লয়। গান করিবার সময় কোনো ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া ইহারা তাহারও গুণগ্রাম গাইয়া থাকে। ভগবদ্বিষয়ক সংগীত কুকিদের মধ্যে প্রচলিত নাই।

বাদ্যযন্ত্র

৮খানি বাঁশ ও বেত সংযোগে ইহারা লাউ দিয়া একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত করে। ইহার নাম 'রশেম'। কুকিদিগের যত প্রকার বাদ্যযন্ত্র আছে তন্মধ্যে ইহার সুরই অতি মধুর।

বড়ো কাঁসরের মত বাদ্যযন্ত্রকে ইহারা 'গঙ', 'গুঙ' বা 'দারখুওঙ' বলে। এই যন্ত্র ইহাদের নিজের তৈয়ারি, কোনো স্থান হইতে কিনিয়া আনে না। ইহার শব্দ ১½—২ মাইল পর্যন্ত যায়। 'দারতেঙ' বাঙালী কাঁসির মত।

'দাররিকু'—গঙের মতো কিন্তু আকারে ছোটো।

যুদ্ধ-সামগ্রী

কুকিদিগের প্রায় সকলেরই বন্দুক আছে, কুকিদের অপর যুদ্ধাস্ত্র চেম, কুয়াল দা, চাকলা (চেম), তির (কুই বাঁশ দ্বারা তৈয়ারি)। তির একটি লোহার ফলক। এতদ্ভিন্ন আরও কয়েকটি অস্ত্র আছে। সেগুলির নাম—চিলাই (বন্দুক), আদাং আবই চেমতে, তেমতে লুজুম, হ্রেই (কুড়াল), ছাইতিরকুওই (অঙ্কুশ) ইত্যাদি।

কুকিগণ সাহসী, পরিশ্রমী ও দৃঢ়লক্ষ্য। ইহারা একপ্রকার সর্বভুক। প্রায় সমস্ত পশুপক্ষীর মাংসই ইহাদের ভক্ষ্য, সরীসৃপ-জাতিও কুকিদিগের প্রিয় খাদ্য। ত্রিপুরা রাজ্যের কুকিদের একপ্রকার পিষ্টক প্রস্তুত করিবার প্রণালী আছে। একটি কুকুরকে মারিয়া তাহার উদর মধ্যে কিছু চাল প্রবেশ করাইয়া দিয়া সেই কুকুরের দেহ অগ্নিতে দগ্ধ করে, সেই দগ্ধ কুকুরের উদর-মধ্যস্থ অন্নই তাহারা পিষ্টক রূপে খাইয়া থাকে। কুকিগণ অতিশয় মদ্যপায়ী। পল্লির স্ত্রীপুরুষ মিলিত হইয়া ইহারা মদ্যপান করে। জুম কাটার পরে ইহার প্রায় দুই মাসকাল মদ্যপানাদি করিয়া আমোদ-প্রমোদে কাটাইয়া থাকে।

সভ্যজাতিদিগের মধ্যে বর্ণের তারতম্য ব্যতীত চক্ষু নাসিকা প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারাও স্ত্রীজাতির সৌন্দর্য পরিকল্পিত হইয়া থাকে। কিন্তু 'ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ।' দেশ কাল পাত্র ভেদে রুচিরও পরিবর্তন ঘটে। স্ত্রীলোকের কোমর মোটা অথচ প্রশস্ত ও কর্ণের ছিদ্র বড়ো হইলে কুকিরা তাহাকে সুন্দরী বলিয়া থাকে। যাহার কর্ণের ছিদ্র যত বড়ো সে তত সুন্দরী। এই কারণে বাঁশের চোঙা দিয়া কুকিরমণী কানের ছিদ্র বড়ো করিয়া থাকে।

কিছুকাল পূর্বে কুকিরা গৃহমধ্যে স্ত্রীপুরুষ উলঙ্গাবস্থায় থাকিত, উলঙ্গ হইয়া স্নানাহার করিত। ইহাতে তাহাদের কোনোরূপ নিন্দা বা লজ্জার কারণ নাই। রাজাও অনেক সময়ে গৃহাভ্যন্তরে নগ্নাবস্থায়ই থাকিত। অবসর মতো অথবা কোনো অন্য জাতীয় লোক গৃহে প্রবেশ করিলে স্ত্রীলোকেরা এক হাত প্রস্থ একখানা বস্ত্র পরিধান করিত। পুরুষেরা একটা মোটা চাদর গায়ে দিত। এই কারণে না জানাইয়া ঘরে প্রবেশ করিলে কুকিজাতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইত।

মৃত্যু

কুকিদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে ইহারা অমানুষিকভাবে তাহার ঔর্ধ্বদেহিক কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। অশৌচগ্রহণের প্রথা ইহাদের মধ্যে নাই। কাহারও মৃত্যু হইলে মৃত ব্যক্তির স্বর্গলাভার্থ ইহারা আত্মীয়স্বজন সহ মিলিত হইয়া সমস্ত লোক মদ্যপান ও মাংসাদি ভোজন করে। মৃত দেহ ঘরে রাখিয়াই ভোজন ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। অতঃপর যে-স্থানে মৃত-ব্যক্তির প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে তন্নিকটবর্তী কোনো এক স্থানে একটি মাচা তৈয়ারি করিয়া রাখে এবং মৃত ব্যক্তি আহার করিবে এই বিশ্বাসে মাচার উপর মৃতদেহের নিকট মদ্য মাংসাদি নিত্যই রাখিয়া দেয়। কুকিরা মৃতদেহ ৫ দিন হইতে ৯০ দিন পর্যন্ত ঘরে রাখে এবং প্রত্যহ খাদ্যসামগ্রী দিয়া থাকে। যে ব্যক্তি যত অধিক দিন মৃতদেহ ঘরে রাখিয়া এইরূপে আহার্য দিতে পারিবে, কুকি সমাজে তাহার সম্মান তত অধিক। সামর্থ্যানুসারে লোকে অল্পদিন বা অধিকদিন মৃতদেহ বাড়িতে রাখিয়া থাকে।

অবস্থানুসারে এইরূপে ঘরে রাখিবার পর তাহারা মৃতদেহ কবরে সমাহিত করিয়া থাকে। কবরের স্থান পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন এবং অত্যন্ত গভীর হওয়া আবশ্যক। একজন পূর্ণাবয়ব মনুষ্য কবরের জন্য খনিত গর্তে প্রবেশ করিয়া হস্ত ঊর্ধ্বে উত্তোলন করিলে যাহাতে উপর হইতে দেখা না যায় এইরূপ গভীর করিয়া কবর খননের ব্যবস্থা ইহারা পছন্দ করে।

মৃতদেহ কবরস্থ করিবার পর মৃতের জন্য আর আহার্য প্রদানের নিয়ম নাই। ইহাদের মধ্যে শ্রাদ্ধাদি নাই। কবর দিবারও কোনো নির্দিষ্ট সময় নাই। কোনো মন্ত্রতন্ত্রেরও ইহারা ধার ধারে না। কোনো পুণ্যবান বা পাপীর অপমৃত্যু হইলে উহারা তাহার ঊর্ধ্বগতির জন্য মাত্র পানভোজন করিয়া থাকে। হিংস্র জন্তু দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অথবা অগ্নিদগ্ধ হইয়া কাহারও মৃত্যু হইলে মৃত ব্যক্তির শরীরের যে অংশ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই ঘরে আনিয়া পূর্বোল্লিখিত নিয়ম বজায় রাখিয়া কবর দেয়। মৃত ব্যক্তিকে কবর দিবার আর একপ্রকার প্রথা আছে। রাজা, উজির, মোক্তার অথবা অন্য অবস্থাপন্ন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার মৃতদেহ কাষ্ঠ নির্মিত বাক্সের ভিতর নগ্নাবস্থায় প্রবেশ করাইয়া ঘরের কোনো স্থানে মাচা পাতিয়া তাহার উপর মাটির বিছানা করিয়া সবিশেষ যত্নে অগ্নি জ্বালাইয়া বাক্সটি এমনভাবে ঝুলাইয়া রাখে যে তাহাতে অগ্নিদ্বারা বাক্সটিও নষ্ট হয় না এবং মৃতশরীর হইতে দুর্গন্ধও বাহির হয় না। এইরূপে তিনমাস অর্থাৎ ৯০ দিন পর্যন্ত রাখিয়া থাকে এবং পূর্বোক্ত নিয়মে আত্মীয়স্বজন সমভিব্যাহারে ভোজনাদি করিয়া শেষে মহাসমারোহের সহিত মৃতদেহটিকে কবরস্থ করে। মৃতদেহ ঘরে থাকিলেও ওই ঘরে বিবাহাদি মাঙ্গলিক কার্য হইতে কোনো বাধা নাই।

মৃতদেহ সমাহিত করিবার সময় সামর্থ্যানুসারে তৎসঙ্গে বন্দুক, দা, ঝুলা, নূতন বস্ত্র, ভাত-তরকারি, মদ্য, মাংস প্রভৃতি নিত্য ব্যবহারের জিনিস ও কতকগুলি টাকা অথবা কয়েকটি পয়সা পর্যন্তও কবরের মধ্যে দিয়া থাকে।

স্ত্রীলোকের মৃত্যু হইলেও ওইরূপ করিয়া তাহাদের সঙ্গে সুতা-কাটার চরকা, সর্বদা ব্যবহারের জিনিস, কাপড়, বেম (অর্থাৎ পইছা) মদ্য, মাংস ইত্যাদি সঙ্গে দিয়া কবর দিয়া থাকে। এই প্রথা মাত্র রাজাদিগের জন্য। অপরে এই নিয়ম প্রতিপালন করিতে না পারিলেও তাহাদের কোনো অপমান নাই। রাজা কিংবা অন্য অবস্থাপন্ন লোকের অর্থাভাব, লোকাভাব, স্থান পরিবর্তন, প্রভৃতি কোনো আকস্মিক ঘটনা উপস্থিত হইলে মৃত্যুর পর তৎক্ষণাৎ বাক্সে পুরিয়া মৃতদেহকে কবর দেওয়া হয়। তাহাতেও তাহাদের সম্মানের কোনোরূপ হ্রাস বা পাতিত্যের কারণ নাই।

মৃত ব্যক্তির সমাধিস্থান

যত প্রকার পশুপক্ষীর কঙ্কাল রাখা যায় ততই তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন হয়। পূর্বকালে কোনো কুকিরাজা বা সর্দারের মৃত্যু হইলে বিদেশীয় লোকগণ ভয়ে ওই রাজা বা সর্দারের সমাধির নিকটবর্তী স্থানেও গমন করিত না।



আসামের কুকি জাতি

শ্রীলালতুদাই রায়

বাঙ্গালী পাঠকগণ আসামের পার্বত্য কুকি জাতির নাম শুনিয়া থাকিবেন। কাছাড়, মণিপুর, লুসাই পাহাড় ও পার্বত্য ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চলে এই কুকিজাতির বাস। আমি উক্ত কুকি-জাতীয় লোক। আমাদের সভ্যতা, বর্বরতা, হিংস্রতা প্রভৃতি বিষয়ে নানা গল্প, আমাদের প্রতিবেশী বাঙ্গালী পাঠকগণ শুনিয়া থাকিবেন। আমিও আজ আমাদের অসভ্য সভ্যতা সম্বন্ধে কিছু বলিতে চেষ্টা করিতেছি,—বিশেষভাবে বাঙ্গালীদের নিকট। আমার গোত্র-পরিচয় অবগত হইয়া, পাঠকগণ নিশ্চয়ই আমার সর্ববিধ ত্রুটি মার্জনা করিবেন, এই ভরসাতেই আমার এই প্রয়াস।

কুকিরা আপনাদিগকে কখনও কুকি বলিত না। কুকি বলিয়া কোনো শব্দ তাহাদের ভাষাতেই নাই। কখন কীভাবে বলা যায় না, বাঙ্গালীগণ উহাদিগকে ওই নামে ডাকিতে আরম্ভ করেন। উহার পর হইতেই কুকি শব্দের প্রচলন হইয়াছে। আজকাল কুকিরা আপনাদিগকে কুকি বলিয়াই পরিচয় দেয়। কুকি, লুসাই ও মণিপুরি একই জাতি। শারীরিক গঠনের কথা ছাড়িয়া দিলেও ভাষাতে এত সাদৃশ্য আছে যে, তাহাতে স্পষ্টই উক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়। শ্রীচৈতন্যদেবের পর বৈষ্ণব ধর্ম মণিপুরিদের মধ্যে প্রচারিত হওয়াতে, মণিপুরিরা, কুকি ও লুসাই জাতি অপেক্ষা আজকাল বেশি উন্নত।

কুকিরা কখনও লেখাপড়া জানিত না। জনপ্রবাদের উপর নির্ভর করিয়াই তাহাদের পূর্ব ইতিহাস কতকটা অনুমান করিতে হয়। প্রবাদ যে, কুকিরা "সিনলুং" হইতে এদেশে আসিয়াছে। উহারা মঙ্গোলিয়ান জাতিরই এক শাখা। সম্ভবত বহুপূর্বে চিনদেশের কোনো স্থান হইতে এদেশে আসিয়াছে। ওই চিন হইতে সিন এবং সিন হইতেই সিনলুং শব্দ পরিবর্তিত ও প্রচলিত হইয়া থাকিবে।

করুণাময় খ্রিস্টান মিশনারিগণ যখন আমাদের কথা জানিতে পারিলেন, তখন তাঁহাদের প্রেমসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। আমাদের ত্রাণের জন্য তাঁহারা এমন প্রেম করিলেন যে তাহাতে আমাদের হাবুডুবু খাইতে হইতেছে। আমাদের উপযুক্ত আলোকের সন্ধান এ দেশে না পাইয়া সাতসমুদ্র তেরো নদীর পার হইতে উৎকৃষ্ট বিজলিবাতি আনিয়া আমাদিগকে আলোকিত করিয়াছেন। আলোকিত অবস্থার পূর্বে আমাদের অন্ধকার অবস্থার কথা কিছু বলা দরকার।

বাঙ্গালীদের মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি বিভাগ আছে এবং এক ব্রাহ্মণদের মধ্যেই রাঢ়ি বারেন্দ্র প্রভৃতি নানা শ্রেণি আছে, সেইরূপ কুকিদের মধ্যেও প্রধানত দুইটি বিভাগ—খসাক এবং খটলাং বা ঠিয়াক। খসাকদের মধ্যে খবুং, সেকং, লেইরি, হমারলুসেই, কেইভং, লুংটাও এবং ঠিয়াকদের মধ্যে আমং, খজল, তোলর, বুহ্রীল, ভাংকাল, শেলাতে, পাকুমাতে, টাইতে প্রভৃতি নানা শ্রেণি আছে। পূর্বোক্ত শ্রেণিবিভাগানুসারে ভাষারও কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে।

কুকিরা বলিষ্ঠ, কষ্টসহিষ্ণু, যুদ্ধপ্রিয় ও স্বাধীনতাপ্রিয় জাতি। উহারা অন্যান্য পার্বত্য জাতি অপেক্ষা শান্ত প্রকৃতির। পর্বতে যাহাদের বাস, বাঘ ভালুক নেকড়ে যাহাদের প্রতিবেশী, তাহাদের যুদ্ধপ্রিয় হওয়াই স্বাভাবিক। কুকিরা চাষ করে, সুতা কাটে, কাপড় পরে, ভাত খায়, পরিবারবদ্ধ হইয়া বাস করে। গ্রামের প্রায় মাইল-খানেক দূরে কতকটা জঙ্গল পোড়াইয়া তাহাতে চাষের জমি তৈয়ার করে। তাহাতে ধান, তুলা, লাউ, কুমড়া, ভুট্টা, শিম, তিল, কচু, লংকা, বেগুন, কাঁকুড় ইত্যাদির চাষ হয়। জমির একপার্শ্বে শস্য জমা রাখিবার বন্দোবস্ত করা হয়। সেখান হইতে মাঝে মাঝে নিজেদের ব্যবহারোপযোগী শস্য বাড়িতে আনা হয়। একজনের শস্য অন্যজনে কদাচ স্পর্শ করিবে না। চুরি করিলে ক্ষেত্রদেবতা রাগ করেন এবং ক্ষেত্রদেবতা রাগ করিলে ফসল হইবে না—এই বিশ্বাসেই কেহ কখনও চুরি করে না। (এই সমস্ত অন্ধকার যুগের কথা, আলোকিত যুগে সমস্তই পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে—তাহা পরে দেখানো হইবে)। বাড়িতে মুরগি, ছাগল, শূকর, মিথুন (একপ্রকার গোরু), কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি পোষা হয়। মুরগি, ছাগল, শূকর, মিথুনের মাংস এবং বন্য শূকর, হরিণ, বন্যকুক্কুট ও নানা প্রকার পাখি শিকার করিয়া তাহাদের মাংস পোড়াইয়া বা রান্না করিয়া খাওয়া হয়। শাকসবজি সিদ্ধ করিয়া লবণ ও লংকা যোগে ভাতের সঙ্গে খাওয়া হয়। লবণ নিজেরা তৈয়ার করে। তুলা হইতে সুতা কাটিয়া মেয়েরা কাপড় বুনে। মেয়েরা দুইখানা কাপড় পরে—ছোটো একখানা কোমরে ও বড়ো একখানা বুকে জড়ানো থাকে। পুরুষেরা চার-পাঁচ হাত দীর্ঘ কাপড় লুঙ্গির মতো পরে। শিকার বা যুদ্ধের পোশাক স্বতন্ত্র। বড়ো একখানা মোটা চাদর মাঝে ভাঁজ করিয়া দুই পাড়ের দিক সেলাই করিলে একটি থলিয়ার মতো হয়। তাহাতে হাতের ও গলার জন্য ছিদ্র থাকে। উহাতে কাঁধ হইতে হাঁটু পর্যন্ত আবৃত হয়। ছোটো আর একখানা কাপড় কোমরে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। মাথায় পাগড়ি থাকে। কাজের সময় যুবকেরা চার-পাঁচ হাতের একখানা গামছা মাত্র পরে। আজকাল ক্রমশ পোশাকের পরিবর্তন হইয়া যাইতেছে।

বহু পরিবার একত্রে দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। কোনো কোনো গ্রামে ২৫০/৩০০ ঘর

লোকও বাস করে। গ্রামে একজন সর্দার থাকেন, তাঁহাকে রাজা বলা হয়। রাজা তাঁহার অধীনস্থ প্রত্যেক শ্রেণি হইতে এক একজন মন্ত্রী গ্রহণ করিতেন। গ্রামবাসীদের আপদে বিপদে উঁহারা আবশ্যকমতো ব্যবস্থা করিতেন। ঝগড়া-বিবাদ উঁহারাই মীমাংসা করিয়া দিতেন। ব্যবস্থা বিচার সমস্তই রাজার ঘরে সম্পন্ন হইত। প্রত্যেক গ্রামবাসী রাজার আদেশ মান্য করিয়া চলিত। রাজা ছাড়া প্রত্যেক গ্রামেই একজন পুরোহিত ও একজন কর্মকার থাকিতেন। যে-সমস্ত বিচার রাজা করিতে পারিতেন না, পুরোহিত নানা অভিনব উপায়ে সেই সব মীমাংসা করিয়া দিতেন। প্রতি বৎসর ফসল কাটা হইলে, রাজা, পুরোহিত ও কর্মকার প্রত্যেকে এক এক ঝুড়ি ধান প্রতি গৃহস্থের নিকট করস্বরূপ পাইতেন।

বাহিরের শত্রু এবং বন্য জন্তুর আক্রমণ হইতে গ্রামকে রক্ষা করিবার জন্য চারিদিকে কাঠেব বেড়া থাকিত। গ্রামস্থ যুবকেরা পালা করিয়া রাত্রে গ্রাম পাহারা দিত। শিকারে ও যুদ্ধে আগে তির ব্যবহৃত হইত, পরে বন্দুকের প্রচলন হইয়াছে। পাহাড়িদের মধ্যে এমন যুবক নাই, যে বন্দুক ব্যবহার করিতে জানে না। সাপের মাথা হইতে বিষ কৌশলে তিরের ফলাতে মাখাইয়া রাখা হইত। সেই তির যাহাকেই বিদ্ধ করুক তাহার আর নিস্তার ছিল না। কুকি অধিকৃত স্থানগুলি ইংরাজের অধিকারে আসিবার পূর্বে ইহাদের নিজেদের মধ্যেও যথেষ্ট যুদ্ধবিগ্রহ হইযাছে।

কুকিদের মধ্যে অবরোধ-প্রথা নাই। ছেলেমেয়েদের বিবাহ পিতামাতাই দিয়া থাকেন। বিবাহের পর বধূ শ্বশুরঘরে গিয়া বাস করে ও শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা করে। কুকিরা ভাত হইতে একপ্রকার মদ্য তৈয়াবি করে। তাহা পান করিলে বেশি নেশা হয় না বা বিশেষ কোনো অনিষ্টও হয় না। যুবক যুবতিরা ক্ষেত্রে কাজ করে। বৃদ্ধ বৃদ্ধারা বাড়িঘর ও ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ের তত্ত্বাবধান করে। খেতে যাইবার পূর্বে গ্রামের সমুদয় যুবক যুবতি মদ্য পান করিয়া একত্রে দলবদ্ধ হইয়া ক্ষেত্রে রওয়ানা হয়। যুবকদের মধ্যে যাহার কণ্ঠস্বর অতিশয় মিষ্ট সেই দলের নেতা হয়। উক্ত নায়ক একটি ঢোলক ও শিঙা বাজাইয়া গান করিতে থাকে। তাহার সঙ্গে সকলেই গান করিতে করিতে অগ্রসর হয়। সংগীতের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দিন ধরিয়া খেতের কাজ চলিতে থাকে।

যদিও খ্রিস্টান মিশনারিগণ অস্বীকার করেন—তবুও আমরা কুকি সমাজকে বিরাট হিন্দুজাতিরই একটি অংশ মনে কবি। সরকারি গণনায় কুকিদিগের হিন্দু লেখা হয় না ; পার্বত্যধর্ম বলিয়া লেখা হয়। তাহার নানা কারণ আছে,—তাহা এখানে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। কুকিরা পবমেশ্বরে বিশ্বাসী। ইহারা পরমেশ্বরকে "পাথিয়ান" বলে।

হিন্দুদের অনুরূপ বহুদেবতার পূজা শ্রাদ্ধাদি ও পিতৃদেবতার পূজা কুকিদের মধ্যে প্রচলিত আছে। প্রচারিত আছে যে পার্বত্যজাতিরা ভূতোপাসক। ভূতের পূজা আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহা অস্বীকার করি না। খ্রিস্টান ও মুসলমানদের শয়তান, বা বৌদ্ধদের মারের সম্বন্ধে যে বিশ্বাস, আমাদের ভূত সম্বন্ধে বিশ্বাসও তদপেক্ষা বিশেষ নিকৃষ্ট নহে। আমরা শিব, কালী, গঙ্গা, রাম লক্ষ্মণ ও লক্ষ্মীর পূজা করি। কুকিদের বিশ্বাস, দেবতারা সুখসম্পদ দেন—ভূতেরা শুধু রোগ, শোক ও দুঃখ দেয়। হিন্দুসমাজের

যে-কোনো নিম্নস্তরের ধর্মবিশ্বাস ও আচরণের সঙ্গে আমাদের বিশেষ পার্থক্য নাই। পূজাতে পশুবলি হয়। মদ্যপান, নৃত্য, বাদ্য ও সংগীত সবই হয়।

আমাদের দিনগুলি ভালভাবেই চলিয়া যাইত। আমাদের অভাব অতি সামান্য ছিল এবং তাহা পূরণের জন্য বিশেষ বেগ পাইতে হইত না। গ্রামস্থ সমুদয় লোক এক পরিবারের লোকের মত বাস করিত। একজন অন্যজনকে বিপদের সময় প্রাণ দিয়াও সাহায্য করিত। সমুদয় অশান্তির মূল "স্বার্থ" জিনিসটি আমাদের মধ্যে বড়ো ছিল না।

অন্ধকার যুগের কথা সংক্ষেপে বলা হইল—এইবার আলোকিত যুগের কথা। পূর্বেই বলিয়াছি—মিশনারি মহাত্মারাই আমাদিগকের প্রেম দিয়া হঠাৎ এই আলোকে লইয়া আসিয়াছেন। অন্ধকার হইতে হঠাৎ এই তীব্র আলোকে আসিয়া আমাদের চোখে ধাঁধা লাগিয়াছে। অন্ধকারে আমরা ছিলাম বরং ভালো। আলোকে যে চোখ যায়! পথও খুঁজিয়া পাইতেছি না। আমাদিগকে পথের সন্ধান কে দিবে?

গৃহবিবাদে ও যুদ্ধবিগ্রহে দুর্বল পার্বত্যজাতি ইংরেজদের বশ্যতা স্বীকার করিল। সাদা-লোক তাহাদের চোখে এক ভীতির বস্তু। সেই মিশনারিরা গিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন,—'প্রভু যিশুকে বিশ্বাস করো—তোমরা পরিত্রাণ পাইবে। যিশু আমাদিগকে তোমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন। তোমরা পশু, তোমরা অসভ্য, মূর্খ, বর্বর, ভূত। তোমরা কিছু জান না। তোমরা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ কর। ইংরাজ খ্রিস্টান, তাই দেখ কত বড়ো। দেখ—যিশু আমাকে কেমন সুন্দর জুতা দিয়াছেন, টুপি দিয়াছেন, কোট দিয়াছেন, সিগারেট দিয়াছেন। আমার কথা শুনিলে তোমরাও এইরূপ পাইবে। অসুখ হইলে তোমরা ভূতের পূজা কর। তোমরাও ভূত। এই দেখ যিশু আমাকে কেমন সুন্দর ঔষধ দিয়াছেন।' পাদরি গ্রামস্থ কোনো রোগীকে কিছু ঔষধ খাওয়াইয়া দিলেন। জীবনে কখনও সে ঔষধ খায় নাই, ঔষধ খাওয়া মাত্রই হয়তো আরোগ্য লাভ করিল। খ্রিস্টধর্মে আর কি অবিশ্বাস থাকিতে পারে? অজ্ঞ সরল পার্বত্যলোকেরা কতক ভয়ে, কতক বিস্ময়ে, কতক লোভে মিশনারিদের কথা শুনিতে লাগিল। ধীরে ধীরে কেহ কেহ খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। কোনো কোনো সংক্রামক রোগের লক্ষণ এইরূপ শুনিয়াছি, নিজে কষ্ট পাইতেছে এবং অন্যের সঙ্গে মিশিলে অন্যেরও রোগ হইতে পারে এ কথা জানিয়াও রোগী অন্যের সঙ্গে মিশিবার জন্য সর্বদা চেষ্টা করে। আমাদের বেলাও তাহাই হইতেছে, যাহারা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহারা নিজে ভাল না থাকিলেও, অন্যকে সর্বদা দলে টানিবার বিশেষ পক্ষপাতী। চা-বাগানের আড়কাঠির মতো ইহাতে বেশ দু-পয়সা রোজগারও হয়—প্রসাদী হ্যাট, কোট, জুতাও পাওয়া যায়।

মিশনারিদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আজ আমরা স্বর্গের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি। সেখানে নাকি আমাদের 'সিট রিজার্ভ' হইয়া আছে। আমাদের মধ্যে শতকরা নব্বই জনের উপর আজ খ্রিস্টান। গ্রামে গ্রামে খড় ও বাঁশের চার্চ ও স্কুল স্থাপিত। আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে সিগারেট ও মাথায় টুপি।

আমাদের পিতা, পিতামহ ভূত ছিলেন ও বর্বর ছিলেন, আর আমরা আজ ধাপে ধাপে স্বর্গের দিকে অগ্রসর হইতেছি। আমরা সভ্য হইয়াছি, আলোকিত হইয়াছি। সুতরাং

পাঠকগণের নিকট আমার বিনীত অনুরোধ, আপনারা আমাদিগকে আর ঘৃণা করিবেন না। আপনারা আমাদিগকে এখন আর ঘৃণা করিতে পারেনই না,—বরং আমরাই তো হিদেন ও পৌত্তলিক বলিয়া আপনাদিগকে কিছু কিছু ঘৃণা করিতে অভ্যাস করিতেছি।

এখানে একটি কথা বলিয়া রাখা দরকার। ব্যক্তিগত বা কোনো সম্প্রদায়বিশেষের বিদ্বেষ বা নিন্দা প্রচার করা আমার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কুকিদের অবস্থা আজ জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। যেসব সমস্যা আজ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত, তাহার কোনো মীমাংসা করিতে না পারিয়াই সুধিগণের সহায়তা কামনায় এই প্রবন্ধ লিখিতেছি। কুকিদের কথা আলোচনা করিতে গেলেই নানা অপ্রিয় প্রসঙ্গের অবতারণা অনিবার্য। আমি অপ্রিয় কথাগুলি যথাসাধ্য বাদ দিয়াই লিখিবার চেষ্টা করিতেছি। এই অবাঙ্গালী অপটু লেখকের বাঙ্গালা লেখাতে তাহার উদ্দেশ্যের বিপরীত ভাব কেহ দেখিতে পাইলে, তাহা তাহার অনভ্যস্ত হস্তেরই দোষ মনে করিয়া মার্জনা করিবেন।

মিশনারিগণ আমাদের জন্য কী কী করিয়াছেন ও করিতেছেন?—(১) অসভ্য জাতিকে সভ্য করিতেছেন। (২) ধর্মহীন জাতিকে ধর্ম দান করিতেছেন। (৩) সাহিত্যহীন জাতিকে সাহিত্য দান করিতেছেন। (৪) ঔষধ দিতেছেন। (৫) মদ্যপান বন্ধ করিয়াছেন।

(১) মিশনারিরা আমাদিগকে সভ্য করিতেছেন। এই সভ্যতার অর্থ কী? সভ্যতার অর্থ যদি পোশাক-পরিচ্ছদ হয় তবে কথাটি ষোলো আনাই সত্য বটে। প্রত্যেক দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা, আবহাওয়া একরূপ নহে। যেখানের যে অবস্থা সেই অবস্থার সঙ্গে মিল করিয়া মানুষের আহার-বিহার, পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করিতে হয়। আজ যখন আমাদের পল্লিতে পল্লিতে হ্যাট, কোট, বুট, সিগারেটের ধুম দেখি,—তখন কাকের ময়ূর সাজিবার গল্পই মনে হয়। পূর্বেই বলিয়াছি, আমাদের অভাব অতি সামান্য ছিল, কিন্তু এখন নিত্য নূতন অভাবের সৃষ্টি হইতেছে, অথচ সেই অভাব মোচনের কোনো নূতন বৈধ উপায় আবিষ্কৃত হইতেছে না। উদ্দাম বিলাসিতাই যদি সভ্যতা হয়, তবে সেই সভ্যতাকে দূর হইতে নমস্কার করাই ভাল। আমাদের যা-কিছু সবই খারাপ, আর পাশ্চাত্যের সবই ভাল, এই একটা ভাব সমাজের মধ্যে বিশেষভাবে যুবকদেব মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। এ ভাব আনিয়াছে কাহারা? আমাদের অর্থের বিশেষ প্রয়োজন ছিল না,—এবং আমাদের আর্থিক অবস্থা তেমন ভালও নয়। আমাদের মত অজ্ঞ ও অসমর্থ জাতির মাথায় এইরূপ সভ্যতার প্রচণ্ড বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাই ভাবি ইহার শেষ কোথায়? যদি বলা যায়, আমাদের নানা কুসংস্কার দূর করা হইতেছে। হইতে পারে, একথা আংশিক সত্য, কিন্তু গাছের আগাছা কাটিতে গিয়া, যে মালি গাছেরই মূলচ্ছেদ করে, আজ আমাদের শিক্ষকেরাও সেইরূপ করিতেছেন না কি? কুকিরা মনে করিত, চুরি করিলে দেবতা রাগ করেন, আর দেবতা রাগ করিলে শস্য হইবে না, এবং আরও নানা অমঙ্গল হইবে। এই বিশ্বাসে কেহ কখনও চুরি করিত না। ইহা একটি কুসংস্কার। আর আজ যিনি খ্রিস্টকে বিশ্বাস করেন—তিনি চুরি করুন, নানা অসৎ কাজ কবুন, তাহাতে কোনো আপত্তি নাই, তার জন্য যে খ্রিস্টই দায়ী। তিনি তো তাঁর আসন স্বর্গে রিজার্ভ কবিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং যাহা প্রাণ চায় করো—কেবল খ্রিস্টকেই বিশ্বাস করিলেই হইল। এই বিশ্বাসের

নাম সুসংস্কার। সভ্যতার উচ্চ সোপানে আমরা কীরূপ দ্রুত অগ্রসর হইতেছি, ইহা তাহার একটি মাত্র নমুনা। দরকার হইলে এইরূপ উদাহরণ অসংখ্য দেওয়া যাইতে পারে। কুকিদের সত্যবাদিতা, সরলতা, সাধুতা, বিশ্বাসপরায়ণতা, আতিথেয়তা প্রসিদ্ধ। কিন্তু এখন সভ্য হইয়া সত্যবাদী হইলে ব্যবসায়ই যে বন্ধ হইয়া যায়। সরলতা, সাধুতা ও বিশ্বাসপরায়ণতার কথা বলিবার দরকার নাই। এ সব তো বোকামি। নিজের আত্মীয়কুটুম্বও সব সময়ে গৃহে স্থান পান না, এই তো গেল আতিথেয়তা। সভ্যতা লাভ করিতে গিয়া আমাদের যা কিছু ছিল সবই হারাইলাম।

গ্রামে গ্রামে স্কুল ও চার্চ আছে। লেখাপড়া শিখিবার জন্য আমাদের জাতির কীরূপ উৎসাহ তাহা নিজে না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না। ৩০/৩৫ বৎসরের লোকেও ১০/১২ বৎসরের বালকের সঙ্গে লেখাপড়া করিতেছে, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। মিশনারি বিদ্যালয় ছাড়া অন্য কোনো বিদ্যালয় পাহাড়ে নাই, মিশনারিদের বিদ্যালয়ে অখ্রিস্টান কোনো ছেলেমেয়ে পড়ে এরূপ কথা কখনও শুনি নাই।

দেশীয় প্রচারককে পাস্তর বলে। গ্রামে গ্রামে পাস্তর আছে। এই পাস্তরগণ ও গ্রাম্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণই ধর্ম প্রচার করেন, লোককে, খ্রিস্টান করিবার জন্য ও পাশ্চাত্য ভাব দিবার জন্য যে কীরূপ প্রোপাগান্ডা করা হয় তাহা বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতীত। বলিতে গেলে সব সময় রুচি বা শ্লীলতা রক্ষা করা সম্ভব হইবে কিনা জানি না। আমরা অজ্ঞ, সাহিত্যহীন, নিরাশ্রয়, অরণ্যবাসী, নাবালক মাত্র। যে আমাদের সর্বস্ব হরণ করিতেছে তাহারই হাতে আত্মসমর্পণ করিতেছি। যে আমাকে, আমার পূর্বপুরুষকে, আমার দেশকে, শতমুখে নিন্দা করিতেছে—আমরা তাহারই সঙ্গে সহস্রমুখে আমাদেরই বাপান্ত করিতেছি ও মাথায় কুঠার মারিতেছি। এইভাবেই ধ্বংসের চরমসীমায় উপস্থিত হইয়া আমরা সভ্যতা পাইতেছি—অন্ধকার হইতে আলোকে যাইতেছি।

(২) একটি ধর্মহীন জাতিকে ধর্মদান করা হইতেছে। আমরা কখনও ধর্মহীন ছিলাম না। আমরা যদি ধর্মহীন হই, তবে ভারতের ২০ কোটি হিন্দুর মধ্যে ১৫ কোটিই ধর্মহীন। হইতে পারে, আমাদের কোনো ধর্মগ্রন্থ নাই, হইতে পারে, আমাদের মধ্যে ধর্মের সম্যক বিকাশ হয় নাই, কিন্তু আমাদের যাহা আছে, তাহার উন্নতির চেষ্টা না করিয়া যে ধর্মদান করা হইতেছে, তাহাতে মনে হয় গাছের মূলোচ্ছেদ করিয়া মাথায় জল দেওয়া হইতেছে, অথবা মেষের মাথা কাটিয়া বলদের স্কন্ধে যোগ করিয়া দেওয়া হইতেছে।

আমাদের প্রকৃত অভাব ধর্মের নয়। শিক্ষার কালচারের। ধর্মদান ব্যাপারটা অনেকেই যত সোজা মনে করেন তত সোজা নয়, যে-সে লোক ধর্ম দিতেও পারে না, লইতেও পারে না। কিন্তু আজ দেখিতেছি, যে-সে লোক ধর্মদাতা সাজিয়া মোটা বেতন (অবশ্য আমাদের তুলনায়) পাইতেছেন এবং হাজার হাজার লোককে ধর্মদান করিতেছেন। এই ধর্মদান ব্যাপার একটি বাহ্যিক ভান নয় কি?

(৩) আমাদের কোনো লিখিত গ্রন্থ ছিল না। আমাদের ভাষার কোনো বর্ণমালাও নাই। পাদরিদের কল্যাণে আমাদের ভাষায় রোমান বর্ণমালায় অনূদিত হইয়া মাত্র কতকগুলি খ্রিস্ট ধর্মগ্রন্থ ও চার্চের গানের পুস্তক ছাপা হইয়াছে। তাহাতে আমাদের সাহিত্যের যে কী

হইল বুঝিতেছি না। রোমান বর্ণমালা একে বিদেশি, তার উপর আমাদের ভাষার যথার্থ উপযোগী বলিয়া মনে হয় না। রোমান বর্ণমালা অপেক্ষা বাংলা বর্ণমালাতে আমাদের ভাষা ভালো লেখা হইবে বলিয়া মনে হয়। বাঙ্গালীরা আমাদের প্রতিবেশী। আমাদের সমুদয় ব্যবসা বাঙ্গালীদের সঙ্গে। সুতরাং বাঙ্গালা ভাষা জানা আমাদের নিতান্ত দরকার। তার উপর বাংলার মত একটি উন্নত ভাষার মানসিক সম্পদের অধিকারী হইবার সুযোগ পাইলে আমাদের যথার্থ উপকার হয়। আমাদের সমগ্র জাতিই বাংলা ভাষা শিখিবার জন্য খুব উৎসুক। কিন্তু সুযোগ কোথায়? মিশনারিদের বিদ্যালয়ে সামান্য ইংরেজি মাত্র শিক্ষা দেওয়া হয়। ছাত্রগণকে বেশি শিক্ষা প্রদান করা কর্তৃপক্ষ অনাবশ্যক মনে করেন, কোনো রকমে বাইবেলখানা পাঠ করিতে পারিলেই হইল। আবার যাহা শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাও এত অপ্রচুর যে, যদিও বা কোনো ছাত্র মিশনারিদের বিদ্যালয়ে উত্তীর্ণ হইয়া শিলচর হাইস্কুলে ভর্তি হয়, তাহা হইলে সেখানে পড়া ভাল চালাইতে পারে না। মিশনারিদের স্কুলে কখনও বাংলা ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয় না। বিদেশি পোশাক আমাদের পোশাক হইয়াছে। পারি আর না পারি, বিদেশি আচার-ব্যবহার অনুকরণ করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছি। বিদেশি বর্ণমালায় আমাদের লেখাপড়া চলিতেছে। প্রতিবেশী বাঙ্গালীদের সঙ্গে আমাদের কথা কহিতে হইলে আমাদের ইংরেজির আশ্রয় লওয়া ছাড়া উপায় নাই। ইহাতে আমরা ক্রমশ এদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছি এবং ইহার একমাত্র কারণ এই মিশনারি আন্দোলন।

(৪) ঔষধ দেওয়া হইতেছে। ঔষধ দিয়া মিশনারিরা শুধু খ্রিস্টান-পরিবারদের যথেষ্ট উপকার করিতেছেন,—ইহাতে সন্দেহ নাই। তবে শিক্ষাহীন জাতির পক্ষে সবই বিড়ম্বনা। রোগ দিন দিন বাড়িতেছে। সুস্থ সবলকায় লোকের সংখ্যা দিন দিন কমিতেছে। পাহাড়িরা নানা প্রকার গাছ-গাছড়া হইতে ঔষধ ব্যবহার করে। সেগুলি রোগে চমৎকার কাজ করিত। এখন এই সব অসভ্যতা। ঘরে ঘরে বিলাতি পেটেন্ট ঔষধ দ্বিগুণ ত্রিগুণ মূল্যে বিক্রয় করা হইতেছে। ডাক্তারখানাতে ডাক্তারের দরকার হয় না—কম্পাউন্ডার বাবুরাই ধন্বন্তরি। অনেক সময়ে অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী হইয়া দাঁড়ায়। তবে পাহাড়িরা এসব বোঝে না, তাই রক্ষা।

মিশনারিরা ঔষধ দিয়া আমাদের উপকার করিতেছেন। সেই ঔষধ গলাধঃকরণের সঙ্গে সঙ্গে আমরা মিশনারিদের নিষ্কাম প্রেম ও প্রভু যিশুকে একমাত্র পরিত্রাতা বলিয়া দৃঢ় (অন্ধ নয়) বিশ্বাস করিতে ত্রুটি করিতেছি না।

(৫) যাহারা খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করিতেছে, তাহারা কেহই মদ্য পান করে না। বাহির হইতে দেখিলে এ একটা মস্ত কাজ বটে। মদ্যপান না করাই ভালো। পূর্বেই বলিয়াছি আমরা নিজে ভাত হইতে এক প্রকার মদ্য তৈয়ার করিয়া উৎসবের সময় বা খেতের কাজ করিবার সময় পান করি। তাহাতে স্বাস্থ্যের কোনো ক্ষতি করে বলিয়া কোথাও দেখি নাই। এই মদ্য বন্ধ করাতে আবালবৃদ্ধবনিতা সিগারেট ধরিয়াছে। পাঁচ বৎসরের শিশুরও সিগারেট না হইলে আর চলে না। কোনো জাতির মধ্যে মাদকদ্রব্যের ব্যবহার একেবারে বন্ধ করা শক্ত। স্বাস্থ্যহানি ও অর্থহানির দিক হইতে মাদকদ্রব্যের বিচার করিলে কী দেখি? আমাদের দেশীয় মদ্য অপেক্ষা শুধু সিগারেটে কমপক্ষে এক হাজার গুণ খরচ

বেশি। দেশীয় মদ্য প্রস্তুত করিতে আমাদের কোনো খরচ লাগে না। দেশীয় মদ্যে কাহারও স্বাস্থ্যের কোনো প্রকার হানি করিতে আমি কখনও দেখি নাই। সিগারেট কী ক্ষতি করে তাহা তো চিকিৎসকগণের অভিমতই প্রামাণ্য। সিগারেটের মত চায়ের কাটতিও দিন দিন ভীষণভাবে বাড়িতেছে। আমাদের মতো গরিব জাতির পক্ষে এই সব বালাই সুখের না হইয়া দুঃখেরই হয়।

আমাদের উপার্জনও বেশি ছিল না, সেইরূপ অভাবও বড় ছিল না। ছেলেমেয়েরা পিতামাতাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত। বধূরা শ্বশুরশাশুড়ির সেবা করিত। দিনগুলি আমাদের শান্তিতে যাইত। বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টে আছে—যিশুর ভাব পাইয়া ছেলেরা পিতামাতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে, পিতামাতারা ছেলের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে।" এই কথার উপর খুব বেশি জোর দিয়া প্রচার করা হইতেছে। অধিকাংশ স্থলে যুবকেরা পাশ্চাত্য চাকচিক্যে মোহিত হইয়া খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। তাঁহারা যখন শুনিতে পায় পিতামাতার কথা শুনিবার দরকার নাই, তখন আর তাহাদিগকে কে রাখে? যুবক-যুবতিরা পিতামাতার অবাধ্য, অনেকস্থলে বৃদ্ধ পিতামাতাকে অসহায় অবস্থায় রাখিয়া চলিয়া যায়। গ্রাম্য পাস্তর (প্রচারক) মুসলমান মোল্লার মত গ্রামের একচ্ছত্র অধিপতি। তাঁহার হুকুমই খোদার হুকুম। ছেলেমেয়ের উপর পিতামাতার কোনো হাত নাই। তিনি যাহা বলেন তাহাই হয়। ছেলেমেয়ের বিবাহ পিতামাতাই দিত, এখন তাহা পাস্তরের ইচ্ছাধীন। তিনি যেখানে ইচ্ছা বিবাহ দিতে পারেন বা যখন ইচ্ছা বন্ধও করিতে পারেন। ইহাতে পিতা-মাতার বলিবার কিছু নাই। এই সব কারণে আমাদের পারিবারিক জীবন যে কীরূপ বিষময় হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা বলিবার নয়।

মিশনারি আন্দোলন সকল প্রকারে আমাদিকে ধ্বংসের পথে লইয়া চলিয়াছে। কে-ই বা বুঝিবে আর কাহার নিকটেই বা কাঁদিব? আমার স্বজাতীয় বৃদ্ধদের মধ্যে যাহারা এখনও খ্রিস্টান হয় নাই, তাহারা সমাজে কোণঠাসা। তাহারা একে নিরক্ষর, তার উপর পাদরিদের অত্যাচারে জর্জরিত। আর দেশবাসীর নিকট আমরা তো বাঘ ভালুক বা এই রকম কিছু।

পতিত জাতিদের সাহায্য করিবার জন্য আজ সারা ভারতময় আন্দোলন চলিতেছে। আমরা পতিত, নিরাশ্রয়। বিরাট হিন্দুসমাজের দ্বারে আমরা ভিক্ষাপ্রার্থী, কৃপাপ্রার্থী। আমরা পতিত, অক্ষম, বা যাই হই, আমরা হিন্দুই। সমগ্র জাতির এককোণে আমরাও কী একটু স্থান পাইব না? আমরা কী এতটুকু সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইব? মিশনারি আন্দোলন কীভাবে আমাদিগের সর্বনাশ করিতেছে, তাহা লিখিতে গেলে একখানা বৃহৎ পুস্তক হইবে। আমি অতি সংক্ষেপে লিখিয়াছি।

খ্রিস্টীয় আন্দোলন কেবল যে আমাদের সর্বনাশ করিতেছে তাহা নয়, ইহাতে সমস্ত দেশেরই একটি বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। আমি ধর্মের দিক হইতে বলিতেছি না ; কারণ শুধু ধর্মের জন্য কাহারও স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া ধর্মান্তর গ্রহণ করিবার কোনো আবশ্যকতা নাই। ধর্ম হিসাবে খ্রিস্টধর্মকে বা কোনো ধর্মকেই আমি অশ্রদ্ধা করি না। আমি দেশের দিক হইতে বলিতেছি, জাতীয়তার দিক হইতে বলিতেছি। আজ দেশের সমুদয় চিন্তাশীল

ব্যক্তিই একটি কথা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছেন, "হিন্দু মুসলমান সমস্যার সমাধান না হইলে ভারতের কল্যাণ নাই।" এই হিন্দু মুসলমান সমস্যার জন্য দায়ী কে? হিন্দুরাই নহে কী? যখন মুসলমানরা এদেশে আসিয়াছিল তখন তাহাদের কয়জনই বা এদেশে স্থায়ীভাবে বাস করিয়াছিল। ভারতের প্রায় সমুদায় মুসলমানই তো এককালে হিন্দু ছিল। কেন তাহারা মুসলমান হইল? কেন ইহারা হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান হইয়াছে এবং এই হিন্দু মুসলমান সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে? এর জন্য দায়ী কে? বলা যাইতে পারে, উচ্চবংশের হিন্দুরা কখনও স্বেচ্ছায় ধর্মান্তর গ্রহণ করে না। হইতে পারে ইহা সত্য কথা। হিন্দুসমাজ তাহার নিম্ন শ্রেণিকে আপন গন্ডির মধ্যে রাখিতে পারেন না কেন? কেবল দল ছাড়া নয়, প্রতিপক্ষের দল বৃদ্ধি করা। এইসব দেখিয়া মনে হয়, আজ হিন্দু মুসলমান সমস্যার সমাধান তো হইতেছেই না, উপরন্তু আবার খ্রিস্টান সমস্যা নামক তৃতীয় সমস্যা ধীরে ধীরে মাথা তুলিতেছে। হিন্দু সমাজ আর কত কাল ঘুমাইবেন? এতদিনে অন্তত ঠেকিয়াও শেখা উচিত ছিল।

পূর্বেই বলিয়াছি, আমাদের বিষয় চিন্তা করিয়া কোনো কূলকিনারা পাই না। সুধিগণের উপদেশ ও সহানুভূতি পাইবার আশাতেই এই প্রবন্ধ লিখিতেছি। কাছাড়, মণিপুর, লুসাই পাহাড়ের শত শত বর্গ মাইল ধরিয়া কেবল পাহাড় এবং এই পাহাড়ে হাজার হাজার পাহাড়ি লোক বাস করিতেছে। লোকচক্ষুর অন্তরালে উহারা কীরূপ ভাবে দিন দিন সর্বস্বান্ত হইয়া দেশের নিকট পর হইয়া যাইতেছে, তাহা কেহই বুঝিতেছেন না। পাহাড়িরাও বুঝিতেছে না। কিন্তু কালে এর ফল বিষময় হইবে এবং সেই বিষময় ফল সমগ্র দেশবাসীকেই ভোগ করিতে হইবে। ইহারা চিরকালই অসভ্য থাকিবে না। এখনও সময় আছে। এখনও দেশবাসীরা ইচ্ছা করিলে ইহাদিগকে টানিয়া লইতে পারিবেন। বিশেষত পাহাড়িদের মধ্যে খ্রিস্টধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা কমিয়া গিয়াছে। প্রচারকগণের চরিত্রই বোধহয় এর জন্য দায়ী। খ্রিস্টানদের মধ্যে অনেকেই আজকাল নাম কাটাইয়া লইতেছে। ইহারা এখন বাহিরের কোনো জিনিস চাহিতেছে। এখনই যদি উহাদিগকে শিক্ষা ও ধর্ম দিয়া সাহায্য করিতে কেহ অগ্রসর হন তবে যথার্থ উপকার হইবে। একটা অবলম্বন ভিন্ন কেহ থাকিতে পারে না। আমাদের মধ্যে যাহারা মিশনারি আন্দোলনে যোগ দেয় নাই বা একবার যোগ দিয়া সংস্রব ত্যাগ করিয়াছে তাহারা আজ দেশবাসীর নিকট হইতে সারবান কিছু চাহিতেছে। কিছু দিন অপেক্ষা করিয়া যদি কিছু না পায়, তবে "পুনর্মুষিক" হইয়া যাইবে।

প্রবাসী ● ভাদ্র ১৩৩৭ (১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ)



লেপচা জাতির কথা

শ্রীনলিনীকান্ত মজুমদার

প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মতে মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থোল্লিখিত কিন্নর জাতিই বর্তমানে লেপচা জাতির পূর্বপুরুষ। লেপচাগণ যেরূপ সুকণ্ঠ, নৃত্যনিপুণ ও ধনুর্বিদ্যাকুশল তাহাতে পণ্ডিতগণের এ অনুমান সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও কাল্পনিক বলিয়া মনে হয় না।

কিন্নোরোপম সুন্দর বাহ্যিক আকৃতির অনুরূপ ইহাদিগের অন্তরখানিও অতি কোমল। কিন্তু ইহারা একদিকে যেমন সরল ও অমায়িক, অন্যদিকে আবার তেমন উগ্র ও ভীষণ। লেপচা স্ত্রী পুরুষ প্রয়োজন বোধ করিলে কঠিন পরিশ্রম করিয়া জীবিকার্জন করে এবং নিতান্ত হীনাবস্থায় পতিত হইলেও কখনও চৌর্য বা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে না।

ইহারা বাঁশ হইতে অতি উৎকৃষ্ট গৃহসজ্জা, আসন ও ভোজনপাত্র, এবং অব্যবহার্য ছিন্ন পরিত্যক্ত বস্ত্রাদি দ্বারা 'লেপচা-চাদর' নামক অতি সুন্দর চাদর প্রস্তুত করিয়া থাকে,—লেপচা রমণীগণের গৃহশিল্প একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়।

লেপচা পুরুষেরা "দম" ও "কু"* নামক দুই প্রস্থ পোশাক পরিধান করে, এবং কোথাও গমনাগমন করিতে হইলে কটিদেশে "বাণ" নামক একহস্ত পরিমিত দীর্ঘ ও তিন অঙ্গুলি প্রস্থ তীক্ষ্ণাগ্র ছুরিকা বহন করে। পোশাকগুলি সাধারণত রেশম বা মখমল নির্মিত এবং দেখিতে অনেকটা ঢিলা চাপকানের মতো। স্ত্রীলোকেরা হাতাহীন দম নামক পোশাক মাত্র ব্যবহার করে এবং কেশ সংস্কারকালে কেশগুলিকে দুইভাবে বিভক্ত করিয়া বেণীর আকারে পৃষ্ঠদেশের উপর দিয়া ঝুলাইয়া দেয়, কখনও বা লম্বিত বেণী দুটিকে উর্ধ্বদিকে মস্তকের পার্শ্বে বেষ্টন করিয়া সীমন্ত দেশে গ্রন্থিবদ্ধ করিয়া রাখে। স্ত্রীলোকেরা কোনোরূপ

দম=নীচের পোশাক, কু=উপরের পোশাক

অবগুণ্ঠন ব্যবহার করে না। লেপচাদিগের মধ্যে জাতি বিভাগ না থাকিলেও সাধারণ লেপচাগণ, বানর, ও সর্পভুক লেপচা এবং "তামসাংবু" লেপচাগণের সহিত কোনোরূপ সামাজিক সংশ্রব রাখে না।

যে সময়ে সিকিম ভুটান কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল ওই সময়ে তিস্তা নদীর পূর্ব তীরবাসীগণ প্রাণভয়ে ভীত হইয়া বিনা যুদ্ধে ভোট সৈন্যের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। সিকিমি লেপচাগণ ইহাদিকে ঘৃণিত "তামসাংবু" অথবা "দাস" আখ্যা প্রদান করিয়াছে।

লেপচাদিগের মধ্যে একটি প্রবাদ আছে যে, জগতে যতদিন বানর জাতি জীবিত থাকিবে, ততদিন লেপচা জাতিরও অস্তিত্ব রহিবে—বানরের সহিত লেপচার জাতিগত বিশেষ কী নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে তাহা শুধু পণ্ডিতগণই বলিতে পারেন।

লেপচা সমাজে পাত্র অপেক্ষা পাত্রীর বয়ঃক্রম অধিক হওয়া বিশেষ আপত্তিজনক বা দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হয় না। গোপনে কোনো যুবকের সহিত কোনো যুবতির প্রণয় সংঘটিত হইলে তাহা কৌশলে অভিভাবকগণের গোচরে আনীত হয়, এবং গ্রামের প্রধানগণের সম্মতি ক্রমে উভয়ে উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকে।

বিবাহে কন্যার পিতা বরপক্ষের নিকট হইতে পাত্রীর মূল্যস্বরূপ পণ গ্রহণ করিয়া থাকেন ; পণের পরিমাণ সকল ক্ষেত্রেই বরের আর্থিক সংগতি অনুসারে স্থিরীকৃত হইয়া থাকে।

সাধারণত বিবাহের সম্বন্ধ 'পিবু' বা ঘটকের দ্বারাই সংস্থাপিত হইয়া থাকে, এবং বরপক্ষকে বিবাহের প্রথম প্রস্তাব উত্থাপন হইতে শেষ পর্যন্ত সকল বিষয়েই পিবুর মতানুবর্তী হইয়া চলিতে হয়। দেশের সামাজিক রীতি অনুসারে তাঁহারা কোনো বিষয়েই তাঁহার কার্যের প্রতিবাদ করিতে পারেন না।

এদেশের কোথাও "মেয়ে দেখা" প্রথা প্রচলিত নাই, সুতরাং বরপক্ষকে পূর্বেই কোনো কৌশলে পাত্রী দেখিয়া লইতে হয়। তবে, অবরোধ প্রথার প্রচলন না থাকা বশত এ বিষয়ে কাহাকেও কোনো বেগ পাইতে হয় না।

নির্ধারিত দিনে বর সদলবলে পাত্রীর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলে, লামা, সমবেত আত্মীয়কুটুম্বগণের সমক্ষে বরকন্যাকে স্বামী-স্ত্রী বলিয়া ঘোষণা করেন, এবং বর, বিবাহের নিদর্শন সূচক "ককেভ" বা অঙ্গুরীয়, "বাদো" নামক একখণ্ড রেশমি রুমাল এবং কিছু অলংকার কনেকে উপহার দিয়া থাকেন। "ইরেনকু" অর্থাৎ যিনি কন্যাকে শৈশবাবস্থা হইতে পালন করিয়াছেন, কন্যার পিতার নিকট হইতে পণলব্ধ অর্থ ও উপঢৌকনাদির কিয়দংশ প্রাপ্ত হন।

বিবাহের অনুষ্ঠানগুলি সমাধা হইলে উভয় পক্ষের আত্মীয়কুটুম্বগণকে ছার মদ্য, মাংস ও পিষ্টকাদি সংযোগে ভোজন করানো হয়। ভোজনকালে সাধারণ নিমন্ত্রিতগণকে ছার অর্থাৎ তরল মদ্য ও বিশিষ্টগণকে "চোঙা"* নামক মদ্য পান করিতে দেওয়া হয়। এতদ্ভিন্ন

* চোঙা—চাউল অথবা সর্ষপের ন্যায় একপ্রকার দ্রব্য "কোদু" দ্বারা মসলাসংযোগে একপ্রকার মদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। যখন চাউল বা কোদুগুলি মাতিয়া উঠে তখন উঁহার কিয়দংশ বাঁশের চোঙার মধ্যে লইয়া তন্মধ্যে গরম জল নিক্ষেপ পূর্বক একটি সরু কঞ্চির নল সাহায্যে নির্গত সুরাসার পান করাকে "চোঙা" পান করা কহে।

উভয় পক্ষের পূজনীয় ও সম্মানীয়গণকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন মানসে, পৃথক পাত্রে করিয়া গৃহে লইয়া যাইবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কাঁচা মাংস পরিবেশন করা হইয়া থাকে।

পাত্রীর বাটীতে বিবাহ রাত্রির এ ভোজের সমুদায় ব্যয়ভার বরকেই বহন করিতে হয়। ফল কথা কন্যার বিবাহের নিমিত্ত পিতাকে আদৌ কোনোরূপ কষ্ট বা ব্যয় স্বীকার করিতে হয় না; ব্যাপারটি যেন বরপক্ষের দায় এমনিভাবে সম্পন্ন হইয়া যায়। নিজ বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া বর আত্মীয়কুটুম্বগণকে আর একটি বিবাহভোজ প্রদান করিয়া থাকেন।

স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জীবদ্দশায় কেহই অন্য পত্নী বা পতি গ্রহণ করিতে পারে না। উভয়ের মধ্যে কাহারও অন্যাসক্তি বা দুশ্চরিত্রতা প্রকাশ পাইলে দুজনের একের ইচ্ছানুসারে দাম্পত্য সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে পারে এবং অপরাধী স্বামী বা অপরাধিনী স্ত্রী ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কিঞ্চিৎ অর্থদণ্ড প্রদান করিতে বাধ্য হইয়া থাকে।

লেপচা সমাজে বিধবা বিবাহের প্রভূত প্রচলন থাকিলেও স্বামী-পরিত্যক্তা ভ্রষ্টা নারীকে কেহই পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে পারে না। কুলত্যাগিনী দুশ্চরিত্রাগণকে চিনীয়গণ কখনো-কখনো উপপত্নীরূপে লইয়া যায়।

স্বামী বিয়োগ ঘটিলে লেপচা রমণী দেবরগণের মধ্যে কাহাকেও, অথবা তদভাবে স্বামীর কোনো আত্মীয়কে পতিত্বে বরণ করে। সামাজিক নিয়মানুসারে শ্বশুর বা তৎস্থলাভিষিক্ত কোনো ব্যক্তি স্বামীবিয়োগ বিধুরা যুবতীকে পত্যন্তর গ্রহণ বিষয়ে সর্বথা সাহায্য করিতে বাধ্য থাকেন। পিতৃনির্দেশানুসারে পুত্র কন্যাগণ সকলেই পৈতৃক সম্পত্তির অংশ প্রাপ্ত হইতে পারে ; পিতা ইচ্ছা করিলে কাহাকেও সম্পূর্ণ বা আংশকিভাবে সম্পত্তির অংশ হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন, তাহাতে কাহারও কোনোরূপ ওজর আপত্তি কবিরার থাকে না।

বিবাহাদি সকল প্রকার সামাজিক ব্যাপারেই বৌদ্ধ লামাগণ লেপচাদিগের পৌরোহিত্য কার্য করিয়া থাকেন। লেপচাগণ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হইলেও ভূতপ্রেতাদি সম্বন্ধে তাহাদিগের সে প্রাচীন বিশ্বাস এখনও দূরীভূত হয় নাই। ভূত প্রেতাদি দুষ্টযোনিগুলিকে গৃহ হইতে দূরে রাখিবার নিমিত্ত ইহারা অঙ্গনে তীক্ষ্ণ ফলকাগ্র বিশিষ্ট সুদীর্ঘ বংশদণ্ড প্রোথিত করিয়া তাহাতে মন্ত্রাঙ্কিত বস্ত্রখণ্ড ঝুলাইয়া দেয।

ভূতপ্রেতের উপাসক "বিজুয়া"দিগকে লেপচাগণ বিশেষ ভাবে ভয় করিয়া চলে। বিজুয়াগণ লোকের বাড়ি বাড়ি নাচিয়া গাহিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায় এবং কাহারও পীড়া হইলে, ভূত তাড়াইয়া মূর্খ পল্লিবাসীর নিকট হইতে বেশ দু-পয়সা উপার্জন করে। লিম্বুদিগের ন্যায় লেপচাদিগের বিশ্বাস, যে গৃহ হইতে বিজুয়া অসন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া যায়, সে পরিবারের সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী।

জন্মান্তর সম্বন্ধে ইহাদিগের বিশ্বাস তিব্বতীয়দিগের ন্যায়। পূর্বে নাকি "পেমেলুস" নামক ধর্মমঠে মৃতব্যক্তিগণের সম্পত্তি রক্ষিত হইত, এবং লামাগণ কাহাকেও "পূর্বজন্মে অমুক ছিল" বলিয়া নির্দেশ করিলে উক্ত ব্যক্তিকে মঠে আনয়ন করিয়া তাহার স্বরূপত্ব সম্বন্ধে

পরীক্ষা গ্রহণ করা হইত। দ্রব্যগুলি সনাক্ত করিতে পারিলে সে সমুদায় সম্পত্তি তাহাকে প্রত্যর্পণ করা হইত। সিকিম আক্রমণকালে ভোট কর্তৃক এই ধর্ম্মমঠটি ভস্মে পরিণত হইয়াছে।

শব সৎকার বিষয়েও লেপচাগণ তিব্বতীয়দিগের ন্যায়। মৃতব্যক্তিকে কয়েকদিন পর্যন্ত গৃহকোণে রক্ষিত করিয়া লামার নির্দেশানুসারে অগ্নিতে দাহ বা ভূমিতে প্রোথিত অথবা নদীজলে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে তিব্বতীয়গণের মৃতদেহ শববাহী ডোম কর্তৃক শ্মশানে নীত হয় এবং মৃতের আত্মীয়কুটুম্বগণের মধ্যে কেহই শবানুগমন করে না, কিন্তু লেপচাদিগের মধ্যে মৃতের আত্মীয়কুটুম্বগণ নিজেরাই তাহার সৎকারাদি করিয়া থাকে এবং 'গৃধ্রভোজন প্রথা' ইহাদিগের মধ্যে প্রচলিত নাই।

অশৌচ পালনের বিষয়ে বিশেষ কোনো রীতি নাই ; "সোংলিয়ন" অর্থাৎ শ্রাদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত মৃতের ভ্রাতা পুত্র প্রভৃতি নিকটাত্মীয়গণ বৈষয়িক কার্য হইতে বিরত থাকে মাত্র। "সোংলিয়নের" দিন লামার নির্দেশানুসারে ধার্য হইয়া থাকে ; মৃত্যুর দিন হইতে তিন মাসের পরেও "সোংলয়িন" নিষ্পন্ন হইতে দেখা গিয়াছে।

বৎসরের মধ্যে বড়োদিনই লেপচাদিগের প্রধান উৎসব। ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে—ক্রমাগত কয়েকদিন ধরিয়া একের পর অন্যস্থানে মিলিত হইয়া, লেপচা স্ত্রী-পুরুষ পান, ভোজন ও নৃত্যগীতাদি দ্বারা বড়োদিন উৎসব সম্পন্ন করে। পুরুষেরা তিরধনুর সাহায্যে কৃত্রিম যুদ্ধ ও মৃগ শিকার করিয়া আনন্দ উপভোগ করে। উৎসবস্থলে ভোজনের নিমিত্ত প্রত্যেক পরিবার নিজগৃহ হইতে আবশ্যকমত খাদ্যসামগ্রী ও মদ্য সঙ্গে লইয়া আসে, এবং ভোজনকালে সকলেই নিজ নিজ গৃহানীত সামগ্রী পৃথক বসিয়া ভোজন করে। পূর্বকালে লেপচাদিগের মধ্যে গোপনে বিষদান প্রথার বহুল প্রচলন ছিল, এই নিমিত্তই বোধহয় এখনও উৎসবাদি ব্যাপারে আহার বিষয়ে এরূপ প্রথার প্রচলন হইয়াছে।

জলস্রোতের গতি পরিবর্তিত করিয়া তন্মধ্যস্থ জলরাশি লতাপাতার সাহায্যে বিষাক্ত করিয়া মৎস্য শিকার লেপচাদিগের একটি মহানন্দজনক ক্রীড়া।

মানসী ও মর্ম্মবাণী ● মাঘ ১৩৩১ (১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ)



চাকমাদিগের ভাষা-তথ্য

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ

চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য ত্রিপুরায় চাকমা নামক জাতিবিশেষের বাস। ইহাদের সংখ্যা প্রায় অর্ধলক্ষ হইবে। শারীরিক গঠনপ্রণালী অনেকটা মগ-ত্রিপুরাদি অপরাপর পার্বত্য জাতির অনুরূপ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে ইহারাও "লোহিত" অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র (যার-কিও-সাংপো) নদের তীরভূমি হইতে আগত। এতদ্‌সম্বন্ধে নানাবিধ জনশ্রুতি শুনিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগের দুইটি মাত্র প্রাচীন নিদর্শন এই সমুদয়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য। "ধনপতি রাধামোহনের উপাখ্যান" এবং "চাটিগাঁ-ছড়া" আখ্যায়িকার সাক্ষ্য স্বীকার করিলে প্রাগুক্ত মত অগ্রাহ্য করা যায় না ; সুতরাং ইহারাও "লোহিতিক" বা "তিব্বতিব্রহ্মা" শ্রেণির অন্তর্গত*। কিন্তু বর্তমানে তাহারা বৌদ্ধদলভুক্ত হইয়াছে**।

সার্বভৌমিক ভাষা

দেশভেদে ভাষার বিভিন্নতা স্বতঃসিদ্ধ। যদি সমগ্র পৃথিবী ব্যাপিয়া একমাত্র ভাষায় ভাবের আদান-প্রদান চলিত, তবে কত যে সুখের ও সুবিধার আশা ছিল, তাহা পরিমাণ করা যায় না ; কেন-না, প্রত্যেক দেশের সুধি সম্প্রদায় বহুশ্রমার্জিত তত্ত্বরাশি স্ব স্ব দেশজ ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সে সমুদয় আয়ত্ত করিতে হইলে তত্তৎভাষায় পারদর্শী হওয়া সর্বাগ্রে আবশ্যক ; সুতরাং পৃথিবীর যাবতীয় ভাষায় অধিকার না থাকিলে সমস্ত রহস্যও উদ্‌ঘাটিত করা দুরূহ। পরন্তু তাদৃশ সার্বভৌমিক শিক্ষা সামান্য মানবজীবনে

---

* ইহাদের জাতীয় পরিচয় এবং প্রাচীন কাহিনি লইয়া 'আষাঢ়' এবং 'মাঘ' (১৩১৩) সংখ্যার 'ভারতী'তে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

** এতদ্‌সম্বন্ধেও "বৌদ্ধবন্ধু"র বৈশাখ হইতে কার্তিক সংখ্যায় (১৩১৩) বিস্তৃত বিবরণী বাহির হইয়াছে।

লাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাই বলিতেছিলাম, সমগ্র পৃথিবীর এক সাধারণ ভাষা হইলে উপকারের পরিসীমা ছিল না। এক সময়ে এ ভারতের প্রায় সর্বাংশে হিন্দিতে কথোপকথন চলিত; কালক্রমে তাহা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সম্প্রতি কতিপয় বঙ্গীয় কৃতবিদ্য বাঙ্গালাভাষাকে ভারতের সর্বত্র প্রচলিত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন, তাঁহাদের মনোরথ সিদ্ধ হইলে—দেশের এক গুরুতর অভাব নিরাকৃত হইবে।

ভাষাতত্ত্ব আলোচনা কালে দেখা যায়, দেশের অবস্থানের উপরই ভাষার প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। ইহা আবার বিবিধ কারণে ঘটিয়া থাকে। প্রথম—দেশবাসীর কর্মতৎপরতা, দ্বিতীয়—প্রতিবেশী অপরাপর ভাষার সংঘর্ষণ এবং তৃতীয়ত—দেশের অবস্থানুসারে আবহাওয়ার প্রকৃতি। যে দেশের লোক সাতিশয় কর্মতৎপর (যেমন বন্দরাদিতে) এমনকি একটু ভালোরূপে কথাটি বলিবারও অবকাশ পায় না, তথাকার ভাষা সংক্ষিপ্ত হওয়া স্বাভাবিক—অনেক স্থলে সংকেতমাত্র অবলম্বনে কার্য চালাইতে বাধ্য হয়।

ভাষাভেদ

পার্বত্য প্রদেশের পক্ষেও এই ব্যবস্থা খাটে; কারণ এখানকার জীবনকেও পরিশ্রমের কঠোর শাসনে পরিচালিত করিতে প্রকৃতিই বাধ্য করে। বিভিন্ন ভাষার সংমিশ্রণে আসিলে ভাষাও একটি খিচুড়ি না হইয়া যায় না। অধুনা আমরা অনেকগুলি ইংরাজি শব্দ একেবারে খাসদখলে আনিয়া ফেলিয়াছি। এই যে 'দখল' শব্দটি প্রয়োগ করিলাম, তাহাও নিজস্ব নহে। এ স্থলে তৎপরিবর্তে 'অধিকার' বসাইলে ঠিক উপযুক্ত (idiomatic) প্রয়োগ হইল না বলিয়া সম্ভবত অনেকেই নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন। এইরূপে সকল ভাষাই কিছু না কিছু পরিমাণে বিভিন্ন ভাষা দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে। এতদ্ব্যতীত দেশের জলবায়ু এবং শীতাতপের বিভিন্নতাও ভাষা বিচ্ছেদ ঘটাইবার পক্ষে সামান্য কারণ নহে। কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করিলেই দেখা যায়, কোনো কোনো দেশের আবহাওয়ায় জিহ্বার এত জড়তা জন্মে যে, উচ্চারণে নিতান্ত বিকৃতি ঘটে। কোথাও বা কেবল অনুনাসিক উচ্চারণই ভাষার প্রকাশক। এইরূপ উচ্চারণ বৈষম্যে অবোধ্য ভাষার সৃষ্টি হইয়া থাকে।

চাকমাদিগের মূলভাষা বাঙ্গালা; তবে ইহা আধুনিক বাঙ্গালার তুলনায় নিতান্ত বিকৃত এবং সংক্ষিপ্তও কম নহে। ইংরাজ রাজপুরুষেরা ইহাকে "চাকমা-বাঙ্গালা" (The language is Chakma Bengali) নামে অভিহিত করিয়াছেন*। বস্তুত বঙ্গদেশের ক্রমেই পূর্বদিকে ভাষা বিকৃত হইয়া আসিয়াছে। এতদ্সম্বন্ধে প্রধানত দুইটি কারণ অনুমান করা

চাকমা-বাঙ্গালা

যায়। (১) এ সকল দেশে পূর্বে মগের বসতি ছিল। পরে যখন পশ্চিমবঙ্গ হইতে বাঙ্গালীগণ এখানে উপনিবেশ সংস্থাপন করিতে আসে, তখন তাহাদের সেই প্রাচীন অর্থাৎ প্রাকৃতবহুল বাঙ্গালামাত্র সম্বল ছিল। (দৃষ্টান্তস্বরূপ— চট্টগ্রামে প্রচলিত অনেক কথা 'চৈতন্যভাগবত', 'চৈতন্যমঙ্গল' ও 'প্রাচীন পদাবলি' প্রভৃতি হইতে তুলিয়া দেখাইতে পারা যায় তাছাড়া এখানে এমতও অনেক কথা আছে, যাহা পশ্চিমবঙ্গ ভিন্ন অপর কোথায়ও ব্যবহার নাই। এ সকল এবং আরও অন্যান্য কারণে বর্তমান চট্টগ্রামবাসী অধিকাংশ হিন্দুই যে দক্ষিণ রাঢ়জ, তাহা

Vide–Appendix Vii ; Part of A (Bengal code of cencus procedure)

সুদৃঢ়রূপে প্রমাণিত হয়।) পরবর্তী যুগে নবদ্বীপ সংস্কৃত আলোচনার কেন্দ্রস্থল হওয়াতে তৎপার্শ্ববর্তী দেশ সমূহের ভাষায় বহু সংস্কৃত শব্দ প্রবেশ লাভ করিয়াছে। তথা হইতে বাঙ্গালার যে অংশ যত অধিক দূরে অবস্থিত, তথাকার বাঙ্গালায় সংস্কৃত শব্দের পসার তত অল্প। (২) অপরত বিভিন্ন ভাষার সংঘর্ষেও যে কোনো ভাষা বিকৃত এবং নিকৃষ্ট হইয়া পড়ে। চাকমা ভাষার মূল বাঙ্গালা হইলেও মগ, ত্রিপুরা এবং মুসলমানি ভাষার সহিত সংমিশ্রণ অতিশয় বিস্তৃত। ফলকথা, ইহারা বিজাতীয় সমাজ হইতে যাহা যাহা অনুকরণ করিয়াছে, ভাষা তন্মধ্যে সাধারণ। মোটামুটি বলা যাইতে পারে, চাকমাগণ হিন্দুদের হইতে ভাষা ও দেবদেবী; মগদিগের ধর্ম, ব্যবহার, ভাষা, এমনকি অক্ষরগুলি পর্যন্ত; ত্রিপুরাদের ভাষা, পূজাপদ্ধতি ও আচার-ব্যবহার; এবং মুসলমানদিগের ভাষা ও খাঁ প্রভৃতি উপাধি ইত্যাদি পার্শ্ববর্তী প্রায় সমুদয় জাতি হইতে কিছু কিছু করিয়া গ্রহণ করিয়াছে। এই নিমিত্ত ইহাদের জাতীয় ইতিবৃত্ত সাতিশয় জটিল হইয়া পড়িয়াছে এবং ভাষাও এত দুরূহ হইয়াছে যে, অপর কোনো জাতিরই সহজবোধ্য নহে। পরন্তু ধীরে ধীরে বলিলে সাধারণ চাকমাও সরল বাঙ্গালা বুঝিতে পারে, এবং প্রায় বোধযোগ্য করিয়া উত্তর প্রদান করে। আবার ইহাদের মধ্যে "গোছা" বিশেষেও কথার পার্থক্য রহিয়াছে ; কোনো কোনো "গোছার" কথার টানও বিভিন্ন।

সংস্কৃত শব্দ

ইহারা কতিপয় সংস্কৃত শব্দ এমনই অবিকৃতরূপে গ্রহণ করিয়াছে যে, ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়। তন্মধ্যে—দয়া, ধর্ম, শক্তি, ভক্তি, দান, মান, কৃপা, পীড়া, চিৎ, অমৃত, সুখ, গুণ, উপকার, সম্পত্তি, বন্ধু, মন, বিপদ, আপদ, ধন, ধনী, মিত্র, বিচার, অন্তর, অকূল, শাক, গূঢ় প্রভৃতি শব্দগুলি সুপ্রথিত। এতদ্ভিন্ন সংস্কৃতমূলক কোনো কোনো শব্দ সামান্য বিকৃত ভাবে ব্যবহৃত হয়। যথা—

সংস্কৃত	*চাকমা ভাষার*	*সংস্কৃত*	*চাকমা ভাষার*
ছায়া	ছাবা;	গুচ্ছ	গোছা;
প্রত্যয়	পাত্যায়;	আর্য	আয্য;
দুঃখ	দুখ;	ঝটিতি	ঝাদি,
বাস (গন্ধ)	বাচ্;	কলুষ	কুলুক;
পিচ্ছিল	পিচ্ছিল;	হৃদয়ে	হিদৎ;
সন্দেহভাষা	ছন্দভাষ;	কুত্র	কুদু;
শবশালা	দবাছাল;	কুত্রাৎ (কস্মাৎ)	কুয়ৎ;
শালা (গৃহ)	ছাল;	মে দেহি	মে দেহি;
গোশালা	গোছাল;	কর্ম্ম	কাম। ইত্যাদি

পালিশব্দ

ধর্ম বৌদ্ধ বলিয়া শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ স্বভাবত প্রাকৃত-বহুল, তাছাড়া প্রচলিত কথায় প্রাকৃত প্রভাব তাদৃশ অধিক নহে। সচরাচর কথোপকথনে—"উজু" (উজ্জু), "এজ্যা" (অজ্জু) ; "লডি" (লট্‌ঠী), "পাথর" (পত্থর), "দুয়ার", "ঘর" "হিয়াল" (শিয়াস), "জিদু" (জট্‌ঠা), বাবন (বম্ভণ), "দড়", "আন্ধান" (অদ্ধঃ), "দুনা"

(দুণা), 'বুরা" (বুড্‌ঢ), "তেল", "মৌ" (মহু), "রূপা" (রূপ্পা), "মাছি" (মছি), "হলৈদ" (হলদ্দা), "পুথি" (পোত্থি) প্রভৃতি মূল এবং ঈষদ্বিকৃত পালি শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়।

আর অবিকৃত বাঙ্গালা শব্দও কম নহে। তন্মধ্যে ফুল, ভাল, মন্দ, ঢাক, গরিব, নিজ, চোখ, ওঝা, পরাণ ইত্যাদি শব্দগুলি সাধারণ, আবার উচ্চারণ বিকৃতি দোষে কতকগুলি বাঙ্গালা শব্দ সামান্য রূপান্তরিত হইয়া পড়িয়াছে। যেমন,—"দুষ" (দোষ), "বিহাৎ" (বিশ্বাস), "ভাপ" (ভাব), "কদা" (কথা), "বিগুন" (বেগুন), "ভেজা" (ভাজা), "বিছম লাগা" (বিষম লাগা) ইত্যাদি। এছাড়া, কোনো কোনো শব্দ বিশেষ পরিবির্তত এবং কোনোটি বা অর্থান্তরিত হইয়া গিয়াছে। কয়েকটি উদাহরণ যথা,—"অবুঝ" (অবোধ), "আভোতা" (অভুক্ত), "বারিজা" (বর্ষা), "কমলে" (কোনো সময়ে) এবং "কানা" শব্দে অন্ধকে বুঝায়।

বাঙ্গালা শব্দ

সম্পর্ক নামে বাঙ্গালীদিগের বিশেষত হিন্দুগণের যথেষ্ট অনুকরণ পরিলক্ষিত হয়, কোনো কোনো স্থলে সামান্য বিকৃতি ঘটিয়াছে মাত্র। যথা—পিতা বা শ্বশুর—"বা" মাতা বা শাশুড়ি—"মা" পিতৃব্য—"জিদু" "জেদাই" (জ্যেষ্ঠতাতপত্নী) "খুরি" "কাকি" ; জ্যেষ্ঠভ্রাতা—"দাদা" ; জ্যেষ্ঠা ভগিনী—"বেই" কনিষ্ঠ ভাই-ভগিনী (স্নেহসূচক)—"লক্ষ" ; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ—"ভুজি"* মায়ের কনিষ্ঠা ভগিনী—"মুঝি" ; মায়ের জ্যেষ্ঠা ভগিনী—"জেদাই" ; "মুঝি"পতি—"মইঝা" এবং "জেদাই" পতি "জিদু", পিসি "পিসাই"; "পিসা", মামা—"মামু" ;—"মামি" ; পিতামহ মাতামহ—"আযু", "দা" : পিতামহী মাতামহী—"বেই", "নানি" ; ভগিনীপতি—"বোনই"**।

আত্মীয়-আহ্বান

সর্বোপরি ইহাদিগের সংখ্যাগণনা এক অভিনব ব্যাপার ! মোট কুড়িটি রাশি আছে, কিন্তু প্রত্যেকটিরই অভিধা বিভিন্ন। ততোধিক গণনার আবশ্যক হইলে, 'এক কুড়ি এত' বা 'দুই কুড়ি এত' বলিযা প্রকাশ করে। অর্থাৎ পাঁচবার কুড়ি কুড়ি গণনার পর তবে এক শতের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বলিতে কী, এতাদৃশ প্রথা অদ্যাপি চট্টগ্রামের অশিক্ষিত সম্প্রদায়ে প্রচলিত আছে। সম্ভবত ইহা তাহারই সংক্রমণ ফল ; কিন্তু এই সংখ্যাগুলির নাম প্রায় বাঙ্গালা-প্রসূত হইলেও কোন্ অর্থে স্থিরীকৃত হইয়াছে, নির্ণয় করা দুরূহ। যথা—১ একথ, ২ দিথ, ৩ তিতিরি, ৪ তিথ, ৫ কাচ, ৬ কতম, ৭ বোলাই, ৮ নিল, ৯ রাজা, ১০ দিন, ১১ হাত, ১২ গাৎ, ১৩ ব্রাহ্মণ, ১৪ ছক্কি, ১৫ ধর্ল, ১৬ তাৎ, ১৭ গন্দা, ১৮ গন্দি, ১৯ উনিশ, ২০ কুড়ি। কিন্তু বর্তমানে এবংবিধ আখ্যায় গণনা এত বিরল যে, অশিক্ষিত সমাজেও কদাচিৎ পরিলক্ষিত হয়।

সংখ্যা গণনায়

ক্রিয়াপদের রূপ সংস্কৃতমূলক হইলেও নিতান্ত সংক্ষিপ্ত করিতে গিয়া তৎসমুদায় অধিকতর দুর্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। দেখিলেই বোধ হয় যেন, প্রাকৃতের অবস্থা অতিক্রম করিয়া বাঙ্গালায় উপনীত হইবার কালে

ক্রিয়াবিভক্তি

* চট্টগ্রামের হিন্দুগণ "ভইজ" এবং মুসলমানেরা "ভাউজ" বলিয়া থাকে।

** চট্টগ্রামের নিম্ন শ্রেণির লোকেরা বলে—"বোনাই"।

একটা মহাবিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে। একবচন ও বহুবচন বিবেচনায় ক্রিয়ার পরিবর্তন হয়। কাল, পুরুষ ও বচনভেদে বিভক্তি সকল অষ্টাদশবিধ। ক্রিয়াবিভক্তি যথা—

		একবচন	*বহুবচন*
বর্তমান কাল	উত্তম পুরুষ	আং	এই
	মধ্যম পুরুষ	ইং	ও
	প্রথম পুরুষ	য়	ন্
ভবিষ্যৎ কাল	উত্তম পুরুষ	এইম্	এবং
	মধ্যম পুরুষ	এবে	এবা
	প্রথম পুরুষ	এবো	এবাক্
অতীত কাল	উত্তম পুরুষ	এইয়ং	ইয়েই
	মধ্যম পরুষ	ইয়চ্	ইয়
	প্রথম পুরুষ	ইয়ে	ইয়ন্

সর্বনাম

বাঙ্গালা পদ্যের "মুই" ও "তুই" সর্বনাম চাকমাভাষায় যথাক্রমে উত্তম ও মধ্যম পুরুষের একবচনে তুচ্ছার্থে এবং অতুচ্ছার্থে প্রচলিত ; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই, ইহারা "আমি" এবং "তুমি" শব্দে বহুবচনার্থে প্রকাশ করিয়া থাকে। অন্যত প্রথম পুরুষের একবচনে সংস্কৃত "তে" এবং বহুবচনে বাঙ্গালা পদ্যের "তারা" সর্বনাম পদ ব্যবহৃত হয়। এই সমুদয় সর্বনামের সম্ভ্রমার্থে কোনো বিশেষ রূপ নাই বটে, কিন্তু তাদৃশ সম্মানিত স্থলে সংস্কৃতের অনুকরণে একের প্রতিও বহুবচনের রূপ ব্যবহারের ব্যবস্থা আছে। মদীয় বক্তব্য কিঞ্চিৎ স্পষ্টতর করিতে এস্থলে একটি ক্রিয়ারূপ উপযুক্ত সর্বনাম সহযোগে প্রদর্শিত হইল। গমনার্থ-বোধক ক্রিয়ারূপ যথা—

বর্তমান কাল

বাঙ্গালা কথা	*চাকমা কথা*
আমি যাই	মুই যাং
আমরা যাই	আমি যেই
তুই বা তুমি যাও	তুই যাইচ্
তোরা বা তোমরা যাও অথবা আপনি যান	তুমি যাও
সে যায়	তে যায়
তাহারা যায় বা তিনি যান	তারা যান

ভবিষ্যৎ কাল

আমরা যাব	মুই যেইম্
আমরা যাব	আমি যেবং
তুই যাবি বা তুমি যাবে	তুই যেবে
তোরা যাবি বা তোমরা যাবে অথবা আপনি যাবেন	তুমি যেবা

বাঙ্গালা কথা	*চাকমা কথা*
সে যাবে	তে যেবো
তাহারা যাবে বা তিনি যাবেন	তারা যেবাক্
অতীত কাল	
আমি গিয়াছিলাম	মুই যেইয়ং
আমরা গিয়াছিলাম	আমি যেয়েই
তুই গিয়াছিলি বা তুমি গিয়াছিলে	তুই যিয়চ্
তোরা গিয়াছিলি বা তোমরা গিয়াছিলে অথবা আপনি গিয়াছিলেন	তুমি যিয়
সে গিয়াছিল	তে যিয়ে
তাহারা গিয়াছিল বা তিনি গিয়াছিলেন	তারা যিয়ন্

পূর্বেই বলিয়াছি, ইহারা মগভাষা হইতে বর্ণগুলি অনুকরণ করিয়াছে। কেন-না ইহাদিগের বর্ণমালা এবং বর্ণসংযোগে ব্রহ্মদের সহিত যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। ফলত ব্রহ্মা এবং বঙ্গীয় বর্ণাবলির উৎপত্তিস্থলও বিভিন্ন নহে ; একই বৃক্ষের কাণ্ড হইতে নানা শাখা নানা আকারে গঠিত হইয়া ভাষার অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য"-এ প্রদর্শিত অশোকের সময় (২৫০ খ্রিস্টাব্দ) হইতে বঙ্গীয় বর্ণমালার ক্রমবিকাশের সহিত ব্রহ্ম ও চাকমা বর্ণসমূহের সাদৃশ্য দেখাইয়া নিম্নে একখানি তালিকা প্রদত্ত হইল। যথা—

আধুনিক বাঙ্গালা	*প্রাচীন বাঙ্গালা*	*ব্রহ্মা*	*চাকমা*	*আধুনিক বাঙ্গালা*	*প্রাচীন বাঙ্গালা*	*ব্রহ্মা*	*চাকমা*
অ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	গ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ই	[illegible]	[illegible]		ঘ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible] (ঈ)	[illegible]	ঙ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
উ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	চ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
এ	[illegible]	[illegible]		ছ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	জ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ক	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
খ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ঝ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ঞ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ফ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ট	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ব	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ঠ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ভ	[illegible]	[illegible]	[illegible]

আধুনিক বাঙ্গালা	প্রাচীন বাঙ্গালা	ব্রহ্মা	চাকমা	আধুনিক বাঙ্গালা	প্রাচীন বাঙ্গালা	ব্রহ্মা	চাকমা
ঙ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ম	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ঢ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	য	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ণ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	র	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ত	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ল	[illegible]	[illegible]	[illegible]
থ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ব	[illegible] (ওয়া)	[illegible]	[illegible]
দ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	স	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ধ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	হ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ন	[illegible]	[illegible]	[illegible]	হ্ল		[illegible]	[illegible]
প	[illegible]	[illegible]	[illegible]				

ইহাতে দেখা যায়, খ, গ, ঘ, থ, ম, য, স এবং হ তে কোনো পার্থক্য নাই বলিলেও চলে। অবশিষ্টের মধ্যে অ, ক, চ, ছ, ড, ঢ, ত, দ, ধ, প, ফ, ব, ভ এবং ল প্রভৃতি যৎসামান্য রূপান্তরিত মাত্র। এতদরিরিক্ত যে বর্ণাবলি রহিল, তাহাদের মধ্যেও যে আকৃতিগত একটা সম্পর্ক না রহিয়াছে এমত নহে। সময়সাগরের এত তরঙ্গাভিঘাত চলিয়া গিয়াছে, তথাপি এত পরবর্তীকালের জীব আমরা যে প্রাচীন নিদর্শনের এতটা সাদৃশ্যেরও অস্তিত্ব পাইতেছি তাহাও পরম সৌভাগ্যের কথা বলিতে হইবে। পক্ষান্তরে বার্মিসের সহিত চাকমা বর্ণমালার সাদৃশ্য এবং সম্বন্ধ অধিকতর ঘনিষ্ঠতম। সম্ভবত ত্রিপুরাদিগের ন্যায় চাকমাদিগেরও লিখনপ্রথা ছিল না, অনন্তর ব্রহ্মদেশে অবস্থিতিকালে নানা অসুবিধায় পড়িয়া তথাকার বর্ণাবলি গ্রহণ করিয়া থাকিবে।

প্রাচীন বাঙ্গালা এবং ব্রহ্মা চাকমা

উপরিচিত্রিত আদর্শেই পরিলক্ষিত হইবে, স্বরবর্ণগুলির মধ্যে 'উ'টি সম্পূর্ণ অবিকৃত; 'অ' ঈষৎ পরিবর্তিত হইয়াছে; এবং অপর দুইটি—ই, এ বর্ণে তারতম্য কিঞ্চিৎ অধিক থাকিলেও বার্মিসের দ্বিতীয় পর্যায়ের সহিত তাদৃশ অনৈক্য নহে। ব্যঞ্জনবর্ণে—ক, খ, গ, ঘ, ত, থ, প, ফ, ব, ম, য, ব (ওয়া), স বার্মিসবর্ণের সহিত অভিন্নপ্রায় ; ঙ, চ, ছ, ঞ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, দ, ধ, ভ, ল, হ ইত্যাদি বর্ণেও অতিসামান্য রূপান্তর ঘটিয়াছে, তৎক্রমপরিবর্তন সুস্পষ্টই পরিদৃষ্ট হয়। অবশিষ্ট জ, ঝ, ন, র এবং হ্র তে সামঞ্জস্য উদ্ধার কিছু কঠিন হইয়া পড়িয়াছে সত্য, পরস্পরের মধ্যে মূলত সৌসাদৃশ্য সহজেই অনুসন্ধান করিয়া লওয়া যায়। চাকমা-সমাজের এ অনুকরণ অনতিকালের কথা নয়। ইহার উপর দিয়া কত রাজামহারাজার প্রভুত্ব—জগতের কত অনন্ত পরিবর্তন চলিয়া গিয়াছে, তাহার তুলনায় বর্ণমালার এ সামান্য পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। বিশেষত অনুকরণে প্রায়ই খাঁটি জিনিস থাকে না, অনুকারী হয়ত স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধির সংযোগে একটা অভিনব পদার্থ গড়িয়া তোলে, অন্যথা তাহা যতদূর পারা যায়—সংক্ষিপ্ত সংস্করণে প্রকাশ করিয়া থাকে।

বার্মিস ও চাকমা

স্বরবর্ণ

কেবল আকৃতিগত সামান্য পরিবর্তন করিয়াই অনুকরণ-কর্তা সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই, বর্ণসংখ্যাও যথাসাধ্য সংক্ষেপের চেষ্টা হইয়াছে। সংস্কৃতমাতৃক বলিয়া এই বর্ণগুলিও স্বর এবং ব্যঞ্জনভেদে দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। ব্রহ্মদিগের মূল স্বরবর্ণ দশটি—ঋ এবং ৯ ইহাদের নাই। কিন্তু চাকমাগণ তাহা হইতে অ-ই-উ-এ বর্ণ চতুষ্টয়মাত্র গ্রহণ করিয়াছে। ই-ঈ এবং উ-ঊ পরস্পরে কোনো প্রভেদ নাই। 'অ'-এর উচ্চারণ—'আ' ; তদুপরি (´) "মাথা তুলিয়া দিলে" অর্থাৎ রেফাক্রান্ত করিলে 'অ' উচ্চারিত হয়। তাছাড়া "অ" এর উপর (˺) বামমুখী আর একখানি শিখা তুলিয়া দিলে 'ঐ' এবং 'অ' এর নীচে 'উ' দিলে 'ও' উচ্চারিত হইয়া থাকে। যেমন—

অ উচ্চারণে ও উচ্চারণে

ঐ উচ্চারণে

ঔ-এর উচ্চারণ ইহাদের মধ্যে নাই।

ব্যঞ্জনবর্ণ

ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা ব্রহ্মভাষারই অনুরূপ বত্রিশটি। তন্মধ্যে বর্গীয়বর্ণগুলি ঠিকই আছে, অন্তস্থবর্ণের য—'য়্যা' এবং ব—'ওয়া'* সংজ্ঞায় প্রথিত। তালব্য 'শ' ও মূর্ধন্য 'ষ' এর শাসন ইহাদের মধ্যে নাই। উষ্মবর্ণে অবশিষ্ট 'স' ও 'হ' ব্যতীত ব্রহ্ম-বর্ণাবলীর অনুকরণে (লাজিয়ে) 'হ্ল' নামে আর একটি বর্ণ আছে, তাহার ব্যবহার অপেক্ষাকৃত বিরল। এতদ্ব্যতিরিক্ত অনুস্বার এবং বিসর্গের প্রচলনও ইহারা অজ্ঞাত নহে ; তবে চন্দ্রবিন্দুর কাজ ন্ দ্বারা সারিয়া যায়। প্রাকৃতের ন্যায় ব্যঞ্জনবর্ণ সকল কা-খা-গা-ঘা ইত্যাদি ক্রমে আকারান্ত করিয়া উচ্চারিত হয়। বিশেষ পরিচয় স্থলে—তৎসঙ্গে আকৃতিসূচক বিশেষণযোগে পাঠ হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য তৎসমুদয় "আঁকুড়ে ক", "বকা ছোঁটে খ" প্রভৃতির রূপান্তর মাত্র। তাহা দেখাইবার পূর্বে বলিয়া রাখা প্রয়োজন, ইহারা সচরাচর 'স' কে 'ছ' এর ন্যায় উচ্চারণ করে এবং ট, ঠ, ড, ঢ এর উচ্চারণ যথাক্রমে ত, থ, দ, ধ এর সহিত বিনিময় করিয়া থাকে। যথা,—ক—"চুচুঙ্গা কা", খ—গুজাঙ্গ্যা খা", গ—"চান্দ্যা গা", ঘ—"তিনঠাল্যা ঘা", ঙ—"ছিলামুঙা ঙা", চ—"দ্বিডাচ্যা চা", ছ—"মজছ্যা ছা", জ—"দ্বিবতলা জা", ঝ—"উরাউরি ঝা", ঞ—"তিলচ্যা ঞা", ট—'দ্বিরাদা তা", ঠ—"ফোডাদিরা থা", ড—"আঁড়ুভাঙা দা", ঢ—"লেজভরা ধা", ণ—"পেট্যো ণা", ত—"গঙদা টা", থ—"জয়দা ঠা", দ—"দুলনি ডা", ধ—"তলমো ঢা", ন—"ফার্‌বাণ্যা না", প—"পাল্যা পা", ফ—"উয়রবোঝা ফা", ব—"উয়রমু বা", ভ—"চেরোদা ভা", ম—"বুগদ্‌পতলা মা", য—"ছিমুছ্যা য়্যা", র—"দ্বিদাজ্যা রা", ল—"তলমুয়া লা", ব—"বাজন্যা ওয়া", স—"ভুতিবক্যা ছা", হ—"উয়রমুয়া হা" এবং হ্ল—"লাজিয়ে হ্লা"।

এই সমুদয় ব্যঞ্জনবর্ণকে অকারান্ত উচ্চারণের উপযোগী করিতে পূর্বোক্তরূপে মস্তকোপরি (´) রেফস্থাপন প্রয়োজন। ই-ঈকার (০) শূন্য বিশেষ মাত্র, ব্যঞ্জনের

---

* এই 'ওয়া' উচ্চারণ অদ্যাপি উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে শুনিতে পাওয়া যায়। যথা—দোয়ারি (দ্বারী), দোয়ারিকা (দ্বারিকা) ঈশোয়ার (ঈশ্বর) ইত্যাদি।

দক্ষিণপার্শ্বোপরি বসে এবং উ-উকার (ু বা ূ) একটান বা দুইটান নিম্নে, একার (ে) ঠিক বাঙ্গালার ন্যায় পূর্বভাগে স্থাপিত হয়। এতদ্ভিন্ন পূর্ববর্ণিত পদ্ধতিতে ঐকার যোগ করিতে হইলে মস্তকে রেফ্ এবং বামমুখী শিখা উত্তোলন, ওকারে মস্তকে রেফ ও পাদদেশে 'উ' সংযুক্ত করা গিয়া থাকে। উদাহরণ যথা,—

স্বরসংযোগ

ক কা কি কু বা কূ কে কৈ কো

অনুস্বার, বিসর্গ এবং চন্দ্রবিন্দু—পৃথক বর্ণ নহে, হলন্ত বর্ণেরই রূপান্তর মাত্র। বলিতে কি, ইহাদেরও মধ্যেও তাদৃশ বিধি লঙ্ঘিত হয় নাই। পূর্বেই বলা হইয়াছে, চাকমা লেখার হলন্ত 'ন্' দ্বারা চন্দ্রবিন্দুর উদ্দেশ্য সংসাধিত হয়। অপর অনুস্বার এবং বিসর্গের নিমিত্ত সংস্কৃতানুকরণে যথাক্রমে (.) একটি এবং (..) দুইটি বিন্দু ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পরন্তু এই বিন্দুগুলি সংযোক্তব্য বর্ণের মস্তকোপরি স্থান পায়। হসন্ত-চিহ্নও (—) মাত্রার ন্যায়, তবে বর্ণের ঈষদুপরি স্থাপিত হয়। ইহাদিগের ভাষায় ক, ঙ, চ, ঞ, ত, ন, প, ম, য়, র এবং ল এই কয়েকটি বর্ণে মাত্র হসন্ত প্রয়োগ করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে হসন্তযোগে ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ হইয়া থাকে। যথা,—ক্ (কাক্), ঙ্ (কাঙ্), চ্ (কাচ্), ঞ্ ((ঞেই), ত্ (কাৎ), ন্ (কোন্), প্ ((কোপ্), ম্ (কাম্), য়্ (কেই), র্ (কার্), ল্ (কাল্) ইত্যাদি। কিন্তু অপর কোনো স্বরান্ত ব্যঞ্জনের সহযোগে "ক" ইৎ যায়। বর্ণবিন্যাসের এই অংশ নিতান্ত দুরূহ। কিন্তু অপর কোনো স্বরান্ত ব্যঞ্জনের সহযোগে "ক" ইৎ যায়। বর্ণবিন্যাসের এই অংশ নিতান্ত দুরূহ। কিন্তু সংযুক্তবর্ণ লিখিবার একটি বিশেষ নিয়ম প্রচলিত আছে। ইহা সামান্যরূপ জটিল হইলেও অপরাপর নিয়মের তুলনায় বর্ণবিন্যাসের সরল সংকেত বলিতে হইবে। উপরেই বলা হইয়াছে, বর্গের প্রথম ও পঞ্চমবর্ণে মাত্র হসন্তযোগ করিতে পারা যায়। সংযুক্ত বর্ণের যে বর্ণটি নিঃস্বর, তাহা যদি বর্গের প্রথম বা পঞ্চম বর্ণ না হয়, তবে সেইটি যে বর্গের—সে বর্গের প্রথম বর্ণোপরি হসন্ত চিহ্ন দিয়া, পরে উক্ত বর্ণ আকারান্ত করিয়া বসাইতে হয়। উদাহরণস্বরূপ যেমন 'লগ্ন' ; চাকমাভাষায়—'লক্গন'। অন্যত 'স' তে হসন্তচিহ্ন প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থা নাই। যেখানে 'স' কে হলন্ত করিবার প্রয়োজন হয়, তথায় 'চ'—'স'-এর অধিকার পায়। যেমন—পুচ্প (পুষ্প), উচ্ণ (উষ্ম) ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, ইহাদের মধ্যে রেফের কোনো ভিন্ন ব্যবস্থা নাই। রেফ্ যুক্ত করিতে হইলে পূর্বভাগে 'র্' স্থাপন করিয়া তৎপার্শ্বে বর্ণটি লিখিতে হয়। উচ্চারণের পক্ষে ইহাদের আরও একটি সরলবিধি এই যে, শব্দের অন্ত্য যে ব্যঞ্জন হলন্ত করিয়া উচ্চারিত হয়, লিখিবার সময়ও তাহাতে হসন্তচিহ্ন যুক্ত হইয়া থাকে।

হসন্ত-বিধান

য (য়), ব, এবং ব (ওয়া) এই কতিপয় বর্ণ মাত্র 'ফলা' রূপে অপর ব্যঞ্জনের সহিত সংযুক্ত হয়। 'য ফলা'টি (।/) প্রায় বাঙ্গালারই অনুরূপ, বর্ণের পশ্চাতে বসে। 'র ফলা'টি ্র একটু অধিক বক্র বটে, কিন্তু দেখিলেই বাঙ্গালাভাব আসে, এবং তদুনুরূপ

পাদমূলে বসিয়া থাকে। প্রথমেই বলিয়া আসিয়াছি, ইহাদের স্বতন্ত্র কোনো ঋ-কার নাই। কিন্তু এতক্ষণ যাবত তাহার কার্য বুঝাইবার সুবিধা পাইয়াছিলাম না। কোনো বর্ণে ঋ-কার যোগের প্রয়োজন হইলে, তাহাতে র ফলা ও ই-কার যোগ করিলে উদ্দেশ্য সম্পাদিত হয়। যথা,—ক্রি (কৃ)। এতদ্ভিন্ন 'ব' অর্থাৎ "ওয়াফলা' ও (০) একটি শূন্য মাত্র—বর্ণের পদপ্রান্তে স্থান পায়, উচ্চারণ সেই উত্তরপশ্চিমাঞ্চলেরই মতো "ওয়া" অর্থাৎ দোয়ারি (দ্বারী), দোয়ারিকা (দ্বারিকা) ইত্যাদিক্রমে হইয়া তাকে। নিম্নোদ্ধৃত প্রতিলিপি হইতে, আশা করি, মদীয় বক্তব্য সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

ফলা

গ্রীষ্মকালে রবির কিরণ তীক্ষ্ণ হয়।

সৎপুত্র বংশ উজ্জ্বল করে।

ভাষার মূল এবং গঠনপ্রণালী যথাসম্ভবরূপে প্রদর্শিত হইল। পরিশেষে বাঙ্গালা প্রাকৃত এবং সংস্কৃত ভিন্ন অপরাপর ভাষা হইতে যে যে শব্দ ইহাদিগের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাহা দেখাইয়াই বর্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। তবে ইহা দ্বারা বিভিন্ন জাতি সমুদয়ের সহিত সংঘর্ষণ পরিমাণ নির্ণয় করিতে গেলে, প্রমাদে পতিত হইতে হইবে মাত্র, কারণ, মগ ত্রিপুরাদি জাতির, যাহাদের সহিত ইহাদিগের বহুকাল ধরিয়া বসবাস চলিতেছে, অতি অল্পসংখ্যক শব্দই চাকমা সমাজে অধিকার পাইয়াছে, সুতরাং প্রচলিত শব্দসংখ্যা লইয়া জাতীয় নৈকট্য পরিমাপ হইতেই পারে না।

অপবাপব ভাষাব শব্দ

মগ ভাষার শব্দ যথা—খবং (গম্বং), খিসা (খিজা)।

ত্রিপুরা ভাষার শব্দ যথা—তাগল (তাকুয়াল)।

আরবি ভাষার শব্দ যথা—হাকিম, হুকুম, মুলবি (মৌলবি), মেজবান।

পারসি ভাষার শব্দ যথা—ফৌজদারি, কাছারি, লৌ, জোয়ানবন্দি (জবানবন্দি), ফর্যাদি (ফরিয়াদি)।

চিন ভাষার শব্দ যথা—ছাটিন (সাটিন), লেছু (নিছু), চিনি।

মালয় ভাষার শব্দ যথা—ছাউ (সাগু)।

হিব্রু ভাষার শব্দ যথা—সেতান (শয়তান)

ইংরাজি ভাষার শব্দ যথা—গোন্নমেন্ট (গভর্নমেন্ট), কমিছনার (কমিশনার), জজ, মাইজস্তেৎ (ম্যাজিস্ট্রেট), আপিল, নুটিস (নোটিস), গলস (গ্লাস), রেফার (রফর)।

ফরাসি ভাষার শব্দ যথা—ফেঁরাঁই (ফিরিঙ্গি), জিন, বিছ্কুট (বিসকিট)।

পর্তুগীজ ভাষার শব্দ যথা—বারান্দা (বারেন্দা), ফিতা, বেলা (বেহালা), গের্জা (ইংগ্রিজা—আমাদের কথায় গির্জা), পাদারী (পাদরি), কাদিরা (কেদেরা), ছাবন (সাবান), আলমারি (আলমিরা)।

দেনমার্ক-দেশীয় ভাষার শব্দ যথা—বারান্দি (ব্রান্ডি), ডেক।

ইতালি-দেশীয় ভাষার শব্দ যথা—ছোদা (সোডা), কুম্পেনি (কোম্পানি), পিতল, লিস্তি (লিস্ট), বুরুছ্ (ব্রুস্), কাপ্তান, ইত্যাদি নানা বিজাতীয় শব্দের দ্বারা চাকমা ভাষা ক্রমেই পরিপুষ্ট হইতেছে এবং কদর্য বাঙ্গালা শব্দগুলিও ক্রমে সংস্কৃত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। মূল শব্দের সন্ধান পাওয়া গেলে অপভ্রষ্টার নির্বাসন স্বাভাবিক। অধুনা ইহাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহিত কথোপকথনে তাদৃশ কোনো শব্দবিকৃতি সহজে ধরিতে পারা যায় না। আশা করা যায় শিক্ষার প্রভূত বিস্তার হইলে বাঙ্গালা ও চাকমা ভাষায় উপলব্ধি করিবার উপযোগী কোনো তারতম্য থাকিবে না। বারান্তরে ইহাদের কবি ও কবিতা—বারোমাস—ছড়া—হেঁয়ালি লইয়া আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ● সন ১৩১৩ (১৯০৬ খ্রিস্টাব্দ)



চাকমা জাতির সংস্কার-কর্ম

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ

[চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য ত্রিপুরায় চাকমা নামক জাতিবিশেষের বাস। ইহাদের সংখ্যা প্রায় অর্ধলক্ষ হইবে। শারীরিক গঠনপ্রণালী অনেকটা মঘত্রিপুরাদি অপরাপর পার্বত্যজাতির অনুরূপ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে ইহারাও "লোহিত" অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র (যার কিও সাংপো) নদের তীরভূমি হইতে আগত। এতৎসম্বন্ধে নানাবিধ জনশ্রুতি আছে। তন্মধ্যে ইহাদিগের দুইটি মাত্র প্রাচীন নিদর্শন সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য। বস্তুত "ধনপতি রাধামোহনের উপাখ্যান" এবং "চাটিগাঁ ছড়া" আখ্যায়িকার সাক্ষ্য স্বীকার করিলেও প্রাগুক্ত মত অগ্রাহ্য করা যায় না। সুতরাং ইহারাও "লোহিতিক" অর্থাৎ "তিব্বত ব্রহ্ম" শ্রেণির অন্তর্গত হইবে।* তবে অনেক দিন তাহারা হিন্দুধর্মে ছিল, সম্প্রতি বৌদ্ধদলভুক্ত হইয়াছে।**]

যদিও চাকমারা এক সময়ে হিন্দুধর্মের অধিকারে ছিল, কিন্তু গত কয়েক বৎসর ধরিয়া বৌদ্ধধর্মের প্রবল সংঘর্ষণে দশাচারের অনেকগুলি পরিত্যাগ করিয়াছে, আবার বিভিন্ন ধর্মের সাহচর্যে দু-একটি অভিনব অনুষ্ঠানও এই সমাজে সংক্রামিত হইয়াছে। কর্মসংখ্যা নিতান্ত বহুল না হইলেও অতিশয় বিশৃঙ্খল। এমনকি, সাধারণ এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যেও যথেষ্ট বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এই সকল পার্থক্যের প্রকৃতি নির্দেশ করিলে স্থূলত বলা যায়, সম্ভ্রান্ত অর্থাৎ উন্নত সম্প্রদায় আপনাদের ক্রিয়াকর্মে যথাসাধ্যরূপে হিন্দুদিগের অনুকরণ আরম্ভ করিয়াছেন, সাধারণ দল এ যাবৎ ততদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। ফলে তাহাদিগের মধ্যে নানা উচ্ছৃঙ্খলাচার প্রচলিত রহিয়াছে। বস্তুত সামাজিক ক্রিয়াকর্মাদি যে প্রধান ভিত্তির উপর অনুষ্ঠিত হয়, যতদিন পর্যন্ত সেই ধর্ম সম্বন্ধে কোনো এক মূল

* ইহাদের জাতীয় পরিচয় এবং প্রাচীন কাহিনি লইয়া 'আষাঢ়' এবং 'মাঘ' (১৩১৩) সংখ্যার "ভারতী"তে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

** এতৎসম্বন্ধেও "বৌদ্ধবন্ধু"র বৈশাখ হইতে কার্তিক সংখ্যায় (১৩১৩) বিস্তৃত বিবরণ বাহির হইয়াছে।

সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া না যায়, ততদিন ইহাদের মধ্যে এক অভিন্ন-আচার চলিবার আশা নাই। বর্তমানে উন্নত সম্প্রদায় সমাজের মধ্যে একটা 'সংস্কার' আনয়ন করিবার চেষ্টা করেন, আর সাধারণ সকলের তাহা গ্রহণ করিয়া উঠিতে অনেক দিল চলিয়া যায়, ইহাই পরস্পরের মধ্যে পার্থক্যভাবের একমাত্র কারণ। যাহা হউক এ স্থলে সাধারণভাবে উভয় সম্প্রদায়েরই কথা বিবৃত করিতে চেষ্টা করা হইল।

প্রাথমিক কর্তব্য

পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে আত্মীয়স্বজনকে ভোজন প্রদান এবং অবস্থাবিশেষে বাজি পোড়ানো প্রভৃতি আনুসঙ্গিক উৎসবও চলিয়া থাকে। কিন্তু দুহিতা লাভে এবংবিধ অনুষ্ঠান অতি অল্পই ঘটে। নামকরণ বলিয়া ইহাদের কোনো ক্রিয়াবিশেষ নাই। অথবা এতদুদ্দেশ্যে কোনো দৈবীশক্তির উপর ভারার্পণ করিবার ব্যবস্থাও দেখা যায় না। পিতামহ, পিতামহী প্রভৃতি বয়োবৃদ্ধগণ স্নেহগর্ভ সংক্ষিপ্ত নাম নির্বাচিত করে, তাহাই শেষে 'ডাক নাম' হইয়া দাঁড়ায়, নিতান্ত বিকৃত শুনাইলেও তাদৃশ নামে সন্তানের প্রকৃতি উপলব্ধি হয়। যথা, "কুর্যা" (কুড়ে) নামে বুঝা যায় ছেলেটি বড়ই অলস এবং "পিড়াভাঙা" নামধেয় ব্যক্তির ভারে যে কোনোদিন "পিড়া" (পিঁড়ি) ভাঙ্গিয়াছিল অর্থাৎ সে যে স্থূলকায় সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। জন্মস্থান বিশেষেও নামকরণ হইয়া থাকে। যেমন, "বড়কলে"* জন্ম হইলে পুত্র "বড়কল্যা" এবং কন্যা "বড়কলি" নামে আখ্যাত হয়। কালের কবলে অনেক পুত্র কন্যা হারাইয়া যদি পরিশেষে কোনো সন্তান লাভ হয়, তাহা হইলে সেই সন্তানের জন্য অতি জঘন্য নাম নির্দেশ করা গিয়া থাকে। বিশ্বাস তাদৃশ নামে যমেরও ঘৃণা হইবে! শেষে সন্তান বয়স্ক হইলে স্বীয় পছন্দানুসারে বা গুরুগণ কর্তক একটা সভ্যভব্য নামে আখ্যাত হয়। অনেক স্থলে স্কুলে ভর্তি হইবার সময়ে শিক্ষকগণই শিশুদিগের বিকৃত নাম পরিবর্তন করিয়া লইয়া থাকেন। আবার পিতামাতা কর্তৃক এমন নাম সকলও নির্বাচিত হইতে দেখা যায়, যেন তাহাতে সন্তানের জীবন দীর্ঘ ও গৌববসূচক হয়। এই আশায় প্রায় রামায়ণ এবং মহাভারতোক্ত নামই রাখা গিয়া থাকে, কৃষ্ণ, দুর্গা, কালী প্রভৃতি হিন্দু দেবদেবীর নামেও অনেকে সন্তানের নামকরণ করে। তাহা অজামিলের ন্যায় ফাঁকতালে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তির কামনায় নহে। ইহারা আশা রাখে সন্তানকে তন্নামধেয় দেবতা অনুগ্রহ করিবেন। এইরূপে চাকমা সমাজের প্রায় সমস্ত নামই হিন্দুসমাজানুমোদিত। অন্নপ্রাশনেরও কোনো বিধিবন্ধ নিয়ম নাই ; সুতরাং তজ্জন্য অনুষ্ঠানবিশেষেরও প্রয়োজন হয় না। সন্তানেরা অনেক দিন ধরিয়া মাতৃস্তন্য পান করিতে থাকে। তিন বৎসরের শিশু তাহার কনিষ্ঠ ভাই ভগিনীর সহিত স্তন্যপান করিতেছে এ হেন দৃশ্য বিরল নহে।

কর্ণবেধ

কর্ণবেধের প্রথা থাকিলেও ইহাদের সমাজে 'কর্ণবেধ' বলিয়া কোনো ক্রিয়াবিশেষ নাই।

* "বড়কল"—কর্ণফুলি নদীর জলপ্রপাত বিশেষ, ইহা মোহনা হইতে প্রায় শতেক মাইল উপরে অবস্থিত। বিস্তারিত বিবরণ ১৩১১ সালের "জ্যোতিতে" "কর্ণফুলি এবং বড়কল" শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

উচ্চ পরিবারে এই উপলক্ষ্যে মাত্র আমোদ-আহ্লাদাদি করা হয়; তাছাড়া ধর্মার্থে কিছুই অনুষ্ঠিত হয় না। সাধারণত সন্তান ছয় সাত বৎসরের হইলে সিজ বা অন্যবিধ বন্যবৃক্ষের কণ্টক দ্বারাই কান দুখানি ছিদ্র করিয়া লয়। পুরুষেরা দুই কানে দুইটিমাত্র ছিদ্র করে, কেহ কেহ তাহাতে রূপার আংটি ধারণ করে। নতুবা ছিদ্র রক্ষা করিবার চেষ্টা করে না। কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের দুই কানে অন্যূন বারো এবং বাম নাসিকায় একটি ছিদ্র করাই সাধারণ নিয়ম। বাস্তবিক অবলাগণ গহনা পরিধানের নিমিত্ত কিদৃশ নিষ্ঠুররূপে ক্ষতবেদনা সহ্য করে। ইহা যে কেমন সখ, সহজ বুদ্ধিতে আসে না।

দীক্ষা

আট নয় বৎসরের সময় শুভদিনে সচরাচর বিষু ও বৈশাখ, আষাঢ়, আশ্বিন এবং মাঘের পূর্ণিমায় বালকগণের "চামনি" অর্থাৎ দীক্ষা হয়। "ঠাকুর" (ভিক্ষু) তদভাবে "রড়ীগণ" (শ্রমণেরা) এই দীক্ষা প্রদান করেন। দীক্ষা গ্রহাণার্থী পূর্বাহ্নে মস্তক মুণ্ডিত করিয়া যথাবিধি পবিত্রতা সাধন এবং কাষায়বস্ত্র পরিধান-পূর্বক সপল্লব ঘট-দীপ-তণ্ডুল ইত্যাদি সম্মুখে পশ্চিমাস্য হইয়া উপবেশন করে। অনন্তর সপ্তগুণ সূত্র দ্বারা এ সমুদায় বেষ্টন করতঃ তৎপ্রান্তদ্বয় হস্তে লইয়া "দশশীল" আচরণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। অবশেষে ভূমিষ্ঠ প্রণিপাত ও গুরুদক্ষিণা দান করিয়া শ্রমণ-ব্রত গ্রহণ করে। কিন্তু এই কৃচ্ছ্রসাধ্যব্রত পালনে অনেকেই পরাঙ্মুখ হয় ; অধিকাংশ সকলে সাত দিন মাত্র আচরণই যথেষ্ট মনে করে,—আর যাহারা যাবজ্জীবন এই ব্রহ্মচর্য ব্রতে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকে তাহারা প্রথমে "রড়ী" এবং সিদ্ধ হইলে "ঠাকুর" আখ্যা পায়। চাকমা সমাজের প্রধান উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, স্ত্রীলোকদিগের কোনো দীক্ষার ব্যবস্থা নাই।

যৌবনোন্মেষ

বালিকাগণ ত্রয়োদশ বৎসরে এবং বালকেরা ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিলে যৌবনের অধিকারভুক্ত হয়। কেহ কেহ রোগ-জীর্ণতায় সকলের সহিত অগ্রসর হইতে পারে না। আবার অনেকে 'ইঁচড়েই পাকিয়া' যায়। সাধারণ শ্রেণিতে—কোনো বালক যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া উঠে, তখন সে অনন্যনির্ভরতায় "জুম"* কর্তন করে। ইহাই তাহার যৌবনপ্রাপ্তির প্রধান নিদর্শন। পুত্রের যৌবনপ্রাপ্তিতে পিতামাতা প্রতিবেশী এবং অপরাপর আত্মীয়স্বজনাদি লইয়া আমোদ-উৎসব করিতে বাধ্য হয়।

বিবাহ

ইহাদের মধ্যে এমনকি যাবতীয় পার্বত্যজাতির ভিতর বাল্যবিবাহ বিরল প্রচলিত। পরন্তু কত বয়সে যে বিবাহ হইবে তাহাও নির্দিষ্ট নাই। কোনো কোনো ব্যক্তি আবার চিরজীবন অবিবাহিত থাকিয়া যায়। বিবাহ হইলে ইহাদের "বুড়াবুড়ি" আখ্যা হয়। নতুবা বয়স যত

* কৃষিবিশেষ মাত্র। এখানে জুম জঙ্গল অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

অধিক হউক না কেন, "গাভুর" (কুমার) ও "মিলা" (কুমারী) অভিধা থাকে। বিগত আদমশুমারির বিবরণীতে দেখা যায়, চাকমাদিগের মধ্যে—

শ্রেণি	০ হইতে ৫ বৎসরের	৫ হইতে ১২ বৎসরের	১২ হইতে ১৫ বৎসরের	১৫ হইতে ২০ বৎসরের	২০ হইতে ৪০ বৎসরের	৪০ হইতে তদূর্ধ বৎসরের	মোট
পুরুষ	৪২৩৯	৫৫৭১	১৬১১	১৮৪৬	১২২৬	৬০	১৪৫৫৩
স্ত্রী	৪০৩৩	৪৯২৪	১৩১৫	৭৬৬	১২৯	৩৫	১১২০২

অবিবাহিত চল্লিশোর্ধ বয়সের এই ৬০ জন পুরুষ এবং ৩৫ জন স্ত্রীলোকের আর বিবাহ হইবার আশা কোথায়? অপর ২০—৪০ বৎসরের যে সকল স্ত্রীলোক অদ্যাপি অবিবাহিতা তাহাদেরও অনেকে চিরকুমারী থাকিবে, তবে অধিকাংশ পুরুষের দার পরিগ্রহ করিবার সম্ভাবনা আছে, পক্ষান্তরে "বিবাহিতের" তালিকায় দেখা যায়, চাকমাদিগের—

শ্রেণি	০ হইতে ৫ বৎসরের	৫ হইতে ১২ বৎসরের	১২ হইতে ১৫ বৎসরের	১৫ হইতে ২০ বৎসরের	২০ হইতে ৪০ বৎসরের	৪০ হইতে তদূর্ধ বৎসরের	মোট
পুরুষ	০	১১	১১	২৭৪	৬০১০	৪১২২	১০৪২৮
স্ত্রী	৫	১২	১৫২	১৪৪৩	৬৪৬৩	২২৩১	১০৩০৭

পত্নী পতি লইয়া আছে। সুতরাং এই উভয় তালিকা তুলনা করিলে সহজেই পরিলক্ষিত হইবে যে, ২০ হইতে ৪০ বৎসর বয়সে পুরুষের এবং ১৫ হইতে ২০ বৎসর বয়সে স্ত্রীলোকের অধিক পরিমাণে বিবাহ ঘটিয়া থাকে, পরন্তু পরবর্তী তালিকায় বিবাহিত পুরুষের সংখ্যা ১০৪২৮ হইলে বিবাহিতা স্ত্রীলোকের সংখ্যা কীরূপে ১০৩০৭ জন মাত্র হইল, দেখিয়া সন্দেহ হয়। এই ১২১ জনকে মৃত-দারও বলিতে পারা যায় না; কেন-না তাহা স্বতন্ত্ররূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। আর মহাভারতীয় দ্রৌপদী বা আধুনিক তিব্বতীয় সম্প্রদায়ের মত ইহাদের সমাজে একত্রে বহু-স্বামী-গ্রহণ-প্রথাও (polyandry) প্রচলিত নাই, অধিকন্তু বহু-স্ত্রী-গ্রহণ প্রথা (polygamy) আছে।* তবে এই মাত্র অনুমান করা যায়, বর্জিতপত্নীক পুরুষগণকেও বিবাহিত সংখ্যায় গণনা করা হইয়াছে। অপর তালিকায় আছে, চাকমাদিগের মধ্যে—

শ্রেণি	০ হইতে ৫ বৎসরের	৫ হইতে ১২ বৎসরের	১২ হইতে ১৫ বৎসরের	১৫ হইতে ২০ বৎসরের	২০ হইতে ৪০ বৎসরের	৪০ হইতে তদূর্ধ বৎসরের	মোট
বিপত্নীক	০	২	০	৭	২১৫	৭২৫	৯৪৯
বিধবা	৩	১	১	১৩	১৬৫	১১৭২	১৩৫৫

অতএব মোট ২৯৮৬৪ জন স্ত্রীলোকের মধ্যে ১৩৫৫ জন মাত্র অর্থাৎ ষোড়শাংশের

* কিন্তু একসময়ে দুই পত্নীর অধিক কাহারও পরিদৃষ্ট হয় না, এমনকি তৎপ্রতি সাধারণের ঘৃণার আভাস পাওয়া যায়! ইহাদের কথাই আছে—

"ছিলে বিলে তিন জোগ,
মুসলমানেব তিন মোগ।"

অর্থাৎ বিলাদিতে যেমন জোঁক যথেষ্ট, তেমনি মুসলমানের স্ত্রী অনেক। (মুসলমান বন্ধুগণ লেখককে ক্ষমা করিবেন)।

নূন্যসংখ্যক স্ত্রীলোককে বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে, তাহাতে আবার প্রৌঢ়া অর্থাৎ যাহাদের পুনর্বিবাহের সময় সম্পূর্ণরূপে অতীত হইয়া গিয়াছে, তেমন বিধবার সংখ্যা ১১৭২ জন, আর ২০ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্ক মৃতদার অপেক্ষা বিধবার সংখ্যা অনেক কম। ইহাতে সহজে অনুভূত হয় যে, যুবতি বিধবাগণের প্রায়ই পুনর্বিবাহ হইয়া যায়। কিন্তু সেই বয়সের বিপত্নীকগণের কথা দূরে থাকুক, চল্লিশোর্ধ্ব যে ৭২৫ জন মৃতদার পুরুষের সংবাদ পাওয়া গেল, জরাপীড়া বা সাংসারিক অসচ্ছলতা প্রভৃতি বিশেষ অসুবিধায় না পড়িলে তাহাদিগেরও অনেকে পত্নীবিরহিত হইয়া অধিক দিন থাকিবে না।

ইহাদিগের মধ্যে, পিতৃকুল লইয়া "গোষ্ঠী"* এবং বাসস্থান ভেদে "গোছা"** আখ্যাত হয়। সেই হেতু "গোছা" এক হইলে বিবাহে কোনো বাধা থাকে না। অথচ "সগোষ্ঠীতে" বিবাহ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ বলিয়াই সমাজের ব্যবস্থা ছিল। এতদিন এই বিধি নির্বিবাদে চলিয়া আসিয়াছে। একমাত্র সেই দিন কুমার রমণীমোহনের বিবাহে ব্যতিক্রম ঘটিল। তিনি সগোষ্ঠী হইতে পত্নীগ্রহণ করিয়াছেন। সমাজবন্ধন এই যে শিথিল হইল, এখন হইতে বোধহয় ইহা অবাধে চলিবে। মামাতো ভগ্নী, পিসতুতো ভগ্নী প্রভৃতির পাণিগ্রহণও যথেষ্ট প্রচলিত, বরং সেইগুলি যেন প্রকৃষ্ট সম্বন্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু ভাগিনেয়ী, বড়োশালি প্রভৃতির সহিত বিবাহ কদাচ পরিদৃষ্ট হয় না। পরিত্যক্তা ও বিধবা স্ত্রীলোকদিগকে দেবরেরাও বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু তজ্জন্য তাহারা বাধ্য নহে।

চাকমাজাতির বিবাহ

সচরাচর বিবাহ পঞ্চবিধ যথা—

অভিভাবকগণের প্রস্তাবানুসারে (১) পাত্রী তুলিয়া আনিয়া ও (২) পাত্র তুলিয়া আনিয়া বিবাহ, এবং (৩) বড়ো বিবাহ (৪) গৃহজামাতা আনয়ন ও (৫) মনোমিলনে পরিণয়।

এতন্মধ্যে প্রথম ও শেষোক্ত শ্রেণির বিবাহই সমধিক প্রচলিত। বিশেষত ধনবান-সম্ভ্রান্ত পরিবারে ভিন্ন "বড়ো বিবাহ" হয় না। দ্বিতীয় ও চতুর্থ প্রকারের বিবাহকেও সমাজ ঘৃণার চক্ষে দেখে, এজন্য অবস্থা ভাল হইলে কেহই ইহাতে স্বীকৃত হয় না। এতদ্ভিন্ন বিধবা এবং পরিত্যক্তা মহিলাদিগের বিবাহও আছে। পুনর্বার বলিয়া রাখি, যে কোনো বিবাহেই "চুঙুলাং"*** পূজা প্রয়োজন, নতুবা স্ত্রীপুরুষের কাহারও বিবাহ ভাঙিতে কোনো আপত্তি হইতে পারে না।

অভিভাবকগণের প্রস্তাবসিদ্ধ বিবাহ

পুত্র বিবাহের উপযুক্ত হইয়াছে দেখিলে পিতা মাতা অপরাপর নিকট আত্মীয়দিগের সহিত "তাইনমাং' (পরামর্শ) করিয়া পাত্রী অনুসন্ধান করিতে থাকে। তাহাদের মনোমতো

* "গোষ্ঠী"—গোত্র।

** "গোছা"—সংস্কৃত গুচ্ছ শব্দ হইতে উৎপন্ন। সমগ্র চাকমা-সমাজ একত্রিংশ "গোছা" অর্থাৎ দলে বিভাজিত।

*** ইহা দেবী পরমেশ্বরীর পূজা। চাকমা-সমাজে ইহা একটি অতি পবিত্র অবশ্য করণীয় অনুষ্ঠান। আশ্বিন কার্তিক (১৩১৩) সংখ্যার "বৌদ্ধবন্ধু"তে ইহার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাইবে।

কন্যার সমাচার পাইলে কোনো কোনো সময় পুত্রকেও প্রকারান্তরে তাহার মত জিজ্ঞাসা করা হয়।

অনন্তর প্রস্তাবনার নিমিত্ত অভিপ্রেত কন্যার পিত্রালয়ে বরের পিতার যাওয়া একান্ত অপরিহার্য। তদভাবে মূল অভিভাবককেই যাইতে হয়। প্রথম বারে—মদ, পান সুপারি এবং কয়েকবিধ মিষ্টান্ন লইয়া যাওয়াই বিধি। বিবাহের প্রস্তাব প্রথমে উঠাইতে অতিশয় সতর্কতা গ্রহণ করা গিয়া থাকে। পাত্রের পিতা বলে—"তোমার ঘরের নিকট একটি মাহাহর বৃক্ষ জন্মিয়াছে, আমি তাহার ছায়াতে একটি চারা রোপণ করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইতে চাহি।" ইহা হইতেই কন্যার পিতা মূল কথা বুঝিয়া লয়। যাতায়াতের সময় উভয় পক্ষই অতি সাবধানে শুভাশুভ লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখে। কেন-না, সম্পূর্ণরূপে স্থিরীকৃত এমন অনেক বিবাহ কুলক্ষণ দ্বারা ভাঙিয়া গিয়াছে। যদি স্ত্রী কিংবা পুরুষ, মোরগ, জল বা দুগ্ধ লইয়া দক্ষিণপার্শ্বে যাইতে দেখা যায়, তবে লক্ষণ—শুভ। কিন্তু চিল কি শকুনি দেখা গেলে অথবা কোনো কাক যদি বাম পার্শ্বে বসিয়া ডাকিতে থাকে, তাহা অশুভ লক্ষণ বলিয়াই কথিত হয়। যদি তাহারা পথে আসিতে কোনো জীবজন্তুর মৃতদেহ দেখিতে পায়, তবে আর পদৈকমাত্র অগ্রসর হয় না, এবং সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় আয়োজনও বন্ধ করিয়া দেয়। বৃদ্ধদিগের মুখে এমন বহু উদাহরণ শুনা যায় যে, এই সমস্ত শুভাশুভ লক্ষণের প্রতি অবহেলা পক্ষান্তরে প্রভূত অসুখের কারণ হইয়াছে। এস্থলে ইহাও বলিয়া রাখা উচিত, "ছাদং"-এর সময় অর্থাৎ আষাঢ়-পূর্ণিমা হইতে আশ্বিনের পূর্ণিমার মধ্যে বিবাহের কোনোরূপ প্রস্তাব উপস্থিত করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

দ্বিতীয় বারে পিষ্টক মোরগ এবং প্রথমোক্ত উপঢৌকনগুলি লইয়া বরের পিতা পুনরায় উপস্থিত হয়। এ যাত্রায় উভয় পক্ষের সুবিধা অসুবিধা বিবেচিত হইয়া থাকে। এবং উপস্থিত পাত্রের সহিত সম্বন্ধ করিতে পাত্রীর পিতামাতার অভিমতও অনেকটা বুঝিয়া লইতে পারা যায়। কিন্তু দ্বিতীয়বারেও সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে স্থিরীকৃত হয় না। অনন্তর তৃতীয়বারেও দ্বিতীয়বারানুরূপ 'তত্ত্ব" সামগ্রী লইয়া যায়, সঙ্গে একজন স্ত্রীলোকও থাকে। এবার পণ ধার্য করা হয়। সাধারণত ৫০/৬০ তোলা রূপার গহনা এবং ১০০/১২০ টাকা পর্যন্ত কন্যার পণ নির্ধারিত হইয়া থাকে। এই সময়ে বর কন্যা তুলিয়া আনিবে কী বরকে তুলিয়া আনিয়া বিবাহ দেওয়া যাইবে, প্রস্তাব উপস্থিত হয়। বর তুলিয়া আনিয়া বিবাহে বরপক্ষীয়ের খরচ অবশ্য অল্প, কিন্তু ইহা খুব বিরল প্রচলিত। হিন্দু সমাজের কলঙ্ক কুলীন সম্প্রদায়ের মতো যৌতুকের সামগ্রীতে গৃহপূর্ণ করিবার আকাঙ্ক্ষা ইহাদের সমাজে এযাবৎ হয় নাই। বর পাত্রীর পিত্রালয়ে গিয়া বিবাহ করিতে নিতান্ত লজ্জা ও অপমান মনে করে। পরন্তু ভাবী বৈবাহিকের রুধিরলোলুপ এমন কোনো বরের পিতা চাকমাজাতিতে দেখা যায় না, এবং তাদৃশ বরবিক্রয়ের প্রথাও ইহাদের সমাজে প্রচলিত নাই। সে যাহা হউক উপরোক্ত প্রস্তাবে উভয় পক্ষের সন্তোষজনক মীমাংসা সম্পাদিত হইলে শুভদিন ধার্য করে। ফসলের কার্য হইতে অবসর কালেই বিবাহের প্রশস্ত সময় ; এই নিমিত্ত সচরাচর মাঘ ফাল্গুন মাসেই দিন নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। কারণ এই সময়ে হাতে টাকা পয়সারও অভাব হয় না এবং সকলে কাজকর্ম হইতেও কিঞ্চিৎ অবসর পায়। এইরূপে কথাবার্তা সাব্যস্ত হইয়া গেলে কোনো কোনো বরের পিতা ভাবী পুত্রবধূকে উদ্বাহস্থিরতা

জ্ঞাপক একটি অঙ্গুরীয় উপহার দিয়া আইসে। অবশেষে বিবাহের দিন নিকটবর্তী হইলে বরপক্ষ কন্যার পিতার নিকট হইতে অচিরে উপস্থিত বিবাহের নিমিত্ত মদ প্রস্তুত করিবে কিনা অনুমতি লইয়া যায়।

বিবাহের পূর্বদিন যে সকল বাদ্যকরেরা আসে, তাহাদের প্রথম বাদ্য হইতে বয়োবৃদ্ধগণ ভাবী পরিবারের শুভাশুভ গণনা করে। এই প্রথম বাদ্যকে "খোলামাননি"* বলা হয়। এতদ্ভিন্ন বরপক্ষীয় কোনো স্ত্রীলোক কদলী পত্রে পান এবং সুপারির দুইটি 'পুঁটুলি' করিয়া একত্রে নদীতে ভাসাইয়া দিয়াও ইষ্টানিষ্ট পরীক্ষা দেখে। যদি 'পুঁটুলি' দুইটি মিলিত হইয়া ভাসিতে থাকে, তাহা হইলে ভাবী দম্পতির প্রগাঢ় সদ্ভাব সূচিত হয়। অন্যথা 'পুঁটুলি' দুইটি বিপ্রকৃষ্ট হইয়া ভাসিলে পরস্পরের মধ্যে চিরজীবনই মতভেদ ঘটিয়া থাকে। বিবাহ বরের বাড়িতে হইবার কথা হইলে তদনন্তর সেই মহিলা নদী হইতে এক কলশি জল লইয়া আইসে ; নতুবা কন্যাপক্ষ হইতে জল তোলানো হয়। তদ্দ্বারা বিবাহের দিন বরকন্যাকে স্নান করাইয়া থাকে। অধিবাস দিবসে বরকন্যা উভয়পক্ষেরই গৃহসম্মুখীন দুইধারে সপল্লব মঙ্গলঘট স্থাপিত হইয়া থাকে।

পাত্রী তুলিয়া

পাত্রী তুলিয়া আনিতে হইলে বিবাহের পূর্ব দিন, পথ যদি দূরবর্তী হয়, তবে তাহারও পূর্বে অর্থাৎ যাহাতে বিবাহদিন প্রাতে পাত্রীকে লইয়া বরের বাড়িতে উপনীত হইতে পারা যায়, সেই হিসাবে বরের পিতামাতা এবং অপরাপর আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবেরা নানাবিধ বাদ্যাদি সমভিব্যাহারে কন্যা আনয়নের জন্য যাত্রা করে। তাহাদের সঙ্গে সগোত্রজা এক অনূঢ়া কিশোরী সুরঞ্জিত "ফুলবারেং"**এর মধ্যে করিয়া পূর্বনির্দিষ্ট সমস্ত গহনা, দুই দুইখানি "পিধন", "খাদি"*** চাদর, "খবং"**** ও কুর্তা (তন্মধ্যে একটি ফুলবিহীন ও অন্যটি "ফুলদার" কুর্তা বিশেষত বিবাহেই ব্যবহৃত হয়। ইহা দ্বারা এসময়ে গহনাগুলি বাঁধিয়া নিয়া থাকে) এবং এক বোতল নারিকেল তৈল, ও একখানি চিরুনি লইয়া যায়।

এদিকে কন্যাকর্তা বিবিধ ভোজ্যোপকরণ আহরণ করিয়া থাকে ; এবং বরযাত্রীগণের নিমিত্ত প্রাঙ্গণে স্ত্রী ও পুরুষের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বৈঠক-স্থান গঠিত হয়। তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইলে কন্যাপক্ষীয়গণ স্বাগতসম্ভাষণাদি দ্বারা তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া যথানির্দিষ্ট স্থানে বসায় ; এবং তখন মদ, তামাক ইত্যাদি শিষ্টাচারোপহার অবিশ্রান্ত চলিতে থাকে। কিয়ৎক্ষণ পরে পাত্রীপক্ষীয় সকলে নানা মঙ্গলায়োজনের সহিত প্রথমে উপরোক্ত কিশোরীকে গৃহে তুলিয়া, পরে অন্যান্য বরযাত্রীগণকেও ঘরে লইয়া যায়। এই

* ইহাতে প্রাঙ্গণে একটি জায়গা করিয়া তাহাতে পান সুপারি, প্রদীপ ইত্যাদি দিয়া ঘট স্থাপিত করে ; এই নিমিত্ত টাকাও একটি দিতে হয়।

** "ফুলবারেং"—'চ্যাচারি' নির্মিত ঝুড়ি বিশেষ।

*** "পিধন" ও "খাদি" স্ত্রীলোকদিগের যথাক্রমে পরিধেয় ও বক্ষবন্ধন বস্ত্র। বিস্তৃত পরিচয় অগ্রহায়ণ (১৩১৩) সংখ্যার কল্পতরুতে প্রকাশিত হইয়াছে।

**** খবং—পাগড়ি।

সঙ্গে দ্বারদেশে স্থাপিত মঙ্গলঘট এবং প্রদীপাদিও উঠাইয়া আনা হয়। পরে গহনাদি যাবতীয় দ্রব্য কন্যার পিতামাতা বুঝিয়া লয়, এবং সকলে আহার করিয়া উঠিলে বরপক্ষীয়া মহিলাগণ সেই গহনা এবং পরিচ্ছদের এক প্রস্থ পাত্রীকে পরাইয়া দেয়।

অনন্তর সকলে নিদ্রা যায়, এবং পরদিন প্রত্যুষে ঘট প্রদীপাদি যথাস্থানে স্থাপনপূর্বক অপরাপর শুভানুষ্ঠানের সহিত পিতামাতা দুহিতারত্নকে বিদায় দান করে। এই সময়ে "সাঁকো" (সিড়ি)র পথ বন্ধ করিয়া সপ্তগুণ সূত্র টাঙাইয়া দেওয়া হয়। বরপক্ষীয়েরা পাত্রী বাহির করিয়া আনিতে কন্যার মাতা সুতাখানি ছিঁড়িয়া দেয়। ইহাতেই তাহাদের সহিত কন্যার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।* যাহা হউক, কন্যার সমভিব্যাহারে তাহার পিতা কী পিতামাতা উভয়েই গিয়া থাকে। বরের বাড়িতেও নানা মঙ্গলায়োজনের সহিত পাত্রী তুলিয়া লইবার প্রথা আছে। বিবাহদিন প্রাতেই "চুঙলাং" পূজা হইয়া থাকে।

রাত্রে (কোনো কোনো পরিবারে গণৎকার নির্ধারিত লগ্নে) বরকন্যাকে উপযুক্ত বসনভূষণে সজ্জিত করিয়া শয়নকক্ষে বিবাহ-বেদিউপরি উপবেশন করায়। স্ত্রী স্বামীর বামপার্শ্বে স্থান পাইয়া থাকে। অতঃপর বরের কোনো আত্মীয় এবং আত্মীয়া বরকন্যার প্রতিনিধিত্ব ভার গ্রহণ করিয়া যথাক্রমে তাহাদের পশ্চাতে বসে। ইহাদিগকে "ছাঁয়লা" এবং "ছাঁয়লি" বলা হয়। ইহারা একখানি নূতন কাপড় লইয়া উপস্থিত সকলকে জিজ্ঞাসা করে, "জোড়গাঁট বাঁধিবার হুকুম আছে তো?" সকলে বলিয়া উঠে—"আছে" "আছে" "আছে"। সম্মতি পাইবা মাত্রই "ছাঁয়লা-ছাঁয়লি" উক্ত বস্ত্রের দ্বারা দম্পতিকে বন্ধ করে। তখন তাহারা পরস্পরকে "বদাগুল্যা ভাত" অর্থাৎ সিদ্ধ ডিম্ব মিশ্রিত অন্ন এবং কলা, গুড় ও পান ইত্যাদি খাওয়ায়, ফলে মুখস্পর্শ করাইয়া থাকে। স্ত্রী দক্ষিণ হস্তে স্বামীর মুখে এবং স্বামী বাম হস্ত দ্বারা প্রণয়িনীর গলদেশ বেষ্টন করতঃ মুখে উল্লিখিত হস্ত দ্বারা ভক্ষ্য প্রদান করে। অবশ্য এই কার্যেও "ছাঁয়লা-ছাঁয়লি"'র বিশেষ সাহায্য প্রয়োজন। কেন-না উপস্থিত সাধারণের** সম্মুখে নবদম্পতি ব্রীড়ানিপীড়িতপ্রায় অসাড়ই থাকে। তখন তাহারা স্বাধীনভাবে কিছুই করিতে পারে না। প্রতি কার্যেই অন্যদীয় সহায়তা অপেক্ষা করে! খাওয়ানোর বিনিময়ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেলে সমাগত বয়োবৃদ্ধগণ নবীন দম্পতির মস্তকে শুভাশিসবাক্যের সহিত নদীজল বর্ষণ করে। ইহাই স্বস্তি বাচন—পক্ষান্তরে কর্মের সাফল্য ঘোষণা! অনন্তর স্বামী স্ত্রী দুই পৃথক স্থানে নিদ্রায় রাত্রি কাটাইয়া থাকে।

পরদিন অতি প্রত্যুষে দম্পতি গাত্রোত্থান করিয়া জনৈক "ওঝার"*** সহিত নদীকূলে

* ত্রিপুরাদিগের মধ্যেও ঈদৃশী প্রথা আছে, কিন্তু তাহা কিঞ্চিৎ ভিন্নরূপ। পাত্রীকে বাহির করিয়া আনিবার সময় তাহার ভগ্নী বা ভ্রাতৃবধূ (বাহই) দ্বারে একটি মুলি বাঁশ আড় করিয়া ধরে। বরপক্ষীয়েরা তাহা ভাঙ্গিয়া কন্যা লইয়া আসে।

** এস্থলে 'সাধারণ' বলিতে স্বজাতীয় বুঝিতে হইবে। প্রত্যুত ইহাদিগের মধ্যে অবরোধ প্রথার কঠোরতা না থাকিলেও ইহারা এই বিবাহ স্বজাতি ভিন্ন অপর কাহাকেও কোনোরূপেই দেখিতে দেয় না, এমনকি বিজাতীয় বন্ধুও বন্ধুর বিবাহ দেখিতে সমর্থ নহে।

*** জাতীয় সামজিক অনুষ্ঠানের যাজক। ভূতপ্রেতাদির উৎপাত নিবারণ, রোগপ্রতিকার, গ্রাম্যদেবতা পূজা প্রভৃতি বহুবিধ ক্রিয়াকর্মে "ওঝার" প্রয়োজন। এই পদ বংশগত নহে, বিশেষ অভিজ্ঞ না হইলে ইহারা ভার পায় না। চাকমাসমাজে ধাত্রীগণকেও "ওঝা" বলিয়া থাকে।

যায়; এবং তথায় দুইটি মোরগের রুধির, 'ঘিলা' ও 'কুঁচ' বাঁটা, কিঞ্চিৎ মদ্য ও সোনা রূপার জলে মাথা ধুইয়া শুদ্ধ হয়। ইহাকেই বিবাহের "বুরপারণ" বলে। অতঃপর চারিদিকের লোক ঘুম হইতে না উঠিতেই বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করে। পরিশেষে আহারাদির পর আত্মীয়স্বজনাদি সমাগত স্ত্রীপুরুষ সকলে (অবশ্য দুই ভিন্ন দলে) সভা করিয়া বসে। তখন নবদম্পতি তাঁহাদিগের নিকট হইতে শুভাশীর্বাদ গ্রহণ করিতে উপনীত হয়, এবং যথোচিত অভিবাদন পুরঃসর পূজনীয়বর্গের নিকট হইতে নিষ্ঠীবনপৃক্ত-সতণ্ডুল-তুলা শুভনির্মাল্য স্বরূপ লাভ করে। এই সঙ্গে দম্পতির কিছু আর্থিক লাভও ঘটিয়া থাকে। সাধারণত এ সময়ে কন্যার পিতা নবজামাতাকে সম্বোধন পূর্বক বলিয়া দেন, "ইহাকে (স্বীয় কন্যাকে জামাতার হস্তার্পিত করিয়া) গ্রহণ কর। আমি বড়ো সাধ করিয়া ইহাকে তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম। এ নিতান্ত বলিকা, গৃহকর্ম কিছুই জানে না। যদি কোনো সময়ে তুমি কর্মস্থল হইতে আসিয়া দেখ যে, ভাত পুড়াইয়া ফেলিয়াছে, অথবা তদ্রূপ আর কোনো দোষ করিয়াছে, তবে তাহাকে শিক্ষা দিও, প্রহার করিও না। এরূপে তিন বৎসর চলিয়া গেলেও যদি অনিষ্ট করিতে থাকে, তাহা হইলে প্রহার করিতে পার, তজ্জন্য আমি অসন্তুষ্ট হইব না। কিন্তু একেবারে প্রাণে মারিয়া ফেলিলে, আমি তোমা হইতে প্রাণের মূল্য দাবি করিব।" অনন্তর কন্যাপক্ষীয় সকলে এবং অপরাপর আত্মীয়স্বজনদিগেরও প্রায় অনেকে বিবাহ-বাড়ি হইতে বিদায় গ্রহণ করে।

বিবাহের দুই তিন দিন পরে বর নানাবিধ মদ্য এবং পিষ্টকাদির সহিত নবোঢ়াসমভিব্যাহারে শ্বশুরালয়ে গমন করে এবং তথায় দুই চারি দিন অবস্থানের পর সস্ত্রীক চলিয়া আইসে। ইহারই নাম "বিবাহের ছুঁইদ ভাঙানো" অর্থাৎ ইহাতেই বিবাহজনিত অপবিত্রতা (?) নষ্ট হইয়া যায়। এমনকি, ইহা না হইলে নবদম্পতির একত্র বাসও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকে এবং তাহারা অপর কাহারও মঞ্চেও* উঠিতে পারে না। চাকমাসমাজের ইহা অতিশয় উল্লেখযোগ্য সংস্কার।

বর তুলিয়া

আনিয়া বিবাহ এবং উপরিবর্ণিত বিবাহ পদ্ধতিতে বিশেষ কোনো প্রভেদ নাই : কেবল বর-আলয়ের কার্যগুলিও কন্যার পিত্রালয়ে হইয়া থাকে মাত্র। ইহাতে বরযাত্রীদিগের সহিত বরও গিয়া থাকে। তাহারা যাহাতে বিবাহ দিন প্রাতে পাত্রীর পিত্রালয়ে উপস্থিত হইতে পারে, সেই হিসাবে যাত্রা করে। বলা বাহুল্য, 'বর তুলিয়া বিবাহে' "বিবাহের ছুঁইদ ভাঙাইবার" প্রয়োজন হয় না।

বড়ো বিবাহ

রাজপরিবার এবং সম্ভ্রান্ত দেওয়ান পরিবার ভিন্ন অপর সাধারণে এ বিবাহের অধিকারী

* ইহাদিগের মধ্যে সাধারণ অবস্থাপন্ন প্রায় সকলেই মঞ্চোপরি বসবাস চালাইয়া থাকে, উচ্চশ্রেণি হইতেও ইহা অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। সম্ভ্রান্ত কয়েক পরিবারে মাত্র বাঙালি অনুকরণে গৃহাদি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রকৃত কেবল চাকমাগণ বলিয়া নহে, পার্বত্য জাতি মাত্রেরই ঈদৃশী ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়।

নহে*। ইহা একপক্ষে যেমন ব্যয়সাধ্য পক্ষান্তরে তেমনি বংশমর্যাদা সাপেক্ষ। বিবাহের আনুষঙ্গিক অপরাপর কার্য—পাত্রী তুলিয়া বিবাহেরই অনুরূপ। তবে সেই সঙ্গো আড়ম্বরাদির তো কথাই নাই। অধিকন্তু তিনখানি গৃহ নির্মিত হয়, তাহার এক ঘরে বরপক্ষ, আর এক ঘরে কন্যাপক্ষ থাকেন। অপর গৃহখানি "ফুল ঘর" নামেই আখ্যাত। তাহাতে নবদম্পতিকে যথাবিধি বসাইয়া 'ঠাকুর' (ভিক্ষু) 'জয়মঙ্গলসূত্র' রূপান্তরে "সিগলমোগলতারা" পাঠ করিয়া শুনাইয়া থাকেন। পূর্বকালে সাধারণ বিবাহেও এই "তারা" (শাস্ত্রগ্রন্থ) পঠিত হইত; এক্ষণে প্রায় অন্তর্হিত। এই "বড়ো বিবাহে"ও নবদম্পতিকে "ছুঁইদ ভাঙাইয়া" আসিতে হয়।

গৃহ-জামাতা

যাহারা নিতান্ত সম্বলহীন এবং যাহাদের পরিবারে অপর কেহ নাই, তাহারা শ্বশুরবাড়িতে গিয়া শ্বশুরেরই ব্যয়ে বিবাহ করিয়া থাকে। পাত্র তুলিয়া লইয়া বিবাহের সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য রহিয়াছে। গৃহ-জামাতা হইলেও আজীবন শ্বশুরবাড়িতে অবস্থান অধুনা প্রায় ঘটিয়া উঠে না। অনেকেই আপনাকে পরিবারচালনক্ষম বুঝিলে স্ত্রীকে লইয়া সরিয়া পড়ে। যাহা হউক, বর্তমানে এই শ্রেণির বিবাহ কদাচিৎ পরিদৃষ্ট হয়। হিন্দুসমাজ হইতেও ইহা বহুপরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। নতুবা কুলীন পরিবার যেরূপ ভারগ্রস্ত হইয়া উঠিতেছিল, এতদিন উহা সেই ভাবে প্রবল থাকিলে সম্ভবত এতদিনে হিন্দুসমাজ বিধ্বস্ত হইয়া যাইত!

মনোমিলনে বিবাহ

ত্রিপুরাসমাজে এই বিবাহ "হিকনানানী" আখ্যায় প্রথিত। প্রাচীনকালে হিন্দুসম্প্রদায়ের যে স্বয়ম্বর প্রথা ছিল, অধুনা পাশ্চাত্য প্রদেশের "কোর্টশিপ" (courtship) এবং ব্রাহ্মসমাজের মনোমিলন পদ্ধতিতে তাহার কিঞ্চিৎ গন্ধ পাওয়া যায়। ইহাতে দম্পতি পরস্পরকে "ত্বং মে পতি—ত্বং মে ভার্য্যা" ইত্যাকার জ্ঞানে গ্রহণ করিলে 'গান্ধর্ব বিবাহ' সম্পাদিত হইয়া যায়। ফলত এইরূপ পরিণয় অতি আদিম প্রথা। অনেকদিন হইতে ইহা লইয়া নীতিশাস্ত্রবিদ সমাজে গভীর গবেষণা চলিতেছে ; এ যাবৎ তাহার কোনো প্রকৃষ্ট মীমাংসা স্থিরীকৃত হয় নাই। চাকমাগণ ইহা ছাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ে ইহা একরূপ নাই বলিলেও চলে। কিন্তু সাধারণ সমাজে মনোমিলনে সম্বন্ধ মতো অধিক, অবিভাবকদিগের প্রস্তাবসিদ্ধ বিবাহ তাহার অর্ধেকও নহে। তবে তাহাদের এই বিবাহের সহিত পাশ্চাত্য সমাজের স্পেনীয় ও ফরাসীয় বিবাহ ব্যবস্থার গাঢ়তর সাদৃশ পরিলক্ষিত হয়।

পরন্তু ইহাদের সমাজে অনূঢ় এবং অনূঢ়াদলের সম্মিলন প্রায় অব্যাহত। যুবক যুবতির

* এমনকি, ইহাদের সমাজে জাতীয় রাজাদেশ ব্যতিরেকে সাধারণ চাকমা পরিবারে কেহ কোনো স্বর্ণাভরণ, অধিক কি "বাজু", "চন্দ্রহার" এবং পায়ের "মল" প্রভৃতি রৌপ্যালংকারও ধারণ করিতে কিংবা সম্ভ্রান্ত পরিবারেব ন্যায় অবরোধ প্রথা প্রবর্তনে সমর্থ নহে।

মধ্যে সেই সুযোগে প্রণায়সক্তি জন্মিলে, কিংবা "মহামুনি মেলার"* সম্মিলনে সূচিত পূর্বরাগে মনোমিলন হইয়া গেলে, তাহারা উভয়ে একযোগে পলাইয়া যায়। এদিকে পিতামাতা যখন জানিতে পারে যে, তাহাদের পুত্র বা কন্যা অমুকের কন্যা বা পুত্রের সঙ্গে পলাইয়াছে, তখন কন্যার পিতা আসিয়া হেড ম্যান** সমীপে যুবকের নামে অভিযোগ করে। উপায়ান্তরাভাবে যুবকের পিতামাতাও যুবতির পিতামাতার নিকট ইহাদিগের পরিণয়ে সম্মতি প্রার্থনা করে। অবশেষে যুবক যুবতি গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলে হেডম্যানের কাছে বিচার উপস্থিত হয়। যদি যুবতির অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলপ্রয়োগ দ্বারা লইয়া গিয়াছে প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে সেই দুর্মতি যুবকের ৬০ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারে। অন্যথা পরস্পরের স্বীকৃতি পাইলে (হেড ম্যানের) বিচারে কিছু অর্থের দ্বারা কন্যার পিতামাতাকে সম্মত করিয়া তাহাদের যথাবিধি বিবাহ হইয়া যায়। আর কোনো কারণে অভিভাবকদিগের সম্মতি পাওয়া না গেলে, তথাচ যদি যুবক যুবতির সংকল্প প্রবল থাকে, তাহারা পুনরায় পলায়ন করে। কিন্তু দ্বিতীয়বার পলায়নের পর আর কেহই তাহাদের বিবাহে বাধা দেয় না। এই বিবাহে "চুঙুলাং" পূজা এবং নূতন কুটুম্বগণকে লইয়া এক পরিপাটি ভোজ ভিন্ন অপরাপর আনুষঙ্গিক কার্য না করিলেও চলে, হয়ও না।

কোনো কোনো সময় এবংবিধ সম্মিলনে ভগ্নমনোরথ হইয়া করুণরসাত্মক অভিনয় ঘটে! তখন ইহা চিরজীবনের তরে অসুখের কারণ হইয়া থাকে। কাপ্তেন লুইন স্বীয় পুস্তকে*** এরূপ একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এস্থলে তাহারই মর্মানুবাদ তুলিয়া দেওয়া সংগত বোধ করিলাম—

> "ভূপিযা নামে জনৈক যুবক সন্যামুলা নাম্নী বালিকার সহিত প্রণয়াসক্ত হইয়াছিল। ইতিপূর্বেই সন্যামুলা মাতৃহাবা হয়। তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জুরাধন সস্ত্রীক ভিন্ন গ্রামে বসতি করিত। সন্যামুলা অপর ভ্রাতা হিরাধন ও বৃদ্ধ পিতার সহিত জুমের সময় "মইনঘরে"**** বাস করিতেছিল। ভূপিযা তাহাকে বিশেষ ভালোবাসিত ; কোনোরূপেই তাহার পাশ ছাডা হইতে চাহিত না। জুমকার্যেব সহায়তা প্রভৃতি ব্যপদেশে সে সর্বদাই তাহাদের পবিবারের ভিতর থাকিতে প্রয়াস পাইত এবং প্রায় প্রতিদিনই তাহাদের বাড়িতে আহাব ও "গুদি"*****তে শয়ন করিত। কিন্তু সে এত দরিদ্র ছিল যে, সন্যামূলার অভিভাবকদের সহিত প্রস্তাবক্রমে বিবাহ করিবার সাহস পায় নাই। এইরূপে প্রায় দুই বৎসব ধরিয়া তাহাদিগেব প্রণয়েব আদানপ্রদান চলিতে থাকে। অবশেষে উভয়ে একযোগে পলায়ন করিল। ঘটনার অবশিষ্ট কথাগুলি হিরাধনের মুখেই প্রকাশ করা

* এই মেলার বিস্তৃত বিবরণী ফাল্গুন-চৈত্র (১৩১২) সংখ্যার "কো'হিনুরে" 'মহামুনি' শীর্ষক প্রবন্ধে বাহির হইয়াছে এবং বক্ষ্যমান চিত্রও "বৌদ্ধবন্ধু"ব ভাদ্র (১৩১৩) সংখ্যায় সুস্পষ্ট দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

** হেড ম্যান (Head man)—গ্রামেব মোড়ল। বলা বাহুল্য ইংরাজ শাসনাধীনে আসিয়া বর্তমান পদবি লাভ হইয়াছে। ইহারা গভর্নমেন্ট কর্তৃক রাজাবাহাদুবের অনুরোধক্রমে নিযুক্ত হইয়া থাকেন।

*** The Chittagong Hill Tracts and the Dwellers there in.—P. 72-73.

**** জুমক্ষেত্রের ফসল পাকিলে বন্যজন্তুর উপদ্রব হইতে তৎসমুদয় রক্ষা করিবার নিমিত্ত তথায় মইন অর্থাৎ শৃঙ্গোপরি যে অস্থায়ী গৃহ নির্মিত হয়।

***** শয়নকক্ষ।

যাইতেছে।—"গত শুক্রবার আমি যখন কার্যস্থল হইতে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হই, পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তোর ভগ্নী কোথায়? অনেকক্ষণ হইল সে জল আনিতে গেল, কিন্তু অদ্যাপি ফিরে নাই। অকর্মণ্য ভূপিয়া আমাদের এখানে নিরন্তর ঘুরিত। আমার সন্দেহ হইতেছে, বুঝিবা সন্যামূলা তাহারই সঙ্গে পলাইয়া গেল!' এই কথায় আমি আরও দুই তিন জন যুবককে সঙ্গে লইয়া ভগিনীর উদ্দেশে বাহির হইলাম। এক ক্ষুদ্র সরিত্তীরে তাহাদের সহিত দেখা হইল। ভূপিয়া অগ্রে, সন্যামূলা তাহাব হস্তধাবণ করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছে। এই দৃশ্যে আমি ক্রোধান্ধ হইয়া হস্তস্থিত দা দ্বারা তাহাকে আঘাত করিতেই সে একপার্শ্বে লাফাইয়া পড়িল, এবং সেই আঘাত আমার ভগ্নীর উপর পড়িয়া তাহার পার্শ্বদেশ কাটিয়া ফেলিল। হায়! তৎক্ষণাৎ সে 'ও ভাই' বলিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। আমি ভয়ে পলাইয়া গেলাম। যদিও আমার সন্দেহ ছিল, কিন্তু আমি নিশ্চিত জানিতাম না যে, তাহাদের মধ্যে প্রণয় জন্মিয়াছে। কেন-না প্রেম-সমস্যা অনুসন্ধান—আমাদের জাতীয় প্রথা নহে। যদি ভূপিয়া আমাদেব নিকট প্রস্তাব উত্থাপিত করিত এবং নিয়মিত পণ দিতে পারিত, তাহা হইলে আমবা বন্ধুবান্ধবদেব সহিত পবামর্শ করিয়া তাহাকেই বিবাহ দিতাম। কিন্তু সে বিবাহের উপযোগী ব্যয় নির্বাহ কবিতে পারিবে না বলিয়া তাহা করে নাই। অগত্যা সন্যামূলাকে লইয়া পলাইয়াছিল।" ইত্যাদি।

ইহা ছাড়া এইরূপই প্রায়শ ঘটে যে, কোনো রমণী এক জনকে পূর্বে বিশেষরূপে আশ্বাস দিয়াছিল, শেষে ঘটনাচক্রে অপরের সহিত তাহার বিবাহ হইয়া যায়। ইহাতে সেই হতাশপ্রণয়ী স্বীয় জীবনের মমতা তুচ্ছ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীকে ইহলোক হইতে সরাইতে সচেষ্ট হয়। বৎসরে দুই চারিটি হত্যা এই নিমিত্তই ঘটিয়া থাকে।

বিধবা এবং পরিত্যক্তা বমণীদের বিবাহে বিশেষ কোনো আমোদ-উৎসবাদি হয় না। কেবল স্বগ্রামবাসী সকলকে একটি ভোজ দেওয়া গিয়া থাকে মাত্র! পূর্বপতির ঔরসজাত সন্তানাদি অধিকাংশস্থলেই তাহাদের পিত্রালয়েই থাকে। আর নিতান্ত অপোগণ্ড হইলে যদি মাকে ছাড়া থাকিতে না চাহে, তাহা হইলে পরবর্তী স্বামীর আশ্রয়ে প্রতিপালিত হয়। কিন্তু স্বেচ্ছাক্রমে দান করিয়া না গেলে কেহই বৈপিত্রিক সম্পদের উত্তরাধিকারী হয় না।

গর্ভধানাদি ইহাদের সমাজে নাই। পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, সাধভক্ষণ প্রভৃতি গর্ভিণীসংস্কারগুলিও এই সমাজে কোনোকালে ছিল কিনা, কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। পরন্তু এই সকলের পরিবর্তে প্রসূতিদিগের মঙ্গলার্থ প্রসবের পূর্বে ও পরে "গাংশালা"* ব্রত অনুষ্ঠিত হয়! গর্ভের সপ্তম মাসে অথবা প্রসবের পর শুভদিন নির্দেশ করিয়া পূর্বদিন যথানিয়মে অর্থাৎ মদ, পান, সুপারি প্রভৃতি দিয়া "ওঝা" নিমন্ত্রণ করিয়া যায়। পরদিন অতি প্রত্যূষে উঠিয়া নিকটবর্তী নদীজলে—জলপৃষ্ঠ হইতে কিঞ্চিদুপরি ভাগে একখানি ক্ষুদ্র গৃহ প্রস্তুত করে। অনন্তর বাড়িতে আসিয়া একটি হাঁড়িতে একটা আস্ত সুপারি স্থাপন পূর্বক উহার মুখ "খাদি" দ্বারা আবৃত করিয়া লয়। পরে একখানি সুদীর্ঘ সুতার একপ্রান্ত সেই "হাঁড়ির"গলায় সাতপাক জড়ায় এবং হাঁড়িটি সাতবার গর্ভিণীর বা প্রসূতির মস্তক 'নিছিয়া" যথাসম্ভব সোজাসুজি পথে সেই ক্ষুদ্র গৃহে লইয়া আসে। কিন্তু সুতাখানি এত লম্বা থাকে যে, তাহার এক প্রান্ত সেই "গাংশালার" "হাঁড়ি"-তে আবদ্ধ রহিলেও

* "গাং"—নদী, "শালা"—গৃহ ; নদীতে গৃহ প্রস্তুত করিয়া যে ব্রত অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে "গাংশালা ব্রত" কহে।

অপর প্রান্ত 'পোয়াতি'র আবাস গৃহে থাকে। ব্রতকার্যে প্রথমে "আগ চাওয়া"* হইয়া গেলে পূজা ও বলিদান প্রভৃতি ক্রমে সম্পাদিত হয়। অনন্তর ওঝা সুতা ধরিয়া অগ্রসর হয় ; এবং প্রসূতির স্বামী সেই "হাঁড়ি" ও বলিপ্রদত্ত মোরগ লইয়া অনুসরণ করিতে থাকে। "হাঁড়ি"টি গৃহে আনিয়া তুলিয়া রাখিবার পর প্রাঙ্গণে একটি শূকর বলি দেওয়া হয়। ইহার নাম "আগিদা"। পরিশেষে সাধ্যমতে আত্মীয়স্বজন এবং প্রতিবেশীগণকে ভোজদানের ব্যবস্থা আছে।

(২)

অন্ত্যেষ্টি

মৃত্যুর অব্যবহিত পরে স্নানাদি করাইয়া শবকে নববস্ত্র পরিধান করায় এবং "সিঙাপা"য় তিনটি বংশবোঝা সংস্থাপন করিয়া তদুপরি শয্যা রচনা পূর্বক উহাকে তাহাতে চিৎ করিয়া শোওয়াইয়া রাখে। অনন্তর শবের শিরোদেশে ও পদপ্রান্তে দুইটি অন্নপিণ্ড এবং বক্ষোপরি কতক খই ও একটি টাকা রাখার পর রড়ি (শ্রমণ) "মালেম তারা" পাঠ আরম্ভ করেন। রাজা বা গণ্যমান্য লোকের মৃত্যুতে "আরেঙামা তারা"ও পঠিত হইয়া থাকে। এই সময়ে "ঢুল" (ঢোল) বাদ্যও চলে, এবং শবরক্ষক যুবকগণ এই "ঢুল" বাজাইয়াই রাত্রি যাপন করে। অন্ত্যেষ্টির আয়োজন এবং আত্মীয়স্বজনের আগমন পর্যন্ত শব এইরূপে থাকে। পরে সুবিধানুরূপ দিনে চরম সংস্কারের নিমিত্ত সকলে প্রস্তুত হয়। বুধবার—লক্ষ্মীবার ; সুতরাং সেইদিন মৃতসৎকার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তাহা ছাড়া অনেক পরিবারে শুক্রবারেও স্থগিত থাকে। কিন্তু শব যত দিন গৃহে থাকে, তত দিন বাড়িতে আর উনুন জ্বলে না। তাহারা সকলে নিকটবর্তী আত্মীয় বা পাড়ার অপর কাহারও গৃহে একে একে আহার করিয়া আসে।

নির্দিষ্ট দিনে সৎকারের যথাবিধি আয়োজন হইলে পূর্বস্থাপিত অন্নপিণ্ডদ্বয় হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাতবার শবের মুখস্পর্শ করাইয়া ফেলিয়া দেয় ; এবং তৎস্থলে পুনরায় দুইটি সদ্যপক্ক অন্নপিণ্ড স্থাপন করে। অনন্তর শবের পাদকনিষ্ঠাঙ্গুলিতে সপ্তলহর সূত্রের এক প্রান্ত বদ্ধ করিয়া অপর প্রান্ত একটি মোরগশাবকের অঙ্গুলিতে বাঁধিয়া দেয় ; মৃত ব্যক্তির পরিবারস্থ সকলে সেই মোরগশাবক ধরিয়া থাকে। তখন 'আদমের' (পাড়ার) জনৈক বয়োবৃদ্ধ সূত্রের ঠিক মধ্যস্থলে—নিম্নে একখণ্ড কাষ্ঠ স্থাপন করিয়া 'তাগল' (দা) হস্তে সমাগত আর সকলকে জিজ্ঞাসা করে—"মরা হইতে জীবিতদের সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে হুকুম আছে কি না?" তাহারা যুগপৎ "আছে" "আছে" বলিয়া উঠিলে বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তির

* "আগ"—পরীক্ষা, "চাওয়া"—দেখা। ওঝা দুইটি কাঁটাল পাতা তদভাবে বাঁশ পাতা দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলির মধ্যস্থলে রাখিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করে। যদি পাতা দুইটিই চিৎ হইয়া পড়ে, তবে বুঝিতে হইবে—'হাসিতেছে!' অন্যথা দুইটিই উলটিয়া পড়িলে বিরাগভাব সূচিত করে। কিন্তু ইহার কোনোটিই সফলতাদায়ক নহে। দ্বিতীয় কি তৃতীয়বারের পরীক্ষাতেও যদি পাতা একটি চিৎ ও একটি উপুড় করিয়া ফেলিতে না পাবে, তাহা হইলে সেই পাতা দুইটি পরিবর্তন করিয়া লয়।

একই ঘায়ে মৃত জীবিতের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তৎপরে "আনিজা তারা" পাঠ আরম্ভ হয়, এবং তাহা সম্পূর্ণ হইতেই সকলে শবকে শ্মশানভূমিতে লইয়া চলে। সচরাচর স্রোতস্বতী তীরেই শ্মশান নির্বাচিত হইয়া থাকে। তথায় আনয়নের পর শেষোক্ত অন্নপিণ্ড দুইটি হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাতবার শবের মুখস্পর্শ করাইয়া পরিত্যাগ করে।

পূর্ণবয়স্কের মৃত্যুতে ও সমর্থ হইলে শ্মশানে রথ টানিবার আয়োজন করা হয়। এই রথ নির্মাণেও আবার ইতরবিশেষ ব্যবস্থা আছে। রাজপরিবারে বা তদঘনিষ্ঠ কেহ মরিলে "পঞ্চরত্ন" রথ প্রস্তুত হয়, অপর সাধারণের মৃত্যুতে একটি মাত্র শৃঙ্গ থাকে। একটি কাষ্ঠমঞ্জুষায় নানা সৌগন্ধি দ্রব্যাদির সহিত শব রাখিয়া, সেই শবাধার রথোপরি স্থাপন করে। অতঃপর উপস্থিত সকলে সমান দুই দলে বিভাগ হইয়া পরস্পর বিপরীতাভিমুখে টানিতে থাকে। তাহাদের এক পক্ষকে "স্বর্গের দূত" অপরপক্ষকে "নরকের দূত" নামে কল্পনা করা হয়। তাহাদিগের হারজিতের দ্বারা মৃতব্যক্তির পরলোকের স্থান পরীক্ষিত হইয়া থাকে। পরন্তু লোক-নির্বাচনে এমনি চাতুরি থাকে, প্রায়শই "স্বর্গীয় দূতের" জয় হয়। পূর্বে এই রথ টানিবার নিমিত্ত বিবাহিত এবং অবিবাহিতদিগের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলিত। বর্তমানে বিবাহিতের সংখ্যা অধিক হইয়া যাওয়াতে "গোছা" ভেদে অথবা নদীর বিপরীতকূলবাসীদের মধ্যে এই প্রতিযোগিতা চলিয়া থাকে। বলিয়া রাখা ভাল, এই সময়ে বাদ্য, বাজি পোড়ানো প্রভৃতি একান্ত প্রয়োজন।

শব সাধারণত দাহ করিয়া বিনষ্ট করা হয়। কিন্তু অনুদগতদন্ত শিশু কিংবা বসন্ত বা ওলাউঠাক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যু হইলে ভূপ্রথিত করাই সাধারণ বিধি। যদি কেহ তাদৃশ শবকেও পোড়াইতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে শবের মুখে কড়ি স্পর্শ করাইয়া অথবা সমাধিদানের কয়েক দিন পরে 'কবর' হইতে উহা তুলিয়া তৎপর জ্বালায়। ইহাদের শবদগ্ধ করিবার নিমিত্ত চুল্লির প্রয়োজন হয় না। দুই পার্শ্বে দুইটি মোটা গুঁড়ি স্থাপন করিয়া তদুপরি পুরুষের নিমিত্ত পাঁচ তবক এবং স্ত্রীলোকের সাত তবক সরু কাষ্ঠ সাজাইয়া লয়।* মধ্যে মধ্যে আম্র প্রশাখাও নিয়ম আছে। ধনশালী মহাশয়েরা তৎপরিবর্তে চন্দনকাষ্ঠ দিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া এই চিতার উপরিভাগে একখানি চন্দ্রাতপ টাঙাইয়া দেওয়া হয়। অনন্তর পুরুষের শব পূর্বাভিমুখ এবং স্ত্রীলোকের শব পশ্চিমাভিমুখ মস্তকে চিতার উপর সংস্থাপিত করা হয়। তখন জ্যেষ্ঠ পুত্র তদভাবে অপর কোনো ঘনিষ্ঠ আত্মীয় সাতবার চিতা প্রদক্ষিণ পূর্বক মুখাগ্নি দান করিলে আরও অনেকে চতুর্দিক হইতে অগ্নিসংযোগ করিয়া থাকে।

ছোঁয়াচে রোগের শব সদ্য জ্বালাইলে হুতাশনের প্রায় ওই রোগ গ্রাম উৎসন্ন করে।

* মগদিগের মধ্যেও স্ত্রীলোকের নিমিত্ত অধিকতর কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়। চাকমাগণ তাহাদিগ হইতে ইহা অনুকরণ করিতে পারে। কিন্তু জানি না, ঈদৃশী ব্যবস্থায় কোনো বিশেষ রহস্য নিহিত রহিয়াছে। কাপ্তেন লুইনও এতৎ প্রসঙ্গালোচনায় লিখিয়াছেন—স্ত্রীলোকদিগের অধিকতর বৃদ্ধি এবং তৈলাক্ত পদার্থের আধিক্যনিবন্ধন দাহোপকরণের কম প্রয়োজন হইবার কথা, কিন্তু ইহারা তৎস্থলে আরও অধিকই ব্যবহার করে।

হাড় ভাসানো

অন্ত্যেষ্টির পরদিন প্রত্যুষে চিতা হইতে কতকগুলি অস্থিমাত্র সংগ্রহ করিয়া অবশিষ্ট ভস্মরাশি স্রোতোজলে নিক্ষেপ করে। অনন্তর সংগৃহীত হাড়গুলি একটি হাঁড়িতে রাখিয়া তাহার মুখ বন্ধ করতঃ মৃতব্যক্তির জনৈক সগোত্র লইয়া সেই স্রোতস্বতীর জলে নামে। এই ব্যক্তির কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে একখানি সুদীর্ঘ সূত্রের একপ্রান্ত বাঁধিয়া দেওয়া হয় ; অপর প্রান্ত তাহার সম্পর্কে সম্মানিত সেই গোত্রেরই কেহ তীরভূমি হইতে টানিয়া ধরে। এদিকে চাপদ্বারা "হাঁড়ি"টা জলপূর্ণ হইলে ডুব দিয়া তাহা ঠেলিয়া দিতেই তীরস্থিত ব্যক্তি জলগত ব্যক্তিকে টানিয়া তুলিয়া আনে। অতঃপর রড়ী ও ঠাকুরদিগকে দান-দক্ষিণা উৎসর্গ করা এবং পরিপাটিরূপে খাওয়ানো হয়। এই সময়ে শ্মশানভূমিতে ঘেরা দিবারও ব্যবস্থা আছে।

কোনো কোনো গোষ্ঠীতে অন্ত্যেষ্টির দিন হইতে সাত দিন পরে আবার কেহ কেহ মৃত্যুদিবসের সাতদিন পরে শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করে। এই আদ্যশ্রাদ্ধ কার্য শ্মশানভূমিতেই অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে সাধ্যায়ত্তরূপে ভিক্ষু ও শ্রমণগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদিগকে ধ্বজা, খড়া শয্যা নানাবিধ বাসন ও ভোজ্যপোকরণ ও দক্ষিণাদি উৎসর্গ করে ; এবং সপরিবারে কলশি ধরিয়া জল ঢালিয়া থাকে। যদি পরিবারের কাহারও অন্তঃপুর হইতে বাহির হইবার আপত্তি থাকে, তাহা হইলে একখানি সুদীর্ঘ সূত্রের একপ্রান্ত ধরিয়া রহে, অপরপ্রান্ত দানভূমিতে আনিয়া উক্ত কলশি গলে জড়ায়। পিতামাতার চুল ফেলিয়া দিতে হয়। এই সময়ে সমাগত আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবেরাও প্রেতাত্মার উদ্দেশ্যে ধ্বজা প্রতিষ্ঠা এবং 'দানখয়বাত' ইত্যাদি যথা ইচ্ছা করিয়া থাকে। কথিত আছে, ধ্বজাদানের এতই ফল যে, তৎসঞ্চালনে শ্মশানের যতগুলি রেণু চালিত হয়, মৃতব্যক্তি তত বৎসর নির্বিঘ্নে স্বর্গবাসের অধিকার লাভ করে। সুতরাং ধ্বজা সংখ্যায় বেশি হইলে স্বর্গবাসের সুবিধাও অধিক হয়। এতদুপলক্ষ্যে ভোজনাদিও যথাসাধ্য পরিপাটি হইয়া থাকে। ইহাদের সমাজে বার্ষিক শ্রাদ্ধ করিবার রীতি প্রচলিত আছে, কিন্তু ইহা অতি অল্প লোকেই করে। মৃত্যু দিবসের বাঙ্গালা তারিখ ধরিয়াই বার্ষিক শ্রাদ্ধের দিন গণনা করা হয়। ইহাতেও ভিক্ষু এবং শ্রমণদিগকে নানাবিধ দান ও দক্ষিণাদি উৎসর্গ ভিন্ন পূর্বোক্তরূপে জল ঢালাও হয়, তাছাড়া অপর কোনো বিশেষ বিধি নাই।

প্রবাসী ● অগ্রহায়ণ ১৩১৪ (১৯০৭ খ্রিস্টাব্দ)



হালামদের কথা

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

হালামরা সাধারণত শ্রীহট্ট জেলার দক্ষিণ অংশে লুসাই পাহাড়ের নিকটবর্তী পার্বত্য স্থানসমূহে বাস করে। ইহারা পার্বত্য টিপ্‌রা জাতির শাখা-বিশেষ। ইহাদের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি সবই অদ্ভুত। বর্তমানকালে বাঙ্গালীদের সংস্পর্শে আসায় ইহারা কতকটা সভ্য হইয়াছে এবং নিজেদের প্রথাগুলি ক্রমশ পরিত্যাগ করিতেছে।

হালামরা ছোটো ছোটো পাহাড় বা টিলার উপর বাড়ি নির্মাণ করিয়া বাস করে। উঁচু বাঁশের মাচার উপর বাড়িগুলি তৈয়ারি। ধাপ-কাটা গাছের গুঁড়িতে প্রস্তুত সিঁড়ি বাহিয়া ঘরের বারান্দায় উঠিতে হয়। ঘরের ছাদ বাঁশ ও একরকম পাতায় ছাওয়া। প্রত্যেক হালামের বাড়িতে একখানামাত্র ঘর থাকে। উহার একদিকে রন্ধনশালা এবং আর একদিকে পরিবারস্থ সকলের শুইবার স্থান। মাচার নীচে শূকর কুক্কুট প্রভৃতি গৃহপালিত পশুপক্ষীর আস্তানা।

হালাম-পুরুষেরা সকলেই ধুতি ও জামা পরিধান করে। স্ত্রীলোকেরা একখানা পাঁচ হাত ধুতি বুকের কাছে গেরো দিয়া পরে এবং আর একখানা ছোটো চাদর কটিতে জড়াইয়া রাখে, কেউ কেউ লম্বা হাতাওয়ালা একরকম কোর্তাও গায়ে দেয়। বয়স্কা নারীরা হাটে সওদা করিতে যাইবার কালে মাথায় পাগড়ি বাঁধিয়া থাকে।

অলংকারের মধ্যে সর্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, ইহাদের কর্ণভূষণ। হালাম নারীদের এক এক কানে দুইটা করিয়া ছিদ্র দেখিতে পাওয়া যায়। কানের উপরদিককার ছিদ্রটি ছোটো, কিন্তু তেলোর ছিদ্রটি মস্ত বড়ো। রূপা দস্তা অথবা টিনের তৈয়ারি একটা অলংকার কানের উপরিভাগে পরানো থাকে আর তেলোর ছিদ্রের ভিতর আন্দাজ দুই ইঞ্চি ব্যাসের একটা

গোল রূপার চাকতি পরানো থাকে। এই গহনাগুলির দরুন হালাম নারীদের কানগুলি ভারী বিশ্রী দেখায়। প্রত্যেক হালাম নারীই রূপার তৈরি একপ্রকার হার এবং কাঁচ, গিলটি, কুঁচ ইত্যাদির মালা গলায় পরে। অবস্থাপন্ন নারীরা টাকা আধুলি এবং সিকিতে কোঁড়া বসাইয়া হাররূপে গলায় পরিয়া থাকে। বাহুতে কোনো গহনা পরিবার রেওয়াজ ইহাদের নাই। ইহারা কেশে এবং কর্ণভূষণে বনফুল পরিতে বড়োই ভালবাসে। যুবতিরা বনফুল দিয়া একে অপরের কেশবিন্যাস করিয়া দেয়। হালাম-পুরুষদের কানে পিতলের অঙ্গুরীয় এবং গলায় তুলসীর মালা।

হালাম স্ত্রীপুরুষ বালক বালিকা সকলেই মদ্য এবং ধূমপানে আসক্ত। ইহাদের হুঁকাগুলি অদ্ভুত ধরনের। মোটা একটা বাঁশের চোঙের ফুটার মধ্যে সরু আর একটি চোঙ বসানো থাকে। ওই ছোটো চোঙটির উপর কলিকা বসাইয়া তাহারা ধূমপান করে।

ভাত পচাইয়া ইহারা মদ তৈয়ার করে। পালা করিয়া এক একদিন এক এক বাড়িতে মদ প্রস্তুত হয়। বাড়ির উঠানের মধ্যে মদ্যপূর্ণ বড় বড় মৃৎপাত্র বসানো থাকে এবং স্ত্রী-পুরুষ সকলে সেগুলার চারিদিকে মণ্ডলাকারে বসে ও একটা সরু বাঁশের নল মৃৎপাত্রের ভিতর ঢুকাইয়া মদ্যপান করে। মদ খাইবার সময় কথা বলা কিংবা বাঁ হাত দিয়া নল ছোঁয়া ইহারা মহা দূষণীয় বলিয়া মনে করে। কচি কচি ছেলে মেয়েদের পর্যন্ত মদ্যপান এবং ধূমপান করিতে দেখা যায়।

শূকর এবং কুক্কুটমাংস ইহাদের অতি প্রিয় খাদ্য। কলাগাছ টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া বেত ও মরিচচূর্ণ সংযোগে ইহারা এক অপূর্ব ব্যঞ্জন তৈয়ার করে। ইহারা কাঁচা মাংস মরিচচূর্ণের সাহিত ছেঁচিয়া এবং আগুনে পোড়াইয়া খাইতে খুব ভালবাসে। খাওয়ার পর কাহারও পাতে কিছু উদ্বৃত্ত থাকিলে পরিবেশনকারিণী তাহা তুলিয়া লইয়া যায় এবং অপরকে তাহা পরিবেশন করে। খাওয়া-দাওয়া চুকিলে একখানা কাপড় দিয়া উচ্ছিষ্ট ঝাড়িয়া মাচার নীচে ফেলিয়া দেয়। ইহাদের মধ্যে খাওয়ার পর আঁচাইবার রেওয়াজ নাই।

হালাম যুবক যুবতিদের মধ্যে অবাধ মেলামেশা প্রচলিত আছে। বিবাহের আগেই যুবক যুবতিদের মধ্যে প্রণয় হইয়া থাকে। গভীর রজনীতে বাড়ির সকলে নিদ্রিত হইলে পর প্রণয়ীবা নিজ নিজ প্রণয়িনীর সহিত দেখা করে। আগেকার দিনে হালাম যুবকেরা মাথায় দীর্ঘ কেশ রাখিত। তখন প্রণয়িনীরা বাঁশের কাঁকই দিয়া তাহাদেব মাথার চুল আঁচড়াইয়া খোঁপা বাঁধিয়া দিত। বিবাহের আগে বরকে কনের বাপের বাড়িতে পাঁচ বছর জন খাটিতে হয়। এই পাঁচ বছর বরকনে স্বামী-স্ত্রীর মত একত্রে বাস করে। খাটুনির মেয়াদ ফুরাইলে বরের পিতা মদ্য সহ (কমপক্ষে বারো কলশ) কনের পিতার বাড়িতে আসিয়া হাজির হয়। সেখানে সকলে মিলিয়া মদ্যপান করে। মদ্য-পাত্রসমূহের নিকটে একটা থালার উপর কিছু তুলা বিছানো থাকে। কনের জ্ঞাতি-সম্পর্কীয় ভাইরা ইচ্ছামত টাকা, আধুলি সিকি ইত্যাদি ওই থালার উপর রাখে—এ সমস্ত কনের প্রাপ্য। কনের বাপের বাড়ি হইতে বরকনেকে একসঙ্গে কনের মামার বাড়িতে যাইয়া কিছুক্ষণ থাকিতে হয়। তারপর বরের বাপ

বরকনেকে লইয়া বাড়িতে চলিয়া আসে। বিবাহের পর সাতদিন পর্যন্ত কনের পক্ষের বাপের বাড়ির কাহারও মুখদর্শন করা নাকি মহাপাপ।

বর জন খাটিতে রাজি না হইলে কনের পিতাকে ষাট টাকা পণ দিতে হয়। মেয়ের অমত থাকিলে বাপ মা জোরজবরদস্তি করিয়া তাহার বিবাহ দিতে পারে না। ইহাদের মধ্যে সময় সময় বিবাহচ্ছেদ হইয়া থাকে। পরস্পরের মনোমালিন্যের দরুন স্ত্রী যদি স্বামীর ঘর ছাড়িয়া চলিয়া আসে, তাহা হইলে স্বামীর নিকট সে ষাট টাকা দাবি করিতে পারে।

অন্যান্য পাহাড়ি জাতির মতো উহারাও জুম কৃষি করে। প্রথমে পাহাড়ের উপরকার জঙ্গল পোড়াইয়া দা দিয়া মাটি কোপাইয়া হরেক রকম তরিতরকারির বীজ একসঙ্গে বপন করে। তারপর প্রথম বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গেই ধান্য রোপণ করে। ধান্য এবং কার্পাস ইহাদের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। পাহাড়ের উপর প্রত্যেকেরই এক একখানা করিয়া ছোটো ঘর থাকে। সেগুলিতে তাহারা ধান্যাদি গোলাজাত করিয়া রাখে।

হালাম নারীরা খুব পরিশ্রমী। কৃষিকার্য হাটবাজার ইত্যাদি বেশির ভাগ স্ত্রীলোকেরাই করে। ইহাদের মধ্যে 'জুমের গান' নামক এক শ্রেণির সংগীত প্রচলিত আছে। ক্ষেত্রে কাজ করিবার সময় স্ত্রীলোকেরা সুর করিয়া জুমের গান গাহিয়া থাকে।

পোশাক-পরিচ্ছদ কিংবা ঘর-গৃহস্থালির দরকারি আসবাবাদির জন্য ইহাদিগকে পরমুখাপেক্ষী হইতে হয় না। প্রত্যেক হালামের বাড়িতেই চরকা ও তাঁত আছে। নিজেদের আবশ্যক বস্ত্রাদি হালাম-নারীরা নিজেরাই বুনিয়া থাকে। সূচীশিল্পেও ইহাদের অসাধারণ দক্ষতা আছে। হালাম-নারীরা এক মুহূর্তও আলস্যে অতিবাহিত করে না।

বাঁশ ইহাদের বিশেষ একটি দরকারি জিনিস। বাঁশ হইতে বেত তুলিয়া তাহা দ্বারা ইহারা এক ধরনের টুকরি তৈয়ারি করে। সেগুলিকে বলে 'চাম্পুই'। ওগুলিতে তরিতরকারি ভরিয়া লইয়া হালাম নারীরা বাজারে বিক্রয় করিতে যায়। মাদুর, দোলনা, কাঁকই ইত্যাদি আরও নানা জিনিস ইহারা বাঁশ দিয়া তৈয়ার করে।

প্রত্যেক হালাম বস্তিতেই একজন 'গালিম' বা গ্রাম-প্রধান এবং তাহার একজন সহকারী থাকে। গালিমের সহকারীকে 'গাবুর' বলা হয়। গ্রামের লোকদের ছোটোখাটো অপরাধের বিচার ইহারাই করিয়া থাকে। গ্রামের মাতব্বরদের সম্মতি ছাড়া কিন্তু ইহারা কাহাকেও দণ্ড দিতে পারে না। 'গালিম' ও 'গাবুর' কোনো সামাজিক অপরাধ করিলে গ্রামবাসীরা সকলে একমত হইয়া তাহাদের জরিমানা করিতে পারে।

হালামরা ভূতপ্রেত এবং উপদেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। ইহাদের ভিতর কতকগুলি কুসংস্কার প্রচলিত আছে। কাহারও ব্যারাম হইলে ইহারা মনে করে যে, রোগাক্রান্ত লোকটির উপর ভূতের আবেশ হইয়াছে। তাই, ভূত ছাড়াইবার জন্য ওঝাকে ডাকাইয়া আনা হয়। ওঝাকে ইহারা 'অচাই' বলে। 'অচাই' আসিয়া রোগীর নাড়ি টিপিয়া বলে যে, তাহার উপর অমুক ভূতের আবেশ হইয়াছে এবং ভূত তাহার নিকট অমুক জিনিস

চাহিতেছে, 'অচাই'র কথামত ভূতকে তাহার প্রার্থিত জিনিস দেওয়া হয়, একবারে ফল না হইলে, তিন তিনবার ওরূপ করা হয়।

তিন বছর বয়সের সময় ছেলেমেয়েদের কর্ণবেধ করা হইয়া থাকে ; কর্ণবেধের সময় গুরুজনেরা তাহাদিগকে চরকায় কাটা সুতা ও চাউল মাথায় দিয়া ও মুখে একটু নুন দিয়া আশীর্বাদ করে।

কেহ মরিলে পর ইহারা কতকগুলি ঝাঁঝ বাজাইয়া প্রতিবেশীদিগকে জানায়। তখন প্রতিবেশীরা স্ত্রীপুরুষ সকলে মৃতব্যক্তির বাড়িতে আসিয়া জমায়েত হয়। মেয়েরা সকলেই আঁচল ভরিয়া ফুল লইয়া আসে, শবদেহটিকে গরম জলে স্নান করাইয়া নূতন কাপড়-চোপড় পরাইয়া ঘরের ভিতর শোয়াইয়া রাখা হয় এবং দুইটি টাকা দিয়া তাহার দুই চোখ, ও লাল রঙের সুতা দিয়া মুখের ছিদ্র, ঢাকিয়া দেওয়া হয় ; মেয়েরা সকলে মিলিয়া শবদেহটিকে ফুল দিয়া সাজায় এবং নিজেরাও কানে ফুলের দুল পরে। বয়স্কা নারীরা বিড়বিড় করিয়া কতকগুলি কথা আওড়াইয়া মৃতদেহটির উপর পানসুপারি রাখে, তারপর শবদেহটির নিকট প্রণতি করিয়া স্ত্রীপুরুষ পরস্পর পরস্পরের হাত ধরাধরি করিয়া বিবিধ অঙ্গভঙ্গি সহকারে নৃত্য আরম্ভ করে। সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলা ঝাঁঝ ও ঢোলক বাজিতে থাকে এবং স্ত্রীপুরুষ বালক বালিকা সকলে মিলিয়া মদ্যপান শুরু করে, নৃত্য শেষ হইলে একজন বয়স্কা নারী সকলের মাথায় কিছু কিছু তেল মাখাইয়া দেয়।

এই সমস্ত অনুষ্ঠান সমাধা হইলে শবদেহটিকে আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত করিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া আনা হয় এবং বাঁশের তৈরি সুন্দর শবাধারে স্থাপিত করিয়া দাহ করিবার জন্য নিবিড় জঙ্গলের ভিতর নদীতীরস্থ সৎকার ভূমিতে লইয়া যাওয়া হয়। স্ত্রীলোকেরা টুকরিতে করিয়া মদ্য, পুষ্প, ভাত-সিদ্ধ-করা কুক্কুটমাংস, কদলী, পানসুপারি এবং একটি জীবন্ত কুক্কুটশাবক লইয়া শবের অনুগমন করে, দাহকার্য সমাধা হইলে মদ্য এবং কুক্কুটমাংসাদি মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়া সৎকারভূমিতে রাখিয়া দেওয়া হয় এবং কুক্কুটশাবকটিকে সে জায়গায় ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং একটি গাছের ডাল মাটিতে পুঁতিয়া তাহাতে মৃতব্যক্তির 'চাম্পুই' এবং একটি পাখা বাঁধিয়া রাখা হয়। সৎকারান্তে বাড়ি ফিরিবার সময় সকলকেই একরকম গাছের ডাল ভাঙিয়া বাঁ হাতে করিয়া লইতে হয়, শেষে একই জায়গায় সবাইকে সেগুলি ফেলিয়া দিতে হয়।

পরদিন মৃত ব্যক্তির বাড়িতে পূজা হয় এবং 'অচাই' তুলসীর জল ছিটাইয়া ঘর শুদ্ধ করে।

ইহাদের বিশ্বাস মৃতব্যক্তি চিল কিংবা ঘুঘুপাখির উপর চড়িয়া স্বর্গে যায় এবং সেখানে তার পাপপুণ্যের বিচার হয়।

কলেরা রোগে কাহারও মৃত্যু হইলে হালামরা তাহার মৃতদেহ দাহ করে না—কপালে আগুন ছোঁয়াইয়া মাটিতে পুঁতিয়া ফেলে।

ইহারা বহু দেবদেবীর পূজা করিয়া থাকে। তন্মধ্যে 'তুইরেংপা' 'তুইদুংপা', 'শিবরাই'

প্রভৃতি প্রধান। তা ছাড়া ভূতপ্রেত এবং উপদেবতাদির পূজাও ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে, ভূতপ্রেতাদির পূজা উপলক্ষ্যে ইহারা শূকর বলি দেয়।

'খলাইরই' পূজা ইহাদের সকলের চেয়ে বড়ো পূজা। হালামরা অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম ভাগে এই পূজা করিয়া থাকে। ইহাদের মতে অগ্রহায়ণ মাস বৎসরের প্রথম মাস।

বাড়ির উঠানের মধ্যে খানিকটা জায়গা সাফ করিয়া লইয়া কতকগুলি বংশখণ্ড মাটিতে পুঁতিয়া সেগুলির গায়ে আড়াআড়িভাবে আরও কতকগুলি বংশখণ্ড বাঁধিয়া রাখা হয় এবং ওগুলার উপর খানকতক তাঁতে তৈরি কাপড় বিছাইয়া রাখা হয়। বাঁশগুলির গায়ে গুটিকতক সূক্ষ্মাগ্র মদ্যপূর্ণ বংশখণ্ড হেলান দেওয়া থাকে। বাঁশগুলিকে ইহারা চাঁছিয়া-ছুলিয়া খুব সুন্দর করিয়া রাখে। 'অচাই' ফুল-পাতা-বাঁধা একগাছি চরকায়-কাটা লম্বা সুতা মাথায় জড়াইয়া বিড়বিড় করিয়া মন্ত্র আওড়াইতে থাকে এবং এক একটি বাঁশ কাটিয়া ভিতরকার মদ মৃত্তিকায় প্রোথিত বংশখণ্ডগুলির উপর ঢালিয়া দেয়। 'অচাই'র সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকজন মাথায় সুতা বাঁধিয়া পূজাস্থানের নিকটে ঘুরিতে থাকে।

বংশখণ্ডগুলির সামনে একখানা পাতায় কিছু চাল রাখিয়া দেওয়া হয়। ইহাই তাহাদের নৈবেদ্য। 'অচাই' এই নৈবেদ্যের উপর কুক্কুট বলি দেয়। পূজা শেষ হইলে, চাল এবং কুক্কুটের রক্ত একত্র করিয়া মাখানো হয়। এই পূজা উপলক্ষে আন্দাজ পঁচিশ ত্রিশটা কুক্কুট বলি দেওয়া হয়। পূজাস্থানের নিকটেই একটা কড়াইয়ে কুক্কুটগুলা সিদ্ধ হইতে থাকে।

বাহিরের অনুষ্ঠানাদি শেষ হইলে 'অচাই' দা-হাতে ঘরের ভিতরে আসিয়া ঢোকে, মেঝের উপর তণ্ডুলপূর্ণ একটি মৃৎপাত্র বসানো থাকে, এই পাত্রটির কাছে কিছু তুলাও বিছানো থাকে। এখানে কুক্কুটগুলিকে অবিকল মুসলমানদের মত জবাই করা হয়। 'অচাই' প্রথমে কুক্কুটগুলির গলার অর্ধেক কাটিয়া ফেলে, তারপর কুক্কুট রক্ত দ্বারা তুলা ভিজাইয়া লয় এবং একটা পাত্রে খানিকটা রক্ত রাখিয়া দেয়। শেষে দা-দিয়া কুক্কুটগুলির পেট ফুঁড়িয়া ভিতরে কিছু জল ঢালিয়া দেয় এবং নাড়িভুঁড়ি টানিয়া বাহির করে।

এরপর দুইটি মদ্যপূর্ণ মৃৎপাত্রের সামনেও কুক্কুট জবাই করা হয়। তখন সকলে সার বাঁধিয়া বসে এবং একজন একটি বংশখণ্ড উপুড় করিয়া প্রত্যেকের হাতে একটু একটু মদ ঢালিয়া দেয়। ওই মদ প্রথমে মাথায় ঠেকাইয়া শেষে খাইতে হয়। অতঃপর সকলকে এক এক পাত্র মদ দেওয়া হয়। তখন সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠে 'চুবাই' 'চুবাই' (নমস্কার নমস্কার) এবং মদ্য পান করে। মদ্যপান শেষ হইলে একটি যুবতি সকলকে পান পরিবেশন করে।

যাহার বাড়িতে পূজা সে সেইদিন গ্রামের লোকদের এক বিরাট ভোজ দেয়। দ্বিপ্রহরে খাওয়া-দাওয়ার পর মদ্যপান শুরু হয় এবং পরদিন দুপুর রাত পর্যন্ত পুরাদমে মদ খাওয়া চলিতে থাকে।

পূজার পরদিন ইহাদের নাচিবার পালা। প্রথমে 'গালিম' মাথায় একটি পাগড়ি বাঁধিয়া

বিবিধ অঙ্গভঙ্গি সহকারে নাচিতে আরম্ভ করে। অপর দুই ব্যক্তি দুইটি বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে থাকে এবং সকলে মিলিয়া বিষম হল্লা জুড়িয়া দেয়। গালিমের নৃত্য শেষ হইলে অচাইকে নাচিতে হয়। অচাই'র সঙ্গে এক বুড়ি একখানা রঙিন কাপড় ওড়নার মতো কাঁধের উপর ফেলিয়া নৃত্য করে। বছরিপূজার সময় যুবতিদের নাচিবার রেওয়াজ নাই, কিন্তু অন্যান্য পূজাপর্ব উপলক্ষে যুবতিরা নৃত্য করিয়া থাকে।

প্রত্যেক হালাম বস্তিতে সর্বসাধারণের পূজার জন্য নিবিড় জঙ্গলের ভিতর একটি ঘর থাকে। সেইটির নাম 'বারেইন'। সকলে মিলিয়া চাঁদা করিয়া ওই ঘর তৈয়ার করে। ফাল্গুন মাসে হালামরা 'বারেইন'এর চারিধারের জঙ্গল সাফ করে এবং ঘরের ভিটার মাটি কাটিয়া কতকগুলি ঢিবি তৈরি করে এবং সেগুলির গায় তুলা এবং চরকায় কাটা সুতা বাঁধিয়া রাখে।

হালামদের সবগুলি পূজার অনুষ্ঠানাদি অবিকল একই ধরনের। তবে কোনো কোনো পূজায় একটু আধটু ইতরবিশেষ যে নাই তেমন নহে। আজকাল হিন্দুদের অনেক পূজা-পদ্ধতি ইহারা গ্রহণ করিতেছে।

প্রবাসী ● শ্রাবণ ১৩৩৭ (১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ)



সিন্টেংদের দেশে

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

জৈন্তা পাহাড়ে সিন্টেং নামক পার্বত্য জাতির মধ্যে প্রচারকার্য ব্যপদেশে ১৯২৯ সনের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি 'হালামদের দেশ' হইতে যাত্রা করিলাম। শ্রীহট্টে আসিয়া খবর পাইলাম, রামকৃষ্ণ মিশনের সুপ্রসিদ্ধ কর্মী স্বামী প্রভানন্দ দিন-কয়েকের মধ্যেই খাসিয়া পাহাড়ের দিকে রওনা হইবেন। স্বামীজির সঙ্গে এপ্রিলের শেষ ভাগে শেলা নামক স্থানে আসিয়া পৌঁছিলাম। দিনকতক শেলাতে কাটাইয়া স্থির হইল শিলং হইতে আমাকে জৈন্তা পাহাড়ের প্রধান শহর জোয়াইয়ে পাঠাইবার ব্যবস্থা স্বামীজি করিবেন।

শেলা গ্রামটি ছাড়াইয়া কিছুদূর অগ্রসর হইবার পরই আন্দাজ আড়াই হাজার ফিট উঁচু এক খাড়া চড়াই শুরু হইল। চড়াইটি পার হইয়া মুস্ত গ্রামে উপস্থিত হইয়া আমরা চারিদিকে পাথরের দেওয়ালে ঘেরা এক তকতকে-ঝকঝকে প্রশস্ত স্থানে একটি গাছের ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। অনতিদূরে জনকতক খাসিয়া জটলা করিয়া বসিয়া ছিল। আমি তাহাদিগকে নিকটে আসিবার জন্য ইশারা করিলাম। তাহারা আসিয়া এক-এক জন করিয়া 'খু-ব্লেই' এই দুইটি শব্দ উচ্চারণপূর্বক আমাদের সঙ্গে করমর্দন করিতে লাগিল, ইহাই খাসিয়াদের অভিবাদন-প্রণালী। কথা-প্রসঙ্গে স্বামীজি বলিলেন, এই অঞ্চলের বহুগ্রামেই এই ধরনের এক একটি প্রাচীরবেষ্টিত স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। কোনো সামাজিক সমস্যার সমাধান করিতে হইলে গ্রামের মাতব্বররা নাকি এই জায়গাগুলাতে আসিয়া জমায়েত হন। নানা উৎসব উপলক্ষ্যে এগুলাতে নাকি খাসিয়াদের নৃত্যাদিও হইয়া থাকে।

বেলা পাঁচটা নাগাদ 'নংওয়ারে' রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলের শিক্ষক বন্ধুবর শশীন্দ্র সোমের বাসায় আসিয়া আশ্রয় লইলাম।

সূর্যাস্তের প্রাক্কালে একান্তে এক অত্যুচ্চ স্থানে একখানা সমতল শিলাখণ্ডে আসিয়া বসিলাম। সম্মুখে গভীর খাদ। খাদের ও-পারে নিবিড় জঙ্গলে ঢাকা সুদূরবিস্তৃত পাহাড়শ্রেণি। ওই পাহাড়শ্রেণির পিছনে বহুদূরে অবস্থিত একটি নীল পাহাড়ের গা বাহিয়া রজতরেখার মতো দুইটি ঝরণাধারা নিম্নে গড়াইয়া পড়িতেছে। তন্ময় হইয়া এই পার্বত্য সৌন্দর্য উপভোগ করিতেছিলাম, কিন্তু সূর্য অস্তমিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে নিবিড় অন্ধকারে দিঙ্‌মণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া গেল। আমি তখন অগত্যা সে জায়গা হইতে উঠিয়া বিজন বনপথ দিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিন দ্বিপ্রহরে আমরা চেরাপুঞ্জির উদ্দেশে রওনা হইলাম। রাস্তার দু-ধারের দৃশ্য পরম রমণীয়। পাহাড়ের উচ্চ চূড়ায় অবস্থিত খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রতিষ্ঠিত গির্জাগুলি মাঝে মাঝে নজরে পড়িতে লাগিল। কয়েকটি চড়াই-উৎরাই পার হইয়া আমরা টার্না গ্রামের কাছে আসিয়া পৌঁছিলাম। টার্নার নিকট চেরাপুঞ্জির রাস্তাটি ডানদিকে বাঁকিয়া খাড়া পাহাড়ের উপর দিয়া উঠিয়াছে, এই চড়াইটির মাথায় পৌঁছিবার পর চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া পথের শ্রান্তি যেন এক নিমেষে বিদূরিত হইয়া গেল। বামে ঢেউখেলানো সুনীল পাহাড়শ্রেণি নীল আকাশের গায় হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। শিখরদেশ হইতে শিবজটানিঃসৃত জাহ্নবীধারার মতো কত রজতশুভ্র জলধারা গিরিপাদমূলে গড়াইয়া পড়িয়া উপলখণ্ডসমূহের বাধা অতিক্রম করিয়া সগর্জনে বহিয়া যাইতেছে। দক্ষিণ দিকে দূরে বহুনিম্নে শ্রীহট্ট জেলার সুবিস্তীর্ণ সমতলভূমি দিগন্তে গিয়া মিশিয়াছে।

চড়াইটি পার হইয়াই আমরা যে-গ্রামে পৌঁছিলাম সেইটির নাম মাউ-স্মু। মাউ-স্মুতে দেখিলাম, এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরে খাসিয়াদের তির-খেলা শুরু হইয়াছে। এক-এক জন করিয়া একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে তির ছুঁড়িতেছে, খেলোয়াড়দের মধ্যে কেহ লক্ষ্যভেদ করিবামাত্র সমবেত দর্শকমণ্ডলী উচ্চকণ্ঠে হর্ষধ্বনি করিতেছে। শুনিতে পাইলাম, ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের দুইটি দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলিতেছে।

তিরখেলা খাসিয়াদের সর্বপ্রধান জাতীয় ক্রীড়া। ক্রীড়াশেষে বিজয়ী দল নৃত্য এবং ঘন ঘন আনন্দধ্বনি করিতে করিতে ঘরে ফিরিয়া যায়, তখন যুবতি রমণীরা সমবেত হইয়া তাহাদের চিত্তরঞ্জনের জন্য সাধ্যমত প্রয়াস পায় এবং একান্ত আগ্রহসহকারে আদ্যোপ্রান্ত প্রতিযোগিতার বিবরণ শ্রবণ করে।

মাউ-স্মু হইতে সবুজ ঘাসে ঢাকা পাহাড়ের উপর দিয়া সমান রাস্তা আরম্ভ হইল। প্রায় মাইল-দেড়েক চলিবার পর চেরাপুঞ্জিতে পৌঁছিয়া আমরা খাসিয়া পাহাড়ে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক, আচার্য শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্তী মহাশয়ের শৈলনিবাস নামক ভবনে আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। পরদিন বেলা প্রায় পাঁচটার সময় মোটরে শিলং পৌঁছিলাম।

শিলং-এ পৌঁছিয়া খবর পাইলাম যে, দিন-কয়েকের মধ্যেই 'স্মিট' নামক স্থানে 'নংক্রেমের পূজা' এবং খাসিয়া মেয়েদের নাচ হইবে। নির্দিষ্ট দিনে ভোরবেলা হইতেই দলে দলে খাসিয়া, নেপালি, বাঙালি প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় নরনারী পূজা ও নাচ দেখিবার জন্য শিলং হইতে রওনা হইল। আমিও পণ্ডিত লক্ষ্মীনারায়ণজি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হিন্দু

অনাথ আশ্রমের এক পণ্ডিতজির সঙ্গে স্মিটে পৌছিয়া সিম পুরোহিত্রীর* বাটির সম্মুখস্থিত বেড়া-ঘেরা এক প্রশস্ত প্রাঙ্গণের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলাম। সেখানে প্রকাণ্ড জনতা। প্রাঙ্গণের একদিকে পুরুষ এবং অন্যদিকে স্ত্রীলোকেরা বসিয়াছে। মাঝখানে প্রায় পঞ্চাশটি যুবতি নৃত্য করিবার জন্য সার বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সেখানে বাস্তবিকই যেন সৌন্দর্যের হাট খুলিয়া গিয়াছে। মেয়েরা প্রায় সকলেই বেশ সুন্দরী, তাহাদের পরণে দামি সিল্কের শাড়ি, গায়ে রঙিন জ্যাকেট, গলায় সোনা এবং প্রবালে তৈরি কণ্ঠহার, কানে সোনার মাকড়ি, হাতে রূপার চুড়ি, বক্ষে সোনা অথবা রূপার দীর্ঘ চেন বিলম্বিত, সকলেরই মাথায় একই ধরনের সোনা অথবা রূপার মুকুট এবং এক এক গাছি দীর্ঘ বেণী প্রত্যেকেরই পৃষ্ঠে দোলায়িত। আপাদমস্তক তাহাদের বস্ত্রালংকারে ভূষিত। বাহু দুটি তাদের দুই পার্শ্বে ঝুলানো। দৃষ্টি মাটিতে নিবন্ধ।

একটু পরে খুব আস্তে আস্তে পা টিপিয়া তাহারা অগ্রসর হইতে লাগিল। ইহারই নাম নাকি 'কা সাড কন্থেই' বা মেয়েদের নৃত্য। রাজ-পরিবারের কয়েকটি মেয়েও এই নৃত্যে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মাথার উপর ছাতা ধরিয়া কয়েক জন লোক সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল। অদূরস্থিত এক উঁচু মঞ্চের উপর হইতে সানাই, ঢাক, করতাল ইত্যাদি বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ কানে ভাসিয়া আসিতেছিল। এক সময় একটি স্ত্রীলোক আসিয়া মেয়েদের বেশভূষার একটু পারিপাট্য-সাধন করিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে আসিল বীরবেশে সজ্জিত আট-দশ জন খাসিয়া, মাথায় তাহাদের গেরুয়া রঙের পাগড়ির উপর সাদা এবং কালো রঙের মুরগির পালকের তৈরি মুকুট, গায়ে জরির কাজ করা রঙিন জামা, পরণে রঙিন বস্ত্র। পিঠে, অস্ত্র ও পাখির পালকে পূর্ণ তূণ। পায়ে এক-এক জোড়া প্রকাণ্ড বুট জুতা। সকলকারই এক হাতে চামর ও অন্য হাতে তলোয়ার। বীরবেশধারীরা প্রথমে কিছুক্ষণ চামর দোলাইয়া বীরত্বব্যঞ্জক অঙ্গভঙ্গিসহকারে নৃত্য করিতে করিতে প্রাঙ্গণের চারিদিক ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, অবশেষে দুই-দুই জন করিয়া অসি-যুদ্ধের অভিনয়পূর্বক অঙ্গন প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল।

ঘণ্টা-তিনেক আমরা নৃত্যাদি দেখিয়া কাটাইলাম। প্রথমে মন্দ লাগে নাই, কিন্তু অবশেষে বিরক্তি ধরিয়া গেল, কেন-না, নৃত্য, বাদ্য এবং যুদ্ধাভিনয়, সমস্তই একঘেয়ে, মেয়েদের ধৈর্য্যের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। রৌদ্রের তাপে সুন্দরীদের সুগৌর মুখগুলি রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, কপালে মুক্তাসদৃশ বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়াছে। কিন্তু তাহাতে তাহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই। সেই যে ঘণ্টা-তিনেক আগে কনে-বউদের মত পা টিপিয়া টিপিয়া তাহারা নৃত্য (?) শুরু করিয়াছে, থামিবার তো কোনো লক্ষণই দেখিতেছি না, আমরা কিন্তু সেখানে আর দেরি না করিয়া শিলঙের পথ ধরিলাম।

প্রতি বৎসর মে মাসে 'স্মিটে' খাসিয়াদের 'পম-ব্লাং' উৎসব এবং তদুপলক্ষে খাসিয়া কুমারীদের নৃত্য হয়। নংক্রেমের 'সিম' এই উৎসবের প্রধান উদ্যোক্তা বলিয়া ইহা 'নংক্রেমের পূজা' নামে পরিচিত। শস্যাদির উন্নতি এবং রাজ্যে শ্রীবৃদ্ধির জন্য 'কা-ব্লেই-

* খাসিয়া রাজাকে 'সিম' বলা হয়।

সংসার' অর্থাৎ জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নিকট ছাগবলি দেওয়া হয়, সময়মত পৌঁছিতে না পারায় আমরা 'পম-ব্লাং' উৎসব দেখিতে পারি নাই।

জোয়াই শিলং হইতে তেত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত। পায়ে হাঁটিয়া যাওয়া ছাড়া সেখানে পৌঁছিবার আর অন্য উপায় নাই। আমি এক দিন সকালবেলা, স্বামিজির ব্যবস্থামত দুই জন ডাকওয়ালার সঙ্গে জোয়াই রওনা হইলাম। প্রায় সতেরো মাইল রাস্তা অতিক্রম করিয়া আমরা 'মউ রং-খেনং'-এর ডাকবাংলাতে আসিয়া পৌঁছিলাম। এখানে শিলঙের ডাকওয়ালার বিদায় হইল, আমি দুইজন সিন্টেং ডাকওয়ালার সঙ্গে চলিলাম। ডাক ঘাড়ে করিয়াই ইহারা প্রাণপণে ছুটিতে আরম্ভ করিল। পাছে জঙ্গলের মধ্যে পথ হারাইয়া ফেলি তাই তাহাদের পিছনে পিছনে ছুটিতে লাগিলাম। পথের দৃশ্য বিচিত্র, কোথাও বা দীর্ঘপত্রসমন্বিত পাইন-শ্রেণি, কোথাও বা দিগন্তবিসর্পী বন্ধুর পার্বত্য প্রান্তর, কোথাও বা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ওক গাছ অন্যান্য বিরাট বনস্পতিসমূহে পরিপূর্ণ সুদূর-প্রসারিত নিবিড় অরণ্যানী। এই আরণ্য শোভা উপভোগ করিবার মতো অবস্থা কিন্তু তখন আমার নয়। প্রকাণ্ড এক বোঁচকা ঘাড়ে করিয়া এক রকম মরিয়া হইয়াই ছুটিতেছি। মনে হইতেছে, যেন আমাদের তিন জনের মধ্যে দৌড়ের প্রতিযোগিতা শুরু হইয়াছে। কিছুক্ষণ পরে কালো পোশাক-পরা এক দল সিন্টেং রমণীর একেবারে সামনা-সামনি আসিয়া পড়িলাম। অমনি একসঙ্গে প্রায় দশ জোড়া (কালো নয়) কটা চোখের কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি আমার উপরে নিক্ষিপ্ত হইল এবং পরক্ষণেই সম্মিলিত নারীকণ্ঠের অট্টহাস্যে নিস্তব্ধ বনভূমি মুখরিত হইয়া উঠিল। আমার ধারণা ছিল যে, আমার তৎকালীন অবস্থাটা স্নেহ সুকোমল নারীহৃদয়ের যদি কোনো রসের উদ্রেক করিতে পারে তো তাহা করুণ রস। কিন্তু সিন্টেঙ্গিনীরা আমার সে-ধারণা বদলাইয়া দিল। যাই হোক পুরুষ-বাচ্চার ইহাতে ঘাবডাইলে চলে না। আমিও বিড়ালাক্ষীদের বিদ্রূপ-হাস্যে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া মরি বাঁচি করিয়া দৌড়াইতে লাগিলাম এবং সন্ধ্যার একটু পরে আধমরা অবস্থায় সিন্টেংদের দেশ জোয়াইয়ে আসিয়া পৌঁছিলাম।

পরদিন বিকালে শহরে বেড়াইতে বাহির হইলাম। দৃশ্য-সৌন্দর্যে জোয়াই অতুলনীয়। এখানকার মতো অমন সুন্দর পাইন-কুঞ্জ খাসিয়া পাড়াড়ের কোথাও নাই। শিলঙের চেয়ে এ-জায়গা ঢের নির্জন ও নিরালা। যাঁহারা শিলঙে বেড়াইতে যান, তাঁহারা একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া (অবশ্য সিন্টেং ডাকওয়ালার সঙ্গে নয়) জোয়াইয়ে গেলে প্রচুর আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবেন।

শহরের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিয়া বাজারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বেশিরভাগ স্ত্রীলোকেরাই জিনিসপত্র বিকিকিনি করিতেছে, চায়ের দোকান অনেকগুলি। সিন্টেং-দ্রৌপদীরা বাজারেই রন্ধন করিয়া উৎকট দুর্গন্ধযুক্ত এক প্রকার ব্যঞ্জন বিক্রি করিতেছে। বাজারে শুকনো মাছ, কুক্কুট, শূকর-মাংস ইত্যাদির আমদানিই বেশি। ব্যাঙের ছাতা, বোলতার চাক ইত্যাদিও দেখিলাম। ওগুলা নাকি সিন্টেংদের প্রিয় খাদ্য।

আমি জোয়াইয়ে আসিবার কিছুদিন পরেই সেখানে বে-ডিং-খ্লাম উৎসব পড়িয়া গেল, ইহা সিন্টেংদের সর্বপ্রধান উৎসব। প্রতি বৎসর জুন মাসে জোয়াইয়ে এবং জৈন্তা পাহাড়ের

আরও নানা স্থানে উক্ত উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 'বে-ডিং-খ্লাম' কথাটার মানে লাঠিদ্বারা মহামারি তাড়ানো।

জোয়াই শহরের প্রত্যেক পল্লিতে এক একটি কা-ইং-পূজা অর্থাৎ পূজাঘর আছে। জুন মাসের ষোলো-সতেরো তারিখ হইতে শহর এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের ছেলেবুড়ো সকলে ভিন্ন ভিন্ন 'কা-ইং-পূজা'তে সমবেত হইয়া আমোদ-উৎসবে মত্ত হইল। প্রথম কয়দিন তাদের কাজ রংবেরঙের কাগজ দিয়া রথ তৈরি করা। তারপর একদিন সকালে সকলে প্রচুর পরিমাণে মদ্য পান করিয়া 'হয়' 'হয়' শব্দ উচ্চারণপূর্বক হাততালি দিয়া বিবিধ অঙ্গাভঙ্গিসহকারে উদ্দাম নৃত্য করিতে করিতে গোটা শহরখানা প্রদক্ষিণ করিল। সেদিন জঙ্গালের ভিতর হইতে কতকগুলি গাছ কাটিয়া আনা হইল এবং লোকেরা নিজেদের বাড়ির উঠানের মধ্যে এক একটি গাছ পুঁতিয়া রাখিল। সিন্টেংদের বাড়িতে গিয়া দেখিতে পাইলাম যে, পুরুষেরা এক একটি লাঠিদ্বারা ঘরে চালে আঘাত করিতেছে এবং মহামারির ভূতকে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার জন্য অনুনয়-বিনয় করিতেছে।

বিকালবেলা সকলে কাগজের তৈরি সং, বেলুন ইত্যাদি সহ এক খোলা ময়দানে জমায়েত হইয়া আবার নৃত্য আরম্ভ করিল। মেয়েরা উত্তম বস্ত্রালংকারে সজ্জিত হইয়া নাচ দেখিবার জন্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। নৃত্য শেষ হইলে কাগজের তৈরি রথগুলাকে 'কা-ইং-পূজা'সমূহ হইতে বাহির করিয়া আনিয়া শহর হইতে কিছু দূরে একটি জলার নিকটে লইয়া যাওয়া হইল, সেখানে একহাঁটু জলের মধ্যে সকলে আবার নৃত্য শুরু করিল। জলের কাছে স্ত্রীপুরুষের যেন মেলা জমিয়া গেল। জননীরা দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগকে কাপড় দিয়া পিঠে বাঁধিয়া সেখানে হাজির হইল।

জলমধ্যে কিছুক্ষণ নৃত্য হইবার পর একদল লোক সদ্যকর্তিত একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষকে বহন করিয়া লইয়া আসিল। ওই বৃক্ষটি উ-ব্লেই অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার প্রতীক। বৃক্ষটিকে জলে স্থাপিত করিবার পর দলে দলে লোকেরা তাহাতে চড়িয়া বসিল, তারপর এই গাছটি দখল করিবার জন্য বিভিন্ন দলের মধ্যে লড়াই আরম্ভ হইল। সিন্টেংদের বিশ্বাস, যে-দল গাছটি দখল করিতে পারিবে, সেই দলের লোকেরা আগামী বৎসর স্বাস্থ্য এবং সমৃদ্ধিলাভ করিবে।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে তৈরি রথসমূহ এবং বৃক্ষটিকে জলাভূমিতে বিসর্জন দিয়া যে-যার ঘরে ফিরিয়া আসিল।

'বে-ডিং-খ্লাম' উৎসবের দিন-কতক পরে একদিন বিকালে রাস্তায় বেড়াইতে বাহির হইয়া দেখি, বাঁশের চাটাই দিয়া ঢাকা একটি শবদেহকে বহু সিন্টেং স্ত্রীপুরুষ দাহ করিবার নিমিত্ত লইয়া চলিয়াছে। কেহ কেহ পানসুপারি, অন্নব্যঞ্জন ইত্যাদি সহ শবের অনুগমন করিতেছে। আমি তাহাদের পিছনে পিছনে সৎকার-ভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ছোটো একটি টিলার উপর চিতা রচনা করা হইল। স্ত্রীপুরুষ সকলে চিতার উপর পান-সুপারি সিকি-দুয়ানি ইত্যাদি রাখিল। চিতায় আগুন দিবামাত্র মৃতব্যক্তির মাতুল একটি কুক্কুটের গলা কাটিয়া অগ্নিতে কিছু রক্ত নিক্ষেপ করিল। তারপর, কুক্কুটটিকে আগুনে

সেঁকিয়া টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া একটা বংশখণ্ডে গাঁথিয়া রাখা হইল। মৃতদেহ ভস্মীভূত হইবার পর আগুন নিবাইয়া অস্থিগুলি এবং সিকি-দুয়ানি ইত্যাদি কুড়াইয়া লওয়া হইল।

এক বৃদ্ধা অস্থিগুলি হাতে লইয়া বিড়বিড় করিয়া মন্ত্র আওড়াইলে সকলে আবার ও-গুলার উপরে পানসুপারি রাখিল। অতঃপর সকলে একটি প্রস্তরস্তম্ভের নিকটে গমন করিল। একটি গাছের পাতা মাটিতে বিছাইয়া তাহাতে কদলী, আম্র, পিষ্টক ইত্যাদি রাখা হইল এবং পূর্বোক্ত বৃদ্ধাটি মন্ত্র আওড়াইয়া মাটিতে কিয়ৎ-পরিমাণ মদ ঢালিয়া দিল। সৎকার-সংক্রান্ত এই সমস্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইলে পর, মৃতের মাতুল অস্থিগুলি ভূমিতে পতিত একখানা সমতল শিলাখণ্ডের নীচে রাখিল। দিনকতক পরে উক্ত প্রস্তরখণ্ডের নীচে হইতে মৃতের অস্থি স্থানান্তরিত করিয়া তদুপরি একটি খাড়া প্রস্তরস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করা হইল। এগুলিকে বলে 'কা-জিং-কন-মাউ'। জোয়াই শহরে রাস্তার ধারে এখানে-সেখানে বহু 'কা-জিং-কন-মাউ' দেখিতে পাওয়া যায়।

জোয়াই শহরস্থ সিন্টেংদের বাড়িগুলা বিলাতি ফ্যাশনের তৈরি। প্রত্যেক বাড়িতেই ছাদের উপর একটি করিয়া চিমনি আছে। সিন্টেংদের মধ্যে অনেক ওস্তাদ মিস্ত্রি আছে। তাহারাই এ সমস্ত বাড়ি তৈয়ার করিয়া থাকে। গ্রামবাসীদের বাড়িগুলি কিন্তু আলাদা ধরনের, সেগুলির ছাদ ডিম্বাকৃতি। ঘরে জানালা থাকে না। সিন্টেংরা তাহাদের ঘরের সামনের খানিকটা জায়গা লাল মাটি কিংবা গোবর দিয়া লেপিয়া রাখে। এই প্রথা আসামের আর কোনো পার্বত্য জাতির মধ্যে প্রচলিত নাই।

খ্রিস্টান সিন্টেংরা কোট-প্যান্ট, ওয়েস্টকোট ইত্যাদি পরিধান করে। শ্রীহট্ট জেলার অধিবাসীদের সঙ্গে যাহারা কাজকারবার করে তাহারা ধুতি ও জামা পরে। পাগড়ি প্রায় সকলেই মাথায় বাঁধিয়া থাকে। কাহারও কাহারও মাথায় কালো রঙের কাপড়ে তৈরি একরকম টুপি দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রাম্য সিন্টেংরা একরকম হাতা ছাড়া কোর্তা ব্যবহার করে। স্ত্রীলোকেরা আপাদলম্বিত সেমিজের উপর ছোটো একটি জামা গায়ে দেয় এবং একটি চার-পাঁচ হাত লম্বা কাপড় কোমরে গেরো দিয়া পরে ও একটি চাদর দিয়া সমস্ত শরীর ঢাকিয়া রাখে। মস্তকে আলাদা একটি বস্ত্রখণ্ড অবগুণ্ঠনরূপে ব্যবহার করে। এরূপভাবে সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া পরিচ্ছদ পরিধান করিতে আসামের অন্যান্য পাহাড়ি রমণীদের দেখি নাই। মস্তক এবং বক্ষদেশের উপরিভাগ অনাবৃত রাখাই অন্যান্য পার্বত্য স্ত্রীলোকদের রেওয়াজ। কেবলমাত্র লুসাই নারীরা সেমিজ গায়ে দেয়। সিন্টেং রমণীদের পোশাক সাধারণত কালো রঙের, তাহাদের বস্ত্রাভ্যন্তরে সকল সময়েই পান-সুপারিতে ভরা ছোটো একটি কাপড়ের থলি থাকে।

প্রবাল এবং সোনার তৈরি ফাঁপা কণ্ঠহার সিন্টেং নারীদের প্রিয় অলংকার। ইহারা কানে মাকড়ি, হাতে চুড়ি, গলায় রূপার চেন পরে, চেনগুলি গলা হইতে কোমর পর্যন্ত ঝুলিয়া পড়ে।

ভাত, শুকনো মাছ এবং শূকর ও কুক্কুট-মাংস সিন্টেংদের প্রধান খাদ্য। একমাত্র গোমাংস ছাড়া আর সকল প্রকার মাংসেই ইহাদের অত্যন্ত আসক্তি আছে। ইহারা অতি

প্রত্যুষে এবং বিকালে—দিবসের মধ্যে দুইবার খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকে। প্রত্যুষে জোয়াইয়ের রাস্তায় বেড়াইতে বাহির হইলে দগ্ধ শূকরের দুর্গন্ধে নাড়িভুঁড়ি উলটিয়া আসিতে চায়। ইঁদুর ব্যাঙাচি প্রভৃতিও ইহাদের বিশেষ প্রিয় খাদ্য। ইহারা পচা ভাত হইতে প্রস্তুত মদ্য পান করে। সিন্টেংদের প্রধান প্রধান পূজা এবং উৎসবাদিতে মদ্য একটি অত্যাবশ্যক জিনিস।

ইহাদের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা ঢের বেশি। সেজন্য পাত্র জুটাইতে মেয়ের বাপকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়। তাই অধিক বয়সে মেয়েদের বিবাহ হয়। আমি নিমন্ত্রিত হইয়া সিন্টেংদের একটি বিবাহ-উৎসবে যোগদান করিয়াছিলাম। পাত্রীটির বয়স ছিল কম পক্ষে ছাব্বিশের কাছাকাছি। বিবাহ কনের বাপের বাড়িতেই হয়। বিবাহের পর কনে স্বামীর ঘরে যায় না, বাপের বাড়িতেই থাকে। দিবাভাগে স্বামী-স্ত্রীর দেখা হওয়া নিষিদ্ধ। সন্ধ্যার পর স্বামী মহাশয়েরা শ্বশুর-বাড়িতে গিয়া নিজ নিজ পত্নীর সহিত রাত্রিযাপন করেন এবং রাত্রি প্রভাত হইবার আগেই নিজেদের বাটিতে ফিরিয়া আসেন। শ্বশুরালয়ের খাদ্যপানীয় গ্রহণ করিবার অধিকার তাহাদের নাই। আজকাল খ্রিস্টান সিন্টেংরা অনেকেই কিন্তু এই প্রথা মানিয়া চলে না। ইহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে। কিন্তু কোনো নারী স্বামীর মৃত্যুর পর যদি আর বিবাহ করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় তাহা হইলে সে মৃত স্বামীর অস্থি নিজের কাছে রাখিতে পারে।

ইহারা আবালবৃদ্ধবনিতা খুব বেশি পান খায়। কেহ বাড়িতে বেড়াইতে আসিলে সিন্টেং-গৃহিণী প্রথমেই পানসুপারি দিয়া অভ্যর্থনা করে। ইহারা ঘরে-বাহিরে যেখানেই থাকুক না কেন, পানসুপারি সঙ্গে থাকিবেই। ইহাদের বিশ্বাস, মৃত্যুর পর মানুষ সুপারি গাছে পরিপূর্ণ স্বর্গোদ্যানে বাস করিয়া অবাধে পানসুপারি খাইতে থাকে। মৃত ব্যক্তির সম্বন্ধে তাহারা সময় সময় নিম্নলিখিত কথাগুলি বলিয়া থাকে—উবা বাম কোয়াই হা ইং উ-ব্লেই।*

ইহারা অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন, নোংরা। সপ্তাহে একদিনও স্নান করে কিনা সন্দেহ। কাছে আসিলে গায়ের দুর্গন্ধে তিষ্ঠানো দায় হইয়া উঠে। ইহারা মলত্যাগ করিয়া জলশৌচ করে না।

সিন্টেংদের প্রধানকে বলে দলৈ। জনসাধারণ দলৈ নির্বাচিত করে। ছোটোখাটো কতকগুলি সামাজিক অপরাধের বিচারের ভার দলৈয়ের হাতে ন্যস্ত আছে। তাহার সহকারীগণ পাত্র, বাসন, সাঙ্গাত প্রভৃতি নামে পরিচিত।

স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয়, পিতামাতার সর্বকনিষ্ঠা কন্যা। অন্য মেয়েরাও কিছু কিছু অংশ পাইয়া থাকে। কিন্তু ছেলেদের ভাগ্যে কানা কড়িটিও জোটে না, ইহাদের অভাববোধ তেমন প্রবল নহে। জীবিকার জন্য দরিদ্রতম সিন্টেং-ও ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে না। এই পার্বত্য জাতির নিকট আমাদের যতগুলি শিক্ষণীয় বিষয় আছে, তন্মধ্যে ইহা একটি।

সেই ব্যক্তি যিনি ভগবানের গৃহে পান-সুপারি খাইতেছেন।

সিন্টেং রমণীদের দেখিলে বাস্তবিকই চিত্ত প্রসন্ন হয়। ইহারা সদা প্রফুল্লচিত্ত, হাসিখুশি ছাড়া এক মুহূর্তও থাকিতে পারে না। প্রায় সকলেরই গায়ের রং খুব ফরসা, দেহের গড়ন নিটোল এবং সুডৌল, কেহ কেহ অনবদ্য রূপলাবণ্যসম্পন্না। ইহারা কঠোর পরিশ্রম করিতে পারে। একমণ-দেড়মণ বোঝা পিঠে করিয়া এক দিনে তেত্রিশ-চৌত্রিশ মাইল রাস্তা অতিক্রম করা ইহাদের পক্ষে মোটেই কষ্টসাধ্য কাজ নহে। ভাত রাঁধা, কাপড়কাচা, জঙ্গল হইতে কাঠ কুড়াইয়া আনা, বাজারে জিনিসপত্র সওদা করা, দোকান-পাট চালানো ইত্যাদি যাবতীয় কাজ স্ত্রীলোকেরাই করিয়া থাকে।

সিন্টেংরা অত্যন্ত সরল ও বিশ্বাসী। ইহারা প্রকৃতির সন্তান। সারাদিন পাহাড়-জঙ্গলের ভিতরে প্রকৃতির স্নেহক্রোড়ে থাকিতেই ভালবাসে। প্রাচীনকালে ইহারা শ্রীহট্টের স্বাধীন হিন্দু রাজাদের অধীনে ছিল। শ্রীহট্টের অন্তর্গত জৈন্তার রাজারাই সিন্টেংদের অধ্যুষিত পাহাড়টিকে জৈন্তা পাহাড় নামে আখ্যায়িত করেন। তখনকার দিনে ইহারা হিন্দুধর্মের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকিতে পারে নাই। গেট সাহেব তাঁহার আসামের ইতিহাসে সিন্টেং-রাজাদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—'রাজ-পরিবার ও বিশিষ্ট অভিজাত বংশীয়েরাই অংশত হিন্দু ধর্মের আশ্রয়ে আসেন। রাজারা শাক্ত ছিলেন।*

এই সমস্ত রাজারা এবং তাঁহাদের অমাত্যবর্গ বহু হিন্দু আচার-পদ্ধতি সিন্টেংদের মধ্যে প্রবর্তন করিয়াছিলেন। আজও পর্যন্ত সিন্টেংদের আচার-ব্যবহার এবং রীতি-নীতিতে হিন্দু প্রভাবের বহু ছাপ রহিয়া গিয়াছে ; যেমন গোবর দিয়া গৃহপ্রাঙ্গণ লেপিয়া রাখা, গোমাংস ভক্ষণে বিরতি, নরটিয়াঙের সিন্টেংগণ কর্তৃক বিশ্বকর্মার পূজানুষ্ঠান প্রভৃতি। কিন্তু এক দিন যাহারা আংশিকভাবে আমাদের বৃহত্তর হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, খ্রিস্টান মিশনারিদের দীর্ঘকালব্যাপী প্রচেষ্টার ফলে আজ তাহারা আমাদের নিকট হইতে একেবারেই বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, আমাদের পরস্পরের ভিতরকার যোগসূত্র আজ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

জোয়াই, জৈন্তা পাহাড়ে মিশনারিদের সর্বপ্রধান কেন্দ্র। ওয়েল্‌শ মিশন, চার্চ অব ইংল্যান্ড, রোমান ক্যাথলিক চার্চ, ইউনিটেরিয়ান চার্চ, ইত্যাদি সব কয়টাই এখানে আড্ডা গাড়িয়াছে। প্রত্যেক রবিবারে গির্জাগুলি সমবেত সিন্টেং নরনারীর কণ্ঠনিঃসৃত খ্রিস্টবন্দনা গানে মুখরিত হইয়া উঠে। আর শুধু জোয়াই কেন, জৈন্তা পাহাড়ের সর্বত্রই দেখিয়াছি, অপ্রতিহত প্রভাবে আধিপত্য করিতেছে খ্রিস্টান মিশনারিরা। বলিতে গেলে গোটা সিন্টেং জাতিটাই স্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া পরধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। স্বীকার করি, মিশনারিরা কিয়ৎপরিমাণে ইহাদের কল্যাণসাধন করিয়াছে। কিন্তু আজ যে ইহারা পরানুকরণকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া বরণ করিয়া লইয়া বিলাসিতা এবং দুর্নীতির স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছে, মেয়েদের মধ্যে সতীত্বের আদর্শটা পর্যন্ত যে লোপ পাইয়াছে, জিজ্ঞাসা করি, সেজন্য দায়ী কে?

জোয়াই হইতে প্রকাশিত *Woh* নামক খাসিয়া সংবাদপত্রের সিন্টেং সম্পাদক Mr. B.

* *History of Assam* by E. A. Gait, p. 262.

T. Pugh তাঁর পত্রিকার কোনো এক সংখ্যায় তাঁর স্বজাতির নৈতিক অবনতির মূল কারণ যে মিশনারিরাই সে-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। বিজাতীয় আদর্শের অনুসরণকারী কুকিজাতির শোচনীয় দুরবস্থার মর্মন্তুদ কাহিনী কুকি-সমাজের শিরোমণি শ্রদ্ধেয় লালতুদাই রায় মহাশয় ইতিপূর্বে 'প্রবাসী'তে বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু শুধু সিন্টেং বা কুকি জাতিরই তো এ অবস্থা নয়। খাসিয়া, লুসাই, নাগা, গারো ইত্যাদি আসামের সমস্ত পার্বত্য জাতির ভিতরকার খবর যিনি রাখেন, তিনিই জানেন সকলকার একই দশা।

এই সমস্ত পার্বত্য জাতিকে হিন্দু সমাজের অঙ্গীভূত করিবার জন্য এখনও কি আমরা উদ্যোগী হইব না? সিন্টেংদের সহিত প্রায় ছয়টি মাস ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করিয়া ইহা বিশেষরূপেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি যে, সম্প্রতি প্রতিক্রিয়া শুরু হইয়াছে। জাতির দুর্গতিমোচন করিতে হইলে যে, সর্বাগ্রে দেশবাসীকে খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রভাব হইতে মুক্ত করিতে হইবে, জোয়াইদের দলৈ প্রভৃতি জনকতক শিক্ষিত সিন্টেং আজ তাহা মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছেন। তাঁহাদের হৃদয়ে একটা তীব্র অসন্তোষ আজ প্রধূমিত হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং এই পার্বত্য জাতিটার মধ্যে প্রচারকার্য করিবার অনুকূল অবস্থা এখন সৃষ্টি হইয়াছে। কেন-না, প্রচারকগণ জাতির সত্যকারের কল্যাণকামী এই সমস্ত সিন্টেং-এর উৎসাহ সহানুভূতি এবং সাহায্য লাভ করিতে সক্ষম হইবেন। সিন্টেংদের চিত্ত জয় করিবার দুইটি উপায় আছে। প্রথমত, তাহাদিগকে বাংলা ভাষা শিক্ষা দেওয়া, দ্বিতীয়ত, তাহাদের মধ্যে বাংলা সংগীত প্রচার করা, কেন-না, জীবিকার জন্য শ্রীহট্টের বাঙালিদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য না করিয়া ইহাদের গত্যন্তর নাই। ইহাদের নিজেদের মাতৃভাষাতেই প্রায় ছয় সাত শত বাংলা শব্দ ঢুকিয়াছে, যথা সংসার, পূজা, খবর, মহাজন, হুকুম ইত্যাদি। বাংলা সংগীতও ইহারা অত্যন্ত ভালবাসে। বাংলা গান শুনিয়া সিন্টেংরা নৃত্য করিতে আরম্ভ করে, ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। সুতরাং বাংলা ভাষা ও সংগীত প্রচার দ্বারা কাজের সূচনা করিলে ভবিষ্যতে অন্যান্য কাজ সহজ ও সুসাধ্য হইয়া উঠিবে। মিশনারিরা বিরোধিতা করিয়া, আমাদের কাজ পণ্ড করিয়া দিতে চাহিলেও, সফলকাম হইবে না।*

—

* এই প্রবন্ধ-রচনায় Major Gurdon-এর *The Khassis* নামক পুস্তক হইতে কিছু সাহায্য পাইয়াছি।

প্রবাসী ● জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০ (১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ)



হাজং জাতির বিবরণ

শ্রীদ্বিজেন্দ্রচন্দ্র সিংহ শৰ্ম্মণঃ

সুসঙ্গ পরগনা ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত ; ইহা ময়মনসিংহের উত্তর-পূর্বাংশে বঙ্গদেশের শেষ সীমায় অবস্থিত। গারো পাহাড় পূর্বে সুসঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল ; পরে ভারত গভর্নমেন্টের ১৮৬৯ খ্রিঃ অব্দের ২২ আইনানুসারে ইহা আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বর্তমান সময় গারো পাহাড়ই সুসঙ্গের উত্তর সীমারূপে পরিণত হইয়াছে। এই গারো পাহাড়ের সানুদেশের সমসূত্রপাতে নিম্নভূমিতে একপ্রকার অর্ধসভ্য জাতির বাস আছে ; ইহারা হাজং নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই জাতি ময়মনসিংহ ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে নাই। ইতঃপূর্বে ইহাবা সেরপুরের অন্তর্গত করইবাড়ির অধিবাসী ছিল। হাজংদিগেব মধ্যে এরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, ইহাদেব আদিম বাসস্থান উত্তর-পশ্চিম প্রদেশান্তর্গত আজমগড় নামক স্থানে। পূর্বে ইহারা ক্ষত্রিয় ছিল। যখন পরশুরাম ক্ষত্রিয় লোপ সাধনে উদ্যত হন, তখন ইহারা প্রাণ ভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন পূর্বক করইবাড়িতে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করে। এই প্রবাদ সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন বলিয়াই অনুমান হয়। সুসঙ্গ রাজ্য পূর্বে অধিকাংশ স্থলেই গভীর অরণ্যানী দ্বারা পরিবৃত ছিল ; নিশিযোগে পার্বত্য ভূমি হইতে নানাবিধ আরণ্য জন্তু আসিয়া ক্ষেত্রের শস্যাদির অপচয় করিত ও নানারূপ উপদ্রব করিত। গারো পর্বতের পাদদেশে লোকালয় স্থাপিত হইলে এই সমস্ত উপদ্রব নিবারণ হইবে. ইহা মনে করিয়া সুসঙ্গ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা পবিত্রাত্মা সোমেশ্বর ঠাকুর হইতে অধস্তন দ্বাদশ পুরুষীয় রাজা কিশোর সিংহ করইবাড়ি হইতে হাজংদিগকে আনাইয়া নিজরাজ্যে গারো পর্বতের পাদদেশের সমসূত্রপাতে উপনিবিষ্ট করান।

আকৃতি

হাজংদিগের নাসিকা চাপা, ক্ষুচ ক্ষুদ্র, হনুদেশ উচ্চ, শ্মশ্রু ও গুল্ফ বিরল ; ইহারা মধ্যাকৃতি। ইহাদের মধ্যে গৌরবর্ণ বিশিষ্ট লোকের

সংখ্যা অতি অল্প পরিমাণে আছে বটে কিন্তু গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের সংখ্যা অতি বিরল; স্থূলকথা ইহাদের আকৃতি অনেকটা অন্যান্য অনার্য জাতীয় মনুষ্যেরই ন্যায়।

হাজংদিগের পুরুষগণ সাধারণত হাঁটুর উপর পর্যন্ত বস্ত্র পরিধান করে; অধুনা ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ কিছু কিছু শিক্ষা লাভ করতঃ বাঙ্গালীর ন্যায় বস্ত্রাদি পরিধান করিতে এবং শার্ট, কোট ও নানা প্রকার বিলাস সামগ্রী ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহাদের

অলঙ্কার পরিচ্ছদ

স্ত্রীলোকগণ নিজেদের প্রস্তুত একপ্রকার বস্ত্র বক্ষদেশের উপরিভাগে স্তনমণ্ডলী পরিবেষ্টন করতঃ হাঁটুর নিম্নদেশ পর্যন্ত লম্বমানভাবে পরিধান করে। এই সমস্ত বস্ত্র প্রস্তুতের জন্য পূর্বে ইহারা নিজেরাই চরকা দ্বারা সুতা কাটিত; সম্প্রতি অনেকেই বিলাতি সুতা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। স্ত্রীলোকগণ অলংকারের মধ্যে সাধারণত শাঁখা ও পয়ালের মালা ব্যবহার করিয়া থাকে।

হাজংগণ মৃদুস্বভাব বিশিষ্ট ও ইহাদের কণ্ঠস্বর মিষ্ট। ইহাদের পুরুষদিগের অপেক্ষা স্ত্রীলোকগণ সাধারণত অধিক পরিশ্রমশালিনী। ধান্য রোপণ ও ছেদন, মৎস্য ধৃত করা, বস্ত্র

প্রকৃতি

বয়ন ও অন্যান্য গৃহ কর্মাদি স্ত্রীলোকগণই করিয়া থাকে। পুরুষগণ হলচালনা, গো-চারণ, হাটবাজার করা প্রভৃতি কার্য করিয়া থাকে। ইহারা অতিশয় অতিথি-সেবাপরায়ণ। বাড়ি ঘর ইহারা সর্বদাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে। ইহারা সাধারণত শান্তিপ্রিয়; ইহাদের মধ্যে একতার ভাব প্রবল ও কলহ বিবাদ অত্যন্ত কম। কেহ কেহ তির-ধনুক ও বন্দুক চালনায় অতিশয় নিপুণ।

ভাষা

ইহাদের ভাষা বাঙ্গালারই অপভ্রংশ। নিম্নে ইহাদের ব্যবহৃত ভাষার ২/৪টি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

বাঙ্গালা ভাষা	*হাজংদিগের ব্যবহৃত ভাষা*
আমি যাইব না	ময় না যাং অথবা ময় না যাব
ছেলেপেলে	হাপাল
হাঁস	অহিংস
তোমার	তলাক
আমার	মলাক
এই দিকে	ইংকে
কোন্ দিকে	কোন্ দিকে
কে গিয়াছে	কাই গেছে
এখনই	এলাই
মা	মাও
মা দিয়াছে	মাওরা দেছে
বাবা দিয়াছে	বাবারা দেছে
আসিতেছি	যায় যায় ইত্যাদি

ইহাদের আচার-ব্যবহার অনেকাংশে হিন্দুদিগের ন্যায়। ইহারা হিন্দুধর্মাবলম্বী বলিয়া

পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে শাক্ত বৈষ্ণব উভয়ই বিদ্যমান আছে। ইহারা অধিকারী, বৈরাগী ও হাজং এই তিন ভাগে বিভক্ত। খড়দহ ও কালীগঞ্জ নামক স্থানের গোস্বামীগণ ইহাদের মধ্যে কাহাকে কাহাকে বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া শিষ্য করেন; এই শিষ্যগণই অধিকারী বলিয়া কথিত হয়। অধিকারীগণ হাজংদিগের পৌরোহিত্যের কার্য করিয়া থাকে। অধিকারীগণ হলচালনা করে না, কোনো প্রকার মাংস ভক্ষণ বা মদ্যপান করে না; ভেক ধারণ করে। অধিকারীগণ খড়দহের গোঁসাইগণের নিকট হইতে মন্ত্রগ্রহণ পূর্বক অন্যান্যকেও মন্ত্র প্রদান করে। অধিকারীর বংশধরগণ বৈরাগী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বৈরাগীগণও হলচালনা করে না; হরিণ কচ্ছপ প্রভৃতির মাংস ভক্ষণ করে কিন্তু হংস, কপোত ও ছাগ মাংস ভক্ষণ করে না; তুলসীর মালা ধারণ করে। অধিকারী ও বৈরাগী ব্যতীত অন্যান্য সকলে হাজং নামে অভিহিত হয়। ইহারা হলচালনা করে, মাংস খায়। কুক্কুট মাংস ভক্ষণ করে না। কিন্তু বন্য বরাহের (গৃহপালিত বরাহের নয়) মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। হিন্দু বলিয়া পরিচিত হওয়ায় গোমাংস যে ইহাদের সকলেরই অভক্ষ্য তাহা বলাই বাহুল্যমাত্র। অধিকারী বৈরাগী ও হাজং সকলেই মৎস্য ভক্ষণ করিয়া থাকে; শুষ্ক মৎস্য ইহাদের অতীব প্রিয় খাদ্য। শাক্তগণ মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে ও কামাখ্যা দেবীর পূজা করিয়া থাকে। হাজংদিগের স্ত্রীলোকগণ পুরুষদিগের উচ্ছিষ্ট ধৌত করে না। অধিকারী ও বৈরাগীগণ হাজংদিগকে মন্ত্র প্রদান পূর্বক বৈরাগী করিয়া পরে তাহাদের কন্যা বিবাহ করিতে পারে কিন্তু এরূপ বিবাহ সুসঙ্গের রাজপরিবারের অনুমতি লইয়া প্রায়শ্চিত্তাদি করিয়া করিতে হয়। প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ কন্যাকে গঙ্গোদক পান করায় ও তাহার কেশ অল্প পরিমাণে ছেদন করতঃ তাহাকে বৈরাগী করিয়া লয়।

ধর্ম আচার-ব্যবহার
খাদ্য

হাজংদিগের মধ্যে কন্যা সন্তানের বিবাহ সাধারণত ৮ হইতে ১২ বৎসরের মধ্যেই হইয়া থাকে। পুরুষদিগের বিবাহের কোনো নির্দিষ্ট বয়স নাই। বিবাহ পিতামাতা বা অপর কোনো আত্মীয় কর্তৃক স্থিরীকৃত হয়। যে গ্রামের যে ব্যক্তির কন্যার সহিত বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত হয়, বরের পিতা বা অপর কোনো আত্মীয় ওই গ্রামে যাইয়া কন্যার ও তাহার বংশাদির সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ করে। তৎপর উভয় পক্ষের বিবাহ দেওয়ার ইচ্ছা থাকিলে ওই গ্রামের কোনো লোক মধ্যবর্তী হইয়া বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়া দেয়। হাজংদিগের মধ্যে যে সমস্ত কন্যা বস্ত্রবয়ন কার্যে নিপুণা তাহারাই সাধারণত বিবাহে পছন্দনীয়া ও নির্বাচিতা হইয়া থাকে; এই কারণে কন্যাসন্তানদিগকে শৈশবকাল হইতেই সুতা কাটা ও বস্ত্রবয়ন কার্য শিক্ষা করিতে হয়। ইহা একটি অতীব সুন্দর প্রথা। হাজংদিগের স্ত্রীলোকগণ প্রায়ই নিজেদেব প্রস্তুত বস্ত্র পরিধান করে। সুসঙ্গে আসিবার পূর্বে করইবাড়িতে অবস্থানকালে যে গ্রামে বাস করিত বর ও কন্যাপক্ষের পূর্ব পুরুষগণ যদি সেই এক গ্রামবাসী হয়, তাহা হইলে বিবাহ হইতে পারে না; ভিন্ন গ্রামবাসী হইলে বিবাহ হয়। হাজংদিগের মধ্যে বরপক্ষ কন্যাপক্ষকে পণ প্রদান করে। এই পণের পরিমাণ পূর্বে ৩০।৪০্ টাকার অধিক ছিল না; অধুনা বৃদ্ধি পাইয়া ১০০।১৫০্ পর্যন্ত হইয়াছে। বিবাহের প্রস্তাবে উভয়পক্ষ সম্মত হইলে কন্যাপক্ষ তাহার গ্রামের কতিপয় লোককে ও পাত্রপক্ষের লোকদিগকে কিছু কিছু পানসুপারি ও চিনি দিয়া বিদায় করে।

বিবাহ

তৎপর ওই রাত্রিতে উভয়পক্ষ কোনো স্বপ্ন দর্শনের আশায় নিশিযাপন করে। কোনো প্রকার স্বপ্ন না দেখিলে অথবা কোনো সুস্বপ্ন দেখিলে বিবাহ হওয়ার পক্ষে আর কোনো বিঘ্ন থাকে না, কিন্তু কোনোরূপ কুস্বপ্ন দেখিলে বিবাহ প্রস্তাব ভঙ্গ হইয়া যায়। এইরূপ স্বপ্নদর্শনের পর যদি বিবাহ সম্বন্ধ স্থিরিকৃত হয়, তাহা হইলে বিবাহের জন্য একটি শুভ দিন স্থির হয়। বিবাহের পূর্বে একদিন পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে খৈ, দধি, পান, চিনি সুপারি ইত্যাদি-সহ পাত্রপক্ষীয় বহু স্ত্রীলোক ও পুরুষ পাত্রীর বাড়ি গিয়া ওই গ্রামস্থ লোকদিগকে খাওয়ায়। সেই দিবস বিবাহে কত টাকা পণ দিতে হইবে তাহার পরিমাণ ঠিক হয়। যে দিন বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়, ওই দিন কন্যাকে বস্ত্রালংকারে ভূষিতা করতঃ সকলকে আনিয়া দেখায় ও প্রণাম করায়। বিবাহের পূর্বদিবস অধিবাস হয়। অধিবাসের দিবস পাত্রের বাড়িতে সত্যনারায়ণের সেবা হয় ও গ্রামস্থ লোকদিগকে খাওয়ায়। বিবাহের দিবস প্রত্যুষে একখানা পালকি ও বাদ্যাদি-সহ কতিপয় পুরুষ ও স্ত্রীলোক (এই স্ত্রীলোকদিগকে হাজংগণ তাহাদের প্রচলিত ভাষায় 'আইরো' বলিয়া থাকে) পাত্রীর বাড়িতে গমন করে। তথায় গেলে পাত্রীর অভিভাবকগণ ইহাদিগকে খাওয়ায়। তৎপর পণের সমস্ত টাকা দিয়া কন্যাকে স্নান ও ক্ষৌরকর্ম করাইয়া ওই গ্রামস্থ অন্যান্য লোকজন-সহ পাত্রের বাড়িতে লইয়া যায়। ইহারা পাত্রের বাড়িতে গিয়া বহির্বাটিতে অপেক্ষা করে, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারে না! পাত্রীর বাড়ি হইতে যে সমস্ত লোক আসে, তাহাদিগকে প্রচলিত ভাষায় 'দার্‌লি' বলে। পাত্রীপক্ষীয় লোকজন পাত্রের বাড়িতে আসিলে তাহাদিগকে আহারাদি প্রদানপূর্বক অভ্যর্থনা করে ও সধবা স্ত্রীলোকদিগকে তৈল, সিন্দূর ও পান প্রদান করে। পাত্রের বাড়ির বহিঃপ্রাঙ্গণে একটি মণ্ডপ প্রস্তুত হয় ; এই মণ্ডপে বর আনীত হইলে 'আইরোগণ' কন্যাকে স্নান করাইয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করায় এবং তৎপর কন্যাকেও বিবাহ মণ্ডপে লইয়া যায় ; পাত্রী বিবাহ মণ্ডপে আনীতা হইলে পাত্রের কনিষ্ঠা ভগ্নী অথবা ভ্রাতুষ্পুত্রী আসিয়া তাহার পদপ্রক্ষালন করিয়া দেয়। পাত্রের পিতা অথবা অন্য কোনো অভিভাবক পাত্রীকে যে সমস্ত অলংকারাদি প্রদান করিতে ইচ্ছা করে, তাহা কোনো একটা পাত্রে স্থাপন পূর্বক এই সময় পাত্রীর সম্মুখে উপস্থিত করে ; পরে ওই অভিভাবকের স্ত্রী আসিয়া পাত্রীকে সিন্দূরাদি দিয়া ওই সমস্ত অলংকারাদি পরিধান করায়। তৎপরে দার্‌লিগণের মধ্যে দুই জন পুরুষ আসিয়া একখানা পিঁড়ির উপরে বসাইয়া কন্যাকে বরের চতুর্দিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করাইয়া বর ও কন্যার বস্ত্রের অগ্রভাগদ্বয় গ্রন্থিবদ্ধ করিয়া দেয় এবং তাহাদের উভয়ের হস্ত অন্যোন্যপরি স্থাপন করতঃ স্বীয় স্বীয় অবস্থানুসারে যাহার যাহা দিবার ইচ্ছা হয় তাহা তাহাদিগকে প্রদান করে এবং ধান্য দূর্বা দ্বারা আশীর্বাদ প্রদান করে। পরে বস্ত্রগ্রন্থি খুলিয়া দেয়, এই সময়ও সকলেই আবার কিছু কিছু বর ও কন্যাকে প্রদান করে। বস্ত্রগ্রন্থি খুলিয়া দেওয়ার পর বর ও কন্যাকে আনিয়া সকলকেই প্রণাম করায় ও দেখায়। তৎপর সমস্তকে আহারাদি প্রদান করে। বিবাহের পর একদিন পাত্রপক্ষ কন্যাপক্ষীয় লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ায় এবং তাহার পর আবার আর একদিন কন্যাপক্ষও পাত্রপক্ষীয় লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ায়। এই দিবস বর ও নবপরিণীতা বধূসহ যায় ও তথায় সিন্দূর, কাপড় ও অর্থ প্রাপ্ত হয়। এই প্রকারে ইহাদের বিবাহ ব্যাপার নির্বাহ হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কোনো কোনো স্থলে বিধবা বিবাহ ও বহু বিবাহেরও প্রচলন আছে। বিবাহের পর যদি

কোনো স্ত্রীলোক পর পুরুষগতা হয় তবে তাহার স্বামীকে ত্যাগ করতঃ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া এবং সুসঙ্গ রাজপরিবারের অনুমতি লইয়া ওই পুরুষকে গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। ইহাকে প্রচলিত ভাষায় 'দাইমারা' বলে। এরূপ স্থলে তাহার স্বামী পত্ন্যন্তর গ্রহণ করিতে পারে। ইহাদের বিবাহ সন্ধ্যার সময় গোধূলি লগ্নে হইয়া থাকে।

কোনো ব্যক্তির মৃত্যু হইলে গ্রামস্থ সকল লোককে ডাকিয়া মৃত ব্যক্তিকে তিল ও তুলসী-সহ জল দ্বারা স্নান করাইয়া নববস্ত্র পরিধান করায়। তৎপরে সংকীর্তন করিতে করিতে শ্মশান ঘাটে লইয়া যায়। তথায় পুত্র অথবা অপর কোনো আত্মীয় মুখাগ্নি করিয়া বাড়িতে চলিয়া আসে এবং মৃত ব্যক্তির পরিহিত বস্ত্রদ্বারা ধড়া গ্রহণ করে ; এই দিবস ওই ব্যক্তি অনাহারে থাকে, পরদিন ভালো ধান্যদ্বারা খৈ প্রস্তুত করতঃ রাত্রে সমস্ত নিদ্রাভিভূত হইলে একটি অলাবু নির্মিত পাত্রে করিয়া জল আনয়ন পূর্বক গৃহের কোনো এক নিভৃত কোণে বসিয়া নিঃশব্দে তাহা ভক্ষণ করে ; আহারের সময় যদি কোনো ব্যক্তি, এমনকি কোনো পশুপক্ষী হঠাৎ কোনো প্রকার শব্দ করে, তাহা হইলে আর আহার করিতে পারে না। তৎপর দিবস পূর্বোক্তরূপে অলাবু নির্মিত পাত্রে করিয়া জল আনয়ন করতঃ একটা নূতন হাঁড়িতে অন্ন প্রস্তুত করে। রন্ধনাদি ক্রিয়ার জন্য শ্মশানঘাট হইতে আসিবার সময় খড় দ্বারা একটি লম্বা বেণী প্রস্তুত করতঃ তাহাতে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া লইয়া আইসে। এই আগুন নিভিয়া গেলে আবার নূতন অগ্নি জ্বালাইয়া রন্ধনাদি করিতে পারে না। কেহ কেহ ৩ দিন অথবা ১০ দিন অশৌচ ধারণ করে। অশৌচ ধারণ কালে ইহারা নিরামিষ ভক্ষণ করে, পান তামাক খায় না, খড়ের বিচালির উপর নিদ্রা যায়। যাহারা ৩ দিনের পর শ্রাদ্ধ করে, তাহারা প্রথম দিবসেই তিন-বেলা তিনটা নূতন পাতিল পোড়ায়; আর যাহারা ১০ দিবস পর শ্রাদ্ধ করে, তাহারা তিন দিনে তিনটা নূতন হাঁড়ি পোড়ায়। ইহারা শ্রাদ্ধের দিবস মস্তকমুণ্ডন করতঃ ধড়া ত্যাগ করে ও নূতন বস্ত্র পরিধান করে। শ্রাদ্ধের দিবস কোনো একটা পরিষ্কৃত ভূমিতে তিল ও তুলসীসহ একটি নূতন জলপূর্ণ ঘট স্থাপন করিয়া তাহার উপর জল ও পয়সা দেয় এবং অধিকারীকে দক্ষিণা প্রদান করতঃ প্রণাম করে ; পরে বাড়ি আসিয়া সত্যনারায়ণের সেবা দেয় ও সংকীর্তন করায়। শ্রাদ্ধের দিবস নিজে মৎস্য খায় না কিন্তু অন্যান্য লোক মাছ মাংস খায় এবং অধিকারীর চরণামৃত পান ও প্রসাদ ভক্ষণ করে। শ্রাদ্ধের পরদিবস মহোৎসব করে ও শর্ত অনুসারে দান দক্ষিণাদি করিয়া থাকে। শ্রাদ্ধে ও বিবাহাদিতে অধিকারীগণই পৌরোহিত্য করিয়া থাকে।

শ্রাদ্ধ ও মৃত সৎকার

ইহাদের কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে নিমন্ত্রণ হইলে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ নিজ নিজ আহার্য দ্রব্য (খৈ, দধি ইত্যাদি) সঙ্গে লইয়া যায় ও পয়সা দেয়, কিন্তু অপরিচিত ব্যক্তিগণ আহারের দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়া যায় না এবং পয়সাও দেয় না। শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে কেহই পয়সা দেয় না।

গারো পাহাড় যখন সুসঙ্গরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তখন সুসঙ্গের রাজপুরুষগণ প্রায় প্রতি বৎসরই উক্ত পাহাড়ে খেদা করিয়া অনেক হস্তী ধৃত করিতেন। এই খেদার কার্যে হাজংগণই কুলির কার্য করিত। এই উদ্দেশ্যে ইহারা 'রায়ত' ও 'ওয়ালা' এই দুই ভাগে

বিভক্ত ছিল; সাধারণত রায়তগণই কুলির কার্য করিত; এই কারণে ইহারা যে সমস্ত জমি ভোগ করিত তাহার কোনো কর গ্রহণ করা হইত না; ওয়ালাদিগকে অতি সামান্য পরিমাণে কর দিতে হইত। রায়তদিগের মধ্যে কুলি না পাওয়া গেলে সময় সময় ওয়ালাগণদ্বারাও কুলির কার্য নির্বাহ হইত। হাজংদিগের প্রত্যেক গ্রামে অথবা ২।৩টি গ্রাম লইয়া এক এক জন মণ্ডল থাকিত। মণ্ডলদিগকে সংবাদ প্রদান করিলেই তাহারা কুলি সংগ্রহ ও অন্যান্য আবশ্যক সমস্ত কার্যাদি সম্পাদন করিত। হাজংগণ গ্রামের মণ্ডলের উপর এতদূর নির্ভর করিত যে ইহাদের কাহারও পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিলে বলিত আমি জানি না, মণ্ডল জানে। অবশ্য এখন শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এ অবস্থার বহুল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে।

অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্বে সুসঙ্গের রাজপুরুষগণ জালদ্বারা ব্যাঘ্র, হরিণ প্রভৃতি আবদ্ধ করতঃ শিকার করিতেন। ইহা অতীব কৌতুকাবহ ও বিপদসংকুল বলিয়া ইহাতে যথেষ্ট সাহসের আবশ্যক ছিল। এই সমস্ত কার্যেও হাজংগণ জাল ও কুলি সরবরাহ করিত। সুসঙ্গরাজ পরিবারস্থ কেহ কোনো স্থানে যাতায়াত করিলে হাজংগণ ভারবাহীর কার্য করিত। ইহারা রাজবাড়িতে বৎসরের অনেক সময় প্রহরীর কার্যও করিত।

বিগত কতিপয় বৎসর অতীত হইল ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ সামান্য পরিমাণে শিক্ষালাভ করতঃ পূর্বোল্লিখিত কার্যাবলি ঘৃণিত ও অপমান সূচক মনে করিয়া ওই সমস্ত কার্যত্যাগ করিয়া রাজপরিবারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ভাবাবলম্বন করিয়াছিল। উহাদের দখলীয় ভূমির পরিমাণ ও স্বত্ব সাব্যস্ত হইয়া কর ধার্য হওয়ায় এখন ইহারা ইহাদের ভূমির জন্য রীতিমত কর প্রদান করিতেছে। গারো প্রভৃতি অনেক অসভ্য জাতি আজকাল বহু পরিমাণে খ্রিস্টধর্মাবলম্বন করিতেছে, কিন্তু অতীব বিস্ময়ের বিষয় এই যে, আজ পর্যন্ত হাজংদিগের মধ্যে একজনও স্বীয়ধর্মত্যাগ পূর্বক অপর কোনো ধর্মাবলম্বন করে নাই। দীপান্বিতার সময় হাজংগণ নানারূপ বেশ ধারণ করতঃ রাজবাড়িতে ও অন্যান্য ভদ্রলোকের বাড়িতে রামরাবণের যুদ্ধ প্রভৃতি প্রদর্শন পূর্বক ও রামমঙ্গল ও অন্যান্য গান করিয়া পয়সা আদায় করে, ইহাকে প্রচলিত ভাষায় 'চরমাগা' বলে। এইরূপ তামাশা দেখাইয়া ও গান করিয়া যে অর্থলাভ করে তাহা দ্বারা বাস্তুপূজা ও মহোৎসবাদি করিয়া থাকে।

সুসঙ্গে গারো পাহাড়ের পাদদেশে হাজংদিগের ন্যায় আর একপ্রকার অর্ধসভ্য জাতির বাস আছে; ইহাদিগকে বানাই বলে। ইহাদের আচার-ব্যবহার অনেকাংশে হাজংদিগেরই ন্যায়, কিন্তু বানাইগণ কুক্কুট ও শূকরের মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। গোমাংস ভক্ষণ করে না। হাজংদিগের ও বানাইদিগের মধ্যে ষণ্ডের ক্লীবত্ব সম্পাদন করিবার প্রথা আছে; ইহা তাহারা দোষ বলিয়া মনে করে না। ইহাদের মধ্যে সতীত্বের ভাবও খুব প্রবল বলিয়া মনে হয় না। হাজংগণ হিন্দুদিগের ন্যায় নবান্নশ্রাদ্ধ করিয়া থাকে; এই সময় ইহারা মদ্যপানও করিয়া থাকে। হাজংগণ অত্যধিক পরিমাণে মদ্যপায়ী নয়।



গোঁড় জাতি

শ্রীসত্যকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

ভারতবর্ষে যেসব পার্বত্য জাতি আছে তাহাদের মধ্যে গোঁড়জাতিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাহারা সংখ্যায় নিতান্ত কম নয়, প্রায় ত্রিশ লক্ষের অধিক হইবে। বনভূমিশোভিত সাতপুরা পর্বতশ্রেণির সর্বত্র, ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত সুদূর চিন্দ্‌বারা প্রদেশের জায়গিরগুলি, বেতুলের নদীসমূহের তীরভূমি, সিয়োনির মনোরম পাহাড়গুলি—এই জাতির বাসস্থান। চন্দা, ওয়ারধা, নরসিংপুর এবং আসাম প্রদেশেও ইহারা বাস করিয়া থাকে।

গোঁড়েরা দ্রাবিড়ি ভাষায় কথাবার্তা বলে, চলতি কথায় তাহাদিগকে রাবণবংশি বলা হয়। সম্ভবত তাহারা দাক্ষিণাত্য হইতে মধ্যপ্রদেশে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছে। আদি বাসস্থান সম্বন্ধে সঠিক কিছু তাহারা বলিতে পারে না। তাহাদের ভাষায় 'ভুলে যাওয়া' শব্দ পাওয়া যায়, কিন্তু 'মনে রাখা' শব্দের উল্লেখ নাই। তাহাদের সম্বন্ধে প্রকৃত প্রবাদ এবং পৌরাণিক উপাখ্যান খুব অল্পই পাওয়া যায়। বেতুলে তাহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে—

প্রাচীন সমুদ্রে সিঙ্গামালি পাখির ডিম হইতে ইহাদের আদি পিতামাতার উৎপত্তি। সাগরমাতা বনভূমিকেই যেন তাহাদের বাসস্থান নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন এবং তাহারা নীলকণ্ঠ পাখির পালক ও ময়ূরপুচ্ছ সংযোগে তথায় বাসস্থান নির্মাণ করিয়া লইয়াছিল। খ্রিস্টানদের আদিমাতা ঈভ যেরূপ নিষিদ্ধ ফলভক্ষণে প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন, গোঁড়দের আদিমাতাও সেরূপ হইয়াছিল বলিয়াই তাহাদের উদ্ভব এবং এই বিশ্বজোড়া দুঃখের হা-হুতাশ। শেষে অন্ধতমসাচ্ছন্ন পৌরাণিক উপাখ্যানের ভিতর বনের রাজা ও বীর রাইলিঙ্গের অত্যুৎকৃষ্ট কাহিনি আসিয়া পড়িল। যে রাইলিঙ্গ রাজা আর্থার, যে রাইলিঙ্গ ফরাসি দেশের লুই, সেই মানবদেহধারী রানির শিরস্ত্রাণ হইতে উদ্ভূত একটি অবতারস্বরূপ।

কিন্তু তাহার জন্ম সম্বন্ধে রানি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ইহা তাঁহার পক্ষে একটি মস্ত বড়ো অভিশাপ; তাই তিনি শিশুটিকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিবার জন্য দুইটি বালিকাকে আদেশ দিলেন। কিন্তু বালিকারা শিশুটির দিকে তাকাইতেই সে তাহাদিগকে দেখিয়া ঈষৎ হাসিল; ওই প্রীতিভরা হাসিতে মুগ্ধ হইয়া বালিকারা তাহাকে পুঁতিয়া ফেলার বদলে একটা বটগাছের মূলে লুকাইয়া রাখিল। এমন সময় এক শকুন-রানি তাহার পর্বতস্থিত বাসা হইতে আহার অন্বেষণে বাহির হইল এবং রাইলিঙ্গাকে তুলিয়া লইয়া তাহার বাসায় চলিয়া গেল। বালক রাইলিঙ্গাও সেখানে মনের সুখে বর্ধিত হইতে লাগিল। সে তির-ধনুক লইয়া শিকার অন্বেষণে বেড়াইতে বেড়াইতে তাহার নিজ জন্মভূমিতে তাহার মাতার কাছে আসিয়া পড়িল। অন্য ছয়জন বড়ো ভাই থাকা সত্ত্বেও মাতা রাইলিঙ্গাকেই রাজাসন দিল, কিন্তু বাইয়েরা ইহাতে ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া তাহাকে বধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ইহাতে ব্যর্থমনোরথ হইয়া তাহারা রাইলিঙ্গাকে তাহাদিগের স্ত্রীদের নিকট রাখিয়া দিয়া বাণিজ্যযাত্রায় বাহির হইল। তাহাদিগের কাছে তাহাব নিষ্কলুষ চরিত্র প্রতি রাত্রে ব্যাহত হইতে লাগিল, কিন্তু সে কিছুতেই তাহাদের কামনা পূর্ণ করিতে চাহিল না, অবশেষে হতাশ হইয়া তাহারা পারাবত শিকারের জন্য রাইলিঙ্গাকে বনমধ্যে লইয়া গিয়া তাহার বস্ত্র উন্মোচন করিয়া দিল, কিন্তু তাহাতে তাহার কিছুমাত্র লজ্জার ভাব প্রকাশ পাইল না। অনন্যোপায় হইয়া স্ত্রীগণ একটি বিড়ালকে ঘরের ভিতর বন্ধ করিয়া রাগাইয়া দিল এবং ওই ক্রুদ্ধ বিড়ালের আঁচড়-কামড়ে তাহারা পীড়িত হইল। তাহাদের স্বামীরা ফিরিয়া আসিলে তাহারা জানাইয়া দিল যে, রাইলিঙ্গা তাহাদিগের উপর অতিশয় অত্যাচার করিয়াছে। তখন ভাইয়েরা মিলিয়া রাইলিঙ্গাকে প্রাণে মারিবার জন্য তাহাকে উত্তপ্ত লোহার কড়ায় ফেলিয়া দিল কিন্তু তিন দিন পরে যখন ভাইয়েরা তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিতে গেল তখন দেখিল যে সে জীবিত। তখন তাহারা বুঝিল যে, পুণ্যাত্মার নিকট যমরাজের অপ্রতিহত শক্তি খর্ব হইয়াছে। ভাইয়েরা তাহাদের স্ত্রীগণের অপরাধ বুঝিতে পারিয়া রাইলিঙ্গাকে অতিশয় সম্মানের সহিত মুক্ত করিল। রাইলিঙ্গের কোনোরূপ প্রতিবাদ না শুনিয়া তাহারা স্ত্রীদের পায়ে বেড়ি পরাইয়া দিল এবং তাহাতে বলদ জুতিয়া দিয়া তাহাদের চরম দশা উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত গ্রামের চারিদিকে ঘুরাইতে লাগিল। পরে রাইলিঙ্গা অগ্নির অনুসন্ধানে বাহির হইয়া বনে গিয়া তাহার ভ্রাতাদের জন্য নূতন রানি ও অগ্নি সংগ্রহ করিল এবং সে নিজে বিবাহ করিতে অসম্মতি জানাইল। সে বলিল, "তোমরা তোমাদের রাজধর্ম ও সাংসারিক ধর্ম পালন কর—আমার সংসারী হইবার প্রবৃত্তি নাই।" তারপর সে তাহাদের সকলকে আলিঙ্গান কবিয়া অন্তর্হিত হইল এবং অমরধামে প্রস্থান করিল।

এই উপাখ্যান ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রচলিত।

চতুর্দশ শতাব্দীর পরে বেতুল, চিন্দ্‌বারা, মান্ডলা ও চন্দায় গোঁড়জাতির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু ইহার পূর্বে তাহাদের কোনো মূল ইতিহাস পাওয়া যায় নাই। উহাদের আধিপত্য প্রায় দুই তিন শতাব্দী ধরিয়া স্থায়ী ছিল, সেজন্য দেশও সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। তখন ভারতের অতীত গৌরব প্রচারের পক্ষাশ্রয়ী পৃষ্ঠপোষক ছিল না বলিলেই হয়, তবুও "মধ্যপ্রদেশের সরকারের অনুমত্যানুসারে প্রকাশিত" একখানি গ্রন্থে আছে—

> "গোঁড় শাসনকর্তাদের নিরুপদ্রব ও শান্তিপূর্ণ শাসনে দেশের সমৃদ্ধি হইয়াছিল, গো-মেষাদি পশুর সংখ্যাধিক্য এবং রাজকোষ পরিপূর্ণ ছিল ... গোঁড় রাজাদের এরূপ একটি সুন্দর নিয়ম ছিল, কোনো লোক পুষ্করিণী খনন করাইতে সম্মত হইলে রাজারা সেই পুষ্করিণীর জমি তাহাকে নিষ্করভাবে দান করিতেন।"

চন্দার জরিপ-বিভাগের প্রধান কর্মচারী গোঁড় শাসনকর্তাদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

> "তাহাদের রাজত্বকালে দেশ সুশাসিত ও শান্তিপূর্ণ ছিল। অট্টালিকাশোভিত সুন্দর নগরগুলি স্থপতিবিদ্যার নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তাহা ক্রমশ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইয়াছিল। যাঁহারা এক সময় রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিল আজ তাহাদের দুর্দশা দেখিলে এই সকল ঘটনা স্বতই আমাদের স্মরণ হয়।"

যে-সাতপুরা পর্বতশ্রেণি এক সময় মনোহর দৃশ্যের লীলাভূমি ছিল, আজ তাহার উপর অশেষ দুঃখের যবনিকাপাত হইয়াছে। যদি কেহ এখানে আসে তাহা হইলে সে এখানকার পীড়িত মানবতার বিষাদমাখা কাতরধ্বনি শুনিতে পাইবে। গোঁড়েরা এখন জগতের আপদগ্রস্ত জাতির মধ্যে গণ্য। বর্তমানে তাহারা প্রত্যেক আগন্তুকের কাছে চক্ষুশূল হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা এখন দারিদ্র্যের চরমসীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে ; তাহাদের গড়পড়তা দৈনিক আয় এক আনা মাত্র ; তাহাদের সন্তানকে পাঁচ বৎসর বয়স হইতেই খাটিয়া খাইতে হয় ; আহার্য তাহাদের অতি সাদাসিধা, কেবলমাত্র ফেনসমেত ভাত ; পরিচ্ছদের দৈন্য এরূপ যে শীতকালে পার্বত্যপ্রদেশের আত্যন্তিক শীত কোনোরূপেই রক্ষা হয় না। তাহাদের পোশাক সম্বন্ধে একজন কবি বলিয়াছেন—

আভরণের টান পড়েছে
করছে তাদের ছন্নছাড়া,
কৌপীনেতে অর্ধঅঙ্গে
লজ্জা ঢাকে সর্বহারা।

তথাপি অর্ধভুক্ত, অবজ্ঞাত, ধ্বংসোন্মুখ এই জাতি মদ্যবিক্রেতা, কুসীদজীবী ও তহশিলদারের হাতে প্রতিনিয়ত উৎপীড়িত। এই জাতিকে ভূমির, কৃষিযন্ত্রাদির, গবাদি পশুর এবং ভোজন-পাত্রের উপর, এমনকি, গৃহাদি সংস্কার ও পরিষ্কার করিবার জন্য যে মৃত্তিকার প্রয়োজন তাহার উপরও করভার বহন করিতে হয়। আগেকার মতো প্রাণীবধ করিয়া তাহারা আর খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারে না, কারণ এখন ধনীলোকের মৃগয়ার সাধ মিটাইবার জন্য বনের জীবজন্তু সুসংরক্ষিত। তাহাদের উপর উৎপীড়ন ও অত্যাচার যথেষ্ট হইয়াছে। যেন কোথা হইতে এক ঝঞ্ঝা আসিয়া গ্রীষ্মের আতপ-তপ্ত পক্ব শস্য নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও চিতা এখন তাহাদের মেষপাল গ্রাস করে ; রাত্রিকালে কখনো কখনো ইহারা তাহাদের কুটিরে প্রবেশ করিয়া তীক্ষ্ণ নখরাঘাতে ও অন্ধকারে চোখের উজ্জ্বলতায় তাহাদের ঘুমন্ত শিশুসন্তানগুলিকে দুঃস্বপ্নের মত জাগাইয়া দেয়। ব্যাঘ্রের অপেক্ষাও ভীতি উৎপাদক ও রক্তপিপাসু মহাজন তাহাদের বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় টাকা লগ্নি করিবার জন্য তাহাদিগকে নানারূপ স্তোকবাক্য প্রয়োগ করে। এই সকল মহাজনের শোষণের পর তাহাদের যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা সভ্যসমাজে আদৃত ও রাজসরকারের পৃষ্ঠপোষিত আফিং ও মদ্যে নিঃশেষিত হইয়া যায়। নিম্নপদস্থ সরকারি

কর্মচারীরাও তাহাদের এই অপব্যয়ের অংশ পাইয়া থাকে। সকলদিকে উপায়বিহীন, একেবারে অজ্ঞ ও নিঃসহায় হইয়া এই জাতি সহজেই নানারূপ পীড়ায় আক্রান্ত হয়। তাহাদের সাহায্যের জন্য কোনো সাধারণ তহবিল নাই। সুতরাং বংশানুক্রমে তাহারা দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। ম্যালেরিয়া তাহাদিগকে পঙ্গু করিয়া দিতেছে, তাহাদের চিকিৎসাদির কোনোরূপ ব্যবস্থা নাই। খাদ্যাভাবে তাহাদের সন্তানগুলি মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। তাহাদের রাজপদ বা রাজসম্মান আজ স্মৃতিপথ হইতে বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে!

কিন্তু কী সাহস ও উদ্যমের সহিত এই অদ্ভুত জাতি তাহাদের দুঃখের সম্মুখীন হইয়াছে! ইহাদের অপেক্ষা কৌতুকপ্রিয় সদানন্দ, কমনীয় জাতি আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহাদের মর্যাদাবোধ স্মরণাতীত হইলেও রক্তের সহিত প্রতি ধমনিতে প্রবাহিত। এখনও তাহাদের আচরণ রাজোচিত, তাহাদের বংশ অতি প্রাচীন।

তাহাদের এই শক্তির মূল উৎস কোথায় যে নিহিত আছে তাহা নির্ণয় করা সহজসাধ্য নহে, তবে তাহাদের নৃত্যের তালে ইহার অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। অনুপ্রেরণাহীন মানব-মনও বনভূমির নিগূঢ়তত্ত্ব কিছু কিছু অনুভব করিতে পারে বলিয়া মনে হয়। তাই শ্রীযুক্ত এম. ডি. পাতিয়াল গৌড়-সেবামণ্ডলে কিছু দিন কাজ করিয়া বনভূমির প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

> "এই জাতির অন্তরাত্মা স্বাচ্ছন্দ্যপ্রয়াসী হইয়া পৃথিবীর নগ্নবক্ষ দীর্ঘনিঃশ্বাসে পরিপূর্ণ করিতেছে। বনের পত্ররাজির মর্মরধ্বনির সহিত ইহার দীর্ঘশ্বাস নিয়ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। দূরবর্তী পশুপক্ষীর সুমধুর সংগীতধ্বনিতে আত্মার এই কাতর ক্রন্দনের সমবেদনা মুখরিত হয়; অদৃশ্য পতঙ্গের অবিরাম সংগীতপ্রবাহ উহার আকুলতাকে জীবিত করে। তাহাদের অন্তর হইতে মানবপ্রকৃতির স্বাভাবিক উদ্বেগ অন্তর্হিত হয়; তাহাদের হৃদয়ের এই ভাব একটি স্বর্গীয় বস্তু। বাহ্য প্রকৃতির এই প্রভাব কখনো কখনো অতি অল্প সময়ের জন্যও পানাহার এবং পরিচ্ছদের চিন্তা তাহাদের মন হইতে বিদূরিত করে; তাহাদের দুঃখে প্রপীড়িত আত্মা ক্ষণিকের জন্য আত্মবিস্মৃত হইয়া যেন একটা বিমল আনন্দের রাজ্যে প্রবেশলাভ করে এবং তাহা তাহাদের আনন্দদায়ক পার্বত্য জীবনের ক্ষণিক স্বপ্ন উপভোগ করে। তাহাদের স্বাধীনতা যেন ফিরিয়া আসে, দারিদ্র্য-দুঃখ যেন ত্যাগের আনন্দে পরিণত হয়। তাহাদের এই বন্য জীবন মানবাত্মার একঘেয়ে একটানা ভাব হইতে তাহাদিগকে দূরে রাখে। এই বনভূমির মধ্যে তাহাদের আভিজাত্যে ভরা হৃদয় স্পন্দিত হয় এবং মধ্যে মধ্যে শান্তিনিলয় এই বনদেবীর বক্ষে তাহারা ক্ষণিক আনন্দে বিভোর হইয়া পড়ে। এই ইন্দ্রজালই গৌড়দিগকে অবিরত বনভূমির দিকে হাতছানি দিয়া ডাকিয়া লইয়া যায়। যে-প্রকৃতিদেবী তাঁহার স্নেহসিক্ত মঙ্গলময় হস্ত দ্বারা তাহাদিগকে লালনপালন ও সান্ত্বনা প্রদান করেন, তাহারই সহানুভূতি ও ভালোবাসার গৌরবময় রহস্য তাহারা এই বনভূমিতেই উপলব্ধি করে। এস্থানে লীলাময়ের হৃদয়-কন্দরে তাঁহারই প্রেমের গান প্রকৃতিদেবীর শত সহস্র সুরে ধ্বনিত হয়। এই বনভূমির বক্ষে তাহারা দুর্ভাগ্যপীড়িত অসহায় শিশুর ন্যায় তাহাদের মর্মোচ্ছ্বাস জ্ঞাপন করে। ভগবানের এই সমস্ত লীলা-বৈচিত্র্য তাহারা সামান্য অনুভব করে মাত্র; অথবা ইহারই ভিতর দিয়া অসীমে পৌঁছিবার পথের সন্ধান পায়। ইহা কল্পনা নয়, স্বপ্নও নয়; ইহা কেবলমাত্র ক্ষণিক দীপ্তিতে প্রকাশিত হয় এবং মুহূর্তমধ্যেই বিস্মৃতি-গর্ভে লীন হইয়া যায়।

মুহূর্তের এই আত্মবিস্মৃতিই গোঁড়জাতির জীবন-প্রবাহের উৎস। ধর্ম, শিল্পকলা, জাদুবিদ্যা এবং সংগীত—সমস্তই এই বন্যজাতির নিজস্ব। অন্য স্থানে এবং অন্য সময়েও তাহারা সতত এই সমস্ত বাস্তবের সান্নিধ্যে থাকিবার জন্য ও সেই সচ্চিদানন্দ অজ্ঞাতের রহস্য ভেদ করিবার জন্য তাহাদের ইন্দ্রিয়ের উৎকর্ষ সাধনাভিলাষে এই অনির্বচনীয় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে। যে বিধাতা তাহাদিগকে এই বিশ্রাম ও সুষুপ্তির গর্ভে নিমজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন জীবনসংগ্রামে তাঁহারই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। অতএব সমগ্র জীব-জগতের ন্যায় তাহাদের জীবন কল্পনা ও উচ্চ আদর্শের ভিত্তিতে স্থাপিত। এই সকল কল্পনা আবার সেই পরমাত্মার হৃদয়নিঃসৃত মহৌষধেব প্রতি প্রগাঢ় অনুরক্তিপ্রসূত।"

পাতিয়াল সাহেব গোঁড়দের সহিত ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে থাকিয়া গোঁড় বনিয়া গিয়াছিলেন এবং তাহাদের আচার-ব্যবহার সম্যক আয়ত্ত করিয়াছিলেন। পূর্বে সভ্য সমাজের ধারণা ছিল যে, অসভ্য জাতির মধ্যে কেবল ভূতের ভয় ছাড়া কোনো ধর্ম নাই ; কিন্তু তাঁহার প্রদত্ত বিবরণী সে ধারণা দূরীভূত করিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

গোঁড় জাতির জীবনযাপনপ্রণালী ও আচার-ব্যবহার এত অল্প পরিসরের মধ্যে বর্ণনা করা সম্ভব নহে। রাসেল সাহেবের রচিত মধ্যপ্রদেশের বর্ণ ও জাতি-সমূহ (Tribes and Castes of the Central Provinces) নামক পুস্তকে উহা সুন্দররূপে বর্ণিত আছে। এই ধরনের পুস্তকে বাহ্যিক বর্ণনাটা যেমন বেশি থাকে ইহাতেও সেইরূপ আছে। এই সকল পুস্তকে যে যে স্থলে ভারতবাসীর আচার-ব্যবহারের প্রশংসা করা হইয়াছে সেই সেই স্থান নির্ভুল বলিয়া বোধ হয়। আর যে যে অংশে ভারতীয় আচার-ব্যবহারের নিন্দা করা হইয়াছে সেই সেই অংশ ঠিক নহে। গোঁড়জাতির বন্ধুত্বপ্রথা সম্বন্ধে পাতিয়াল সাহেব যেভাবে বিবৃত করিয়াছেন আর কোনো পুস্তকে সেরূপ নাই। তাহাদের বন্ধুত্বের আদর্শ উচ্চ। বন্ধুত্ব প্রথাকে তাহারা একটা কলাবিদ্যায় পরিণত করিয়াছে বলিলেও চলে। এই বন্ধুত্ব স্ত্রীপুরুষের সংস্পর্শজাত নয়। কেন-না, তাহাদের বন্ধুত্ব স্ব স্ব জাতির মধ্যে আবদ্ধ। পরস্পরের প্রতি ভালোবাসার গভীরতা অনুসারে তাহাদের বন্ধুত্ব পাঁচ প্রকারে বিভক্ত। যথা—ভাজলি, সখী, জওরা, মহাপ্রসাদ ও গঙ্গাজল।* এই পাঁচটির মধ্যে ভালোবাসা উত্তরোত্তর বর্ধিতভাবে বর্তমান থাকে। অর্থাৎ প্রথমটি অপেক্ষা দ্বিতীয়টিতে অধিকতর এবং দ্বিতীয়টি অপেক্ষা তৃতীয়টিতে আরও বেশি ভালোবাসা দৃষ্ট হয়।

গোঁড়জাতির জীবনযাপন প্রণালী কীরূপ সুন্দর ও মাধুর্যময় তাহা আংশিক বলা হইল। এইবার তাহাদের কী কী জিনিসের অভাব আছে সে-সম্বন্ধে সন্ধান লওয়া যাক। সভ্য মানবসমাজ তাহাদিগকে বহু শতাব্দী ধরিয়া অবহেলা করিয়া আসিয়াছে। আজ তাহাদিগকে কী কী সুযোগ দেওয়া উচিত? সর্বপ্রথম প্রয়োজন,—তাহাদিগকে শিক্ষা দান করা। এই শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা হওয়া চাই, যে-সে শিক্ষা নহে। বর্তমানে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড যে শিক্ষা দান করে তাহা কোনো প্রয়োজনেই লাগে না। এই শিক্ষা তাহাদিগকে কিছু সভ্য করিয়া তোলে বটে, কিন্তু উহা তাহাদের মানসিক শক্তি দমিত করিয়া তাহাদিগকে ক্রমশ দাসত্বের দিকে অগ্রসর করাইয়া দেয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য আত্মাকে মুক্ত বা স্বাধীন করা। অতএব যে-শিক্ষা

* আমাদের সভ্য বাঙালি জাতির মধ্যেও সখী, মহাপ্রসাদ এবং গঙ্গাজল—এই তিনটি প্রচলিত আছে।

আত্মাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া তাহার চিত্তবৃত্তির সম্যক পরিস্ফুরণের অবসর দেয় সেই শিক্ষাই তাহাদের দরকার। ভূগোল এবং বিজ্ঞানচর্চা করাও প্রয়োজন। তাহাদিগকে রাজারাজড়া বা যুদ্ধের ইতিহাস না শিখাইয়া সেই সাধু-সন্ন্যাসীর ইতিহাস শিখাইতে হইবে, যাঁহারা জগতে মহৎ কার্য করিয়া মহত্বলাভ করিয়াছেন। স্বাস্থ্যনীতি এবং সংগীতবিদ্যা তাহাদিগকে শেখানো উচিত। বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন করিবার জন্য পুষ্পশোভিত গৃহসকল নির্মাণ, উদ্যানরক্ষা, উৎকৃষ্ট বস্ত্রের জন্য বয়ন এবং উৎকৃষ্ট গৃহ নির্মাণের জন্য সূত্রধরের কার্যও তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া উচিত।

দ্বিতীয়ত, চিকিৎসাবিদ্যা তাহাদের পক্ষে অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। কেন-না, ভারতের অধিকাংশ বালক বালিকাই রুগ্ন, অনাহারক্লিষ্ট ও কঙ্কালসার। যতদিন না ভারতে বহুলপরিমাণে হাসপাতাল ও ঔষধালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ততদিন কেহই ভারতবাসীর স্বাস্থ্য দেখিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারিবে না।

কর, বিশেষত গো-মহিষাদি গৃহপালিত জন্তুর উপর কর, উঠাইয়া দিতে হইবে এবং যে-সকল আইন-ব্যবসায়ী দরিদ্রের কলহ হইতে নিজেরা বেশ দু-পয়সা উপায় করে তাহাদের হাত হইতেও ইহাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে। দূরবর্তী স্থানগুলির শাসনকর্তাদের উপর উচ্চ রাজকর্মচারীদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখাও উচিত। বনে শিকার করিবার অধিকার তাহাদিগকে দিতে হইবে। গরিব লোকেরা ক্ষুধার নিবৃত্তির জন্যই শিকার করে, আর ধনীরা করেন আমোদ উপভোগের জন্য। গরিব লোকদিগকে শিকারের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া ধনীদের সেই অধিকার দিলে তাহা অপেক্ষা অধিকতর পক্ষপাতিত্ব আর কী হইতে পারে? প্রাণীবধ করাই অন্যায়। অনাহারক্লিষ্ট লোকের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য প্রাণী বধ করিতে হয় তাহা বরং মার্জনীয়, কিন্তু মানুষ যে কেবলমাত্র তাহার আনন্দ উপভোগ ও ধর্মের নামে পশুহত্যা করিবে ইহা নিতান্ত গর্হিত।

আমরা সমাজের উন্নতি করিব, গ্রামের উন্নতি করিব বলিয়া বৃথা চীৎকার করি। আমাদের এই সব বিষয় আলোচনা করিবার কোনো অধিকার নাই। চোর যেমন গৃহস্বামীর নৈতিক উন্নতির বিষয় আলোচনা করিতে পারে না, আমরাও সেইরূপ গ্রামবাসীদের উন্নতির বিষয় আলোচনা করিতে পারি না। বনবাসীদের উন্নতির বিষয় আমাদের চিন্তা করিতে যাওয়া আরও উপহাসের বিষয়। কেন-না, তাহাদের বংশ আমাদের অপেক্ষাও প্রাচীন এবং তাহারা যেসব গূঢ় তথ্য অবগত আছে তাহা আমাদের নিকট অপরিজ্ঞাত। যে শ্রেণির খাদ্যদ্রব্য ব্যবহার করিয়া আমরা এক মাসের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হই সেই শ্রেণির খাদ্যদ্রব্যে তৃপ্ত থাকিয়া তাহারা সারাদিন কাজ করিয়া যাইতেছে এবং রাত্রির অধিকাংশ সময় নৃত্যাদি আনন্দে কাটাইতেছে। তাহারা যে ধৈর্য ও আনন্দের সহিত তাহাদের এই দারুণ দুঃখময় জীবন পরমানন্দে উপভোগ করিতেছে তাহারা অর্ধেক পাইলেও আমরা কৃতার্থ হই।

তবে কেন আমরা তাহাদিগকে বর্বর বলিয়া নিন্দা করি? শ্বেতবর্ণের উত্তরীয়বিশিষ্ট, মস্তকে শোলার টুপিধারী, রাজস্ব কার্যালয়ের বাবুর নিকট হইতে সেলামপ্রাপ্ত নাগরিকের পার্শ্বে বন্য বৈগা অথবা কোর্কু কুৎসিত বা কদাকার বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে। কিন্তু

এখানে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, কে বা কাহারা প্রকৃত বর্বর—বিশ্বশিল্পী-নির্মিত পদযুগলকে জোরে চর্মপিঞ্জরে প্রবেশ করানো এবং বিদেশি বস্ত্রের কুৎসিত গোলাকার মোজার ভিতর পা দুইটিকে রক্ষা করা এবং গাধার গলদেশের রজ্জুর ন্যায় গলবন্ধদ্বারা গলদেশ বন্ধন করা, না হস্তপদকে উন্মুক্ত রাখিয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে বনানীর মধ্যে পরিভ্রমণ করা? ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি প্রকৃত 'জংলি'?

শ্রীযুক্তা রোন্‌ডা আধুনিক সভ্য বালিকার যে রূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা এবং রবীন্দ্রনাথ সাঁওতাল-ললনার যে রূপ বর্ণনা দিয়াছেন তাহাও নিম্নে দেওয়া গেল। দুইটিই পাশাপাশি রাখিয়া পাঠক বিচার করুন কোনটি বর্বর নামে অভিহিত হইবার যোগ্য—

"এ-যুগের সভ্য ললনাগণ শরীরটিকে একটি ছবি বা প্রতিমা বলিয়া বিবেচনা করেন। তাঁহাদের ঠোঁটে রং, গলায় হার, কানে দুল, চুল কোঁকড়ানো, বঙ্কিম ভ্রূ—এসব তাঁহাদের সহজ স্বাভাবিক ভাব দূর করিয়া তাহার পরিবর্তে কৃত্রিম ভাব ধারণ করিয়াছে।"

রবীন্দ্রনাথ সাঁওতাল রমণীদের এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন—

"সাঁওতাল রমণীরা সর্বদা কার্যে ব্যাপৃত থাকায় তাহাদের শরীর স্বাস্থ্যপূর্ণ, গতিবিধি স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল ; কার্যকুশলতায় তাহাদের সজীবতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সর্বদা ধূলি-সংস্পর্শে থাকিলেও তাহাদের সুগোল, স্বাস্থ্যব্যঞ্জক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি মলিন বলিয়া বোধ হয় না। বর্তমানে সভ্য নারী সাবান, এসেন্স, হেজলিন, পমেটম ইত্যাদি কৃত্রিম সৌন্দর্যসৃষ্টির উপকরণ সাহায্যে পরিচ্ছন্নতা রক্ষার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাহাদের স্বাস্থ্যব্যঞ্জক স্বভাব-সৌন্দর্যের নিকট সে চাকচিক্য কোনোরূপে তুলনা করা চলে না।"

এই বন্য ভ্রাতা ভগিনীদিগকে ভালবাসার চোখে দেখা প্রত্যেক ভারতবাসীরই একান্ত কর্তব্য। এখন এই এক কোটি আশি লক্ষ লোকের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন ও অর্থসাহায্য করা আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত। যদি প্রয়োজন হয় প্রাণ দিয়াও তাহাদের উপকার করা বাঞ্ছনীয়। যদিও তাহারা তাহাদের অভ্যুদয়ের জন্য কোনো লোকের মুখাপেক্ষী নহে, তথাপি যদি কেহ তাহাদের নিকট বন্ধুরূপে তাহাদিগকে প্রীতির চক্ষে দেখিয়া থাকে তাহা হইলে তাহারা কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাহাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিবে। ইহা অপেক্ষা অধিক কিছু প্রতিদানের আশা যেন তাহারা না করে।

নব্য ভারতবাসীর ধমনিতে বনভূমির আদিম অধিবাসীগণের শোণিত প্রবাহিত হওয়া প্রয়োজন। এই শোণিত তাহাদিগকে নববলে বলীয়ান করিবে। অরণ্যই ভারতের হৃদয়স্বরূপ। অরণ্যই একদিন মুনিঋষিদিগের আশ্রম ও আবাসস্থল ছিল। অরণ্যেই একসময় ভারতের সর্বোৎকৃষ্ট সাহিত্য ও দর্শনের উৎপত্তি হইয়াছিল। সুতরাং অরণ্য ও অরণ্যবাসীকে ভারতবাসী অশ্রদ্ধা করিতে পারে না।*

* ১৯৩৩ সালের নভেম্বর মাসের 'মডার্ন রিভিউ' পত্রে প্রকাশিত ভেরিয়ার এলউইন সাহেবের ইংরেজি প্রবন্ধ অবলম্বনে।



নীলগিরির টোডা জাতি

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী

প্রথম যেদিন টোডা দেখিলাম মনে এক নূতনতর আনন্দ জন্মিল। মনুষ্যসমাজের সেই আদিম যুগ—যখন মানুষের বুদ্ধি অপরিস্ফুট, সুবিধা আরাম কৌশল স্বল্পায়ত্ত, পর্বতগুহা বা সামান্য পর্ণকুটিরই তাহাদের নিবাসস্থল, মৃন্ময় ও লৌহ দ্রব্যাদিই তাহাদের কারুকার্য ও গৃহদ্রব্য, সমাজ-নিয়ম অজটিল অথচ বিশৃঙ্খল, স্ত্রী পাওয়া সহজ নহে, বহু কষ্টে কোনো পরিবার হইতে কোনো এক নারী কাড়িয়া আনিতে পারিলে বহু ভ্রাতা মিলিয়া তাহাকে গ্রহণ করে,—এখনকার সভ্য সময়ে যে যুগের সমস্তই উপন্যাস কল্পনার বিষয় মাত্র, সে দিন তাহাই যেন চোখের সম্মুখে স্থূলজীবন্ত প্রত্যক্ষ করিয়া সত্যে উপন্যাসে, অতীতে বর্তমানে, নূতনে পুরাতনে, মনের মধ্যে মিশিয়া গিয়া, সমগ্র মনুষ্যজাতির বিস্ময়জনক পূর্বাপর মহান একত্ব উপলব্ধি করিতে লাগিলাম। আজিকার দিনের মনুষ্যজাতির শীর্ষস্থানীয় বৈজ্ঞানিক মহাবুদ্ধি, এবং প্রবলপ্রতাপ রাজা মহারাজা সকলেরই ছবি ইহাদিগের ক্যামেরার মধ্য দিয়া প্রস্ফুটিত দেখিলাম।

আদিম অসভ্যজাতি শুনিয়া যদি কেহ মনে করেন ইহারা কাফ্রিদিগের মতো ভীষণমূর্তি, অথবা ভুটিয়াদিগের মতো খর্বনাসা, বিশাল-মাংসপেশি, তাহা হইলে ভুল করিবেন। ইহাদের চেহারায় অসভ্যত্ব, অনার্যত্ব বিশেষ কিছুই নাই। আর্যগণ সন্তুষ্ট হইবেন কিনা জানি না, অধিকাংশেরই গঠন আকৃতি তাঁহাদেরই বরঞ্চ অনুরূপ। ইহারা সুশ্রী, সুগঠিত, বলিষ্ঠকায় বলিয়া ইংরাজ বংশতত্ত্ববিদগণ ইহাদের অনার্যত্ব সম্বন্ধেও সন্দেহ প্রকাশ করেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা ইহাদের মূল ইতালীয় হইতে, কেহ বা ইহুদিজাতি হইতে, কেহ বা আরবজাতি হইতে টানিতে চেষ্টা করেন।

আমরা ইহাদের যত জনকে দেখিয়াছি তাহার মধ্যে টোডা পুরুষগণের মুখশ্রীই

অধিকতর সুন্দর। এক এক জনের তো একেবারে গ্রিক প্রস্তর-ছবির ন্যায় সৌম্যগঠন, বর্ণ কাহারও কালো নহে, বেশির ভাগ শ্যাম; কেহ কেহ সামান্য গৌরবর্ণ। ইহাদের স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই ভিতরে ঘাগরার ন্যায় কটিবন্ধ বস্ত্র, একখানা লম্বা আর আমরা যেমন করিয়া শাল জড়াই অনেকটা সেই রকম ধরনে চাদর গলা হইতে পা পর্যন্ত জড়ানো; ঈষদীর্ঘ কুঞ্চিত কেশ আস্কন্ধলম্বিত। এইরূপ বেশ বলিয়া যাহাদিগকে সুশ্রী দেখিতে তাহাদিগকে আরও ছবির মত দেখায়। ইংরাজ আসিবার আগে নাকি ইহারা নগ্ন থাকিত, গভর্নমেন্টের আইনে এখন ইহারা কাপড় পরিতে বাধ্য হইয়াছে। যাহারা দূর অরণ্যে থাকে তাহাদেরও শুনিলাম এখন এইরূপ বেশ। নিতান্ত শিশুদিগকে ইহারা এই চাদরের মধ্যে বুকে করিয়া রাখে। যে সকল বালক বালিকারা একটু চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে পারে তাহাদের কাহারও কাহারও গাত্রে ইংরাজি জ্যাকেট, ফ্রক দেখিলাম। টোডাগণ নোংরা বলিয়া তাহাদিগের একটা কুনাম আছে। মহীশূর রাজভৃত্য বলিয়াছিল—ইহারা ভাত খাইয়া মাথায় হাত মোছে। কিন্তু দেখিয়া তাহাদিগকে সেরূপ অপরিষ্কার মনে হইল না; এখন যখন জিজ্ঞাসা করা গেল, "তোমরা খাইয়া মাথায় হাত মোছো?" তখন জিজ্ঞাসিত যুবতি ঘৃণার ভাবে মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, "ছি ছি! আমরা হাত ধুই।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমরা স্নান কর?" সে বলিল, "হ্যাঁ, দুই একদিন অন্তর আমরা নদীতে গিয়া স্নান করি।" তাহাদের কাপড় যদিও পরিষ্কার ধোপ নহে, কিন্তু নিতান্ত কালো কিটকিটেও নহে, কাপড় ধোবার বাড়ি না দিয়া জলে কাচিলে যেরূপ রং হয় সেই রকম। সাধারণত যুবতিগণ বেশ ফিটফাট, সাজসজ্জার দিকে বিশেষ একটু মনোযোগী। সকলেরই সমুখের চুল বেশ পরিপাটি করিয়া আঁচড়ানো, হাত মুখ দাঁত মার্জিত পরিষ্কার, কেহ কেহ কেশগুচ্ছ কুঞ্চিত করিয়া মাথার মধ্যে গুঁজিয়া রাখিয়াছে, উপযুক্ত সময়ে ঝুলাইয়া দিবে, কাহারো অলক দ্বিধাযুক্ত সীমন্তের পার্শ্বে ও পৃষ্ঠদেশে আলম্বিত। কী করিয়া তাহারা চুল কোঁকড়ায় আমরা দেখিতে চাহিলাম। একজন তাহার মাথার গুটানো অলকগুচ্ছ খুলিয়া আবার আঙুলে জড়াইয়া দেখাইয়া দিল। ইহাদের কাহারও কাহারও গাত্রে অল্পস্বল্প রৌপ্যালংকার। উলকিভূষাও ইহাদের দেখিলাম, কিন্তু অধিক নহে। চেহারায় না হউক, ইহাদের বাসস্থলে, আচারে-ব্যবহারে অনার্যত্ব অসভ্যত্ব প্রত্যক্ষ। বাঙ্গালার সাঁওতাল, পশ্চিমের ভিল জাতি সভ্যতর জাতির সংস্পর্শে প্রায় তদনুরূপই হইয়া পড়িয়াছে ; কিন্তু টোডা জাতির আদিমত্ব অল্পই পরিবর্তিত দেখিলাম। তাহার প্রধান কারণ, অপেক্ষাকৃত অল্পদিন ইহারা সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়াছে,—দ্বিতীয়ত, এখনও ইহারা বিজনবাসী। পারতপক্ষে ইহারা লোকালয়ে ঘেঁষিতে চাহে না ; যেখানে যেখানে অরণ্য সেই সেইখানে মাত্র ইহাদের বসতি। তাহাও শহরের কাছাকাছি অরণ্যে অল্প টোডারই বাস। সুদূর উচ্চ নিভৃত অরণ্য—যেখানে লোকালয়ের সহিত কোনো যোগ নাই, উৎকামন্দ শহর হইবার পর অধিকাংশ টোডা সেই সকল স্থানে পলায়ন করিয়াছে। কখনো-কখনো তাহাদের কেহ ঘৃতাদির বিনিময়ে লবণ প্রভৃতি পণ্যদ্রব্যাদি লইবার জন্য মাত্র শহরে আসে।

উৎকামন্দেব চারিদিকেই সোলা, আমরা কেবল ফার্নহিল ও সুলতান সোলায় গিয়াছিলাম, উভয়স্থলেই টোডার বাস দেখিলাম। নিভৃত অরণ্য প্রান্তের মুক্ত প্রশস্ত বিজন-স্থলে কাছাকাছি তিন চারিখানি কুটির, ইহাই এক এক অরণ্যের টোডাপাড়া। এমন এক

একটি পাড়ায় স্ত্রীপুরুষ ছেলেমেয়ে মিলিয়া ২০/২৫ জনের রাত্রিকালের আশ্রয়স্থল। কুটিরের আকার ধনুকাকৃতি, তিন দিক বন্ধ, এক দিক একটুখানি খোলা; একেবারে গুড়িসুড়ি না মারিয়া সেই অতিনিম্ন দ্বারপথে গৃহপ্রবেশ করা যায় না। দ্বারের কাছে বসিয়াও মাথা নীচু করিয়া উঁকি মারিয়া তবে গৃহমধ্য আমাদের নজরে পড়িল। কুটির মধ্যে একদিকে একটুখানি রোয়াক, তাহাই শয়নস্থল, অন্য দিকে উনুনের কাছে বাসনকোসন প্রভৃতি সাজানো। এমন তিন চারি দল স্বামী স্ত্রী কিংবা বিবাহিত অবিবাহিত দল মিলিয়া একসঙ্গে সেই রোয়াকে শয়ন করে।

মনুষ্যজাতির আদিম অবস্থায় যখন বস্ত্রাদি প্রস্তুত-কৌশল অনাবিষ্কৃত ছিল—যখন কুটির নির্মাণ সহজ ছিল না, তখনকার কালে শীত নিবারণের জন্য এরূপ একত্র শয়ন আবশ্যক হইয়া পড়িত সন্দেহ নাই ; কিন্তু সভ্যতার সুবিধার এত সংস্পর্শে আসিয়াও তাহারা সেই হীন আদিম প্রথা এখনও রক্ষা করিতেছে দেখিয়া বড়ো একটা অসোয়াস্তি বোধ হইতে লাগিল। ইচ্ছা করিতেছিল এই প্রথার ত্যাগ তাহাদের পক্ষে কতদূর মঙ্গলজনক সুখজনক তাহা বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিই। আমরা ভালো করিয়া বলিতে পারিলেই যেন তাহারা এ প্রথার পরিবর্তন করিবে! কিন্তু বুঝাই কীরূপে? তাহাদের ভাষা জানি না—তাহারাও হিন্দুস্থানি বোঝে না; মহীশূর-রাজভৃত্য আমাদের মধ্যস্থ, আমরা সামান্য যে সকল প্রশ্ন করিতেছি তাহাই সে ঠিক জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছে কি না বিলক্ষণ সন্দেহ হইতেছিল। তথাপি আমরা এ সম্বন্ধে উপদেশ দিতে ত্রুটি করিলাম না। তাহাতে উত্তর পাইলাম, এ নিয়ম তাহাদের ভাঙিবার নয়। এমনকি যদি এক পাড়া হইতে অন্য পাড়ায় ৮/১০ জন অতিথি আসিয়া কিছুদিন বাস করে তাহা হইলে উভয় দলই এই কয়খানি কুটিরের মধ্যে কোনো রকমে মাথা গুঁজিয়া থাকিবে—তথাপি স্বতন্ত্র বাসস্থানের বন্দোবস্ত করিবে না।

সুখের বিষয় তাহাদের বিবাহপ্রথাও এইরূপ অপরিবর্তনীয় অভঙ্গানীয় জ্ঞানে দৃঢ়ভাবে, এখনও আলিঙ্গিত নহে। সমস্ত ভ্রাতার এক স্ত্রী গ্রহণ করাই ইহাদের জাতিগত নিয়ম, কিন্তু দুই অরণ্যের মধ্যে কোনো রমণীরই একাধিক স্বামী দেখিলাম না। জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলাম, "না, এখন সকল ভ্রাতাই ভিন্ন ভিন্ন স্ত্রী গ্রহণ করে।" সকলেই আপন আপন স্ত্রীকে আমাদের দেখাইয়া দিল। মহীশূর-রাজের এক বর্গা অর্ধবৃদ্ধ কুলি সর্দার আছে, তাহার কিন্তু একথা বিশ্বাস হইল না। সে বলিল, "মিছে কথা বলিতেছে। উহাদের দেখাদেখি আমাদেরও মধ্যেও ওই প্রথার চলতি হইয়াছে, এই আমরা কয় ভ্রাতাতে এক স্ত্রী বিবাহ করিয়াছি, আর ইহাদের কাহারও সেরূপ নাই—এও কি কখনও হয়! মিথ্যা বলিতেছে"।

যে টোডা পুরুষ আমাদের প্রশ্নের উত্তর করিতেছিল সে এই কথা শুনিয়া লজ্জিত ভাবে বলিল, "আগে ওইরূপ হইত বটে, এখন কিন্তু আর সেরূপ হয় না।"

বর্গার কথা যদিই বা সত্য হয়, এখনও টোডাদিগের পূর্ব বিবাহপ্রথা যদি বা পূর্ণলোপ না হইয়া থাকে তথাপি এ কথায় তাহারা যে লজ্জা পাইতে শিখিয়াছে ইহাই যথেষ্ট শুভ লক্ষণ!

প্রত্যেক টোডা পাড়ায় বাসকুটির কয়খানি হইতে দূরে একখানি করিয়া শূন্য কুটির থাকে। ইহা টোডাদিগের দেবস্থান। দেবস্থান শুনিয়া ভাবিলাম, ইহার মধ্যে বুঝি বা

ইহাদের পূজনীয় কোনো প্রস্তর বা কাষ্ঠমূর্তি আছে। কিন্তু শুনিলাম তাহা নহে, এইখানে ইহারা মহিষ দুগ্ধ আনিয়া মাখন ঘৃতাদি প্রস্তুত করে। ইহাই দেবপূজা। স্ত্রীলোক এ গৃহে প্রবেশ করিতে পারে না। ইহা পুরুষেরই কার্য।

ফার্নহিল সোলার দেবস্থানের কাছে আসিয়া আমরা ভিতর হইতে একটা ঘড়ঘড়ানি শব্দ শুনিতে পাইলাম। আমাদের সঙ্গের একজন টোডা চিৎকার করিয়া কী বলিল ; তৎক্ষণাৎ কৌপীনধারী এক টোডা যুবা দেবস্থানের দ্বারদেশে দেহ মস্তক অবনত করিয়া উঁকি মারিল। সে ভিতরে মাখন করিতেছিল। আমরা মাখন তুলিবার যন্ত্র দেখিতে চাওয়ায় সে তাহার ঘোলমহুনি আনিয়া আমাদের দেখাইল।

দেবস্থানের অর্থ কী জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল, "যেখানে হারিয়া ডারিস, অর্থাৎ ঈশ্বর থাকেন?"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"ঈশ্বর কে?"

উত্তর : যিনি এসব সৃষ্টি করেছেন।

জিজ্ঞাসা : তিনি কি ওইখানে থাকেন?

উত্তর : আমাদের পূজা লইতে ওইখানে তিনি আসেন। দুধ ঘিতে তিনি সন্তুষ্ট।

এ সকল কথা তাহারা কতদূর কী বলিল, আর আমরাই বা মহীশূর-ভৃত্যের নিকট কতদূর বা পরিবর্তিত আকারে শুনিলাম—তাহা কিন্তু ঠিক বলিতে পারি না।

ইহাদের সকলেরই অবস্থা বেশ স্বচ্ছল, কেহ দরিদ্র নহে। ২৫/৩০/৪০/৫০ করিয়া এক এক জনের মহিষ আছে, তাহা হইতে ইহারা প্রচুর ঘৃত-মাখনাদি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে। যদি কোনো টোডার মহিষ মরিয়া যায়, তবে অন্য টোডারা নিজেদের মধ্যে হইতে দুই একটি করিয়া দান করিয়া তাহার মহিষ-সংখ্যা পূর্ণ করিয়া দেয়। মহিষ রাখিতেও ইহাদের কোনো খরচ নাই, তাহারা সমস্ত দিন পাহাড়ে চরিয়া খায়, আর বিকালে টোডা রমণীর ডাকে কুটির সন্নিধানে আসিয়া দুগ্ধ দোহন করিতে দেয়—তাহার পর রাত্রে কুটিরের কাছাকাছি যেখানে সেখানে শুইয়া থাকে। মহিষগণ ক্ষুদ্র টোডা বালকের হস্তেও পরিচালিত হইয়া থাকে, কিন্তু শহরের লোকের পক্ষে ইহারা ভয়ানক। যে পাহাড়ে মহিষ চরে সেখানে কেহ আসিতে চাহে না। বিশেষত ইংরাজ ঘোড়-সওয়ার দেখিলে ইহারা মহা ক্ষেপিয়া আক্রমণ করে। মহিষ ঘৃত দুগ্ধাদি বা বাসস্থানের জন্য ইংরাজ গভর্নমেন্টকেও ইহাদের কোনো কর দিতে হয় না। ইংরাজ নীলগিরি লইবার আগে এ স্থান ইহাদেরই ভোগদখলে ছিল বলিয়া গর্ভনমেন্ট ইহাদের অধিকার মানিয়া চলেন, বাস অরণ্যভূমি কতকাংশ করিয়া তাহারা একেবারে নিষ্কর দান পাইয়াছে, কিন্তু ইহাতে তাহাদের বিক্রয়াধিকার নাই।

ইহাদের এত স্বচ্ছল অবস্থা, গভর্নমেন্টের ইহাদের প্রতি এত অনুগ্রহ, আবশ্যকের অধিক ইহাদের উপার্জন, তথাপি ইহাদের সন্তানাদি নিতান্ত অল্প। Survival of the fittest এখানে প্রত্যক্ষ দেখা যায়। প্রতি অরণ্যে ২০/২৫ জনের বেশি টোডা নাই, দূর অরণ্যেও শুনিলাম টোডার সংখ্যা ক্রমশই কমিয়া আসিতেছে। টোডারা অত্যন্ত অলস। স্ত্রীলোকের গৃহকার্য এবং পুরুষের ঘৃতাদি প্রস্তুত ও বাজারের ক্রয়বিক্রয় কার্য ছাড়া অন্য কোনো কাজ নাই। ইহারা কৃষিকার্য সহজেই করিতে পারে, কিন্তু তাহা করে না ; চাকরি

করা তো নিতান্ত অপমানজনক জ্ঞান করে। আসল কথা ইহাদের অন্য কোনো কাজের আবশ্যক নাই। ঘৃত বিক্রয়ে ইহারা যাহা উপার্জন করে তাহাতে বেশ বাবুগিরি করিয়া থাকিতে পারে—দুঃখের বিষয় ইহারা বাবুগিরি করিতে জানে না, অর্থের প্রকৃত ব্যবহার এখনও ইহাদের নিকট অজ্ঞাত। অন্য সভ্যতর জাতি ইহাদের মতো স্বচ্ছল অবস্থায় যেরূপ আয়াস-আরাম সুবিধা কিনিতে পারিত—ইহারা উপায় সত্ত্বেও তাহা করে না। বন্য ফলমূল দুধই ইহাদের প্রধান আহার। গোধূম চাল আলুও আজকাল ইহারা খাইতে আরম্ভ করিয়াছে। মাছমাংস ইহারা খায় না, অন্যান্য তরিতরকারি মিষ্টান্ন দ্রব্যাদি শহর হইতে যাহা সহজেই পাইতে পারে—তাহাও তাহারা দৈবাৎ কেনে।

ফার্নহিল পাড়ায় দেখিলাম একজন স্ত্রীলোক একখানা লম্বা ভাঙা পাথরের শিল করিয়াছে, আর তাহার উপর একটা মোটা পাথরের টুকরা রাখিয়া তাহাই নোড়া করিয়া গম পিষিতেছে। শহর এত কাছে সেখান হইতে একটা জাঁতা আনিলেই আটা করিবার কত বেশি সুবিধা হয়—কিন্তু সেদিকে তাহাদের লক্ষ নাই।

নূতন আয়েসের মধ্যে তামাক ও নস্যের আয়েস তাহারা বুঝিয়াছে, আর বুঝিয়াছে ভিক্ষার আয়েস। দাস্যবৃত্তি তাহারা অপমানজনক জ্ঞান করে—কিন্তু ভিক্ষায় তাহাদের অপমান নাই। মেমসাহেবেরা তাহাদিগকে দেখিতে গেলেই তাহারা বকশিস রূপ কর চাহে। আমাদিগের নিকটেও অবশ্য চাহিল, আমরা কিন্তু তখন তাহাদিগকে কিছু না দিয়া পরদিন বাড়ি আসিতে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলাম। তাহাদের নৃত্যগীতের পরিচয় লওয়াটাই অভিপ্রায়।

পরদিন উভয় অরণ্য প্রায় খালি করিয়া আমাদের বাড়িতে দলে দলে টোডা স্ত্রী-পুরুষেরা আসিয়া উপস্থিত। আগে তাহাদিগের বাসস্থলে দেখি নাই এমন দুই চারিটি নূতন মুখও দেখিলাম, তাহারা শুনিলাম সেদিন শহরে গিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে একজন যুবা চমৎকার সুশ্রী দেখিতে। বর্ণ গৌর, সুন্দর সুদীর্ঘ দেহ, সুঠাম উন্নত নাসা, আয়ত চক্ষু, কেশহীন চারু অধরোষ্ঠ, ঈষৎ লম্বিত চিবুক, সুশ্রী ললাটের উপর সুগঠিত মস্তকে কুঞ্চিত কেশরাশি দ্বিধা বিভক্তভাবে আলম্বিত, এবং পূর্বোক্ত ছবির মতো সুদীর্ঘ বস্ত্রে অঙ্গাবরিত; যেন অ্যাপোলোর ছবি মূর্তিমন্ত। তাহার একখানি ফটোগ্রাফ তুলিয়া দেশে পাঠাইতে ভারি ইচ্ছা করিতেছিল, কিন্তু সুবিধা হইয়া উঠিল না। তাহার বাপও বেশ দেখিতে, তবে এখন বুড়ো হইয়াছে আর রং অমন পরিষ্কার নহে। ইহার মাকে আমরা দেখি নাই, সম্ভবত মায়ের রং পাইয়া থাকিবে। শুনিয়াছি এক একজন টোডা রমণীর রং হাতির দাঁতের মতো নাকি ধবধবে, এবং চমৎকার সুশ্রী মুখ; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমরা টোডা নারীদিগের মধ্যে কাহারও তেমন মোহিনী মূর্তি দেখি নাই। অন্য সোলায় যাইলে হয়ত দেখিতে পাইতাম।

টোডার নাচ বড়ো অদ্ভুত। স্ত্রীলোকে নাচে যোগ দেয় না। ৭/৮ জন পুরুষে মিলিয়া হাত ধরাধরি করিয়া গোল হইয়া দাঁড়ায়, দাঁড়াইয়া ও-হাউ হাউ ও-হাউ হাউ করিয়া চিৎকার করিতে করিতে তালে তালে একসঙ্গে পা ফেলিয়া ফেলিয়া ঘুরিতে থাকে। আসল কথা ইহা আনন্দ নৃত্য নহে—মৃত্যুৎসব। কেহ মরিলে তাহারা মৃতব্যক্তিকে লইয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন করে—প্রতি গ্রামে সকলে মিলিয়া উক্তরূপে শব বেষ্টন করিয়া

ঈশ্বরস্তব করে। গ্রাম প্রদক্ষিণ শেষ হইলে তখন মৃতব্যক্তি স্বগ্রামে নীত হইয়া তাহার স্বকুটিরে সমস্ত তৈজস অলংকার দ্রব্যাদির সহিত দগ্ধীকৃত হয়। অধুনা এ প্রথার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কেহ মরিলে তাহার কুটির ও দ্রব্যাদি তাহার সহিত ভস্মসাৎ না করিয়া একখানি স্বতন্ত্র কুটির নির্মাণ করিয়া তাহাতে শবদাহ করা হয়, এবং টোডাগণ সকলে মিলিয়া দুই একখানি করিয়া তৈজসপত্রাদি যাহা দান করে তাহাই মৃতব্যক্তির সহিত পোড়ানো হয়।

শবদাহ হইয়া গেলে যুবা পুরুষেরা শড়কি দিয়া ৮/১০টা মহিষ নিহত করে এবং টোডা নারীগণ সুর করিয়া কাঁদিতে থাকে। ইহাই তাহাদের গান। ইহাদের মেয়েরা যেমন নাচে না, পুরুষেরা তেমনি গাহে না। আমরা গাহিতে বলায় মেয়েরা গালে হাত দিয়া সুর করিয়া কাঁদিতে বসিল, আর টক খাইতে খাইতে বা বেশি শীত লাগিলে যেমন লোকে মুখে হি হি শব্দ করে—কান্নার সুরের মাঝে মাঝে সেইরূপ হি হি করিতে লাগিল। ইহাই টোডাদিগের নৃত্যগীত। টোডা নারীরা মহিষদিগকে মাঠ হইতে গৃহে আহ্বানকালে এইরূপ সুর করিয়া ডাকে। ইহারা মাছ মাংস খায় না, সুতরাং মহিষ-বধ মৃত্যুভোজের জন্য নহে। আমার মনে হয় মৃত ব্যক্তি লোকান্তরে তাহার সম্পত্তি ভোগ কবিবে এই বিশ্বাসে—তাহার সঙ্গে তাহার কুটির তৈজসপত্র মহিষ প্রভৃতি সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট করা হয়। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, মরিলে কী হয়। উত্তর পাইলাম, "ওরুনরে (মহালোক) যায়।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভূত বিশ্বাস করো?"

উত্তর : "না, আমরা জঙ্গালে থাকি, কখনও ভূত দেখি নাই ; ভূত বিশ্বাস করি না।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "মৃত আত্মাকে পূজা কর?"

উত্তর : না, একবার মরিয়া গেলে তাহার কথা আর আমরা ভাবি না।

এই মৃত্যুৎসব ছাড়া আর কোনোরূপ উৎসব ইহাদের নাই। এমনকি বিবাহও ইহাদের পর্বদিন নহে। বিবাহে কোনো আমোদ-প্রমোদ হয় না। বাপ মায়ে স্থির করে যে আমার কন্যার সহিত তোমার পুত্রের বিবাহ দিব, সেই স্থির করাকেই তাহারা বিবাহ বলে। তাহার পরে কোনো এক সময়ে কন্যা স্বামীর গৃহে গিয়া বাস করে। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম—স্ত্রীপুরুষে পছন্দ করে বিবাহ করে, না বাপ মা তাহাদের বিবাহ দেয়?

বলিল—'বাপ মা।" জিজ্ঞাসা করিলাম—"কত বয়সে তাহাদের বিবাহ হয়?"

বলিল—স্ত্রীলোকের ৩/৪ বছর বয়সে. পুরুষের কিছু বেশি ৮/১০ বছর।

বিবাহে আমোদ হয়?

বলিল—"না। বাপের বাড়ি থেকে বড়ো হলে স্বামীর কাছে যায় মাত্র।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—তোমরা ছেলে হইলে সন্তুষ্ট হও, না মেয়ে হইলে?

উত্তর—ছেলে হইলে।

জিজ্ঞাসা : কে বিষয় পায়?

উত্তর : ছেলে।

এ সকল প্রথা কতদূর তাহাদের নিজের, কতদূর এখন গ্রহণ করিয়াছে বোঝা গেল না।

সে দিন নাচগানের শেষে তাহাদের মুড়ি নারকেল মিষ্টান্ন প্রভৃতি আতিথ্যদান করিয়া ও নগদ মুদ্রা কিছু দক্ষিণা দিয়া বিদায় করা গেল।

টোডাদিগের নাচ দেখিলাম। বর্গাকুলিরা ধরিয়া পড়িল, আমাদেরও নাচ দেখিতে হইবে।

একদিন তাহারাও দলে দলে আসিয়া হাজির। ইহাদের নাচগান নাচগানের মতো বটে। বৈষ্ণবেরা যেমন হাত তুলিয়া তালে তালে পা ফেলিয়া নাচে, অনেকটা সেই রকম। গানেরও সুর আছে, সঙ্গে সঙ্গে ঢোলক বাজায়। নিজেদের নাচ শেষ করিয়া ইহারা টোডাদের নাচও নাচিল। বর্গা স্ত্রীলোকেরা নাচগান করে না, সাধারণ ভারতনারীর মত ইহা তাহাদের পক্ষে নিন্দনীয়। একখানা ইংরাজি পুস্তকে পড়িয়াছিলাম টোডারা বর্গাদিগকে নিজেদের অপেক্ষা হীন মনে করে, বর্গারাও আপনাদিগকে নীচু জ্ঞানে টোডাদিগকে মান্য করিয়া চলে ; কিন্তু মহীশূর-ভৃত্য অনরূপ জানাইল—বলিল, টোডাগণ বর্গাদিগকে উচ্চজাতি ভাবিয়া সম্মান প্রদান করে। আমরাও দেখিলাম আমাদের বাড়িতে টোডাগণ বর্গা সর্দারের নিকট আশীর্বাদ গ্রহণ করিতে লাগিল। টোডারা নিজেদের মধ্যে মাথায় পা তুলিয়া দিয়া আশীর্বাদ করে।

নীলগিরিতে কোটা কুড়ুম্বা ইরুলা প্রভৃতি নামে আরও কয়েকজাতি পাহাড়ি আছে। ইহাদের মধ্যে কুড়ুম্বারা জাদুকর বলিয়া খ্যাত। ইহারা শহর হইতে দূরস্থিত অরণ্যে বাস করে। বর্গারা ইহাদের অত্যন্ত ভয় করে, বর্গা কেন এ দেশের অন্যান্য অশিক্ষিত লোকেও ইহাদিগকে ভয় পায়, কেবল টোডারা ভয় করে না। মহীশূর-ভৃত্যের নিকট গল্প শুনিলাম, কুড়ুম্বা জাতির পশু বানাইবার ক্ষমতা আছে, নিজেরাও বাঘ প্রভৃতির বেশ ধরিয়া লোককে ভয় দেখায়। আর ভিক্ষা চাহিলে যদি কেহ ভিক্ষা না দেয় তো তৎক্ষণাৎ তাহাকে পশু বানাইয়া ফেলে। এইরূপ মানুষ-পশুর কেবল লেজ থাকে না ; তাহা হইলেই বোঝা যায় সে জাদুপ্রাপ্ত। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কি কখনও এরূপ মানুষ-পশু দেখিয়াছ?" সে বলিল, "দেখি নাই বটে ; কিন্তু ইহা মিথ্যা নহে ; সত্যই কুড়ুম্বারা এরূপ করিয়া থাকে।" দেখিলাম তাহার বিশ্বাস আমাদের কথায় ভাঙিবার নহে।

নীলগিরির অনেকস্থলে ঘেঁষাঘেষি পাহাড়ে পুরাতন সমাধি-স্তূপ দেখা যায়। পুরাতত্ত্ববিদগণ ইহার কোনোটাই প্রায় খুঁড়িতে বাকি রাখেন নাই। খুঁড়িয়া ইহার মধ্যে যে সকল দগ্ধ পিত্তলপাত্র, অস্ত্র, পশু ও মনুষ্যের মৃন্মূর্তি প্রভৃতি যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে, সকলই তাঁহারা লুঠ করিয়াছেন, এমনকি অঙ্গার পর্যন্ত। অনেক মূর্তি তাতার উষ্ণীষধারী। কোনো কোনো মতে এই সকল মূর্তি টোডাদিগের সাইথীয় পূর্বপুরুষদিগের। কিন্তু এ সম্বন্ধে আপত্তি এই, টোডাগণ নিজেদের বিজাতীয় উৎপত্তি স্বীকার করে না, স্থানীয় নিবাসী বলে ; দ্বিতীয়ত, এই সকল সমাধিও তাহারা তাহাদিগের পূর্বপুরুষদিগের বলিয়া মানে না, সেই জন্য অবাধে খনন ও লুণ্ঠন করিতে দেয়। টোডাদিগের এবং অন্যান্য পাহাড়িদিগের মতে পাণ্ডিয়া বংশ বহু পূর্বে নীলগিরিতে রাজ্য করিতেন, এ সকল সমাধি তাঁহাদিগেরই। নীলগিরির পুরাতন গভীর জঙ্গলের মধ্যেও স্থানে স্থানে যেরূপ ভগ্নাবশেষ দুর্গ-চিহ্ন এবং দেবমূর্তি পাওয়া যায় এবং তৎসংলগ্ন দেব ঋষি ও রাক্ষসের গল্প শুনা যায়, তাহাতে বহুপূর্বে ইহা যে আর্যদিগের নিবাসভূমি ছিল তাহাতে সন্দেহ থাকে না। সম্ভবত পাণ্ডুবংশোদ্ভবেরা এখানে রাজ্য করিয়াছিলেন, তাঁহারাই পাণ্ডিয়া নামে খ্যাত।



নীলগিরির পাহাড়িয়া জাতি

মোহাম্মদ মোদাব্বের

নীলগিরির পার্বত্য অঞ্চলটি সর্বভারতের পার্বত্য জাতির কেন্দ্রভূমি। পাহাড়িয়া জাতির বিভিন্ন সম্প্রদায় এখানে বর্তমানে বাস করিতেছে। তবে এখানকার আদিম ও অভিজাত শ্রেণির পাহাড়িয়াদের কথা বলিতে গেলে সর্বপ্রথমে মনে আসে টোডা জাতির কথা। এরা Sea level হইতে সাত হাজার ফিট উর্ধ্বে উতকামন্ডের ঢালু ভূমিতে বাস করে। টোডাদের আদিকথা আমরা খুব বেশি জানিতে পারি নাই। তবে তাহাদের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিলে আমাদের অনুমিত হয় যে, অতি পুরাকালে দ্রাবিড় জাতি (Dravadians) যখন পশ্চিম এশিয়া ত্যাগ করিয়া পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূভাগে বাস করিতে আসে, এরাও প্রায় সেই সময় উত্তর ভারতের ওপারের পার্বত্য-ভূমি পার হইয়া ভারতে তাহাদের ভাগ্যান্বেষণে বহির্গত হয়।

ভাগ্য তাহাদেব ফিরিল। বর্তমান নীলগিরি তাহার বিস্তৃত বন্ধুর বক্ষে এই নবাগত প্রকৃতি সন্তানকে আঁকড়িয়া ধরিল। ক্রমে বিদেশ স্বদেশ হইল এবং এতই আপন হইল যে, পরে টোডারা নীলগিরিকে তাহাদের আদিম বাসভূমি বলিয়া স্বীকার করিল, শুধু স্বীকার নয়—দৃঢ়কণ্ঠে দাবি করিল। এই দাবির মূল্য যখন বাড়িল তখন তাহারা আর একটু উপরে উঠিয়া নীলগিরির পাহাড়িয়াদের প্রভু বলিয়া ঘোষণা করিল। তারপর টোডারা স্থানীয় অন্য পার্বত্য জাতির নিকট হইতে একপ্রকার কর (gudu) আদায় করিতে আরম্ভ করে। ইহা হইতে তাহাদের প্রভুত্বের দাবিকে উপেক্ষা করা যায় না। এখনও এই টোডারা অন্য পার্বত্য জাতিকে জমি বন্দোবস্ত দেয় ও লাভ স্বরূপ ফসল বা খাজানা আদায় করে।

ইহাদের প্রধান পেশা কৃষিকার্য। বন্য মহিষ, গোরু প্রভৃতিও এরা পালন করিয়া থাকে। গো-মহিষের দুগ্ধজাত দ্রব্যই ইহাদের প্রধান খাদ্য। ইহাদের শরীরের গঠন, সুন্দর আকৃতি-প্রকৃতি

স্বভাবতই সভ্য-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বসন-ভূষণের দিক হইতেও এরা অনেকটা উন্নত শ্রেণির পর্যায়ে পড়িতে পারে। এদের কাপড় পরার ধরন অদ্ভুত রকমের। যদিও এরা খুব মোটা মোটা কাপড় পরে তবুও পরার ধরনের জন্য ইহাদিগকে মন্দ দেখায় না। এদের স্ত্রীপুরুষেরা সকলেই সমান ধরনের ডোরা কাপড় পরে। পরিধানের কোনো পার্থক্যও দেখা যায় না। নারী পুরুষ নির্বিশেষে ইহারা পিত্তল ও রৌপ্যের বলয় হস্তপদের অলংকার হিসাবে ব্যবহার করে। আচার-ব্যবহারও ইহাদের অনেকটা আধুনিক সভ্য-জাতির সমতুল্য। প্রাতে ইহারা সূর্যকে বন্দনা করে এবং দিবসের কর্মশেষে গৃহে ফিরিয়া সন্ধ্যা-প্রদীপকে প্রণাম জানায়। কখনও কোনো সম্মানিত ব্যক্তির সহিত যদি ইহাদের অকস্মাৎ সাক্ষাৎ হয় তাহা হইলে ইহারা তাদের দুই হাতের সমস্তগুলি আঙুল নাকে ঠেকাইয়া আগন্তুকের প্রতি সম্মান দেখায়। যখন কোনো দেবমন্দিরে বা তীর্থস্থানে যায় তখনও এরা ঠিক এইরূপভাবেই দেবতাদের প্রতি তাদের ভক্তি-অর্ঘ্য প্রদান করে।

টোডাপল্লিকে সাধারণত উহাদের ভাষায় “মন্ড” বলে। ৫/৬টি কুঁড়েঘর ও তৎসংলগ্ন গোয়াল ঘর, খানিক খোলা জায়গা, গোচারণভূমি প্রভৃতি লইয়া এক-একটি টোডা পল্লি গঠিত। এরূপ দেখা গিয়াছে যে ইহারা উন্নত শ্রেণির মানুষের ন্যায় নিজেদের আবাসস্থল উচ্চ প্রাচীর দিয়া ঘিরিয়া রাখে। কিন্তু তাই বলিয়া ঘরের বা পল্লির মায়া তাহাদিগকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। আবশ্যক হইলে বা প্রাকৃতিক উপদ্রব অসহ্য হইলে উহারা সদলবলে পল্লির মায়া কাটাইয়া অন্যত্র আশ্রয়স্থলের সন্ধানে যাত্রা করে। উহাদের ঘরের কেহ যদি মরিয়া যায় তাহা হইলেও উহারা সে গৃহ ত্যাগ করে—অবশ্য সাময়িকভাবে। কিছুদিন পরে আবার তাহারা পরিত্যক্ত গৃহে ফিরিয়া আসে।

টোডাদের গৃহ নির্মাণের ধারা অদ্ভুত রকমের। মাটির উপর খড়-পাতার চাল তোলা হয় এবং সে চাল ডিম্বাকৃতি হইয়া চারিদিকে মাটি স্পর্শ করে। ভিতরে প্রবেশের পথ ১ হাত হইতে ২ হাত মাত্র প্রশস্ত। এই পথে হামাগুড়ি দিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে হয়। গৃহগুলি দরজা-জানালা-বিহীন। গৃহের অভ্যন্তরে—যে স্থানটিতে শয়ন করা হয়—তাহা মাটি দিয়া উঁচু করিয়া গাঁথা। এই উঁচু বেদির একপার্শ্বে তাহারা তাহাদের রন্ধন-কার্য সারিয়া লয়।

ইহাদের প্রাত্যহিক কর্ম—প্রত্যুষে নিদ্রা হইতে উঠিয়া সূর্যকে প্রণাম করা ও তৎপর গো-মহিষাদির দুগ্ধ দোহন করা। ইহা ছাড়া যাহারা কৃষিকার্য করে তাহারা সারাদিন মাঠে কাটাইয়া দিনান্তে গৃহে প্রত্যাগমন করে। গৃহে ফিরিয়া সন্ধ্যাপ্রদীপকে প্রণাম জানাইয়া তাহারা সেদিনের মতো সকল কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করে।

টোডাদের ধর্ম্মমত যে কী, তাহা তারা নিজেরাই জানে না। এই জাতির আদিম ইতিহাস যেমন রহস্যপূর্ণ, এদের ধর্ম্মমতও তেমনি তমসাবৃত। এ সম্বন্ধে বিশেষ কোনো সূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। তবে তারা উসুরি স্বামী নামক কল্পিত দেবতাকে জগতের সৃষ্টি ও লয়ের কর্তা বলিয়া মনে করে। যারা অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত—বাহিরের সভ্যতার আলোক যাহারা পাইয়াছে—তাহারা ক্রমে ক্রমে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হইয়া পড়িতেছে। আধুনিক শিক্ষিত টোডার ছেলে মেয়েরা উতকামন্ড স্কুলে শিক্ষালাভ করিতেছে।

টোডাদের এ বিশ্বাস আছে যে মরণের পরে মানুষকে অন্য এক জগতে যাইতে হয়, এবং

বিশ্বাস আছে বলিয়া তাহারা স্ব-সম্প্রদায়ের কোনো লোক মরিলে, মৃতদেহ দাহ করার সময় বহু সংখ্যক মহিষ হত্যা করে। তারা মনে করে, এই মৃত মহিষগুলি অন্য জগতে গিয়া মৃত মানুষকে মাংস ও দুগ্ধ জোগাইবে।

ইহাদের শবদাহ প্রথা অদ্ভুত রকমের। সাধারণত দুই প্রকারে শবদাহ করা হয়। একটিকে বলে "কাঁচা দাহ" ও অপরটিকে বলে "শুষ্ক দাহ"। মৃত্যুর ২/৩ দিন পরে যে সৎকার করা হয় তাহাকে "কাঁচা দাহ" বলে। "শুষ্ক দাহ" এক অদ্ভুত এবং জাঁকজমকের ব্যাপার। যখন কোনো পীড়িত লোকের মৃত্যু সম্ভাবনা দেখা যায় তখন হইতে তাহাকে গৃহের সমস্ত অলংকার দিয়া সাজানো হয়। তারপর মানুষটি যতদিন না মরে বা না সারিয়া উঠে ততদিন এই অলংকার তার অঙ্গে রাখা হয়। যখন লোকটি মৃত্যুমুখী হয় তখন তাকে সামান্য একটু দুগ্ধ খাওয়ানো হয়। মৃত্যুকালে কোনো প্রকার প্রার্থনা করা হয় না। মৃত্যুর পর সালংকার লাশটিকে নূতন কাপড় জড়ানো হয়, এবং কাপড়ের এক কোণে কিছু শস্য বাঁধিয়া দেওয়া হয়। এরা মনে করে যে অন্য জগতে যাত্রাপথের খাদ্যস্বরূপ এই শস্যগুলি কাজে লাগিবে। বলিতে ভুলিয়াছি, এরা মৃত্যুর পরে যেখানে যায় বলিয়া বিশ্বাস করে তাহার নাম 'আমনর'।

যাহা হউক সালংকার শবটি দাহ করার পূর্বে মৃতের আত্মীয়স্বজন, যেখানে যত আছে. নিমন্ত্রণ করা হয়। তারপর গাছের শুষ্ক ডাল দ্বারা চিতা প্রস্তুত করিয়া তাহার উপর শবটিকে রাখা হয়। চিতায় আগুন দিবার সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়স্বজন সমস্বরে চিৎকার করিয়া মৃতের উদ্দেশ্যে বলে, "আমরা তোমার জন্য মহিষ মারিব", "তোমাকে পান করার জন্য দুগ্ধ পাঠাইব" ইত্যাদি। তারপর দুইটি মহিষ ধরিয়া আনিয়া মৃতের কল্পিত পরবর্তী জগতে দুগ্ধ ও মাংস সরবরাহের জন্য বলি দেওয়া হয়। বলি দিবার পূর্বে ইহারা মহিষ পাল তাড়া করে। ইহাদের মধ্যে একজন মহিষের ঘাড়ে লাফাইয়া উঠে এবং শিং ধরিয়া এমনভাবে মোচড় দেয় যে মহিষ প্রবরকে বাধ্য হইয়া ভূমি শয্যা গ্রহণ করিতে হয়। তারপর ঘাতক কুঠারের এক আঘাতে বেচারাকে অমরলোকে পাঠাইয়া দেয়।

মহিষ হত্যা করা শেষ হইলে ভস্মীভূত শব হইতে একটু ভস্ম উঠাইয়া লইয়া মৃত মহিষের নাকে ঢুকাইয়া দেয়। টোডারা মনে করে এরূপ করিলে মৃত মহিষ পরজগতে গিয়া যার উদ্দেশ্যে তাকে বলি দেওয়া হইল তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে সহজে সক্ষম হইবে। ভস্ম নাকে শোঁকাইবার পর টোডা নরনারী মৃত মহিষটাকে ঘিরিয়া বৃত্তাকারে বসিয়া উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া শোক প্রকাশ করিতে থাকে। এই শোক প্রকাশেরও একটা নির্দিষ্ট সময় দেওয়া হয়। সেই সময় উত্তীর্ণ হইলে ইহারা সকলে একত্রে নাক মাটিতে ঠেকাইয়া হিন্দুদের ন্যায় প্রণাম করে। খুব ধনাঢ্য ব্যক্তির শবদাহ করার সময় আবার সকল পাহাড়িয়া জাতির মধ্য হইতে বাছা বাছা বাজনাওয়ালা আনা হয় এবং বাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে শব শোভাযাত্রীরা একপ্রকার তাণ্ডব নৃত্যসহ আউ! আউ! শব্দ করিতে থাকে। স্ত্রীলোকেরা সাধারণত এরূপ তাণ্ডব নর্তনে যোগ দেয় না। অবশ্য খুব নিকট আত্মীয়রা সময় সময় শোকাবেগ দমন করিতে না পারিয়া ইহাতে যোগ দেয়। অতঃপর মৃতের মাথার খুলি ও ভস্মাবেশ মাটিতে পুতিয়া ইহারা গৃহে ফিরিয়া আসে এবং নূতন করিয়া—মৃতের শোক ভুলিয়া—সংসারের নিত্তনৈমিত্তিক কাজে মন দেয়।

মাসিক মোহাম্মদী ● পৌষ ১৩৪০ (১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ)



আন্ডামানি*

গিরিজাকুমার ঘোষ

আন্ডামানবাসীদিগের সংখ্যা যেরূপ কমিয়া আসিতেছে, তাহাতে তাহাদের শীঘ্রই সম্পূর্ণ বিলোপের আশঙ্কা হয়। এইজন্য ইহাদের সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা যায়, লিপিবন্ধ করিয়া রাখা মানবতত্ত্ববিজ্ঞানের পক্ষে একান্ত আবশ্যক।

আন্ডামান দ্বীপপুঞ্জে ক্ষুদ্র বৃহৎ ২০০টি দ্বীপ আছে। তন্মধ্যে কতকগুলিতে কোনো মানুষ নাই। ভূতত্ত্ববিদেরা মনে করেন যে, এই দ্বীপপুঞ্জ পূর্বে এশিয়া মহাদেশের সহিত যুক্ত ছিল। মধ্যবর্তী ভূখণ্ড বসিয়া গিয়া সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন হওয়ায় অবশিষ্টাংশ সাগর পরিবেষ্টিত হইয়া দ্বীপে পরিণত হইয়াছে। দ্বীপগুলি যে এখনও ক্রমশ বসিয়া যাইতেছে, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

আন্ডামান নাতিশীতোষ্ম। ইহার বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১০০ ইঞ্চির উপর। বৎসরের মধ্যে অর্ধেক দিন বৃষ্টি পড়ে। জলবায়ুর অবস্থা এইরূপ হওয়ায় এখানে স্নায়বিক অবসাদ, উদরাময়, ম্যালেরিয়া জ্বর ও কাশির অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। দ্বীপগুলি সমুদ্রতট পর্যন্ত নিবিড় জঙ্গলে আচ্ছন্ন। স্থানে স্থানে বেত্রাদির জঙ্গালে এরূপ ঘন যে, অরণ্যচারী আন্ডামানিগণও তাহার ভিতর দিয়া যাইতে পারে না। দ্বীপগুলির প্রাকৃতিক দৃশ্য অনেক স্থলে বড়ো সুন্দর। কিন্তু আন্ডামানিগণ তাহা বুঝিতে বা উপভোগ করিতে অসমর্থ। এখানে কোনো বড়ো বন্যজন্তু দৃষ্ট হয় না। আদিম নিবাসীরা নানাবিধ ফলমূল, মাছ, চিংড়ি, মধু ও পোকা-মাকড় খাইয়া প্রাণ ধারণ করে।

---

* *A History of our Relations with the Andamanese* Compiled from Histories and Travels, and from the Records of the Government of India. By M. V. Portman, M.A.I. &c., Officer in charge of the Andamanese, Two Volumes, 1899.

আন্ডামানবাসীরা নেগ্রিটো জাতীয়। ভারতবর্ষের সাঁওতাল, কোল প্রভৃতি জাতির মধ্যে নেগ্রিটো রক্তের সংমিশ্রণ আছে, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ এইরূপ অনুমান করেন। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট যখন আন্ডামান দখল করেন, তখন বৃহৎ আন্ডামান দ্বীপে আনুমানিক ৬,০০০ এবং ক্ষুদ্র আন্ডামান দ্বীপে ২,০০০ লোক ছিল। পূর্বেই বলিয়াছি, বহু প্রাচীনকালে আন্ডামান দ্বীপপুঞ্জ এশিয়া মহাদেশের সহিত সংযুক্ত ছিল। আন্ডামানবাসীদিগের মধ্যে এরূপ জনশ্রুতিও আছে যে, একবার প্রলয় হইয়া তাহাদের দেশের অনেক অংশ সমুদ্রে ডুবিয়া যায়।

আন্ডামান নামটির উৎপত্তি সম্বন্ধে পোর্টম্যান সাহেব বলেন যে, মালয়বাসীরা প্রাচীনকাল হইতে আন্ডামান দ্বীপপুঞ্জে গিয়া তথাকার অধিবাসীদিগকে ধরিয়া আনিয়া দাসরূপে বিক্রয় করিত। তাহারা আন্ডামানিদিগকে রামায়ণবর্ণিত বানর বা হনুমান মনে করিত। মালয়েরা হনুমান কথাটি "হন্ডুমান" এইরূপ উচ্চারণ করে। এই হন্ডুমান হইতে আন্ডামান নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

আন্ডামানিরা ১২টি গোত্রে এবং ৩ শ্রেণিতে বিভক্ত। প্রত্যেক গোত্র আবার অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত। এক এক গোত্রের লোকে একই প্রকার তিরধনু ব্যবহার করে, একই রকম গহনা ও উলকি পরে এবং প্রায় একই ভাষায় কথা কহে। গোত্র নির্বিশেষে আন্ডামানিদের আর একপ্রকার শ্রেণিবিভাগ আছে। তাহারা "আর-য়াউটো" অর্থাৎ বেলাবাসী, এবং "এরেমটাগ" অর্থাৎ অরণ্যবাসী, এই দুই দলে বিভক্ত। বেলাবাসী ও অরণ্যবাসীদের মধ্যে প্রভেদ এই—বেলাবাসীরা প্রধানত সমুদ্রতীরে বাস করে, এবং প্রধানত সমুদ্র হইতে নিজ নিজ খাদ্য আহরণ করে। এইজন্য তাহারা জঙ্গালবাসীগণ অপেক্ষা সাঁতার ও ডুব দিতে এবং মাছ বিঁধিতে অধিক দক্ষ। তাহারা এরেমটাগ-গণ অপেক্ষা সাহসী ও কষ্টসহিষ্ণু এবং মৎস্য ও অপরাপর সামুদ্রিক জীবগণের বিষয় অধিক জানে। এরেমটাগ বা জঙ্গালবাসীরা জঙ্গালের ভিতর দিয়া পথ চিনিয়া যাইতে ও শূকর শিকার করিতে অধিকতর দক্ষ। তাহারা আন্ডামানের প্রাণী ও উদ্ভিদ সমূহের বিষয় আর-য়াউটোগণ অপেক্ষা অধিক জানে, কিন্তু তাদের চেয়ে ভীরু ও ধূর্ত। জঙ্গালবাসীরা কচ্ছপাদি শরবিদ্ধ করিতে পারে না। বেলাবাসী ও জঙ্গালবাসীদের মধ্যে বৈবাহিক আদানপ্রদান চলে। একই গোত্রের দুইটি ভাগের মধ্যে অনেক সময় যুদ্ধ হয়। আন্ডামানিদিগের মৈত্রীর ক্রম নিম্নলিখিতরূপ। পরিবারের মধ্যে তাহাদের প্রীতি খুব বেশি। এক গোষ্ঠীর লোকদের মধ্যেও ভাব আছে। এক গোত্রের লোকদের মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে সদ্ভাব আছে। পরিচয় থাকিলে স্বকীয় দলের অন্যান্য গোত্রের লোকদের সঙ্গে তাহারা ভদ্রতা রাখিয়া চলে। স্বকীয় দলভুক্ত অপরিচিত অন্যান্য গোত্রের লোকদিগকে, এতদ্ব্যতীত অপর আন্ডামানিদিগকে এবং সমুদয় বিদেশি লোককে তাহারা শত্রু মনে করে। আন্ডামানিদের গোত্র জন্মগত। "বেলাবাসী" বা "জঙ্গালবাসী" নামও জন্মের উপর নির্ভর করে। কখনও কখনও পুত্রীকরণ (adoption) দ্বারা একজন "জঙ্গালবাসী" "বেলাবাসী" হইতে পারে, কিন্তু "বেলাবাসী" কখনওই "জঙ্গালবাসী" হইবে না। কারণ বেলাবাসীরা জঙ্গালবাসীদিগকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখে।

আন্ডামানি পুরুষদের গড় উৎসেধ ৪ ফুট ১০১/২ ইঞ্চি, স্ত্রীলোকদের ৪ ফুট ৬ ইঞ্চি। পুরুষদের গড় স্বাভাবিক দৈহিক উত্তাপ ৯৯ ডিগ্রি, স্ত্রীলোকদের ৯৯.৫। পুরুষদের গড় নাড়ি-স্পন্দন মিনিটে ৮২ বার, স্ত্রীলোকদের ৯৩ বার। পুরুষের গড় শ্বাসপ্রশ্বাস মিনিটে ১৯ বার, স্ত্রীলোকের ১৬ বার। পুরুষদের গড় ওজন ৯৬ পাউন্ড ১০ আউন্স, স্ত্রীলোকদের ৮৭ পাউন্ড। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, ইহাদের স্বাভাবিক দৈহিক উত্তাপ আর্যজাতীয় মানবদিগের উত্তাপ অপেক্ষা কিছু বেশি। ইহার ঠিক কারণ নিরূপিত হয় নাই। হয়ত তাহাদের খাদ্য প্রধানত আঙ্গারিক (carbonaceous) বলিয়াই এরূপ হয়, কিংবা সর্বদা ম্যালেরিয়াপূর্ণ দেশে বাস করায় হয়ত অনেক সময়েই তাহাদের প্রচ্ছন্ন জ্বর থাকে, যাহা তাহারা নিজেই অনুভব করিতে পারে না।

তাহারা শীতকে বড় অপছন্দ ও ভয় করে। কিন্তু তাহাদের দেশ অপেক্ষা শীতল ভারতবর্ষীয় কোনো স্থানে তাহাদিগকে লইয়া গেলে তাহাদের কোনো ক্ষতি হয় না, বরং স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। তাহারা রোদ বেশ সহিতে পারে, কিন্তু কখনো কখনো তাহাদের খুব মাথা ধরে ও রৌদ্রজনিত জ্বর হয়। তাহারা খুব গ্রীষ্মের সময়ও দিবা দ্বিপ্রহরে সম্পূর্ণ উলঙ্গভাবে, মাথা কোনো প্রকারে আবৃত না করিয়া জলে স্থলে সর্বত্র বিচরণ করে। খুব রোদের সময় ডোঙায় করিয়া জলে বিচরণ করিতে হইলে তাহারা কখনও কখনও পাতার ছাতা ব্যবহার করে। তাহারা ক্ষুধা তৃষ্ণা মোটেই সহিতে পারে না। ক্ষুৎপিপাসা বোধ হইবামাত্রই উপায় থাকিলে তাহারা তৎক্ষণাৎ উভয়ই নিবারণ করে। তাহারা সাধারণত ২৪ ঘণ্টার বেশি না ঘুমাইয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু কখনো কখনো কোনো বড়ো নাচ উপলক্ষে তাহাদিগকে চারি দিন চারি রাত্রি জাগিয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে। তাহারা তাহার পর কিন্তু অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে।

তাহাদের কাহারও কাহারও গলার স্বর গম্ভীর ও কর্কশ হইলেও অধিকাংশেরই স্বর অনুচ্চ ও মিষ্ট। তাহারা স্বভাবত "দূরদর্শী"। তাহারা অনেক সময় সাদা ও লাল রং-এ শরীর রঞ্জিত করে। তাহা না করিলে পুরুষেরা এবং যুবতি নারীরা দেখিতে কুৎসিত নয়। তাহাদের নাসিকা সুগঠিত, ঠোঁট পাতলা, মুখের হাঁ ছোটো, দন্তপংক্তি সমোচ্চ ও সাদা, চক্ষু উজ্জ্বল এবং দেহ সুঠাম। বুড়াবুড়িরা অনেক সময় বড়ো কদাকার হয়। আন্ডামানিদের রং কয়লার মত কালো। কাহারও কাহারও গ্রীবাস্থি, কপোল ফলক (cheek bones) প্রভৃতি রক্তাভ কপিশ বর্ণ হয়। তাহাদের আঙুল ও ঠোঁট হইতে কখনো কখনো কালো রং উঠিয়া যাওয়ায় তাহাদিগকে শবলিত দেখায়। তাহাদের চুলের রং ঝুলের মত কালো, গাঢ় কপিশ, সোনালি, লাল প্রভৃতি হয়। ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের কেশরচনার পদ্ধতি স্বতন্ত্র। কেহ বা মস্তক মুণ্ডন করে, কেহ দীর্ঘ জটা ধারণ করে, কেহ মাথার মাঝখানে এক গোছা চুল রাখিয়া দেয়, কেহ বা খুব খাটো করিয়া চুল কাটে। তাহাদের শরীর প্রায়ই অতিরিক্ত রোমশ হয় না। কিন্তু সম্পূর্ণ লোমহীনতাও দেখা যায় না। কাহারও কাহারও সামান্য দাড়ি গোঁফ হয়। দাড়ি গোঁফবিশিষ্ট ব্যক্তিদের অহংকারের সীমা থাকে না। তাহারা ভ্রূ কামাইয়া ফেলে।

ইহাদের মধ্যে স্বাভাবিক অঙ্গবৈকল্য প্রায় দেখা যায় না। বোঝা বহিবার জন্য তাহারা

মাথার উপর একটা মোটা ফিতা ব্যবহার করে। এইজন্য মাথার মাঝখানে একটা দাগ পড়িয়া যায়। এই দাগ স্ত্রীলোকদের মধ্যে অধিক লক্ষিত হয়। কারণ তাহাদিগকে জ্বালানি কাঠ প্রভৃতির ভারী বোঝা বহিতে হয়। প্রায় ছয় বৎসর বয়স হইতে বোঝা বহায় তাহাদের মাথার খুলি পর্যন্ত ফিতার দাগে দাগে নীচু হইয়া যায়। আন্ডামানিরা ৬০/৬৫ বৎসর পর্যন্ত বাঁচে।

ইহাদের মধ্যে জন্মগত উন্মাদ প্রায় দেখা যায় না। নরহত্যা করিবার প্রবল ইচ্ছারূপ উন্মাদ কখনো কখনো দেখা যায়। এইরূপ ক্ষিপ্ত লোকেরা কাঁচা মাংস, মাটি প্রভৃতি খাইতে আরম্ভ করে, এবং কোনো মানুষকে মারিলে তাহার কাঁচা চর্বি খায় ও রক্ত পান করে। এইরূপ রাক্ষসপ্রবৃত্তি ক্ষিপ্ত লোকেরা কিছুদিন অত্যন্ত বিভীষিকা উৎপাদন করে। কিন্তু প্রায়ই কেহ না কেহ জ্ঞাতিবধের প্রতিশোধ লইবার জন্য শীঘ্রই তাহাদিগকে মারিয়া ফেলে।

আন্ডামানি বালক বালিকা ও যুবক যুবতিদের বুদ্ধি, এবং তাহাদের স্বাভাবিক অবস্থার সহিত সম্পূর্ণ অসম্পৃক্ত বিষয় বুঝিবার ক্ষমতা, যথেষ্ট আছে। পোর্টম্যান সাহেব বলেন যে যাহাদের বুদ্ধি বেশি, তাহাদের চেহারা অপেক্ষাকৃত মার্জিত এবং স্বভাব কোপন। চল্লিশের পর আন্ডামানিদের বুদ্ধি কমিয়া আসে। তাহার পর তাহারা অধিকতর বর্বর ও বিবাদপ্রিয় হয়।

আন্ডামানিরা পরস্পরের প্রতি ব্যবহারে ধীর ও মৃদু-স্বভাব, শিশুবৎসল, কিন্তু আশুক্রোধী ; রাগিলেই খুন করিয়া বসে। তাহারা নিষ্ঠুর, ঈর্ষাপরায়ণ, বিশ্বাসঘাতক এবং বৈরনির্যাতনপ্রিয়। উপকার বা অনিষ্ট বেশিদিন তাহাদের মনে থাকে না। তাহারা কৃতজ্ঞতার কোনো ধার ধারে না। তাহারা নিজ নিজ পত্নীকে ভালোবাসে, মন্দ গুণগুলি অপরিচিত ব্যক্তিদের জন্য রাখিয়া দেয়। তাহার আমোদপ্রিয়, মৃগয়াসক্ত এবং স্বাধীনচিত্ত। তাহারা কোনো কাজই অধিকক্ষণ ধরিয়া করিতে ভালবাসে না। স্ত্রীলোকদের বুদ্ধি পুরুষদের সমান না হইলেও নিতান্ত কম নয়। বৃদ্ধারা অনেক সময়ই সম্মানলাভ করে। তাহারা পুরুষদের চেয়ে দীর্ঘজীবী হয় এবং বৃদ্ধবয়সে কোপনস্বভাব বা কলহপ্রিয় হয় না। আন্ডামানিরা নারীকে পুরুষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট মনে করে। স্ত্রীরা কার্যত স্বামীদের দাসী , তাহাদের সমস্ত কাজই স্ত্রীরা করে।

আন্ডামানিদের দৃষ্টিশক্তি স্বভাবত ইউরোপীয়দিগের দৃষ্টিশক্তি অপেক্ষা তীক্ষ্ণ নহে ; অভ্যাস এবং জীবিকা-নির্বাহের জন্য প্রয়োজনবশত কখনো কখনো তীক্ষ্ণ হয় বটে। তাহারা সভ্যজাতিদের প্রিয় সুগন্ধি বা পুষ্পের সুঘ্রাণের প্রতি কোনো অনুরাগ দেখায় না ; ফুল দিয়া নিজ নিজ দেহকেও ভূষিত করে না। তাহারা অন্ধকারে কেবল ঘ্রাণ দ্বারা কাহাকেও চিনিতে পারে না। পোর্টম্যান সাহেবের মতে তাহাদের কোনো ইন্দ্রিয়শক্তিই স্বভাবত সভ্যজাতিদের ইন্দ্রিয়শক্তি অপেক্ষা তীক্ষ্ণ নহে। অভ্যাস প্রয়োজন ও শিক্ষা প্রযুক্ত অধিক তীক্ষ্ণ হয় মাত্র।

ওঙ্গে শ্রেণিভুক্ত গোত্রগুলি ব্যতীত অপর সমুদয় গোত্রের আন্ডামানিরা উলকি দ্বারা দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ "বিভূষিত" করে।

আন্ডামানিদের নাম তিন রকমের। (১) জননী-জঠরে থাকিবার সময়ে শিশুর যে নাম হয়, আমরণ সেই নাম ব্যবহৃত হয়। প্রত্যেক গোত্রে এইরূপ নাম মোটে প্রায় কুড়িটি আছে। যখন কোনো স্ত্রীলোক অন্তঃসত্ত্বা হন, তখন তিনি শিশুর এই নাম রাখেন। যমজ সন্তান হইলে ভূমিষ্ঠ হইবার পর তাহার নামকরণ হয়। যদি কাহারও প্রথম সন্তান মারা যায়, তাহা হইলে দ্বিতীয় সন্তান হইলে তাহাকে প্রথম সন্তানের নামটি দেওয়া হয়, এবং তাহাতে "ঈল" অর্থাৎ "দ্বিজ" বা "পুনর্জাত" কথাটি যোগ করিয়া দেওয়া হয়। কারণ, আন্ডামানিরা বিশ্বাস করে যে পূর্বমৃত সন্তানটিই আবার জন্মিয়াছে। আমাদের দেশেও কিয়ৎ পরিমাণে এই প্রকার একটি বিশ্বাস আছে। সেই জন্য কোনো মাতার সন্তান পুনঃপুন মারা গেলে মৃত শিশুটির কান কাটিয়া বা বিঁধিয়া দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য, যেন সে আবার না আসে, বা আসিলে ওই চিহ্ন দ্বারা যেন তাহাকে চেনা যায়। (২) বিদ্রূপাত্মক বা বিশেষত্বসূচক নাম। শিশুদের নিজের বা তাহাদের পিতামাতার শারীরিক গঠনে বা আচরণে কোনো বিশেষত্ব থাকিলে এইরূপ নাম দেওয়া হয়। এগুলি বিদ্রূপাত্মক, অঙ্গবৈকল্যসূচক, বা সম্মানজ্ঞাপক হইতে পারে। (৩) পুষ্প-নাম। এই নাম কেবল স্ত্রীলোকদিগকেই দেওয়া হয়। কোনো বালিকা যে সময়ে প্রাপ্তবয়স্কা হয়, তখন কতকগুলি নির্দিষ্ট পুষ্পের মধ্যে যেটি ফুটিতে থাকে, তদনুসারে স্ত্রীলোকটির পুষ্পনামকরণ হয়। পুষ্পপ্রস্ফুটনের সহিত নারীজীবনের অবস্থাবিশেষের সাদৃশ্যবোধ আমাদের দেশেও আছে। মনুষ্যশিশুর জন্ম এবং পুষ্প হইতে বীজ ও তাহা হইতে বৃক্ষশিশুর জন্ম, এই উভয়ের সাদৃশ্যই এরূপ বোধের মূল বলিয়া অনুমিত হয়। আন্ডামানিরা কতকগুলি সম্মানসূচক নামও ব্যবহার করে। প্রৌঢ় পুরুষগণকে সম্মানার্থ "মাঈ আ" ও "মাম" এবং বিবাহিতা নারীগণকে "চান" বলা হয়। সন্তানেরা পিতামাতাকে নাম ধরিয়া ডাকে না। যুবক যুবতিরা বয়োজ্যেষ্ঠদিগের সহিত কথা কহিবার সময় তাহাদের বিদ্রূপাত্মক বা বিশেষত্বসূচক এবং কখনো কখনো তাহাদের ডাকনাম (proper name) পর্যন্ত ব্যবহার করে না।

আন্ডামানিরা একটি মাত্র বিবাহ করে। বিবাহের পূর্বে তাহাদের যৌন-নীতি ভালো না হইলেও বিবাহের পর স্ত্রীপুরুষ উভয়েই পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত থাকে।

পীড়ার সময় আন্ডামানিরা লাল গৈরিক লেপন ও সেবন করে। জ্বর হইলে ও মাথা ধরিলে তাহারা কপাল হইতে এবং ফোড়া হইলে যেখানে ফোড়া হয় সেখান হইতে রক্তমোক্ষণ করে। কোনো স্থানে বেদনা বোধ হইলে সেখানে মানুষের হাড়ের মালা পরে। তাহারা একেবারে পথ্যাপথ্যজ্ঞানবিবর্জিত নহে।

তাহারা গাছে চড়িতে খুব পটু এবং খুব দ্রুত হাঁটিতে ও দৌড়াইতে পারে। আর-য়াউটোরা সুনিপুণ সন্তরক ; তাহারা ঠিক যেন জলচর জীব। ফেনিল সমুদ্রতরঙ্গের মধ্যে তিরধনু দ্বারা মাছ মারিতে ইহাদের অসাধারণ দক্ষতা দৃষ্ট হয়।

তাহারা স্বপ্নে এবং "জ্ঞানী লোক"দের ভবিষ্যদ্‌বাণীতে দৃঢ় বিশ্বাস করে। তাহারা নির্ভুলরূপে দুইয়ের অধিক গণিতে পারে না ; পাঁচ পর্যন্ত কোনো প্রকারে কষ্টে-সৃষ্টে পারে।

আন্ডামানিরা যাযাবর ও বড়ো নোংরা। এই জন্য তাহারা (ক্ষুদ্র আন্ডামান ব্যতীত অন্যত্র) স্থায়ী বা বৃহৎ কুটির নির্মাণ করে না। এক একটি গ্রামে সাধারণত ১৪টি কুঁড়ে

ঘর থাকে। সেগুলি ডিম্বাকারে সজ্জিত। দ্বার ভিতরের দিকে। গ্রামের মধ্যে নাচের জন্য কতকটা ফাঁকা জায়গা থাকে। কুঁড়ে ঘরগুলি সম্মুখে সাড়ে চারি ফুট এবং পশ্চাতে ৮ ইঞ্চি মাত্র উঁচু। চাল ঘাস পাতা প্রভৃতি দিয়া ছাওয়া, চারিপাশে দেওয়াল থাকে না। কুঁড়ে ঘরগুলি ৪ ফুট লম্বা ও ৩ ফুট চওড়া ; ইহাই এক একটি পরিবারের পক্ষে যথেষ্ট। গ্রামের এক প্রান্তে অবিবাহিত পুরুষদিগের জন্য এবং অপর প্রান্তে অবিবাহিতা নারীগণের জন্য এক একটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ কুটির থাকে।

আন্ডামানিরা প্রত্যেকে স্ব-স্বপ্রধান। কিন্তু গোত্রের বয়োবৃদ্ধগণের কিছু ক্ষমতা আছে। মেজাজ, যুদ্ধে ও মৃগয়ায় শৌর্য, বুদ্ধির উৎকর্ষ, প্রভৃতি অনুসারে এক এক জন গোত্রপতি নির্বাচিত হন। তিনি ক্রমে ক্রমে এই পদের অধিকারী হইয়া উঠেন ; বাস্তবিক যে পঞ্চায়েত করিয়া তাঁহাকে নির্বাচন করা হয়, তাহা নয়। এই অসভ্য জাতির মধ্যে, বার্ধক্যের সম্মান আছে। কাহারও বিরুদ্ধে কেহ অপরাধ করিলে, ফরিয়াদি নিজেই আসামির সম্পত্তি নষ্ট করিয়া কিংবা তাহাকে জখম বা খুন করিয়া তাহার দণ্ড দেয়। আন্ডামানিরা নরমাংসভোজী নহে।

ইহাদের কোনো লিখিত ভাষা নাই। পরস্পরের মধ্যে চিন্তা বা ভাব বিনিময়ের জন্য কোনো সংকেতাদির ব্যবহারও নাই। প্রত্যেক গোত্রের ভাষা প্রায় স্বতন্ত্র। অপর গোত্রের লোকে তাহা প্রায় বুঝিতে পারে না।

ইহাদের মধ্যে একপ্রকার দীক্ষা আছে। ১২ হইতে ১৬ বৎসর বয়সে দীক্ষা হয়। এই বয়স হইতে দীক্ষিত ব্যক্তিরা কোনো কোনো খাদ্যদ্রব্য বর্জন করে। কয়েক বৎসর পরে কতকগুলি ক্রিয়াকলাপ এবং নাচের পর আবার এই সকল খাদ্য ভক্ষিত হয়। ইহাদের বৈবাহিক ক্রিয়াকলাপ খুব সাদাসিধে। গ্রামের মুখ্যারা যখন কোনো যুবক যুবতির বিবাহেচ্ছা বুঝিতে পারে, তখন একটি নবনির্মিত শূন্য কুটিরে কন্যাকে উপবেশন করায়। বর জঙ্গালে পলায়ন করে কিন্তু কিছু লড়ালড়ি এবং অনিচ্ছার ভাণের পর সে বল প্রয়োগ দ্বারা ধৃত ও আনীত হয় এবং কন্যার ক্রোড়ে উপবেশিত হয়। ইহাই বিবাহ। বিবাহের পর নবদম্পতি পরস্পরের সহিত সামান্যই কথা বলে এবং অন্তত এক মাস পরস্পরকে খুব লজ্জা করিয়া চলে। তাহার পর একত্র ঘর করিতে থাকে।

মৃত্যুর পর শিশুগণকে তাহাদের পিতামাতার কুটিরের মেঝেতে সমাহিত করা হয়। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদিগকে অগভীর কবরে পুঁতিয়া ফেলা হয়, কিংবা অধিক সম্মান দেখাইতে হইলে, মৃতদেহকে পুলিন্দার মত করিয়া মুড়িয়া ও বাঁধিয়া একটি গাছে মাচার উপর রাখিয়া আসা হয়। তাহার পর সেই গাছের বা গোরের নিকট দূর হইতে সহজদৃশ্য বেত গাছের পাতার থোপা বাঁধিয়া রাখা হয়। তিন মাস সেদিক দিয়া কেহ যায় না। এই তিন মাস মৃত ব্যক্তির আত্মীয়বন্ধুরা ধূসরবর্ণ মাটি মাখিয়া এবং নৃত্য না করিয়া অশৌচ পালন করে। অশৌচান্তে মৃত ব্যক্তির হাড়গুলি খুঁড়িয়া বা বৃক্ষ হইতে নামাইয়া প্রক্ষালনানন্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরা করিয়া গহনার মত পরিধান করে। এই অলংকারগুলির রোগনিবারণশক্তিতে তাহারা দৃঢ় বিশ্বাসী। ইহার পর নৃত্যানন্তর অশৌচ শেষ হয় এবং দেহ হইতে ধূসর মাটি ধুইয়া ফেলা হয়।

বৃহৎ আন্ডামানবাসীরা দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর মিলনের সময় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করে। এই রোদন কখনো কখনো কয়েকঘণ্টাব্যাপী হয়। ওঙ্গে-গোত্রীয়েরা মিলনের সময় পরস্পরের কোলে বসে, আদর করিয়া গায়ে হাত বুলায়, এবং নীরবে কয়েক বিন্দু অশ্রুমোচন করে। বিদায়ের সময় আন্ডামানিরা পরস্পরের হাতে ফুঁ দেয়। এ সময় মনের ভাব বা আবেগ প্রকাশ করা শিষ্টাচারসম্মত নহে।

আন্ডামানিরা আকাশবাসী, সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে সর্বস্রষ্টা, মনুষ্যের মত ক্রোধ-অনুরাগ-বিরাগ-বিশিষ্ট এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। তিনি দণ্ড দেন, ঝড় বহান। তাহাকে কোনো প্রকারে সন্তুষ্ট করা যায় না। তিনি যাহাতে ক্রুদ্ধ হন, এরূপ কাজ আন্ডামানিরা করে না। তাহাদের প্রার্থনা, পূজা বা বলিদানের কোনো ধারণা নাই। এই ঈশ্বরকে তাহারা প্রীতি করে না। এই ঈশ্বর ব্যতীত তাহারা জঙ্গলে উপদেবতা ও সমুদ্রের উপদেবতায়ও বিশ্বাস করে। ইহারা এবং অন্যান্য নিকৃষ্ট উপদেবতারা কেবল অমঙ্গল ঘটায়। আন্ডামানিরা বিশ্বাস করে যে মৃত্যুর পরে তাহাদের আত্মা ভূগর্ভে একটি স্থানে যায়, কিন্তু তাহাদের অনন্ত দণ্ড বা পুরস্কার বা তদুপযোগী স্বর্গ-নরকনামক কোনো স্থান সম্বন্ধে কোনো ধারণা নাই।

তাহারা সম্পূর্ণ উলঙ্গ থাকে। কেবল পুরুষেরা কটিবন্ধ ও হার পরে এবং স্ত্রীলোকেরা পাঁচ ছয়টা পাতার গোছা বা গাছের ছাল কটিতটে পরিধান করে।

তাহারা চাষ করিতে জানে না ; এবং ইংরেজাধিকারের পূর্বে কোনো পশুপক্ষীও পুষিত না। তাহারা এক একটা গাছের গুঁড়ির ভিতর হইতে বাইস দ্বারা কাঠ কাটিয়া বাহির করিয়া ডোঙা প্রস্তুত করে। ডোঙাগুলি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। তাহারা তাহাদের খাদ্য রাঁধিয়া খায়। মাটির রন্ধনপাত্র নির্মাণ করিয়া আগুনে পুড়াইয়া লয়। যতদিন হইতে তাহারা ঝড়াদি দ্বারা নষ্ট জাহাজ হইতে লোহা পাইতেছে, ততদিন হইতে লোহার ব্যবহার করিতেছে, নতুবা ঝিনুক, শামুক ও মাছের কাঁটাই ব্যবহৃত হইত। তাহারা বেশ ঝুড়ি বাঁশের ও কাঠের বালতি তৈয়ার করিতে পারে। লতার ছাল হইতে দড়ি, বেতের ছালের শীতলপাটি প্রভৃতিও তাহারা প্রস্তুত করিতে পারে।

নৃত্য এবং ঢাকের বাদ্যই তাহাদের প্রধান আমোদ। নৃত্য পাঁচ প্রকারের।

প্রবাসী ● ভাদ্র ১৩০৮ (১৯০১ খ্রিস্টাব্দ)



সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতি



সাঁওতাল জাতির বিবরণ

শ্রীরামব্রহ্ম সান্যাল

সখার পাঠক পাঠিকা! সাঁওতালের নাম তোমরা অনেকেই শুনিয়াছ ; ধাঙ্গড়, পাহাড়ি এবং কোলদিগের মতো ইহারাও ভারতের আদিম অধিবাসী। বাঙ্গালার পশ্চিম সীমান্তে যে সকল জঙ্গল এবং পাহাড় আছে সাঁওতালেরা সেই সকল জঙ্গল এবং পাহাড়ে বাস করে। ওই সকল জঙ্গল এবং পাহাড় পালামৌ, হাজারিবাগ, ছোটোনাগপুর, মানভূম প্রভৃতি জেলা এবং মহকুমার অন্তর্গত। ইহা ভিন্ন বাঙ্গালা এবং বেহারের মধ্যে রাজমহল পাহাড়ের নিকটে যে সকল সমতল স্থান আছে তাহাতে এত সাঁওতালের বাস যে, ওই সকল স্থানের নাম 'সাঁওতাল পরগনা' হইয়াছে।

সাঁওতাল দেখিতে যদিও অনেক পরিমাণে ধাঙ্গড় এবং কোলদিগের মতো কিন্তু ওই সকল জাতি অপেক্ষা যে ইহারা বেশি বুদ্ধিমান এবং কর্মিষ্ঠ তাহার সন্দেহ নাই। সাঁওতালদিগের মধ্যে প্রায়ই কাহারও গোঁফ দাড়ি দেখিতে পাওয়া যায় না। তোমরা মনে করিও না যে, ইহারা গোঁফ দাড়ি কামাইয়া ফেলে, ইহাদের গোঁফ দাড়ি উঠেই না। সাঁওতালেরা খুব শিকারি, এবং কৃষিকার্যেও বেশ দক্ষ। আত্মনির্ভরের ভাব ইহাদিগের প্রকৃতিতে যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, এবং আলস্য কাহাকে বলে একেবারেই জানে না। এই সকল কারণে সাঁওতালদিগের মধ্যে এমন পরিবার কিংবা ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না যাহারা আহার অভাবে কষ্ট পাইতেছে। অবশ্য তাহাদিগের দোতলা বাড়ি নাই, ভালো ভালো কাপড়, ভালো ভালো জামা নাই, বিলাসের জিনিস কিছুই নাই, কিন্তু তাহাদিগের যাহা যাহা আবশ্যক তাহা সমস্তই আছে। ভারতের আদিম অধিবাসীদিগের বিশেষ বৃত্তান্ত যতই পড়িবে, তাহাদিগের বিষয় যত সমালোচনা করিবে, ততই দেখিতে

পাইবে যে, ওই সকল জাতির অনেকের অপেক্ষা সাঁওতালদিগের অবস্থা বেশি উন্নত। কৃষি বিষয়ে নিপুণতা, ধৈর্য, এবং শ্রমদক্ষতা তাহাদিগের এই উন্নতির কারণ। অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইহাদিগের জাতীয় প্রকৃতিরও পরিবর্তন হইতেছে। চল্লিশ, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে সাঁওতালেরা অধিক দিন একস্থানে বাস করিত না। চাষবাসের সুবিধা অসুবিধা অনুসারে কখনও এ-স্থান কখনও অন্য স্থান করিয়া বেড়াইত। সাঁওতালেরা যেখানে যায় সে স্থান হাজার জঙ্গল হইলেও তাহা পরিষ্কার এবং কৃষিব উপযুক্ত করিয়া লয়। আপন পরিবারের ভরণপোষণের নিমিত্ত যতই কেন পরিশ্রম করিতে হউক না, সাঁওতালেরা তাহা প্রফুল্ল চিত্তে স্বীকার করে। প্রাণান্তেও অপরের দাসত্ব স্বীকার করে না। সাঁওতালদিগের এই সকল স্বাভাবিক সদ্‌গুণের সঙ্গে যদি শিক্ষা থাকিত তাহা হইলে মণি-কাঞ্চনের যোগ হইত।

আজকাল কিন্তু ইউরোপীয় মিশনারিদিগের প্রসাদে অনেক স্থানে সাঁওতালেরা সুন্দর শিক্ষা পাইতেছে। পাঠক পাঠিকা! তোমরা সৌভাগ্যক্রমে বিদ্যালয়ে শিক্ষক মহাশয়দিগের নিকট হইতে যে সকল সৎশিক্ষা পাইতেছ, সাঁওতালেরা তাহা পায় নাই। যদিও তাহাদিগের চরিত্রে অনেক দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, তত্রাচ তাহাদিগের মধ্যে এমন সকল সদ্‌গুণ আছে যাহা তোমাদিগের অনুকরণীয়। যদি যথার্থ মনুষ্যত্ব লাভ করিতে চাও তাহা হইলে তোমরাও সাঁওতালদিগের মত শ্রমদক্ষ এবং ধৈর্য্যশীল হও, এবং আত্মনির্ভর শিক্ষা করো।

অন্য অন্য আদিম অধিবাসীদিগের ন্যায় সাঁওতালদিগের পরিচ্ছদ অতি সামান্য, সচরাচর প্রায় একখানি কৌপীন মাত্র, কিন্তু স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ অনেকটা উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের মহিলাদিগের মতো। কী স্ত্রী কী পুরুষ, সকলেই অলংকার ভালবাসে এবং নানা প্রকার পুষ্প এবং পাখির পালক সংগ্রহ করিয়া আপন আপন শিল্প নিপুণতা অনুসারে নানা সুদৃশ্য অলংকার প্রস্তুত করিয়া থাকে। ইহা ভিন্ন স্ত্রীলোকেরা পিত্তল, কাঁসা নির্মিত অলংকারও ব্যবহার করে।

জনার, ভুট্টা, হাঁস, কুক্কুট, মাংস ইত্যাদি ইহাদিগের প্রধান খাদ্য, আহারাদি সম্বন্ধে ইহাদিগের মধ্যে জাতিভেদ নাই ; তবে কেহ বলিয়া থাকেন যে, হিন্দুদিগের সহিত পূর্বকালের শত্রুতাবশত তাহাদিগের ছোঁয়া কোনো দ্রব্য আহার করে না। আমরা কিন্তু যে সকল সাঁওতালের সঙ্গে আলাপ করিয়াছি তাহারা একথা অস্বীকার করে।

সাঁওতালদিগের কুটিরগুলি সুনির্মিত এবং পরিষ্কার, অনেকে আবার দেয়ালে নানাবর্ণের নানাপ্রকার ছবি এবং লতাপাতা আঁকিয়া রাখে প্রতি সাঁওতাল পল্লির ঘরগুলি একটি প্রশস্ত রাস্তার দুই পার্শ্বে সন্নিবেশিত। প্রত্যেক বাড়িতেই গৃহপালিত পশুপক্ষীদিগের থাকিবার স্থান আছে। অপেক্ষাকৃত সংগতিপন্ন সাঁওতালেরা প্রায় সকলেই মহিষ পুষিয়া থাকে, এবং দধি দুগ্ধের ব্যবসায়ও করিয়া থাকে। সাঁওতালেরা অতিশয় সংগীতপ্রিয়, সামান্য বাঁশের এমন সুন্দর বাঁশি প্রস্তুত করে যাহার সুস্বরে এমন হৃদয় নাই যে মুগ্ধ হয় না। ধাঙ্গাড় এবং কোলদিগের মতো প্রত্যেক সাঁওতাল পল্লিতেও এক একটি নৃত্য গীতের আড্ডা আছে ; যেখানে গ্রামের বালক বালিকা, যুবক যুবতি সকলে একত্রিত

হইয়া নৃত্যগীত করে। সাঁওতালদিগের বিবাহ প্রণালী ধাঙ্গাড় এবং কোলদিগের ন্যায়। বহু বিবাহ যদিও প্রচলিত আছে কিন্তু এক স্ত্রী জীবিত থাকিতে প্রায়ই কেহ দ্বিতীয়বার বিবাহ করে না।

সাঁওতালদিগের প্রধান দেবতার নাম 'সিঙ্গা বঙ্গা'। কোলদিগের ন্যায় ইহাদেরও বিশ্বাস এই যে, ওই দেবতা সূর্যেতেই স্বপ্রকাশ, ইহা ভিন্ন আরও কতকগুলি উপদেবতা আছে। স্ত্রীলোকেরা হাতিকে অতিশয় ভক্তি করিয়া থাকে, এবং হাতি দেখিলে তাহার সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করে। হিন্দুদিগের ন্যায় সাঁওতালেরাও শব দাহ করে ; এবং দগ্ধ অস্থি নদীতে কিংবা পুষ্করিণীতে ফেলিয়া দেয়। সাঁওতালদিগের বিষয় যাহা বলা হইল তাহা অতি সামান্য, অন্য সময়ে ইহাদিগের বিশেষ বৃত্তান্ত বলা যাইবে।

সখা ● জানুয়ারি ১৮৮৮



সাঁওতালগণের বিবরণ

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র রায়

সাঁওতালপরগনা ভাগলপুর বিভাগের অন্তর্গত। সৌভাগ্যক্রমে ভাগলপুর সাহিত্য-সম্মিলনির অধিবেশন হইয়াছে। সুতরাং সুধীমণ্ডলীর সম্মুখে সাঁওতাল সংক্রান্ত কিঞ্চিৎ আলোচনা অসাময়িক অথবা অযৌক্তিক বিবেচিত হইতে পারে না। সাঁওতাল এই দেশের আদিম অধিবাসী। ইহারা কোন্ স্থান হইতে আসিয়া বঙ্গদেশে উপনিবেশ করিয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। সম্ভবত আর্যজাতি অথবা অন্য কোনো জাতি কর্তৃক তাড়িত হইয়া উত্তর দেশ হইতে ইহারা এই স্থানে উপনীত হইয়াছিল। সাধারণত অসভ্য ও অশিক্ষিত জাতির পূর্ব পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া অথবা পূর্ববিবরণ সংগ্রহ করা অতীব কষ্টকর। এই সকল জাতির কোনো বর্ণমালা নাই ; সুতরাং তাহাদের কোনো লিখিত পুরাবৃত্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই সকল জাতির পূর্ব ইতিহাস উপকথার ন্যায় পুরুষানুক্রমে প্রচলিত হইয়া আইসে। তাহাতে অধিকাংশ স্থলে বিকৃত ও বিবর্ণিত হইয়া পড়ে। ইহাদের মধ্যে প্রচলিত প্রবাদ সকলও বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া কোনো স্থির মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায় না, কারণ তাহাদের পরস্পরে সামঞ্জস্য নাই—একটি অপরটির বিরোধী। সাঁওতালগণের মধ্যে যে সকল সংগীত প্রচলিত আছে তাহাতে অনুমান হয় যে, তাহাদের আদি বাসস্থান হিহিরি-পিপিরি ও চায়-চম্পা। এই হিহিরি-পিপিরি চায়-চম্পা কোন্ স্থানে অবস্থিত তাহা নিশ্চিত বলিতে পারা যায় না। সাঁওতাল ভাষায় প্রজাপতির নাম পিপিরি ও ফুল্ল কুসুমিত বৃক্ষের নাম চম্পা। পিপিরি ও চায় শ্রুতি-মধুরতার জন্য দ্বিত্ব করা হইয়াছে ধরিয়া লইলে দ্রুম গুল্ম শোভিনী নানাজাতীয় বিহঙ্গম কলকূজিত কোনো পর্বত প্রদেশ তাহাদের আদি বাসস্থান স্বরূপে কল্পনা করিতে পারা যায়। মাননীয় পেটি ওয়ার্ড সাহেব ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই আগস্ট তারিখে রেভিনিউ বোর্ডে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার ৩৪ সংখ্যক

প্যারাতে এই সাঁওতালগণকে সান্টার নামে উল্লেখ করিয়া ইহাদিগকে সিংভূম অথবা হাজারিবাগের অধিবাসী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তৎপরে তাহারা ছোটোনাগপুর হইতে ঝালদা নামক স্থানে গমন করিয়াছিল; পরে ভূমিজ রাজের অধিকারভুক্ত পাতকুমে আসিয়াছিল। অনন্তর মানভূম জেলান্তর্গত পচেট নামক স্থানে উপনীত হইয়াছিল। তথা হইতে তাহারা শাওন্ত নামক গ্রামে আসিয়া সম্ভবত সেই স্থানের নামানুসারে সাঁওতাল নামে অভিহিত হইয়াছিল। এইরূপে তাহারা নানাস্থান পর্যটন করিয়া অবশেষে তাহাদের স্বকীয় নামে পরিচিত সাঁওতাল পরগনায় আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। স্থান পরিত্যাগের সহিত তাহাদের বংশও ক্রমশ বিস্তৃত হইয়াছিল; সুতরাং একস্থান পরিত্যাগকালে সমগ্র সাঁওতাল জাতির সেই স্থান হইতে তিরোভাব অসম্ভব হইয়াছিল। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে গভর্নমেন্ট এই ভ্রমণশীল জাতিকে এই বিভাগে স্থায়ীভাবে বাস ও কৃষিকার্য করার অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন।

আদমশুমারির দ্বারা সপ্রমাণিত হইয়াছে যে, অল্পকাল মধ্যে সাঁওতালবংশ অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃতপক্ষে সাঁওতাল বহুপত্যজাতি। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধভাগে সাঁওতাল পরগনায় ৩০,০০০ সাঁওতাল ছিল। ১৮৭২ অব্দে ৪,৫৫,৫১৩। ১৯০১ অব্দে ৬,৬৩,৪৬১। সাঁওতাল পরগনা ব্যতীত মানভূম, বীরভূম, মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় ১৮৮১ অব্দে ৩,৪৬,৩৯২ ও ১৮৯১ অব্দে ১১,৬৪,১২১ ব্যক্তি গণিত হইয়াছিল।

নানা কারণে এই জাতি এই প্রদেশে বিদ্রোহীভাবাপন্ন হইলে বঙ্গদেশে প্রচলিত আইনকানুন ইহাদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী নহে বিবেচনা করিয়া ইহাদিগকে পৃথকভাবে শাসন করিবার জন্য ১৮৫৫ সালের ৩৭ সংখ্যক কানুন দ্বারা ভাগলপুর ও বীরভূম জেলা হইতে কতক কতক অংশ গ্রহণ করিয়া সাঁওতাল পরগনা গঠিত হইয়াছে। এই প্রদেশের আইন-কানুন ও অধিবাসীগণের আচার-ব্যবহার বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানাপেক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। মাননীয় স্যার এস্‌লি ইডেন সাঁওতাল পরগনার প্রথম ডেপুটি কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

এই জাতিমধ্যে প্রচলিত পৃথিবী গঠন সংক্রান্ত প্রবাদ, ইহাদের ধর্ম ও দেবতা, ইহাদের রীতি-নীতি, বিবাহ-প্রথা ও সাঁওতাল-বিদ্রোহ প্রভৃতি বিষয়ক আলোচনা মৎপ্রণীত "পার্বত্য-কাহিনি" নামক গ্রন্থে যতদূর সম্ভব সংগৃহীত হইয়া আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং সেই সকল বিষয় পুনরুত্থাপিত করিয়া বিদ্বন্মণ্ডলীর মূল্যবান সময় নষ্ট না করিয়া এই জাতির ভাষা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সংক্ষেপ আলোচনা করিতে মনন করিতেছি। আশা করি, তাহা বিরক্তিকর হইবে না।

সাঁওতালের কোনো বর্ণমালা নাই। কোনো একটি ভাষার বর্ণমালা যতই প্রকাণ্ড হউক না কেন তাহাতে অন্য ভাষা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা সুবিধাজনক হয় না। সংস্কৃত অথবা বাঙ্গালার বর্ণমালা যতদূর সম্ভব বিস্তৃত, তত্রাপি ভাষান্তরের সময় সকল শব্দের উচ্চারণযোগ্য ঠিক বর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইংরাজি z ও পারস্যভাষায় ژ জৈ বড়ো কাফ্ এই সকল বর্ণের তুল্য বর্ণ সংস্কৃত অথবা বাঙ্গালায় নাই। তত্রাপি সাঁওতালি ভাষা

বাঙ্গালা বর্ণমালার ছাঁচে ফেলিতে পারা যায়। আমাদের বিসর্গান্ত শব্দ সকল যেরূপভাবে উচ্চারিত হয়, অধিকাংশ সাঁওতালি শব্দ সেইরূপ ধরনে উচ্চারিত হইয়া থাকে। সাঁওতালি ভাষায় অনুনাসিক উচ্চারণের আধিক্যতা মনে হয়।

ভাষার গঠন সাধারণত সর্বনাম ও ধাতুর উপর নির্ভর করে। সর্বনাম ও ধাতু কী প্রকারে সংযুক্ত হয়, তাহারা কী প্রকার রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, তাহারা পরস্পর সংযুক্ত হইলে কীরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট হয় ইত্যাদি। সর্বনাম ও ধাতু দুইটিই ভাষার প্রধান উপাদান। শরীরের সহিত জীবনীশক্তির যেরূপ সম্বন্ধ মানব ভাষার সহিত ধাতুর সেইরূপ সম্বন্ধ। ধাতু হইতে ক্রিয়া, বিশেষ্য উৎপন্ন হয়। দেশ, কাল, পাত্রসূচক সর্বনাম এই সকল অর্থশূন্য, অকর্মণ্য ক্রিয়া ও বিশেষ্যকে জীবনী প্রদান করিয়া ভাবপূর্ণ ও কার্যকুশল করে।

এইরূপ গঠন হিসাবে ভাষার অনেক বিভিন্ন শ্রেণি আছে—

প্রথমত—চিন, শ্যাম প্রভৃতি দেশের ভাষা কেবল ধাতু মাত্র—ধাতুসকল অন্য ধাতুর সহিত যুক্ত অথবা রূপান্তরিত হয় না।

দ্বিতীয়ত—কতকগুলি ভাষার ধাতু সকল পরস্পর যুক্ত হয়, কিন্তু রূপান্তরিত হয় না।

তৃতীয়ত—কতকগুলি ভাষার ধাতু স্বয়ং অথবা উপসর্গ ও প্রত্যয় যোগে রূপান্তরিত হয় ইত্যাদি। এক্ষণে দেখিতে হইবে সাঁওতালি ভাষা উল্লিখিত কোন্ শ্রেণির অধীন।

"হাকো" শব্দের অর্থ মৎস্য। দুইটি মৎস্য বলিতে হইলে সাঁওতাল "দুই মৎস্য" অথবা "মৎস্য দুই" বলে না, তাহারা একটি পৃথক প্রত্যয় শব্দের সহিত যোগ করে—"হাকো কিন" অর্থে দুইটি মৎস্য, কিন অর্থ দুই নহে। এইরূপ অনেক মৎস্য "হাকো-কো"। এই "কিন" অথবা "কো" আদি শব্দের সহিত সংযুক্ত হইয়া যায়, পৃথক থাকে না ; যেমন "দুইটি মৎস্যের" বলিতে হইলে সাঁওতাল "হসকা কিন রিনি" ও "বহু মৎস্যের নিকট" বলিতে হইলে "হাকোকো থেন" বলিয়া থাকে। সুতরাং ইহা প্রথম শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত নহে। এক্ষণে পরীক্ষা করা আবশ্যক, সাঁওতালি ধাতু পরস্পর যুক্ত ও সন্ধিগত অথবা স্বয়ং কিংবা উপসর্গ প্রত্যয় যোগে রূপান্তরিত হয় কি না। সাঁওতাল ধাতুর শেষ অক্ষর কদাপি লুপ্ত হয় না। সাঁওতালি ভাষা সন্ধি অত্যন্ত ঘৃণা করে। "বড়ে" (বটবৃক্ষ) সাঁওতালি করণকারকসূচক শব্দ "ইয়াতে" "বড়ের" সহিত "ইয়াতে" যুক্ত হইলে "বড়িৃযাতে" উচ্চারিত হয় না. সাঁওতাল স্পষ্টরূপে "বড়ে ইয়াতে" উচ্চারণ করে। কাড়া—(মহিষ) "কাড়া ইয়াতে" উচ্চারিত হয়। "তাহিন"—অর্থ "থাকা" (to remain) ইহার ভূত, ভবিষ্যৎ অথবা বচন ও লিঙ্গ প্রভেদে আদি শব্দের পরিবর্তন হয় না যথা—"তাহিন-আকিন" (তাহারা দুই জন থাকিবে) "তাহিন আকো" (তাহারা সকলে থাকিবে) "তাহিন-এন-আকিন" (তাহারা দুই জন ছিল) "তাহিন-এন-আকো" (তাহারা সকলে ছিল)।

সুতরাং দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির মধ্যবর্তী শ্রেণি মধ্যে সাঁওতালি পরিগণিত হইতে পারে। সাঁওতালি ভাষা agglutinative ধরনের ভাষা। ভাষার গঠনে একটি শব্দই যথাক্রমে ক্রিয়া, বিশেষ্য, বিশেষণ ইত্যাদি রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে, "ভাগলপুর কেদিনা"—সে আমাকে ভাগলপুরে রাখিয়া ছিল—Literally, he Bhagalpured me.

বিশেষণের সহিত নিম্নলিখিত শব্দগুলি সংযুক্ত হইয়া ক্রিয়া সূচনা করে—

বিশেষণ "মরাং" (বড়ো)

"আ"	হয়	...	মরাংআ	বড়ো হয়,
"গিয়া"	নিশ্চয় হয়	...	মরাংগিয়া	বড়ো নিশ্চয় হয়
"ওক'কানা"	হইতেছে	...	মরাংওক'কানা	বড়ো হইতেছে
"ওক'আ"	হইবে	...	মরাংওক'আ	বড়ো হইবে
"তেহেকানা"	ছিল	...	মরাং তেহেকানা	বড়ো ছিল
"এনা"	হইয়াছিল	...	মরাংএনা	বড়ো হইয়াছিল
"আকানা"	হইয়াছে	...	মরাংআকানা	বড়ো হইয়াছে
"লেনা"	নিশ্চয় হইযাছিল	...	মরাংলেনা	নিশ্চয় বড়ো হইয়াছিল

ক্রিয়ার সহিত নিম্নলিখিত শব্দগুলি যুক্ত হইয়া কাল সূচনা করে—

ক্রিয়া "রোড়" কহা

"এডা	রোরেডা	কহা
"এতকানা"	রোড এতকানা	কহিতেছে
"এত'তাহেকানা"	রোড় এত তাহেকানা	কহিত
"এত কান তাহেকানা"	রোড়কান তাহেকানা	কহিতেছিল
"আ"	রোড় আ	কহিবে
আকাদা	রোড় আকাদা	কহিয়াছে
কেদা, লেদা	রোড় কেদা	কহিয়াছিল

লিঙ্গ

বিশেষ্যের তিনটি লিঙ্গ আছে—পুং, স্ত্রী, উভ, সর্বনাম ও ক্রিয়ার স্ত্রী-পুরুষভেদ সূচক কোনো চিহ্ন নাই।

নিম্নলিখিত তিন প্রকার বিধানে সাধারণত লিঙ্গভেদ হইয়া থাকে।

(১) বিভিন্ন শব্দ দ্বারা যথা—

কাড়া (মহিষ)—বিটকিল (মহিষী)

(২) শেষ অক্ষরের বিভিন্নতা দ্বারা যথা—

কোড়া—(যুবক)—কুড়ি (যুবতি)
ভেড়া—ভেড়ি

(৩) বিভিন্ন লিঙ্গা সূচক শব্দ দ্বারা যথা—

এঁড়িয়া সাদম (অশ্ব)—এঙ্গা সাদম (স্ত্রী অশ্ব)
সিম আঁড়ি (মোরগ)—সিম এঙ্গা (মুরগি)

বচন

তিনপ্রকার—একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন। সাধারণত "কিন" যোগে দ্বিবচন "কো" যোগে বহুবচন হইয়া থাকে। "কিন" বিশেষ্যের পরে সংযুক্ত হয়, স্থলে স্থলে অগ্রেও হইয়া থাকে।

কারক		*হোড়*
কর্তা	হোড়	মনুষ্য
কর্ম	হোড়	
করণ	হোড়	তে, ইয়াতে, হোতেতে
সম্প্রদান	হোড়	থেন
অপাদান	হোড়	খোন, খনান
সম্বন্ধ	হোড়	রেন, রিয়াক, রিয়াং

চেতনের সহিত সম্বন্ধ বুঝাইতে রেন, অচেতনের সহিত সম্বন্ধ বুঝাইতে রিয়াক, রিয়াং)

অধিকরণ	হোড়	রে
সম্বোধন	এ হোড়, এহো, হেন্ডা ;	

সাঁওতালের নানাপ্রকার বিভক্তি, হর্ষ ও বিস্ময়সূচক শব্দ ইত্যাদি দৃষ্ট হয়। বহুলতা ভয়ে তাহার উল্লেখ করা হইল না।

বিশেষণের দুই অথবা বহুর মধ্যে উৎকর্ষতাসূচক শব্দও সাঁওতালিতে আছে। "খন" ও "সানাংখন" তজ্জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বলিষ্ঠ ঈষৎ-পুষ্ট-ওষ্ঠ সাঁওতালকে দেখিলে মনে হয় কার্য ও পরিশ্রম জন্য ঈশ্বর ইহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। চিন্তাশীলতার কোনো চিহ্নপ্রাপ্ত হওয়া যায় না। সম্ভবত সেই কারমে abstract noun সাঁওতালি ভাষায় নাই বলিলেও চলে তবে সভ্যতা বিস্তৃতির সহিত নূতন শব্দ সৃষ্ট হইতেছে।

সর্বনাম ও ক্রিয়ার অনেক প্রকার শব্দ দৃষ্ট হয়।

ইং (আমি) আলাং (আমরা দুই জন—যাহার সহিত কথা হইতেছে)

আলিং (আমরা দুইজন—যাহার সম্বন্ধে কথা হইতেছে)

আবো (আমরা—যাহার সহিত কথা হইতেছে সেই ব্যক্তি সমেত)

আলো (আমরা—যাহার সহিত কথা হইতেছে সে ব্যক্তি ব্যতীত)

এইরূপ অন্যান্য পুরুষের সর্ববিধ বচন ও কারকসূচক পদ দৃষ্ট হয়।

সংখ্যা

মিট—১	ইয়াই—৬
বার, বারিয়া—২	ইরাল—৮
পি, পিয়া—৩	আরে—৯
পন, পনিয়া—৪	গেল—১০
মোড়ে—৫	গেলমিক—১১
তুরুই—৬	গেলবার—১২

এইরূপ "গেল"-এর সহিত পি, পন ইত্যাদি যোগ হইয়া উনিশ পর্যন্ত গণনা হয়। একাদশ হইতে অষ্টাদশ পর্যন্তও এই ধরনে হইয়া থাকে।

মিট ইশি—এককুড়ি

বার ইশি—দুইকুড়ি

ইশির সহিত দুই, তিন ইত্যাদি যোগ করিয়া কুড়ি হিসাবে ২০০ পর্যন্ত গণিত হয়। বর্তমান সাঁওতাল সম্প্রদায় স্থানে স্থানে "শ" "হাজার" প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া থাকে। সাঁওতালের দশ সংখ্যাধিক গণনা ক্ষমতা একটি বিশেষ ঘটনা দ্বারা প্রকাশ পাইয়া থাকে, সাঁওতাল সমাজে কোনো উৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করা অবশ্যক হইলে যদ্যপি নিমন্ত্রণ করিবার দিন হইতে উৎসবের দিনের মধ্যে দশ দিবসের অধিক ব্যবধান থাকে তাহা হইলে কতকগুলি রজ্জুতে ওই কয়েক দিবসের সমসংখ্যক গ্রন্থি প্রদত্ত হয় এবং ওই এক একটি গ্রন্থিযুক্ত রজ্জু আত্মীয়কুটুম্ব সদনে প্রেরিত হয়। প্রত্যহ এক একটি গ্রন্থি উন্মুক্ত হয় যে দিবস শেষ গ্রন্থি উন্মোচিত হয় সেই দিবস উৎসবের দিন। আত্মীয়গণ সেই দিবস উৎসব বাটিতে আসিয়া উপস্থিত হয়।

সংস্কৃত অথবা বাঙ্গালার অনেক শব্দের সহিত সাঁওতালি অনেক শব্দের সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। সাধারণ ভাষায় 'স্তম্ভকে' 'খুঁটা' কহে সাঁওতালও খুঁটা কহে। সাধারণ ভাষায় 'পেট' বলে, সাঁওতাল স্থূলোদর ব্যক্তিকে "পটিয়া" বলে ; সংস্কৃত "চিৎ" যোগে অনেক শব্দ উৎপন্ন হয় যথা কশ্চিৎ ইত্যাদি—

সাঁওতালি চেৎ—কী, চেৎ—হং—কোনো দ্রব্য, চেৎ—বো—বোধহয় ;

সাঁওতালি—'যা—যুগ'—অনেক সময় যাবত, অনেকবার

দিন—কালোম —গত বৎসর

দিন—হিলোম—দৈনিক,

কালং—আগামী বৎসর,

হাল—কালোম—দুই বৎসর পূর্বে

মাহাং—কালোম—তিন বৎসর পূর্বে

সম্ভবত আর্যজাতির সহিত এই আদিম জাতির সংশ্রব ও সংঘর্ষ হওয়ায় আর্যজাতি

তাহাদের কোনো কোনো শব্দ গ্রহণ করিয়াছিলেন, পক্ষান্তরে ইহারাও আর্যজাতির অনেক অনুকরণ করিয়াছিল। ইহা অসম্ভব নহে, কারণ ইংরাজি ভাষাতেও অনেক বাঙ্গালা শব্দ প্রবেশলাভ করিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষাতেও অনেক ইংরাজি শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে।

উভয় ভাষার নিকট সম্পর্ক না থাকিলে এইরূপ শব্দের সামঞ্জস্যতা দৃষ্ট হয় না। উড়িয়া, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষা সংস্কৃতমূলক। বাঙ্গালার সহিত সংস্কৃতের এত নিকট সম্পর্ক যে কতকগুলি এরূপ সংস্কৃত শ্লোক দৃষ্ট হয় যে তাহা প্রথম দৃষ্টিতে বাঙ্গালা বলিয়া ধারণা হয় যেমন—

অফল জননগত জনগন ভরণ।
সকল গরল হর পরভর শরণ॥
মদন দলন কর তপনজ দমন।
জয় জয় নর লয় ভব ভয় হরণ॥

খরতর বর শর হত দশবদন।
খগচর নগধর ফণধর শয়ন॥
জগদঘ মপহর ভবভয় শমন।
পরপদ লয়কর কমলজ নয়ন॥

সেইরূপ সাঁওতালির সহিত আর্যজাতির ভাষারও অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। সাঁওতালের পর্বাদিও আর্যজাতির শাস্ত্রোক্ত পর্বের অনুকরণ। তৎবিষয় 'পার্বত্য-কাহিনিতে' বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃতমূলক হইলেও সাঁওতালি ভাষার দুই-এক স্থলে বাঙ্গালা অপেক্ষাও উৎকর্ষতা দৃষ্ট হয় যেমন বাঙ্গালায় দ্বিবচনের প্রায় ব্যবহার নাই কিন্তু সাঁওতালের তাহা আছে। সাঁওতাল পরোক্ষ অতীত ক্রিয়া ও তৎপূর্বের ক্রিয়ারও ব্যবহার করে। এই সকল কারণে সাঁওতাল আর্যজাতিরই কোনো নিম্নতম শ্রেণি বলিয়াও অনুমান করা নিতান্ত কল্পনাপ্রসূত বলিয়া মনে হয় না। তাহাদিগকে হিন্দু বলিবার অনেক কারণ আছে। এ বিষয়ের আলোচনা স্থানান্তরে করিবার ইচ্ছা রহিল।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের কার্যবিবরণ ● ১৩১৮ বঙ্গাব্দ (১৯১১ খ্রিস্টাব্দ)

শুদ্ধি ॥ হসকা কিন রিনি→হাকোকিনরেন; হাকোকো থেন→হাতোকো ঠেন, বড়ে→বাড়ে; কাড়া→কাডা; তাহিন→তাহেন, মরাংআ→মারাংআ; তেহেকোনা→তাহেঁকানা; বোড়→রড়, এডা→এদা; এতকানা→এৎকানা, বিট্‌কিল→বিতকিল; ভেড়া→ভেডা; আঁড়ি→সাণ্ডি; হোতেতে→হতেতে; রিয়াক→বেয়াঃ; রিয়াং→রেয়াঞ; হেন্ডা→হেন্দা; ইং→ইঞ; আলিং→আলিঞ; আলো→আলে; মিট→মিৎ; গেলমিক→গেলমিৎ; হিলোম→হিলোঃ; কালং→কালম, হাদ→হল; বার→বার্; বারিয়া→বারেয়া, পি→পে; পিয়া→পেয়া, পন→পোন; পনিয়া→পোনেয়া; মোড়ে→মড়েঁ

—সম্পাদক



সাঁওতাল-জীবন

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

আমাদের আশ্রমের পশ্চিম প্রান্তে সীমান্ত-রেখায় বিরল-তরুচ্ছায় ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কুটিরযুক্ত যে-কয়খানি গ্রাম দেখা যায় তাহাদিগের অধিবাসী দরিদ্র সাঁওতালদিগের জীবন সম্বন্ধে কিছু লিখিবার চেষ্টা করিব। এই সাঁওতালদিগের অধিকাংশই দরিদ্র। গ্রাসাচ্ছাদনের অতিরিক্ত সঞ্চয় করিবার ক্ষমতা ইহাদিগের নাই। তাহাদের সামান্য উপার্জন-লব্ধ ধন আহার এবং পোশাকে ব্যয়িত হয়। ইহাদিগের মধ্যে যাহারা একটু অবস্থাপন্ন তাহাদের দুই-তিনটি গৃহ, একটি গোয়াল, একটি শূকরের খোঁয়াড়, গুটিকতক মুরগি, তিন-চারিটি লাঙল, বিঘা-কতক জমি এবং হয়ত কুড়ি ত্রিশ টাকা সঞ্চিত থাকিলেও থাকিতে পারে। তাহা ব্যতীত প্রত্যেকের ব্যবহারোপযোগী দ্রব্য, যেমন, একটি দড়ি খাট, কয়েকটি বাটি, মাটির হাঁড়ি একটি, কুড়ুল একটি, কাঠের চিরুনি, ইত্যাদি আছে।

ইহাদিগের গৃহের চুতষ্পার্শ্ব গোময়-লিপ্ত করা হয় ; চমৎকার পরিষ্কার, কোথাও একটুও ময়লা নাই। কাহারো কাহারো ঘরের চালে লাউ-কুমড়ার চারা লতাইয়া উঠিয়াছে। ক্বচিৎ দুই-একটি ফলও দেখা যায়। ইহারা ফুল অত্যন্ত ভালোবাসে। বসন্তকালে ইহাদিগের একটি উৎসব হয়। তখন বসন্ত-দেবতাকে পুষ্পোপহার প্রদান করিয়া ইহারা পুনরায় নূতন পুষ্প কর্ণে অথবা মস্তকে ধারণ করে। এই পূজাকে প্রস্ফুটিত বাহা পূজা বলে। সে সম্বন্ধে পরে বলিতেছি।

ইহারা গাঁদাফুলের অত্যন্ত ভক্ত। ইহাদের গৃহের পার্শ্বে শিম অথবা অন্য কোনো তরিতরকারির চারা লতাইয়া উঠিবার জন্য ইহারা মাচা নির্মাণ করিয়া দেয়। এগুলিকে সজীব রাখিতে ইহাদিগকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হয়। এই মরুভূমির মতো অনুর্বর

প্রদেশে জলাভাবে কোনো কিছু উৎপন্ন করা অত্যন্ত কষ্টকর। এইসমস্ত মাচার নিম্নে অথবা পার্শ্বে শ্রেণিবদ্ধভাবে গাঁদাফুলের ঝাড় দেখা যায়। শীতকালে এইসমস্ত ঝাড় হরিদ্রা-বর্ণে রঞ্জিত হয় এবং প্রচুর পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়। আমরাও প্রয়োজন হইলে ইহাদের নিকট হইতে ফুল আনিয়া থাকি। সকলেরই নিজের গৃহের পার্শ্বে একটু-একটু জমি আছে। ইহাতে শাক-সবজি উৎপন্ন হয়। বেগুন, শশা, কুমড়া, ইত্যাদি কাহারো কাহারো ক্ষেতে দেখা যায়। তাহা ছাড়া প্রায় প্রত্যেকেরই তিন-চার বিঘা খাজনা-করা ধানের জমি আছে। জমিদারকে খাজনা দিয়াও যাহা অতিরিক্ত থাকে, তাহার এবং শাকসবজির সাহায্যে কোনো প্রকারে ইহাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ হয় এবং সকলেই তাহাতে সুখী। সভ্যসমাজ হইতে দূরে পড়ায় ইহাদের কোনো উচ্চ আশা নাই। অর্থে মনের প্রকৃত আনন্দ হয় না। মানুষ দরিদ্র অবস্থাতে থাকিয়াও সুখী হইতে পারে। আমি একবার একটি সাঁওতাল রমণীর সহিত আলাপ করিয়াছিলাম। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা কবিলাম, "তোমার কি কিছু অভাব আছে? তোমার পরিবারে লোকসংখ্যা কত?" সে বলিল, "আমার কোনো অভাব নাই, আমরা সংসারে চারিজন। আমার পুত্র, পুত্রবধূ এবং একটি শিশু পৌত্র। আমার শূকর আছে, মুরগি আছে, খেতে ধান আছে ; আমার আবার কীসের অভাব?" ইহাতেই বুঝা যায় যে ইহারা কত সুখে জীবন যাপন করে। কিন্তু অর্থাভাবে যে তাহাদিগকে বিপদে পড়িতে হয় না, তাহা বলিতেছি না।

এক-একটি পরিবার তিন-চার জন অথবা পাঁচজনেও গঠিত হয়। পুরুষেরা কাজ করিয়া দৈনিক চারি আনা করিয়া উপার্জন করে এবং স্ত্রীলোকেরা গৃহের কার্যসমূহ সম্পন্ন করে। কখনো-কখনো স্ত্রীলোকেরাও শারীরিক কর্ম করিয়া জীবিকা উপার্জন করে এবং বালকেরা গো-মেষাদি লইয়া সমস্ত দিন মাঠে-মাঠে চরাইয়া বেড়ায়।

ইহাদিগের ভোজন-ব্যাপার অত্যন্ত সাধাসিধা রকমের। প্রাতে কার্যে বাহির হইবার পূর্বে পুরুষেরা বাটিতে শীতল জলে ভাত ভিজাইয়া লইয়া বাহির হয় এবং দ্বিপ্রহরে কর্মস্থানে আহার করে। ইহাদিগের প্রধান অস্ত্র তিরধনুক। বাদ্য মাদল এবং পানীয় তাড়ি। এই তাড়িই তাহাদের অত্যন্ত অপকার করিতেছে। যৎসামান্য উপার্জিত অর্থের অধিকাংশই ইহাতে ব্যয়িত হয়, কিন্তু মদ্যপান ইহাদিগের ভিতর এত প্রচলিত হইয়াছে যে, ইহাকে তাহারা দোষের মধ্যেই গণ্য করে না। যে কোনো উৎসবে, পূজায়, বিবাহে, ইহাই ইহাদিগের সর্বপ্রধান পেয়। ইহারা অতিশয় কুসংস্কারাপন্ন। অপদেবতার প্রতি ইহাদের বিশ্বাস প্রগাঢ় এবং অটল এবং বিশেষ-বিশেষ সময়ে ইহাদের পূজা করে। বিচ্ছিন্নভাবে বাস করে বলিয়া ইহাদিগের কোনো স্থায়ী সমাজ নাই। তবে তিন-চারিটি গ্রামের প্রধান ব্যক্তিদিগকে লইয়া একটি পঞ্চায়েৎ আছে। কোনো অন্যায় হইলে সকলে নির্দিষ্ট স্থানে একত্র হয় এবং বিচার করে। যে গ্রামের মোড়ল, তাহাকে উচ্চাসন প্রদান করা হয়।

সভায় বাদী-প্রতিবাদী দুই দলের রীতিমত তর্ক আরম্ভ হয়। প্রত্যেকেই মোড়লের আদেশ লইয়া নিজের পক্ষকে সমর্থন করে। এই প্রকারে যে পক্ষ জয়লাভ করে, সেই পক্ষের উকিল-ব্যারিস্টারগণ মক্কেলের নিকট হইতে দুই-একটাকা পুরস্কার পায়। এইপ্রকারে ইহাদিগের বিচার-কার্য সম্পন্ন হয়। সাঁওতালি ভাষায় ইহার নাম হালিসা। এই হালিসায়

আমি কয়েকবার উপস্থিত ছিলাম। কী বালক, কী বৃদ্ধ—সকলেই এই বিচারে যোগ দিতে পারে, কিন্তু সাবালক না হইলে কোনো পক্ষে যোগ দিয়া তর্ক করিবার ক্ষমতা হয় না। এইসমস্ত গ্রাম-সম্বন্ধীয় বিচার্য বিষয় ইহারা কাহারো নিকট প্রকাশ করে না।

মাংসে ইহাদের বড়ো রুচি। প্রায় সমস্ত পশুপক্ষীর মাংসই ইহারা ভক্ষণ করে।

ইঁদুর, কাক, শূকর, খরগোস, এবং নানাজাতীয় পক্ষী ইহাদিগের প্রধান খাদ্য। ছয়-সাত বৎসর পূর্বে ইহারা মাংস অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিত।

আজকাল এ-বিষয়ে একটু উন্নতি হইয়াছে। আমি একদিন ইহাদের ভোজন-ক্রিয়ার পূর্বে তথায় উপস্থিত ছিলাম। একদিন দূর হইতে জনতা এবং লোকের কোলাহলে কৌতূহলী হইয়া নিকটে গমন কবিয়া দেখিলাম বিরাট-আকার দুই শূকর রক্তাক্ত-কলেবরে পড়িয়া আছে, বক্ষে তিরের ফলার ক্ষত-চিহ্ন। বালক-বৃদ্ধ সকলেই প্রফুল্লমুখে শুষ্ক পত্র আহরণে ব্যস্ত। পরে স্তূপাকারে মৃত শূকরের উপর পত্র সজ্জিত করিয়া তাহাতে অগ্নিদান করা হইল। এমন দুর্গন্ধ ধূম উঠিতে লাগিল যে, আমাকে বাধ্য হইয়া সে-স্থান পরিত্যাগ করিতে হইল। এইপ্রকারে তিন-চারবার শূকরটাকে দগ্ধ করিলে পর কাস্তের সাহায্যে ইহাকে খণ্ড-খণ্ড করিয়া বাড়িতে-বাড়িতে প্রেরণ করা হইল এবং সকলে পৃথক-পৃথকভাবে রন্ধন করিয়া ভোজন করিল।

সন্তান জন্মিলে পাঁচ দিন পর্যন্ত সূতিকা-গৃহে থাকিতে হয়। তারপর নবজাত শিশু এবং প্রসূতিকে সকলে স্পর্শ করিতে পারে। নামকরণের সময় গ্রামের সকলে সমবেত হয়, শিশু পিতৃমাতৃহীন হইলে কয়েক জন বিশেষ ব্যক্তি মিলিত হইয়া শিশুর নাম রাখে। কিন্তু যদি শিশুর পিতামাতা বর্তমান থাকে, তবে পুত্র জন্মিলে পিতার নামই তাহাকে অর্পণ করা হয়; এবং কন্যা জন্মিলে মাতার নামেই তাহার নাম রাখা হয়।

পুরুষ স্ত্রীলোক সকলেরই কান বেঁধা হয়। জন্মগ্রহণের তিন-চারি মাসের মধ্যে উক্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

ইহাদিগের মধ্যে উচ্চ-নীচ জাতি আছে। তন্মধ্যে মন্ডি, হেমবোল এবং হাঁসদাও এই তিনটি প্রধান। এই তিন জাতির পরস্পরের ভিতর উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু কন্যা ও পাত্র এক জাতি হইলে বিবাহ হয় না। নিমন্ত্রিত লোকদিগকে ভোজন করাইবার ভার বরকর্তাকে গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু ইচ্ছা করিলে তাঁহারা বিকালে কন্যাকর্তার বাটীতে সদলবলে আহার করিতে পারেন। বিবাহে বরকর্তাকে কন্যার পিতাকে বারো টাকা পণস্বরূপ দিতে হয়। এই প্রাপ্য টাকা দেওয়া চাই, ইহার কমও গ্রহণ করে না এবং বেশিও আশা করে না। ইহা ছাড়া আরও কাপড়, গহনা ইত্যাদি দিতে হয়। বিবাহ কন্যার বাটীতেই সম্পন্ন হয়। আমাদের ন্যায় ইহাদেরও একদল ঘটকসম্প্রদায় আছে। তাহারা পাত্রপাত্রী নির্বাচন করিয়া থাকে।

ইহাদের পাঁজি নাই। সুতরাং এক নূতন উপায়ে বিবাহের দিন নির্দিষ্ট করা হয়।

যতদিন পরে বিবাহ দিবার ইচ্ছা হয়, একটি হরিদ্রাবর্ণে রঞ্জিত সূত্রে ততগুলি গ্রন্থি দেওয়া হয়। তৎপরে প্রতিদিন একটি-একটি করিয়া খুলিয়া ফেলিতে হয়। শেষ গ্রন্থির দিন বিবাহ সম্পন্ন হয়।

বিবাহের পূর্বদিন গ্রামের সমুদয় লোক বরকে দেখিতে আসে। তখন কেহ এক টাকা, কেহ একখানি কাপড় ইত্যাদি যার যাহা সাধ্য দিয়া যায়। তাহাতে পাত্র প্রায় নয়-দশ টাকা পায়। বিবাহের দিন প্রাতে 'গায়েহলুদ' হয়। উভয়ের গৃহে পৃথক-পৃথকভাবে বরকন্যার গায়ে হলুদ দেওয়া হয়। পাত্রী সমবেত এয়োস্ত্রীদিগকে সিঁদুর প্রদান করে।

বিবাহের পূর্বে কন্যা সীমন্তে সিঁদুর ধারণ করিতে পারে না।

যথাসময়ে বর কন্যার গৃহে আগমন করে। এইসময় একটু খেলা হয়। বরযাত্রী এবং কন্যাযাত্রী উভয় দল মুখোমুখি হইয়া দণ্ডায়মান হয়। প্রত্যেকেই একটি যষ্ঠি গ্রহণ করে। তারপর পাঁয়তারার মতো কখনও বা উভয় দল সম্মুখে, কখনও বা পিছনে সরিয়া যায়। প্রায় ঘণ্টাখানেক উভয় দলের মধ্যে এই ক্রীড়া চলিতে থাকে। তৎপরে বরযাত্রীরা সমুদায় যষ্টি কন্যাযাত্রীদিগের পদতলে রাখিয়া দেয়। ইহা আত্ম-সমর্পণের চিহ্ন; আমাদের দেশে পূর্বকালে ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধ করিয়া কন্যা জয় করিয়া তবে বিবাহ করিতেন। ইহাদিগের ভিতর সেই প্রথা ক্রীড়াকারে পরিণত হইয়া চলিয়া আসিতেছে। তৎপরে বরযাত্রীরা ক্রমাগত তাহাদের অস্ত্র পুনর্গ্রহণ করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু গ্রহণ করিতে পারিতেছে না, বারবার এইপ্রকার ভাব দেখাইয়া ফিরিয়া আসে, তাহার পর পলায়নোদ্যত হইলেই কন্যাযাত্রীরা তাহাদিগকে হস্তের ইশারায় ডাকিতে থাকে। বলা বাহুল্য, এখনও সেইপ্রকার ক্রীড়া চলিয়া থাকে। তাহাদের আহ্বানে বরযাত্রীগণ নিকটে আসিলে কন্যাযাত্রীরা হাতের ইশারায় তাহাদের মুখ মুছাইয়া দেয় এবং মুখে খাদ্য প্রদানের ভাব প্রদর্শন করে। অপর পক্ষও হাঁ করিয়া খাদ্য গ্রহণ ও চর্বণের ভাব প্রদর্শন করে। এইপ্রকার অভ্যর্থনা শেষ হইলে তাহাদিগকে বিনোদন করিবার নিমিত্ত নাচ এবং গান আরম্ভ হয়। সাঁওতাল রমণীরা এই নৃত্য ও গীত করিয়া থাকে। সকলে শ্রেণিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হয়, তৎপরে গানের সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণিরক্ষা করিয়া নানাবিধ অঙ্গভঙ্গি-সহকারে নৃত্য করিতে থাকে। নৃত্যগীত সমাপ্ত হইলে কন্যাপক্ষীয়গণ বরযাত্রীদিগকে লইয়া একটি উচ্চ মাচার তলে গমন করে। তারপর যষ্টির দ্বারা উভয় দলই তাহাতে আঘাত করে। তাহার অর্থ, এই গৃহ-সম্পত্তি সবই আমাদের উভয় দলের। এইপ্রকারে দুটি পৃথক জাতি পরস্পরের সহিত একতা-সূত্রে আবদ্ধ হয়। তৎপরে দ্বিপ্রহরে বিবাহ-কাল নির্দিষ্ট হয়। বরকন্যা উভয়ে দুইটি কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট হয়। তখন সকলে মিলিয়া কন্যাকে পিঁড়িতে উঠাইয়া বরকে তিনবার অথবা পাঁচবার প্রদক্ষিণ করে। ইহা সমাপ্ত হইলে উভয়ের গাত্রে মন্ত্রপূত বারি নিক্ষেপ করা হয় এবং কন্যার সীমন্তে সিঁদুর লেপন করা হয়। ইহার পূর্ব-পর্যন্ত কন্যার মুখ অবগুণ্ঠনে আবৃত থাকে। তাব পর কন্যার অবগুণ্ঠন মোচন করা হয় এবং বরকন্যা উভয়ের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করে। ইহাই শুভদৃষ্টি। এইপ্রকারে বিবাহ সম্পন্ন হইলে সমস্ত দিন নৃত্যগীত ইত্যাদি চলিতে থাকে। কন্যা স্ত্রীলোকদিগের সহিত এবং বর পুরুষদিগের সহিত নৃত্যে যোগদান করে এবং উভয় দল মুখোমুখি হইয়া নৃত্য করিতে থাকে। এইসময় কন্যাকে তাহাব সম্পর্কিতদিগের নিকট হইতে যথেষ্ট ঠাট্টা-বিদ্রুপ সহ্য করিতে হয়। পাত্রও বাদ যায় না। ইহার পর কন্যা বরের গৃহে তিনদিন যাপন করে। তাহার পর পিতৃগৃহে একবৎসর যাপন করিয়া শ্বশুর-গৃহে আগমন করে এবং স্বামী-সহবাসে কালযাপন করে।

বৎসরে প্রত্যেক মাসেই ইহাদের পূজা অথবা পার্বণ আছে। ইহাবা ফাল্গুন হইতে মাস

গণনা করে। এই ফাল্গুন মাসে ইহাদের বাহা পূজা অর্থাৎ বসন্ত পূজা। এই পূজার পূর্বে কোনো সাঁওতাল-রমণী পুষ্পাভরণে সজ্জিত হইতে পারে না, এবং নূতন ফল দেবতাকে না উৎসর্গ করিয়া ভক্ষণ করিতে পারে না। চৈত্র মাসে ইহাদিগের কোনো পূজা নাই। বৈশাখে হোমপূজা। এই পূজার আরাধ্য দেবতা মহাদেব। ইহারা একটি প্রস্তর শিলার নিকট পূজা প্রদান করিয়া সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করে। কয়েকটি বিশেষ নিয়ম-অনুসারে প্রত্যেক পূজার কার্যই সম্পন্ন হয়। প্রত্যেক গ্রামে একঘর করিয়া পুরোহিত আছে। এই পরিবারের মধ্যে বালক বৃদ্ধ সকলেই পূজা করিবার অধিকাররী। একটি পাত্রের উপর আতপ চাউল স্তূপাকারে সাজাইয়া রাখে, তদুপরি একটি সুপারি স্থাপন করে। যদি সেটি নিম্নে পতিত হয় তবে দেবতা প্রসন্ন হইয়াছেন এরূপ মনে করিতে হইবে। নতুবা জানিতে হইবে ঈশ্বর অপ্রসন্ন রহিয়াছেন।

জ্যৈষ্ঠ মাসে 'এরো পূজা'। গ্রামবাসী সকলে মিলিয়া সর্দারকে লইয়া ঈশ্বরের পূজা করে এবং তাহার পর প্রত্যেকে নিজের গৃহেও সেই আরাধ্য দেবতার পূজা করিয়া থাকে।

আষাঢ়ে হরিয়াও পূজা। সেই পূজার ইষ্টদেবতা ইন্দ্রদেব। প্রচুর বারিবর্ষণ করো—এই একমাত্র বর ইহারা তাঁহার নিকট প্রার্থনা করে। শ্রাবণ মাসে কোনো পূজা নাই। ভাদ্রে ছাতা পূজা। কেবলমাত্র আমোদের জন্য এই পূজা হয়। এই পূজায় নৃত্য গীত এবং জাঁকজমকের সহিত বাদ্য হয়। প্রথমে দুটি খুঁটি একহস্ত ব্যবধানে মৃত্তিকাতে প্রোথিত হয়। তৎপর একটি বংশখণ্ড আড়াআড়িভাবে স্থাপন করা হয়। ইহার মধ্যস্থলে একটি ছিদ্র থাকে এবং একটি দীর্ঘ-সরু বংশ এই ছিদ্রে ঋজুভাবে দাঁড় করানো হয়। তাহার ডগায় কাগজের টোকা নির্মাণ করিয়া ঝুলাইয়া দেওয়া হয় এবং তাহার তলদেশে অনেক ফুল ছড়াইয়া দেওয়া হয়। আশ্বিন মাসে উহারা দিবি অর্থাৎ দুর্গাপূজা করে। এই পূজাতেই সর্বাপেক্ষা ঘটা হয়। নানাবিধ নৈবেদ্য ফলমূল দিয়া ইহার সম্মুখে স্থাপন করা হয় এবং দেবী প্রসন্ন কিনা, তাহা চাউলের উপর সুপারি দিয়া ঠিক করে। তৎপর যে পুরোহিত সে এই মন্ত্র দুই তিনবার উচ্চারণ করে "মা তবে এমাম কানাই" অর্থাৎ মা তবে তুমি আমাদের পূজা গ্রহণ করো। ইহা ছাড়া আর দ্বিতীয় মন্ত্র নাই। প্রায় প্রত্যেক পূজায় বলিদান হয়। এই পূজাতে বিশেষ করিয়া হয়। প্রতিমা একরাত্রি এবং পরদিন বিকাল পর্যন্ত গৃহে থাকে এবং ভাসানের সময় সকলে মিলিয়া নিকটস্থ জলপূর্ণ স্থানে ফেলিয়া দেয়। বলা বাহুল্য এই পূজায় নেশা, নাচ এবং বাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে হয়। প্রত্যেক শুভ অনুষ্ঠান সকলকে লইয়া সম্পন্ন হয়—কাহারো গৃহে পূজা হইলে সকলকেই নিমন্ত্রণ করা হয়। সুতরাং ভোজনও সামান্য-রকমে সম্পন্ন হয়। ভাত এবং কিছু মাংস। ইহাতেই সকলে খুশি।

কার্তিক মাসে সরস্বতী পূজা। ইহারও মূর্তি ক্রয় করা হয় এবং উপরোক্ত নিয়মানুসারে পূজা সম্পন্ন হয়।

অগ্রহায়ণ মাসে নওবাই অর্থাৎ নবান্ন হয়। ইহা একটি পরব মাত্র। নূতন ধান্য ক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন হইলেই সকলে মিলিয়া দুধ, গুড়, কলা এবং নূতন চাউল দিয়া মাখিয়া গৃহদেবতাকে নিবেদন করিয়া ভোজন করে।

পৌষ মাসে সহোরাই পূজা। এই পূজাটি বাঁধা পূজা নামে আমাদের নিকট সুপরিচিত।

এইসময়ে গৃহপালিত উপকারী পশুদিগকে ইহারা পূজা করে। বাস্তবিক এইটি খুব চমৎকার। পশুরা যদিও অত্যন্ত নীচ তথাপি তাহারা আমাদের উপকার করে বলিয়া একদিক দিয়া আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র এবং এই পূজা তাহাদিগকে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন ভিন্ন আর কিছুই নয়। উক্ত পশুদিগের কপালে সিঁদুর লেপন করিয়া নবীন তৃণ ভক্ষণ করানো হয়। তারপর তাহাদিগকে প্রণাম করিয়া সকলে মিলিয়া উৎসব করে। মাঘ মাসে মাঘ পূজা। এই পূজাটি 'বর্ষ-শেষ' পূজা সুতরাং ধূমধামও যথেষ্ট হয়।

ইহারা বিশিষ্ট দিনে অপদেবতাকে পূজা করে। গ্রামের পশ্চিমে প্রকাণ্ড একটি বট বৃক্ষ আছে। অন্ধকার রাত্রে সেই বৃক্ষের নিম্নে জীবন্ত ছাগশিশু বাঁধিয়া রাখে। যদি সকালে তাহাকে পাওয়া যায় তবে কাটিয়া ভক্ষণ করে। কিন্তু এযাবৎ কোনো অদৃশ্য হস্ত এই বলি অপরহণ করে নাই। প্রাতে জীবন্ত লোকের হস্তেই তাহাদিগকে প্রাণ হারাইতে হয়।

মৃতের ইহারা সৎকার করে। পরিবারের মধ্যে কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে স্বজাতীয়রা সকলে মিলিয়া মৃতদেহ খাটিয়াতে লইয়া শ্মশানে গিয়া পোড়াইয়া ফেলে এবং একটি অস্থি লইয়া সেই দিনই দামোদরে নিক্ষেপ করিয়া আসে এবং স্নান করিয়া গৃহে আগমন করে। সেই দিন গ্রামের লোকেরা তাহাদের গৃহে সমবেত হয়। পরে প্রত্যেকেই চুল এবং দাড়ি-গোঁফ ছাটিয়া ফেলে। কেবল সেই পরিবারের সকলে মাথা মুণ্ডন করে। তারপর সকলে মিলিয়া ভোজন করে। মাছ-মাংসও এই খাওয়াতে নিষিদ্ধ নহে।

ইহাদিগের ভাষার একবর্ণও আমাদের বোধগম্য হয় না। কিন্তু অল্পকাল শিক্ষা করিলেই সরল হইয়া পড়ে। ইহাদিগের ক্রিয়ার আকৃতিগুলিই বিশেষ শিক্ষণীয়। কিন্তু তার মধ্যেও বেশ একটি বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে। উহাদিগের সাতটি ক্রিয়ার আকৃতি আছে। বাংলায় যেমন তেছি, তেছিলাম, ব, আছি, আছিলাম অভ্যাস এবং আদেশ আছে, ইহাদিগেরও তেমনি 'লেনাই', 'কানাই', 'আকানাই', 'কান্তাহেঁআই', 'আই', 'হেলেনাই', 'মে' ইত্যাদি আছে। এইগুলিই সাঁওতালি ক্রিয়ার নামের পরে বসাইয়া দিলেই ভিন্ন-ভিন্ন আকার এবং অর্থ ধারণ করে। 'বসা'কে সাঁওতালিতে দুড়ু বলে। ইহার পর বসিবে, বসিতেছে ইত্যাদি মানে বোঝায়। নিম্নে একটি যথাক্রমে উক্ত পদগুলি বসাইয়া দিলেই যথাক্রমে বসে, তালিকা প্রদত্ত হইল—

দৌড়ান	দৌড়ায়	দৌড়াইতেছে	দৌড়াইবে	দৌড়াইতেছিল	দৌড়াইয়াছে	দৌড়াইয়াছিল
দৌড়	দৌড়কানাই	দৌড়-আকানাই	দৌড়আই	দৌড়-কান্তাহেঁআই	দৌড়হেলেনাই	দৌড়লেনাই



সাঁওতালদের গ্রামে

শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়

আজ প্রায় ২৫/২৬ বৎসরের কথা, তখন আমি সাঁওতাল পরগনায় স্কুল-পরিদর্শনের কার্যে নিযুক্ত ছিলাম। একবার গড্ডা মহকুমায় যাইবার আদেশ হইল। ডেপুটি কমিশনার সাহেব সেখানে যাইবেন! যাঁহারা জেলার পরিদর্শন-কার্যে নিযুক্ত আছেন তাঁহাদের সকলকেই সেখানে যাইতে হইবে।

ফাল্গুন কি চৈত্র মাস। সন্ধ্যার পর খাওয়াদাওয়া শেষ করিয়া দুমকা হইতে গো-শকটে উঠিলাম। গো-শকটটি আমার মনোমত করিয়া প্রস্তুত করাইয়াছিলাম। শকটের উপরে একটি বৃহদাকার পালকি, তাহার তলায় দুইদিকে দুইটি বাক্স। একটিতে চাল ডাল আলু ঘি তেল ইত্যাদি রাখিতাম, অপরটিতে রন্ধনের উপকরণ বাসন ইত্যাদি থাকিত। চাল ডাল সঙ্গে না থাকিলে মফস্‌সলে বড়ই কষ্ট ভোগ করিতে হইত। এইজন্য সঙ্গে রসদ না লইয়া বাহির হইতাম না।

জ্যোৎস্নালোকে পথ-ঘাট বন উপবন আলোকিত। শালবনের উপর দিয়া জ্যোৎস্নার ঢেউ খেলিতেছে ; ছোটো-ছোটো পাহাড়গুলি নীরবে চন্দ্রকিরণ উপভোগ করিতেছে। আমার শকট মন্থরগতিতে চলিয়াছে, দুই ধারে নিবিড় শাল-জঙ্গল, তাহার মধ্য হইতে সাঁওতাল রমণীদের নৃত্য-গীতের ধ্বনি, মাদলের শব্দ শোনা যাইতেছিল—সেই গান শুনিতে শুনিতে আমি নিদ্রিত হইলাম। সেই রাত্রের মধ্যে প্রায় ২০ মাইল রাস্তা অতিক্রম করিলাম। সকালে একটি বাঙ্গালায় থাকিবার কথা ছিল, কিন্তু সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখি, দুইটি ইংরেজ বাঙ্গালার দুইটি কামরা অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন, বাঙ্গালায় আর স্থান নাই। আমার চাপরাশি পাঠককে বলিলাম—'পাঠক এখন কী করা যায়, মধ্যাহ্নভোজন

কোথায় হইবে?" পাঠক বলিল, "বাবু নিকটে একটি সাঁওতালের গ্রাম আছে—সেখানে একটি পাঠশালাও আছে, যদি বলেন সেইখানে গিয়া রসুই করি, আপনার পাঠশালা দেখাও হইবে।" আমি বলিলাম, "আমি তাহাই চাই! বেশ কথা, সাঁওতালদের গ্রামেই চল, সেখানে যাহা হয় করা যাইবে।" পাঠক-চাপরাশি আমার আগেই সেই গ্রামে চলিয়া গেল—আমি একটি বাঁধের ধারে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া পুনরায় শকটে আরোহণ করিলাম ও সাঁওতালদের গ্রামে যাইবার জন্য উৎসুক হইলাম। দুমকায় অনেক সাঁওতালের সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাহারা শহরের নিকটে থাকায় তাহাদের মধ্যে সভ্যতা ও কৃত্রিমতা প্রবেশ করিয়াছে—সেইজন্য তাহাদের আচার-ব্যবহার ভালো নয়। সেখানকার সাঁওতাল রমণীদের চরিত্র-সম্বন্ধে বিশেষ পরিচয় দিতে ইচ্ছা নাই, দিতে কুণ্ঠিত বোধও করিতেছি। এইজন্য জঙ্গালের মধ্যে শহরের অতিদূরে খাঁটি অকৃত্রিম সাঁওতাল দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলাম।

ধীরে-ধীরে গো-শকট সাঁওতালদের গ্রামের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। গাড়ি হইতে দেখিলাম গ্রামের বহির্ভাগ গ্রাম্য রাস্তার দুইধারে কতকগুলি সাঁওতাল শ্রেণিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে—তাহাদের মধ্যে যুবক যুবতি, বৃদ্ধা বৃদ্ধা ছোটো ছোটো ছেলে মেয়ে নির্বাক নিঃস্পন্দ হইয়া আমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। সে-গ্রামে কখনও ডেপুটি ইন্সপেক্টরের শুভাগমন হয় নাই—সুতরাং অদ্য তাহাদের পক্ষে একটা বিশেষ ঘটনা। স্কুলের বড়বাবু কী প্রকারের জীব তাহা তাহারা দেখিতে আসিয়াছে—গ্রাম হইতে প্রায় ৮/১০ টা কুকুরও তাহাদের নিকট দাঁড়াইয়া আছে।

আমি তাহাদিগকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি গাড়ি হইতে নামিলাম ও কী প্রকারে তাহাদের সম্ভাষণ করিব ভাবিতে লাগিলাম—একটা বুদ্ধি চট করিয়া জোগাইল। আমার তখন নস্য লওয়া অভ্যাস ছিল (এখনও আছে)। নস্যের ডিবেটা বাহির করিলাম এবং সকলকে বলিলাম, 'হাত পাত।' নিজে হস্ত প্রসারণ করিয়া দেখাইয়া দিলাম। কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া গম্ভীরভাবে তাহারা হাত পাতিল। আমি একটু-একটু নস্য লইয়া সকলের হাতে দিলাম (অবশ্য ছোটো ছেলেমেয়েদিগকে রেহাই দিয়াছিলাম)। তাহারা নস্য লইয়া কী করিবে তাহা জানিত না, আমি তাহাদের সম্মুখে একটু নস্য লইলাম এবং বলিলাম 'এইরকম কর'। তাহার দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহাই করিল—তাহার পর যাহা হইল তাহা বর্ণনা করা আমার পক্ষে অসাধ্য। হাঁচির সঙ্গে-সঙ্গে হাসির ফোয়ারা খুলিল—এমন মুখভরা হাসি কখনও শুনি নাই। হাঁচি, হাসি, চক্ষে জল, নাসিকায় জল, ইহাদের একত্র সমাবেশে দৃশ্যটি বড়ই অদ্ভুতরকমের হইয়াছিল। মেশিন কামানে যেমন শত্রুপক্ষ ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়—তেমনি দু-এক কণা নস্যের প্রভাবে সাঁওতালদের দল ভাঙিয়া গেল—হাসিতে-হাসিতে এ উহার গায়ে পড়ে, এ উহার গলা জড়াইয়া ধরে, এ মাটিতে গড়াগড়ি দেয়...কোথায় তাহাদের গাম্ভীর্য অন্তর্ধান করিল। কুকুরগুলাও বেগতিক দেখিয়া চিৎকার আরম্ভ করিল, গ্রাম হইতে যাহারা গৃহকার্যে ব্যস্ত ছিল তাহারা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিল ও ব্যাপারটি কী দেখিয়া-শুনিয়া তাহারাও সেই কোলাহলে যোগদান করিল। আমার কার্য সমাধা করিয়া আমি পদব্রজে স্কুলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, তাহারাও

পশ্চাতে কিয়দ্দুর আমার অনুসরণ করিল—পরে হাসিতে হাসিতে আপন আপন ঘরে ফিরিয়া গেল, তাহারা বুঝিল যে স্কুলের ডেপুটি একটি অদ্ভুত জীব নয়, তাহাদেরই মতন মানুষ।

স্কুলগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, আমার চাপরাশি রন্ধনের উদ্যোগ করিতেছে। ঘরটি বেশ পরিষ্কৃত হইয়াছে, ঘরের এক কোণে উনান কাটা হইয়াছে—মধ্যস্থলে একটি কম্বল বিছানো হইয়াছে। আমি সেই কম্বলে বসিলাম। স্কুল-গৃহটির নিম্নদেশ দিয়া একটি ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত—স্থানটি বেশ নির্জন, অদূরে নদীর ওপারে শালজঙ্গল—তাহাতে কৃষ্ণকায় সাঁওতাল বালকেরা গোরু-মহিষ চরাইতেছে ও বাঁশি বাজাইতেছে। তাহাদের পরিধানে একটি করিয়া কৌপীন—দৃশ্যটি বড়োই ভালো লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম, দুই-একজন সাঁওতাল আমার নিকট আসিতেছে—তাহাদের মধ্যে একজন গ্রামের 'প্রধান' নিকটে আসিয়া বলিল, "বাবু তোকে কিছু খেতে দিব, লিবি তো?" সাঁওতাল আমাকে কী খাইতে দিবে? ভাবিলাম ভুট্টা, জুনার ডিংলা—এই দু-চারটা আমাকে উপহার দিবে, আমি বলিলাম, "খাব বই কি। কী খেতে দেবে নিয়ে এস"—তাহারা খুব খুশি হইয়া ফিরিয়া গেল—আমি ভুট্টা জুনারের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম আমার পাঠক-ঠাকুর তখন হাঁড়ি চাপাইয়া দিয়াছে।

পনেরো মিনিটের মধ্যে একদল সাঁওতাল-বালক আসিতেছে দেখিলাম। পশ্চাতে 'প্রধান,' তাহাদের সকলের হাতেই কিছু-না-কিছু জিনিস আছে—প্রথম বালকটি রন্ধন-কাষ্ঠের বোঝা মাথায় করিয়া আনিতেছে, দ্বিতীয়টি দুইটি পায়রা ছানা ও ৪টি মাগুর মাছ। তাহার পশ্চাতে একটি ডালার সরু চাল ও অড়হরের ডাল—তাহার পশ্চাতে ময়দা ঘি ও উৎকৃষ্ট গুড়। তাহার পশ্চাতে গৃহজাত তরিতরকারি। তাহার পশ্চাতে দধি ও দুগ্ধ। তাহার পর আর মনে নাই। তাহারা একে-একে সমস্ত জিনিসগুলি আমার সম্মুখে রাখিয়া দিল। আমি তো দেখিয়াই অবাক। প্রধান-মহাশয়কে বলিলাম, 'আমি এত জিনিস লইয়া কী করিব? আমি তো একবেলা খাইব?

প্রধান উত্তর দিল—"তুই আসবি তা তো আমরা জানতাম না—যা সামান্য জিনিস পেলম তাই দিয়েছি—এগুলি সব তোকে লিতেই হবে।"

আমার একটু রাগ হইল, বলিলাম, "তুমি তো বেশ মজার লোক হে, সামান্য জিনিস বলিয়া এক গাড়ি জিনিস আনিয়াছ। আমার এত দরকার নাই। তুমি নিয়ে যাও। আর যদি আমাকে নিতে হয়, তবে দাম নাও!"

সাঁওতাল বলিল, "দাম যদি দিবি তবে আগে গলায় ছুরি দে।"

এইসময় পাঠক আমাকে ডাকিয়া বলিল, "বাবু একবার উঠিয়া আসুন তো"—আমি তাহার নিকট উঠিয়া গিয়া বলিলাম, "কী"—পাঠক বলিল, "বাবু উহাদের দামটামের কথা বলিবেন না—তাহাতে উহারা অতিশয় অসন্তুষ্ট হয় ও অপমান বোধ করে, আপনি জিনিসগুলি লউন। উহাদের গ্রামে ভদ্রলোক আসিলে উহারা ওইপ্রকারই করিয়া থাকে—আর ওই প্রধানটি গ্রামের মধ্যে বড়ো লোক। আপনি আর কিছু বলিবেন না।"

আমিও বুঝিলাম যে উহাদিগকে চটাইয়া লাভ নাই। অগত্যা প্রধানকে বলিলাম—"আচ্ছা, তোমাদের জিনিসগুলি লইলাম।" এই বলিয়া প্রথমত পায়রা ছানাগুলির বন্ধন মুক্ত করিয়া বাহিরে আসিয়া উড়াইয়া দিলাম আর বলিলাম, "আমি মাংস খাই না"—পাখিগুলি উড়িয়া গেল। তাহার পর প্রধানকে বলিলাম, "তোমাদের স্কুল দেখিয়া আসি চল।" অদ্য পাঠশালা-গৃহটি আমাকে ছাড়িয়া দিয়া প্রধান আপনার আটচালাতেই পাঠশালা বসাইয়াছিল।

পাঠশালায় গিয়া সাঁওতাল-বালকদের সহিত দেখা করিলাম—কতকগুলি বালক আমার ভয়ে জঙ্গলে পলাইয়া গিয়াছিল—১০/১৫ জন মোটে উপস্থিত ছিল—তাহারাও ভয়ে জড়সড়। কী করি তাহাদের ভয় ভাঙাইতে হইল—সকলকে বাহিরে আসিতে বলিলাম। একটা হাঁড়ি জোগাড় করিয়া আনা হইল—হাঁড়িটি কিছু দূরে রাখা হইল—একটি ছেলের চোখ বাঁধিয়া দিয়া হাতে একটি শালের লাঠি দিয়া বলিলাম, "ওই হাঁড়িটিকে ভাঙিতে হইবে, যে পারিবে সে একটি লাল-নীল পেনসিল প্রাইজ পাইবে।"

এই বলিয়া ছেলেটিকে একবার ঘুরাইয়া দিয়া বলিলাম, "যাও হাঁড়িটিকে ভাঙিয়া এস।" সে বেচারি ঘুরপাক খাইয়া পূর্বদিকে না গিয়া দক্ষিণ দিকে হাঁড়ি ভাঙিতে গেল ও খানিক দূর গিয়া হাঁড়ি নিকটে আছে ভাবিয়া মাটিতে লাঠি মারিল। আর চারি দিকে হাসির লহরি উঠিল। তাহার চোখ খুলিয়া দেওয়া হইল, আর একজনকে ওই রকম পাঠানো হইল। সে উত্তর দিকে গেল ও মাটিতে লাঠি মারিল। এই প্রকার ৫/৭টি ছেলে অকৃতকার্য হওয়ার পর একটু দুষ্টু ছেলে কোনো-গতিকে বোধহয় চোখের কাপড়টিকে একটু আলগা করিয়া চারিদিক ভাল করিয়া দেখিল, এবং হাঁড়িটির দিক ঠিক করিয়া লইয়া সেই দিকে গিয়া হাঁড়িটিকে ভাঙিয়া ফেলিল ও প্রাইজ পাইল। বলা বাহুল্য, এই সময় গ্রামের সমস্ত পুরুষ, রমণী আমাদের চারিধারে দাঁড়াইয়াছিল ও তাহাদের হাস্য ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হইতেছিল। সাঁওতাল রমণীদের (বিশেষত অল্পবয়স্কাদের) হাসি একটা শুনিবার জিনিস, ইহার তুলনা নাই। তাহাদের চোখের চাহনিটিও দেখিবার জিনিস। সে চাহনির মধ্যে কোনো প্রকার হাবভাবের লেশমাত্র নাই। ইংরেজিতে "sexless stare of infancy" পড়িয়াছিলাম। এই দৃষ্টি সেই প্রকার সরল স্বচ্ছ ও কপটতাশূন্য, সেইজন্য এতই মধুর—রমণীদের চুলের পারিপাট্যটা কিছু বেশি, আর তাহাদের নিকট ফুলের আদরটা আরও বেশি। প্রত্যেক যুবতির খোঁপায় ও কানে ফুল দেখিলাম। প্রত্যেকের চুলগুলি তৈলসিক্ত ও সুচিক্কণ। প্রত্যেকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুকোমল অথচ বলিষ্ঠ। তাহাদের নিকট আর একবার নস্যের ডিবাটা বাহির করিয়া নস্য দিতে চাহিলাম, কিন্তু সে-বার তাহারা হাসিয়া ছুটিয়া পলাইল।

তাহার পর বালকদের পরীক্ষা লইলাম। তখন তাহাদের ভয় ভাঙিয়াছে—বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত পুস্তক তাহারা পড়ে—আবার ইংরেজি হরফে লিখিত সাঁওতালি ভাষাও কোথাও কোথাও শিক্ষা দেওয়া হয়। মিশনারি সাহেবেরা সাঁওতালি পুস্তক লিখিয়াছেন ও সাঁওতালি ব্যাকরণ বচনা করিয়াছেন—ব্যাকরণটি গ্রিক কি সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণের অপেক্ষাও শক্ত। যাহা হউক, তাহাদিগকে একটু পড়াইয়া, একটু লিখাইয়া দু-চারিটি

মানসাঙ্ক জিজ্ঞাসা করিয়া ছুটি দিলাম ও এক দিনের জন্য স্কুল বন্ধ দিতে বলিলাম। তাহাতে তাহাদের খুব আনন্দ। পাঠশালা দেখিয়া যখন ফিরিলাম তখন প্রায় ১২টা বাজিয়াছে। তাহার পর নদীর জলে স্নান করিয়া আহারে বসিলাম। এ প্রকার মধ্যাহ্ন-ভোজন প্রায়ই ঘটে না—মাগুর মাছের ঝোল, অড়হরের ডাল, সুগন্ধি চালের অন্ন, দু-তিনটা ভাজা, ডালনা, দধি ও দুধ—পাকও অতি সুন্দর হইয়াছিল—আহারও প্রচুর পরিমাণে হইল। সাঁওতালদের গ্রামে যে বিধাতা এরূপ আহার জোগাইবেন তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া সাঁওতালদের নিকটা বিদায় লইয়া আবার গো-শকটে উঠিলাম—পিছনে-পিছনে সাঁওতাল পুরুষ, রমণী ও ছেলের দল অনেক দূর পর্যন্ত আমার সঙ্গে গিয়াছিল। শেষে তাহাদিগকে অনেক কষ্টে বিদায় দিলাম। তাহাদের সেই অকপট সরল ব্যবহারে আমি যে মুগ্ধ হইয়াছিলাম, সেকথা বলাই বাহুল্য। তাহারা যেন আমার কত আপনার লোক, কতকালের পরিচিত বন্ধু। তাহাদের সেই নীরব আদর-অভ্যর্থনা আমার চিরকাল মনে থাকিবে। সভ্যতার শুষ্ক হাসি ও অভ্যর্থনা ইহার তুলনায় অতি তুচ্ছ।

প্রবাসী ● ভাদ্র ১৩৩২ (১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ)



দিনাজপুরে সাঁওতাল

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়, বি-এ, তত্ত্বনিধি

(১)

১৯২১ খ্রিস্টাব্দের লোকগণনার হিসাবে দেখা যায় যে, দিনাজপুর জেলাতে ওই সালে মোট লোকসংখ্যা ছিল—১,৭০৫,৩৫৩ জন।

তাহার মধ্যে হিন্দু—৭৫১,৮৬১ জন ; মুসলমান—৮৩৬,৮০৩ জন ; এ্যানিমিস্ট—১১১,২১৪ জন ; খ্রিস্টিয়ান—৫,০০৯ জন ; অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের—৪৬৬ জন।

১১১,২১৪ জন এ্যানিমিস্টের মধ্যে কয়েকজন তাঁতি ছাড়া প্রায় সকলেই সাঁওতাল, ওরাওঁ ও মুন্ডা। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের লোকগণনার হিসাবে হিন্দুর যে সংখ্যা দেখানো হইয়াছিল তাহার মধ্যে অনেক সাঁওতাল ছিল। অনেক সাঁওতাল হিন্দু বলাতে তাহাদিগকে হিন্দু বলিযাই লেখা হইয়াছিল। ৫,০০৯ জন খ্রিস্টিয়ানের মধ্যেও অনেকেই সাঁওতাল। ১৯১১ খ্রিঃ মাথা গুনতির হিসাব হইতে দেখা যায়, ওই সালে এই জেলাতে ১০২,০৩১ জন এ্যানিমিস্ট ছিল। এই দশ বৎসরে এই জেলাতে ইহাদের সংখ্যা বাড়িয়াছে ৯১৮৩ জন।

(২)

ইহারা ছোটোনাগপুর ও সাঁওতাল পরগনা হইতে মালদহ জেলার ভিতর দিয়া আসিয়া ক্রমশ দিনাজপুর জেলাতে ছড়াইয়া পড়িতেছে। ইহারা প্রথমে জংলা অনাবাদি স্থানে আসিয়া বাস করে। জমির মালিকের হুকুম লইয়া, জঙ্গল পরিষ্কার করে, জমি আবাদ করে। কিছুদিন বাদে জমিদার খাজনা দাবি করিলেই তথা হইতেই উঠিয়া পুনরায় বিনা-খাজনার অনাবাদি জমি চাষ করিবার চেষ্টা করে। অর্থাৎ খাজনা দেওয়াটা এরা বড়ো পছন্দ করে না, তবে এদের কৃপায় এ

জেলার অনাবাদি জমির পরিমাণ ক্রমশ কমিয়া আসাতে এখন বাধ্য হইয়া খাজনা দিয়া এক জায়গায় বসবাস করিতে হয়। সাধারণত ইহারা আসিয়া বন্দোবস্তে জমি চষিবার ভার লয়। অনেকের বেলাই বলদ কিনিয়া দেয় জমির মালিক এবং বৎসরের খোরাকি বাবদ ধান ও আগাম দেয় সেই-ই। তবে ফসল উঠিলে উহার দাম কাটিয়া লয়।

এ জেলার সাঁওতালগণ এখনও কোনো ব্যবসা-বাণিজ্যে মাথা দেয় নাই। কৃষিই তাহাদের প্রধান সম্বল। তবে মজুর হিসাবে অনেকে খাটিতে শুরু করিয়াছে।

(৩)

অনেক দিন এ যাবৎ জেলার সামাজিক আওতায় বাস করিয়াও ইহারা ইহাদের দেশের আচার-রীতি-নীতি ও স্বাভাবিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখিয়াছে। সাঁওতাল পল্লির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘর-বাড়িগুলি ও আঙিনা দেখিলেই আমাদের তৃপ্তি হয়।

এই ম্যালেরিয়া-প্রধান জেলায় দুই তিন পুরুষের প্রবাসী সাঁওতাল দেখিয়া বুঝিতেছি এখানে বসবাসের ফলে তাহাদের স্বাস্থ্য বা অঙ্গের গঠনের বিশেষ কোনো পরিবর্তন এখনও হয় নাই। যা হয় কিছু উপকরণ সহ পেট পুরিয়া মোটা ভাত খাইয়া, মশার দেশে মশারি ছাড়া ঘুমাইয়া, ঔষধ-পত্রের ধার না ধারিয়া তাহারা দিন কাটাইতেছে। অথচ ইহারা ম্যালেরিয়ায় বাঙ্গালীর মতন ভোগে না। নালাডোবার পচা জল ও মশা, ম্যালেবিয়ার অগ্রচর হইলেও জীবনী-শক্তির অভাবই ম্যালেরিয়ার বড়ো বাহন নয় কি?

(৪)

ধর্মবিশ্বাসে সাঁওতালগণ ইংরেজিতে এ্যানিমিস্ট বলিয়া পরিচিত। এ্যানিমিস্ট কী? শ্রীযুক্ত গেইট ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের আসাম সেন্সস রিপোর্টে এ্যানিমিস্টদিগের ধর্মবিশ্বাস আলোচনা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন, "একজন সর্বশক্তিমান জীবের উপর ইহাদের একটা ভাসা ভাসা অথচ সাধারণ বিশ্বাস আছে। সেই সর্বশক্তিমান জীব মানুষের কল্যাণকামী ; সুতরাং তাঁহার পূজার আবশ্যকতা নাই। ইঁহার নিচেই কতকগুলি খারাপ প্রেতাত্মা আছে, যাহারা মানুষের মঙ্গল দেখিতে পারে না। ইহাদের প্রভাবেই মানুষের যত দুঃখ-কষ্টের সৃষ্টি। পূজা ও বলি দিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখা দরকার। বৃক্ষের, পর্বতের, ঝরনার এবং পূর্বপুরুষদিগের আত্মাই এরা। ইহাদিগের রীতিমত পুরোহিত নাই। কোনো বিপদ উপস্থিত হইলে কোন্ ভূত ভর হইয়াছে, কাহাকে পূজা দিয়া শান্ত করিতে হইবে, ইত্যাদি জানিবার জন্য শমন বা ওঝাকে ডাকিয়া আনা হয়। সে আসিয়া ডিম, চাল ইত্যাদি দিয়া সু ও কু লক্ষণ পরীক্ষা করিয়া, অথবা সুরা-পানান্তে নৃত্যের মত্ততায় প্রেতাত্মাদিগের সহিত কথাবার্তা চালাইয়া বলিয়া দেয় কোন্ ভূত কেন ভার হইয়াছে, এবং অশান্তির শান্তির জন্য কী করিতে হইবে।"

দিনাজপুর জেলার সাঁওতালদিগকে এখন আর এ্যানিমিস্ট বলা যায় কিনা সন্দেহ। তাহাদিগের ধর্মবিশ্বাস দেখিতেছি অনেকটা হিন্দুর প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের মতোই হইয়াছে। হাড়ি-বাগদি প্রভৃতির ধর্মবিশ্বাসের সহিত ইহাদের ধর্মবিশ্বাসের একটা আকাশ-পাতাল প্রভেদ মালুম হয় না। আচার-ব্যবহার দেখিয়া ইহাদিগকে অহিন্দু বলা চলে না। এই জেলার বহু সংখ্যক সাঁওতাল দেখিতেছি কালীপূজাও করিয়া থাকে।

বৎসর পাঁচ আগে স্থানীয় উকিল শ্রীযুক্ত কাশীশ্বর চক্রবর্তী মহাশয় এই জেলার সাঁওতালদিগের উপর অসম্ভব প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হন। বর্তমানে প্রায় ৭০০/৮০০ সাঁওতাল চক্রবর্তী মহাশয়কে তাহাদের গুরু বলিয়া মানে। চক্রবর্তী-মহাশয়ও সাঁওতালদিগকে 'সত্যং শিবং সুন্দরং' মন্ত্র দিয়া হিন্দু করিতেছেন। বৎসরে একবার তাহাদিগকে লইয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে কালীপূজা করিয়া থাকেন। এই জেলার সাঁওতালগণ দলে দলে চক্রবর্তী মহাশয়ের নিকট হইতে উক্ত মন্ত্র লইয়া হিন্দু হইতেছে। মন্ত্র লউক আর না লউক, তাহাদের মনের বিশ্বাস যে, তাহারা হিন্দুসমাজেরই লোক। চক্রবর্তী মহাশয়ের এই ব্যক্তিগত মিশনকাজের দরুন খ্রিস্টিয়ান মিশনারিগণের সাঁওতালদিগকে খ্রিস্টিয়ান করিবার পক্ষে কোনো বাধা হইয়াছে কি না, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। হওয়াটা অসম্ভব নয়। হিন্দুসমাজের যেসব মিশন রহিয়াছে—যথা, ব্রাহ্ম মিশন ও রামকৃষ্ণ মিশন, তাহাদের এইসব সমস্যা লইয়া মাথা ঘামাইবার সময় আসে নাই কি? লক্ষাধিক সাঁওতাল যখন হিন্দু বলিয়া পরিচিত হইতে চায় এবং হিন্দু সভ্যতার আওতায় থাকিতে চায়, তখন হিন্দু সমাজের ও হিন্দু সভ্যতার ধুরন্ধরদিগের কি এই বিষয়ে কিছু কর্তব্য নাই? দেশীয় সমাজের যেসব প্রভাব বা অভাব ইহাদিগকে খ্রিস্টিয়ান সমাজে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে, সে সকলের আলোচনা বিশ্লেষণ করিয়া নূতন বিধি ব্যবস্থা গড়িবার সময় আসিয়াছে বলিয়া আমার মনে হয়। বাংলার সীমান্তের জেলাগুলি ঘুরিলে এই সমস্যাটা বড়ো হইয়া চোখে পড়ে। বাংলার হিন্দু সমাজের গোঁড়ামির মূল্য কতটা, বাহির হইতে কেহ বাংলার হিন্দু সমাজে নীরবে প্রবেশ করিতেছে কি না এবং তাহার প্রভাব ইত্যাদি বিষয় যুবক বাঙ্গালার উচিত নিজের চোখে দেখিয়া বুঝিয়া লওয়া। এখানকার সাঁওতালগণ এখনও এ জেলার লোকের সহিত বিবাহাদি সম্বন্ধে আবদ্ধ হয় নাই, নিজেদের দলের বাহিরে যায় নাই।

এ দেশীয় সমাজের বেশভূষা-আমোদ-আহ্লাদ এখনও ইহাদের মধ্যে প্রবেশ করে নাই। তবে হিন্দু সমাজের আওতায় থাকিবার জন্য আহার্যের পরিবর্তন অনেকটা হইতেছে।

এখানে এখনও ইহাদের বড়ো উৎসব বসন্তোৎসব। বসন্তকালে এই উৎসবে পুরুষেরা মাদল বাজায়—আর মেয়েরা বনফুলে সাজিয়া ঢেউয়ের গতিতে মাদলের তালে তালে নাচিতে থাকে। দেশি সুরাও পান করে।

বাঙ্গালী সমাজের আবহাওয়ায় থাকিয়া ইহারা এখনও সাঁওতাল জীবনের বড়ো সম্পদ সত্য ও সরলতা হারায় নাই।

প্রবাসী ● পৌষ ১৩৩৪ (১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ)



সাঁওতাল পুরাণ

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

হিন্দুদিগের পুরাণ শাস্ত্রে, খ্রিস্টীয়গণের ওল্ড টেস্টামেন্ট গ্রন্থে, মুসলমানদিগের কোরানাদিতে, দ্রাবিড়িগণের পুরাণশাস্ত্রে যেমন প্রাগৈতিহাসিক যুগের এক একটা কাল্পনিক বিবরণ আছে, সেইরূপ সাঁওতালদিগেরও একটা পুরাণ আছে। তবে সাঁওতালদিগের লিপিবিদ্যা না থাকায় তাহাদের লিখিত পুরাণ নাই। যাহা আছে তাহা তাহারা বংশানুক্রমে শুনিয়া মনে গাঁথিয়া রাখে। তাহাদের এই অলিখিত পুরাণশাস্ত্রে সৃষ্টিতত্ত্ব আছে, তাহাদের ধর্মবিশ্বাসের একটা ধারা আছে এবং তাহাদের সভ্যতা ও চিন্তা-প্রণালীর অনুরূপ নানা প্রাচীন কাহিনি আছে।

সৃষ্টিকাণ্ড

অতি প্রাচীনকালে ঠাকুর-বাবা* মানুষ সৃষ্টি করিয়া তাহাদের সুবিধা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আরামের জন্য নানা প্রকার বিধান করিয়াছিলেন। ঠাকুর বাবার সৃষ্টিতে মানুষকে পরিশ্রম করিয়া কোনো কিছু প্রস্তুত করিতে হইত না। মানুষের যাহা আবশ্যক তাহা প্রকৃতিতে প্রচুর পরিমাণে জন্মাইত। মানুষ ইচ্ছামতো তাহা কুড়াইয়া লইয়া ভোগ দখল করিত। কিন্তু মানুষ নিজের দোষে ঠাকুর বাবাকে চটাইয়া সেই সমস্ত সুবিধা হারাইয়াছে।

তখন সাঁওতালেরা চম্পা রাজ্যে** কিস্‌কুরাজাদিগের*** অধীনে পরমসুখে বাস

*বাবা যেমন একটা সংসারের স্বামী বা গৃহস্বামী তেমনি ঠাকুর-বাবা এই বিশ্বসংসারের স্বামী বা কর্তা। বিমান-বিহারী সূর্যদেবই সাঁওতালদের ঠাকুর-বাবা।

**এই চম্পা কোথায় ছিল?

***সাঁওতালদিগের মধ্যে পৌরাণিক যুগে দ্বাদশ শ্রেণি বা বর্ণ ছিল। স্ব-শ্রেণিতে ইহাদের বিবাহ হইত না। 'কিস্‌কু' ইহাদের অন্যতম , কিস্‌কুগণই পৌরাণিক যুগে রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের রাজত্ব আমাদের 'রাম-রাজত্বের' ন্যায় সর্বসুখের হেতুভূত ছিল।

করিত। তাহারা অতি সরল ও ধর্মভীরু ছিল এবং ঠাকুরের পূজা করিত। সেই জন্য ঠাকুরের খুব স্নেহ ছিল। ধান-গাছে তখন ধান জন্মাইত না,—একেবারে তুষবিহীন চাউল গাছে ধরিত,—সাঁওতালদিগকে ঢেঁকিতে ধান ভাঙিয়া চাউল করিয়া লইতে হইত না—গাছ হইতে তুলিয়া লইলেই হইত। কাপাস গাছে তুলা হইত না ; একেবারে সাঁওতালদিগের পরিধানোপযোগী বস্ত্র কাপাস-বৃক্ষের ফল-স্বরূপে জন্মাইত। তুলা হইতে সুতা ও সুতা হইতে বস্ত্রনির্মাণের পরিশ্রম সাঁওতালদিগকে করিতে হইত না। আর একটা বিশেষ সুবিধা ছিল এই যে, মাথার উকুন তুলিবার জন্য দ্বিতীয় ব্যক্তির সাহায্য আবশ্যক হইত না। কারণ মাথার খুলি (skull) তখন জোড়া ছিল না ; আবশ্যক মতো খুলিয়া লইয়া পরিষ্কার করিয়া, পুনবায় পাগড়ির ন্যায় মাথায় বসাইয়া দিলেই চলিত।

সাঁওতালদিগের এই পৌরাণিক সুখসম্ভারের অন্তরায় হইয়াছিল একটি হীন-স্বভাবা দাসী। খ্রিস্টীয়গণের ইবা (Eva) ও গ্রিকদিগের প্রজের্পিনার (Proserpina) ন্যায় এই রমণীই সাঁওতালদিগের পৌরাণিক সুখে হানা দিয়াছে। এই রমণী এক রাজার দাসী ছিল। একদিন মাঠে মলত্যাগ কালে গাছ হইতে চাউল তুলিয়া খাইয়া ফেলে। আর একটা অমার্জনীয় অপরাধ তাহার এই ছিল যে, গোশালা পরিষ্কার করিবার কালে এই রমণী গোময় দ্বারা পরিধেয় বস্ত্র কলঙ্কিত করিত। ঠাকুর-বাবা এ প্রকার অপবিত্রতা দেখিতে পারিলেন না। এ অপরাধের ভয়ংকর শাস্তি হইল। ঠাকুর-বাবা ক্রুদ্ধ হইয়া গাছে চাউল ধরা বন্ধ করিয়া দিলেন। সেই অবধি গাছে ধান হয়, চাউল হয় না। কারণ তুষাবৃত না থাকিলে পুনঃপুন চাউল এইভাবে অপবিত্র হইত। আর হইল এই যে, গাছে কাপড় জন্মানো বন্ধ হইয়া গেল। গাছে সেই অবধি কাপাস ফল ধরে। নতুবা এইভাবে চিরকাল দুষ্টস্বভাবা রমণীগণ নিসর্গজাত বস্ত্র অপবিত্র করিত। আর মানুষের মাথার খুলি মানুষের মাথায় জুড়িয়া গেল; পাগড়ির ন্যায় আলগা হইয়া লাগিয়া থাকিল না। কারণ তাহা না হইলে তাহারা মাথা অপবিত্র করিবার সুযোগ পাইত।*

প্রাচীনকালে আকাশখানা পৃথিবীর গায়ে লাগিয়া থাকিত এবং ঠাকুর বাবা আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়া সাঁওতালদিগের ঘরবাড়ি দেখিয়া যাইতেন। সেই জন্য সাঁওতালদিগের পূর্বপুরুষগণ ঘরের উঠানে, সদর দরজায় বা খিড়কি দুয়ারে উচ্ছিষ্ট দ্রব্যাদি বা উচ্ছিষ্ট ভোজন পত্রাদি ফেলিয়া রাখিতে ভূয়োভূয় নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের আদেশ অনুসারে রাত্রিকালে ঘরে কোনো উচ্ছিষ্ট বাসন রাখিবার উপায় নাই, কারণ ঠাকুর-বাবা সাধারণত রাত্রিকালেই পৃথিবী পরিদর্শনে আগমন করেন। তিনি যদি কোনো গৃহে উচ্ছিষ্ট বাসন দেখিতে পান, তাহা হইলে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েন। ফলে অভিশাপ ও অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু স্ত্রীজাতিই সাঁওতালদিগের সর্ব অনিষ্টের মূল হইয়াছে। কারণ একদিন এক রমণী রাত্রিকালে আহারের পর উচ্ছিষ্ট শাল-পত্রসমূহ ঘরের বাহিরে ফেলিয়া

*এই স্থানে উল্লেখ করা যায় যে, সাঁওতালেরা অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। তাহাদের আরণ্য-গৃহ মৃত্তিকা-নির্মিত হইলেও অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ঘরের দেওয়ালের চতুর্দিক ইহারা লেপিয়া পরিষ্কার করে। উঠানটি রোজ লেপিয়া পরিষ্কার করে। আমাদের অনেক হিন্দু গৃহস্থের গৃহ অপেক্ষা ইহাদের আরণ্য-গৃহ পরিষ্কার। ইহাদের ঘর ও উঠান চকচকে ঝকঝকে। কোথাও কোনো আবর্জনা নাই। একটি পাতাও পড়িয়া থাকে না।

দিয়াছিল। বাতাসে উড়িয়া সেই পাতা আকাশে চলিয়া যায়। তাহাতে ঠাকুর বাবা অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া পৃথিবী হইতে আকাশটাকে বহুদূরে সরাইয়া দিয়াছেন ; কারণ মানুষের এত অপবিত্র ব্যবহার তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই।

এইজন্য এখনও সাঁওতালেরা রাস্তায় উচ্ছিষ্ট পাতা ফেলিতে নিষেধ করে এবং নিজেরা উচ্ছিষ্ট পাতা রাস্তায় ফেলে না। লোকালয় হইতে দূরবর্তী স্থানে তাহারা উচ্ছিষ্ট পাতা ফেলিয়া দিয়া আইসে।

সাঁওতালদিগের ঠাকুর-বাবা হইতেছেন 'সিং চন্দো' বা সূর্যদেব; এবং 'নিন্দ চন্দো' বা চন্দ্রদেব তাঁহার পত্নী। সাঁওতালদিগের অপবিত্র ব্যবহারে ঠাকুর বাবা বা 'সিং চন্দো' অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া পৃথিবীর সমস্ত সাঁওতাল বা মনুষ্যকে ধ্বংস করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হয়েন। আকাশে যে সকল তারা বা নক্ষত্র দেখা যায়, উহারা 'সিং চন্দো' ও 'নিন্দ চন্দো'র পুত্র কন্যা। আজকাল রাত্রিকালে যত তারা দেখা যায়, সেকালে দিবাভাগেও ওই প্রকার তারা দেখা যাইত। দিনমানের তারাগুলি সিং চন্দোর পুত্র-কন্যা আর রাত্রিকালের তারাগুলি নিন্দ চন্দোর। এইরূপে তাঁহারা আপন পুত্রকন্যা ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। এখন 'সিং চন্দো'র প্রতিজ্ঞা হইল মনুষ্যজাতির (অর্থাৎ সাঁওতাল জাতির) উচ্ছেদ সাধন করিতেই হইবে এবং সেই সঙ্গে তাঁহার পুত্র কন্যাদেরও ধ্বংস করিতে হইবে। তাহা হইলেই সৃষ্টি নাশ হইবে। 'নিন্দ চন্দো' স্নেহে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তিনি তো আর সৃষ্টি নাশ দেখিতে পারেন না। কিন্তু উপায় কী? 'সিং চন্দো'র ইচ্ছায় বাধা দেয় কে? তথাপি 'নিন্দ চন্দো' অনেক অনুনয়-বিনয় করিতে লাগিলেন। অনেক কথা-কাটাকাটির পর ঠাকুর-বাবা একটু নরম হইলেন। বলিলেন, নূতন সৃষ্টির জন্য দুইটি মানুষ ও দুইটি তারা রাখিয়া দিয়া অবশিষ্ট যাবতীয় নরনারী ও তারকার ধ্বংস হইবে।

অবশেষে স্থির হইল 'পিলচু-হারাম' ও 'পিলচু-বুধি' নামে যুবক ও যুবতিকে বাদ দিয়া সমস্ত মনুষ্যজাতির ধ্বংস হইবে। আর তাহার মধ্যেও শুকতারা ও সন্ধ্যাতারাকে ছাড়িয়া দিয়া অবশিষ্ট সমস্ত তারার ধ্বংস হইবে, এই স্থির হইয়া গেল। সুতরাং ওই যুবক ও যুবতির প্রতি সিং চন্দোর আদেশ হইল, "এই গহ্বরে প্রবেশ কর।" তাহারা ভয়-বিহ্বল চিত্তে গর্তে প্রবেশ করিল। তাহার পরে ওই গহ্বর কাঁচা চামড়া দিয়া সিং চন্দো স্বয়ং ঢাকিয়া দিলেন।

তারপর ধ্বংসকার্য আরম্ভ হইল। এ ধ্বংস হিন্দুদিগের প্রলয়ের ন্যায় পৃথিবীকে জলমগ্ন করিয়া হয় নাই। খ্রিস্ট-ধর্মীয়গণের ন্যায় 'নোআর জাহাজ' (Noah's Ark) সৃষ্টিও হইল না। সূর্যের দাহিকা শক্তি অগ্নিরূপে বর্ষিত হইতে লাগিল। বন, জঙ্গল, মানুষ, জানোয়ার, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ—সব দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। পাঁচ দিন পাঁচ রাত্রি এই অগ্নিবর্ষণ চলিল। গহ্বরের ভিতরে থাকিয়া সাঁওতাল যুবক ও যুবতি 'বাহা' সুরে গান ধরিল—

"পাঁচ দিন, পাঁচ রাত আগুন বরষিবে!—হো!
পাঁচ দিন, পাঁচ রাত, বড়ো বড়ো রাত! হো!
কোথা রইবি তোরা দুজন সাঁওতাল মানুষ?—হো!

কোথা গেলে রক্ষা পাবি তোরা? হো!
একটা চামড়া আছে, একটা চামড়া আছে হে।
একটা পাহাড় আছে একটা পাহাড় হে!
আর একটা আছে তাতে গভর হে।
সেইখানে রব আমরা দুটি হে।
সেইখানে রক্ষা পাব দুটি হে।।"

পাঁচ দিন পাঁচ রাত্রির অবসানে যখন তাহারা গহ্বরের বাহিরে আসিল, তখন তাহারা প্রথমেই দেখিল একটা 'করকে' গাছের মাথা ভাঙ্গিয়া পুড়িতে পুড়িতে একটা গাভীর উপর পড়িয়াছে, গাভিটি পুড়িয়া মরিয়া গিয়াছে, তাহার পার্শ্বেই একটা মহিষ-গাই পুড়িয়া মরিয়াছে। তাহা দেখিয়া তাহারা গান ধরিল—

গাইটি ধকধক ছাই হে ধকধক ছাই!
করকের গাছ পুড়ে ছাই!
পড়ে আছে মহিষ গাই পুড়ে হয়ে ছাই হে
পুড়ে হয়ে ছাই।"

এই প্রকারে যে যে বস্তু তাহারা দেখিল, তাহা দেখিয়াই বিলাপের গান গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল। অন্য পক্ষে আকাশের বালক-বালিকা তারকা-কুলের কী হইল দেখুন।

হাজার হইলেও নিন্দ চন্দোর রমণীর হৃদয়। আপন পুত্র-কন্যার ধ্বংস হইবে ইহা মাতৃহৃদয়ে সহ্য হইল না। 'সিং চন্দোর সহিত তিনি একটু চালাকি খেলিলেন। আপনার ভাগের যাবতীয় তারকা-কুলকে তিনি একটা ঝুড়ির মধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন। তারপর মুখে রাঙা রং মাখাইয়া সিং চন্দোকে বলিলেন, "আমার মুখ দেখ, আমি আমার ছেলেদের খাইয়া ফেলিয়াছি। তাহাদের রক্তে মুখ রাঙা হইয়াছে। তুমি তোমার ছেলেদের খাইতে পার।" সুতরাং শুকতারা ও সন্ধ্যাতারাকে বাদ দিয়া সমস্ত তারাগুলিকে সিং চন্দো খাইয়া ফেলিলেন। সেই অবধি আর দিনে তারা নাই।

এইরূপ সমস্ত কার্য করিয়া সিং চন্দোর আর দ্বিতীয় বার পৃথিবী দগ্ধ করিবার শক্তি থাকিল না। সুতরাং 'নিন্দ চন্দো' এইবার নিশ্চিন্তমনে আপন পুত্র-কন্যাগণকে লুক্কায়িত করিয়া দিলেন। কিন্তু তাহাদিগকে পুনঃপুন সতর্ক করিয়া দিলেন যে, বাবা তাহাদিগকে দেখিলে ক্রুদ্ধ হইবেন। চাঁদের ছেলেমেয়েরা রাত্রিকালে আকাশে খেলা করিতে লাগিল। 'সিং চন্দো তাহা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন। ক্রোধে অধীর হইয়া 'সিং চন্দো' নিন্দ চন্দো'র দিকে তাড়া করিয়া আসিলেন। ভয়ে তারাগণ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। সেই অবধি তাহারা বিক্ষিপ্তই আছে—তার পূর্বে সকলে একস্থানে ছিল। 'সিং চন্দো তাহাদিগকে কিছু না বলিয়া 'নিন্দ চন্দো'কে দুই টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন। সেই জন্য সেই কাল হইতে চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। তৎপূর্বে চাঁদ সূর্যের ন্যায় চির পূর্ণাঙ্গ ছিলেন।

আর সেই যে দুইজন মানুষ বাঁচিল—'পিল্চু-হারাম' ও 'পিল্চু বুধি'—তাহাদের দ্বাদশ পুত্র ও দ্বাদশ কন্যা জন্মে। তাহাদের দ্বারা ক্রমশ মনুষ্যজাতির বৃদ্ধি হইয়া সমস্ত পৃথিবী

পূর্ণ হইয়াছে। তার পর সেই বারো জন হইতে ক্রমে খাদ্যের বিভিন্নতা অনুসারে সাঁওতালদিগের বারো জাতি হইয়াছে।

* * *

একদিন 'চন্দো' বনে কাঠ কাটিতে গিয়াছেন; ফিরিতে অত্যন্ত বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া তাঁহার পত্নী অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তাই তিনি কতকগুলি মশা সৃষ্টি করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। উদ্দেশ্য মশার কামড়ে অস্থির হইয়া চন্দো গৃহে ফিরিবে। কিন্তু 'চন্দো' তাহা করিলেন না। তিনি কতকগুলি ডাঁশ সৃষ্টি করিলেন, তাহারা মশা ধরিয়া খাইতে লাগিল। তখন নিন্দ চন্দো আরও অনেক জানোয়ার সৃষ্টি করিয়া পাঠাইলেন। সিং চন্দো মারিয়া ফেলিলেন। অবশেষে 'নিন্দ চন্দো' একটি ব্যাঘ্র সৃষ্টি করিয়া পাঠাইলেন। সিং চন্দো কতকগুলি কাঠের কুচো ছুঁড়িয়া মারিলেন। কাঠের কুচোগুলি বৃকে পরিণত হইয়া ব্যাঘ্রের অনুসরণ করিল। ব্যাঘ্র পলাইল। সে অবধি ব্যাঘ্র বৃককে ভয় করে।

চন্দো ঘরে ফিরিলে তাঁহার পত্নী তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? তোমার সৃষ্টির এত জীবজন্তুকে খাইতে দেয় কে?"

চন্দো বলিলেন, "আমি সকলকে খাইতে দিয়াছি।" তাঁহার পত্নী একটি পতঙ্গ লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। দেখাইলেন লোহার পাত্রমধ্যে পতঙ্গ ঘাস খাইতেছে। চন্দো লজ্জিত হইলেন।

* * *

জন্মান্তরবাদ

সাঁওতালেরা আত্মার দেহান্তর পরিগ্রহ বিশ্বাস করে। ইহাদের ঠাকুর জল, স্থল, আকাশ, মানুষ, গোরু, মাছ, পোকা ও অন্যান্য যাবতীয় প্রাণী বৃক্ষাদি এককালে নির্দিষ্ট সংখ্যায় সৃষ্টি কারয়াছেন। সে সংখ্যা কমেও না, বাড়েও না। যতদিনে দেহমধ্যে তাহারা বাড়িয়া পূর্ণাঙ্গ হইবে, ঠাকুর তাহা ঠিক করিয়া দিয়াছেন। তাহার ফলে এই হইয়াছে যে মানুষের শরীরেও কুকুর বিড়াল প্রভৃতি ইতর প্রাণীরা আত্মা প্রবেশ করে। আর কুকুর প্রভৃতির শরীরে মানুষের আত্মা প্রবেশ করে। যদি কোনো মানুষের শরীরে মানুষের আত্মা থাকে, তবে তাহার আচার-ব্যবহার ভদ্রোচিত হইবে। বিড়াল কুকুরের আত্মা পাইলে মানুষ কলহপ্রিয় হয়। ভেকের আত্মা পাইলে মানুষ নির্জনতাপ্রিয় ও মুখ-চোরা হয়। বাঘের আত্মা পাইলে মানুষ অত্যন্ত ক্রোধী হয়, কিছুতেই শান্ত হয় না।

এ বিষয়ে একটি গল্প আছে। এক ব্রাহ্মণ গাছগাছড়া দিয়া চিকিৎসা করিত। তাহার দুই পত্নী ছিল। তাহারা বড়ো কলহপ্রিয় ছিল। তাহাদের কলহে বিরক্ত হইয়া ব্রাহ্মণ যোগীর বেশে গৃহত্যাগ করে। চলিতে চলিতে সে এক শহরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন শহরে মড়ক লাগিয়াছে। অসংখ্য মৃতের লাশ একটা গাছের নীচে স্তূপাকারে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। গাছের উপরে দুইটা শকুনি ছিল। একটি শকুনি অন্যটিকে বলিতেছে, "কোন্ লাশটি আমরা প্রথমে খাইব?" অন্য শকুনি কোনো উত্তর না করায় প্রথম শকুনি

পুনরায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করে। তাহাতে সে বলেন 'দেখিতেছ না নীচে মানুষ আছে।" ব্রাহ্মণ পাখির ভাষা বুঝিত বলিয়া এই সব কথা বুঝিতে পারে। তাহারা ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন তুমি এখানে বসিয়াছ? তোমার কি কোনো বিপদ ঘটিয়াছে?" ব্রাহ্মণ তাহার পত্নীদ্বয়ের কথা বলিল। শকুনিরা তাহাকে একটি করিয়া পালক খসাইয়া দিয়া বলিল, "এই পালক কানে গুঁজিয়া দেখিলে তুমি মানুষ চিনিতে পারিবে।" তখন ব্রাহ্মণ গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। ওই পালক কানে দিয়া যাইতে যাইতে ব্রাহ্মণ এক গ্রামে দেখিল, কতকগুলি লোক বিড়াল, কতকগুলি লোক শিয়াল আবার কেহ বা কুকুর! ঘরে গিয়া দেখিল, তাহার একটি পত্নী কুক্কুরী, ও অপরটি শূকরী। সুতরাং সে ঘরে না ঢুকিয়াই ফিরিল। প্রতিজ্ঞা করিল যে, যে রমণী হাতে করিয়া ভিক্ষা দেয় তাহাকেই বিবাহ করিবে। কারণ অন্য প্রাণীতে মুখে করিয়া ভিক্ষা দেয়।

এক গ্রামে এক চামারের কন্যা তাহাকে হাতে করিয়া ভিক্ষা দিতে আসিল। ব্রাহ্মণ দেখিল, সে প্রকৃতই মানবী। তখন সে চামারকে বিবাহের অভিপ্রায় জানাইল। চামার তাহাতে ব্রাহ্মণকে তিরস্কার করিয়া বলিল, "আমরা চামার, আমাদের ঘরে বিবাহ করিলে তোমার জতিনাশ হইবে। তুমি অমন কথা মুখে আনিও না।" ব্রাহ্মণ তাহাতেও বিচলিত না হওয়ায় চামার অপরাপর চামারদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া, গ্রামের মণ্ডলদিগকে ডাকিয়া ব্রাহ্মণের হস্তে কন্যা সমর্পণ করিল। তখন ব্রাহ্মণ তাহার সমস্ত পরিচয় দান করিল। শুনিয়া সকলে খুশি হইল। ব্রাহ্মণ চামার হইয়া সুখে দিন কাটাইতে লাগিল।

* * *

পরলোক

মৃত্যুর পর পরলোকে গিয়া মানুষকে অতি কষ্টে কালযাপন করিতে হয়। 'চন্দো বোংগা' তাহাদিগকে অত্যন্ত খাটাইয়া লয়। সেখানে মেয়েরা এরণ্ড ফল খলে ভাঙ্গিয়া তৈল প্রস্তুত করে। বীজ হইতে চন্দো বোংগা মানুষ গড়ে। সারাদিন তাহাদিগকে পরিশ্রম করিতে হয়। বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। যে সকল স্ত্রীলোকের ছেলে আছে তাহারা ছেলেকে স্তন্যদান করিবার জন্য কিঞ্চিৎ অবসর পায়। আর যে সকল পুরুষ তামাক পাতা চিবাইয়া খায়, তাহারা সেই কার্যের জন্য কিঞ্চিৎ অবসর পায়। এই কারণে সাঁওতালেরা তামাক পাতা চিবাইয়া খাইতে শিখে। হুঁকায় তামাক পোড়াইয়া খাওয়ায় কোনো লাভ নাই ; কারণ সেজন্য ছুটি পায় না। এখানে কেহ জল খাইতে পায় না। পুষ্করিণী বা সরোবরে যে সকল ভেক প্রহরী আছে, তাহারা কাহাকেও জলে নামিতে দেয় না। এই জন্য সাঁওতালদের মৃত্যুকালে তাহাদের সঙ্গে জলপানের পাত্র দেওয়া হয়, কারণ পাত্র থাকিলে তাহাতে করিয়া জল তুলিয়া লইয়া তাহারা খাইতে পারে। পরলোকে জল খাইতে পাইবার আর একটা উপায় আছে। জীবিতকালে অশ্বত্থ বৃক্ষ রোপণ করিলে সাঁওতালেরা পরলোকে জল খাইবার সুবিধা পায়। পুণ্যের ফলে নহে, পাপের শাস্তিস্বরূপে। অশ্বত্থবৃক্ষের পত্র পুষ্করিণীর জলে পড়িয়া জল কলুষিত করে বলিয়া বৃক্ষরোপণকারীকে জলে নামিয়া পাতা কুড়াইয়া ফেলিতে হয়। তাহাতে তাহার জল খাইবার সুবিধা হয়।

* * *

তামাকের উৎপত্তি

এক ব্রাহ্মণ-বালিকার কোনো জ্ঞাতি না থাকায় বিবাহ হয় নাই। অবিবাহিত অবস্থায়ই তাহার পরলোক হয়। তাহার শবদাহ করিয়া লোকজন ফিরিয়া যাইলে পর চন্দো ভাবিলেন, "এই বালিকা সংসারে গিয়া অনাদৃত হইয়াছে। ইহাকে এমন একটি বর দান করিব যে, অতঃপর পৃথিবীর সকল লোকেই ইহার সমাদর করিবে।" এই ভাবিয়া তিনি ওই বালিকার শ্মশানে তামাক গাছ জন্মাইয়া দিলেন। এক রাখাল-বালক গোচারণের কালে দেখিল তাহার ছাগলে ওই গাছের পাতা খাইতে লাগিল। রাখাল মনে করিল পাতাটা বোধ হয় মিষ্ট হইবে ; তাও সে একটা পাতা লইয়া মুখে দিল। কিন্তু পাতা তিক্তস্বাদ বলিয়া মুখে রাখিতে পারিল না, ফেলিয়া দিল। আর একদিন তাহার দন্তশূল হওয়ায় নানাবিধ ঔষধ প্রয়োগেও যখন তাহার রোগ সারিল না, তখন কী-মনে করিয়া সে এক পাতা তামাক মুখে দিল। চিবাইতে চিবাইতে তাহার দন্তশূল ভালো হইয়া গেল। তখন সে তামাকপাতা চিবাইয়া খাওয়া অভ্যাস করিল। একদিন এক টুকরা হাড়-পোড়া চূর্ণ দিয়া একটা তামাকপাতা ঘষিয়া দেখিল তাহতে তাহার স্বাদ ভাল হয়। সুতরাং সেই অবধি সে চূণ দিয়া তামাক পাতা খাওয়া ধরিল। তাহার দেখাদেখি অনেকেই তামাক ধরিল। ক্রমে পৃথিবীতে তামাক-পাতার সমাদর বাড়িতে লাগিল। এখন তামাকের চাষ চলিতেছে।

* * *

হরিচন্দ ও ষোলো-শত গোপিনি

কোনো অবিবাহিতা রমণীর গর্ভসঞ্চার হওয়ায় সে এক জঙ্গালের মধ্যে বাঁশঝাড়ে একটি পুত্র ও একটি কন্যা প্রসব করিয়া চলিয়া যায়। এক বন্য গাভি তাহাদিগকে স্তন্যদান করিয়া মানুষ করে। কোনো লোকে তাহাদিগকে আনিতে গেলে গাই শিং নাড়িয়া তাড়াইয়া দিত। অবশেষে বালক-বালিকা বড় হইয়া পরস্পরকে বিবাহ করিল। তখন গাভি তাহাদিগকে রাখিয়া চলিযা গেল। ঠাকুর আকাশ হইতে ষোলোশত গোপিনি পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা শিখর রাজ্যে আসিয়া ওই বালক-বালিকাকে তাহাদের রাজা ও রানি করিল। রাজার নাম হরিচন্দ। এখন রাজা হরিচন্দের দুর্গ ও রাজধানী কোথায় হইবে তাহা বিচার করিবার জন্য সভা হইল। রাজা ও রানি সভার মধ্যস্থলে বসিলেন। দক্ষিণ পার্শ্বে হিকিম মুহুরি বসিল ; বামে বসিল ভুজা ও জগনাথ মুহুরি। গোপিনিরা বৃত্তাকারে তাহাদিগকে ঘিরিয়া বসিল। স্থির হইল, পাচেট পাহাড়ে হরিচন্দের রাজধানী হইবে। পাচেট পাহাড়ে রাজধানী ও দুর্গ নির্মাণ হইয়া গেল। অনেক সাঁওতাল চম্পা হইতে আসিয়া সেখানে বাস করিল। হরিচন্দের শিখর রাজ্য সমৃদ্ধিপূর্ণ হইল। হরিচন্দের পিতা মাতার পরিচয় ছিল না বলিয়া, সাঁওতালেরা তাহাকে 'বোংগা' (দেবতা বা অপদেবতা) বলে। রাজা হরিচন্দ 'চাতার' পরব করিয়াছিলেন।

* * *

অজ্ঞাত-পিতৃক বালক-বালিকা

যদি কোনো ভ্রষ্টা রমণীর পুত্র কন্যা জন্মে এবং লজ্জা বা ভয়বশত রমণী ছেলের পিতার নাম না করে, তাহা হইলে প্রসূত সন্তানকে 'চন্দোর ছেলে' বলা হয়। তাহার জন্মকালে প্রতিবেশীদিগের সভা বা উৎসব হয় না। ছেলের শিরমুণ্ডন বা নামকরণ (নাতা) হয় না। ছেলে কোনো জাতির অন্তর্নিবিষ্ট হয় না। পুত্র হইলে তাহার নাম হয় 'চান্দু' বা 'চন্দ্রাই' বা কখনো কখনো 'বীরবন্তো' ; আর কন্যা হইলে তাহার নাম হয় 'চন্দ্রো' বা 'চান্দমুনি' বা 'বোনেলা'। কিছুকাল পরে গোপন রাখিবার শর্তে সন্তানের মাতা তাহার মাতা বা তৎস্থানীয় কোনো রমণীর নিকট সন্তানের পিতার নাম বলে। এবং তখন ছেলের পিতৃবংশের কাহারও নাম অনুসারে ছেলের নাম রাখা হয়। ছেলে বড়ো হইলে তাহার একটা ডাক-নাম রাখা হয়। পরে বালকের কীর্তিকলাপ যশস্কর হইলে তাহার নাম নূতন করিয়া রাখা হয় এবং সাঁওতাল বলিয়া তাহাকে গ্রহণ করা হয়। যদি কখনও পিতা আত্মপ্রকাশ না করে এবং পুত্রকে গ্রহণ করিতে না চাহে, তাহা হইলে মাতা পুত্রকে জন্মকালেই মারিয়া ফেলে বা পুঁতিয়া রাখে। যাহারা ওঝার কাজ করে তাহারা এই গর্ত খুঁজিয়া হত বালকের অস্থি সংগ্রহ করিয়া রাখে। কারণ এই অস্থি জাদুবিদ্যায় তাহাদের প্রধান সহায়।

* * *

শ্মশানভীতি

শ্মশানে 'বোংগা' থাকে, 'বোংগা'রা মানুষ খায়। মানুষ মরিলে 'বোংগা' হয়। শ্মশানে 'বোংগা দেখিলে তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া কোনো লাভ নাই ; কারণ 'বোংগা' ঘন ঘন দেহ পরিবর্তন করে। কখনও বা মানুষ বেশে কখনও বা ইতর প্রাণীর বেশে 'বোংগা' বিচরণ করে। তাহারা আক্রমণ করিলে কেহ এড়াইতে পারে না। ছোটো ছেলে মারা গেলে 'ভূত' হয়, আর গর্ভবতী রমণী মারা গেলে 'চুরিন' হয়, গর্ভবতী রমণী গ্রামের বাহিরে বা শ্মশানে যাইতে পায় না। কারণ 'বোংগা' সর্বত্রই তাহাদের অনিষ্ট করিবার জন্য বিচরণ করে।

মানসী ও মর্মবাণী ● বৈশাখ ১৩২৯ (১৯২২ খ্রিস্টাব্দ)

শুদ্ধি ॥ সিং→সিঙও ; চন্দো→চান্দো ; নিন্দ→ঞিন্দী ; হারাম→হাড়াম ; বুধি→বুডাই ; চুরিন→চুড়িন

—সম্পাদক



সাঁওতালি গান

শ্রীসরসীলাল সরকার

হিন্দুজাতি ও সাঁওতাল জাতি একই বঙ্গজননীর সন্তান। সাঁওতাল জাতি তাহাদের বুদ্ধিমান-হিন্দু ভাইদিগকে অতিশয় সম্মানের চক্ষে দেখে এবং উহাদিগকে আদর্শ করিয়া সতত আপনাদিগের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু হিন্দু-ভাইগণ তাহাদিগের এই অবোধ, অথচ সরল, নিরীহ ও সবল শ্রমপটু ভাইদিগের প্রতি একবার ফিরিয়া চাহিয়াও দেখে না। কাজে কাজেই ইহাদিগকে মিশনারিগণের আশ্রয় লইতে হইতেছে। মানভূম সম্বন্ধে অনেক পাণ্ডিত্য ও গবেষণাপূর্ণ আলোচনা হইয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি মহোদয়গণের মতো পণ্ডিতবর্গ এই মানভূমের প্রত্নতত্ত্ব, পুরাতন রাজবংশ ও শিলালিপি প্রভৃতি লইয়া বিস্তর পরিশ্রম এবং গবেষণা করিয়াছেন। কিন্তু এই মানভূমে সজীব অনার্যজাতিগণ রহিয়াছ ; যাহাদের ভাষা, উপকথা, আচার-ব্যবহার ও গান বোধ হয় ভগ্ন শিলালিপি প্রভৃতি অপেক্ষা অতীতের রহস্য অধিকতর উদ্‌ঘাটিত করিতে সমর্থ। বঙ্গসাহিত্যে এই অনার্য জাতিগণকে লইয়া বিশেষ আলোচনা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। ইহারা চিরদিনই তাহাদের হিন্দু-ভ্রাতৃদিগের প্রতি মুখ চাহিয়া রহিয়াছে। কিন্তু হিন্দু-ভ্রাতৃগণ ইহাদের দিকে মুখ ফিরাইয়া তাকাইয়া ইহাদের অবজ্ঞা-প্রদর্শন ব্যতীত সুখে দুঃখে কখনও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন এরূপ মনে হয় না।

সাঁওতাল জাতির গান তাহাদের জীবনের একটি প্রধান অঙ্গ। ইহারা পরিশ্রমশীল, কর্ম করিতে করিতে শ্রমভার লাঘবের জন্য গান করিয়া থাকে, বিশ্রামের সময় সংগীত উপভোগ করাই ইহাদের একটি প্রধান আনন্দ। বিবাহ এবং উৎসবাদির সময় দলবদ্ধ হইয়া বাজনার সহিত নৃত্য করিয়া গান করাই ইহাদের প্রধান স্ফূর্তি।

যদি ইহারা কোনো ঘটনা দেখে এবং যাহা ইহাদিগের নিকট আশ্চর্য বলিয়া বোধ হয়

ইহারা তখন সেই বিষয়টি লইয়া গান বাঁধিতে চেষ্টা করে। নমুনা-স্বরূপ গান নীচে দেওয়া গেল। এস্থলে বলা কর্তব্য যে, সাঁওতালি কথা অনেক স্থলে বাঙ্গালা ভাষায় ঠিক লেখা যায় না; কারণ সাঁওতালি কথার উচ্চারণ অনেক স্থলে বাঙ্গালা অর্থাৎ সংস্কৃত বর্ণমালায় প্রকাশ করা যায় না। মিশনারিগণ সাঁওতালি ভাষা লিখিবার জন্য একরূপ ইংরাজি রোমান বর্ণমালা সৃষ্ট করিয়াছেন। তাহাতে কতকগুলি নূতন বর্ণও সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। যাহা হউক অধিকাংশ এই নূতন বর্ণমালার সাহায্য না লইয়াও সাঁওতালি উচ্চারণের ধাঁধা বাঙ্গালা অক্ষরে বুঝানো যায়। তবে একটি অক্ষরের দরকার। এইটি পার্শি আয়েন অক্ষরের স্বরূপ অর্থাৎ Guttural অ। এইটি আমরা লুপ্ত অকার দিয়া প্রকাশ করিব। যেমন পার্শি—'মালুম' এই কথাটির উচ্চারণ আমাদের কৃত বর্ণমালায় 'মহলুম' এইরূপভাবে প্রকাশিত হইবে।

নিম্নলিখিত সাঁওতালি গানটি বোধহয় কোনো অতীত ঘটনার বর্ণনা।

চেতাঙ দিসুম্‌বে ঝরিকরা লতাঙ দিসুম্‌তে ঝরিকরা
কিন আড়্‌গই সড়ক সড়ক্‌তে।
তালি সাকামতে কিম পহঙ্কি উলি ডেরই ভিকিম কলম
রাম বাম কিন পডাহে।

অর্থ—পশ্চিমের দিক হতে এক জোড়া ছোকরা পূর্বের দিকে চলে গেল রাস্তায় রাস্তায়। তালপাতের বই আমপাতার শিরের কলম রাম রাম করে পড়ছে।

সাঁওতালি কবিগণের ভাষায় কথার সংখ্যা অতি কম ছিল। সাঁওতালি জীবনের ঘটনার বৈচিত্র্য তদধিক কম। কিন্তু বোধ হয় কতকগুলি গানে সাঁওতাল কবিগণ তাহাদের দৈনিক জীবনের সামান্য ঘটনা লইয়া গভীরতর ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—

অত্‌ললো সেবমাসিতুম,
সিতুম কান্দে মনেওয়া।
হরবিগি বাডি উমুল
উমুলান পে মানেওয়া।
সিতুম কান্দে মনেওয়া—
হরবিগি চাটানি
উমুলান পে মানেওয়া—

অর্থ— জমিটি গরম, উপরে রৌদ্র রৌদ্র লাগছে রৌদ্র লাগছে।
রাস্তায় পাথর আছে রাস্তায় বড় গাছের ছাওয়া আছে।
জুড়ায়ে লও মনুষ্যেরা, জুড়ায়ে লও মনুষ্যেরা।

এই সংসারে দুঃখ কষ্ট এবং পরিশ্রমের পর পরিণামে শান্তি আছে, পণ্ডিতগণ ও দার্শনিকবৃন্দ মনুষ্যগণকে ইহাই বুঝাইয়া শান্তি প্রদান করিতে চেষ্টা করেন। সাঁওতালগণও যখন দ্বিপ্রহর রৌদ্রে গরম পাহাড়ের উপর দাঁড়াইয়া কাঠ কাটে, তখন এই গান লইয়া তাহাদের মনকে ওইরূপ প্রবোধ দিতে চেষ্টা করে।

নীচের গানটি কোনো বিরহ কাতর সাঁওতাল যাহার স্ত্রী মরিয়া গিয়াছে তাহারই গান—

ওড়াং আরে মা ইঞ্জ আপা।
বাচা রেমা আতো হও।

ওকা রেব মেদা ইঞ যদা।
ইঞ রেয়া দায়া বাড়ে সেনাতাম খান।
বেঞে কইড় মেদা যদ মে।

অর্থ—

ঘরেতে মা বাপ।
আঙ্গানাতে তো গাঁয়েব লোক।
কোথায় চোখের জল আমি মুছে দি।
আমার জন্য দয়া তোমার আছে তো।
ঘুরে দেখ চোখের জল মুছে দে।

এই গ্রামে সরলপ্রাণ সাঁওতাল তাহার মনকে প্রবোধ দিতেছে যে, যদিও তাহার স্ত্রী বিরহে দুঃখে বুক ফাটিয়া আসিতেছে, তথাপি তাহার মা-বাপ রহিয়াছে, গাঁয়ের লোক রহিয়াছে, যাহারা তাহার স্ত্রী অপেক্ষা কম অন্তরঙ্গ নহে। ইহারা যদি তাহাকে আপনার ভাবিয়া জল মুছাইয়া দেয়, তাহা হইলে তাহার হৃদয়েব বেদনা লঘু হইয়া যাইবে। যদি ব্যক্তিগত দুঃখ কষ্ট ঘুচাইবার একটি প্রধান উপায় বিশ্বজনীন দুঃখ কষ্টে আপনাকে মিলাইয়া দেওয়া। সাঁওতাল তাহাদের সরল প্রাণে যে এই সত্যের উপলব্ধি করিয়াছে, তাহা আজকালকার সভ্য জগতের অতি অল্প জীবই অনুভব করিতে পারে।

সাঁওতালি গানের কোনো কোনো স্থানে দুই এক লাইন খাঁটি বাঙ্গালা থাকে। নিম্নলিখিত গানটি উহার উদাহরণ স্বরূপ দেওয়া যাইতে পারে। এই গানটি ছেলে ঘুমপাড়ানো গান।

চেতাঙ দিসম ক্ষণ হেয একালা কযলার যুগি
মাসে মাবাঙ কহ কযদে ইমাই সে
কোলে আছে সোনেব বঁধু কয়দে ইমাইমে।

অর্থ—

উপর থেকে আসছে ভিক্ষুক যোগী
দিয়েদে বড় বধূ ভিক্ষা দিয়ে দে
কোলে আছে সোনার খোকা ভিক্ষা দিয়ে দে।

আর একটি গান দেওয়া হইল। ইহাব দুই লাইন সাঁওতালি এবং দুই লাইন বাঙ্গালা। যথা—

অত্মা লো লোকান ডাঞান লেহিকান।
সের্মা সেতুন কান হবমঞ লেহিকান।
মনে কবো হে ছাতা ধর। মুচিকে বল হে পায়ে জুতা।

অর্থ—

জমি গরম আছে পা দুটি জ্বলছে আমার
উপরে রৌদ্র আছে শরীরটি জ্বলছে
ছাতা ধরতে মন কর মুচিকে পায়ের জুতা
তৈয়ারি করিতে বল।

নিম্নলিখিত গানটিতে সূর্যগ্রহণ কেন হয় তাহা বুঝাইবার চেষ্টা আছে—

মারাঙ বুরুরে দুসেৎ বেরইলে কানায়
হারা লতার লতার তে
মানেওয়া হড়কো বেরইলে কানায়
মানাওয়া মায়া জালাতে
চাদবঙা জনম জনমে হইড়ি এনায়।

অর্থ—
বড়ো পাহাড়ে দুসেৎ লোকেরা ছিল
মানুষ পাহাড়ের নীচের জমিতে ছিল
ছিল লোকেরা এক সঙ্গে ঘর করে
ছিল পরস্পরের মায়ার বাঁধনে।
ভগবান সূর্য জন্মে জন্মে ঋণ শোধ করিতে পারিতেছেন না।

গানের মর্মটি সাঁওতালদের এই বিশ্বাসটি জানিলে বুঝা যায়। সাঁওতালদের ধান এবং ধানের চাষ ছিল না। ভগবান সূর্য সাঁওতালদের মঙ্গলের জন্য দোসাৎ জাতির নিকট হইতে এক মুঠা ধান ধার করিয়া সাঁওতালদের প্রদান করেন। ভগবান সূর্যের এই ধার সুদে সুদে বাড়িয়া যাইতেছে, শোধ করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। সেই জন্য দোসাৎ জাতির কর্তা কখনো কখনো সূর্যদেবকে ধারের জন্য পীড়ন করেন এবং তাঁহার তেজ কাড়িয়া লয়েন। সেই জন্য সূর্যগ্রহণ হইল।

রামায়ণের ঘটনা লইয়া সাঁওতালদের অনেক গান প্রচলিত আছে। উদাহরণ স্বরূপ দুই একটি নীচে দেওয়া গেল—

সীতা কারণতে লঙ্কা গাড়
লএনো জরি জারা ওরে
ওঁনাতেড়ং তবোয়তেড়ং
হাঙুম্ চাদ লএ না রে

অর্থ—
সীতার কারণে লঙ্কাগড় জ্বলে গিয়েছিল
ওই কারণে সেই কারণে হনুমানও জ্বলে গিয়েছিল।

আর একটি গান দেওয়া গেল। যথা—

উরিন বীরতে বামে লক্ষণকে বল এনা
কইকি ইঙ্গাত কাপাট অলকেদা
রামে লক্ষণ কি বনবাসিন

অর্থ—
অরণ্য বনেতে রাম লক্ষ্মণ চলে গেল
কৈকেয়ী কপাটে লিখে মেরে রেখেছিল
'রাম লক্ষ্মণের বনবাস'।



সাঁওতালি গান

সন্তোষচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক সংকলিত

শান্তিনিকেতন-ব্রহ্মচর্যবিদ্যালয়ের পূর্বতন ছাত্র ও অধ্যাপক সন্তোষচন্দ্র মজুমদার তাঁহার অচিরস্থায়ী জীবনে নানা কল্যাণকার্যের সূচনা করিয়া গিয়াছিলেন; প্রতিবেশী সাঁওতালদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহ তাহার অন্যতম। ১৯২৬ সালে মৃত্যুর পূর্বে দীর্ঘকাল তিনি সাঁওতালি গানের সংগ্রহে ও অনুবাদকার্যে ব্যাপৃত ছিলেন; অকালমৃত্যু তাঁহাকে এগুলি সুগ্রথিত করিয়া প্রকাশের সুযোগ দেয় নাই। সম্প্রতি সন্তোষচন্দ্রের পুত্রগণের নিকট হইতে গানের খাতাগুলি আমরা প্রকাশের জন্য পাইয়াছি, তাহার একটি অংশ আপাতত মুদ্রিত হইল; ইহার সম্পাদনকার্যে বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্র শ্রীমান ধাগু মাঝি বি এ আমাদের সাহায্য করিয়া কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।—প্রবাসী পত্রে সাঁওতাল-প্রসঙ্গের 'আলোচনা' উপলক্ষ্যে (শ্রাবণ ১৩৩২) সাঁওতালি গীতিগুচ্ছের ভূমিকায় সন্তোষচন্দ্র যে মন্তব্য করিয়াছিলেন নিম্নে তাহা পুনর্মুদ্রিত হইল।

—সম্পাদক, বিশ্বভারতী পত্রিকা

আমাদের আশেপাশে অনেক সাঁওতালের বাস। ইহাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার এবং ইহাদের ছোটোবড়ো সুখদুঃখের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ আমাদের সর্বদাই ঘটে। সাঁওতাল কুলি এবং প্রজা না থাকিলে এ-অঞ্চলের চাষবাস একদিনও চলিতে পারে না, অথচ জমিদার, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, মহাজনদের অত্যাচার ইহাদের উপর বাড়িয়াই চলিয়াছে। সাত বৎসরের মধ্যে জমিদার নানা অছিলায় জমা পাঁচ টাকা হইতে চল্লিশ টাকায় লইয়া গিয়াছেন, এমন দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ইহারা অনুর্বর কঙ্করময় অসমতল উচ্চভূমি বহু পরিশ্রমে ইহাদের দ্বারা উর্বর ক্ষেত্রে পরিণত করাইয়া লন, এবং তাহার পর নানা জবরদস্তি-জাল-জুয়াচুরির সাহায্যে সেই জমি ইহাদের হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া উচ্চহারে অন্যকে বিলি করেন। তথাপি ইহাদের জীবনযাত্রার মধ্যে যে সংযম, যে শান্তি, যে সৌন্দর্য এবং অনাবিলতা আছে, সভ্যতাভিমানী খুব অল্প মানব-সমাজেই তাহা সুলভ। ইহারা দরিদ্র, কিন্তু বর্বর নহে।

কিছুকাল হইতে সাঁওতালি প্রেমের এবং বিবাহের গান আমি সংগ্রহ করিতেছি। সংগৃহীত চার পাঁচ শত গানের মধ্যে এমন-কিছু পাই নাই যাহাকে অশ্লীল অথবা ইতর বলা চলে। সব ভাষাতেই অল্পাধিক-পরিমাণে অশ্লীল গান প্রচলিত থাকে, সাঁওতালি ভাষাতেও আছে।—এই শ্রেণির গান "বীরগান" নামে

পরিচিত। সাঁওতালি ভাষায় 'বীর' শব্দের অর্থ জঙ্গল—বৎসরের মধ্যে দুই-একবার যখন ইহারা শিকারে যায়, গভীর জঙ্গলের মধ্যে পুরুষেরা তখন এইসকল গান গাহিয়া থাকে। এদলে মেয়েরা কখনও থাকে না। অল্পবয়স্ক ছেলেদেরও এখানে প্রবেশ নিষেধ। ... বস্তুতপক্ষে মদ্যপানে বিহ্বল কোনো সাঁওতালও এধবনের কোনো গান গ্রামে কাছাকাছি গাহিলে কঠিন সামাজিক দণ্ড ভোগ করে এবং এ অপরাধে আট-দশ বছবের মধ্যে গ্রামে দুই-এক জনকেও অপরাধী হইতে শোনা যায় না।

—শ্রীসন্তোষচন্দ্র মজুমদার

১

গাডা নাড়ে নাড়েতে, তিরিয়ো বদন রে নালম নরং,
ধীবি-মাগাড় রে, দাঃক দ বদন রে নালম বডে।

ওরে বদন, নদীর ধারে বাঁশি বাজিও না, পাথরের তলায় রয়েছে যে জল তাকে ঘুলিয়ে তোলা কি উচিত, বদন।

২

গাডা নাড়ে নাড়েতে
সুই-উড় সুই-উড় কোডাম গোগলকানা ;
হড়ম রে সাজাবাজীঞ চেকায় তামা,
ওড়াঃক রে অন্ধন বাঁনুঃক্‌তামা।

নদীর পাড়ে পাড়ে সুপুরুষটি তো বেশ শিস দিয়ে দিয়ে ফিরছ! শরীরের সাজ দেখে আর কী করব! ঘরে তোমার না আছে ধন, না আছে অন্ন!

৩

দাঃক্‌মাঞ চোঁদাকেঃৎ সাহান গে বাঙ,
তালেবির তালে সাহান দাড়ে গে বাঙ।
দাকা মাঞ দাকা ক্যোবট উতু গে বাঙ,
জোলারে জিয়াল হাকু ঝালিগে বাঙ।

ভাতের জল চাপিয়েছি, কাঠ নেই ; তালের বনে অথচ কত কাঠ! ভাতটা তো কোনো রকমে রান্না করলুম, তরকারি তো নেই ; নদীর দ-এ জিয়ল মাছ কত আছে, জাল তো নেই।

৪

সেতাঃক রেগে গ দাঃক্‌লোয়িঞ চালাওলেন
তাইনম্‌তেঞ ব্যাঙ্গোঃট লেঃট
নেরা-ডম ডগ্ দকো টুঙ্গাওকেদা।
ধীবি চাটাইনি রে উঁমকাতে
নাড়কাকাতে নুমুলিঞ এালেলেঃট
কুড়ি বয়েস দ বানুঃক তিঁঞী।

ভোরে জল আনতে গিয়েছিলুম, মা—পিছন ফিরে দেখলুম, রেড়িগাছের ডগাগুলো কে ভেঙে দিয়েছে! বড়ো পাথরের চাতালটার উপর স্নান করে মাথা ঘসে নিজের ছায়ার দিকে চাইলুম। যৌবন তো আর আমার নেই!

৫

কুলহি মুচাঁঃট্ রে বাবাম বাবাম বাঁধ কেদা
বাবাম পুখ্‌রি কেদা
তোয়া বাহা বাবাম রহয় কেদা।
ইঞ্‌মা বাবাঞ হারায়েঁন
বাহা মা বাবা মোসঃট এন
হড়মো লিকির লিকির তো আ বাহা।

(গ্রামের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে যে পথ) সেই কুলহির মুখেতে, বাবা, তুমি বাঁধ বেঁধেছ, পুকুর খুঁড়েছ। তার পাড়ে টগরফুল লাগিয়েছ। আমি তো, বাবা, তোমার ডাগর হয়েছি, এদিকে দোলায়মান টগরগাছের ফুলগুলি শুকিয়ে গেছে।

৬

গতেঞা সাজদ সোনাগে সাজ—
রূপাগে আব্‌রান
নোঁয়াকো সাজবাজ চেকাতেঞ হিড়িঞা।
নালে বাচারে মারাঙ অকঃচ জজদারে
জজ দারেরেঞ রাকাঃপ কাদা
রাচা জঃক জঃক তেঞ হিড়িঞ কেদা।

আমার ভাবের লোকের সাজ ছিল সোনার, তার আভরণ ছিল রূপার, সেসব সাজগোজ কী করে ভুলব! আমাদের উঠানে ওই প্রকাণ্ড বড়ো তেঁতুল গাছ। তেঁতুল গাছের উপর তোলা রইল সেসব! উঠান ঝাঁট দিতে দিতে ভুল হয়ে যাচ্ছে সব।

৭

জজ-দ জইনা ঝ'মকা ঝাঁকুর
নুলে-দ জইনা থোপা থোপা ,
নুলে জমদ পেড়া সেন্‌নালেপে,
নাপে-মা ঞেল্‌তে ডাডিমা ঘাট রে,
পেরেঃচ কান্তাপেড়াঞ বাঁগিয়াদাঃ।

তেঁতুল ফল ঝামকা-ঝুকুর-ঝুকুর ঝুলছে, থোকায় থোকায় আম ফলেছে—আম খেতে আমাদের ওদিকে যেও, বন্ধু! তোমাদের দেখে জল নেবার বালু-খোঁড়া ডোবার ঘাটে ভরা কলশি ফেলে দিয়ে এসেছি, সখা!

৮

গাডা নাড়ে নাড়েতে, বুগিতে তালে রেঠে জানুম।
দেজ তালাংমে রাটাপাটা
বুকুই তালাংমে দালায় দালায়
হহয় তালাংমে দিলীয় দিলীয়
জজম সানাঞ-কান লুচুর লুচুর।

নদীর ধারে ধারে আমাদের অনেক বেঁটে বেঁটে কুলগাছ।—হাঁচড়ে-পাঁচড়ে তুমি এক রকম করে গাছে চড়ো, গাছটাকে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে দোলা দিও তুমি, 'এসো এসো' বলে ডেকো আমাকে। খেতে ইচ্ছা করে এখনই আমার মুখে জল আসছে!

৯

নত হবে বিন্দিম তল কেদা,
দারে হবে বিন্দিম তল কেদা,
নিঞরেন জুরি বিন্দিম ত-ল লেখান,
দেনে বানার তীরে রুপী টডর।

মাটিও বাঁধলে মাকড়সা-রানি, গাছও বাঁধলে। আমার জুড়িটিকে আমার সঙ্গে যদি বেঁধে দিতে পার, মাকড়সা, তো তোমার দুই হাতে দুটি রুপোর বালা পরিয়ে দিই!

১০

বানাম রেগে রড় মেনাঃক লান্দা মেনাঃক কাথা
মেনাঃক মুনিরে, তিরিয়ো রেগে মুনি মনদো মেনাঃক
আমাঃক মনে মুনি ইঞরে, ইঞাঃক মনে মুনি আমরে
মনে মনে মুনি, তড়ে সুতামতে, তল ইনারে।

বেহালাতে ভাষা আছে, হাসি আছে, কথা আছে, মুনি, বাঁশিতে মন আছে—মুনি, তোমার মনে আমি, আমার মনে তুমি, আকাশ-ভাসা (সুরের) সুতোয় বাঁধা পড়ে গেল সব!

১১

আলে দিসাঁম দ বগেতে মাতকম দারি,
তিকিন তারাসিং ঞুর আকানা।
হয়মা হিঁসালিযে সিতুং ঢিমালিয়ে
হযলল দিন দুলাড় আলোম হালাং।

আমাদের দেশে তো মহুয়াগাছের অভাব নেই. দুপুরে বিকালে সব সময়েই তো মহুয়া ঝরে পড়ছে। বাতাস হিংসুটে, রোদ্দুরটা অলস—প্রিয়, গরম বাতাসের দিনে আজ মহুয়া না-ই কুড়লে!

১২

হর হেসাঃক্‌দ হর বাড়ে, নমন-আকান
হ কাঁড়ের আকান।
হড়দকো মেনা ফালনা হপন নেরা হাবাওযাকান
হর জারগো ওয়াকান।
হারা ওয়াকান রেহঞ জারগো ওয়াকান রেহঞ
নাপাবারে ধন গেথঞ জজম কানা।

রাস্তার বট অশথ যেমন বড়ো হয়ে উঠছে ডালপালা ছড়িয়ে, লোকে বলে, অমুক লোকের মেয়ে তেমনি বেড়ে উঠছে, লো, আইবুড়ো থেকে বুড়িয়ে যাচ্ছে। বড়ো হয়ে

উঠেছি তো উঠেছি, আইবুড়ো আছি তো আছি, আমার বাপ-মায়েরই সম্পত্তি তো খাই (তাদের তো খাচ্ছি নে)।

১৩

অৎরেমা ধিরি দালান
সেরমা রেমা সনা দালান
হিহিড়ি সনা দলান বাব দুয়ার।
চেকাতেঞ ঝিজা চেকাতেঞ বলা
হিহিড়ি সনা দলান বার দুয়ার।

মাটিতে পাথরের দালান, আকাশে সোনার দালান, হিহিড়ির সোনার দালানে বারোটি দরজা। কী করেই বা খুলব, কী করেই বা ঢুকব, বারোদুয়ারি হিহিড়ির সোনার দালানে!

১৪

কুড়ি কুড়ি লে রিয়াঁও এনা,
বাঁইহাঁড় বাঁইহাঁড় তে গৈঁঠা হালাঞ।
গাতেকুড়ি দকো মিতাঁঞ কানা,
নাম দ কারাম ডাঁরেম* জাবগোযেনা।

মেয়েতে মেয়েতে আমরা সব এসে জুটেছি, মাঠে মাঠে ঘুঁটে কুড়তে। সখীরা বলছে, হাঁ ভাই কারাম-ডাল* তুই যে আইবুড়ো হয়ে রইলি।

১৫

ইং জুরি কুড়ি ইঁ বানুঃক কোয়া
ইংদ কুঁয়ারিয়া
ইঞদং অডং চালাঃক এট্রাদিসাম!
দারেরে জাপাঃক কাতে
চান্দোসে সামাংকাতে।
চান্দো ক্কয়েমে দিনি জুরি।

আমার সমবয়সী মেয়ে তো আর নেই, আজও কুমারী থেকে গেলুম! বেরিয়ে চলে যাবই আমি অন্য কোনো দেশে!

(আহা তা কেন!) গাছে ঠেস দিয়ে, চাঁদের দিকে মুখ করে চাঁদকে বলো, ওগো, আমার জুড়িটি জুটিয়ে দাও!

১৬

নায়ঞো হয় গুবেন বাবা হঁয় গুরেন
অকয় মিতাঁঞা দেমাঁই দুড়ুঃপ।

* কারাম ডাঁরেম। সই পাতানোর মতো 'কারাম ডাঁরেম' পাতানোর রীতি আছে। অগ্রহায়ণ মাসে সর্দারের বাড়ির সামনে কারাম গাছের জোড়া ডাল পুঁতে নাচ হয়। এই দুই ডালে যেমন বিচ্ছেদ নেই, তেমনি দুই সখিতে যেন কখনও বিচ্ছেদ না থাকে, 'কারাম-ডাল' পাতানোর সময় এই কামনা করা হয়।

নালে রাচারে কায়রা দারে
কায়রা গে নিঙ্গাঞ কায়রা গে না-পুঁঞ,
কায়রা গেই মিতাঁ-ঞা দেমাঁই দুড়ুঃপ।

মাও মরে গেল, বাবাও মরে গেল, কে আর আমাকে বলবে, মা এসে বোস! —আমাদের উঠোনের সেই কলাগাছটি! ওই কলাগাছই আমাদের মা, ওই কলাগাছই আমাদের বাবা। ওই আজ বলছে, মা, আয় বোস!

১৭

নালে ছটকারে জাঁনম দারে,
জানুম দারের পুলু-লুমাঁং।
নায়ো হঁয় গুরেন বাবা হঁয় ভিন্দাঁড়েন
তকয় যতন বেন পুলুই-লুমাঁং।

আমাদের বাড়ির সামনে কুলগাছ, কুলগাছে পলু পোকা। মাও মারা গেল, বাবাও পড়ল, কে আর তোমাদের যত্ন করবে, পলু পোকা!

১৮

হড়মো হপনবাবু লেঃক লেকা,
ডানডা হপনবাবু চাঁমুক লেকা,
চেকাতে বাং বাবুম রহড় কান?
নিঞতেমা বাং সাঁরে চান্দোগে
বেনাও লিদিং, জিসুমাসি কিন ঢিলাঁও কিদিঞ।

গাটি তোমার, ভাইটি, ছিল চকচকে, পিছলে যাবার মতো, কোমরটি ছিল ছিপছিপে চাবুকের মতো! শরীর এখন অমন শুকিয়ে যাচ্ছে কেন?

আমার আপনা থেকে তো নয়, বউ (দিদি), চান্দো (বিধাতা) গড়ে তুলেছিল আমাকে, জিশু মুসাতে জুটে দুরবস্থা ঘটালে!

১৯

আলে বয়হা-দ আঁড়িলে সাঙ্গেয়া
ওড়াঃক রেগে তালে তুম্-দা টামাক।
জমক্‌লে রুইয়া জমক্‌লে হিলাঁঃকআ,
হবর আকান গিদরাম দহ কেয়া।

আমরা ভাই কজন সংখ্যায় অনেক, বাড়িতে আমাদের মাদল আর ঢোলক আছে। জমকালো রকম করে আমরা বাজাই, খুব জমিয়ে হেলে দুলে নাচি। কোলে আছে যে ছেলে তাকেও নামিয়ে লোককে এসে জুটতে হয় সে নাচে!

২০

পুরুব খন্‌চ দাঁই পাঁছিম খন্‌চ,
হিঁসিদেঁ হিঁসিদেই হয় লেদারে
ছুপি চাতম ওটাং এন

তালে সাকাম কেঞ্চড় এন
হিঁসিদে হিঁসিদেই হয় লেদারে।

দিদি, পুবদিক থেকে পশ্চিমদিক থেকে সোঁ সোঁ করে বাতাস বইছে—তালপাতাগুলো সব ফড়ফড় করছে ; মাথার মাথালি, ছাতা সব উড়ে যাচ্ছে ; সোঁ সোঁ করছে হাওয়া।

২১

হেন্দে ছাতা চাতম দোচঃট, দাঁহড়ি
পানে নিমামদয় তকয় কানা?
দাঃক-হিলি তাঙমে গান্ডহিলি বেলমে
তায়নম তেঞ লী-ইয়ামা
তায়নম রেদো হিলিই বোকম কানা।

কালো কাপড়ের ছাতা মাথায়, মোরগের চুড়োর মতো পাগড়ি পরা, যে তোকে পান দিচ্ছিল সে কে, রে?

জল, বউদিদি, তুমি দাও তো, পিঁড়িটা পাত তো, তারপরে বলছি।—

শীগগির, ও যে তোমার ভাই হতে যাচ্ছে, বউদিদি!

২২

নিন্‌গাঞ না পুঞ না তোরে
তুন্দাঃক টামাক সাড়ে কানদো বাবা-গ
ওনা আনজোম আনজোমতে
ওনা আতেন আতেনতে
পোরাইনি সাকাম লেকাঞ চলমল আ।

মা-বাবার গ্রামে লাগড়া আর মাদলের শব্দ হচ্ছে! তাই শুনে শুনে, ওর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে পদ্মের পাতার মতো টলমল করছে (আমার গা)!

২৩

ইঞ-গাঁঞ আঁহুঞদ চান্দোলেকা
হিলিঞদাদাদ ইপিল লেকা
ইঞদঞ জানাম্‌লেন সুরগুজাবুটারে
ইঞাঃক ঞুতুমদ সুরুজমুনি।

মা বাবা আমার চাঁদের মতো, আমার বউদিদি আর দাদা যেন দুটি তারা, আমি জন্মেছিলুম সুরগুজিয়া ফুলের মধ্যে—আর আমার নামটি হচ্ছে সূর্যমণি!

২৪

গাড়া নাড়ে নাড়েতে কাঁম্বিড় বাহা
দেজঃক তেগি সাঁরি বের্‌মাই হাসুরেন
সিঃট গোছাই তেগি গাতে সারাসাঁতি
গুতুগালাং তেগি গাতে বের্‌মায় রাকাঃপ।

নদীর পাড়ে পাড়ে কাম্বিড় ফুল। গাছে চড়তেই বেলা ডুবে গেল, সই! আঁচলে ফুল ভরতে ভরতেই নিশুতি রাত হয়ে এল! মালা গাঁথতে গাঁথতেই আবার সূর্য উঠল!

২৫

হেন্দা বাঁবুগুপি কোড়া
চেকাতে বাংএম রহড় এনা?
গাঁই গুপিতে, তিরিয়ো নরংতে,
বানাম তিউইংতেঞ রহড়্এনা।

ওগো আমার রাখাল, কী করেই বা এমন শুকিয়ে গেলে তুমি?

এই, গোরু চরিয়ে চরিয়ে, বাঁশি বাজিয়ে বাজিয়ে, বেহালা বয়ে বয়ে, কাহিল হয়ে যাচ্ছি আর-কি?

২৬

নাঁই নাঁই তালারে তালা নাঁই তালারে কারাম দারে
কারাম বুটারে সিরাঁম গ্যেলে
সিরাঁম গ্যেলে বে টিরাঁম চ্যেড়ে
টিরাঁম চ্যেড়েদয় ম্যেনা
রাজদ রাপাজদ নিঞরেন নেঙ্গানাপা
সাহেব সুবাঁদ নাপাবারে।

দামোদর নদীর মাঝখানে, মাঝ দামোদরের মাঝে, চাকলদা গাছ। কারাম গাছের তলায় বেনা গাছের শিষ। তার শিষে শিষে নীল রঙের পাখি। তাদের ভাবখানা হচ্ছে, রাজা-রাজড়াবা তো তাদের বাপ মা, সাহেব-সুবারা হল তাদের ভাই-বেরাদার।

২৭

হেন্দাবাবু মাঁন্দাঁড়িয়াঁ, নাবেনাঃক রাঁস্কাঁবেন তোকাকেদা?
নাঁলিঞাঃক বাঁস্কাঁদ নোড়াঃক্রে নেমাঃক-আ
পিতল তল তিরিয়াঁ পিটারিরে।

ওহে বাপু মাদল-বাজিয়ে, তোমাদের আনন্দ-উচ্ছ্বাস সব গেল কোথায়?

আমাদের আনন্দ বাড়িতে রয়ে গেছে, পিতল-বাঁধানো বাঁশিটি পেটারিতে (ফেলে এসেছি)।

২৮

হাটেম চালাঃক্গ বাটেম চালাঃক
সোনা ছাতার গ কিরিঞ্যাঞ মে!
হাটিঃঞ চালাঃক বাঁবু বাটিঞ চালাঃক
সোনা ছাতার বাঁবু বাঁঞ কিরিঞ্যা—
নোবঞ কিরিঞাম তীরে যুগে।

হাটে যাচ্ছ, মা, তুমি পথে বেরুচ্ছ, আমার জন্যে একটা সোনার ছাতা কিনে দিও!

পথেই তো, বাছা, আমি বেরুচ্ছি, হাটেই তো চলেছি। সোনার ছাতা তো কিনব না, মেয়ে একটি কিনে আনব, সে হবে তোর চিরযুগের!

২৯

রাঁসি মা বাঁসতি টোলা মা প্যে টোলা
বাবেয়া গেয়াকিন্ রাঁসিকা দ
রাসিকা এ্যালতে অলংকার এ্যালতে,
হড়ম রেনাঃক গামছা হাঁসরেনা।

ভারি বসতিওয়ালা গ্রাম, তার তিন তিনটে টোলা। বাজিয়ে দুজনেই রসিক বটে! মাদলবাজিয়ে (রসিক) দুটিকে দেখে, তাদের অলংকার আর রঙ্গভঙ্গা দেখে, গায়ের গামছা আমার আর গায়ে থাকছে না!

৩০

সেদায় দ আইএযা আর বাবা দকিন মোনা
দোবাবু কাঁমিমে, রাজান-ভাজান লিঞ বাঁহুওয়া মা।
তোহিংদো আইয়ো আর বাবা দকিন
গুনিযেন ভাঁবিয়েন ধাঁরতি টুন্‌ডাং তেকিন বাঁহুয়াঁঞকান।

জন্মাবধি মা আর বাবা বলে বলে পাঠিয়েছে, যা বাছা, কাজ কর, ধুমধাম বাজনা বাজিয়ে পালকি করে বউ এনে দেব! (আর কী না) আজ বাবা আর মা অনেক ভেবে চিন্তে পায়ে হাঁটিয়ে (আমার) বিয়ে দিচ্ছে।

৩১

বেনাও য়াঁঞমে কামার বেনাওয়াঁঞমে
তিরেনাঃক লীলমুঠি কাজরাটি।
সাজাওয়াঁঞমে নায়োগ সাজাওয়াঁঞমে
বাঁহুতুল দাঁউড়া সিন্দুর শাড়ি।

গড়ে দিও, কামার, গড়ে দিও হাতের নীলমুঠি কাজললতা। সাজিয়ে দিস মা, সাজিয়ে দিস বউ-তোলবার চাঙারিতে সিঁদুর আর শাড়ি।

৩২

হলা তিকিন রে মাণ্ডোওয়া, তেহেঞতিকিন তেগে
সানাম মাণ্ডোওয়া সাকাম রহঃড়েনা।
নিঞহচ মারাং হিলিহোলা তিকিন মাজান জম
রহড়েনা সেঞ গসয়েনা।

কাল দুপুরবেলার বিয়ের পাতার মণ্ডপ, আজকের দুপুর হতেই শুকিয়ে গেছে! আমিও, বড়ো বউদিদি, কাল সেই দুপুরে খেয়েছিলুম, শুকিয়ে গেছি না ঝিমিয়ে আছি (বুঝতে পারছি নে)।

৩৩

ইউমিন মারাং নোড়া করে
অকয় বায়বাব লেদা বায় বতবলেন
দুড়ুংপ আকানদএঃ লুটুগে লুটুগে
তেঙ্গো আকানদএঃ লিকিদে লিকিদে
বওংবংক কামদএঃ কেটেল কেটেল।

এত বড়ো ঘরে কে ঘটকালি করেছিল? ভয় করেনি তার! বসে থাকলে গা ছমছম করে, দাঁড়ালে গাছের মতো গা কাঁপতে থাকে, ভয়ে শরীর শিউরে শিউরে চমকে চমকে ওঠে!

৩৪

তোকো বুরুরেন চেঁড়ে কানাই
সাজো সারজোম সাকাম দারেবেই এঞামেকান।
ওকয় হাপন কানাই নওংক নল কোড়া,
সাজো বৈহাকুড়ি বাহুই এঞামেকান।

কোন্ পাহাড়ের পাখি এই কানাই যে অনেক-পাতাওয়ালা শালগাছ চায়? কাদের ছেলে হচ্ছেন এই কানাইটি যাঁর লেখাপড়া জানা আছে, (আর) যিনি অনেক-বোনওয়ালি বউ চান? —

৩৫

নাঁলিএরগে বয়হা নালিএরগে এনাতেগা
নাড়া সাকাম দ বালিং জমা।
গুড়লিএন্দু লা 'হোমোতিলি' লহ দা
দাড়ে সেদেন রেদেন বালিএঃ জমা।

আমরা দুই বোন, আমরা দুটি জা, শাকপাতা খাই না। গুড় ঢালি, তারপর তাকে দুধ দিয়ে আমরা দুজনে ভিজাই। ঘাটাঘাটি-করা দই-টই আমরা খাই না!

৩৬

গাতে গাতেলাড় হারেকানা,
উনুনি বীরলাং বলয়েনা
গাতে গাতেলাড় বালা মা লেনা।

সখীতে সখীতে আমরা দুটিতে ছিলুম, গহন অন্ধকার বনে ঢুকে কখন হারিয়ে গিয়েছিলুম, আজ আবার সখীতে সখীতে আমরা বেয়ান হয়েছি!

৩৭

সেদায় দ নিজ্ঞোন দ কীমি রেয়াড গে রঁড়েইএঃ
তিহিএঃ দ নিজ্ঞীএঃ দ বিদীযিজ্ঞা বডিএঃ আঙ্কুম।

আগে মা আমাকে কাজের কথাই বলেছে, আজ শুধু বিদায়ের কথাই শুনছি।

৩৮

সড়ক সড়ক তেং চালাঃক কানা
তালা সড়ক রেঞ তেন্দোয়েনা
নিয়ে করে জীবন মেনামমে খান
পিতল তল তিরিয়ো জীবন নরগুলেতাম।

পথে পথে চলেছি, মাঝ সড়কে এসে দাঁড়ালুম। এর আশেপাশে কোথাও থাকো যদি তবে তোমার পিতল-বাঁধানো বাঁশিটি একবার বাজাও তো জীবন!

৩৯

সিন চান্দো সেওয়া কাতে
বাহা মান্দার মুলিং বহয়লেদা
কুয়ারি ডোবগেঞ বাহা লেদা
হায় রে মন্দরমুলিম বোঙ্গাহাডেম।

সূর্যদেবের পূজার জন্যে মন্দারমূলী ফুল পুঁতেছিলুম। যতদিন কুমারী ছিলুম মাথায় ফুল গুঁজেছি। চললুম, হায় রে মন্দারমূলী, এখন যক্ষের ধন হয়ে রইলে!

বিশ্বভারতী পত্রিকা ● কার্তিক-পৌষ ১৩৫৩ (১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ)

শুদ্ধি॥ কোবট→কেং; বাজোঃট→বেজোং; লেঃট→লেং; এরালেঃট→এরলেং, লেঃট→লেং
মুচাঃট→মুচাং; মোসঃট→মোসং, বাচারে→বাচাবে, কাণ্ডাপেডাঞ→কান্ডাপেডাঞ,
তাবাসিং→তাবাসিঞ, ইং→ইঞ; এটাদিসাম→এটাকদিসম, চন্দোসে→চান্দোসেং,
কয়েমে→কবেমে, ছটকারে→ছটিকা, লিদিং→লিদিঞ; আঁদু এঃদ→আঁপুম সিঃট→সিং,
ইউমিন→নুমিন, কানাই→কানায়, হাপন→হপন, বালিং→বালিঞ; নিজোন→নিজোঞ,
তেং→তেঞ, তেন্দোয়েনা→তেজোয়ানা; সিন→সিঞ; মুলিং→মুলিঞ; ডোরগেঞ→ডোবগেঞ

—সম্পাদক



সাঁওতালদের পূজা-পদ্ধতি

শ্রীরণেন্দ্রবিজয় দাস

আমরা যেমন নানাপ্রকার পূজা উৎসবাদির আনুষ্ঠান করিয়া থাকি এবং পূজা বিশেষে যেমন তারতম্য হইয়া থাকে; সাঁওতালদিগের মধ্যেও সেইরূপ নানপ্রকার পূজা উৎসবাদির তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়; এবং পূজা বিশেষে তারতম্যও হইয়া থাকে। আমাদের মধ্যে যেমন বৎসরের বিশেষ বিশেষ দিনে নানাপ্রকার পূজা উৎসবাদি হইয়া থাকে সেইরূপ তাহাদের মধ্যেও বিশেষ বিশেষ মাসে বিশেষ বিশেষ দেবতার উপাসনাদি হইয়া থাকে। আমাদের যেমন দুর্গা পূজা বৎসরের মধ্যে বড়ো পূজা সাঁওতালদিগের মধ্যে তেমনি "বাদ্‌না" নামক দেবতার পূজাই সমস্ত পূজার শীর্ষস্থানীয়।

এই "বাদ্‌না" পূজা পৌষ মাসে হইয়া থাকে। ইহার কোনো নির্দিষ্ট দিন ঠিক নাই। গ্রামের সমস্ত লোক একত্র হইয়া তাহাদের সর্দ্দারের সাহিত পূজার দিন ঠিক করে। কিন্তু ইহা পৌষ মাসেই করিতে হয়। এই পূজার কার্য ক্রমান্বয়ে তিনদিন চলিতে থাকে। পূজার প্রথম দিনে পূজারী দ্বারা গ্রাম হইতে কিছু দূরে মাঠের মধ্যে পূজার কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়। এই পূজারীকে সাঁওতালরা নায়কে বলে।

নায়কে অর্থাৎ আমাদের যেমন পুরোহিত পূজাদির কার্য করিয়া থাকে তাহাদের মধ্যেও এমন এক পরিবার কাজ যার কাজ শুধু পূজা উপাসনাদি করা; এই পরিবারের লোককে তারা নায়কে বলে।

পূজার প্রথম দিন সকালবেলা হইতেই গ্রামবাসী হইতেই এক একটি করিয়া মুরগি ও চাল, ডাল ইত্যাদি পূজার উপকরণ সকল সংগ্রহ করা হয়। এই সংগ্রহ কার্য শেষ হইলে পর; বেলা আটটা-নয়টার সময় গ্রামের সমস্ত লোক একত্র হইয়া খোলা মাঠের দিকে

চলিয়া যায় এবং কিছুদুর গিয়া একটি সমতল জায়গা পরিষ্কার করে এবং গোবর ও জল দ্বারা লেপন করে। তারপর জায়গাটা একটু শুকাইলে চালের গুঁড়ি দ্বারা আলপনার মতো করিয়া একহাত চওড়া দুটি লাইন টানে এবং যতগুলি পরিবার মিলিয়া এই পূজা করে লাইন দুটিকে চালের গুড়ি দিয়া ঠিক ততগুলি ভাগ করে। সেই প্রত্যেক ভাগের মধ্যে নায়কে এক এক মুঠা চাল মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে রাখিয়া দেয় এবং তাহার উপর প্রত্যেক পরিবারের এক মুরগি ছাড়িয়া দেয়। চাল খাওয়া শেষ হইলে পরে নায়কে এক একটি করিয়া মুরগি বলি দেয়। আমরা যেরূপ দেবতার কাছে পাঁঠা বলি দিয়া থাকি তাহারা ঠিক সেইরূপ দেয় না। তাহাদের বলি দেওয়ার একটু বিশেষত্ব আছে। মুরগিটাকে ধরিয়া এক একখানা ধারালো ছুরি তার গলায় লাগাইয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে উপর ও নীচে দুটি টান দিয়া—ছাড়িয়া দেয়। তারপর বলি দেওয়া হইলে সমস্ত লোকেরা মিলিয়া সেই মুরগিগুলি একজায়গায় রান্না করিয়া আহার করে। নায়কে কিন্তু সকলের সঙ্গে একত্রে আহার করে না। সে নিজের রান্না নিজে করে। তারপর একটি মুরগির ডিম ভাঙ্গিয়া তাহার কুসুম একটি গাছের পাতায় করিয়া নায়কে পুড়াইয়া খাইয়া খোসাটি সেই পূজার নির্দিষ্ট আলপনার উপর রাখিয়া দেয়। এই সমস্ত কাজ করিতে করিতে বেলা প্রায় তিন-চারটা বাজিয়া যায়; তখন গ্রামের সমস্ত গোরুর পালকে সেই স্থানে লইয়া গিয়া পূজার জায়গার উপর দিয়া চালাইয়া দেওয়া হয় এবং যে গোরুটি সর্বপ্রথমে সেই ডিমের খোসাটি মাড়ায় সেই গোরুটিকে ধরিয়া তাহার পায়ে সিঁদুর দিয়া সাজাইয়া তাকে প্রণাম করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। পরে এই গোরুটির মালিককে পরের একটি বিশেষ পর্ব উপলক্ষ্যে তিন সের মদ সমস্ত গ্রামবাসীকে পান করাইতে হয়। এই মাঠের পূজার সময় স্ত্রীলোকেরা সেখানে যায় না। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে সকলে মিলে গোরুরপাল লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসে।

সন্ধ্যা হইলে পরে লোকেরা কোনো এক নির্দিষ্ট জায়গায় সমবেত হইয়া খুব মদ পান করে। তারপর সমস্ত স্ত্রীপুরুষ একত্র হইয়া নাচ-গান করিয়া সমস্ত গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। মদের নেশা যখন খুব প্রবল হয় তখন তাহাদের গান ও আমোদ খুব জমিয়া উঠে এইরূপে তাহাদের সমস্ত রাত আমোদে কাটিয়া যায়।

পরের দিন সকালবেলা আট-নয়টা পর্যন্ত উপবাস করে এবং আপন আপন বাড়ির উঠানের কতকটা জায়গা গোলাকৃতি করিয়া গোবর দিয়া লেপিয়া তার উপর পূর্বোক্ত মতে আলপনা কাটে ও সেই জায়গাটির উপর প্রত্যেক পরিবারের লোকেরা একটি করিয়া শূকর বলি দেয়। সেই শূকরটিকে পুড়াইয়া কাটিয়া ভাত ও সেই মাংস একটা থালাতে করিয়া তাহাদের উঠানের আলপনা কাটা জায়গায় রাখিয়া "বাদ্‌না" দেবের ভোগ দেয়। ভোগ দিবার সময় তাহারা দুই একটি মন্ত্রও বলে। তারপর হাতের মধ্যে জল লইয়া সেই নৈবিদ্যের চারিধাকে ছড়াইয়া দিয়া সেই প্রসাদ পরিবারের প্রত্যেক লোককে অল্প অল্প করিয়া দেয়। এই দিনের পূজা তারা নিজেরাই করিতে পারে আর নায়কের প্রয়োজন হয় না। তারপর আবশ্যক মতো আরও শূকর কাটিয়া ভাত তরকারি রাঁধিয়া বেশ মজলিশ করিয়া খায়। তারপর সন্ধ্যা হইলে পর পূর্ব দিনের মতো মদ পান করে এবং স্ত্রী পুরুষ দুইই একত্রে গান করিতে করিতে ও নাচিতে নাচিতে গ্রাম প্রদক্ষিণ করে এবং সমস্ত রাতই এইভাবে কাটাইয়া দেয়।

তৃতীয় দিন তাদের কিছু করিতে হয় না এই দিন তাদের সম্পূর্ণ বিশ্রামের দিন।

চতুর্থ দিন নিজেদের ইচ্ছামতো কেহ বা কিছু না খাইয়া কেহ বা একটি মুরগি মারিয়া তারই ঝোল করিয়া খাইয়া একত্রে নিকটস্থ কোনো বনে তির-ধনুক লইয়া শিকারে চলিয়া যায়। সেখানে গিয়া কেহ বা কাঠবিড়ালি, কেহ বা খরগোশ কেহ বা কোনো পাখি বা অন্য কোনো কিছু শিকার করে। বেলা বারোটা একটার সময় নিজেদের শিকার লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসে। এবং তাহা রান্না হইলে পর তাহা খাইয়া গ্রামের নিকটবর্তী খোলা মাঠে চলিয়া যায়। সেখানে নানাপ্রকার কৌশলের খেলা দেখানো হয়। গ্রামের সর্দারও সেখানে উপস্থিত থাকে।

সর্দার অর্থাৎ যেমন আমাদের কাপ্তেন আমরা ঠিক করি তাহারা ও তাহাদের সর্দার ভোট দিয়া ঠিক করে। গ্রামের ছোটো বড়ো সকল প্রকার অভিযোগই এই সর্দার মীমাংসা করে এবং সকলকেই তাহার বিচার মানিয়া চলিতে হয়।

খেলার জায়গায় গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই উপস্থিত থাকে। সেখানে গ্রামের সমস্ত যুবকগণ তির-ধনুক হাতে লইয়া সারি বাঁধিয়া দাঁড়ায় এবং তাহাদের কাছ হইতে কিছু দূরে একটি খোঁটা পোতা হয় সেই খোঁটাকে লক্ষ্য করিয়া তির ছুড়িতে থাকে। তির ছোঁড়া শেষ হইলে, হাড়ি ভাঙ্গা খেলা হয়।

এই হাড়ি-ভাঙ্গা খেলাটি ভারি মজার। সমস্ত খেলোয়াড়রা সারি বাঁধিয়া এবং সারি হইতে কিছু দূরে একটি কলশি রাখিয়া দেয়। সর্দার এক একজনকে চোখ বাঁধিয়া ঘুরপাক খাওয়াইয়া ছাড়িয়া দেয়, চোখ বাঁধা লোকটি হযতো হাড়ির দিকে না গিয়া ঠিক বিপরীত দিকে গিয়া মাটিতে সজোরে আঘাত করে তখন এই কাণ্ডটি দেখিতে বড়োই হাসি পায়। কেহ হয়তো হাড়ি পার হইয়া অনেক দূরে গিয়া মাটিতে আঘাত করে এইরূপে অনেক কষ্টের পর বহু ভাগ্যের ফলে হয়তো কেহ ঠিক কলশির উপর আঘাত করিতে পারে। এইরূপে নানাপ্রকার ক্রিড়া কৌতুক দেখাইবার পর যে খোঁটাটিকে পূর্বে লক্ষ্য করিয়া প্রথম তির ছুড়িয়াছিল সেই খোঁটাটি তুলিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে তারপর সর্দারের সম্মানার্থে এই খোঁটার এক খণ্ড তাহাকে দেওয়া হয় সেও তাহার পরিবর্তে তাহাদের মদ ও মুড়ি খাওয়ায়। তারপর বাকি অংশগুলি তাদের সমাজের কুলীনদের সম্মান প্রদর্শনার্থে বাড়িতে গিয়া এক একখণ্ড করিয়া দিয়া আসে। তারাও তাহাদিগকে মদ ও মুড়ি দিয়া সন্তুষ্ট করে। এই কাজ শেষ হইলে পরে তাহারা আপন আপন ঘরে ফিরিয়া যায় এইরূপে সেই বৎসরের মতো "বাদ্‌না" দেবের পূজা শেষ হয়।

শান্তিনিকেতন ● ভাদ্র ১৩৩১ (১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ)



সাঁওতালি ভাষায় সংস্কৃত ও প্রাদেশিক ভাষার প্রভাব

শ্রীসত্যেশচন্দ্র গুপ্ত এম-এ

ঠিক কোন্ সময়ে সাঁওতালেরা ভারতে এসেছিল তা জানা যায় না। কেউ কেউ বলেন, তারা হিমালয় থেকে এসেছিল, আর বাঙ্গালা বিহার ওড়িশায় এসে বাস করেছিল। কেউ বলেন তারা সাগর পার থেকে এসেছিল। আবার কেউ বলেন সাঁওতালেরা ভারতেরই আদিম বাসিন্দা। এটা নিশ্চিত যে তারা এই ভারতবর্ষে বহু শতাব্দী হতে বসবাস করছে। অনুমান যে আর্যগণের ভারত অধিকার করবার পূর্ব হতেই তারা ভারতে ছিল।

বিহারের ছোটোনাগপুর বিভাগে, সাঁওতাল পরগনায়, ওড়িশায় বালেশ্বর জিলায় আর ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে, প্রাচীন বঙ্গের বীরভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জিলায়, উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর জিলায় সাঁওতালদের সংখ্যাধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। সাঁওতালদের মধ্যে প্রচলিত কিংবদন্তি ও তাহাদের সম্বন্ধে প্রকাশিত পুস্তকাদি হতে বুঝতে পারা যায় যে, মেদিনীপুর জিলার উত্তর-পশ্চিম অংশে, সাঁওতালদের আদি বাসস্থান, অন্তত আদি ও দীর্ঘকালস্থায়ী উপনিবেশ ছিল। মেদিনীপুর জিলার এই অংশ, ইংরাজ অধিকারেব প্রথমে 'জঙ্গাল-মহাল' নামে স্বতন্ত্র জিলারূপে শাসিত হত। জঙ্গাল-মহালকে বিচ্ছিন্ন করে, কতক অংশ মানভূমে, কতক বীরভূমে, কতক বাঁকুড়ায় আর বেশির ভাগ মেদিনীপুর জিলার সঙ্গে ১৮৭০ থেকে ১৮৮০ খ্রিঃ অব্দের মধ্যে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়।

পূর্বে মনে করতাম যে সাঁওতালি বুঝিবা খাঁটি বা অবিমিশ্র ভাষা। এরকম মনে করা ভুল। কোনো জীবন্ত ভাষার পক্ষে স্বীয় গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকা অসম্ভব। বিবিধ সভ্য ও বর্বরজাতির সহিত সংঘর্ষে ও সাহচর্যে সাঁওতালদের জাতীয় প্রকৃতির যে পরিবর্তন

সাধিত হয়েছে, তাহাতে ভাষার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন অবশ্যম্ভাবী। আদিম ও বর্বর সাঁওতাল এখনও ওড়িশার পার্বত্য প্রদেশে বর্তমান। এখনও তারা কাপড় পরে না, বল্কলেই লজ্জা নিবারণ করে। সাঁওতাল পরগনা, মানভূম, বাঁকুড়া, বীরভূম ও মেদিনীপুরে, সাধারণ হিন্দু চাষি ও গৃহস্থের তুল্য সাঁওতাল চাষি ও গৃহস্থের অভাব নাই। আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী ডেপুটি, কেরানি, স্কুল-মাস্টার সাঁওতাল, সাঁওতাল পরগনা ও হাজারিবাগ জিলায় বিরল নহে। সুতরাং সাঁওতালদের মধ্যে প্রচলিত ভাষার তারতম্য দেখিতে পাওয়া যাইবে ইহা আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নহে।

রেল, কারখানা, মিশন, আইন-আদালত, দোকান, মহাজন, এ সবের আমলে আসে নাই এমন জাতি বা সম্প্রদায় দেখতে পাওয়া যায় না। সুতরাং অনেক ইংরাজি, বাংলা হিন্দি শব্দ তাদের ভাষায় জোর করে ঢুকেছে। তাদের বেছে বার করা কঠিন নয়। তাদের ভাষাও এখন আর সমস্ত জীবন্ত ভাষার মত মিশ্রভাষা। আমার অনুমান হয়, 'আদি ও অকৃত্রিম' সাঁওতালি ভাষা এখন লুপ্তপ্রায়।

আদিতে আর্যের সহিত সংঘর্ষের ফলে অনেক সংস্কৃত শব্দ সাঁওতালেরা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। তিরধনুকের এমনি অপ্রচলন আজকালকার যুগে, যে, আমরা মনে করি যে, ওটা বুঝি বন্য ও পার্বত্য জাতিদের নিজস্ব অস্ত্র। ভাষা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে ওই অস্ত্রও ধার করা। তিরধনুকের সাঁওতালি প্রতিশব্দ নাই। 'তির'কে বলে 'শর', আর ধনুককে বলে 'জ্যা' ; একেবারে খাঁটি সংস্কৃত। অপর প্রতিশব্দ হচ্ছে 'কাঁড়' কার্মকেরই অপভ্রংশ ; আর ধনুক হল 'বাঁশ' ; 'বংশ' আর খুঁজতে হয় না। আশ্চর্য মনে হতে পারে, কিন্তু একথা সত্য যে, প্রচলিত সাঁওতালি ভাষায়, সংস্কৃত শব্দই সর্বাপেক্ষা বেশি—সংস্কৃত বা সংস্কৃতমূলক। পূর্বেই বলেছি যে অনেক বাংলা, হিন্দি ও ওড়িয়া শব্দ সাঁওতালি ভাষার সম্পদবৃদ্ধি করেছে।

প্রদেশভেদে একই শব্দের রূপান্তর দেখা যায়। বীরভূমের সাঁওতাল রাস্তাকে বলে 'কুলহি'। কুলি বাংলা শব্দ। মেদিনীপুরের গোপীবল্লভপুর থানার আর বালেশ্বর জিলার সাঁওতালেরা, পথকে বলে 'দাণ্ড'। আপনারা পুরী শ্রীক্ষেত্রের 'বড়োদাণ্ড' শুনিয়াছেন।

সাঁওতালকে তাহার জাতি জিজ্ঞাসা করিলে বলে, 'সাঁতাল', ওড়িশায় বলে 'সাঁতাড়', বীরভূমে বলে 'মাঝা'। নিজেদের মধ্যে বলে 'হড়'। 'হড়' বা 'হর' খাঁটি কোলারীয় শব্দ। সাঁওতাল ও কোলেরা নিজেদের বলে 'বীরহর'। 'বীর' মানে জঙ্গল, যার থেকে, কেউ কেউ বলেন, 'বীরভূমির' নাম হয়েছে ; আর 'হর' হল মানুষ। 'বীরহর' মানে 'জঙ্গালের মানুষ' আমরা যেমন সাধারণ কথায় বলি 'জংলি'।

স্ত্রীলোক বলতে কিন্তু 'কুঁরি', বাঙ্গালা ও সংস্কৃত 'কুমারী'রই সাঁওতালি রূপ। বিবাহিতা স্ত্রীকে বলে 'মাইজু' বা 'ওইরা'। 'মাইজু', হিন্দি 'মাই', 'মাইজির' রূপান্তর। 'ওইরা' কি 'উহারা'র সংক্ষিপ্ত সংস্করণ? ভাবিবার বিষয়, কারণ সাঁওতাল বা কোল নিজের স্ত্রীর নাম লয় না।

ছেলেপিলাকে বলে 'গিদিরা' বা 'হপন'। গিদিরা কি 'ক্ষুদ্র' হইতে আসিয়াছে? কিন্তু পুত্র সন্তানকে বলে 'কোবা গিদিরা', 'কোরা' নিশ্চয়ই 'কুমারের' রূপান্তর। কন্যাকে সেইরূপ

বলে 'কুরি গিদিরা'। 'হপন' কেবল শাবক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন ভালুক ছানা, 'বনাহপন'।

সাঁওতালেরা বাসঘরকে বলে 'বাসা'। গ্রামের নামের অন্তে সেইজন্য 'বাসা' প্রায়ই পাওয়া যায়। আমাদের নিকটেই ভালু 'বাসা' আপনারা জানেন। 'চাঁইবাসা'তে ওই 'বাসা'। রাখাল বা গোপালককে সাঁওতালেরা বলে 'গুপি'। হলচালনকারীকে বলে 'চাষা'। এর থেকে অনুমান করা অন্যায় হবে না যে আদিম অবস্থায়, এরা হলচালনা করত না, ঘর বেঁধে থাকত না, গোপালন করত না।

দেবদেবীর নাম বেশি নাই। দেবতা, ঠিক ঠিক বলতে গেলে অপদেবতা, মহাশয়দের সাধারণ নাম 'বোঙ্গা'। খুব বড়ো দেবতা অর্থাৎ ঈশ্বরকে বুঝাইতে গেলে 'সিং বোঙ্গা'। 'সিং' সিংহ থেকে। সিংহ বনের প্রবল প্রতাপশালী, সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। হিন্দুর নিকট ধার করা 'চণ্ডী' দেবতাকেও 'চণ্ডীবোঙ্গা' হতে হয়েছে।

সাঁওতালেরা বোধ হয়, সৃষ্টির আদি থেকেই নৃত্যগীত ও বিলাসপ্রিয় ও সৌন্দর্যের উপাসক। সেই জন্যই বোধ হয়, চন্দ্র তাদের প্রিয়। চন্দ্র ও সূর্যের নামকরণের সময়, আগে চন্দ্র হ'লেন 'চাঁদো' ; সূর্য উষ্ণতর ও উজ্জ্বলতর, সুতরাং তিনি হলেন 'সিং চাঁদো'। মাসও 'চাঁদ' এক মাস, দু মাস হল, 'মিত চাঁদ' 'বারেয়া চাঁদ'। 'আগুন'কে বলে 'সেঙ্গেল'—অগ্নির ধ্বনি আছে। বাসগৃহকে বলে 'ওরা'—গৃহের ধ্বনি বর্তমান।

গৃহপালিত জীবজন্তুর মধ্যে তাহাদের প্রধান হচ্ছে মুরগি,—বলে 'সিম'। অনেক সাঁওতাল বলে 'কুকড়া' কুক্কুটের—হিন্দি সংস্করণ। আর সব প্রায়ই ধার করা, যেমন—

গাভি—গাই। গাধা—গাধা। উট—অঁট

পাখি—'চেড়ে'—হিন্দি উর্দুর চিড়িয়ার সংক্ষিপ্ত রূপ।

ষণ্ড—'আণ্ডিয়া'—এঁড়ে হইতে মনে হয়।

কুকুর—সেতা

ছাগল—মেরোম—ধ্বনিবাচক শব্দ। ম্যাড়া পাঁঠা বাংলায় চলিত আছে।

'হরিণ' কিন্তু 'জেল'—সিং এর নামে জন্তুর নাম।

অশ্ব—সাদম—আরবি থেকে কোন্ কালের ধার করা জানা যায় না।

সংখ্যাবাচক শব্দের মধ্যে সংস্কৃত শব্দের চিহ্ন এখন ধরা কঠিন। অনেক পণ্ডিত অনুমান করেন যে সাঁওতালেরা আর্যগণের নিকট গণনা শিক্ষা করেন। এক হইতে দশ পর্যন্ত সংখ্যায়, বাঙ্গালা বা সংস্কৃতের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় না। অন্য কোনো ভাষার প্রতিধ্বনি আছে কি না, অভিজ্ঞেরা বলতে পারেন।

এক—মি	পাঁচ—মোনে	নয়—আ-রে
দুই—বারেয়া	ছয়—তুরুই	দশ—গেল
তিন—পে-আ	সাত—এ-আ-এ	
চার—পোনে-আ	আট—ই-রা-ল	

তবে বিশ বা কুড়িকে বলে 'ইসি'। 'ইসি', বিশ বা বিংশ থেকে এসেছে বলা যায়। আবার কুড়ির উর্ধ্ব সংখ্যাবাচক শব্দগুলি সংস্কৃতের অনুরূপ প্রণালীতে গঠিত। যেমন চল্লিশ 'বার ইসি', কিন্তু পঞ্চাশ হ'ল 'বার ইসি গেল' অর্থাৎ দুকুড়ি দশ। তেমনি একশত, 'মোনে ইসি' অর্থাৎ পাঁচ কুড়ি। সাধারণ সাঁওতালেরা কুড়ির বেশি গুণিতে পারে না। অপেক্ষাকৃত সভ্য সাঁওতালেরা একশোকে প্রদেশভেদে বলে 'শয়, শত, বা শ'—ওড়িয়া, হিন্দি ও বাংলার চলিত রূপ।

তারপর সর্বনাম দেখা যাক। 'আমি', সাঁওতালি 'ইঈএ'—অহং-এর স্পষ্ট ধ্বনি আছে। 'আমরা'—'আনে' বা 'আবানে'—'আবাম' পরিচয় দিচ্ছে। 'তোর' বা 'তোমার' বলিতে, 'তস' ত্বং-এর মূল। তোমাদের বলিতে 'তাবেন' সং তাভ্যাং-এর ধ্বনি আনে অর্থ না আনুক। 'আপনি' বলিতে 'আপে' তে ভবান বা আপনির চিহ্ন বর্তমান। আপনার বলিতে 'তাপে' তে 'তব' রহিয়াছে, খুঁজিতে হয় না। 'তিনি' বলিতে 'হুনি'—উনিরই প্রকারভেদ। তাহার বলিতে 'তায়' এতে তাহার বা তস্যর গন্ধ আছে।

দেহ ও অঙ্গবাচক শব্দে 'পা' অর্থে দেহেব নিম্নদেশ। কোমরকে 'কটা', জঙ্ঘাকে 'জাঙ্গা' বলে। মূল সহজেই ধরা দেয়। নাসিকাই মুখমণ্ডলের প্রধান শ্রী ও অবয়ব। সেই জন্য 'নাক' বলিতে তারা 'মু' বলে। মুখগহ্বরকে বলে 'মোকা' ; মুখ ধরা পড়ে। দাঁতকে বলে—'ডাটা'—দন্তের ধ্বনি আছে। কেশকে বলে 'উপ্'। 'জিভ'কে বলে 'আলা'—তালুর অপভ্রংশ বলে বোধ হয়। পেটের মধ্যে নাভিই লক্ষ্য ; পেটকে তাই সাঁওতালেরা বলে 'লাই'।

ধাতুর মধ্যে লৌহ, হল 'মেন্থে'—মূল ধরতে পারিনি। সেনা হল 'সামানম' স্বর্ণের অপভ্রংশ। রৌপ্য হল 'রূপা'—বাংলা শব্দ। আর কোনো ধাতু তারা জানত না।

সম্বন্ধবাচক শব্দে আগাগোড়া সংস্কৃত বা বাংলা শব্দের আকৃতি বর্তমান—যেমন ঃ—

বাঙ্গালা	*সাঁওতালি*
বাবা	বাবা বা আপু
মা	মায়ো, এঙ্গা
ভাই	দাদা বা ভাইয়া
দিদি	দাই

নীচে কতকগুলি শব্দের তালিকা দেওয়া গেল। এগুলিতে বাংলা ও সংস্কৃতের যেরূপ প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়, উচ্চারণ করিলেই তা বুঝতে পারা যায়।

সাঁওতালি	*বাঙ্গালা*	*সংস্কৃত ধাতু বা শব্দ*
সেন	যাওয়া	আস ধাতু
হিজু	এখানে এস	আগচ্ছ বা ইহা গচ্ছ
জম	খাওয়া	ভুজ ধাতু
ডাল	প্রহার করা	দণ্ড ধাতু
দুরুপ	বসা	উপ-বিশ ধাতু
তিঙ্গু	দাঁড়ানো	দণ্ড ধাতু

গুজু	মৃত্যু হওয়া	গতাসু বা গত
এম	দেওয়া	দা—মি
চেতন	উঁচু	উচ্চতম
থেঁরে	নিকটে	স্থা ধাতু.
ওকোএ	কে ও	কঃ অয়ং
চেৎ কো	কী?	কিম? চিৎ?
চাহ } চেদা	কেন	চিৎ কং?
আদো } আর	এবং আর	এবং
মেনখান	কিন্তু	কিন্তু
ইদু	যদি	যদি
হঁ, হো	হাঁ	
আঢ় বাং	না	মা
এহে ওহো	আহা!	
উশুন	উঁচু	উচ্চ
ক্রিং	কেনা	ক্রী ধাতু।

আরও উদ্ধার করিলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হয়ে যাবে। ভবিষ্যতে আরও আলোচনা করা যাবে। তবে একটি কথা বলা দরকার মনে করছি। বৈদেশিক পণ্ডিতগণের মধ্যে যাঁরা সংস্কৃত ও প্রাদেশিক ভাষায় অনভিজ্ঞ—প্রধানত তাঁরাই সাঁওতালি ভাষার অভিধান সংকলন করেছেন। ইংরাজি হরফে তা ছাপা হয়েছে। বাংলা সরল সাঁওতালি শিক্ষা যা দেখা যায় তার মূলও ইংরেজি। সাঁওতালি ভাষার কোনো অক্ষর নাই। মিশনারিগণ সাঁওতালি এক স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভাষা মনে করে, সাঁওতালি শব্দের রূপ এমন পরিবর্তন করেছেন যে তা দেখলেই নূতন শিক্ষার্থী ভীত হবেন। আমাদের মধ্যে যাঁরা, সংস্কৃত ও প্রাদেশিক ভাষায় অভিজ্ঞ, সাঁওতালি ও অন্যান্য কোলারীয় ভাষার আলোচনা করলে অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান পাবেন।*

*জেমসেদপুর সাহিত্য সভার সাধাবণ অধিবেশনে পঠিত।

ভারতবর্ষ ● মাঘ ১৩৩৩ (১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ)

শুদ্ধি।। মাঝা→মাঝি; হর→হড়; বীরহর→বীবহড়, গিদিরা→গিদরা; কোবা→কোডা; কুরি→কুড়ি, বনাহপন→বানাহপন; মিত→মিৎ; সিং→সিঞ, ওবা→ওড়াঃ; চেড়ে→চেঁডে, মি→মিৎ; মোনে→মোঁড়ে; এ-আ-এ→এয়ায়; আনে→আলে; ইঈএ→ইঞ; আলা→আলাঙ; লাই→লাচ্, মেন্থে→মেঁডহেৎ; সেনা→সোনা; আপু→আপুঞ; এঙ্গা→এঙ্গাত; হিজু→হিজুঃ; ডাল→দাল; দুরুপ→দুড়ুপ; উশুন→উসুল; ক্রিং→কিরিঞ্, চেদা→চেদাঃ, ইদু→পালে, থেঁরে→সোররে; ওকোত্র→অকয়; গুজু→গুজুঃ; চেতন→চেতান

—সম্পাদক



আদিবাসীচর্চার রূপবৈচিত্র্য



আর্য ও অনার্য শিল্প

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারত শিল্পের ইতিহাস এবং পুরাতত্ত্ব, ছবি, মূর্তি, মন্দির, মঠ ইত্যাদির সঠিক ছাপ ও ফটোগ্রাফ দিয়ে হাজার হাজার বই ছাপা হল! চোখ এবং মন দুই নিয়ে এই বিরাট সংগ্রহের মধ্যে দিয়ে চলাফেরা করে একটা কথা বার বার আমার মন বললে---কই এ তো সম্পূর্ণ ইতিহাস পেলেম না, এ যেন একখানা পুথির শেষ গোটাকতক অধ্যায় মাত্র পেলেম, পূর্বের অধ্যায়গুলো হারিয়ে গেছে! চোখ চলতে চলতে বৈদিক যুগের ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে উপস্থিত হয়ে দেখলে সামনে হিমালয়-প্রমাণ কুয়াশার প্রাচীর তার ওপারে ভারত শিল্পের ধারা শব্দ দিয়ে ঝরছে কিন্তু দেখা নেই সে ধারার! ভারত শিল্পীদের রচনা সমস্ত ধারাবাহিক ভাবে যেমন যেমন প্রকাশ পেয়েছিল তার প্রত্যক্ষ নিদর্শন তো আমাদের চোখের সামনে ধরা নেই আজ—এখানে গোটাকতক টুকরো, ওখানে খানিক, মাঝে মাঝে মস্ত মস্ত ফাঁক,—এইভাবে দেখা দিচ্ছে সব। সুতরাং খানিকটা কল্পনার সাহায্য দরকার হয়ে পড়ে বিষয়টা চর্চার বেলায়। চোখের দেখা গাছের শাখা পত্র পুষ্পের মতো ভারত শিল্পকলার তিন চার যুগব্যাপী এলোমেলো ভাবে ছড়ানো প্রত্যক্ষ নিদর্শন কেবলি যদি দেখে চলা যায় অপ্রতক্ষ্য মূলের রহস্য বাদ দিয়ে, তাতে করে তার আগাগোড়া জানা হল বা দেখা হল বলা তো যায় না! চোখ এবং মনকে পাঠাতে হবে সেখানে মহাকালের মধ্যে যেখানে ইতিহাসের অখ্যাত যুগের ভারতবাসী তাঁরা, আরণ্যক ঋষিরা যাঁদের নাম দিলেন অন্যব্রত তাঁরা, কাজ করেছেন।

তত্ত্ব অনুসন্ধানের জায়গায় কল্পনার প্রবেশ নিষেধ, কিন্তু শুধু চোখে দেখা যাচ্ছে যা, তা তো বেশি দূরে নিয়ে যেতে পারে না আমাদের। ধরো, পুষ্পক রথের কথা পড়ে যদি সত্যিই কল্পনা করি আর্যদের পূর্বপুরুষ তাঁরা আকাশে উড়তেন, তবে ভুল কল্পনা করা হয়,

কিন্তু আজকের দিনে প্রত্যক্ষ হচ্ছে যেসব মন্দির মঠ তা থেকে আর্যপূর্ব জাতি কাঠ ও বাঁশ ইত্যাদি দিয়ে ঘর বাঁধতেন এটা কল্পনা করা অন্যায় হয় না, কাজেই যুক্তিসংগত কল্পনার স্থান আছে তত্ত্বানুসন্ধানের বেলায়। কী শিল্পের দিক দিয়ে, কী ধর্মের কর্মের দিক দিয়ে আমাদের সব চিন্তা যেখানে গিয়ে ঠেকে, সেই বৈদিক যুগে গিয়ে উপস্থিত হওয়া যাক—সেখানে গিয়ে দাঁড়াই, যেখানে আরণ্যক ঋষিরা যজ্ঞক্রিয়া করছেন—এই হল আর্য সভ্যতার জ্ঞাত যা কিছু—তার প্রাচীনতম সীমানা, এর পরেই আবছায়া সমস্ত অন্যব্রত এবং অকর্মা বলা যায় যাঁদের, তাঁরা কল্পনা ধরে মনের সামনে আসাযাওয়া করেন।

যাঁদের আমরা আর্য বলছি, তাঁদের ক্রিয়াকাণ্ড কেমন ছিল, তাঁদের মধ্যে কী কী শিল্প প্রচলিত ছিল, কী ভাবতেন তাঁরা, এবং কী ভাবে চলতেন তাঁরা, তার ছবি সুস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে আজকের কালে, জানবার বিষয় অল্পই আছে বললেও হয় এই আর্যগণের সম্বন্ধে। কিন্তু এই সব অন্যব্রত ও অকর্মা যাঁদের উদ্দেশ করে করে ঋষিগণ বারবার মন্ত্র উচ্চারণ করছেন, তাঁরা ঋষিদের মিত্র ছিলেন না, এটা ঠিক। কিন্তু ভারতবর্ষের কোন্ আদিতম যুগ থেকে এই সব যে অন্যব্রত এবং অকর্মা, এঁরা আরণ্যক ঋষিদের আশে পাশে কেউ ঋষিদের অনুষ্ঠিত ব্রত থেকে স্বতন্ত্র ব্রত নিয়ে, কেউ একেবারে ক্রিয়া-কর্ম-যাগ-যজ্ঞহীন অবস্থায় রয়েছেন, এঁরা ভারতশিল্প চর্চার বেলায় কোন্ স্থান অধিকার করেন এসে সেটা দেখার বিষয়।

নিজেদের সঙ্গে সকল বিষয়ে ধর্মে কর্মে পৃথক যাঁরা, তাঁদের বলেছেন ঋষিরা অন্যব্রত। অকর্মা বলা হল তাঁদের যাঁরা ক্রিয়াকাণ্ড-হীন জীবনযাত্রা ধরে রয়েছেন। অন্যব্রত—তাঁরা ব্রতধারী, কিন্তু আর্যদের সমান ব্রত পালন করছেন না—যেমন আজকের হিন্দু এবং ক্রিশ্চান দুজনেই একই আর্যজাতি, কিন্তু ব্রতের দিক দিয়ে উভয়ে উভয়ের কাছে স্বতন্ত্র ও অন্যব্রত বলে পরিচিত হচ্ছে।

ঋষিরা যাদের বলছেন অকর্মা, নিশ্চয়ই তাদের জীবলীলার কোনো চিহ্ন ধরা নেই কোথাও—তারা খেয়েছে, বেড়েছে, মার খেয়েছে ও মরেছে, তাদের ভাবনাচিন্তা ছিল নিশ্চয়, কিন্তু সেগুলো পাথরে, মন্দিরে, সাজে, সজ্জায়, নাচে, গানে নিরূপিত হতে পেলে না। মানুষের ক্রিয়াবান অবস্থারই প্রকাশ হল শিল্পকলা, অকর্মা—তারা অশিল্পী শুধু তারা বর্বরের মতো অন্যের ক্রিয়া পণ্ড করেছে। নিষ্ক্রিয় এরা সব ছায়ামূর্তির মতো কেবলি বাস করেছে ভারতবর্ষে, কিন্তু ভূভারতের ইতিহাস গঠনের মধ্যে এদের স্থান হয়নি, জীবনব্রত ক্রিয়ার মধ্যেও এদের আসন পড়েনি, মরার পরে এদের হাড়মাংস ভারতের মাটিকে খানিক রসিয়ে দিয়ে গেছে মাত্র। এই সমস্ত নিষ্ক্রিয় মানুষ ক্রিয়াবান অন্যব্রত এবং যাজ্ঞিক আর্যদের সঙ্গে এক সূত্রে বাঁধা এবং হয়তো আরণ্যক ঋষিদেরই পূর্বতন যুগের বর্বরাবস্থার কথা জানাচ্ছে। জন্মায় না মানুষ একেবারেই ঋষি হয়ে, আগে বর্বর তারপর অনেকগুলো অবস্থা অতিক্রম করে তো তবে আর্যাবস্থা! একই মানুষ যেমন জাগাব আগে ঘুমিয়ে থাকে, আজকের ক্রিয়াকর্মে পটু ছেলে একদিনের অকর্মণ্য শিশু অবস্থায় যেমন পড়ে আছে দেখছি, তেমনি এই সমস্ত অকর্মা—তারা যে কর্মঠ ব্রতক্রিয়াশীল অন্যব্রত এবং আর্যদের একটা আদিম অবস্থার কথা জানায় না, তাই বা কে বলবে! ঘুমন্ত, অর্ধজাগরিত

এবং জাগ্রত এই তিন অবস্থা সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট অপেক্ষাকৃত ক্রিয়াশীল এবং পরিপূর্ণ ক্রিয়াবান—এই নিয়মে সব দেশের সব মানুষই উন্নতির পথে এগিয়েছে, ভারতবর্ষের আর্যগণের বেলাতেও যে এ-নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি সেটা ধরে নিতে পারি। ছেলেটা অকৃতকর্মা, পড়লে না, শুনলে না, সংসার পাতলে না—আর এক ভাই সংসার পাতলে, আফিসে গেল, রোজগারি হল এবং আর এক ভাই সে প্রকাণ্ড চিন্তাশীল মহাপুরুষ ঋষি হয়ে বসল। একটি পরিবারের মধ্যে সহোদরে সহোদরে এই পার্থক্য যখন স্বভাবের নিয়মে ঘটছে দেখি, তখন একই জাতি, কেউ পেলে আর্য আখ্যা, কেউ পেলে অনাব্রত, কেউবা অকর্মা দস্যু ইত্যাদি বদনাম—এতে আশ্চর্য হবার কী আছে!

জীবতত্ত্ববিদ যাঁরা, তাঁরা মানুষের জাতি-বিভাগ করেছেন মুখাকৃতি ও দৈহিক মাপজোখ দিয়ে, তাঁরা কাউকে বলছেন আর্য, কাউকে অনার্য, সেদিক দিয়ে প্রমাণ হচ্ছে যে আর্য জাতি এসে ভারতবর্ষে অনার্যদের মধ্যে বসতি করলেন এবং অনার্যদের ক্রমে সকল দিক দিয়ে জয় করে আর্যাবর্ত বলে প্রকাণ্ড একটা রাজত্ব স্থাপন করলেন! এ ঘটনার অনুরূপ ঘটনা আজও ঘটছে দেখব,—আজকের মিশনারি তারা এইভাবে আফ্রিকা, ফিজি প্রভৃতি জায়গায় ধর্মবল এবং বাহুবল নিয়ে ক্রিয়া করে চলেছে অকর্মা ও অন্যকর্মাদের মধ্যে, শুধু এই নয়, অপেক্ষাকৃত সুসভ্য কিন্তু অন্যব্রত অথচ একই আর্যজাতি তাদের মধ্যেও পশ্চিমের আর্য সভ্যতার দূত সমস্ত নানা ভাবে নানা ক্রিয়া করে চলেছে আজকের ভারতবর্ষে। এছাড়া আকৃতির হিসেবে দেখছি আর্য ছাঁদের মানুষ, কিন্তু বৃত্তির হিসেবে দেখছি রাক্ষস বা দস্যু ও বুদ্ধির হিসেবে একেবারে বর্বর এরও প্রত্যক্ষ প্রমাণ পৃথিবীজোড়া আর্যদের মধ্যে আজও ছড়ানো দেখতে পাই। সুতরাং যদি বলি ভারতের মধ্যে একটা জাত আর্যব্রত, অন্যব্রত এবং অকর্মা এই তিন থাকে বিভক্ত ছিল ভারতশিল্পের উৎকর্ষের শৈশবাবস্থায়, তবে একেবারে যে অসংগত কল্পনা করা হল তা নয়।

আর্য যাঁরা ভারতবর্ষে বৈদিক যুগে বাস করছেন, তাঁদের মধ্যেই আমরা নানা শ্রেণির নানা থাকে বিভক্ত মানুষ দেখি—একদল আরণ্যক, তাঁরা বনে বাস করছেন, একদল বণিক, একদল যোদ্ধা, একদল চিকিৎসক ও জাদুকর, এরা সবাই একটা জাতিরই ভিন্ন ভিন্ন থাক—এদের মধ্যে কারিগরদেরও নাম পাই যারা স্পষ্টভাবে অন্যব্রত।

হঠাৎ একদল মানুষ সিঁড়ি না ভেঙে তেতালায় উঠে এল, উড়োকল সৃষ্টি না করে উড়ে পড়ল আকাশে—এ অসম্ভব কল্পনা আর্টিস্ট হয়েও বিশ্ববিদ্যালয়ে দাঁড়িয়ে বলা আমার পক্ষে নিরাপদ নয়। আর্যরা পেয়ে গেলেন এবং নিয়ে এলেন এদেশে সকল সভ্যতা, সকল বিদ্যা—হঠাৎ এ বললে অনেক আপদ এড়িয়ে যাওয়া চলে কিন্তু নিজের মনের কাছ থেকে খোঁচার শেষ হয় না।

আর্যজাতি বলতে মস্ত একটা দল যা পৃথিবীর অনেকখানি জুড়ে বসবাস করছিল, তাদের উপরে পণ্ডিতেরা নানাদিক থেকে আলো ফেলে আমাদের দেখিয়েছেন যে, যেমন এদের চেহারায় মিল, তেমনি ভাষাতেও মিল—এই মিলটা ক্রিয়াবান এবং ক্রিয়াহীনে একেবারেই লক্ষ করা যায় না। এ-দল ব্রত করে যজ্ঞ করে, ও-দল ব্রতভঙ্গ করে যজ্ঞনাশ করে, এ-দল গড়ে—ভাষা দিয়ে গড়ে, সুর দিয়ে গড়ে, হাত দিয়ে গড়ে, মন দিয়ে গড়ে,

বুদ্ধি দিয়ে গড়ে ; আর ও-দল—তারা গড়তে পারে না—ছেলেরা যেমন তেমনি—কেবলি গড়া জিনিস পেলেই ভাঙে, এরা কালো ওরা সাদা, এই শেষের দলকে অকর্মা বলে ধরা চলল, কিন্তু এই আর্য এবং অন্যব্রত এদের দুটো জাত বলে না ধরে যদি একই জাতির দুটো থাক বলে ধরা যায়, তা হলে আর্য শিল্প সাহিত্য ভাষা ইত্যাদির ক্রমবিকাশ পরিষ্কার ভাবে ধরার পক্ষে অনেকখানি সুবিধা পাওয়া যায় বলে মনে হয়।

অকর্মা যারা ছিল তারা সাদাই থাক বা কালোই থাক কোনো চিহ্ন ধরেনি নিজ নিজ কর্মের, শুধু এরা অন্যের ক্রিয়া পণ্ড করেছে—এইটুকু ঋষিদের কথা থেকে পাচ্ছি, সুতরাং এদের আর্য ও অন্যব্রতদের থেকে সম্পূর্ণ অন্য বলে ধরলে বিশেষ কাজ আটকায় না। কিন্তু অন্যব্রত অবস্থার মানুষের আচার-ব্যবহার ক্রিয়াকাণ্ড সমস্তের হিসাব যা আজকের ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা সন্ধান করে বার করছেন, তার সঙ্গে পৃথিবীর তাবৎ আর্যজাতির ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে মিল দেখা যাচ্ছে এবং সেই রাস্তা ধরে ইউরোপে যে সকল আর্যগণ বসতি করছেন তাঁদের শিল্প ধর্ম কর্ম সমস্তই নতুন পন্থায় চর্চা হচ্ছে, ভারত শিল্পের বেলায় এর ব্যতিক্রম করা ঠিক নয়।

আর্য বলতে একটা পদবি বোঝায়, কিন্তু এই পদবিতে উপনীত হবার আগের ধাপ যে আর্যেরা অতিক্রম করেননি, এমনতো নয়। এক সভ্যতার এক ভাবের পরিক্রম ও আন্দোলন বহু দেশ, বহু জাতি, বহু যুগ ধরে, আর্যাবর্তের ঠিক রূপটি কী এই না বলব অনেকখানি বিস্তার নিয়ে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চক্রে যা রয়েছে তার পরিণতি হল একে? একটা আবর্তের দুটো গতি আছে, সে দুটি হচ্ছে বহির্মুখী এবং অন্তর্মুখী, তলিয়ে রয়েছে যেটুকু তা বিস্তার পেতে চাচ্ছে, উঠে আসতে চাচ্ছে, ছড়িয়ে রয়েছে যতখানি তা ঘূর্ণিপথে তলিয়ে চলেছে একটি দিকে। যাগ-যজ্ঞে ব্রতী হল যারা, সেই সব আরণ্যক মানুষ এবং তাদের থেকে বাইরে বাইরে নানা ব্রতধারী মানুষ এরা হয়তো ভিন্ন জাতীয়, হয়তো নয়, কিন্তু আর্যাবর্তের আগাগোড়া গঠন এরা দুয়ে মিলে দিলে, তলার জল এবং উপরের জল যেভাবে রচনা করে আবর্ত, সেইভাবে কাজ করলে আর্যধর্ম, আর্যশিল্প, আর্যভাব—এক কথায়, আদ্যন্ত মহাভারতের সবটা এ যেন স্পষ্ট দেখি।

যজ্ঞাদি কর্ম নিরত একটি মণ্ডলী, এরই বাইরে যারা তাদের সম্বন্ধে ঋষিরা বলছেন—"আমাদিগের চতুর্দিকে দস্যুজাতি আছে, তাহারা যজ্ঞ করে না, তাহারা কিছু মানে না, তাহারা মনুষ্যের মধ্যেই নয়, তাহাদের ক্রিয়া ভিন্ন রকমের। হে ইন্দ্র, তুমি তাহাদিগকে বিনাশ কর।" এই সমস্ত যারা মানতে চায় না আরণ্যক ঋষিদের ক্রিয়াকাণ্ড, হঠাৎ মনে হয় তারা সত্যিই কেউ ছিল না আর্যদের—না হলে এমন করে অভিসম্পাত? গোঁড়ার দল,—তারা বৈদিক যুগেও ছিল এখনও আছে, জ্ঞাতিবিবাদ তখনও ছিল এখনও আছে, এ-দল শাপ দেয় ও-দলকে, অথচ জাতে এক তারা এও দেখি জগতে! এমন কোনও সভ্যতা কোনও ধর্ম নেই যেখানে এক ও অন্যে বিবাদ ও মনান্তর নেই;—পণ্ডিতদের মতে আমরা আর্য, ইউরোপীয়রাও আর্য, কিন্তু ব্রত নিয়ে মারামারিতো ঠেকেনি এতে করে, হিন্দু ব্রাহ্ম দুই দলই আর্যজাতি অথচ ব্রত এক নয় ; সুতরাং আর্য ও অন্যব্রত দুটো জাতি না বলে একই জাতির দুটো থাক বলে কল্পনা করলে একেবারে ভুল যে হয় তা নয়—ক্রিয়ার

দিক দিয়ে ভিন্ন চিন্তার দিক দিয়ে উচ্চ এবং নিম্ন শ্রেণিতে বদ্ধ এ বললেও বলা চলে। চেহারায় চেহারায় ভিন্নতা, বর্ণে বর্ণে ভিন্নতা, ভাষায় ভাষায় ভিন্নতা প্রকৃতির নিয়মে ঘটছে দেখি, তাই দেখে জাতিবিভাগ স্থির করি মানুষে মানুষে ; এক দেশের শিল্পে অন্য দেশের শিল্পে যে ভিন্নতা—তাও এইভাবে স্থির করতে যাই আমরা, কিন্তু এই বাহিরে বাহিরে ভিন্নতা এটা কি মানবতত্ত্বের কি মানবের শিল্পতত্ত্বের চরম কথা নয়—তাবৎ মানুষ যা নিয়ে এক, তাবৎ শিল্প আর্য অনার্য নির্বিশেষে যা নিয়ে এক, তাও চোখের এবং মনের সামনে এসে পড়ে।

আমের মঞ্জরি সকালের কুয়াশার মধ্যে রয়েছে, আম রোদের দিনে পেকে টুসটুস করছে—কী রসের দিক দিয়ে কী আকারপ্রকার ভাবভঙ্গি সব দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবা দুটি। গুটি পোকাতে আর প্রজাপতিতে এক জাতির বলে কিছুতে ধরা যায় না—এ চলে মাটি আঁকড়ে, ও চলে বাতাসে আলোতে গা ভাসিয়ে, খেচরে ভূচরে যতটা তফাৎ ততটা তফাৎ এই একই জীবের দুই অবস্থায়! একই মানব এবং সেই মানব জাতির মধ্যে একমাত্র আর্যগণকে নিয়ে প্রকৃতিদেবী যে ওলটপালট খেলেননি এইভাবে তা কে বলবে? মাটি হল সোনা, জল হল মেঘ, কাচ হল হীরক, কালো হল সাদা, যুগাযুগান্তর বহে এই খেলার স্রোত চলে আসছে—এটাতো অস্বীকার করা যায় না। আজকের সৌরজগৎ একদিন এক টুকরো নীহারিকার বাষ্প ছিল—একথা যদি মানতে পারি, তবে আর্যশিল্পের গোড়াপত্তন আর্যেতর শিল্পে একথা মানতে দ্বিধা হবে কেন?

নিকৃষ্ট অবস্থা, উৎকৃষ্ট অবস্থা, আর্য অবস্থা, অনার্য অবস্থা এ বললে কোনো গোল নেই। ছোটোয় ভাষা নেই, বড়োয় ভাষা আছে, ছোটোয় ঢেলা-খেলা, বড়োয় পাথরের মূর্তি কেটে লীলা, ছোটোয় চলি চলি পা, বড়োয় নটরাজের লাস্য ও তাণ্ডব, ছোটোয় মা মা, বড়োয় সা রি গা মা—এই দাঁড়ায় ব্যাপারটা! গাছের শিকড় নরম, গাছের ডাল শক্ত, তাই বলে দুটো দুটো থেকে বিভিন্ন এ-তো বলা চলে না! শিকড় মাটি থেকে জল টানে ডাল সেই রসে বাড়ে, পাতা গজায়, ফুল ফলায়, ফুল ফোটায়—এমনি ঘনিষ্ঠতা আর্যে অনার্যে। কেবলি আর্যগণের সম্বন্ধে নয়, আর্যেতর যাঁরা তাঁদেরও সঙ্গে আর্যগণ কীরূপ সম্বন্ধে বদ্ধ তারও সাক্ষ্য দিচ্ছে চতুর্বেদ। আর্যশিল্প সাক্ষ্য দিচ্ছে আর্যেতর অবস্থার শিল্পের, আর্যচিন্তার প্রবাহ বহন করছে আর্যেতর অবস্থার চিন্তার ধারা। বেদ যদি আর্য বলে একটিমাত্র দলের হত তো একটা বেদই হতো, চারখানা মিলে একটা হত না। যেমন চতুর্বেদ, তেমনি চারিদিকের সভ্যতা, শিল্পকলা এসব নিয়ে এক আর্যশিল্প। অতীতকালের আর্যেতর অবস্থাকে অস্বীকার করা অসম্ভব ছিল আর্যদেব পক্ষে, কেন-না তাঁরা সেই মানব সভ্যতার উৎকর্ষের প্রাতঃসন্ধ্যায় বর্তমান ছিলেন যখন নতুন আলোয় পূর্বরাত্রির অন্ধকারকে জড়িয়ে রয়েছে, দিনের গায়ে জড়িয়ে রয়েছে রাতের কৃষ্ণসার মৃগচর্ম। সব দিক দিয়ে ভাষায়, শিল্পে, গীতে, নাট্যে, সাহিত্যে তপস্যার সূত্রপাত হচ্ছে তখন, মানবাত্মা নিষ্ক্রান্ত হচ্ছে প্রজাপতির মতন অজ্ঞতার আবরণ কেটে। এই সন্ধিক্ষণে, যখন আর্যেরা তাঁদের অনার্য অবস্থা সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারেননি সেই সময়ে আলোর সঙ্গে অন্ধকারকে নিজেদের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে অতীতকেও স্বীকার করতে বাধ্য তাঁদের সমস্ত

শিল্পরচনা—উষাদেবীর মূর্তি পাথরে বা কাঠে তাঁরা কেমনতরো করে কেটেছিলেন তার উদ্দেশ এখন পাওয়াতো যাবে না, নিশ্চয়ই মূর্তিশিল্প খুব বেশি দূর এগোয়নি তখন আজকের আফ্রিকানদের শালভঞ্জিকার চেয়ে—কিন্তু ভাষা দিয়ে যে মূর্তি তাঁরা উষাদেবীকে দিলেন তা আলো অন্ধকারের ছন্দে তাঁদের অতীত এবং বর্তমানকে চমৎকার রূপ দিয়ে ধরলে আমাদের কাছে।

"কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার হইতে পূজনীয়া, বিচিত্র গতিমতী ও মনুষ্য আবাসের রোগনাশিনি উষা উদয় হইলেন—বিচিত্র রূপবতী অহোরাত্র দেবতাদ্বয় ব্যবধানরহিতভাবে চলিতেছেন। একজন গমন করেন আর একজন আইসেন। পর্যায়গামিনী দেবতাদ্বয়ের মধ্যে একজন পদার্থসমূহ গোপন করেন (অন্যজন) উষা অত্যন্ত দীপ্তিমান রথদ্বারা তাহা প্রকাশিত করেন ...উষা দিনের প্রথম অংশের আগমনের সময় জানেন। তিনি স্বতোদীপ্তা ও শ্বেতবর্ণা, কৃষ্ণবর্ণ হইতে তাঁহার উদ্ভব..." অথবা যেমন বলা হল—"স্বসা (রাত্রি) জ্যেষ্ঠস্বসাকে (উষাকে) উৎপত্তিস্থান (অপর রাত্ররূপ) প্রদান করিয়াছেন এবং উষাকে জানাইয়া স্বয়ং চলিয়া যাইতেছেন, উষা সূর্যকিরণ দ্বারা অন্ধকার বিদূরিত করিয়া বিদ্যুৎরাশির ন্যায় জগৎ প্রকাশ করিতেছেন। এই সকল স্বসৃভাবাপন্ন পুরাতনী উষাগণের মধ্যে প্রথমা অপরার পশ্চাৎ প্রত্যহ গমন করেন। নবয়সী উষা পুরাতনী উষা সমূহের ন্যায় সুদিন আনয়ন করতঃ আমাদিগকে বহুধনবিশিষ্ট করিয়া প্রকাশ করুন।" (রমেশচন্দ্র দত্ত—ঋগ্বেদংসহিতা)

অতীতেব আর বর্তমানের মধ্যে, একজন কালো, একজন সাদা, এ ওর ভগ্নী, শুধু রং ভিন্ন ভিন্ন, এ একেবারে পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে আর্য অনার্য অবস্থার কথা। সংগীত শাস্ত্রের দিক দিয়ে এই মূর্তির তুলনা পাই দিনের বেহাগ আর রাতের বেহাগে, মূর্তি শিল্পের দিক দিয়ে এই সাদা কালোর রূপক রূপ পেলে হরিহর, শিবশক্তি, কৃষ্ণরাধা এমনি অসংখ্য জায়গার চিত্রকলায় আজ আমরা যাকে বলছি Light and Shade আলো ছায়া ইত্যাদি তা এই পুরাতনী ও নবীয়সী উষার প্রকাশ—"দেবতাদ্বয়ের মধ্যে একজন পদার্থসমূহ গোপন করেন (অন্যজন) উষা অত্যন্ত দীপ্তিমান রথদ্বারা তাহা প্রকাশিত করেন।" অজন্তা গুহার ছাদের চন্দ্রাতপ তার মাঝখানে যে মস্ত পদ্ম আঁকা হল তারই কোণে কোণে এই সাদা আর কালো দুই উষা দেবতার রূপ লিখে গেল শিল্পীরা। যুগযুগান্তের কল্পনা এইভাবে যুগ যুগ ধরে আর্য শিল্পের নানা কৌশলে ধরা রইল।

মানব মনের, তার ভাষা, তার শিল্পকলার, উন্মেষ কত যুগ যুগ ধরে হচ্ছিল আলো ছায়ার নিবিড় উষার মধ্যে দিয়ে—তার ঠিক ঠিকানা নাই। আর্য অবস্থায় পৌঁছতে একটা আর্যেতর অবস্থা কল্পনা করে নেওয়াতে ভুল নেই, ভুল করি তখন যখন কল্পনা করি যে পথ না চলেই আর্যেরা পথের শেষে উপস্থিত অতৈলপুর আশ্চর্য প্রদীপ হাতে!

উষাদেবতার মূর্তি ঋষিরা ভাষায় ফোটালেন এবং তার পরে কালে কালে কী ভাবে সেই একই উষার কল্পনা পাটায় পটে ইটে কাঠে পাথরে সাহিত্যে সংগীতে প্রতিষ্ঠিত হল তা দেখলেম, কিন্তু ওই উষা ও স্বসা এবং ওই যে কৃষ্ণবর্ণোদ্ভবা শ্বেতবর্ণা এদের প্রতীক আর্যেতর এবং অন্যব্রতদের দেওয়া নয় এটা ভাবাই ভুল।

রেড-ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ান হিসেবে যে আর্যগণে জ্ঞাতি ভ্রাতা—তা ঠিক করে এখনও বলা

চলে না—কিন্তু এটা অভ্রান্তভাবে স্থির হয়ে গেছে, এই রেড় ইন্ডিয়ান তারা খুব প্রাচীনকাল থেকেই নানা রং দিয়ে ব্যক্ত করছে সকাল সন্ধ্যে, জল হাওয়া, আকাশ বাতাস এবং নানা ঋতুপর্যায় এবং জীবন মৃত্যুও। ওই রেড-ইন্ডিয়ান তাদের কাছে শ্বেতবর্ণ মানে বোঝাচ্ছে white-in-nocence, awakening, disclosing the fist glimpse—উষা ছাড়া আর কিছু নয়!

রাত্রিকে কৃষ্ণবর্ণা উষার স্বসা বলেছেন আর্য ঋষিরা। রেড-ইন্ডিয়ানরা সায়ংসন্ধ্যা বোঝাতে এবং বৃষ্টি বোঝাতে ব্যবহার করছে পীত ও কৃষ্ণবর্ণ—yellow streak crossed with black lines symbolise rain and the evening sky, rain is commonly represented by eight vertical lines painted black. ঋষিরা বলছেন—বিচিত্র রূপবতী অহোরাত্র দেবতাদ্বয় এই পর্যায়গামিনী দেবতাদ্বয়ের মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ যিনি তিনি পদার্থসমূহ গোপন করেন, অন্যজন তাহা প্রকাশিত করেন। এই কালো রং সম্বন্ধে রেড-ইন্ডিয়ানদের ধারণা হল—Black covers and hides, কালো গোপন করেন, আবরণ করেন, it is a line seldom seen in nature, for her days and years are full of promise. ভারতের আর্যগণ এবং আমেরিকার রেড-ইন্ডিয়ান এ দুয়ের জাতিগত ঐক্য প্রমাণ হল না হল তাতে বড়ো আসে যায় না, এক চিন্তা আর্যে অনার্যে, এক শিল্প আর্যে অনার্যে, এর সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হতে পারে না আর্য সভ্যতারই ইতিহাস চর্চার বেলায়।

আমাদের দেশেই আর্যেতর জাতি এখনও বিদ্যমান যারা অন্যব্রত পালন করছে। গারো এবং খাসিয়া পাহাড়ের এই আর্যেতর জাতির এক কবি, তার সামনে নবীয়সী উষার মতো যখন প্রেয়সী এসে উপস্থিত হল তখন ঋষিদেরই মতো সেও বর্ণন করলে ছন্দে—

মরি মরি রাতের দেআ
রাতারাতি গড়তেছিল
এই পুতলি!
আসতে দিশা—আদুল গায়ে
জড়িয়ে দিল তাড়াতাড়ি
নীলাম্বরী!
ঘুমঘোরে বা ভুল করে বা
রং ধরালো এমন নীলি
রাতের নীলি কাজল নীলি
উজল নীলি!

"Before the sun shouldst thou have been created
Thou art as the blue of the new drawn indigo."

(The Garos—Major Playfair)

এখানেও সেই ঋষি বর্ণিত অহোরাত্র দুই দেবতায় মিলে গড়া সুন্দরী—কালো এবং আলো করা রূপ মিলে এক প্রতিমা।

আর্যেরা এবং আর্যেতর তারাও বহু দেবতার উপাসনা করতেন—সূর্য, অগ্নি, জল,

মেঘ, নদ-নদী, বনস্পতি কত কী যে দেবতা তার ঠিকঠিকানা নেই। এই তেত্রিশ কোটি দেবতাকে উত্তরাধিকারী সূত্রে আর্যেরা যে পেয়েছিলেন তাতে ভুল নেই। ভাষার দিক দিয়ে দেখতে গেলে আর্যে এবং আর্যেতরে বড়ো একটা মেলে না, কিন্তু দেবতার নামে নামে এবং সেই সেই দেবতার কাজে কাজেও ভারি একটা মিল দেখি।

নিউজিল্যান্ডের মাওরিজাতি তাদের একজন বজ্র দেবতা আছেন ; তাঁকে বলে তারা Waitari বা দৈত্যারি! দেবতাদের সঙ্গে সঙ্গে দেবতাদের পূজার উপচার ও বিধি আর্যগণ যে পাননি আর্যেতরগণের কাছে থেকে তাই বা কে বলবে। বেদি নির্মাণ, অগ্নিকুণ্ডের চারিদিকে যথাযথ স্থানে বসে গান ও সোমপান যূপকাষ্ঠের পূজা পশুবলি সমস্তই প্রমাণ করছে আর্য এবং আর্যেতরে সকল দিক দিয়ে নিকট সম্বন্ধ।

ঋষিরা বাচ্যরূপে ধরে গেছেন আমাদের কাছে তাঁদের কল্পিত নানা দেবদেবী মূর্তি। এক এক রকম যজ্ঞক্রিয়ার জন্যে নানা কোণ কাটা বেদি এবং যজ্ঞের ব্যবহার্য নানা উপকরণ থেকে তাঁরা কী ভাবে কেমন করে নানা সামগ্রী গড়তেন তার আভাস পাই। কল্পিত দেবতাকে পাথরে কী কাঠে অথবা মাটিতে কিংবা চিত্রে তাঁরা ফুটিয়েছিলেন কিনা তা জানার উপায় নেই। কিন্তু ইন্দ্রধ্বজ আর যূপ এই দুটির গড়ন এখনও আমাদের চোখের সামনে রয়েছে যা থেকে আর্যেতর জাতিগণের শিল্পকলার সঙ্গে আর্যদের শিল্পকলার সাদৃশ্য অনেকখানি ধরা পড়ে।

বৈদিক যুগের আর্যগণ শিল্পী হিসাবে তৎকালীন আর্যেতর জাতিগণের চেয়ে খুব যে বড়ো ছিলেন না তার প্রমাণের অভাব নেই, তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র যানবাহন সবই আর্যেতরগণের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল কি না সে বিষয়েও সন্দেহ থেকে যায়। সেই বৈদিক যুগে ঋষিগণের চিন্তা এবং কল্পনা এবং ভাষা উৎকৃষ্টতর একথাও জোর করে বলা যায় না। সবেমাত্র সবদিক দিয়ে উন্মেষের অবস্থা তখন ফুটতে চাচ্ছে, কিন্তু ফোটেনি তখনও সবই। একেশ্বরের উপমা খুঁজতে গিয়ে তখনও আরণ্যক ঋষিদের মনে অরণ্য দেবতার প্রাচীন বনস্পতি মূর্তিটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে, তাঁরা বলছেন,—"বৃক্ষৈব স্তধো দিবি তিষ্টত্যেকঃ।" অনার্য অবস্থার সেই বনস্পতি দেবতার কথা! বৈদিক যুগ চলে গেল, নতুন নতুন চিন্তা কল্পনা করে চললো মানুষ, কিন্তু সেখানেও এল সেই অতি পুরাতন কল্পবৃক্ষ—নন্দনের পারিজাত যার ছায়ায় তেত্রিশ কোটি দেবতার লীলা চললো। বৌদ্ধযুগ প্রকাণ্ড এক ওলট-পালট আনলে চিন্তায়, কর্মে ধর্মে, কিন্তু সেখানেও প্রথমে পাথরে অটুট করে ধরা গেল অক্ষয়বটের স্মৃতি! খুবই আধুনিক বৈষ্ণব ধর্ম সেখানেও গাছ পূজা পেলে—গহন বনের তুলসী গাছ; সেই আর্যেতর অবস্থায় অরণ্য দেবতা—সে বারে বারে জানিয়ে দিলে আর্যগণ কোনো দূর আরণ্যক অবস্থার স্মৃতি বহন করে চলেছে, উত্তরের নদী যেমন তুহিনকণা বহন করে চলে দক্ষিণ সমুদ্রে।

সৃষ্টির কথা স্রষ্টার কথা বলতে আর্যেরা বললেন—ইদম্ বা অগ্রে নৈব কিঞ্চিৎ আসীৎ ইত্যাদি। নিউজিল্যান্ডের অনার্য তারাও এই সৃষ্টি রহস্য কীভাবে বর্ণন করলে দেখ—

"Io dwelt within the breathing space of immensity.
The Universe was in darkness, with water everywhere

There was no glimmer of dawn, no clearness, no Light
And he began by saying these words,—That he
Might 'cese remaining inactive :
'Darkness! Become a light possesing darkness'
And at once light appeared.

* * *

'Heaven be formed' then the Sky became suspended
'Bring forth thou, Tupua-horo-nuku
And at once the moving earth lay stretched abroad"

(Page 13, Mythology of all races—Dixon, vol. ix)

ভারতবর্ষের আর্য ঋষিগণের চিন্তা কল্পনা ক্রিয়াকর্ম সবেতেই তাঁদের পূর্বতন আর্যেতর অবস্থার ছাপ কী সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান তা দেখছি—সুতরাং ভারত শিল্পের ইতিহাস শুধু বৈদিক যুগ পর্যন্ত নয় তারও এবং আরও পূর্ব থেকে তার ধারা চলে আসছে—এইটেই বলতে হল। আত্মা এবং পরমাত্মা দুটি কেমন যেমনি দেখাতে হল অমনি ঋষিরা তাঁদের সেই পূর্বতন অবস্থার দুটি পাখির উপাখ্যান দিয়ে ছবি দিলেন "দ্বা সুপর্ণা"—একটি পাখি জেগে থাকে একটি পাখি ঘুমিয়ে থাকে! কোন্ অখ্যাত যুগের রূপকথার পাখি—যখন আর্যদের পূর্বপুরুষরা সবেমাত্র কথা বলতে, আগুন পোহাতে শিখেছেন—তারই স্মৃতিছন্দের দ্বারায় নিরূপিত হল, ঋষিদের গভীর তত্ত্বজ্ঞান তাকে তলিয়ে দিতে পারলে না। তারপর থেকে পাথরে ধাতুতে কবিতায় গানে রূপকথায় আর্য সভ্যতা কতবার কতভাবে এই দুটি পাখি বেঙ্গমা-বেঙ্গমি এবং শুক সারির আকারে ধরে গেল তার ঠিক নেই—

"সাই সুয়া দুড পাখি গহিন নদী চরে
স্যাও গহিন শুকায়া গেলে শুন্যি উড়াল ছাড়ে
ধবল বরণ কবুতর চিরল বরণ আখি—"

এমনি সব কথা এ আর্য অনার্য দুইয়ের আত্মীয়তার কথা না জানিয়ে থাকতে পারছে না। কাজেই বলতে হয় আর্যশিল্পের ভিত্তি অনার্য যুগের উপরে।

পাকা ফলের বুকের মাঝে যেমন শক্ত কষি, তেমনি আর্যশিল্পের অন্তরে অন্তরে অনার্য-শিল্পের প্রাণ বীজের মতো লুকিয়ে রয়েছে—তাকে ফেলে হয়তো রস পেতে পাবি, কিন্তু সে যদি বাদ যেত আরম্ভেই একেবারে তবে নিষ্ফলা হত আর্য সভ্যতা এটা নিশ্চয়।

বঙ্গবাণী ● চৈত্র ১৩৩২ (১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ)



ছোটোনাগপুরে সাহিত্য-সেবার উপাদান

শ্রীশরৎচন্দ্র রায়

ছোটোনাগপুরে সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চার অপরিণত ও অপরিপক্ক উপকরণ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। পরিতাপের বিষয়, সেসব উপাদান অস্পৃশ্য হরিজনদের মতো বহু যুগ হইতে অনাদৃত, অনাহূত ও অস্পৃষ্ট অবস্থায় পড়িয়া আছে।

ভূবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, খনিজবিদ্যা, প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতির অনুশীলনের পক্ষে ছোটোনাগপুর একটি প্রশস্ত ক্ষেত্র। কিন্তু যদিও এই ক্ষেত্রে 'আবাদ করিলে সোনা ফলিতে' পারিত, দুঃখের বিষয় আজ পর্যন্ত 'চাষের মতন চাষ করার' লোকের অভাবে এই বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র পতিত বা অকর্ষিত অবস্থায় রহিয়াছে। কেবল গত শতাব্দীর দুই-চারি জন উচ্চপদস্থ ইংরেজ সবকারি কর্মচারী এই ক্ষেত্রে উপর-উপর আঁচড় দিয়াছেন মাত্র। কিন্তু যদিও তাঁহারা এই ক্ষেত্র গভীরভাবে কর্ষণ করিবার অবকাশ বা সুযোগ পান নাই, তবুও সম্যক কর্ষণে কীরূপ সোনার ফসল লাভ হইতে পারে তাহার আভাস দিয়া তাঁহাদের পরবর্তী কৃষকদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

ভূবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণীবিদ্যা সম্বন্ধে বল (V. Ball), ব্লান্ডফোর্ড (W. T. Blandford) ও কর্নেল টিকেল (Col. Tickell) প্রমুখ কয়েকজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী এবং নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে ছোটোনাগপুরের ভূতপূর্ব কমিশনার কর্নেল ডালটন (Col. Dalton) এবং মানভূমের ভূতপূর্ব সহকারী কমিশনার এবং পরে ভারত-গভর্নমেন্টের হোম মেম্বার স্যার হারবার্ট রিজলি (Sir Herbert Risley) পথ-প্রদর্শকের কাজ করিয়া আমাদিগকে চিরঋণী করিয়াছেন। অবশ্য ইঁহারা দেশীয় সহকারী ও পত্রপ্রেরকদের সহায়তায় তত্ত্বানুসন্ধান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের অনেকেরই নাম অজ্ঞাত।

১। প্রাগৈতিহাসিক যুগ

প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে ছোটোনাগপুরে এখনও সবিশেষ অনুসন্ধান হয় নাই। কাপ্তেন বিচিং (Captain Beeching), বল (V. Bali), কর্নেল টিকেল এবং আরও দুই-এক জন অনুসন্ধিৎসু ইংরেজ কর্মচারী অন্য তত্ত্বের অনুসন্ধান উপলক্ষে দৈবক্রমে দুই-চারিটি প্রস্তর-যুগের কুঠারফলক প্রাপ্ত হন এবং আনুষঙ্গিকভাবে সেগুলির পরিচয় দেন।

ছোটোনাগপুরের ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধেও ভূতপূর্ব ইংরেজ সিবিলিয়ান সুপ্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিদ স্যর জর্জ গ্রিয়ারসন (Sir George Grierson) এবং দুই-চারিটি ইউরোপীয় পাদরির (Father Hoffmann, Rev. Dr. Noltrott, Rev. Hahn, ও Father Grignard-এর) নিকট আমরা ঋণী। এইসব বিদেশীয় পণ্ডিত যে জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন আমরা এখানে তাহার সম্মুখে থাকিয়াও এত দিন সেই উন্মুক্ত দ্বারের আহ্বান অবহেলা করিয়া আসিতেছি।

সম্প্রতি ভারতে রাজনৈতিক, সামাজিক, বাণিজ্যিক ও কলকারখানা দ্বারা উৎপাদন সম্বন্ধীয় ব্যাপারে যেরূপ স্বাবলম্বনের স্পৃহা জাগ্রত হইয়াছে, বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্বন্ধেও স্যার জগদীশচন্দ্র বসু, স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডক্টর মেঘনাদ সাহা প্রমুখ বিজ্ঞানাচার্যেরা সেইরূপ আত্মনির্ভরতার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন এবং সাহিত্য ও ইতিহাসাদি সেবায় ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, স্যর যদুনাথ সরকার, অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন, ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকগণও সেইরূপ আত্মনির্ভরের পরিচয় দিতেছেন। এখন আর গত শতাব্দীর অধিকাংশ শিক্ষিত ভারতবাসীর ন্যায় আমরা ভারতের অমূল্য প্রাচীন সাহিত্য, দর্শন, শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্রের মূলতত্ত্ব উদ্‌ঘাটনের ও ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের উদ্ধারের জন্য এবং আধুনিক সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণার জন্য বিদেশীয় পণ্ডিতদের সম্পূর্ণ মুখাপেক্ষী নহি। যদিও পূর্বগামী বিশেষজ্ঞ কতকগুলি বিদেশীয় পণ্ডিতের ও তাঁহাদের মতানুবর্তী কোনো কোনো ভারতীয় পণ্ডিতের নিকট ভারতবাসী চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে, তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে প্রকৃতপক্ষে ভারতের প্রাচীন জ্ঞান-ভাণ্ডারের উদ্ধার ও সম্যক অর্থবোধ ও ব্যাখ্যান এবং নূতন বা অনাহৃত তথ্যের আবিষ্কার বা আহরণ দেশীয় বিদ্বন্মণ্ডলীর দ্বারা যেরূপ সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা, বিদেশীয় পণ্ডিতদের নিকট হইতে সেরূপ প্রত্যাশা করা যায় না।

যে নব্য বিদ্বৎগোষ্ঠী বাংলা দেশে সাহিত্য ইতিহাস বিজ্ঞান প্রভৃতির গবেষণার নূতন যুগ প্রবর্তন করিয়াছেন, তাঁহাদের দৃষ্টি আজ এই 'পাণ্ডববর্জিত' ছোটোনাগপুরের দিকে আকৃষ্ট হওয়ায় স্থানীয় সাহিত্যসেবীদের মনে বিশেষ আশার সঞ্চার হইয়াছে। তাই আশা করি, বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব ও সাহিত্য সম্বন্ধে গবেষণার কীরূপ উপকরণ ছোটোনাগপুরে পাওয়া যাইতে পারে—এই প্রসঙ্গ এই অভিভাষণের অনুপযোগী হইবে না। তবে ভাষার দারিদ্র্যের জন্য ও যথাযথ ব্যাখ্যানের শক্তির অভাবে আমার এই অভিভাষণ হয়তো শ্রোতাদের ক্লেশদায়ক হইয়া পড়িবে।

ছোটোনাগপুরের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে সরকারি ভূতত্ত্ব-বিভাগের অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, ছোটোনাগপুর ভারতের মধ্যে একটি সর্বপুরাতন প্রদেশ। যখন পৃথিবীর অধিকাংশ বর্তমান স্থলভাগ সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল তখনই ছোটোনাগপুরের ভূপঞ্জর গঠিত হইয়াছে। যে-যুগে পৃথিবীতে জীবনের উন্মেষ হয় নাই, সেই জীবহীন (Archaean বা Azoic) যুগে Gneiss, Granite, Quartzite ও Epidiorite প্রভৃতি প্রস্তরে ছোটোনাগপুর, বিশেষত রাঁচি ও হাজারিবাগ জেলা, পরিপূর্ণ। আর কেবল কোনো কোনো অংশে পুরাতন জীব-যুগের (Lower Paleozoic) ধারোয়ার ও গন্ডোয়ানা শ্রেণির প্রস্তর বর্তমান। সুতরাং ভারতের এই একটি প্রাচীনতম প্রদেশে ভূবিদ্যার আলোচনা ও গবেষণার প্রচুর উপাদান পাওয়া যাইতে পারে।

আর এখানে লৌহ-অভ্র-কয়লা-চুন প্রভৃতির অনেক খনি থাকাতে খনিজবিদ্যা সম্বন্ধেও গবেষণার সুযোগ আছে। উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণীবিদ্যা সম্বন্ধেও অরণ্যবহুল ছোটোনাগপুরে অনুসন্ধান ও গবেষণার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র বর্তমান। তারপর প্রাগৈতিহাসিক গবেষণার জন্য ছোটোনাগপুরে যেরূপ প্রচুর উপকরণ আছে, উত্তর-ভারতে সিন্ধু-নদের উপত্যকা ছাড়া সম্ভবত আর কোথাও সেরূপ নাই। যে-প্রদেশের ভূস্তর-সংগঠন (land formation) ভারতের বা পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতমের একটি সেই স্থান যুগযুগান্তর হইতে মানবের আবাস-ভূমি হইয়া আসিতেছে, এ তথ্য কেবল অনুমানসাপেক্ষ নয়। পুরাতন প্রস্তর-যুগ, মধ্য-প্রস্তর যুগ, নূতন প্রস্তর-যুগ, প্রস্তর ও তাম্রের মিশ্রযুগ, তাম্র-যুগ ও পুরাতন লৌহ-যুগ—ইহার নিদর্শন ছোটোনাগপুরের মালভূমিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে বর্তমান। কেবল অনুসন্ধানকারীর কোদালির অপেক্ষা করিতেছে।

আপনারা সকলেই জানেন যে আদিমানবের বিশেষ কোনো অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। আদিমানব স্বাভাবিক অস্ত্র ব্যবহার করিত, অর্থাৎ নিজের হাত পা নখ এবং গাছের ডাল বা পাথরের টুকরাই তাহার একমাত্র অস্ত্র ছিল। হয়ত জলস্রোতে ঘষিয়া কিংবা নৈসর্গিক কোনোরূপ চাপে ছুঁচালো বা তীক্ষ্ম ধারযুক্ত দুই-চারখানা পাথর দেখিয়া কোনো আদিম মানবের মনে প্রস্তরখণ্ডকে কৌশলে ভাঙিয়া বা ঘষিয়া ধারালো করিবার কল্পনা প্রথমে উদিত হয়। এই প্রথম মানব-হস্তনির্মিত শিলা-অস্ত্রগুলির উষা-শিলা (Eolith) নাম দেওয়া হইয়াছে। এইরূপে মানব-সভ্যতার বিকাশ আরম্ভ হইল। ক্রমে এক-একখানা প্রস্তরখণ্ড অন্য প্রস্তরের দ্বারা বিশেষ আকারে ভাঙিয়া লইয়া কিনারাগুলি সেইরূপে ছিলিয়া (chipping) ও ধার-যুক্ত করিয়া বিশেষ আদর্শ (pattern) অনুযায়ী আদিম মানবেরা কুঠারফলক প্রভৃতি নির্মাণ করিতে লাগিল। এরকম ফলকযুক্ত ছিলা (chipped) বা অসমান (rough) প্রস্তরাস্ত্র বহু সহস্র বৎসর যাবৎ ব্যবহৃত হইত। ওই যুগকে পুরাতন প্রস্তর-যুগ (Rough Stone age বা Palæolithic Age) বলা হয়। তারপর ক্রমান্বয়ে গঠন-প্রণালীর ও নমুনার উন্নতি ও কার্যোপযোগিতা ও সৌন্দর্যের উৎকর্ষ অনুসারে মধ্য-প্রস্তরযুগ (Mesolithic Age) ও নূতন প্রস্তর-যুগ (Neolithic Age)-এর উদ্ভব হইল। এই যুগে পাথরের ধার অন্য পাথরে ঘষিয়া করা হইত;—ছিলিয়া নয়। এইরূপে আবার কত সহস্র বৎসর কাটিল ; সভ্যতার স্ফুরণ মন্দ গতিতে চলিতে থাকিল। তারপর মাত্র কয়েক সহস্র বৎসর হইল তাম্রের এবং

পরে ব্রোঞ্জের (টিনমিশ্রিত তামার) আবিষ্কার হইল। আর পাথরের অস্ত্রের অনুকরণে তামার অস্ত্রাদি প্রস্তুত হইতে শুরু হইল। প্রথম প্রথম কিছুকাল প্রস্তরাস্ত্র ও তাম্র-অস্ত্র দুই-ই ব্যবহার হইতে লাগিল। ওই যুগকে তাম্র-প্রস্তর যুগ (Chalcolithic Age) নাম দেওয়া হইয়াছে। পরে, ভারতের বিমিশ্র তাম্র-যুগ ও ইউরোপের ব্রোঞ্জ-যুগ। যখন আর্যেরা ভারতে প্রথম আগমন করেন তখনও হয়ত ভারতে তাম্র-যুগ শেষ হয় নাই। সম্ভবত তখন তাম্র ও লৌহ যুগের সন্ধিকাল। কারণ ঋগ্বেদে যে 'অয়সে'র উল্লেখ আছে তাহাকে কোনো কোনো পণ্ডিত তামা অর্থে গ্রহণ করেন।

সর্বশেষে লোহার ব্যবহার আরম্ভ হইল। এই লৌহ যুগকেও দুইভাগে বিভক্ত করা হয় ; প্রথম বিভাগ পুরাতন লৌহ-যুগ (Early Iron Age) ও অপরটি নূতন লৌহ-যুগ (Later Iron Age) নামে অভিহিত হয়। এখন আমরা এই নূতন লৌহ-যুগে আছি।

২। নৃতত্ত্ব

এই প্রসঙ্গে আর্যদের আগে ভারতে পর-পর কোন্ কোন্ জাতি আসিয়াছিল, সে-সম্বন্ধে দুই-এক কথা বলা বোধ হয় অসমীচীন হইবে না। নৃতত্ত্ববিদ পণ্ডিতদের অনেকেই অনুমান করেন যে. সর্বপ্রথমে কালো. বেঁটে বর্তমান আন্দামানবাসী কিংবা মেলেনেশিয়াবাসী নেগ্রিটোদের মতো এক বা বহু জাতি ভারতের অধিবাসী ছিল। তাহারাই ভারতের পুরাতন প্রস্তর যুগের অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ করিয়াছিল। তাহারা মৃগয়ালব্ধ পশুপক্ষী বা বন্য ফলমূল খাইয়া জীবনধারণ করিত। এখন ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে যে কাডার (Kadar), উরালি (Urali) প্রভৃতি জাতি আছে, তাহারাই ভারতের সেই সর্বপ্রথম অধিবাসীদের, অমিশ্র না হইলেও বিমিশ্র (remnants) বংশধর। তারপর বর্তমান মুন্ডা-গোষ্ঠীর জাতিদের পূর্বপুরুষেরা ভারতে আসে। কোথা হইতে এবং কোন্ পথে আসে সে-সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মতের অমিল আছে। আগেকার নৃতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা মনে করিতেন এবং এখনও কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন, তাহারা ভারতের উত্তর পূর্ব দিক হইতে ব্রহ্মদেশ ও আসাম হইয়া এ-দেশে আসিয়াছিল ; কিন্তু ইদানীন্তন অনেক পণ্ডিতের মতে উহারা উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। উহাদের উত্তর-পূর্ব পথে আগমনের সপক্ষে বলা যায় যে, প্রথমত ভারতের পূর্বস্থ মলয়-দ্বীপের সাকেই (Sakei) ও সেমাং (Semang) জাতিদের ভাষা ব্রহ্মদেশের ওয়া (Wa), পালৌঙ্গ (Palaung) প্রভৃতি ভাষা. পেগুর মন্স (Mons) বা তেলাইঙ্গ (Telaing) ভাষা ও আসামের খাসি ভাষার সহিত ভারতের মুন্ডা-গোষ্ঠীর ভাষাগুলির গঠনে ও কিছু কিছু বিশেষ প্রয়োজনীয় শব্দাবলিতে সাদৃশ্য দেখা যায়। দ্বিতীয়ত, ব্রহ্মদেশে নূতন প্রস্তর-যুগের যে স্কন্ধযুক্ত কুঠারফলক পাওয়া যায়, ছোটোনাগপুর ও সাঁওতাল পরগনাতেও সেইরূপ প্রস্তরাস্ত্র পাওয়া গিয়াছে। আর আসামেও তদনুরূপ স্কন্ধযুক্ত লোহার অস্ত্র ও খানিকটা তদনুরূপ প্রস্তরের অস্ত্র পাওয়া গিয়াছে। তৃতীয়ত, কোনো কোনো মুন্ডাজাতির মধ্যে মোঙ্গোলিয়ানদের মত ক্ষুদ্র চক্ষু ও বাঁকা চক্ষু কিংবা অপর কোনো অস্পষ্ট বা অনির্দিষ্ট মোঙ্গোলিয়ান লক্ষণ কখনো-কখনো দেখা যায়।

এই মতের স্বপক্ষে আরও দুই-একটি তথ্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। উড়িষ্যায়

জুয়াঙ ও পাহাড়ি ভুঁইয়া রমণীদের জাতিতত্ত্ব অনুসন্ধানকালীন জুয়াঙ্গ ও পাহাড়ি ভুঁইয়াদের গলায় থাকে-থাকে যে লাল অনেকগুলি করিয়া কাচ-বর্তুলের মালা দেখিয়াছি তাহা নাগা প্রভৃতি মোঙ্গোলীয় রমণীদের গলার ওইরূপ পুঞ্জীকৃত মালার কথা মনে করাইয়া দেয়। আর কোনো কোনো জুয়াঙ্গ ও পাহাড়ি ভুঁইয়া যে শূকর ও ছাগলাদি রাখিবার জন্য ছোটো ছোটো মাচার উপর ঘর নির্মাণ করে, সেগুলিও আসামের নাগাদের আবাসগৃহ বা "চাঙ" ঘরের স্মারক।

অপর পক্ষে, অনেক নৃতত্ত্ববিদ পণ্ডিত মুন্ডা-গোষ্ঠীর জাতিদিগকে যে উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে ভারতে আগত ককেশীয় জাতির একটি নিম্নস্তরের কৃষ্ণ-ত্বচশাখা (Low form of Caucasian Melanochroi) বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। এই মতের সপক্ষে প্রমাণ-স্বরূপ প্রদর্শিত হয় যে, ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে টার্নভিল পিটার (Turnville Petre) গ্যালিলি প্রদেশের 'রবার্স কেভ' নামক গিরিগুহায় যে-ধরনের (Neanderthaloid) নরকঙ্কাল প্রাপ্ত হন এবং ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ব্যারি (W. E. Barrey) দক্ষিণ আফ্রিকার রোডেসিয়া প্রদেশের 'ব্রোকেন হিল' পাহাড়ের গুহায় রোডেসিয়ান মানুষের যে কঙ্কাল প্রাপ্ত হন তাহার গঠন অস্ট্রেলিয়ানদের দৈহিক গঠনের অনুরূপ, এবং মুন্ডা-গোষ্ঠীর জাতিদের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সুদূর সম্পর্ক থাকা অসম্ভব নয়। যদিও অস্ট্রেলিয়ার অসভ্য জাতিদের সঙ্গে প্রাগৈতিহাসিক কালের নিয়ান্ডারথাল-মানবের কোনো সম্পর্ক থাকার কথা আধুনিক নৃতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা অনেকেই অস্বীকার করেন, তবুও সম্প্রতি আমেরিকার বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ হার্ডলিসকা (Hardlicka) এবং ভারতীয় প্রাণীতত্ত্ব বিভাগের ভূতপূর্ব ডিরেক্টর কর্নেল সিউয়েল ওই পুরাতন মতের পুনরুত্থাপন ও সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু গ্যালিলিতে প্রাপ্ত নিয়ান্ডারথাল-মানবের করোটি ব্যতীত প্যালেস্টাইনের মাউন্ট কার্মেলের অ্যাথলিট (Athlit) গুহা এবং শুখা (Shukhah) গুহাতে যে নরকঙ্কালাবশেষ পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি পরবর্তী যুগের Neanthropic বা নূতন মানুষের। অস্ট্রেলিয়ায় যে দুইটি প্রাগৈতিহাসিক যুগের কঙ্কালাবশেষ (Talgai skull ও Cohuna skull) এ-পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে তাহা উভয়েই সমজাতীয় এবং অনেকাংশে নিয়ান্ডারথাল আদিম মানবের (Homo Primigenius-এব) অনুরূপ। সার আর্থার কিথের মতে—

"Both skulls represent the proto-Australian type of which the modern aboriginal type has been Lived"–*New Discoveries relating to the Antithies of a Man.* p.308.

দ্বিতীয়ত, মুন্ডাজাতির মধ্যে যেটুকু মোঙ্গোলিয়ান মিশ্রণের আভাস পাওয়া যায় তাহা, সম্ভবত সমুদ্রযোগে, দক্ষিণ-মোঙ্গোলীয় (Pareoean) জাতির লোকেরা এখানে আনিয়াছিল। তৃতীয়ত, কোনো কোনো ভাষাতত্ত্ববিদ পণ্ডিত মুন্ডা-গোষ্ঠীর agglutinative ভাষাগুলির সহিত সুমেরুদেশীয় ভাষার সম্বন্ধ আছে এরূপ মনে করেন।

সে যাহাই হউক, মুন্ডা-গোষ্ঠীর জাতিদের পূর্বপুরুষেরা সম্ভবত পূর্ববর্তী নেগ্রিটো জাতিদের আংশিক উচ্ছেদসাধন করে এবং অবশিষ্ট অংশের কতক প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক

অবস্থার প্রভাবক্রমে লয়প্রাপ্ত হইল, কতক-বা মুন্ডা-গোষ্ঠীয়দের সংমিশ্রণে পৃথক অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলিল। কেবল তাহাদের কিছু কিছু অংশ দক্ষিণ-ভারতের উরুলা, কাড়ার, চেঞ্চু প্রভৃতি জাতিদের মধ্যে সম্ভবত রহিয়া গিয়াছিল। মুন্ডা-গোষ্ঠীয়দের কিংবদন্তি হইতে জানা যায় যে, এক সময় তাহারা—অন্তত তাহাদের মধ্যে প্রধান জাতিগুলি—শোণ, গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি নদনদীর উপত্যকায় বাস করিত এবং কৃষিকার্য দ্বারা কিয়ৎ-পরিমাণ সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করিত। ইহারাই সম্ভবত ভারতে প্রথম কৃষিকার্য করে। উত্তর-ভারতের পশ্চিম হইতে পূর্ব সীমা পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া ইহাদেরই শাখা-প্রশাখা ব্রহ্মদেশ অতিক্রম করিয়া পূর্ব-মহাসাগরের মলয়-উপদ্বীপ হইয়া আরও দূরে যায়। দক্ষিণে লঙ্কাদ্বীপের বেদ্দারাও (Vedda) ইহাদেরই একটি প্রশাখা এইরূপ অনুমান হয়। ইহাদের মধ্যে যাহারা আসাম ও ব্রহ্মদেশ হইয়া আরও পূর্বে চলিয়া যায়, তাহাদের একদল মোঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণে ইন্ডোনেশিয়ান জাতিতে পরিণত হইল। ইহার অনেক পরে আবার সেই ইন্ডোনেশিয়ানদের মধ্যে কতক আসামে গিয়াছিল এবং দক্ষিণ-ভারতের উপকূলেও তাহাদের কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়।

যখন মুন্ডাগোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখা সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত ছিল এমন সময়ে এদেশে আর একটি নূতন জাতির আবির্ভাব হয়। ইহাদের পূর্ববাসস্থান এবং কৃষ্টিগত উদ্ভবস্থল (area of characterization) ভূমধ্যসাগরের বেলাভূমি বা তন্নিকটবর্তী স্থানে। এইজন্য ইহাদিগকে অসুর জাতি (Mediterranean race বা Proto-Mediterranean race) বলা হয়। ইহারা দলে দলে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সম্ভবত বেলুচিস্তান হইয়া ভারতে প্রবেশ করে। বেলুচিস্তান ও ভারতের সীমান্ত-প্রদেশে যে ব্রাহুই (Brahui) জাতি আছে তাহাদের ভাষা ইহাদেরই ভাষার সমজাতীয়। হয়ত পরে জলপথেও এই অসুর জাতির কোনো কোনো দল ভারতে আগমন করিয়াছিল।

এই নবাগত অসুর জাতির কোনো কোনো দল উত্তর-ভারতে মুন্ডাগোষ্ঠীর জাতিদের প্রভাব দেখিয়া দক্ষিণ-ভারতের দিকে অগ্রসর হইল এবং সেখানকার অপেক্ষাকৃত হীনবল নেগ্রিটো জাতিদের বিধ্বস্ত করিয়া ক্রমে সমস্ত দক্ষিণ-ভারত অধিকার ও দ্রাবিড়-সভ্যতার পত্তন করিল। দক্ষিণ-ভারতে মুন্ডাগোষ্ঠীর যেসব জাতি ছিল তাহারা ক্রমে নবাগত অসুর জাতিদের মধ্যে বিলীন হইয়া গেল। আর অসুর জাতির মধ্যে যাহারা উত্তর-ভারতে বসবাস করিল তাহাদের এক দল সিন্ধু-উপত্যকায় ক্রমে আধিপত্য স্থাপন করিয়া ভারতের বাহিরের অন্যান্য জাতির সংস্পর্শে ও সম্ভবত আংশিক সংমিশ্রণে সভ্যতার সাতিশয় উৎকর্ষসাধন করিয়াছিল, মহেন-জো-দারো ও হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ হইতে এরূপ অনুমান হয়। ভারতের আরও পূর্বে অর্থাৎ গঙ্গা, যমুনা, তাপ্তি, নর্মদা প্রভৃতি নদীর উপত্যকায় যে মেডিটারেনিয়ন জাতির দলেরা বসবাস করিয়াছিল তাহাদের সংঘর্ষে অপেক্ষাকৃত অসভ্য বর্বর মুন্ডা-জাতিগুলি (জুয়াঙ্গ, বিরহোড় প্রভৃতি) পাহাড়-পর্বতে আশ্রয় লইল ; কেবল মুন্ডা, শবর, সাঁওতাল প্রভৃতি কয়েকটি অপেক্ষাকৃত শক্তিমান মুন্ডা-গোষ্ঠীর 'কোলজাতি' শোণ, গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি নদনদীর উপত্যকায় স্থানে স্থানে নিজেদের প্রভাব কোনো রকমে বজায় রাখিতে সমর্থ হইল এবং কালে আশপাশের অসুর জাতিদের সঙ্গে তাহাদের কতক কতক সংমিশ্রণও হইল।

মুন্ডাগোষ্ঠীয় জাতির ভারতে আগমনের বহু কাল পরে এবং সম্ভবত দ্রাবিড়-জাতীয়দের আগমনের কিছু পরে ককেশীয় জাতির আরও একটি শাখা ভারতে আসিয়াছিল এরূপ অনুমান হয়। ইহারাই বাঙালি, গুজরাটি, মহারাষ্ট্রীয় প্রভৃতি জাতির পূর্বপুরুষ। পুরুষ-পরম্পরা আল্পস্ পর্বতশ্রেণির মালভূমিতে সুদীর্ঘকাল অবস্থিতি করায় ইহাদের গোলাকৃতি মস্তক এবং দৈহিক গঠনের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য জন্মে ; সেই জন্য ইহারা এবং ইহাদের জ্ঞাতি-জাতিরা আলপাইন জাতি নামে পরিচিত। সম্ভবত উত্তর-ভারতে অসুর ও মুন্ডা-গোষ্ঠীর জাতিদের প্রাদুর্ভাব ও প্রাধান্য দেখিয়া ভারতে আগত এই আলপাইন জাতির এক দল গুজরাটে অবস্থান করে ; এক দল আরব-উপসাগরের উপকূল দিয়া দক্ষিণ দিকে মহিশূর, কুর্গ প্রভৃতি প্রদেশে যায় ও আর এক দল মধ্যভারত ও বিহারের পূর্ব প্রান্ত হইয়া বাংলা দেশে যায়। ইহারাই গুজরাটি, মহারাষ্ট্রি ও বাঙালি জাতির পূর্বপুরুষ। 'ঘোষ', 'মিত্র', 'নাগ', 'পাল' প্রভৃতি কয়েকটি পদবি বাঙালি কায়স্থদের মধ্যে এবং গুজরাটি নগর-ব্রাহ্মণদের মধ্যেও দেখা যায়। ইহা হইতে এরূপ অনুমান হয়ত অসংগত হইবে না যে আর্যদের সঙ্গে সংমিশ্রণের পূর্বে বাংলা দেশের কায়স্থগণ বাঙালি সমাজে এবং গুজরাটের নগর-ব্রাহ্মণেরা গুজরাটি সমাজে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিত ; সম্ভবত বাংলা দেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও জাতিভেদ সংস্থাপিত হইবার পর তখনকার সর্বোচ্চ শ্রেণির বাঙালিদের মধ্যে যাঁহারা যজন-যাজন করিতেন তাঁহারা ব্রাহ্মণশ্রেণিভুক্ত হইলেন, আর ওই সর্বোচ্চ শ্রেণির মধ্যে যাঁহারা বৈষয়িক ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন তাঁহারা কায়স্থ পদবাচ্য হইলেন। বর্তমান কায়স্থ জাতির পূর্বপুরুষদের এক দল জ্ঞাতি বা স্বশ্রেণি ছাড়াও কান্যকুব্জ প্রভৃতি হইতে আগত কতিপয় আর্য ব্রাহ্মণ-বংশ ও এই উভয়ের সংমিশ্রণসম্ভূত বংশগুলি মিলিয়া বাঙালি ব্রাহ্মণের উদ্ভব হয়। ভারতের নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে সরকারি তদন্তে রিজলি সাহেবের Anthropometrical measurements-এর মাপ হইতে জানা গিয়াছে যে, পূর্ববঙ্গের ও পশ্চিমবঙ্গের ব্রাহ্মণদের Average Cephalic index গড়পড়তা ৭৮.২, এবং বাংলা দেশের কায়স্থদের মাথারও ঠিক ওই মাপ (৭৮.২), কেবল নাসিকার মাপ বাঙালি কায়স্থ এবং পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্মণ দুয়েরই গড়পড়তা ৭০.৩ অর্থাৎ লম্বা ও সরু ; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ব্রাহ্মণদের গড়পড়তা ৭১.৯ অর্থাৎ ঈষৎ বেশি মোটা নাক। পরে কোনো কোনো নৃতত্ত্ববিদ যে মাপ করিয়াছেন তাহাতে কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। সে যাহা হউক, বঙ্গদেশের কায়স্থ, ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যদের মধ্যে দৈহিক গঠনে বা সহজ মানসিক ক্ষমতায় বা সংস্কৃতিতে বিশেষ কোনো প্রভেদ দেখা যায় না।

অস্ট্রিক ভাষাভাষী মুন্ডাগোষ্ঠীয় জাতি, মেডিটারেনিয়ন গোষ্ঠীয় দ্রাবিড়ভাষী অসুর জাতি ও আলপাইন-গোষ্ঠীয় জাতিগুলি ছাড়া ভারতে আর একটি প্রধান জাতি মোঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর। ঐতিহাসিক যুগেই ইহাদের অধিকাংশ উত্তর-পূর্ব অভিমুখ হইতে আসামে এবং সামান্য কতক হিমালয়ের উত্তর দিক হইতে হিমালয়ের দক্ষিণ-পাদমূলে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। উত্তর-পূর্ব হইতে মোঙ্গোলীয়দের আগমন এখনও একেবারে ক্ষান্ত হয় নাই। আসামের অধিকাংশ অধিবাসী ইহাদের বংশসম্ভূত ; উত্তরবঙ্গের কোচ জাতি এবং উত্তর-বিহারের থাড়ু জাতির মধ্যে মোঙ্গোলীয় রক্তের সংমিশ্রণ দেখা যায়। রিজলি-প্রমুখ

সাবেক নৃতত্ত্ববিদেরা বাঙালি জাতির যে মোঙ্গোলিয়ান ও দ্রাবিড় জাতিব সংমিশ্রণে উৎপত্তি নির্দেশ করেন তাহা ভ্রমাত্মক বলিয়া আধুনিক নৃতত্ত্ববিদেরা স্থির করিয়াছেন।

পরিশেষে সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় কি তৃতীয় সহস্রকে, হয়তো বা তৎপূর্বেই, আর্যজাতি উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে ভারতে আগমন করেন। প্রথমে পঞ্চনদতীরে আর্যদের সঙ্গে ভারতের অসুর (Mediterranean) জাতির সংঘর্ষ হইল। সুর-দেবতার উপাসক আর্যেরা উত্তর-ভারতের এই আর্যদেবদ্বেষী মেডিটারেনিয়ন জাতিদের 'অসুর' নামে অভিহিত করেন। সিন্ধু-উপত্যকায় মহেন-জো-দারো ও হরপ্পা প্রভৃতি স্থানের অসুরেরা কোনো অজ্ঞাত কারণে তৎপূর্বেই লুপ্ত হইয়াছিল এরূপ অনুমিত হয়। মুন্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি মুন্ডাগোষ্ঠীর মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত উন্নত জাতিরা শোণ-নদ ও গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি নদীর উপত্যকায় তখন বাস করিত তাহারাও আর্যদের তাড়নায় ক্রমে পূর্বে ও দক্ষিণে সরিয়া যাইতে লাগিল। উত্তর-ভারতের পঞ্জাব হইতে মগধ পর্যন্ত মেডিটারেনিয়ন-গোষ্ঠীর যেসব অসুর আর্যদের আগমনের পূর্বে আধিপত্য করিত তাহারা ক্রমে ক্রমে আর্যদের নিকট পরাভূত ও কতক বশীভূত হইয়া কালে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য হারাইযা ফেলিল। অনুমান হয় যে, তাহাদের মধ্যে উচ্চবংশীয় কতকগুলি পরিবার আর্যদের সঙ্গে সংমিশ্রিত হইয়াছিল ; কতক বা পূর্ববর্তী আলপাইন জাতিদের মধ্যে মিশিয়া গেল। আর নিম্নস্তরেব অসুরেরা মুন্ডা-গোষ্ঠীর জাতিদের মধ্যে লীন হইয়া গেল।

সম্ভবত এই অসুর জাতিরই একটি প্রশাখা প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই ছোটোনাগপুরের পার্বত্য প্রদেশে অধিষ্ঠিত হইয়া বহুকাল হইতে নির্বিবাদে বাস করিত। ছোটোনাগপুরের মুন্ডাদের কিংবদন্তি এইরূপ যে পুরাকালে ছোটোনাগপুরের মালভূমিতে 'অসুর'দের একটি সুদূর বিচ্ছিন্ন দলের বাস ছিল ; যখন মুন্ডারা গঙ্গার—পরে শোণ-নদের—উপত্যকা হইতে ক্রমে ক্রমে বিতাড়িত হইয়া ছোটোনাগপুরের মালভূমিতে প্রবেশ করে তখনও এই অসুরদের এখানে পূর্ণ প্রভাব। ছোটোনাগপুরের ধাতব দ্রব্যের নির্মাণ ও প্রচলন এই অসুরদের দ্বারাই হয়, কিংবদন্তি এইরূপ। তাম্র-যুগের এবং পুরাতন লৌহ-যুগের যেসব নিদর্শন এখানে পাওয়া যায়, জনশ্রুতি এই যে সেগুলি এই অসুরদের নির্মিত। এই জন্যই তাহাদের পরবর্তী কালের যে মুন্ডাভাষাভাষী অসভ্য জাতি এখানে এখনও আছে এবং আকরজাত ধাতু (ore) হইতে লোহা-গলানো পেশা অবলম্বন করিয়াছে তাহাদিগকে 'অসুর' নামে অভিহিত করা হয় ; বস্তুত, তাহাদের সঙ্গে ছোটোনাগপুরের তাম্র-যুগের অসুরদের কোনো জাতিগত সম্বন্ধ আছে এরূপ মনে হয় না। পূর্বেই বলিয়াছি, ঋগ্বেদে অসুর জাতির সঙ্গে আর্য জাতির দীর্ঘকালব্যাপী সংঘর্ষের উল্লেখ আছে। ছোটোনাগপুরের তাম্র-যুগের অসুরেরা সম্ভবত তাহাদেরই সুদূরবিক্ষিপ্ত একটি শাখা। ঋগ্বেদে অসুরদিগকে 'শিশ্নদেবাঃ' বলা হইয়াছে ; সাধারণত পণ্ডিতেরা 'শিশ্নদেবাঃ' শব্দের অর্থ করেন 'লিঙ্গ-উপাসক'। ছোটোনাগপুরের অসুরদের ধ্বংসাবশেষগুলিতে প্রস্তর-লিঙ্গ ও অনেক পোড়ামাটির লিঙ্গ-প্রতীক পাওয়া যায়।

সে যাহা হউক, সম্ভবত নব প্রস্তর-যুগ হইতে লৌহ-যুগের প্রারম্ভ পর্যন্ত এখানে এই তথাকথিত অসুর জাতির প্রভাব ছিল ; মুন্ডাদের কিংবদন্তি এইরূপ সাক্ষ্য দেয় এবং তাহার

বস্তুগত প্রমাণও পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। আবার ওই যুগে প্রাপ্ত প্রস্তরাস্ত্র প্রভৃতির দুই-একটিতে মৌর্য-যুগের ধ্বজস্তম্ভ বা 'লাট' এবং মৌর্য প্রস্তর-মূর্তির পালিশের অনুরূপ মসৃণ ও চিক্কণ পালিশ দৃষ্ট হয়। ওই পালিশ যদি প্রস্তরবিশেষের স্বাভাবিক পালিশ না হয় তাহা হইলে মৌর্য-যুগের ওই শিল্প-বৈশিষ্ট্য পূর্ববর্তী প্রস্তর-তাম্র-যুগের দান বলিয়া অনুমিত হইতে পারে।

অবসর-মতো ছোটোনাগপুরের প্রাগৈতিহাসিক কালের সমাধিস্থানগুলি ও আবাসস্থানের ধ্বংসাবশেষগুলি খনন ও অন্বেষণ করিয়া পুরাতন ও নূতন প্রস্তর-যুগের অস্ত্রশস্ত্র, অলংকার ও তৈজসপত্রাদিব কিছু কিছু নিদর্শন পাইয়াছি, তাহার অধিকাংশই পাটনার সরকারি জাদুঘরে রক্ষিত আছে।

পূর্বেই বলিয়াছি, তাম্র ও টিনের সংমিশ্রণে যে ব্রোঞ্জ ধাতু প্রস্তুত হয় ইউরোপে বিমিশ্র তাম্র-অস্ত্রের পরিবর্তে সেই ব্রোঞ্জের অস্ত্রাদিই বেশি পাওয়া যায়। টিনের খনি ভারতে তেমন বেশি নাই। সেইজন্য সম্ভবত ভারতে ব্রোঞ্জ-যুগের পরিবর্তে তাম্র-যুগ প্রচলিত ছিল। তবে ছোটোনাগপুরের এবং ভারতের অন্য কোনো কোনো স্থানে ব্রোঞ্জে নির্মিত তৈজসপত্র কিছু কিছু আবিষ্কৃত হইয়াছে। ছোটোনাগপুরে এমনকি একটি ব্রোঞ্জের কুঠার-ফলকও পাইয়াছি। ইহা বর্তমান পাটনার সরকারি জাদুঘরে আছে। ভারতের আর কোথাও ব্রোঞ্জের অস্ত্র আবিষ্কারের কথা আমার জানা নাই। যদি এগুলি সেকালে ভারতের বাহির হইতে আমদানি হইয়া থাকিত, তাহা হইলে ছোটোনাগপুরের সঙ্গে প্রাগৈতিহাসিক যুগে বহির্জগতের যোগ ছিল বুঝিতে হইবে। যদিও পাণ্ডবদের দিগ্বিজয়যাত্রার পথে ছোটোনাগপুরে সম্ভবত বাদ পড়িয়াছিল, তথাপি বাহিরের সঙ্গে ছোটোনাগপুরের যোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল এরূপ মনে হয় না।*

---

*বিগত ২২ কার্তিক (রাঁচি) হিন্দু ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব সাহিত্য সম্মিলনির বার্ষিক অধিবেশনে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ।

প্রবাসী ● মাঘ ১৩৪১ (১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ)



ধ্বংসোন্মুখ মুন্ডা জাতি

মোহাম্মদ মোদাব্বের

১৯৩১ সাল। নাগপুরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। কিন্তু এত দীর্ঘকাল পরে ভ্রমণ কাহিনি লিখিয়া পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি করিব না। অতএব পাঠকগণ---মাভৈঃ। কিন্তু ছোটোনাগপুরের যে এক অদ্ভুত জাতির সঙ্গে সামান্য পরিচয় হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে বলার কৌতূহল দমন করা দুঃসাধ্য। এ জাতিটা কোল ভিল জাতির সমশ্রেণির। জাতি-তাত্ত্বিকরা এদের কী নামে অভিহিত করেন জানি না---তবে সাধারণ ঐতিহাসিকগণের নিকট এরা মুন্ডাজাতি বলিয়া পরিচিত।

বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের এক নিভৃত অঞ্চলে মুন্ডাদের দেশ অবস্থিত। বহুকাল পূর্বে এই বংশের পূর্বপুরুষ, এক বৃদ্ধ ধর্মযাজক, ছোটো "হাদম" (মুন্ডাভাষায় "হাদম" অর্থ বৃদ্ধলোক) চুটিয়া গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন। সেই হইতে এই অঞ্চলটার নাম হয় "চুটিয়া" নাগপুর বা "চোট্টা" নাগপুর এবং পরে ছোটোনাগপুর।

মুন্ডারা এক অদ্ভুত জাতি। অতি প্রাচীন জাতিও বটে। মহাভারত ও ঋগ্বেদের যুগ হইতে এই জাতির অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। তাদের কালচার বা রীতিনীতির আভাসও ইহাতে মিলে। আমি এখানে তাহাদের জাতীয় ইতিহাস বিশ্লেষণ করিয়া পাঠকের ধৈর্যপরীক্ষা করিতে চাহি না। কেবল সংক্ষেপে তাদের প্রাচীন ও আধুনিক অবস্থার পরিচয় দিতে চাই। ছোটোনাগপুর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি। বিভিন্ন রংয়ের বিভিন্ন ধরনের পর্বত-শ্রেণি, স্বতঃউৎসারিত ঝরনা, সুন্দর ও ভীষণ শব্দায়মান জলপ্রপাত, দিগন্ত-বিস্তৃত জঙ্গল, স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া, প্রচুর খাদ্যদ্রব্যসম্ভার ও সর্বোপরি এখানকার কৃষ্ণকায় অর্ধউলঙ্গ পার্বত্য-জাতি এ দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে মহিমামণ্ডিত করিয়াছে। কিন্তু কালের প্রভাব এড়ানো মানুষের পক্ষে অসম্ভব। মুন্ডারাও কালের এ-প্রভাব এড়াইতে পারিতেছে না। ধীরে ধীরে তারা জাতীয় বৈশিষ্ট্য হইতে বিচ্যুত হইয়া বিজাতীয় ভাবধারার অনুসরণ করিতেছে। সুযোগ বুঝিয়া খ্রিস্টান ধর্ম-যাজকরা ছোটোনাগপুরকে উর্বর কৃষিভূমির ন্যায় ধর্মপ্রচারের একটা বিশিষ্ট কেন্দ্ররূপে

ব্যবহার করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে বিদেশি শোষণও আরম্ভ হইয়াছে। কলকারখানার উৎপাতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও নষ্ট হইতে বসিয়াছে। এক বৃদ্ধ অর্ধশিক্ষিত মুন্ডা সর্দারের সহিত দুর্বোধ্য-ভাষায়, মুখ হাত সঞ্চালন ও অভূতপূর্ব ইশারায় আলোচনা করিয়া বুঝিলাম যে, এদের বংশে জন্মসংখ্যা যেরূপভাবে কমিতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে আগামী দুই শতাব্দীর মধ্যে এ জাতির অস্তিত্ব ধরাবক্ষ হইতে লোপ পাইবে। যাহারা খ্রিস্টান পাদরিদের সংস্পর্শে আসিতেছে, তাহারাও জাতীয় বৈশিষ্ট্য হারাইয়া খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করিতেছে। খ্রিস্টান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা নিজদিগকে মুন্ডাজাতি বলিতে যেন সংকোচবোধ করে। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে, ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্টে দেখা যায়, মুন্ডাদের সংখ্যা ভারতবর্ষে প্রায় ৪৬৬৬৬৮ ছিল—ধর্মান্তরগ্রহণকারীদের বাদ দিয়া। বর্তমানে তাহাদের সংখ্যা বহুল পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। এ জাতির ভাগ্যে ধ্বংস যেন তাথৈ তাথৈ নর্তন শুরু করিয়াছে।

মুন্ডাজাতি কোনো জাতির এক বড়ো শাখা ; এবং দ্রাবিড় জাতির সঙ্গে এদের সামঞ্জস্য আছে। বহু জাতির ভাগ্যে যাহা ঘটে, ইহাদের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিয়াছিল—মধ্য ভারতে নোমাদদের (যাযাবর জাতির) হাতে অশেষ লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া ইহারা অবশেষে এই ছোটোনাগপুরে বাসা বাঁধে।

মুন্ডাদের জাতীয় রীতিনীতি বা কালচার বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে উহার মধ্যে উত্তর-ভারতের ভাব-বৈশিষ্ট্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। অনেকে বলেন, পঞ্চনদের সমতলভূমিই ছিল এদের আদিম বাসস্থান। আধুনিক ঐতিহাসিকগণও গবেষণার পর এই অনুমান সমর্থন করিতেছেন—এমনকি, সত্য বলিয়া স্বীকারও করিতেছেন। পাঞ্জাবে বসতি করার পূর্বে এরা যে কোথায় ছিল, তা বলা সহজ নহে। তবে এরা যদি বহির্ভারতের আমদানিই হয়, তাহা হইলেও একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, এরা কিছুকালের জন্য পাঞ্জাবে বসতি করিয়াছিল। ভারতে নব-আগন্তুক জাতি মাত্রই সাধারণত প্রথমে পাঞ্জাবে আসিয়াই বাসা বাঁধে।

ঐতিহাসিকগণ প্রমাণ করিতেছেন, মুন্ডারা যেখানেই থাকুক না কেন, প্রথমে পাঞ্জাবে আসে, তাহার পর উত্তরদিক হইতে ক্রমশ দক্ষিণদিকে বুন্দেলখন্দ ও মধ্য ভারতে সরিয়া আসে ; তৎপর পূর্ব-রাজপুতানা পার হইয়া আবার উত্তর-পশ্চিম ভারতে, এবং তথা হইতে বর্তমান রোহিলখন্দ এবং অযোধ্যা হইয়া বিহার এবং সর্বশেষে ছোটোনাগপুরে আসিয়া স্থায়ী আড্ডা করে। নাগপুরের জন-কোলাহল হইতে দূরে সরিয়া গিয়া ইহারা সুন্দর অসমতল ভূমি, সবুজ বৃক্ষাদি পরিপূর্ণ উপত্যকা ও সুদৃশ্য জলপ্রপাতের ধারে নির্জন নিরালায় নিজেদের বাসস্থান ঠিক করে। প্রকৃতি যেন স্নেহময়ী জননীর মতো বন-জঙ্গলরূপ আঁচল-ছায়ে ইহাদিগকে বাইরের আবহাওয়া হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছিল। বাহিরের সংস্পর্শ হইতে দূরে ছিল বলিয়াই তাদের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার এমনভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল যে, তাহা ওই প্রদেশের অন্য কোনো জাতির সহিত খাপ খাইত না। তবুও একথা অসংকোচে বলা যায় যে, কৃষিকার্যে তাহারা অতিশয় দক্ষ। নৈতিকতার ভিত্তিতে তাদের ধর্ম আর্যদের ন্যায় গঠিত হইয়াছিল। দর্শন ও সমাজ-বিজ্ঞানে তারা প্রাচীন আর্যদের চেয়ে কোনো অংশে কম যাইত না। বাহিরের সমস্ত সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়াও কুটিরশিল্পের তারা যেরূপ উন্নতিসাধন করিয়াছিল, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়-উৎপাদন করে। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও নব-সভ্যতার প্লাবনে তারা আজ ধ্বংসমুখী।

মাসিক মোহাম্মদী ● কার্তিক ১৩৪০ (১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ)



আসামের কুকি জাতি

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ সোমদ্দার

ভাদ্র মাসের প্রবাসীতে শ্রীলালতুদাই রায় মহাশয় "আসামের কুকিজাতি" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধে খ্রিস্টিয়ান মিশনারিদিগকে নিন্দা করা হইয়াছে—এই সম্বন্ধে আমার দুই একটি বক্তব্য লিখিতেছি।

লালতুদাই রায় মহাশয় 'অবাঙ্গালী' হইলেও লেখক-হিসাবে তিনি অপটু নন, এবং তাঁহার 'অনভ্যস্ত হস্তের' লেখাতেও তাঁহার মনোভাব যথাযথ প্রকাশ পাইয়াছে। রায় মহাশয় খ্রিস্টিয়ান ধর্মাবলম্বী কিনা জানি না, তবে তাঁহাকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বলিয়া মনে হয়—আর তিনি যে নিজে শিক্ষিত এজন্য তিনি নিশ্চয়ই দুঃখিতও নন।

খ্রিস্টিয়ান মিশনারিগণ যে ধর্মের প্রচার করিয়াছেন সেটা বাস্তবিকই প্রেমের ধর্ম। সকল ক্ষেত্রে মিশনারিগণ যথার্থ প্রেমিক না হইতে পারেন, কিন্তু যিশুখ্রিস্টের অতুলনীয় প্রেমের প্রেরণাতেই তাঁহারা খ্রিস্টধর্ম প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং এখনও করিতেছেন। প্রভু যিশুখ্রিস্টের প্রেম হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টিয়ান, সভ্য অসভ্য সকল জাতির কাছেই প্রচারিত, প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং প্রভু যিশুখ্রিস্টের এই আদেশ "তোমরা সমুদয় জগতে যাও, সমস্ত সৃষ্টির নিকটে সুসমাচার প্রচার কর।"

রায় মহাশয় কোন্ প্রেমের কথা বলিতেছেন? মিশনারিদের প্রেমে হাবুডুবু খাইবার দরকার নাই।

রায় মহাশয় নিজে বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ভূতের পূজা ঠিক নয়। তিনি ভূত, শয়তান এবং মারের যে তুলনা করিয়াছেন সেটা মোটেই ঠিক হয় নাই। ভূতের পূজা হয় ভূতকে

শান্ত রাখিবার জন্য, কারণ কুকিদের বিশ্বাস এই, ভূতের দ্বারাই জগতে রোগ, শোক, ঝড়, ভূমিকম্প ইত্যাদি হইয়া থাকে। ব্যাধি এবং নৈসর্গিক বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই ভূতকে মুরগি, মদ ইত্যাদি দিয়া শান্ত রাখিবার চেষ্টা করা হয়।

বৌদ্ধগণ মারের এবং মুসলমান ও খ্রিস্টিয়ানগণ শয়তানের পূজা করেন না, তাহাকে তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করেন না। যে বিরুদ্ধ কামনার বশবর্তী হইয়া আমরা পাপ করি, যে 'বিপক্ষ' আমাদিগকে বিবেকের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে, সেই শয়তানের হাত হইতে রক্ষা পাইবার ভয়েই যিশুখ্রিস্টের স্মরণ লইতে হয়।

"যিশু আমাকে কেমন সুন্দর জুতা দিয়াছেন, টুপি দিয়াছেন, কোট দিয়াছেন, সিগারেট দিয়াছেন" এই কথাগুলি শ্লীলতার সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে—ইহা কটূক্তি। 'সিট রিজার্ভ' কথাটাও না লিখিলেই ভালো হইত।

রায় মহাশয় বাঁশের চার্চ ও স্কুলের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি চার্চের উপর বিরূপ হইতে পারেন কিন্তু যে স্কুলে (মিশনারি স্কুল না হইতেও পারে) তিনি শিক্ষিত হইয়া আজ নিজের মনোভাব এই ভাবে প্রকাশ করিতে পারিতেছেন, এবং নিশ্চয়ই একটা আত্মপ্রসাদও লাভ করিতেছেন, সেই স্কুলগুলির দোষ কী? স্কুলগুলিতে হয়ত উপযুক্ত শিক্ষক না থাকিতে পারে, রীতিমত তত্ত্বাবধান না হইতে পারে—ওইগুলির উন্নতির চেষ্টা করিতে হইলে অন্যভাবে করাই প্রীতিকর।

(১) মিশনারিগণ হ্যাট, কোট, বুট পরিতেও বলেন না, সিগারেট পান প্রচলনের চেষ্টাও করেন না। শুধু শুধু ওই সমস্ত অভ্যাস না করিলেই হয়। আমাদের সবই খারাপ আর পাশ্চাত্যের যা-কিছু সবই ভালো একথা এ পর্যন্ত কোনো মিশনারি বলেন নাই, আর আমাদের সবই ভালো পশ্চিমের সবই খারাপ এও হইতে পারে না। খ্রিস্টিয়ান ধর্ম উদ্দাম বিলাসিতা শিখায় নাই। পোশাকের কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় উহা আমাদের নিজেদের দোষ।

পৃথিবীতে এককালে অর্থের তত প্রয়োজন ছিল না, তখন মানুষ অদলবদল করিয়া সংসার চালাইত। এখন আর সেদিন নাই, মানুষ বাহির হইয়া পড়িয়াছে, দেশ দেশান্তর যাইতেছে—অর্থের প্রয়োজনও বাড়িয়াছে। নিজেদের অভাব নিজেরাই বাড়াইয়া তুলিতেছি, অন্যকে দোষী করি কেন?

যেরূপ আগুনে হাত দিলে বাঘে খায় না, কিন্তু হাত পোড়ে, তদ্রূপ চুরি করিলে ভূতে রাগ করিবে এ ধারণা না রাখিয়া 'পাপ হইবে এবং ঈশ্বর শাস্তি দিবেন' এই সত্য উপলব্ধি করাই শ্রেয়।

খ্রিস্টধর্মের কোথাও এমন শিক্ষা নাই যে, "যিনি খ্রিস্টকে বিশ্বাস করেন, তিনি চুরি করুন, নানা অসৎ কাজ করুন, তাহাতে কোনো আপত্তি নাই, তার জন্য যে খ্রিস্টই দায়ী। তিনি তো তাঁর আসন স্বর্গে রিজার্ভ করিয়া রাখিয়াছেন, সুতরাং যাহা প্রাণ চায় করো, কেবল খ্রিস্টকে বিশ্বাস করিলেই হইল।"

খ্রিস্টকে যিনি বিশ্বাস করেন তিনি আব তাঁর ইচ্ছামত কাজ করিতে পারেন না, তিনি

তো খ্রিস্টের। খ্রিস্টকে ঈশ্বর-প্রেরিত ত্রাণকর্তা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া প্রাণপণে তাঁহার আদেশসমূহ পালনের চেষ্টা করা দরকার।

যে খ্রিস্টকে বিশ্বাস করে সে তাঁহার আদেশ পালনে যত্নবান হয়। কোনো মিশনারি কি কুকিদিগকে মিথ্যাকথা বলিতে, অসরল হইতে শিক্ষা দিয়াছেন? আত্মীয়কুটুম্বদিগকে গৃহে স্থান দিতে নিষেধ করিয়াছেন? খ্রিস্টধর্মের কোথাও তো এইপ্রকার শিক্ষা নাই।

(২) মেষের মাথা কাটিয়া বলদের স্কন্ধে দেওয়ার অর্থ কী?

রায় মহাশয় যদি মনে করেন, কুকি জাতি পূর্বে ধর্মহীন ছিল না, ইহার বিরুদ্ধে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। খ্রিস্টিয়ানদের ধর্মদানটি বাহ্যিক নয়,—আন্তরিক। বহু পূর্বকাল হইতেই পৃথিবীতে ধর্মপ্রচার পদ্ধতি বর্তমান আছে।

(৩) সাধারণত ইংরেজ পাদরিগণ বাংলার চেয়ে তাহাদের দেশীয় ভাষাই বেশি জানেন। যদি তাঁহারা পূর্বে বুঝিতে পারিতেন যে, কুকি জাতি বাংলা ভাষাকে নিজেদের ভাষা বলিয়া স্বীকার করিবে তবে হয়ত তাঁহারা কুকি জাতির জন্য বাংলা ভাষায় পুস্তক ছাপাইতে চেষ্টা করিতেন। এখন কুকি জাতির মধ্যে যাঁহারা শিক্ষিত হইয়াছেন তাঁহারা তো চেষ্টা করিলে নিজেদের জন্য একটা ভাষা সৃষ্টি করিতে পারেন, অথবা বাংলা ভাষায় জোর দিতে পারেন।

(৪) ঔষধ দেওয়াটা যে কীসে দোষের হইল তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। রোগ বৃদ্ধি এবং সুস্থ সবলকায় লোক কমিয়া যাওয়ার কারণ কি ঔষধ দেওয়া? গাছ-গাছড়া ব্যবহার করাটা অসভ্যতা নয়। টাকা খরচ করিয়া পেটেন্ট ঔষধ না কিনিলেই হয়। ঔষধ দেওয়ার উদ্দেশ্য বাস্তবিকই দরিদ্র ও অসহায় লোকের সাহায্য করা। "ঔষধ গলাধঃকরণের সঙ্গো সঙ্গো প্রভু যিশুকে একমাত্র পরিত্রাতা বলিয়া বিশ্বাস করা" কথাটি রায় মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া একটু ভাবিয়া দেখিবেন।

(৫) মদ বন্ধ হইয়াছে ভালোই, এখন সিগারেট বন্ধ করিবার চেষ্টা করা দরকার। যাঁহারা খ্রিস্টিয়ান নন, কোনোদিন মিশনারিদের সংস্পর্শে আসেন নাই এমন লক্ষ লক্ষ লোক আজ সিগারেট, চা ব্যবহার করিতেছেন।

"যিশুর ভাব পাইয়া ছেলেরা পিতামাতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে।" নিউ টেস্টামেন্টের এই কথার বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া যদি কোনো প্রচারক প্রচার করেন তবে তিনি ভুল করিতেছেন। যতদূর মনে হয় সে ভাবের প্রচার হয় নাই।

ব্যর্থ এবং নিষ্প্রয়োজন অনুকরণ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ময়ূর কখনও কাককে ময়ূর সাজিতে ডাকে না, কাক যদি নিজে ইচ্ছা করিয়া ময়ূর হইতে চায় তবে তাহাতে ময়ূরের দোষ দেওয়া যায় না, কাককেই নির্যাতিত ও হাস্যাস্পদ হইতে হয়।



পার্বত্য-চট্টগ্রামের

পাহাড়ি জাতির খাদ্যের উপকরণ*

শ্রীসরসীলাল সরকার

জীবন-সংগ্রামের জন্য খাদ্যসংগ্রহই প্রধান কার্য। নিম্নশ্রেণির জীবদের মধ্যে খাদ্যসংগ্রহই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। কী করিয়া পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং দ্রব্যাদি হইতে খাদ্যসংগ্রহ করিতে হয়, তাহাদের জীবনের সকল চেষ্টা প্রথমত তাহারই জন্য নিযুক্ত হয়। সুসভ্য মনুষ্য-সমাজে ব্যক্তিগতভাবে জীবনযাত্রা-নির্বাহ করিতে হয় না, প্রত্যেক ব্যক্তি সমাজের জন্য কিংবা সমষ্টির জন্য কার্য করে। তাহাদের প্রয়োজনীয় আহারাদির উপকরণ পাইবার পক্ষে সমাজের অপর লোকের সাহায্য পাইবার অনেক সুবিধা আছে। সভ্যসমাজে কোনো ব্যক্তি প্রয়োজনীয় কার্য করিয়া অর্থ উপার্জন করিলে, সেই অর্থ দ্বারা তাহাদের ইচ্ছামত ও সুবিধানুযায়ী সকল প্রকার আহার্য বস্তু কিনিতে পারে। ব্যক্তিগত চেষ্টা দ্বারা নিম্নশ্রেণির জীবগণের মতো তাহাদের প্রত্যেকটি আহার্য বস্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে সংগ্রহ করিতে হয় না। এইটি সভ্যতার সর্বপ্রধান সুবিধা, কিন্তু অসভ্য বা অর্ধসভ্য মনুষ্যদের মধ্যে এইরূপ সুবিধার অভাব পরিলক্ষিত হয়। তাহাদের আহার্য-বিষয়ের উপকরণগুলির মধ্যে অনেকগুলিকে নিজের ব্যক্তিগত চেষ্টা দ্বারা সংগ্রহ করিতে হয়।

আজকালকার পার্বত্য-চট্টগ্রামের আদিম অধিবাসীগণকে অসভ্যজাতি বলা যায় না। কিন্তু তাহাদের খাদ্যাদির উপকরণ-সংগ্রহ-বিষয়ে সমভূমির অধিবাসীগণের যতটা সুবিধা আছে, ততটা নয়। সমভূমির লোকেরা যেরূপ সুবিধামত দেশলাই কিনিতে পারে, এই পাহাড়ি জাতির পক্ষে সেরূপ সহজে দেশলাই ক্রয় করা সম্ভবপর নয়। এই সব পাহাড়ে

* পরিষদের ১৩২৮ দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

চকমকি পাথরের অভাব। কারণ, পাহাড়গুলি প্রধানত কর্দম হইতে উৎপন্ন (clay-stone)। সেইজন্য তাহারা চকমকি ঠুকিয়া আগুন উৎপাদন করিতে পারে না। এই সব অসুবিধার মধ্যে তাহারা আগুন উৎপাদন করিবার জন্য বাঁশে বাঁশে ঘসিয়া একটি নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। এইরূপে আগুন উৎপাদন করিবার বিবরণ ইতিপূর্বে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়* লেখক কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীরা রন্ধনের জন্য দগ্ধ মৃৎপাত্র (যেমন হাঁড়ি ইত্যাদি) প্রস্তুত করিতে পারে না। মাটির হাঁড়ি, বদনা, গেলাস প্রভৃতি অজস্র পরিমাণে চট্টগ্রাম হইতে পার্বত্য-চট্টগ্রামে বিক্রয়ের জন্য প্রেরিত হয়। পাহাড়িদের মধ্যে যাহারা সমৃদ্ধশালী তাহারা ধাতুপাত্র (যেমন—কড়াই, বগ্‌নো প্রভৃতি) কিনিয়া থাকে। পুরাকালে যখন চট্টগ্রাম প্রভৃতির সহিত পার্বত-চট্টগ্রামের বাণিজ্য-ব্যবসা আদান-প্রদান এত প্রচলিত ছিল না, তখনও পার্বত্য-চট্টগ্রামবাসীরা দগ্ধ-মৃৎপাত্র প্রস্তুত করিত না। বোধহয়, কঙ্কর-মিশ্রিত মৃত্তিকা কুমারের ব্যবসার উপযোগী ছিল না। সেজন্য পার্বত্য-চট্টগ্রামবাসীদিগকে রন্ধনের পাত্রের জন্য উপাদান সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল—তাহাও বাঁশ। এই বাঁশ দ্বারাই পার্বত্য-চট্টগ্রামবাসীদের ঘরকন্নার অধিকাংশ কাজই চলে। তাহাদের গৃহেব প্রত্যেক উপকরণ বাঁশ হইতে নির্মিত এবং ব্যবহার্য প্রত্যেক দ্রব্যই, এমনকি রন্ধনের পাত্র পর্যন্ত বাঁশ হইতে প্রস্তুত।

এখানে নানাপ্রকার বাঁশ জন্মে, তাহার মধ্যে ডলুবাঁশ নামে একপ্রকার বাঁশ আছে। ওই বাঁশ খুব ফাঁপা এবং ইহাদের গিঁটগুলি অনেক দূরে দূরে অবস্থিত ও চটা খুব পাতলা। এই বাঁশের এক একটি গিঁট কাটিয়া অনেকস্থলে তাহারা রন্ধনের পাত্রস্বরূপ ব্যবহার করে। অন্য বাঁশের গিঁটে রাঁধিলে খাদ্য কিছু তিক্ত বা কিছু বিস্বাদ হয়—এইরূপ তাহারা বলিয়া থাকে। কিন্তু ডলু বাঁশের গিঁটে রাঁধিলে তাহা হয় না।

লবণ আহারের জন্য একটি অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য। আজকাল পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীরা প্রায়ই বাজারের লবণ ব্যবহার করিয়া থাকে। পাহাড়ে 'নুনিয়া' নামে একপ্রকার গাছ আছে। পূর্বে পাহাড়িরা তাহা পোড়াইয়া, ছাই জলে গুলিত ; পরে বাঁশের চুঙ্গিতে ছেঁদা করিয়া সেই ছেঁদা তুলা দিয়া বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিত। তাহা হইলে যে পরিষ্কার জল বাহির হইয়া আসিত, সেই জল জ্বাল দিয়া শুকাইয়া লইলে, পরিষ্কার লবণ পাওয়া যাইত। একপ্রকার সিমগাছের ছাই এবং একরকম বাঁশের ছাই হইতেও লবণ পাওয়া যাইত। এখন সরকারের আইনে এসব উপায়ে লবণ তৈয়ারি বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

পাহাড়ে একপ্রকার কলাগাছ পাওয়া যায়—তাহার বাকলের রসের আস্বাদ ঠিক লবণের মত। এই রস তরকারিতে বেশ লবণাস্বাদ হইয়া যায়।

যদিও পাহাড়িজাতি সকলেই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বলিয়া প্রকাশ করে, তথাপি অনেকগুলি জাতির মধ্যে পোকা, ফড়িং হইতে হস্তী পর্যন্ত অধিকাংশ জীব আহার করিবার তাহাদের কোনো বাধা নাই। এই সব মাংস তাহাদের রন্ধন করিয়া বা পোড়াইয়া খাইতে হয়।

* ২৬শ ভাগ, ৩য় সংখ্যা।

বঙ্গদেশীয় জনসাধারণের মতো ভাতই তাহাদের খাদ্যের উপকরণ। কিন্তু, সমতলভূমিতে আমরা যেরূপে লাঙল দিয়া ভূমিকর্ষণ করিতে পারি, পাহাড়ে সেইভাবে কর্ষণ করার সুবিধা নাই। ওই স্থানে পাহাড়িদের জমি কর্ষণ করিবার নিয়ম এইরূপ—যেসব পাহাড়ে বড়ো বড়ো গাছ জন্মে, তাহাতে ঘাস কিংবা আগাছা জন্মে না। পাহাড়িরা এইরূপ পাহাড় বাছিয়া লয়। তাহারা বড়ো গাছগুলি কাটিয়া পাহাড়ের গা দিয়া গড়াইয়া ফেলিয়া দেয়। পরে সেই জমিতে যে শুষ্কপত্রাদি থাকে, তাহা অগ্নির দ্বারা পোড়াইয়া দেয়। পরে দা দিয়া খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া ধান, কার্পাস, তিল, মরিচ প্রভৃতি বুনিয়া দেয়। ইহাতে ধান্য প্রভৃতি বেশ জন্মে। পাহাড়ের উপরের এই খেতকে পাহাড়িরা 'জুম' বলিয়া থাকে।

পার্বত্য-চট্টগ্রামের কয়েকটি তরকারি প্রসিদ্ধ। যেমন—কচু, কুমড়া, সারফ (একরূপ ফুটি) ও চিনার (একরূপ কাঁকুড়) ; ইহা ছাড়া ঢেঁড়শ, পুঁইশাক—এই তরকারিগুলিও অল্পবিস্তর পাওয়া যায়। এই সবগুলি পুরাতনকালের তরকারি। আজকাল কপি, গাজর, শালগম প্রভৃতি অনেক প্রকার তরকারির চাষ সভ্য-পল্লিতে আরব্ধ হইয়া থাকে।

পাহাড়িরা ভ্রমণশীল জাতি এবং তাহাদের অন্যত্র ভ্রমণকালে খাদ্যদ্রব্য নিজে যাহা বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে, তাহা ছাড়া অন্য কিছু লইবার সুবিধা নাই। কোনো স্থানে যাইতে হইলে, আহারের উপকরণের মধ্যে শুধু চাউল লয় এবং একখানি ছোটো কাটারি সঙ্গে রাখে। তরকারি, হলুদ, লংকা প্রভৃতি পথেই সংগ্রহ করে। কাটারি দ্বারা প্যায়া বাঁশ কাটিয়া তদ্দারা আগুন জ্বালায় এবং ডলু বাঁশের গিট কাটিয়া তাহার একটির মধ্যে চাউল ও জল দেয় ও অন্য একটি লইয়া তাহার ভিতর তরকারি, হলুদ, লংকা ও জল দিয়া এবং পাতা দিয়া বাঁশের চোঙার মুখ বন্ধ করিয়া, আগুনের মধ্যে চতুর্দিকে ছাই দিয়া ঘিরিয়া, বাঁশগুলি বসাইয়া এরূপভাবে জ্বাল দিতে থাকে যে, ভাত ও তরকারি বাঁশের চোঙার মধ্যে সিদ্ধ হয়। এই বাঁশের চোঙা আগুনের তাপে ঠিক থাকে, পুড়িয়া কয়লা হইয়া যায় না।

"পাহাড়ি জাতির খাদ্যের উপকরণ" সম্বন্ধে আলোচনা

প্রবন্ধ পঠিত হইলে পর, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি. এ. মহাশয় এই প্রবন্ধের আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিলেন যে, তিনি একবার পার্বত্য-চট্টগ্রামে গিয়াছিলেন। সেখানকার ভূমির অধিকাংশই পর্বত-সমাচ্ছন্ন। সমতলভূমির সর্বত্রই প্রায় বাঁশের জঙ্গলে আবৃত। তথাকার (রাঙামাটির) অধিবাসীরা কৃষিকার্যের সুবিধার জন্য বর্ষার প্রাক্কালে পর্বতের সানুদেশগুলিতে সঞ্চিত বাঁশের পাতা ও কঞ্চিতে আগুন ধরাইয়া দিয়া, সমস্ত আবর্জনা পুড়াইয়া ফেলে ; পরিশেষে তাহাতে ধান্যাদি শস্যের বীজ বপন করে। ওইভাবে ২/৩টি পাহাড়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহারা কৃষিকার্য করিয়া থাকে। পার্বত্য-প্রদেশবাসীরা গৃহনির্মাণাদি সমস্ত প্রয়োজনীয় কার্যে বাঁশের ব্যবহার করিয়া থাকে। বাঁশের মাচা নির্মাণ করিয়া তাহাতেই শয়ন করে। বাঁশের নির্মিত একপ্রকার তাঁতে তাহাদের পরিধেয় বস্ত্রও বয়ন করিয়া থাকে। তাহারা সকলেই মাংসাশী। সর্ববিধ জান্তব খাদ্য তাহারা অনায়াসেই সংগ্রহ করিতে পারে। তন্মধ্যে

বন্য কুক্কুটের মাংসেরই প্রচলন অধিক। ওই জাতি অতিশয় সত্যপরায়ণ ও অতিথিপ্রিয়। অসময়ে ঋণ করিলে, নূতন ধান্য উৎপন্ন হইবামাত্রই তাহা পরিশোধ করে।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যভূষণ মহাশয় বলিলেন, "পার্বত্য-চট্টগ্রামের পার্বত্য অধিবাসীদের অনেকে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী, তথাপি তাহারা সকলেই মাংসভুক। তাহারা সাধারণত দুইটি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত—(১) খিউংথা, (২) তুংথা। খিউংথাদের সকলেই মগ ; পুরাতন আরাকান ভাষায় কথা বলে। তুংথা জাতিরা অত্যন্ত মাংসাশী ; প্রায় সকল প্রাণীর মাংসই তাহারা খাইয়া থাকে, তবে বন্যশূকরের মাংসভক্ষণ তাহাদের নিষিদ্ধ। মাছ খায় বটে, কিন্তু তাহা টাটকা অবস্থায় খায় না। শুকনো বা পচাইয়া খায়। খিউংথা জাতীয়েরা মাছ আদৌ খায় না।"

তৎপরে তিনি তাহাদের অবলম্বিত "জুম" প্রণালীর কৃষিকার্য ও তাহাদের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক বুঝাইয়া দিলেন।

অনন্তর সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর আই এস ও, এম বি, এফ সি এস মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে ধন্যবাদ করিলেন। তিনি ব্রহ্মদেশের পার্বত্যজাতির সহিত এই জাতির আচার-ব্যবহারের তুলনা করিলেন। ব্রহ্মদেশের লোকেরা বৌদ্ধ হইলেও প্রায় সকলেই মাংসাশী। পূর্বকালে তাহারা কোনো প্রাণীহত্যা করিয়া মাংস ভক্ষণ করিত না, এখন তাহা করে। পুঙ্গিরা সভ্য ব্রহ্মবাসীদিগের পুরোহিত ও শিক্ষক ; অধিকাংশ ব্রহ্মবাসী বালকেরা বিদ্যার্থী হইয়া পুঙ্গিদের গৃহে অবস্থান করে। এইপ্রকারে তাহাদের ব্রহ্মচর্যাশ্রম নির্বাহিত হয়। পার্বত্য-জাতিদিগের মধ্যে বিদ্যার আলোক এখনও প্রবেশ করে নাই। তাহাদের স্বভাব সাধারণ ব্রহ্মবাসী অপেক্ষা উগ্র এবং তাহারা অতিথি-বৎসল হইলেও প্রতিহিংসা-পরায়ণ। তাহাদের আচার-ব্যবহার অনেকাংশে চট্টগ্রামের পার্বত্য অধিবাসীদিগের অনুরূপ।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ● সন ১৩২৮ (১৯২১ খ্রিস্টাব্দ)



পাহাড়ি জাতির মধ্যে অগ্ন্যুৎপাদনের উপায়*

শ্রীসরসীলাল সরকার

সুসভ্য হউক, অসভ্য হউক, গৃহী হউক, বনবাসী হউক, সকল মনুষ্যের মধ্যেই জীবন ধারণের জন্য অগ্নির প্রয়োজন হইয়া থাকে। এ দেশে দিয়াশলাই আগমনের পূর্বে চকমকি প্রস্তবে লৌহ দ্বারা আঘাত করিয়া অগ্ন্যুৎপাদনের প্রথা প্রচলিত ছিল। গৃহীরা পূর্বে মালশায় করিয়া অগ্নি সংরক্ষণ করিতেন এবং গন্ধকের দিয়াশলাই ব্যবহার করিয়া জ্বালাইবার কার্য নির্বাহ করিতেন।

এই পার্বত্য চট্টগ্রাম দেশে (Chittagong Hill Tracts) বিলাতি দিয়াশলাই-এর ব্যবহার পাহাড়িদের মধ্যে অনেক পরিমাণে প্রচলিত আছে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই অগ্নি সংরক্ষণ করে এবং দরকার হইলে ইহা হইতেই অগ্নি প্রজ্বালন করে। কিন্তু দরকার হইলে ইহারা বাঁশে বাঁশে ঘর্ষণ করিয়া অগ্ন্যুৎপাদন করে, তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

একটি বাঁশের গিঁট কাটিয়া লইয়া, মধ্য হইতে চিরিয়া দুই ভাগ করিয়া ফেলা হয়। ওই গিঁটের এক অর্ধেক লইয়া, তাহার বাহির অর্থাৎ ত্বকের দিক দিয়া একটি অর্ধচন্দ্রাকার খাঁজ কাটিয়া লওয়া হয়। এই বাঁশের ভিতরেব গর্তের ঠিক মধ্যে, খাঁজের ঠিক নীচে চাঁছিয়া পাতলা করিয়া লওয়া হয়। সেখানে খুব পাতলা চাঁছনি ভিতর দিকে রাখিয়া দেওয়া হয়। তাহার পর আর আধখানা বাঁশ হইতে একটি বাঁশের চটা কাটিয়া লওয়া হয়। এই চটাটি কাটিবার সময় কিছু কারিকুরি করিয়া কাটা হয়—যাহাতে এই চটাটি এইরূপ মাপের হয় যে, যাহার গায়ে পূর্বে একটি খাঁজ কাটা হইয়াছে, সেই খাঁদে এই চটাটি ঠিক খাপ খাইয়া

* বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ২৫ বর্ষের ৪র্থ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

বসে। তাহার পর যে বাঁশের বাহির দিকে গায়ে খাঁজ কাটা হইয়াছে, সেটি পা দিয়া চাপিয়া ধরিয়া, সেই খাঁজে বাঁশের চটা লাগাইয়া, দুই হাত দিয়া এ-পাশ ও-পাশ করিয়া টানিতে হইবে। টানিতে টানিতে ক্রমশ খাঁজটি গরম হইয়া উঠিবে। তখন সেই খাঁজের ভিতর দিকে যেখানটা খুব পাতলা করিয়া লওয়া হইয়াছিল ও সরু বাঁশের চাঁচনি বসানো আছে, সেই স্থান ক্রমশ অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিবে এবং সরু বাঁশের চাঁচনিতে ধূম উঠিতে থাকিবে ও ক্রমশ তাহাতে আগুন ধরিয়া উঠিবে। তাহার পর পাহাড়িরা এই চাঁচনিতে ফুঁ দিয়া আগুন জ্বালাইয়া লয়। পরে সেই আগুন হইতে শুকনা কাঠ ধরাইয়া বেশ বড়ো আগুন করিয়া লয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে নানা প্রকারের বাঁশ দেখিতে পাওয়া যায় ,—তাহাদিগের মধ্যে তিনপ্রকার বাঁশ প্রধান ; তাহাদের নাম—ডলু, ওরা এবং প্যায়া। অগ্নি প্রজ্বলিত করিবার জন্য প্যায়া বাঁশ ব্যবহৃত হয়। আমার বোধ হয়, ইহার প্রধান কারণ এই যে, অন্য বাঁশ হইতে চটা তুলিয়া, খাঁজে বসাইয়া, এ-পাশ ও-পাশ করিয়া টানিতে প্রায়ই ভাঙিয়া যায়। কিন্তু প্যায়া বাঁশের চটা প্রায়ই সেরূপ ভাঙে না।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ● সন ১৩২৬ (১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ)



উত্তর-পূর্ব সীমান্তে

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

একুশ বৎসর পূর্বে যখন ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে গিয়াছিলাম, তখন আসামের পূর্ব প্রান্তের দৃশ্য অন্যরূপ ছিল, তখন ডিব্রুগড় হইতে তলপ পর্যন্ত রেল ছিল ; কিন্তু তলপ হইতে সদিয়া পর্যন্ত রেল খুলে নাই। কলিকাতা হইতে সদিয়া যাইতে হইলে গোয়ালন্দ হইতে চাঁদপুর পর্যন্ত স্টিমারে আসিয়া আসাম-বেঙ্গল রেল ধরিয়া অথবা রেলে কলিকাতা হইতে যাত্রাপুর বা ধুবড়ি পর্যন্ত আসিয়া স্টিমারে, ডিব্রুগড় যাইতে হইত। ডিব্রুগড় হইতে নৌকা করিয়া সদিয়া যাইতে হয়। এখনও কলিকাতা বা গোয়ালন্দ হইতে ডিব্রুগড় পর্যন্ত স্টিমার চলে, কিন্তু ডিব্রুগড় হইতে সদিয়া পর্যন্ত কালে-ভদ্রে স্টিমার চলিতে পাবে। রেলপথে চাঁদপুর হইতে তিনশুকিয়া বা তিনচুকিয়া পর্যন্ত এবং সেখান হইতে ডিব্রু-সদিয়া রেল লাইন ধরিয়া ১৯০৩ সালে তলপ পর্যন্ত যাওয়া যাইত। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে আমার শিক্ষক স্বর্গীয় ডাক্তার ব্লখ এই পথে সদিয়া আসিয়াছিলেন। তলপ হইতে ৯ মাইল গোরুর গাড়ি করিয়া সৈখোয়া গ্রামে আসিতে হইত। সৈখোয়া একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। এখন মাকুম হইতে রেলপথ বাড়াইয়া সৈখোয়া ঘাট পর্যন্ত আনা হইয়াছে। সৈখোয়া এখন হঠাৎ বড়ো গ্রাম হইয়া পড়িয়াছে এবং অনেক মাড়ওয়ারি ব্যবসাদাব দোকান খুলিয়াছেন। সৈখোয়া এখন ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র। ইহার পরপারে সদিয়া অবস্থিত। ইংরেজ রাজ্যের পূর্বদিকে সদিয়া একটি প্রধান বাজার বা গঞ্জ। ইংরেজ রাজ্যের পূর্ব, উত্তর-পূর্ব এবং উত্তর সীমান্তে যতগুলি দেশ আছে তাহার বাণিজ্য ওই সদিয়া দিয়া ভারতবর্ষে সাধিত হয়। সদিয়া এখন একটি ছোটোখাটো নগর, এখানে একটি বড়ো বাজার আছে। ইংরেজ রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের রক্ষক বা পলিটিক্যাল এজেন্ট এই সদিয়া নগরে বাস করিয়া থাকেন। ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরে ইংরেজের রাজ্য যতদূর

বিস্তৃত তাহা ওই পলিটিক্যাল রাজা-সাহেবের অধীন। মধ্যযুগে আসাম যখন আহম জাতি কর্তৃক বিজিত হইয়াছিল তখনও সদিয়া আসাম রাজ্যের সীমান্তে ছিল। আহম জাতীয় একজন সেনাপতি এই সদিয়ায় বাস করিয়া উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রক্ষা করিতেন। তাঁহার উপাধি ছিল "সদিয়া খোআ গোঁহাই"। আসামের আহম রাজারা দুর্বল হইয়া পড়িলে মিরি, খামতি প্রভৃতি পার্বত্য জাতি সদিয়া প্রদেশ জয় করিয়াছিল এবং তখন হইতে ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ বিজয় পর্যন্ত এইসমস্ত পার্বত্য জাতির প্রধানেরা "সদিয়া খোঁয়া গোঁহাই" উপাধি ব্যবহার করিত।

এদেশের ঘরবাড়ি নূতন ধরনের। এখন জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ি অঞ্চলে এই রকমের ঘরবাড়ি তৈয়ার হইয়া থাকে। সাপ অথবা হিংস্র জন্তুর ভয়ে এই সমস্ত ঘরবাড়ির মেঝে জমি হইতে অনেক উচ্চ। দূর হইতে দেখিলে দ্বিতল বলিয়া ভ্রম হয়, কিন্তু এই সকল ঘরবাড়ির প্রথম তলা একেবারে খালি। ব্রহ্মপুত্রের তীরে সৈখোয়া ঘাটে যে সরকারি ডাক-বাঙলা আছে তাহা দেখিলেই এই নূতন ধরনের বাড়ি কীরকমের তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। নিজ সদিয়াতে সরকারি বাড়ি অনেকগুলি এইরকমের ; তবে এখন যে-সমস্ত ঘর-বাড়ি তৈয়ারি হইতেছে তাহা বাঙ্গালা অথবা আসাম দেশের মতো অর্থাৎ তাহার মেঝে মাটি হইতে অনেক উচ্চে নহে। সৈখোয়া ঘাট হইতে সদিয়া যাইতে হইলে জলপথে তিন চারি মাইল যাইতে হয়। ব্রহ্মপুত্র এখানে ছোটো নদ এবং কলিকাতার গঙ্গা হইতে অধিক চওড়া। তবে গ্রীষ্ম ও শীতকালে ইহাতে অধিক জল থাকে না এবং বড়ো বড়ো স্টিমার ডিব্রুগড় হইতে এতদূর আসিতে পারে না। নদ বক্ষে বড়ো চড়া পড়িয়া গিয়াছে এবং পদ্মার চরের মত তাহার দুই-একটিতে চাষ-আবাদ হইতেছে। এদেশে আমাদের দেশের মতো বড়ো নৌকা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। আসামের নৌকা দেখিতে অনেকটা কলিকাতার দক্ষিণের শালতি অথবা ডোঙার মতো। আমিনগাঁও অথবা গৌহাটি হইতে জলপথে কামাখ্যার মন্দিরে যাইতে হইলে এইরূপ নৌকা বা শালতি করিয়া যাইতে হয়। সৈখোয়া ঘাটে বা সদিয়ায় যে-সমস্ত শালতি দেখিলাম, তাহার মধ্যে অনেকগুলি কাঠের ডোঙা বা Dugout। একটি বড়োগাছ হইতে এক-একখানি নৌকা কুঁদিয়া বাহির করিতে হয়। ইহার মুখ বা গলুই নাই। সম্মুখে একজন ও পিছনে একজন দাঁড় বা বাঁশের লগি লইয়া এই জাতীয় নৌকায় থাকে। এই নৌকার উপরেই ছই বাঁধিয়া যাত্রী লইয়া যাওয়া হয়। ভারী জিনিস লইয়া যাইতে হইলে এই জাতীয় দুইখানি নৌকা পাশাপাশি বাঁধিয়া মাঝখানে ভার চাপানো হইয়া থাকে। সদিয়া হইতে এই জাতীয় নৌকা চড়িয়া ব্রহ্মপুত্রে উজান বাহিয়া পাঁচিশ ত্রিশ ক্রোশ পর্যন্ত যাওয়া যায়।

অতি পূর্বকালে, কতপূর্বে তাহা এখনও স্থির করিয়া বলা যায় না, এই অঞ্চলে হিন্দুর বাস ছিল। ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরে হিমালয়ের পাদমূল পর্যন্ত যে বিস্তৃত উর্বর ভূমি আছে তাহার মধ্যে অনেক স্থানে প্রাচীন হিন্দুধর্মের চিহ্ন মাঝে মাঝে আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। সদিয়া হইতে পাঁচিশ ত্রিশ ক্রোশ উত্তর-পূর্বে পরশুরাম কুণ্ড অবস্থিত। আমি যখন প্রথম সদিয়ায় গিয়াছিলাম তখন ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীর হইতে হিমালয়ের পাদমূল পর্যন্ত সমস্ত প্রদেশটি ঘন জঙ্গলে আচ্ছন্ন ছিল। পরশুরাম-কুণ্ডের পথ তখনও অত্যন্ত দুর্গম ছিল। সে

পথ কীরকম দুর্গম ছিল, তাহা যাঁহারা মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদের ভ্রমণ কাহিনি পড়িয়াছেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন। এই ভ্রমণ কাহিনি দশ পনেরো বৎসর পূর্বে কোনো বাঙ্গালা মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে কি না বলিতে পারি না। পরশুরাম-কুণ্ডের পথ এখন অত্যন্ত সুগম। সদিয়া হইতে বহুদূর পর্যন্ত ইংরেজ সরকার সুন্দর রাস্তা তৈয়ারি করাইয়া দিয়াছেন, মোটরে চড়িয়া পরশুরাম কুণ্ডের নিকটে পৌঁছানো যায়। ২৩ বৎসর পূর্বে আমার শিক্ষক স্বর্গীয় ডাক্তার ব্লখ আসাম সরকারের আদেশে এই সদিয়া হইতে যখন তাম্রেশ্বরী মন্দির দেখিতে গিয়াছিলেন তখন অনেক হাতি ও লোক লইয়া তাঁহাকে জঙ্গাল কাটিয়া পথ পরিষ্কার করিয়া যাইতে হইয়াছিল। এখন তাম্রেশ্বরীর পথ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। তাম্রেশ্বরীর মন্দিরটি কিন্তু পরশুরাম-কুণ্ডের ন্যায় পুরাতন নহে। ইহা সম্ভবত আহম রাজাদের সময়ে তৈয়ারি হইয়াছিল। ইহা এখন পড়িয়া গিয়াছে এবং ইহার অনেকগুলি ক্ষোদিত ইষ্টক প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কাশীনাথ নারায়ণ দীক্ষিতের যত্নে কলিকাতার মিউজিয়ামে আনা হইয়াছে। এইসমস্ত খোদিত ইষ্টক দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পাবা যায় যে, যে-সময়ে শিবসাগরে জয়সাগরে আহম রাজাদের মন্দির তৈয়ারি হইয়াছিল তাম্রেশ্বরী মন্দিরও সেই সময়ে তৈয়ারি হইয়াছিল। জঙ্গালের ভিতরে অনেক জায়গায় পাথরের মন্দিরেব ধ্বংসাবশেষ ও মূর্তি আছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু এখনও সে-সমস্ত স্থানে পৌঁছিতে পারা যায় নাই।

সদিয়া নগরে চারিদিক হইতে পার্বত্য বর্বরেরা জিনিসপত্র বিক্রয় করিতে আসে। মিশমিদিগের তুলার কম্বল সদিয়া ও সৈখোয়া হইতে ডিব্রুগড় পর্যন্ত সমস্ত গ্রামেই পাওয়া যায়। মাড়ওয়ারি বণিকেরা এই তুলার কম্বল প্রচুর পরিমাণে খরিদ করিয়া থাকে। এই কম্বল নূতন জিনিস, মোটা সুতার কাপড়ের উপরে কাঁচা তুলা লম্বা করিয়া পাকাইয়া বসাইয়া দেওয়া হয়। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে কাশ্মীরের উত্তরে গিলগিটে এই জাতীয় পশমের কম্বল তৈয়ারি হইতে দেখিয়াছিলাম। গিলগিটের যে-জাতি এই জাতীয় কম্বল তৈয়ারি করে, তাহারা বুরুশাস্কি বা বুরুশেস্কি নামক এক ভাষা ব্যবহার করে। এই ভাষার সহিত পৃথিবীর অন্য কোনো ভাষার সম্বন্ধ পণ্ডিতেরা এখনও নির্ণয় করিতে পারেন নাই। ১৩৩১ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে একটি আবর যুবা ও আবর মহিলা জিনিসপত্র বিক্রয় করিতে সদিয়ায় আসিয়াছিল। আমাদের একজন সঙ্গী আবর ভাষা বুঝিতেন। তাঁহার সাহায্যে এই আবর যুগলের ফোটোগ্রাফ তুলিবার অনুমতি পাওয়া গেল। পুরুষটির অঙ্গে তিন খণ্ড বস্ত্র ছিল—(১) কৌপীন, (২) একটি ছোটো জামা এবং (৩) তাহার উপরে একটি বড়ো জামা। তাহার মস্তকে একটি পুরাতন বিলাতি হ্যাট এবং গলা হইতে কাঁচা চামড়ার খাপে ঝোলানো একখানি দা। মহিলাটির অঙ্গেও তিনখণ্ড বস্ত্র তাহাব মধ্যে দুই খণ্ড ধুতি বা শাড়ি এবং তৃতীয় খণ্ড একটি ছোটো জামা। মহিলাটির গলায় একটি মানুষের হাড়ের মালা এবং বাঘের মুখ ও রূপার সিকি-দুয়ানি দিয়া তৈয়ারি একটি হার। ইহারা মৃগনাভি ও চর্ম বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল এবং নদীতীরে নিজেদের তৈয়ারি ছাতার তলে রাত্রি-বাস করিত। অনেক খোসামোদের পরে মহিলাটির বস্ত্র দুইখানি ও পুরুষটির দা খরিদ করা গেল। মহিলাটি বস্ত্র দুই খণ্ডের পরিবর্তে একটি রঙিন জাপানি কিমোনো ও নীল রং-এর

Bathmat তোয়ালে গ্রহণ করিলেন। একখানি জার্মানির বড় ছুবির পরিবর্তে যুবকের দা-খানি পাওয়া গেল। শুনিতে পাওয়া গেল যে, আবরেরা এখনও ইংরেজ সরকারের টাকা-পয়সা লইতে চাহে না ; পন্যের বিনিময়ে মাড়ওয়ারি বণিকদের নিকট হইতে লবণ, কাপড়, ছুরি, কাঁচি, কুঠার প্রভৃতি অস্ত্র লইয়া যায়। ফিরিবার সময় পথে একদল নাগার সহিত দেখা হইল। ইহারা আঙ্গামি নাগা এবং দক্ষিণ-পূর্ব হইতে নামরূপ হইয়া কাঁচা ও শুষ্ক লংকা বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল। এইসকল নাগারা বাঙ্গালা ও আসামি বুঝিতে পাবে এবং তরকারি, চামড়া প্রভৃতি বিক্রয় করিতে ইংরেজ রাজ্যে আসিয়া থাকে। ইহাদিগেব মধ্যে দুইজনের হাতে যে বর্শা বা বল্লম ছিল তাহা মানুষ মারিবার বল্লম (head hunting spear)। নাগাদের দা নূতন রকমের। একটি ছোটো লাঠির ডগায় একখানি চওড়া দা বসানো হইয়া থাকে। নাগারা ইংরেজ সরকারের টাকা-পয়সা লইতে কোনোই আপত্তি করিল না এবং কিছুক্ষণ দর-কষাকষি করিয়া বল্লম দুইটি ও দা দুইখানি বিক্রয় করিল।

ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর তীরে ভূখণ্ডে এখনও ঘন জঙ্গাল আছে। এই জঙ্গাল পার হইয়া হিমালয়ের পাদমূলে পৌঁছিতে হয়। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে আবর যুদ্ধে যাঁহারা গিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু প্রাণীতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ ডাক্তার শ্রীযুক্ত কেম্প (S. W. Kemp) অনেক দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহার মুখেই শুনা গিয়াছিল যে, বরবা পদম আবরদের দেশে এখনও টাকা-পয়সা চলে না। ছোটো বা বড়ো কাঁসার বাটি সময়ে-সময়ে বিনিময়ের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডাক্তার কেম্প আবব দেশ হইতে চারি পাঁচটি এইরূপ কাঁসার বাটি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া কলিকাতা মিউজিয়মে উপহার দিয়াছেন। ইংরেজ রাজ্যের লক্ষ্মীমপুর জেলা পার হইয়া উত্তর-পূর্ব সীমান্ত প্রদেশে যাইতে হয়। ইংরেজের অধীন সীমান্ত প্রদেশের উত্তর ভাগে জঙ্গালের ভিতরে পথ-ঘাট একেবারেই নাই। স্থানে স্থানে নদীর উপরে মানুয পার হইবার জন্য বাঁশেব সেতু তৈয়ারি হইয়াছে বটে, কিন্তু নদীতে বান আসিলে বাঁশের সেতু ভাঙিয়া যায়, তখন আবরেরা নদীর এপার হইতে ওপাব পর্যন্ত একটা মোটা দড়ি টাঙাইয়া দেয় এবং পথিকদিগকে সেই দড়িতে ঝুলিয়া ঝুলিয়া পার হইতে হয়। পথ অনেক সময়ে পর্বতের গা দিয়া, কিন্তু অতিবৃষ্টির সময়ে পর্বত ধসিয়া পড়ে ; তখন আবরেরা সেই অংশে বাঁশ দিয়া সেতুর মত একটা রাস্তা করিয়া দেয়। এই অস্থায়ী বাঁশের পথে পার্বত্য জাতি ভিন্ন অপরের চলা কঠিন। জঙ্গাল পার হইয়া হিমালয়ের পাদমূলে পৌঁছিলে মনে হয় যেন অমরাবতীতে আসিয়া পড়িলাম। এই দেশের দৃশ্য অতি সুন্দর। প্রত্যেক পর্বতে চারিদিকে অসংখ্য গিরি-নদী, তাহাদের তীরে অল্প বন, স্থানে স্থানে অল্প-পরিসর উপত্যকা এবং এইসকল উপত্যকায় আবরদিগের বাস। গ্রীষ্মে ও বর্ষায় পর্বতের সানুদেশের বনরাজি সহস্র বর্ণের অসংখ্য পুষ্পে আবৃত হইয়া থাকে, দূরে চিরতুষারমণ্ডিত অভ্রভেদী হিমালয়। দূর হইতে দেখিলে মনে হয় যেন যক্ষগণ তুষারকান্তি দেবাদিদেবের চরণে পারিজাত-মালা অর্পণ করিয়া গিয়াছেন।



ভারতে অনার্যদিগের মধ্যে বিবাহপদ্ধতি

দক্ষিণ ভারতে অনার্য জাতিগণের মধ্যে অনেক প্রকার অদ্ভুত বিবাহ পদ্ধতি প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাদের সকল শ্রেণির মধ্যেই 'তলু' 'বট্টু' (একপ্রকার হাঁসুলি বা গলার হার) জিনিসটি বিবাহ কর্মের অপরিহার্য উপাদান বলিয়া গণ্য। অনেক ইয়ুরোপবাসী হয়তো শুনিয়া আশ্চর্য হইবেন যে তাঁহাদের ন্যায় ইহাদের মধ্যেও নববিবাহিত যুগলের পশ্চাতে চাউল ছড়াইবার রীতি প্রচলিত। কুরুম্বা (Kurumba) বা রাখাল জাতির মধ্যে বিবাহকালে কন্যা অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া রাখে। চাষারা যেরূপ শারীরিক সুচিহ্ন দেখিয়া পশু ক্রয় করে ইহারাও সেইরূপ কন্যার অঙ্গের কোনো সৌভাগ্য চিহ্ন দেখিলে তাহাকে পত্নীরূপে মনোনীত করে। যানদীস (Yanadis) নামে নেলোরের এক বন্য জাতির মধ্যে পুরুষ বা নারী পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হইবার পূর্বে বিবাহ করিতে পায় না। বর কনের ডান পা-র উপর তাহার ডান পা রাখিয়া তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবার অঙ্গীকার করে এবং কনের কণ্ঠে 'তলু' বাঁধিয়া দেয়। তাহারা দুইজনে পরস্পরের মাথার উপর চাউল নিক্ষেপ করে। ইহার পর দেবতার পূজা সমাপ্ত হইলেই বিবাহ কর্ম সমাধা হইল।

'কোরাবার' নামে আর এক অর্ধসভ্য চোর জাতি আছে, তাহাদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত। কাহারও পত্নী ইচ্ছামাত্রেই তাহাকে ত্যাগ করিয়া অপর পুরুষকে পতিত্বে বরণ করিতে পারে। ইহাতে তাহাদের মধ্যে কোনো নিন্দা নাই। বর কন্যার পিতার নিকট এক ভাঁড় 'তাড়ি' উপঢৌকন দিতে পারিলেই কন্যার পাণিগ্রহণ সিদ্ধ হইয়া যায়। বিবাহ বন্ধন ইহাদের মধ্যে বড়োই শিথিল।

'সাগালি' নামে আর এক জাতি আছে তাহারা পাখি ধরিয়া খায়। ইহাদের মধ্যে বর তাহার ভাবী শ্বশুরকে দুই একটি গো মেষ ও কিছু টাকা দিতে পারিলেই তাঁহার কন্যার কণ্ঠে 'তলু' বাঁধিয়া দিতে পারে অর্থাৎ তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে পারে। বিবাহের

পর তৃতীয় দিনে কনে তাহার স্বামীর বাটিতে গমন করে। যাইবার সময়ে সম্মুখে একটি ষাঁড় রাখিয়া চলে।

যোগী নামে আর একটি বন্যজাতি বিবাহকালে ১২টি খুঁটি পুঁতিয়া একটি খোঁয়াড় প্রস্তুত করে। বরকনে উভয় পক্ষের নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে একটি করিয়া মেষ ও মাটির ভাঁড় উপহার দেয়। যে এরূপ উপহার দিতে অক্ষম হয় তাহার হাতের চেটোয় তিন ঘা করিয়া বেত্রাঘাত করা হয়। পরে তাহার কিছু অর্থ দণ্ড করিয়া তাহার মাথার উপর ময়লা জল ঢালিয়া দেওয়া হয়। ইহাদের মধ্যে কনের কণ্ঠে 'বট্টু' বাঁধিবার পূর্বে বর একটি বিড়ালির কণ্ঠে বট্টু বাঁধিয়া দেয়। এরূপ করার যে উদ্দেশ্য কী তাহা তাহারা নিজেই জানে না। তামিল চামারেরা 'অভরম' গাছকে বিশেষ ভক্তি করে। এই গাছের ছালে তাহারা চামড়া পরিষ্কার করে। ইহারা প্রথমে 'অভরম' গাছের ডালে একটি 'বট্টু' বাঁধিয়া পরে কনের কণ্ঠে 'বট্টু' পরাইয়া দেয়। 'পলয়ক্করণ' নামে একপ্রকার ব্যাধ জাতি জম্বু বৃক্ষকে বিশেষ ভক্তি করে। বিবাহের প্রথম দিনে ইহারা একটি জম্বু শাখাকে ধূপধুনা, দুগ্ধ ও ঘৃত দ্বারা পূজা করে। অবশেষে এই বৃক্ষজড়িত লতা লইয়া বর বিবাহ মঞ্চের প্রত্যেক খুঁটিতে তাহা জড়াইয়া দেয়। দ্বিতীয় দিনের প্রাতঃকালে বিবাহিত যুগল গ্রামের বাহিরে কোনো পিঁপড়ার ঢিবির নিকট যাত্রা করে। তাহার উপর দুধ ও ঘি ঢালিয়া ঝুড়ি করিয়া সেই কাদা গৃহে লইয়া আসে। বর সেই কাদায় ১২টি প্রদীপ গড়িয়া ১২টি স্তম্ভের উপর জ্বালিয়া দেয়। তৃতীয় দিনে বর তাহার আত্মীয়গণের সহিত গ্রামের বাহিরে এক মাঠে গিয়া কতকটা ভূমি লাঙল দিয়া কর্ষণ করিয়া সেইস্থানে শস্যের বীজ বপন করে। 'কাম্মাভারো' নামে একপ্রকার তেলেগু কৃষকজাতি পুরাকালে শত্রুগণ কর্তৃক তাড়িত হইয়া হইয়া 'ঢল' বনেব ভিতর লুকাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল। তাহারা সেই জন্য এখনও পর্যন্ত বিবাহকালে সামিয়ানার উত্তর দিকের খুঁটিতে 'ঢল' গাছের পাতা বাঁধিয়া রাখে।

'মলয়ালি' নামে একপ্রকার পার্বত্য জাতি পশ্চিম ঘাটের 'জবাদি' পর্বতে বাস করে। ইহাদের মধ্যে বিবাহ প্রথা অতি অদ্ভুত। পুরোহিত কনের কণ্ঠে 'তলু' বাঁধিয়া দিবার পর বিবাহিত যুগলের কোলের উপর একখানি তরবারি রাখিয়া দেওয়া হয়। কনের পিতার নিকট কন্যাদানের সম্মতি গ্রহণের পূর্বে বরকে অন্তত এক বৎসর কনের বাড়িতে কর্ম করিতে হয়। অনেক সময়ে যুবতি পিতার সম্মতি লাভের আশায় অপেক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া যুবকের সহিত পলাইয়া যায় বা যুবক যুবতির রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বলপূর্বক ধরিয়া লইয়া পলায়ন করে। বর এরূপ করিলে তাহার এই অন্যায় ব্যবহারের জন্য শাস্তি ভোগ করিতে হয়, যথা মুখে রং মাখিয়া, ভাঙা হাঁড়ি, জঞ্জাল বোঝাই ঝুড়ি বা ভাঙা জানালা মাথার উপর রাখিয়া তাহার পথে চলিতে হয়। ইহাদের মধ্যেও বিবাহবন্ধন অতি শিথিল। ইহারা পর্বতের গুহ্যতম প্রদেশে একটি প্রস্তরের কালীমূর্তি স্থাপন করিয়া পূজা করে। তথায় বাহিরের কাহারও তো যাইবার সম্ভাবনা নাই-ই, তাহাদের স্ত্রীলোকগণ পর্যন্ত তথায় প্রবেশ করিতে পায় না।

'বয়া' নামে আর একপ্রকার জাতি আছে। তাহারা পূর্বে ব্যাধ ছিল। বিবাহকালে ইহারা বরকনের হাতে লোহার বালা পরাইয়া দিয়া কৃষ্ণ মেষের লোমে দুই জনের হাত বাঁধিয়া

দেয়। কন্যার কণ্ঠে 'তলু' পরানো তো আছেই। ইহাদের মধ্যে বিবাহিতা স্ত্রীলোকেরাই কালো রঙের বালা পরে।

দক্ষিণ ভারতে 'দেবদাসী' নামপ্রাপ্ত স্ত্রীলোকগণ আমরণ অবিবাহিতা থাকে ও দেবালয়ে নর্তকীর কার্য করে। ইহাদের একটি তরবারির সহিত বিবাহ হইয়া থাকে। যে দেবতাকে ইহারা দাসীরূপে সেবা করে তাঁহারই পত্নীরূপে গণ্য হয়। বিবাহিতার চিহ্নস্বরূপ ইহারা কণ্ঠে 'বট্টু' ব্যবহার করে।

চট্টগ্রামে চাকমাজাতির বিবাহ পদ্ধতি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাস তাঁহার চাকমাজাতির ইতিহাসে যাহা লিখিয়াছেন তাহাও অতিশয় কৌতুকাবহ। ইহাদের মধ্যে মামাতো পিসতুতো ভাই-ভগিনীর মধ্যে পাণিগ্রহণ প্রচলিত, কিন্তু শ্যালিকার সহিত বিবাহ কদাচ পরিদৃষ্ট হয় না। পরিত্যক্তা ও বিধবা স্ত্রীলোকদিগকে দেবরেরাও বিবাহ করিতে পারে।

বিবাহ ইহাদিগের সচরাচর পঞ্চবিধ যথা,—অভিভাবকগণের প্রস্তাবানুসারে—১। বলপূর্বক বিবাহ ২। বড়ো বিবাহ ৩। গৃহজামাতা আনয়ন ৪। এবং মনোমিলনে পরিণয় ৫। এতন্মধ্যে প্রথম ও শেষোক্ত শ্রেণির বিবাহ সমধিক প্রচলিত।

পুত্র বিবাহের উপযুক্ত হইয়াছে দেখিলে পিতামাতা অপরাপর নিকট আত্মীয়দিগের সহিত "তাইন্‌মাং" (পরামর্শ) করিয়া পাত্রী অনুসন্ধান করিতে থাকে।

তাহাদের মনোমত কন্যার সমাচার পাইলে কোনো কোনো সময় পুত্রকেও প্রকারান্তরে তাহার মত জিজ্ঞাসা করা হয়। অনন্তর প্রস্তাবনার নিমিত্ত কন্যার পিত্রালয়ে বরের পিতাকে যাইতে হয়। পিতা না থাকিলে অন্য কোনো অভিভাবক গমন করেন। প্রথম বারে মদ, পানসুপারি এবং কয়েকবিধ মিষ্টান্ন লইয়া যাওয়াই বিধি। পরন্তু কখনোই কলা লইয়া যাইতে নাই ; তাহাতে বিফল মনোরথ সর্ববাদীসম্মত। নিতান্ত সাবধানে বিবাহের প্রস্তাব প্রথমে উত্থাপিত করা হয়। পাত্রের পিতা বলে—"তোমার ঘরের নিকট একটি মনোহর বৃক্ষ জন্মিয়াছে, আমি তাহার ছায়াতে একটি চারা রোপণ করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইতে চাহি।" ইহা হইতেই কন্যার পিতা মূলকথা বুঝিয়া লয়। যাতায়াতের সময় উভয় পক্ষই অতি সাবধানে শুভাশুভ লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখে। কেন-না, সম্পূর্ণরূপে স্থিরীকৃত এমন অনেক বিবাহ কুলক্ষণ দ্বারা ভাঙিয়া গিয়াছে। যদি কোনো স্ত্রী কিংবা পুরুষকে মোরগ, জল বা দুগ্ধ লইয়া দক্ষিণ পার্শ্বে যাইতে দেখা যায়, তবে লক্ষণ—শুভ। কিন্তু চিল কি শকুনি দেখা গেলে, অথবা কোনো কাক যদি বামপার্শ্বে বসিয়া ডাকিতে থাকে, তাহা অশুভ লক্ষণ বলিয়াই কথিত হয়। যদি তাহারা পথে আসিতে কোনো জীবজন্তুর মৃতদেহ দেখিতে পায়, তবে আর একপদমাত্র অগ্রসর হয় না, এবং সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় আয়োজনও বন্ধ করিয়া দেয়।

এ স্থলে ইহাও বলিয়া রাখা উচিত, "ছাদং"-এর সময় অর্থাৎ আষাঢ় পূর্ণিমা হইতে আশ্বিনের পূর্ণিমার মধ্যে বিবাহের কোনোরূপ প্রস্তাব উপস্থিত করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

দ্বিতীয়বারেও প্রথমবারের ন্যায় অধিকন্তু পিষ্টক, মোরগ প্রভৃতি উপঢৌকন লইয়া বরের পিতা পুনরায় উপস্থিত হয়। এ যাত্রায় উভয় পক্ষের সুবিধা অসুবিধা বিবেচিত হইয়া থাকে। অনন্তর তৃতীয়বারে পণ ধার্য করা হয়। সাধারণত ৫০/৬০ তোলা রূপার গহনা এবং ১০০/১২০ টাকা পর্যন্ত কন্যার পণ নির্ধারিত হইয়া থাকে ; সম্ভ্রান্ত পরিবারে কন্যাপণের প্রচলন নাই। এই সময়ে কন্যা তুলিয়া আনা হইবে, কী বরকে তুলিয়া নিয়া বিবাহ দেওয়া যাইবে, এই প্রস্তাব উপস্থিত হয়। বর তুলিয়া নিয়া বিবাহে বরপক্ষীয়ের খরচ অবশ্য অল্প, কিন্তু ইহার তেমন প্রচলন নাই।

* * * *

উভয় পক্ষের সন্তোষজনক মীমাংসা সম্পাদিত হইলে, শুভদিন ধার্য হইয়া যায়। ফসলের কার্য হইতে অবসর কালই বিবাহের প্রশস্ত সময় , এই নিমিত্ত সচরাচর মাঘ ফাল্গুন মাসেই দিন নির্দিষ্ট হইয়া থাকে।

* * * *

কথাবার্তা সাব্যস্ত হইয়া গেলে কোনো কোনো বরের পিতা ভাবী পুত্রবধূকে একটি অঙ্গুরীয় উপহার দিয়া আইসে। অবশেষে বিবাহের দিন নিকটবর্তী হইলে বরপক্ষ কন্যার পিতার নিকট হইতে বিবাহের নিমিত্ত মদ্য প্রস্তুত করিবার অনুমতি লইয়া যায়।

বিবাহের পূর্বদিন যে সকল বাদ্যকরেরা আসে, তাহাদের প্রথম বাদ্য হইতে বয়োবৃদ্ধগণ ভাবী পরিবারের শুভাশুভ গণনা করে। এই প্রথম বাদ্যকে "খোলা আননি"* বলা হয়। এতদ্ভিন্ন বরপক্ষীয় কোনো স্ত্রীলোক কলা পাতায় পানসুপারির দুইটি 'পুঁটুলি' করিয়া একত্রে নদীতে ভাসাইয়া দিয়াও ইষ্টানিষ্ট পরীক্ষা দেখে। যদি 'পুঁটুলি' দুইটি মিলিত হইয়া ভাসে, তাহা হইলে ভাবী দম্পতির প্রগাঢ় সদ্ভাব সূচিত হয়, অন্যথায় তাহারা বরকন্যার মনোমালিন্যের আশঙ্কা করে। বরের বাড়িতে বিবাহ হইবার কথা হইলে বরপক্ষীয় কোনো মহিলা পক্ষান্তরে কন্যাপক্ষের কেহ নদী হইতে এক কলশি জল লইয়া আইসে ; এই জলে, বিবাহের দিন বরকন্যাকে স্নান করানো হয়। অধিবাস দিবসে বরকন্যা উভয়পক্ষেরই গৃহসম্মুখীন দুইধারে সপল্লব মঙ্গলঘট স্থাপিত হইয়া থাকে।

১। পাত্রী বরের গৃহে তুলিয়া আনিতে হইলে বিবাহের পূর্ব দিন, পথ যদি দূরবর্তী হয়, তবে তাহারও পূর্বে অর্থাৎ যাহাতে বিবাহদিন প্রাতে পাত্রীকে লইয়া বরের বাড়িতে

* এসময় প্রাঙ্গণে একটি জায়গা করিয়া তাহাতে পানসুপারি, প্রদীপ ইত্যাদি দিয়া ঘট স্থাপিত করে , এই নিমিত্ত টাকাও একটি দিতে হয়।

উপনীত হইতে পারা যায় সেই হিসাবে, বরের পিতামাতা এবং অপরাপর আত্মীয় বন্ধুবান্ধবেরা নানাবিধ বাদ্যাদিসহ কন্যা আনয়নের জন্য যাত্রা করে।

* * * *

পরদিন প্রত্যুষে ঘট প্রদীপাদি যথাস্থানে স্থাপনপূর্বক অপরাপর শুভানুষ্ঠানের সহিত পিতামাতা দুহিতারত্নকে বিদায় দান করে। এই সময়ে "সাঁকো"র পথ বন্ধ করিয়া সপ্তগুণ সূত্র টাঙাইয়া দেওয়া হয়। বরপক্ষীয়েরা পাত্রী বাহির করিয়া আনিবার সময় কন্যার মাতা সুতাখানি ছিঁড়িয়া দেয়, ইহাতেই তাহাদের সহিত কন্যার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। যাহা হউক, কন্যার সহিত তাহার পিতা কী পিতামাতা উভয়েই বরগৃহে গমন করে।

* * * *

কোনো কোনো পরিবারে গণৎকার নির্ধারিত লগ্নে বরকন্যাকে উপযুক্ত বসন ভূষণে সজ্জিত করিয়া শয়নকক্ষে বিবাহবেদির উপরে উপবেশন করায়। স্ত্রী স্বামীর বামপার্শ্বে স্থান পাইয়া থাকে। অতঃপর বরের কোনো আত্মীয় এবং আত্মীয়া বরকন্যার প্রতিনিধিত্ব ভার গ্রহণ করিয়া যথাকালে তাহাদের পশ্চাতে বসে। ইহাদিগকে "ছাঁয়লা" এবং "ছাঁয়লি" বলা হয়। ইহারা একখানি শুভ্র বস্ত্র লইয়া উপস্থিত সকলকে জিজ্ঞাসা করে, "জোড়গাঁট বাঁধিবার হুকুম আছে তো?" সকলে বলিয়া উঠে—"আছে" "আছে" "আছে"। সম্মতি পাইবা মাত্রই "ছাঁয়লা-ছাঁয়লি" উক্ত বস্ত্রের দ্বারা দম্পতিকে বন্ধ করে। তখন তাহারা পরস্পরকে "বদাগুল্যা ভাত" অর্থাৎ সিদ্ধ ডিম্ব মিশ্রিত অন্ন এবং কলা, গুড় ও পান ইত্যাদি খাওয়ায়। স্ত্রী দক্ষিণ হস্তে স্বামীর মুখে এবং স্বামী বাম হস্ত দ্বারা প্রণয়িনীর গলদেশ বেষ্টন করতঃ তাহার মুখমধ্যে উল্লিখিত ভক্ষ্য প্রদান করে।

* * * *

এইরূপে খাদ্য বিনিময়ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেলে সমাগত বয়োবৃদ্ধগণ নবীন দম্পতির মস্তকে শুভাশিস বাক্যের সহিত নদীজল বর্ষণ করেন। ইহাই স্বস্তিবাচন—পক্ষান্তরে কর্মের সাফল্য ঘোষণা! অনন্তর দম্পতি আচম্বিতে উঠিয়া পড়ে। এতন্মধ্যে যদি নবোঢ়া পূর্বে উঠে, তবে সে সর্বদা স্বামীর অপরিমেয় ভালবাসা লাভ করিতে পারিবে বলিয়া সংস্কারের আশ্বাস আছে। পরে স্বামী স্ত্রী দুই পৃথক স্থানে নিদ্রায় রাত্রি কাটায়।

পরদিন অতি প্রত্যুষে দম্পতি গাত্রোত্থান করিয়া জনৈক "ওঝার" সহিত নদীকূলে যায়, এবং তথায় দুইটি মোরগের রুধিরে 'ঘিলা' ও কিঞ্চিৎ মদ্য ও সোনা রূপার জলে "মাথা ধুইয়া শুদ্ধ" হয়। ইহাকেই বিবাহের "বুরপারণ" বলে। অতঃপর চারিদিকের লোক ঘুম হইতে না উঠিতেই বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করে। পরিশেষে আহারাদির পর আত্মীয়স্বজাতি সমাগত স্ত্রীপুরুষ সকলে (অবশ্য দুই ভিন্ন দলে) সভা করিয়া বসে। তখন নবদম্পতি তাঁহাদিগের নিকট হইতে শুভাশীর্বাদ গ্রহণ করিতে উপনীত হয় ; এবং যথোচিত অভিবাদন

পুরঃসর পূজনীয়বর্গের নিকট হইতে নিষ্ঠীবনসিক্ত-সতণ্ডুল-তুলা শুভনির্মাল্য স্বরূপ লাভ করে। এই সঙ্গে দম্পতির কিছু আর্থিক লাভও ঘটিয়া থাকে।

* * * *

বিবাহের দুই তিন দিন পরে বর নানাবিধ মদ্য এবং পিষ্টকাদির সহিত নবোঢ়া সমভিব্যাহারে শ্বশুরালয়ে গমন করে এবং তথায় দুই চারি দিন অবস্থানের পর সস্ত্রীক চলিয়া আইসে। ইহারই নাম বিবাহের "ছুঁইদ ভাঙান" অর্থাৎ ইহাতেই বিবাহজনিত অপবিত্রতা নষ্ট হইয়া যায়। এমনকি, ইহা না হইলে নবদম্পতির একত্র বাসও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকে এবং তাহারা অপর কাহারও মঞ্চেও উঠিতে পারে না।

* * * *

বর তুলিয়া নিয়া বিবাহ এবং উপরিবর্ণিত বিবাহ পদ্ধতিতে বিশেষ কোনো তারতম্য নাই ; কেবল বরগৃহের কর্মগুলিও কন্যার পিত্রালয়ে হইয়া থাকে মাত্র।

* * * *

ইহাদের সমাজে অনূঢ় এবং অনূঢ়াদলের সম্মিলন প্রায় অব্যাহত। যুবক যুবতির মধ্যে সেই সুযোগে প্রণয়াসক্তি জন্মিলে তাহারা উভয়ে একযোগে পলাইয়া যায়। এদিকে পিতামাতা যখন জানিতে পারে যে, তাহাদের পুত্র বা কন্যা অমুকের কন্যা বা পুত্রের সঙ্গে পলাইয়াছে, তখন কন্যার পিতা আসিয়া সমাজকর্তার সমীপে যুবকের নামে অভিযোগ জানায়। উপায়াভাবে যুবকের পিতামাতাও যুবতির পিতামাতার নিকট তাহাদিগের পরিণয়ে সম্মতি প্রার্থনা করে। অবশেষে যুবক যুবতি স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলে সমাজকর্তার কাছে বিচার উপস্থিত হয়। যদি যুবতির অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলপ্রয়োগ দ্বারা লইয়া গিয়াছে প্রমাণ পাওয়া যায় তবে সেই দুর্মতি যুবকের ৬০ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারে। অন্যথা বিচারে কিছু অর্থের দ্বারা কন্যার পিতামাতাকে সম্মত করিয়া তাহাদের যথাবিধি বিবাহ হইয়া যায়। কোনো কারণে অভিভাবকদিগের সম্মতি পাওয়া না গেলেও যদি যুবক যুবতির সংকল্প প্রবল থাকে, তাহারা পুনরায় পলায়ন করে। এইরূপে চারিবার পর্যন্ত পলাইতে পারিলে কন্যার পিতা আর কুলমর্যাদাহানির দাবি করিতে পারে না। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে দ্বিতীয়বার পলায়নের পর আর কেহই তাহাদের বিবাহে বাধা দেয় না। এই বিবাহে "চুপ্তুলাং পূজা" এবং নূতন কুটুম্বগণকে লইয়া এক পরিপাটি ভোজ ভিন্ন অপরাপর আনুষঙ্গিক কার্য না করিলেও চলে, হয়ও না।



ব্যাঘ্র-পূজা*

শ্রীশরৎচন্দ্র মিত্র

বর্তমানকালে আদিম মনুষ্যের বাসগুহায় যে সমস্ত ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে যে, যে সময়ে ঐরাবত-সদৃশ মামথ, গুহা-ভল্লুক, গুহা-সিংহ এবং অন্যান্য পুরাকালীন পশু ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করিত, সেই সময়েও পৃথিবীতে আদিম মনুষ্যের অস্তিত্ব ছিল। উক্ত ধ্বংসাবশেষসমূহের মধ্যে চকমকিনির্মিত বর্শার অগ্রভাগ, কুঠার, হাতুড়ি ও অপরাপর যন্ত্রাদি থাকায় ইহা ভূয়োঃভূয়ো প্রমাণ হইতেছে যে, আদিম মনুষ্য সেই পুরাকালে কেবল উক্ত পশুসকল শিকার করিয়া উহাদের মাংসে আপনার উদর পোষণ করিত না, পরন্তু ইহাদিগকে বিশেষ ভয় করিত। উক্ত পশুদিগের দীর্ঘকায় ও বলাধিক্যজনিত ভয় হইতেই মনুষ্য-মধ্যে পশু-পূজার আবির্ভাব হইয়াছে। আদিম মনুষ্য আপনা হইতে পশুকে অধিক পরাক্রমশালী দেখিয়া, অজ্ঞানতাবশত বিবেচনা করিত যে, ওই সমস্ত পশুগণের আত্মা তাহার আত্মা হইতে মহৎতর। এইরূপ বিবেচনা করিতে করিতে তাহার মনে হইত যে, ওই সমস্ত পশুগণ নিশ্চয় এমন কোনো দেবদেবতা হইবে, মনুষ্যের সুখ দুঃখের উপর যাহাদের হাত আছে, এবং যাহাদের বরপ্রাপ্তি অথবা ক্রোধ শান্তির জন্য উপাসনা করা আবশ্যক। যে প্রক্রিয়াবশত পশু-পূজার আবির্ভাব হইয়াছে, এইটি সেই প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় ক্রম। পৃথিবীতে অনেক জাতির মধ্যে এই পশু-পূজা আজকালও প্রচলিত

* এই প্রবন্ধটি মৎপ্রণীত "The Indian Folk-Beliefs about the Tiger" শীর্ষক ইংরাজি প্রবন্ধের সারমর্ম। উক্ত ইংরাজি প্রবন্ধটি বোম্বাই শহরের The Anthropological Society of Bombay নামক বৈজ্ঞানিক সভার গত জানুয়ারি মাসের অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল, এবং উক্ত সভা প্রণীত—The Journal of the Anthropological Society of Bombay নামক পত্রিকার তৃতীয় ভাগের প্রথম সংখ্যায় (Vol III, No. 1, Pages 45-60) প্রকাশিত হইয়াছে—লেখক।

দেখা যায়, তাহাদের অবস্থা ও জীবন নির্বাহের উপায় প্রায় পুরাপ্রান্তরিক (Palaeolithic Age) নব-প্রান্তরিক (Neolithic Age) এবং কাংস্য (Bronze Age) যুগের মনুষ্যের অবস্থাসদৃশ।

সেই দেশের মনুষ্যজাতি সেই পশুকেই সর্বাপেক্ষা ভয় করে ও তাহারই উপাসনা করে, যে দেশে যে পশু বহুসংখ্যায় প্রাপ্ত হওয়া যায়, অথবা যাহা বেশি উপদ্রব করে। উত্তর আমেরিকার অত্যন্ত উত্তর প্রান্তে গ্রিজ্‌লি ভল্লুক নামক একপ্রকার ভল্লুক বহুসংখ্যায় বাস করে এবং অনেক প্রাণী-নাশ করে, সেইজন্য ওই দেশনিবাসী আদিম ইন্ডিয়ানগণ উহাদিগকে বড়ো ভয় করে। মাংসলোলুপ নেকড়ে বাঘের বাসভূমি কেনেডাদেশে মনুষ্য-শোণিতলোলুপ নেকড়ে জাতীয় এক প্রেত-পশুর কিংবদন্তি আজও পর্যন্ত প্রচলিত আছে, তাহা হইতেই প্রতীয়মান হয় যে, কেনেডাবাসীগণ ওই পশুকে কত ভয় করে। আমাদের দেশে ব্যাঘ্রের, সর্পের ও মকরের পূজা এখনও পর্যন্ত বর্তমান আছে। ভারতবর্ষে যত প্রকার পশু আছে, তন্মধ্যে ব্যাঘ্রই সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ। উহার দীর্ঘকায় ও ভয়ানক উপদ্রবনিবন্ধন আজও পর্যন্ত ভারতের ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে ব্যাঘ্র সম্বন্ধে নানারূপ কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। এদেশে ব্যাঘ্রের এরূপ উপদ্রব যে, উহার হস্তে প্রতি বৎসর বহু সংখ্যক মনুষ্য-গবাদির প্রাণনাশ হইয়া থাকে এবং সেইজন্য দেশের অনেক অংশ মনুষ্যশূন্য হইয়া যায় ও কৃষিগণের অনেক অর্থহানি হইয়া থাকে। সর্প ও মকর এদেশের আর দুইটি হিংস্রক জন্তু। ইহাদের উপদ্রবেও প্রতি বৎসর অনেক মনুষ্যের জীবননাশ হইয়া থাকে। সেই জন্যই বাঙ্গালীরা সর্পের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত শ্রাবণ মাসে মনসাপূজার দিন সর্প-রাজ্ঞী মনসাদেবীর উপাসনা করিয়া থাকে। দশহারার দিবস মকরারোহিণী গঙ্গাদেবীর অর্চনা করিয়া হাঙরের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইযা থাকে।

সেইরূপ ভারতবর্ষের অনেক আদিম জাতির মধ্যে ব্যাঘ্রের উপাসনা হইয়া থাকে। এই দেশের অন্যান্য অংশের লোক যদিও ব্যাঘ্রের বাস্তবিক উপাসনা করে না, তত্রাপি তৎসম্বন্ধে তাহাদের অনেক ভয়জনিত কুসংস্কার আছে। ভারতীয় কয়েকটি আদিম জাতির মধ্যে ব্যাঘ্র-দানব একটি উপাস্য দেবতা। ছোটোনাগপুরের অন্তর্বর্তী পালামৌ, সরগুজা ও জাশপুরের সন্নিকটে কিসান* নামে একটি অর্ধ-অসভ্য জাতি বাস করে, তাহারা কতক পরিমাণে হিন্দুদিগের আচার-ব্যবহার পালন করিয়া থাকে। ইহারা ব্যাঘ্র-দানবের পূজা করে। তাহাদের বিশ্বাস যে, উক্ত দানবের অর্চনা করিলে তাহারা স্বয়ং ও তাহাদের গৃহপালিত পশুগণ ব্যাঘ্রের উপদ্রব হইতে অব্যাহতি পাইবে। রামগড়-নিবাসী সাঁওতালদের মধ্যে যে সকল লোকের কোনো আত্মীয়স্বজন ব্যাঘ্রকর্তৃক নিহত হয়, তাহারা কেবলই কুটুম্ববিনাশী ব্যাঘ্র-দানবের উপাসনা করিয়া থাকে, যে কারণে কিষান ও সাঁওতালগণ ব্যাঘ্র-দানবের অর্চনা করিয়া থাকে সেই সেই কারণবশত গোঁড় নামক আর একটি অসভ্য জাতিও ব্যাঘ্রের উপাসনা করে। সাঁওতাল পরগনাতে সাঁওতালগণ ব্যাঘ্রদংশনে মৃত্যু হওয়াকে ভয়ংকর বিপদ মনে করে। এমনকি উক্ত প্রদেশস্থ আদালতে সাঁওতালি সাক্ষীগণের

* Indian Autiquary নামক পত্রিকার ১৯ খণ্ডের ১২৮ পৃষ্ঠা দেখুন।

এজেহার লওয়ার জন্য উহাদিগকে সাঁওতালি ভাষায় যে হলফ দেওয়া হয়, তাহার অর্থ এই যে, যদ্যপি তাহারা কোনোরূপ মিথ্যা বলে, তাহা হইলে তাহাদিগের ব্যাঘ্রদংশনে মৃত্যু হইবে। গোঁড় জাতির মধ্যে, কুস্রু, সুরি, মর্কাম, নিতিয়া এবং সার্সুন গোত্রীয় লোকসকল বাঘেশ্বর নামক দেবতার উপাসনা করিয়া থাকে। উক্ত জাতির মধ্যে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।*

এক সময়ে কোনো গোঁড় পরিবারে কুস্রু, সুরি, মর্কাম, নিতিয়া এবং সার্সুন নামক পঞ্চভ্রাতা ছিল। তন্মধ্যে কুস্রুর স্ত্রী যখন দ্বিতীয়বার অন্তঃসত্বা হয়, তখন এক ব্যাঘ্রশিশু গর্ভে ধারণ করিয়াছিল। সময়ক্রমে ওই শিশুর জন্ম হইলে তাহার পিতামাতা তাহাকে অগ্রজ পুত্রনির্বিশেষে লালনপালন করিতে লাগিল। শৈশবাবস্থা হইতেই ওই ব্যাঘ্রশিশু সদাসর্বদা তাহার পিতা কুস্রুর সমভিব্যাহারে থাকিত। যখন কুস্রু শস্য রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ক্ষেত্রে যাইত, ব্যাঘ্রশিশুও তাহার সহিত থাকিত। যখন নীলগাই, সম্বর প্রভৃতি হরিণ সকল তাহার শস্য নষ্ট করিতে লাগিল, কুস্রু তাহা কোনরূপে নিবারণ করিতে পারিল না। একদা একটি বৃহদাকার সম্বর হরিণ কুস্রুর কচি কচি মাসকলাইয়ের চারা সকল নষ্ট করিতেছে দেখিয়া, কুস্রু রোদন করিয়া আপনার কেশ ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল। এই দেখিয়া ব্যাঘ্রশিশু ওই সম্বরটিকে আক্রমণ করিল ও তৎক্ষণাৎ উহাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল। এইরূপে যত বন্যপশু কুস্রুর শস্য নষ্ট করিতে আসিত, ব্যাঘ্রশিশু তাহাদিগকে বিনাশ করিত। সময়ক্রমে ব্যাঘ্রশিশুর মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পরে সে ভূত হইল।

একদিন কুস্রুর কন্যার বিবাহোপলক্ষে, নিমন্ত্রিতগণের মধ্যে একজনকে ভূতে পাইল। বয়গা অথবা গ্রাম্য-পূজারী ও ওঝাকে আহ্বান করা হইল। সে আসিয়া ভূতাক্রান্ত ব্যক্তিকে প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিল যে কুস্রুর ব্যাঘ্রশিশুর প্রেতই উহাকে পাইয়াছে ও তাহাদিগকে বলিল যে তৎক্ষণাৎ উক্ত প্রেতের শান্তির জন্য উহার পূজা ও বলি দেওয়া আবশ্যক। কুক্কুট, ছাগবৎস, তাড়ি এবং ঘৃত দিয়া উহার পূজা করিতেই, ব্যাঘ্র প্রেত উক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিল। সেই জন্য ওই দিবস হইতেই কুস্রুর ব্যাঘ্র-শিশুর প্রেত দেবতা বলিয়া গণিত হইয়াছে। এবং কুস্রু, সুরি, মর্কাম, নিতিয়া এবং সার্সুন নামক পঞ্চভ্রাতা হইতে উদ্ভূত উপরোক্ত পাঁচটি গোঁড় গোত্রের মধ্যে উক্ত ব্যাঘ্র-প্রেতের পূজা হইয়া থাকে।

উক্ত পঞ্চ-গোত্রের মধ্যে যখন কাহারও বিবাহ হয়, তখনই বাঘেশ্বরের উক্ত প্রকারে আবির্ভাব হইয়া থাকে। উক্ত পঞ্চ গোত্রের মধ্যেই বাঘেশ্বর দেবতা বলিয়া গণিত হইয়া থাকে। কিন্তু অপরাপর শ্রেণির গোঁড়দিগের মধ্যে বাঘেশ্বর কেবল একটি উপাস্য প্রেত বলিয়া গণিত হয় ও তাহার বাৎসরিক পূজা হইয়া থাকে। শেষোক্ত গোঁড়দিগের এইরূপ বিশ্বাস যে, যে সমস্ত লোকের ব্যাঘ্র দংশনে মৃত্যু হইয়াছে, তাহাদিগের প্রেতগণ সম্মিলিত হইয়া বাঘেশ্বর নামক প্রেত-দেবতা হইয়াছে। আপন আপন গো-মেষাদি যাহাতে ব্যাঘ্রের

* Journal of the Asiatic Society of Bengal নামক পত্রিকার ৪১ খণ্ডের প্রথম ভাগের ১১৫ পৃষ্ঠা দেখুন।

উপদ্রব হইতে রক্ষা পায় ও যাহাতে তাহাদের আপনাদেরও প্রাণ রক্ষা হয়, এই জন্য প্রত্যেক গ্রামের গোঁড় নিবাসীগণ প্রতি বৎসর ষোড়শোপচারে তাহার পূজা করিয়া থাকে।

গোঁড়দিগের মধ্যে কীরূপে ব্যাঘ্র-পূজার আবির্ভাব হইল, তাহার আর একটি স্বতন্ত্র বিবরণ পাওয়া যায়। কোনো গোঁড় সর্দার অল্প বয়সে ব্যাঘ্র কর্তৃক নিহত হয়। তাহার মৃত্যুর পরে তাহার প্রেত আপনার বন্ধুবান্ধবের মধ্যে আসিয়া বলিয়াছিল যে যদ্যপি তাহার প্রেতের পূজা করে তাহা হইলে তাহারা স্বয়ং ও তাহাদের গৃহপালিত পশুগণ আর কখনও ব্যাঘ্র কর্তৃক নিহত হইবে না। ইহা শুনিয়া তাহার বন্ধুবান্ধবগণ তৎপরামর্শানুযায়ী পূজা করিতে লাগিল। এইরূপে ওই প্রেত গোঁড়দিগের দেবসমূহের মধ্যে একটি দেবতা বলিয়া গণিত হইতে লাগিল।*

ভারতীয় আর কয়েকটি অসভ্য জাতির মধ্যে এইরূপ বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে কোনো কোনো দুষ্টলোক ব্যাঘ্রের রূপ ধারণ করিতে পারে এবং সেইজন্য তাহাদের জীবন্ত মনুষ্যের অনিষ্ট করিবার ক্ষমতা আছে। উড়িষ্যানিবাসী খণ্ড** জাতি বিশ্বাস করে যে কোনো কোনো স্ত্রীলোক ব্যাঘ্রের রূপ ধারণ করিতে পারে। কখনো-কখনো দুষ্ট লোকেরা প্রচার করিয়া দেয় যে তাহাদের এইরূপ ক্ষমতা আছে এবং প্রতিবেশীদের নিকট হইতে এই বলিয়া নানাপ্রকার উপঢৌকন লইয়া থাকে, যে তাহাদিগকে উৎকোচ দিলে তাহারা আর তাহাদিগের অনিষ্ট করিবে না। মধ্য ভারতের অন্তর্গত প্রদেশসমূহে ওরাওঁ*** জাতির মধ্যেও এরূপ বিশ্বাস প্রচলিত আছে। তাহারা বলে যে, যে সমস্ত লোকের ব্যাঘ্রদংশনে মৃত্যু হয় তাহারাই ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করিয়া থাকে।

বর্মাদেশের পূর্বে যে সমস্ত পাহাড় আছে তথায় কামিয়েন নামক এক অসভ্য জাতি বাস করে। তাহাদের মধ্যে চিটং ও মুরণ নামক দুইটি দেবতা আছেন, তাঁহারা তাহাদের শুভাশুভের উপর নজর রাখিয়া থাকেন। কামিয়েনদের এইরূপ বিশ্বাস যে যদ্যপি কামিয়েন শিকারীরা চিটং দেবের পূজা না দেয়, তাহা হইলে তাহাদেব মধ্যে কেহ না কেহ ব্যাঘ্র কর্তৃক নিহত হইবে। তাহাদের মধ্যে আর একটি দেবতা বা নাটের পূজা হইয়া থাকে, তাঁহার নাম নডং নাট,**** তিনি বাসগৃহের বহির্ভাগে অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। উক্ত দেবতা সচরাচর বাসগৃহের অভ্যন্তরেই বাস করেন কিন্তু যদ্যপি উক্ত গৃহনিবাসী পরিবারস্থ কোনো ব্যক্তির ব্যাঘ্র দংশনে মৃত্যু হয় তাহা হইলে তাঁহার পূজা বাসগৃহের বহির্ভাগেই হইয়া থাকে।

মগেরা নডং নামক কামিয়েন নাটকে আইঙ-পিন-নাট নামে অভিহিত করিয়া থাকে। যদ্যপি পরিবারস্থ কোনো লোক ব্যাঘ্র কর্তৃক নিহত হয় তাহা হইলে তাহারা উক্ত দেবতাকে পূজা করিয়া থাকে।***** মগেরা এরূপও বিশ্বাস করে যে উক্ত দেবতা

* Indian Antiquary নামক পত্রিকার ১৪শ খণ্ডের ১৩৩ পৃষ্ঠা দেখুন।

** উপরোক্ত পত্রিকার ১৩২ পৃষ্ঠা দেখুন।

*** উপরোক্ত পত্রিকার ১৩২ পৃষ্ঠা দেখুন।

**** John Anderson M. D. প্রণীত Mandalay to Momien নামক গ্রন্থের ১৪৭ পৃষ্ঠা দেখুন।

***** ওই গ্রন্থের ৪৫৯ পৃষ্ঠা দেখুন।

সময়ে সময়ে ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করেন, কেন-না ডাক্তার আন্ডারসন বলেন "থেমব এঙ নামক স্থানে উক্ত প্রদেশের সর্দার আসিয়া আমাদিগের নৌকা ছাড়িতে বাধ্য করিয়াছিল। কামিয়েনেরা আমাদিগকে আক্রমণ করে নাই, পরন্তু রাত্রিতে ব্যাঘ্র আসিবে এই ভয় আমাদের হইয়াছিল। নৌকার মাঝিরা বলিল যে উহা বাস্তবিক ব্যাঘ্র নয় পরন্তু ব্যাঘ্ররূপধারী তত্রত্য নাট দেবতা যিনি আমাদের একটি বৃক্ষের কয়েকটি শাখা কাটার জন্য কুপিত হইয়াছিলেন।"* কুসংস্কারবশত মগেরা ব্যাঘ্রকে এত ভয় করে যে যখন কোনো মগ ব্যাঘ্র কর্তৃক নিহত হয়, তাহারা তাহার শব যত শীঘ্র পারে সমাহিত করিয়া ফেলে। ডাক্তার জন আন্ডারসন যখন ভামোতে গিয়াছিলেন তখন এই কুসংস্কারের একটি উদাহরণ দেখিয়াছিলেন। তিনি বলেন ভামো নগরে একটি স্ত্রীলোক ব্যাঘ্র কর্তৃক নিহত হয়। মগেদের প্রথানুসারে উক্ত স্ত্রীলোকের মৃতদেহ সেই রাত্রিতেই সমাহিত করা হইয়াছিল।**

ইয়ানাওন প্রদেশস্থ সন্তা উপত্যকানিবাসী সান জাতিও একটি নাট দেবতাকে মানে, তিনি ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করিয়া শিশু সন্তানকে চুরি করিয়া লইয়া যাইয়া থাকেন। ১৮৬৮ খ্রিঃ ডাক্তার আন্ডারসন যখন উক্ত প্রদেশে গিয়াছিলেন, তখন তিনিও ইহাদের মধ্যে উক্ত কুসংস্কারের প্রচলন দেখিযাছিলেন। তিনি বলেন সবয়ার পারিবারিক সমাধিস্থানে একটি বড়ো দেবদারু বন আছে। তাহাদের (সানেদের) বিশ্বাস যে উক্ত স্থানে বন্দুক ছুঁড়িলে নিশ্চয়ই তত্রত্য সর্দার ও তাঁহার পরিবারস্থ লোকসকল পীড়িত হইয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইবে। সেইজন্য শহরের পশ্চাৎভাগে পাহাড়ের উপর আমাদের শিকার করিতে মানা করা হইয়াছিল।" ১৭৬৭ খ্রিঃ চিনদেশীয় সৈনিকেরা যথায় একটি কিল্লা নির্মাণ করিবার নিমিত্ত মাটি খনন করিয়াছিল তথায় একটি নাটদেবতা নিবাস করেন এরূপ প্রবাদ আছে। সানেদের বিশ্বাস যে যদ্যপি তথায় বন্দুক ছোঁড়া হয়, তাহা হইলে উক্ত দেবতা কুপিত হইয়া ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করতঃ আসিবেন ও শিশু সন্তান চুরি করিয়া লইয়া যাইবেন।***

ভারতবর্ষের মধ্যবর্তী প্রদেশসমূহে ব্যাঘ্র সম্বন্ধে অনেক প্রকার কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। যখন কোনো ব্যক্তি ব্যাঘ্র কর্তৃক নিহত হয়, তাহার প্রেত তাহার নিহন্তা ব্যাঘ্রকে পাইয়া থাকে ও যে যে স্থানে বিপদের সম্ভাবনা ব্যাঘ্রকে তথা হইতে সরাইয়া লইয়া যায়। লেফটেনান্ট কর্নেল ডবলু এচ স্লিমান সাহেব অনেক দিন এই সমস্ত প্রদেশে বাস করিয়া এই সমস্ত প্রচলিত কিংবদন্তির বিষয় শুনিয়াছিলেন। তিনি বলেন**** একদা দিউরির সর্দার রামচাঁদ রু (যাহাকে লোকে সচরাচর সুরিমন্ত বলিয়া ডাকিত) প্রাতঃভোজনের পর আমার

* উপরোক্ত গ্রন্থের ৪৫২ পৃষ্ঠা দেখুন।

** J Anderson M. D. প্রণীত Report on the Expedition to Western Yunan via Bhamo নামক গ্রন্থের ২৩৫-৩৬ পৃষ্ঠা দেখুন।

*** উপরোক্ত গ্রন্থের ২৬০ দেখুন।

**** Sleeman সাহেব প্রণীত Rambles and Recollections of an Indian Official নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ১৬২-৬৩ পৃষ্ঠা দেখুন।

সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার রাজধানী দিউরি ও সাগরের মধ্যে কত লোক ব্যাঘ্র কর্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে কথোপকথন হইতে লাগিল। তাঁহার অনুচরবর্গের মধ্যে একজন বলিল যে যখন কোনো ব্যাঘ্র একটি লোক বিনাশ করে, তখন সে নিরাপদ হয়, কেন-না তন্নিহত ব্যক্তির প্রেত তাহার মস্তকের উপর আরোহণ করিয়া তাহাকে যে স্থানে বিপদ সম্ভব তথা হইতে সরাইয়া লইয়া যায়। প্রেতটি ভালোরূপে জানে যে যথায় লোকটি বিনষ্ট হইয়াছে তথায় লোকে ব্যাঘ্রকে মারিবার জন্য সদা সর্বদা সতর্কিত থাকিবে। সেই জন্য সে ব্যাঘ্রকে অপর কোনো নিরাপদ স্থানে লইয়া যায় যেখানে ব্যাঘ্র নির্ভয়ে অপরাপর মনুষ্য বিনাশ করিতে পারিবে। ওই প্রেত তন্নিহন্তা ব্যাঘ্রকে কেন এত সাহায্য করিয়া থাকে তাহার কারণ উক্ত অনুচর বলিতে পারিল না। সে আরো বলিল যে প্রেতসকল প্রায়ই অনিষ্টকারক হইয়া থাকে। যদাপি প্রেতের শান্তির জন্য কোনো উপায় অবলম্বন না করা হয় তাহা হইলে মানুষ আপন জীবদ্দশায় যত ভালো থাকে, তাহার প্রেত ততই অনিষ্টকারক হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষের সর্বত্র আর একটি ব্যাঘ্র কিংবদন্তি বিস্তারিতরূপে প্রচলিত এই যে, একপ্রকার গাছড়া আছে, যাহার মূল ভক্ষণ করিলেই মনুষ্য ব্যাঘ্ররূপে পরিণত হয় ও যদ্যপি সেই অবস্থাতেই সে আর একপ্রকার গাছড়ার মূল ভক্ষণ করিতে পারে, তাহা হইলে পুনর্বার মনুষ্যরূপ প্রাপ্ত হয়। ইহার সম্বন্ধে স্লীমান সাহেব বলিয়াছেন,* সুরিমন্তের নিজেরও এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে সাগর ও দিউরির মধ্যবর্তী বনে যে সমস্ত ব্যাঘ্র বিচরণ করে তাহারা ভিন্ন প্রকারের ব্যাঘ্র, তাহারা বাস্তবিক ব্যাঘ্র নয়, পরন্তু ব্যাঘ্ররূপধারী মনুষ্য। তিনি আরও বলিলেন যে বাস্তবিক ব্যাঘ্র ও ব্যাঘ্ররূপী মনুষ্যের মধ্যে এই প্রভেদ যে, ব্যাঘ্ররূপী মনুষ্যের লাঙ্গুল থাকে না ও বোরা অথবা বাস্তবিক ব্যাঘ্রের দীর্ঘ লাঙ্গুল থাকে। দিউরির নিকটবর্তী জঙ্গালে একপ্রকার গাছড়া পাওয়া যায়, যাহার মূল ভক্ষণ করিলে মানুষ তৎক্ষণাৎ ব্যাঘ্ররূপে পরিণত হয়। আর সেই অবস্থাতেই যদ্যপি আর এক প্রকার গাছড়ার মূল ভক্ষণ করিতে পারে, তাহা হইলে পুনর্বার মনুষ্যরূপ প্রাপ্ত হয়। তিনি বলিলেন যে, তাঁহার শৈশবাবস্থায় এইরূপ একটি ঘটনা তাঁহার আপনার পরিবারের মধ্যে হইয়াছিল। তাঁহার ধোপা (যাহার নাম ছিল রঘু) বড়ো মাতাল ছিল। মানুষ ব্যাঘ্র হইলে তাহার মনে কীরূপ ভাবের উদয় হয়, ইহা জানিতে একদিন রঘুর বড়োই কৌতূহল হইল। তৎক্ষণাৎ জঙ্গালে যাইয়া দুই প্রকার মূল আনয়ন করিয়া একটি আপনার স্ত্রীকে দিয়া বলিল যে, যখন দেখিবে যে সে (রঘু) ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করিতেছে, তৎক্ষণাৎ সেই মূলটি রঘুর মুখে প্রবেশ করাইয়া দিবে। তাহার স্ত্রী ইহাতে সম্মত হইল। রঘু মূলটি ভক্ষণ করিয়া ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করিল। কিন্তু তাহার স্ত্রী আপনার স্বামীকে ওইরূপ ব্যাঘ্র হইতে দেখিয়া ভয়ানক ভীত হইল ও মূলটি হস্তে লইয়া পলায়ন করিল। রঘু বেচারা জঙ্গালে যাইয়া নিকটবর্তী গ্রামবাসী অনেক বন্ধুবান্ধবকে হত্যা করিতে লাগিল। অবশেষে তাহাকে গুলি করিয়া মারা হইল এবং দেখা যাইল যে তাহার লাঙ্গুল নাই। সুরিমন্ত আমাকে আরও বলিলেন যে, আপনি যখনই কোনো লাঙ্গুলহীন ব্যাঘ্র দেখিবেন, তখন জানিবেন কোনো হতভাগ্য ব্যক্তি সেই মূল

* উপরোক্ত গ্রন্থের ১৬৩-৬৪ পৃষ্ঠা দেখুন।

ভক্ষণ করিয়া এইপ্রকার ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করিয়াছে ও আরও জানিবেন যে সকল ব্যাঘ্র অপেক্ষা ওই ব্যাঘ্রই ভয়ানক অনিষ্টকারক।

মধ্য ভারতবর্ষে ব্যাঘ্র সম্বন্ধে আরও একটি কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। তাহার মর্ম এই যে, একপ্রকার বিজ্ঞান আছে, যাহা অধ্যয়ন করিলে মানুষের এরূপ ক্ষমতা জন্মে যে, অধীতশাস্ত্র ব্যক্তি ইচ্ছামত ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করিতে পারে। মধ্যভারতবর্ষনিবাসী লোকদের আচার ব্যবহারজ্ঞ শ্লীমান সাহেব লিখিয়াছেন, "একদিন জব্বলপুর ও মৃজাপুরের রাস্তাতে যাইতে যাইতে আমার বন্ধু মাইহারের রাজার সহিত কথোপকথন হইতে ছিল যে, উক্ত রাস্তার সন্নিকটবর্তী কাট্রাপাস নামক স্থানে কত লোক ব্যাঘ্র কর্তৃক নিহত হইয়াছে ও ব্যাঘ্রগণকে বিনাশ করিবার কী উপায় আছে। রাজা বলিলেন যে, যদ্যপি ওই সকল ব্যাঘ্র বাস্তবিক ব্যাঘ্র হইত তাহা হইলে তাহাদিগকে বিনাশ করা সহজ হইত। কিন্তু আপনি জানিবেন যে, যে সমস্ত ব্যাঘ্র বহুসংখ্যক মনুষ্য বিনাশ করিতে পারে, তাহারা সামান্য ব্যাঘ্র নহে ; পরন্তু তাহারা সেই সকল অধীতশাস্ত্র লোক যাহারা বিজ্ঞানবলে ওই প্রকার ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করিয়াছে। ওইরূপ ব্যাঘ্রদিগকে শাসন করা বড়ো দুরূহ ব্যাপার। ওই সকল লোক কীরূপে ব্যাঘ্ররূপে ধারণ করিয়া থাকে জিজ্ঞাসা করিলে পর, রাজা বলিলেন;—"যে সমস্ত লোক ওই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে ওই রূপ ধারণ করা বড়োই সহজ। কিন্তু কীরূপে তাহারা এই প্রকরণ শিক্ষা করিয়া থাকে ও সেই শাস্ত্রই বা কী প্রকার, আমার মতন মূর্খ লোকে তাহা জানে না। মাইহারস্থ একটি মন্দিরের পুরোহিত এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ও সেই বিজ্ঞানবলে ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করিতেন। যে মুহূর্তে তিনি পূর্ণ ব্যাঘ্রমূর্তি হইতেন, সেই সময়ে তাঁহার একজন শিষ্য তাঁহার গলায় একটি হার ফেলিয়া দিতেন। তিনি অনেক দিন হইতে এই অভ্যাস ত্যাগ করিয়াছিলেন ও তাঁহার প্রধান শিষ্য সকলও তীর্থ করিতে গিয়াছিল। ইত্যবসরে একদিন ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করিবার তাঁহার বড়োই ইচ্ছা হইল। তিনি একটি আশুদীক্ষিত শিষ্যের নিকট আপন ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন ও তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "সে তাঁহাব গলায় হারটি ফেলিয়া দিতে পারিবেক কি না।" শিষ্য বলিল ;—"আপনি অনায়াসে ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করিতে পারেন। ঈশ্বরের ও আপনার উপর আমার এরূপ প্রগাঢ় ভক্তি যে আমি কিছুতেই ভয় পাইব না।" পুরোহিত তখন শিষ্যকে হারগাছটি সমর্পণ করিয়া ব্যাঘ্রমূর্তি ধারণ করিতে লাগিলেন। এই দেখিয়া শিষ্য কাঁপিতে লাগিল ও যখন ব্যাঘ্রকে চিৎকার করিতে শুনিল, তখনই পতিত হইয়া ভূমিতে হারটি ফেলিয়া দিল। ব্যাঘ্রও তাহার উপর লম্ফ দিয়া চলিয়া যাইল। সেই সময় হইতেই অনেক বৎসর পর্যন্ত মন্দিরে যাইবার রাস্তায় উপদ্রব করিতে লাগিল।" কাট্রাপাসে যে সমস্ত ব্যাঘ্র আছে, তাহার মধ্যে ব্যাঘ্ররূপী পুরোহিত একটি কিনা জিজ্ঞাসা করাতে রাজা বলিলেন—"না, কিন্তু তাহারা ব্যাঘ্ররূপী মনুষ্য হইলেও হইতে পারে, যাহারা বিজ্ঞান বলে এইপ্রকার রূপ ধারণ করিয়াছে। যখন মানুষ একবার এই বিদ্যা শিক্ষা করিয়া থাকে আপনাদের ও অপর লোকের অনিষ্টসত্ত্বেও তাহারা ইহা অভ্যাস না করিয়া থাকিতে পারে না।" যদ্যপি ইহারা বাস্তবিক ব্যাঘ্রই হয়, তাহা হইলে ইহাদের উপদ্রব নিবারণ করিবার কোনো সহজ উপায় আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে রাজা বলিলেন;—"যে সমস্ত প্রেত তাহাদিগকে চালাইয়া লইয়া বেড়ায়,

তাহাদিগের পূজা করা উচিত ও তাহাদিগকে নৈবেদ্য প্রভৃতি দেওয়া উচিত। তাহা হইলে তাহারা শান্ত হইবে। কেন-না যে সকল লোক ব্যাঘ্র কর্তৃক নিহত হয়, তাহাদের প্রেতাত্মা ব্যাঘ্রের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া বেড়ায় ও তাহাকে বলিয়া দেয় যে, কোথায় যাইলে শিকার পাওয়া যাইবে অথবা কোন্ স্থানে যাইলে বিপদের সম্ভাবনা নাই। গোঁড় অথবা অপর কোনো জংলি লোককে কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া তাহাদিগকে একটি ক্ষুদ্র আস্থান নির্মাণ করিয়া দিয়া তথায় ওই প্রেতদিগের পূজা দিতে আদেশ করুন। গোঁড়রা ওই প্রেতদিগকে আহ্বান করিয়া বলিবেক যে, যদ্যপি তাহারা ব্যাঘ্রদিগকে সাহায্য না করে, তাহা হইলে সেই আস্থানে তাহাদের নিয়মিতরূপে পূজা হইবে ও বলিদান করা হইবেক।" রাজা আরও বলিলেন! "যদ্যপি এরূপ করা হয়, তাহা হইলে ব্যাঘ্রেরা আপনা আপনিই বিনষ্ট হইবে অথবা তাহারা আর মনুষ্য বধ করিবে না। যদ্যপি এরূপে ফললাভ না হয়, তাহা হইলে আপনি নিশ্চয়ই জানিবেন যে, তাহারা সামান্য ব্যাঘ্র নহে, পরন্তু ব্যাঘ্ররূপী মনুষ্য। অথবা এরূপ হইতেও পারে যে, গোঁড়েরা ব্যাঘ্রদেবের পূজা না করিয়া স্বয়ং পূজার দ্রব্যাদি অপহরণ করিয়াছে।"

জাপান দেশে যে দ্বাদশ রাশি প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে ব্যাঘ্র একটি। বাকি একাদশ রাশি হইতেছে ;—মূষিক, বৃষ, খরগোশ, ড্রেগন, সর্প, অশ্ব, ছাগ, বাঁদর, কুক্কুট, কুকুর ও শূকর।* জাপানদেশীয় মন্দিরসমূহে যে সমস্ত কড়িকাষ্ঠ থাকে, তাহাতে সচরাচর ব্যাঘ্রের মুখ ক্ষোদিত থাকিতে দেখা যায়।

তিব্বতদেশেও যে দ্বাদশ রাশি প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে ব্যাঘ্র একটি। বাকি একাদশটির নাম মূষিক, বৃষ, খরগোশ, ড্রেগন, সর্প, অশ্ব, মেষ, বাঁদর, কুক্কুট, কুকুর এবং শূকর। এই দ্বাদশ রাশিকে লোখর চুনি বলে ও ইহাদের নাম দ্বারা দ্বাদশ বাৎসরিক যুগের বৎসর সকল অভিহিত হইয়া থাকে। তিব্বতীয়দের নববৎসর ব্যাঘ্ররাশি হইতেই আরম্ভ হয় ও হোর্দা-টাঙ-পো নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে প্রবাদ আছে যে, বৎসরের প্রথম মাসই ব্যাঘ্র-মাস।**

প্রাচীন গ্রিকদের মধ্যে, ব্যাঘ্র, মর্টিখোরা নামে অভিহিত হইত। এই গ্রিক নামটি পারসি মর্দখোর অথবা মনুষ্যখাদক শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। গ্রিক ইতিহাসবেত্তা টিসিয়াস মর্টিখোরার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ লিখিয়াছেন ;—সিংহসদৃশ ; লোহিত বর্ণ ; মনুষ্য সদৃশ মুখ, চক্ষু ও নাসিকা, তিন পাটি দাঁত ; শরীরের সর্বাংশে কাঁটা ; বিশেষত লাঙ্গুলের উপর ; যেহেতু ইহা বৃশ্চিক-সদৃশ।"

ভারতবাসী ও আসিয়া নিবাসী অপরাপর জাতিদের মধ্যে ব্যাঘ্রের অবয়ব সম্বন্ধেও নানাপ্রকার কুসংস্কার প্রচলিত আছে। এদেশি শিকারীদের বিশ্বাস যে ব্যাঘ্র, সিংহ ও

* Miss Isabella Bird প্রণীত Unbeaten Tracks in Japan নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৬৮ পৃষ্ঠা দেখুন।

** The Proceedings of the Asiatic Society of Bengal for 1890 নামক পত্রিকার ৭৩৮ পৃষ্ঠা দেখুন।

অপরাপর বিড়ালজাতীয় পশুদের লাঙ্গুলের শেষভাগে একটি নখ সদৃশ কাঁটা থাকে। ভারতবর্ষীয় লোকেদের বিশ্বাস যে বৃশ্চিক যেরূপে আপনার হুল দ্বারা দংশন করিয়া থাকে, ব্যাঘ্রের কাঁটাও সেই হুলের কার্য করিয়া থাকে। আরো প্রবাদ আছে যে ব্যাঘ্রের গোঁফ মানুষের বড়োই অনিষ্টকারক। সেই জন্য ব্যাঘ্র নিহত হইলেই দেশি শিকারিরা তাহার গোঁফ উৎপাটন করিয়া ফেলে অথবা উহা জ্বালাইয়া দেয়, যেহেতু উহা থাকিলে অনেক অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

ভারতীয় কয়েকটি জাতির মধ্যে এরূপ বিশ্বাসও প্রচলিত আছে যে ব্যাঘ্রের গোঁফ উৎপাটিত করিয়া ফেলিলে, মনুষ্য বিনাশ করিবার নিমিত্ত কোনো লোকই ব্যাঘ্রের রূপ ধারণ করিতে পারিবে না। অপর কয়েকটি জাতির বিশ্বাস যে ব্যাঘ্রের গোঁফ শরীরে ধারণ করিলে সেই লোক ইচ্ছামতো যে কোনো স্ত্রীলোক হউক না কেন তাহাকে বশীভূত করিতে পারিবে। পুরাকালে বিচারালয়ে সাক্ষীগণকে ব্যাঘ্রচর্মের উপর বসাইয়া হলফ দেওয়া হইত। প্রাচ্য রাজগণের মধ্যে ব্যাঘ্র রাজচিহ্ন বলিয়া পুরাকাল হইতে ব্যাঘ্র চর্ম রাজসিংহাসন ও বিচারাসনের উপর প্রসারিত হইয়া আসিতেছে। হিন্দুদিগের মধ্যে, মৃগচর্মের ন্যায়, ব্যাঘ্র চর্মও শুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হয়। যোগী ও ফকিরগণ ব্যাঘ্রচর্মের উপর উপবিষ্ট হইয়া আপন আপন পূজাপাঠ ও ঈশ্বর আরাধনা করিয়া থাকেন। ব্যাঘ্রের সম্মুখের দাঁত, গোঁফ, নখ ও বীরনখ মাদুলির স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মলয় দেশনিবাসীদের বিশ্বাস যে ব্যাঘ্র মাংস ভক্ষণ করিলে ভোক্তার ব্যাঘ্র সদৃশ বলবিক্রম হয়। জাপানদেশীয় চিকিৎসকেরা ব্যাঘ্রের যকৃৎ অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে। মিস ইসাবেলা বার্ড নামক জনৈক ইংরাজ মহিলা, যিনি জাপানে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, তিনি এই সম্বন্ধে বলেন,* "আমি পীড়িত হওয়াতে ডাক্তার নোসোকি নামক জনৈক জাপানদেশীয় চিকিৎসক আমার চিকিৎসা করিতে আসিয়া ছিলেন। তিনি বলিলেন যে জাপানি চিকিৎসাশাস্ত্রে জিনসেং গণ্ডারের শৃঙ্গ ও ব্যাঘ্রের যকৃৎ অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া পরিগণিত হইয়া তাকে।" চৈনিকেরাও ব্যাঘ্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশ ঔষধে ব্যবহার করিয়া থাকে। মিস বার্ড, কিয়দ্দিবস কান্টননগরে বাস করিয়াছিলেন, তিনি এই সম্বন্ধে বলেন,** "মলয় দেশস্থ সালাঙ্গোর নামক স্থানে একটি ব্যাঘ্র মারিবার পর বড়োই কৌতুকজনক ব্যাপার দেখিয়াছিলাম। নিকটস্থ চৈনিকেরা ব্যাঘ্রের মৃত দেহটি লইয়া ছেঁড়াছিঁড়ি করিতে লাগিল। কেহ তাহার যকৃৎটি কাটিয়া লইল। কেহ তাহার চক্ষুদ্বয় ও প্লীহা কাটিল, কেহ তাহার রক্ত সংগ্রহ করিতে লাগিল। অপরাপর লোকেরা দেহ গ্রন্থির কোমল অস্থি সকল কাটিতে লাগিল। ব্যাঘ্রের চক্ষুর তারার ঔষধি গুণ আশ্চর্য। ব্যাঘ্রের রক্ত ১১০ ডিগ্রি উত্তাপে শুখাইলে অপূর্ব তেজস্কর ও বলকারক ঔষধ বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এবং শুষ্ক যকৃৎ ও প্লীহা গুঁড়া করিয়া ব্যবহার করিলে অনেক রোগ আরাম হয়। সুলতান আবদুল সমৎ যকৃৎটি লইলেন ও অপরাপর অংশগুলি চৈনিক চিকিৎসকেরা বহুমুল্যে ক্রয় করিয়া

* Unbeaten Tracks in Japan নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ২৭৫ পৃষ্ঠা দেখুন।

** উক্ত গ্রন্থের ২৭৫ পৃষ্ঠা দেখুন।

লইল।" বাঙ্গালা দেশে ব্যাঘ্রের ঘি অথবা চর্বি বাতরোগের ঔষধ বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বর্মার উত্তর প্রদেশনিবাসী সান জাতির মধ্যেও ব্যাঘ্রের ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব ঔষধ স্বরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডাক্তার জে আন্ডারসন তৎসম্বন্ধে বলেন,* "সানেরা বলে যে গর্ভিনী ব্যাঘ্রীর গর্ভস্থলী সিদ্ধ করিয়া পান করিলে রোগাক্রান্ত ব্যক্তি বল প্রাপ্ত হয় ও শীঘ্র আরাম হয়। ব্যাঘ্রের পাকস্থলী শুষ্ক করিয়া ব্যবহার করিলে অনেক দুঃসাধ্য রোগ আরোগ্য হয়। রোগীর শরীর দুর্বল হইলে ব্যাঘ্রের পায়ের অস্থি গুঁড়া করিয়া সেবন করাইলে রোগী বলপ্রাপ্ত হয়।"

* A Report on the Expedition to Western Ynuan Via Bhamo নামক গ্রন্থের ১১৪ পৃষ্ঠা দেখুন।

ভারতী ● আষাঢ় ১৩০০ (১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দ)



ভেদ নামক অরণ্যের বন্য মনুষ্য

লঙ্কা উপদ্বীপের মধ্যস্থ অংশ পর্বত ও অরণ্যেতে আচ্ছাদিত আছে বৃক্ষ সকল পৃথক হইয়াছে অনেক ঊর্ধ্বগমন কোমল বৃক্ষের সহিত এবং জমির উপরে ক্ষুদ্র ঝাড় ও লম্বা তৃণ উৎপত্তি হয় এজন্য এই বড়ো অরণ্য মধ্য হইতে যাহা ওই দেশীয় লোকেরা জঙ্গল বলিয়া থাকে ক্ষুদ্র পথ পাওয়া সুকঠিন হয়। কেবল অনেকানেক সর্প ও বন্য পশু সকল এই সকল স্থানে বাস করে ইহা নয়, কিন্তু এক আশ্চর্য জাতির মনুষ্য যাহারা ভেদস কিংবা অরণ্যের বন্য মনুষ্য রূপে পরিচিত হইয়াছে।

এই অসভ্য বনবাসীদের ঘর কিংবা গ্রাম নাই যখন প্রকাশ্য হয়, যখন কাল নীরস হয় তখন তাহারা বনমধ্যে ভ্রমণ করে, এবং বৃক্ষের তলাতে নিদ্রা যায় এবং কখনো বা বৃক্ষের শাখার উপরে থাকে কিন্তু আর্দ্র কালেতে তাহারা গহ্বরের ভিতরেতে গমন করে, কিংবা পর্বতের আশ্রমেতে বিছাইয়া থাকে উহাদের শয্যা কেবল অল্প পত্রেতে হয়, আর এক টুকরা বস্ত্র যাহা উহাদের কটিতে আছে, এবং অল্প তির ব্যতিরেকে তাহাদের প্রতিবাসী পশুদের অপেক্ষা উহাদের আর অধিক বিষয় নাই।

এই গরিব জীব সকল আহারার্থে কখনো জমি চাষ করে না, কিন্তু মুল ও বন-মধু খাইয়া জীবন ধারণ করিত আর কখনো-কখনো তাহারা টিকটিকি ও বানর এবং অন্যান্য পশু যাহা তাহারা বন মধ্যে পাইত তাহা আহার করিত। উহাদিগকে অসভ্যের মতো দৃষ্ট হইত তাহাদের কেশ আলগা ও অপরিষ্কার এবং সূর্যের কিরণেতে জ্বলিয়া পিঙ্গালবর্ণ হইয়াছে।

একজন দেশ ভ্রামকের এক বৃদ্ধ ভেদের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল তাহাকে তাহার পরিবার আনিতে জিজ্ঞাসিলেন যে উনি তাহাদিগকে দেখিবেন। ওই ভেদ বলিল উহারা কখনো শুভ্র মনুষ্যকে দেখে নাই এজন্য উহারা আসিবে না এক শুভ্র মানুষ অপেক্ষা উহারা

এক জংলী পশুর সহিত শীঘ্র সাক্ষাৎ করিবে। কিন্তু বকশিশ অঙ্গীকৃত হইলে সে উহাদিগকে অনুসন্ধান করিতে গেল অল্প সময়েতে বড় চিৎকার শব্দ কর্ণগোচর হইল ওই বন্য মনুষ্য উহার স্ত্রী এবং সন্তানদিগকে জোর পূর্বক টানিয়া আনাতে উহারা ভ্রম প্রযুক্ত ক্রন্দন করিতেছিল। যখন উহারা নিকটবর্তী হইয়া ওই দেশ ভ্রামককে দেখিল তখন উহারা পুনর্বার উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া দ্রুতগতি হইয়া জঙ্গালের মধ্যে প্রবেশ করিল। অনেক সময়ান্তে ওই মনুষ্য উহার স্ত্রীকে ও কন্যাকে এবং ছোটো সন্তানকে ওই স্থানেতে আনিতে চেষ্টা করিল। এবং ওই সম্রান্ত মনুষ্য ওই ছোটো বালকের হস্ত ধরাতে সে এমন ভীত হইল যে চিৎকার করিয়া দ্রুতগামী মৃগের সদৃশ হইয়া জঙ্গালের মধ্যে দৌড়িল।

ওই পিতা কোথায় বিশ্রাম করে জিজ্ঞাসা করাতে প্রত্যুত্তর করিল বৃক্ষোপরি। কিন্তু তোমার স্ত্রী ও সন্তানেরা কোথায় শয়ন করে? বৃক্ষোপরি। কিন্তু কী প্রকারে তাহারা আরোহণ করে। ইহা তাহাদের স্বভাব। তোমরা কী আহার কর? সকল সামগ্রী, যখন যাহা প্রাপ্ত হই। তোমরা কোন্ ধর্মবলম্বী? তুমি কী বলিতেছ আমরা তাহা জানি না। মনুষ্য সকল মৃত্যুর পরে কোথায় যায়? আমরা জানি না।

ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান এই বন্য মনুষ্যদের কিছুই মাত্র নাই যদ্যপি উহাদের কোনো উপাসনা থাকে তাহা কেবল অপদেবতাকে ভজনা নিবেদন করা। যখন উহাদের মধ্যে কেহ পীড়িত হয় তখন তাহারা শয়তানকে নৃত্য করায় এবং ওই দুরাত্মাকে (যে তাহাদের অনুমানে তাহাদিগকে দুঃখ দেয়) তাহাকে নারিকেল ও চাউল উৎসর্গ করে। তাহাদের ঘণ্টার ও দিনের নাম বিষয় কিছুই জ্ঞান নাই ; ফলত তাহারা অজ্ঞানতার ও দুঃখের নীচ অবস্থায় পতিত হইয়াছে।

সত্যার্ণব ● মে ১৮৫২



বুশমান জাতির বিবরণ

আফ্রিকা খণ্ডের উত্তমাশা অন্তঃরীপান্তঃপাতি অরণ্যপ্রদেশে বুশমান নামক অসভ্য লোকেরা বাস করে। কী চমৎকার! তাহারা ৩/৪ দিন পর্যন্ত কিছুমাত্র আহার না করিয়া জীবনধারণ করিতে পারে। এবং অনশনান্তে এত অধিক সামগ্রীও ভোজন করিতে পারে, যে তাহা শুনিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। কোনো ইংরেজ লিখিয়াছেন, যে একজন বুশমানকে ১৫ সের পরিমিত একটা মেষের সমুদায় মাংস ভোজন করিতে দেখা গিয়াছে।

ক্ষুধার সময়ে খাদ্যসামগ্রী না পাইলে তাহাদিগের ক্ষুধা যত প্রবল হইতে থাকে, ততই তাহারা একটা কটিবন্ধের দ্বারা তাহাদিগের কঙ্কালদেশ অত্যন্ত দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া গাঁজার ন্যায় ডাকা নামক মাদক দ্রব্যের ধূমপান করিতে থাকে। তাহাতে তাহারা ক্রমে ক্রমে মাদকতায় মত্ত হইয়া ৩।৪ দিন পর্যন্ত অহর্নিশ ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। তন্নিমিত্ত ক্ষুধার ক্লেশ কিছুই অনুভব করিতে পারে না।

তাহাদিগের উপজীবিকা উপার্জনে কিছুই মনোযোগ নাই। তজ্জন্য তাহারা কোনো প্রকার শস্যবপন, বৃক্ষরোপণ, পশুপালন. বা বাণিজ্যাদি কোনো কর্ম করে না। অধিক কী কহিব, পরদিন যে কী আহার করিবে, তাহাও বোধ নাই। কেবল কানন মধ্যে পর্যটন করিতে কোনো লোকের নিকট হইতে যাহা প্রাপ্ত হয়, তাহাই মাত্র ভোজন করে।

আহা কী চমৎকার! ইহারা পরম মঙ্গলাকর সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরকে কেবল তমোগুণাবলম্বী মন্দকারীরূপে জ্ঞান করে। পরকালের বিষযে তাহাদিগের এমত বোধ আছে, যে অনন্তকাল পর্যন্ত ঘোরতর ভয়ানক অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানে বাস করিতে হইবে। তথায় আহারার্থে ঘাস ব্যতীত আর কোনো সামগ্রীই নাই। আর তাহারা জ্ঞান করে, যে কেবল

সূর্য হইতে ধরাতলে বারিবর্ষণ হইয়া জীবের জীবন রক্ষা হয় ; তন্নিমিত্তে সূর্য মেঘাচ্ছন্ন হইলেই তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করণার্থ ও মেঘের প্রতি ক্রোধ প্রদর্শনার্থ একখান দগ্ধকাষ্ঠ লইয়া ঊর্ধ্বভাগে উচ্চ করে।

তাহারা অত্যন্ত অসভ্য বটে, কিন্তু পর্বতের উত্তমোত্তম প্রস্তরের উপরিভাগে নানাবিধ পশ্বাদির প্রতিমূর্তি অতি সুচারুরূপে চিত্রিত করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদিগের বর্ণের কিছুমাত্র প্রভেদ করে না। তাহারা অবিরত নৃত্য বাদ্যানুরত, কিন্তু তাহাদিগের বাদ্যযন্ত্র কেবল গুণসংযুক্ত এক ধনুকের ন্যায় মাত্র। ওই গুণেতে অঙ্গুলীর আঘাত দ্বারাই তাহারা বাদ্য করে।

সুলভ পত্রিকা ● কার্তিক ১২৬০ (১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দ)



প্রস্তর যুগের মানুষ : বুশম্যান

শ্রীসুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী

দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায় কালাহারি মরুভূমি এবং ইহার নিকটবর্তী স্থানে বুশম্যান জাতি বাস করে। বৈজ্ঞানিকদের মতে এই বুশম্যান-জাতি প্রস্তরযুগের মানুষ। আজ পর্যন্ত ইহারা সেই প্রস্তরযুগের অবস্থায় রহিয়াছে, সভ্যতার আলোক ইহাদের কিছুমাত্র স্পর্শ পর্যন্ত করিতে পারে নাই, সুতরাং নৃতত্ত্বের দিক দিয়া ইহাদের আচার-ব্যবহার, জীবনযাত্রার প্রণালী প্রভৃতি পর্যবেক্ষণের বিশেষ মূল্য আছে। জনৈক বৈজ্ঞানিক ইহাদের জীবন্ত 'ফসিল' বলিয়াছেন।

বর্তমান তথাকথিত সভ্যতার সংঘাতে ইহারা অত্যন্ত ক্ষয়িষ্ণু জাতি হইয়া পড়িয়াছে। বর্তমানে সমগ্র আফ্রিকায় কয়েক শতের অধিক বুশম্যান পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ। পুরাকালে উহারা যে সকল স্থানে শিকার করিয়া জীবনধারণ করিত, তাহা ক্রমে হটেন্‌টট জাতিব অধিকারে আসে। পরে বান্টু এবং বর্তমানে য়ুরোপীয়গণ সেই স্থানে আধিপত্য করিতেছে। ইহার ফলে ইহারা ক্রমশ এমন স্থানে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছে যে, সেই সকল স্থানে শিকার পাওয়া কঠিন এবং জলের অত্যন্ত অভাব। সুতরাং ইহারা যে বর্তমানে ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে চলিয়াছে, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই ; বরং ইহাই বোধহয় স্বাভাবিক।

সম্প্রতি ডোনাল্ড বেন নামক জনৈক শিকারি ও আবিষ্কারক ইহাদের নিশ্চিত বিলোপ হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। বুশম্যান জাতি সম্পূর্ণরূপে বন্ধনহীন, ইহাদের কোনো দেশ নাই, কোনো ধর্মবিশ্বাস নাই এবং ইহাদের রক্ষা করিবার জন্য কোনো গভর্নমেন্টের শিরঃপীড়া নাই। মিঃ বেন কালাহারি মরুভূমিতে একটি 'রিজার্ভ'

বা উহাদের জন্য বিশেষ ভাবে রক্ষিত ভূখণ্ড জোগাড় করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এইখানে বাস করিলে বুশম্যানেরা বেচুয়ানাল্যান্ড ও কেপ প্রদেশের বান্টুদের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইবে।

তাঁহার পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করিবার প্রথম চেষ্টাস্বরূপ, মিঃ বেন কালাহারির মধ্যভাগে একটি অস্থায়ী শিবির স্থাপন করেন এবং বহু কৌশলে এবং ধৈর্যের ফলে প্রায় এক শত বুশম্যানকে এখানে আনিয়া রাখিতে সমর্থ হন। এই দলের অধিনায়কত্ব দেওয়া হয় শতজীবী এক বুশম্যানকে—এই বৃদ্ধ এখন 'বুড়া আব্রাহাম' নামে পরিচিত। এই শিবিরে শিকারের সুবিধা করিয়া দিয়া এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া মিঃ বেন ইহাকে এক প্রকার বুশম্যানের স্বর্গ করিয়া তোলেন, কারণ বুশম্যানেরা সাধারণত অত্যন্ত কষ্টে জীবনযাপন করে, প্রচুর শিকার প্রায়ই তাহাদের ভাগ্যে জুটিয়া উঠে না। মিঃ বেন ক্রমশ বুশম্যানদের অত্যন্ত বিশ্বাসের পাত্র হইয়া উঠেন এবং তখন বুশম্যান সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য তিনি উইটওয়াটারস্‌র‍্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের নিমন্ত্রণ করেন।

বুশম্যানদের প্রাথমিক সংকোচ ও ভয় কাটিয়া যাইবার পর, অধ্যাপকবা তাহাদের ফটো লইলেন, মুখের ছাঁচ লইলেন, শরীরের মাপ লইলেন এবং বুশম্যানদের নৃত্য দেখিলেন ও গান শুনিলেন।

বুশম্যানেরা দৈর্ঘ্যে প্রায় সাড়ে চার ফুট হইয়া থাকে, সম্ভবত ইহারাই পৃথিবীর খর্বতম মানুষ। ইহাদের ওজন সাধারণত এক মণের বিশেষ ওপরে যায় না। জন্মকাল হইতে রৌদ্রে পুড়িয়া ইহাদের গাত্রচর্ম কুঞ্চিত হইয়া থাকে এবং প্রচণ্ড রৌদ্রে মরু-অঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়ানোর ফলে ইহাদের পায়ের তলায় অত্যন্ত কঠিন কড়া পড়িয়া যায়। ইহারা কখনও এক স্থানে স্থির ভাবে বাস করে না, শিকারের সন্ধানে দেশ হইতে দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়। অনেক সময়, ভালো শিকার মেলে, এরূপ স্থানে উহারা কিছুদিন থাকিয়া যায় এবং গাছের ডাল ও ঘাস দিয়া কুটির নির্মাণ করে। মরুভূমি অঞ্চলে জলের অভাব বলিয়া বুশম্যানেরা উটপাখির ডিমের খোলায় পানীয় জল ভরিয়া বালির ভিতর পুঁতিয়া রাখে। জলের অভাবে বুশম্যানেরা এতই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে যে, তাহারা জীবনে কখনও স্নান করে না, প্রচুর শিকার পাইলে সর্বাঙ্গে চর্বি মর্দন করে।

আহার্য ও পানীয় সংগ্রহ করা ব্যতীত জীবনের অন্য কোনো উদ্দেশ্য বুশম্যানদের নাই। এই হিসাবে ইহারা বন্য জন্তু অপেক্ষা উন্নততর নহে। মরুভূমি অঞ্চলে দুই এক প্রকার গাছ হইতে ছোটো ছোটো ফল এবং এক প্রকার তরমুজ ব্যতীত আর কোনো উদ্ভিজ্জাত খাদ্য পাওয়া যায় না। এইগুলি ছাড়া ইহারা প্রধানত হরিণ শিকার করিয়া খায়। বিছা ও নানা প্রকার পোকা, উই ও উইয়ের ডিম এবং পঙ্গপাল উহাদের অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য। উহারা কখনও দল বাঁধিয়া থাকে না, কারণ একই স্থানে বহু লোকের খাদ্য সংগ্রহ করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার।

শিকার করিবার জন্য উহারা তির ও ধনু ব্যবহার করে। তিরের ফলাগুলি পাথরের এবং তাহাতে কাঁচপোকা জাতীয় এক প্রকার পোকা হইতে তৈয়ারি বিষ লাগানো থাকে। কোনো শিকার দেখিলেই বুশম্যানেরা তাহাকে অনুসরণ করে এবং কাছাকাছি আসিলেই তির নিক্ষেপ করে। উহাদের ধনুতে অধিক দূর তির ছোড়া যায় না। তিরের আঘাতেই শিকার মরে না, কারণ বিষের ক্রিয়া অত্যন্ত ধীরে ধীরে হয়। সুতরাং তির নিক্ষেপ করিবার পর অনেক সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা শিকারের পশ্চাদ্ধাবন করিতে হয়। পুরুষদের সঙ্গে মেয়েরা এবং শিশুরাও চলিতে থাকে। অবশেষে বিষের ক্রিয়ায় শিকার ধরাশায়ী হইলে শিকারি তিরটি ও তিরের সংলগ্ন মাংস কাটিয়া বাদ দেয় এবং তাহার পরে সকলে মিলিয়া তৎক্ষণাৎ কাঁচা মাংস খাইতে আরম্ভ করিয়া দেয়। খাদ্য সম্বন্ধে ইহাদের কোনো বাছ-বিচার নাই ; পচা ডিম, সিংহ ও শৃগাল কর্তৃক ভক্ষিত পচা মাংসাবশেষ ইহারা পরম তৃপ্তির সহিত খাইয়া থাকে।

বুশম্যানদের কোনো ধর্ম আছে কি না, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে ; কেহ কেহ বলেন যে, উহাদের কোনো ধর্ম নাই, তবে কুসংস্কার কতকগুলি আছে এবং উহাদের মধ্যে ভূতের গল্প প্রচলিত আছে, সুতরাং উহারা ভূত বিশ্বাস করে। অনেক সময় দেখা যায় যে, উহারা পেট ভরিয়া খাইতে পাইলে পূর্ণিমার রাত্রে চন্দ্রের উদ্দেশ্যে এবং জীবন্ত ঘাসের উদ্দেশ্যে নাচিয়া থাকে ; কেহ কেহ মনে করেন যে, এই প্রকার নৃত্য উহাদের এক প্রকার ধর্মানুষ্ঠান এবং উহারা চন্দ্রের উপাসনা করে। নাচের সময় স্ত্রীলোকেরা তাহাদের দেহ এবং মুখ শিকারে মৃত পশুর রক্ত দ্বারা রঞ্জিত করে এবং পুরুষরা মাথায় শৃগালের লেজ এবং পায়ে ঝুমঝুমি বাঁধে। নাচের তাল দিবার জন্য উহারা হাততালি দেয় এবং একঘেয়ে ভাবে কয়েকটি বিশেষ সুরের পুনরাবৃত্তি করিতে থাকে, কখনো-কখনো একটি খোঁটায় বাঁধা অথবা ধনুকে বাঁধা তার বাজায়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বুশম্যানদের ধর্ম বলিয়া কিছু আছে কিনা সন্দেহ, কিন্তু উহাদের দৈনন্দিন জীবনে কয়েকটি পবিত্র হাড় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। আমাদের দেশে যেমন কোনো শুভাশুভ প্রভৃতি দেখিতে হইলে পাঁজির সাহায্য লওয়া হয় এবং পাঁজির সিদ্ধান্ত—অনেক সময়ই—নির্ভুল বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়, এই হাড়গুলিও উহাদের সেইরূপ কাজে আসে। এই হাড়গুলির সংখ্যা সাধারণত চারটি, যদিও সময় সময় একসঙ্গে তেরোটি পর্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কোনো কিছু করিবার পূর্বে বুশম্যানেরা পাশার মত এইগুলি ছোড়ে এবং ইহাদের অবস্থান হইতে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করে।

যুরোপীয় পণ্ডিতগণ বুশম্যানদের সংস্পর্শে বিশেষ আসেন নাই, সুতরাং তাঁহাদের অনেকের বুশম্যানদের সম্বন্ধে অনেক ভুল ধারণা ছিল, কিন্তু পর্যবেক্ষণের ফলে দেখা গিয়াছে যে, বুশম্যানেরা মোটেই বিশ্বাসঘাতক বা কুটিল প্রকৃতি নহে, বরং তাহারা অত্যন্ত সরল। তাহাদের মধ্যে আমোদপ্রিয়তা যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। বালকদের মতো তাহারা পরস্পরের সঙ্গে প্রায়ই ফস্টিনস্টি করিয়া থাকে। তাহাদের সরলতার সুযোগ লইয়া শহরের লোকেরা সুযোগ পাইলেই তাহাদের ঠকাইয়া থাকে, কিন্তু

তাহাতে তাহারা বিশেষ ক্ষুব্ধ হয় বলিয়া বোধ হয় না। সম্প্রতি "সাউথ-ওয়েস্ট আফ্রিকান কমিশন" বুশম্যানদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে "উহারা নিতান্ত অল্পবুদ্ধি এই মত ভ্রান্ত, উহাদের বুদ্ধিবৃত্তি উহাদের পারিপার্শ্বিক হিসাবে ভালোই বলিতে হইবে। সাধারণের মত এই যে, বুশম্যানরা পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা পশ্চাদ্‌পদ মনুষ্যগোষ্ঠী। কিন্তু এই মত ঠিক নহে, উহাদের শিল্প এবং রূপকথা ভাল স্তরের বলিতে হইবে। ইহা ছাড়া একটি বিষয়ে উহাদের জ্ঞান আছে, যাহা আফ্রিকার অন্য বন্য জাতির জ্ঞান অপেক্ষা সুসংবদ্ধ—এই জ্ঞানটি হইতেছে বিভিন্ন লতাপাতা ও পোকামাকড়ের বিষাক্ততা ও নির্বিষতা সম্বন্ধে।"

বঙ্গশ্রী ● ভাদ্র ১৩৪৪ (১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ)



ডোকো জাতির বিবরণ

আফ্রিকা খণ্ডের মধ্যবর্তী দেশ-সকলের যথার্থ বিবরণ জনসমাজে প্রচার নাই। মঙ্গোপার্ক, রুপেল, স্মিথ, বিক ও অন্যান্য ভ্রমণকর্তারা উক্তদেশ ভ্রমণোন্মুখ হইয়া পথিমধ্যে যে বিষম ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন তাহা শ্রবণে আর কেহ তৎকর্মে প্রবৃত্ত হন নাই। আর তত্তদ্দেশ বিষয়ে যাহা কিছু প্রচার আছে তাহা জনশ্রুতি মাত্র, সুতরাং সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নহে। অনেকে কহিয়া থাকেন যে আফ্রিকা খণ্ডের মধ্যস্থান বালুকাময় মরুভূমি ; তাহাতে কোনো উদ্ভিজ্জ পদার্থ জন্মে না। প্রচলিত ভূগোল গ্রন্থে এই মরুভূমি "সাহারা" নামে প্রসিদ্ধ আছে এবং ইহার পরিমাণ ভারতবর্ষের দ্বিগুণরূপে নিরূপিত হইয়াছে ; কিন্তু এ বিষয়ের কোনো বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই। এই মরুভূমির দক্ষিণে আবিসিনিয়া দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে কাফা নামে এক প্রদেশ আছে ; এবং কাফরি-দাস-ক্রয়-করণার্থে ক্রীতদাস ব্যবসায়ীরা তথায় সর্বদা গমনাগমন করিয়া থাকে। বিক নামক বিখ্যাত ভ্রমণকর্তা এই দেশে গিয়া তত্রত্য বিজ্ঞব্যক্তিবর্গ হইতে ইহার দক্ষিণ-পশ্চিমে যে-সকল দেশ আছে তাহার যে বিবরণ সংগ্রহ করত প্রকাশ করিয়াছেন তন্মধ্যে "ডোকো" নামে এক বামন জাতি বিশেষের বিবরণ আছে, তাহার যৎকিঞ্চিৎ পাঠকবর্গদিগের সুগোচরার্থে প্রকাশ করা গেল।

বিক সাহেব লেখেন "ডোকোদিগের দেশ কাফা হইতে এক মাসের পথ অন্তর। ইহাতে ক্রীতদাস ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য কেহ গমন করে না। এই দেশ গমনের প্রচলিত পথ কাফা হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখী। এই পথ দিয়া প্রথম দাম্ব দেশ পরে কুচা ও কুলু দেশ ভ্রমণ-পূর্বক ইরো নদী পার হইয়া টুফটে গ্রামে যাইতে হয় ; তৎপরে যে দেশ তাহাতে ডোকো নামক জাতি বিশেষের অবস্থান। অন্যত্রের দশ বারো বৎসর বয়স্ক বালকেরা যে পরিমাণে দীর্ঘ ডোকোদিগের স্ত্রী পুরুষেরাও তদ্রূপ ; অতি বৃদ্ধ বয়স্ক ডোকোরাও তদপেক্ষায় দীর্ঘ হয় না। ইহারা সর্বদা উলঙ্গ থাকে ; কোনো বস্ত্রাদি ধারণ

করে না ; এবং পিপীলিকা সর্প, মুষিকাদি জন্তু ও অন্যান্য হেয় পদার্থ যাহা অপর মনুষ্যেরা ভোজ্য মধ্যে গণ্য করে না তাহাই ইহারা ভক্ষণ করত দিনপাত করে। কথিত আছে যে পিপীলিকা-সর্পাদি ধৃত করণে ইহারা এতাদৃশ তৎপর যে তন্নিমিত্তে প্রতিবাসী অন্য জাতিদিগের প্রশংসাভাজন হইয়াছে। তাহারা এই নিকৃষ্ট ভোজ্য এতাদৃশ প্রিয় জ্ঞান করে যে নিয়ত সুখাদ্য প্রাপ্ত হইলেও ইহার অন্বেষণে বিরত হয় না। স্বদেশে ইহারা অলংকারস্বরূপে সর্প-চর্ম ধারণ করে। এবং বৃক্ষাদি আরোহন করিতে ইহারা অতি তৎপর এবং মস্তক অধ রাখিয়া উর্ধ্বপাদ হইয়া তৎকর্ম সাধন করে। মনুষ্যের দুর্গম্য অতি নিবিড় বন ইহাদিগের বাসস্থান ; এবং দাসান্বেষকেরা কখনো-কখনো এই বন মধ্যে এক বৃক্ষোপরি বহু সংখ্যক ডোকোদিগকে দেখিতে পাইলে তাহাদিগকে কোনো সুদৃশ্য পদার্থ দর্শাইলে তল্লোভে ডোকোরা ভূমিতে নামে তাহাতে তাহারা অনায়াসে ধৃত হয়। ধৃত-করণ সময়ে কোনো ডোকো ক্রন্দন করিলে দাসান্বেষকেরা তৎক্ষণাৎ তাহাকে বধ করে ; নচেৎ তাহার ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করত তাহার সমভিব্যাহারিরা পলায়ন করিয়া দাসান্বেষকদিগের শ্রম বিফল করে।

"ডোকোরা দলবব্ধ হইয়া বাস করে ; কিন্তু বিবাহ বিষয়ে তাহাদের কোনো নিয়ম নাই ; ইচ্ছানুসারে পরস্পর স্ত্রী-পুরুষে ঐক্য হয়। এবং ইচ্ছানুসারে পৃথক হয়। যে পর্যন্ত মাতারা পিপীলিকান্বেষণে সক্ষম না হয় তদবধি তাহাদিগের অপত্যকে স্তনপান করায় ; এবং ওই অপত্য স্বয়ং পিপীলিকা ধৃত করণে পারগ হইলে পিতামাতার সহিত তাহার আর কোনো সংস্রব থাকে না। ডোকোদিগের মধ্যে কোনো পদের ভেদ নাই ; সকলেই তুল্য ; কেহ কাহাকে আজ্ঞা করে না ; কেহ আজ্ঞাবহ নাই ; কেহ দেশরক্ষক নাই, এবং স্বদেশের মঙ্গালাকাঙ্ক্ষীও কেহ নাই। শত্রু হইতে রক্ষার্থ পলায়ন করাই তাহাদের প্রধান উপায়। এবং নিয়ত তাহাই অবলম্বন করে।

"ডোকোদিগের ঈশ্বর জ্ঞান আছে ; এবং কখনও কখনও ইহারা ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করিয়া উর্ধ্বে পদ নিক্ষেপ করত অত্যন্ত কাকুক্তির সহিত "ইয়ার" "ইয়ার" শব্দ উচ্চারণ করে ; এবং কহে "ইয়ার যদ্যপি তুমি থাক ; তবে কেন আমাদিগকে মরিতে দেও ; আমরা অন্ন বস্ত্রাদি যাচ্ঞা করি না ; কেবল সর্প পিপীলিকা ও মূষিক ভক্ষণ করত দিনপাত করি।" কখনো কখনো ৫-৬ ব্যক্তি একত্র মিলিয়া এতদ্রূপ ভজনা করে। ফল ভক্ষণ করিলে কদাপি ডোকোরা পরস্পর বিবাদ করত সবল দুর্বলের প্রাণ নাশ করিয়া থাকে।

"ডোকোদিগের ভাষা অতি অস্পষ্ট গুণ গুণ শব্দ প্রায় ; পরন্তু তাহা উহাদের পরস্পর ও দাসান্বেষকদিগের বোধগম্য বটে। অপর দাস রূপে বিক্রীত হইয়া ভদ্র সমাজে নীত হইলে ইহারা সুবুদ্ধিমান ও কর্মে তৎপর হয় ; ও স্ব স্ব স্বামীর সর্বতোভাবে মঙ্গল চেষ্টা করিয়া থাকে, এতৎ প্রযুক্ত কাফা দেশবাসীরা ডোকোজাতীয় ক্রীতদাসদিগকে কদাপি বিক্রয় করে না।"



পাপুয়া

পৃথিবীতে সবচেয়ে বড়ো দ্বীপ অস্ট্রেলিয়া। তার পরেই আয়তনের দিক দিয়া নিউ-গিনি বা পাপুয়া। আয়তনে নিউ-গিনি সত্তর হাজার বর্গ মাইল। পশ্চিমের অর্ধেকটা আছে ডাচের অধিকারে। পূর্বাংশের দক্ষিণার্ধ-ভাগ পাপুয়া নামে পরিচিত। পাপুয়া এখন অস্ট্রেলিয়ার অধীন। উত্তরার্ধ-ভাগ ছিল জার্মানির অধিকারে। গত মহাযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক সন্ধি শর্তে এ অংশের শাসনভার অস্ট্রেলিয়ার হাতে গিয়াছে। নিউ-গিনির উত্তর-পূর্বাংশটুকু ব্রিটিশের। ব্রিটিশ নিউ-গিনি নামে এ অংশের খ্যাতি।

নিউ-গিনির দক্ষিণ-পূর্ব সীমানায় সাগর-তরঙ্গে খানিকটা অংশ ভাঙিয়া-চুরিয়া ছোটো-খাটো কয়েকটি দ্বীপ গড়িয়া উঠিয়াছে। সেগুলিকে লুইসেইড দ্বীপপুঞ্জ নামে অভিহিত করা হয়। এ কয়টি দ্বীপের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো সুডেস্ট—লম্বায় ৪৫ মাইল। এখানে এবং কাছাকাছি ছোটো দ্বীপ মিশিয়ায় সোনার খনির সন্ধান মিলিয়াছে।

নৃতত্ত্ববিদরা বলেন, আদিম নিওলিথিক যুগের মানুষের চিহ্ন যদি কোথাও আজও মেলে তো সে এই পাপুয়ায়। কত হাজার-হাজার বৎসর কাটিয়া গেল, পাপুয়ার এই আদিম-পাপুয়ান জাতি কিন্তু আচারে-ব্যবহারে রীতি-নীতিতে—সব বিষয়ে সেই আদিম যুগের মতো রহিয়া গিয়াছে। পাথর এবং অস্থি-কঙ্কাল লইয়া আজও ইহারা অস্ত্র-শস্ত্র নির্মাণ করে, ঠিক সেই আদিম যুগের মতো। এবং এই অস্ত্র-শস্ত্রকে সহায় করিয়াই তারা জলে-স্থলে শিকার করিতেছে এবং সর্ববিধ বিপদের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া আজও বাঁচিয়া আছে. তাদের বাড়ি-ঘর এখনও পশুপক্ষীর নীড়ের ছাঁদে নির্মিত হইতেছে। বাড়ি-ঘরের ছাদ নৌকার পিঠের মতো। সে-ছাদের তারা সজ্জাভূষণ সম্পাদন করে নারিকেলের মালা, কড়ি, শাঁখ বা নিহত শত্রুদের মাথার খুলি দিয়া। এসব ঘরবাড়ি অধিকাংশই নির্মিত হয় জলার বুকে বা মরা-হাজা নদীর বুকে খুঁটি পুঁতিয়া। গাছের মাথায়-মাথায়, শাখায়-শাখায়,

বাসা বাঁধিয়াও বাস করে। মই লাগাইয়া সেসব ঘরে প্রবেশ করিতে হয়। নগ্নতার উপর কেহ বল্কল বা পত্র-পল্লবের আবরণ টানিয়া দেয় ; কেহ বা নগ্ন-দেহে বাস করে—তাহাতে তিলমাত্র তাহাদের লজ্জা নাই।

মেয়েরা আজকাল আর নগ্ন-দেহে থাকে না—কোমরে গুচ্ছাকারে তৃণ-গুল্ম বাঁধিয়া লজ্জা নিবারণ করে। স্ত্রীপুরুষ সকলেই গায়ে চিত্র-বিচিত্র নকশা আঁকিয়া দেহ রঞ্জিত করে। তারপর নাক-কান ফুঁড়িয়া কাঠি-কুঠি বা সামুদ্রিক মাছের কাঁটা অথবা পশুপক্ষীর হাড় বিঁধিয়া অলংকার-ভূষণের ব্যবস্থা—পাপুয়ান সমাজে মস্ত শৌখিনতা। কড়ি, হাড়, দাঁতের মালা-কাঁকনেও তাদের অলংকার-ভূষণ সম্পাদিত হয়। মাথায় যারা নানা পাখির রঙিন পালক গোঁজে, শৌখিন বলিয়া তাদের নাম-ডাকের অন্ত থাকে না!

অশিক্ষিত বর্বর হইলেও এ-দ্বীপের মেয়েরা কিন্তু পুরুষের দাস্য করে না। স্ত্রীপুরুষে সাম্য আছে। ছোটো-বড়ো দল বাঁধিয়া ইহারা বাস করে। দলে যেমন এক জন করিয়া সর্দার আছে, তেমনি সর্দারনিরও অভাব নাই! সর্দারনিদের শক্তি এবং সম্মান সর্দারদের চেয়ে এক-তিল কম নয়। চাষবাস করা, মাছ ধরা, শিকার ও পশুপালন—সব কাজেই স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার।

কাঠের উপর খোদাইয়ের কাজে এখানকার বর্বর জাতির গুণপনা আশ্চর্য রকমের! নৌকা-ডিঙি—এগুলার কাঠে কত রকমের নকশা খোদাই করে, দেখিলে বিস্ময় বোধ হয়! মাছ ধরিবার জন্য যে-জাল বোনে, সে-জালেও কী রকমারি নকশা!

নিউ-গিনি গরম দ্বীপ। তবে বর্ষাও এ দ্বীপে দাতা-কর্ণের মতো বারি-বর্ষণ করে। বৃষ্টি প্রায়ই হয়। সেজন্য নদী-নির্ঝরে বন্যার দৌরাত্ম্য খুব বেশি। এখানকার জমি উর্বর। চারিদিকে ঘন বন-জঙ্গল। সে জঙ্গলে আছে প্রচুর ইউক্যালিপ্টাস, তাল, নারিকেল, সাগুদানার গাছ। বাদাম, সুপারি, রাস্‌পবেরি, স্ট্রবেরি একেবারে অন্তহীন। কার্পাস গাছ এখানে অজস্র জন্মায়। আর আছে আখের বন! তামাক হইতে শুরু করিয়া আলু, রাঙা আলু, কপি, শালগম সবই এ-দ্বীপে অজস্রভাবে জন্মায়! প্রকৃতিদেবী অফুরান হাতে নিজের ভাণ্ডার এখানে যেন মুক্ত করিয়া দিয়াছেন!

পাখি—বর্ণবিভবে সমৃদ্ধ নানা-জাতের পাখির বাস এখানে। বার্ড-অফ প্যারাডাইস—এই দ্বীপেরই পাখি। তাছাড়া কাকাতুয়া, পায়রা, চন্দনা, মাছরাঙা, ময়ূর, টার্কি, কাশোয়ারি, হর্নবিল,—বনে-বনে যেন চিড়িয়াখানা! তেমনি আবার প্রজাপতি এবং কীট-পতঙ্গের বর্ণ-বিভবেও অজস্র মাধুরী!

কয় বৎসর পূর্বে মার্কিন যুক্তরাজ্যের কৃষি-বিভাগ হইতে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ এই দ্বীপে গিয়াছিলেন এখানকার কৃষি-সম্পদের তত্ত্ব লইতে।

অস্ট্রেলিয়া হইতে প্লেনে চড়িয়া তাঁরা আসিয়া নিউ-গিনির দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে সামারাই নামক ক্ষুদ্র দ্বীপে অবতরণ করেন। তারপর সেখান হইতে ২৬০ মাইল দূরে পোর্ট মোরেশবিতে যাত্রা করেন। এদলে প্রধান ছিলেন ডক্টর ব্রাভিশ, পি-এচ-ডি। যাত্রাপথের বর্ণনায় তিনি লিখিয়াছেন,—সমুদ্র ঘিরিয়া উপকূল-প্রদেশগুলি দেখিলাম। দেখিয়াছি, পত্র-

পল্লবে নিবিড় শ্যামলিমা—নারিকেলের অবিচ্ছিন্ন কুঞ্জশ্রেণি! দূরে দূরে কোথাও জলা। সেই জলার বুক হইতে সাপের মতো আঁকিয়া-বাঁকিয়া বহিয়া চলিয়াছে অজস্র ছোটো-বড়ো নদী। নদীর জল গৈরিক। সে জলস্রোত অসংখ্য শাখা-প্রশাখা বহিয়া প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে গিয়া মিশিয়াছে!

পোর্ট মোরেশবির কাছাকাছি কয়েকখানি ঘরবাড়ি দেখিলাম একেবারে জলের বুকে। প্লেন হইতে সেগুলিকে দেখাইতেছিল যেন পাশাপাশি অসংখ্য বোট বাঁধা আছে। প্রতি গৃহের সঙ্গে একখানি করিয়া নৌকা আছে। পাহাড়ি হিংস্রজাতির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য এখানকার শান্ত অধিবাসীরা এমনি করিয়া সেকালে জলের বুকে ঘর বাঁধিয়া বাস করিত। সে রীতি আজও প্রচলিত আছে।

পোর্ট মোরেশবির পিছনে গিরিশ্রেণি। ছোটো দুটি পাহাড়ের মাঝখানে সমতল উপত্যকায় পোর্ট মোরেশবি। সেই উপত্যকায় একালের বাসোপযোগী ঘর-বাড়ি নির্মিত হইয়াছে। এসব ঘরবাড়িতে থাকে সভ্য, শিক্ষিত বিদেশি ব্যবসায়ীর দল। পোর্ট মোরেশবিতে প্রায় তিন শত শ্বেতাঙ্গের বাস। ইহাদের মধ্যে কেহ ব্যবসায়ী, কেহ বা সরকারি কাজ করে।

এখান হইতে রবার, ঝুনা-নারিকেল, তামা, সোনা, মুক্তা, কড়ি, ঝিনুক, ম্যানগ্রোভ (ওষধি-লতা) এবং ত্রেপাঙ নমে এক রকম সামুদ্রিক গুল্ম নানা দিগ্‌দেশে চালান যায়। এখানে মুক্তা খুব বেশি মেলে না। যা মেলে, তা ভাসিয়া আসে কুইন্‌স্‌ল্যান্ড-অঞ্চল হইতে।

পোর্ট মোরেশবি ব্রিটিশ নিউ-গিনির অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষা-সভ্যতার ফলে এ-অঞ্চল বুনো ভাব হইতে কতকটা মুক্ত। দেশি-লোকদের জন্য লেখাপড়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে অনেকে ডকে এবং কলকারখানায় কাজ করে। তাছাড়া চাষবাস করা এবং মাছ ধরাই এদেশি লোকের জীবিকার প্রধান অবলম্বন। আমাদের দেশে যেমন ভাত, এদেশে তেমনি সাগুদানা সকলের প্রধান খাদ্য।

বিবাহের সম্বন্ধে এদেশীয় অধিবাসীদের মধ্যে কোনোরূপ বাঁধা-ধরা নিয়ম-কানুন নাই। বাপ-মা বিবাহের কথাবার্তা কহিলেও সেকথা বড়ো একটা টিকে না! যে যাকে চায়—এই নীতি মানিয়া স্ত্রীপুরুষে দাম্পত্য সম্পর্ক গড়িয়া তোলে। তবে সম্পর্ক গড়িয়া তুলিবার মুখে কন্যার জন্য বরকে মূল্য দিতে হয়। সম্পর্ক-বন্ধন যদি অটুট থাকে, ভালো! নচেৎ বরের কাছ হইতে কন্যা যে-মূল্য গ্রহণ করে, বিচ্ছেদ ঘটিলে হিসাব করিয়া কন্যাকে সে-দাম ফেরত দিতে হয়। দাম্পত্য সম্পর্ক স্বীকার করিবার পর স্বামী ভিন্ন অপর পুরুষকে কোনো নারী দেহ দান করিতে পারে না।

এ-দ্বীপে শিশু-কন্যাকে জলে বিসর্জন দিবার রীতি বিদ্যমান আছে বলিয়া পুরুষের চেয়ে স্ত্রীলোকের সংখ্যা কম। তবু এক-এক জন পুরুষ তিন-চারিটি করিয়া পত্নী গ্রহণ করে! তার ফলে বহু পুরুষের ভাগ্যে স্ত্রী-লাভ ঘটে না। তারা চিরদিন শিশুপাল থাকিয়া যায়!

পূর্বে লজ্জা-নিবারণের কথা বলিয়াছি। দশ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেরা, এবং ছয় বৎসর

পর্যন্ত মেয়েরা কাপড়-চোপড় পরে না, উলঙ্গ থাকে। তারপর পুরুষদের কোমরে ওঠে ছোটো কৌপীন—মেয়েরা পরে তৃণগুচ্ছের ঝালর-ঝুলানো ছোটো ঘাগরা।

স্ত্রীপুরুষে বিবাহে দাম্পত্য সম্পর্ক মানবার আগে পর্যন্ত মেয়েদের মাথায় চুল দীর্ঘ রাখিবার বিধি আছে। বিবাহ হইলেই চুল ছাঁটিয়া বব করিতে হয়। এই বব-করা চুলে বহু নারী গুচ্ছ বাঁধে, কেহ বা নানা-ছাদের নকশায় কেশ-গুচ্ছ সাজাইয়া তোলে।

সাগুদানা ছাড়া রসনার তৃপ্তির জন্য এদেশি লোক খায় মাছ এবং শিকার করা পশু-পক্ষী।

তির-ধনু লইয়া ইহারা ডোঙায় চড়িয়া মাছ ধরে। বনে-জঙ্গলে গিয়া শিকার করে শূকর এবং কাশোয়ারি নামে বড় জাতের বন-মোরগ! ইহাদের কাছে কালিয়া-পোলাওয়ের তুল্য রাজভোগ কাশোয়ারি—টার্কি-জাতের পাখি। বনে থাকে। এক-একটা আকারে বিপুল—প্রায় খাসির মতো।

যে যত বড়ো শিকারি, সমাজে তার তত মান-ইজ্জত। এজন্য এ-জাত শিকারের রেকর্ড রাখে। বাড়ির সামনে বাঁশ পুঁতিয়া মৃগয়াহত পশুপক্ষীর মাথা, হাড়, নখ, পালক ; নিহত শত্রুর মাথার খুলি—এগুলি হইল এ জাতের বনিয়াদির জয়-পতাকা।

মেয়েরাও মাছ ধরিতে খুব পটু। জাল এবং ছোটো ছোটো শড়কি-বর্শা লইয়া ছোটো-বড়ো সব বয়সের মেয়েরা নদী-নালায় ঘুরিয়া বেড়ায় মাছের সন্ধানে।

তিরক্ষেপে সমুদ্রে মাছ ধরা—এ বিদ্যায় পাপুয়ানদের পটুতার তুলনা নাই। লক্ষ বড়ো একটা ব্যর্থ হইতে দেখা যায় না! পাপুয়ান-উপসাগরে বড়ো-বড়ো কাঁকড়া পাওয়া যায়। এ কাঁকড়া চালান দিয়া বহু শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ী আজ বহু অর্থ উপার্জন করিতেছে।

তামাক নিউ-গিনির নিজস্ব সম্পত্তি। অথচ এখানকার লোক পূর্বে তাম্রকূটের সেবা করিত পাতা পুড়াইয়া—সেই পোড়া পাতা মুখে দিয়া। ষোড়শ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য বণিকের দল আসিয়া এখানকার তামাক দখল করিয়া বসে এবং তাদের কাছ হইতেই পাপুয়ানরা তামাকের যথারীতি সেবা শিখিয়াছে।

ডক্টর ব্রান্ডিশ লিখিতেছেন,—চল্লিশ হাজার বর্গ-মাইল ব্যাপিয়া অবস্থিত হইলেও নিউ-গিনির ওই ডাচ এবং ব্রিটিশ-অধিকৃত অংশমাত্র সভ্য-সমাজের পরিচিত—অবশিষ্ট অংশ এখনও সভ্য জগতের অপরিচিত রহিয়া গিয়াছে। সে-অংশে যেমন জঙ্গল, জলার তেমনি প্রাচুর্য। প্লেনে চড়িয়া শূন্যপথ হইতে এ-অংশের পরিচয় লইবার প্রয়াস পাইয়াছিলাম। ফ্লাই-নদীর রেখা ধরিয়া শূন্যমার্গে সোজা উত্তরদিকে উড়িয়া উপর হইতে যেটুকু দেখিয়াছি,—তার কোথাও জন-বসতির চিহ্ন নাই। ভিক্টর এমানুয়েল-গিরি হইতে উত্তর-পূর্ব দিকে একশো মাইল দূর পর্যন্ত বন-জঙ্গল হইতে ধূমরাশি উঠিতে দেখিয়াছি। তাহাতে মনে হয়, ও-অঞ্চলে লোকজনের বাস আছে। কিন্তু এ-অঞ্চল এমন ঘন জঙ্গলে সমাকীর্ণ যে, সেখানে যাইবার যোগ্য রন্ধ্রপথও

খুঁজিয়া পাই নাই। এই একশো মাইল পার হইয়া আরও ষাট মাইল অগ্রসর হইবার পর নীচে এক-জায়গায় বিস্তীর্ণ একখণ্ড সমতল ভূমি দেখিয়া বিঘ্ন-বিপত্তির ভয় ত্যাগ করিয়া প্লেন নামাইয়াছিলাম। প্লেন নামাইয়া দেখি, চারিদিকে আখ গাছের সুদীর্ঘ ঘন ঝোপ! বহু সন্ধানেও লোকজনের সাড়া-শব্দ পাই নাই!

সেখান হইতে দক্ষিণে স্টিকল্যান্ডে আসিলাম। স্টিকল্যান্ডের একটু উত্তর-পশ্চিমে ম্যরে হ্রদ দেখিলাম। হ্রদটি উত্তর-দক্ষিণে চল্লিশ মাইল দীর্ঘ। এ হ্রদ হইতে বহু নদী শীর্ণ-বিশীর্ণ রেখায় নানা দিকে বহিয়া গিয়াছে। জায়গাটি চমৎকার। হ্রদের বুকে মাঝে মাঝে চড়া পড়িয়াছে। ভিজা চড়া। হ্রদের বুকে এক-জাতের পদ্ম দেখিলাম—উজ্জ্বল গোলাপী বর্ণের পদ্ম। পদ্মের ব্যাস প্রায় চৌদ্দ ইঞ্চি। এত বড়ো পদ্ম পৃথিবীর আর কোথাও নাকি জন্মায় না! পদ্ম ছাড়া আরও কত রকমের বিচিত্র বর্ণের ফুল দেখিলাম। হ্রদের বুকে ছোটো-বড়ো হাঁস—পাতিহাঁস, রাজহাঁস ; এবং বক।

এই হ্রদের পরে সুগভীর জঙ্গল। এখানকার ঘন জঙ্গলে এখনও বহু রাক্ষস-পাপুয়ানের বসতি আছে। রাক্ষস বলিবার কারণ, নর-মাংসে আজও তাদের রুচি আছে ; এবং মানুষ-মৃগয়াকেই তারা চরম শৌর্যের পরিচয় বলিয়া জানে। ইহারা "মাথা-শিকারি" (head-hunters) নামে খ্যাত। কাহারও সঙ্গে যদি বিবাদ-বিরোধ ঘটিল তো তার মাথা না লওয়া পর্যন্ত কোনো পক্ষের স্বস্তি নাই!

'মানুষ-মারা' এই সব শিকারিদের ধনুকের তিরগুলা বিষাক্ত। সে তিরের নির্মাণে মানুষের কেরামতির চরম পরিচয় পাওয়া যায়। এসব তৈয়ারি হয় কাশোয়ারি জাতের টার্কির নখ হইতে, শূকরের দাঁত-নখ হইতে। এইসব নখ লইয়া নানা ভাবে সেগুলিকে বিষাক্ত করে। ফলে কাহারও গায়ে এ-তির বিঁধিলে তিরের ফলায় রক্তপাত হইয়া তখনি তার মৃত্যু নিশ্চিত। রক্ত না পড়িলেও তিরের তীক্ষ্ণ আঁচড়ে সারা দেহ এমন বিষাক্ত হইয়া ওঠে যে, তার প্রাণরক্ষার আর উপায় থাকে না।

স্টিকল্যান্ডের উত্তরে পামার। পামারে অতি-প্রাচীন নেগ্রিকো জাতের বাস। সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এ-জাতির বিলোপ ঘটিতেছে। নেগ্রিকোরা আকারে খর্ব এবং তাদের প্রকৃতি অত্যন্ত নিরীহ ও শান্ত।

ওক্‌টেডি এবং এভারিল বন-পর্বতময়। এ বনের কাঠ খুব মজবুত—দেশ-বিদেশে চালান যায়।

নিউ-গিনির মধ্যে ব্রিটিশ-অধিকৃত অংশটুকু যতখানি সভ্যতার সংস্পর্শ পাইয়াছে, ডাচ-অধিকৃত অংশ ততখানি পায় নাই। য়ুরোপীয় জাতিদের মধ্যে ডাচ জাতিই সর্বপ্রথম আসিয়া নিউ-গিনিতে আস্তানা পাতে। বাণিজ্যকল্পেই ডাচেরা এখানে আসিয়া প্রথমে উদয় হইয়াছিল। তারপর প্রকৃতির সম্পদের মোহে তারা দেশে প্রত্যাগমন না করিয়া এইখানে আস্তানা পাতে এবং এখান হইতে চালানি-কারবার শুরু করিয়া দেয়। ডাচ-অধিকৃত নিউ-গিনির কোথাও এমন জায়গা নাই, সভ্যতার মাপকাঠিতে যে জাগয়াকে নগর-আখ্যায় ভূষিত করা যায়। ইংরেজ এ-দ্বীপে প্রথম আসে ১৭১৩ খ্রিস্টাব্দে। ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির

তরফ হইতে সার জন হেইস এ দ্বীপে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু ডাচ জাতির বিক্রমে তাঁর সে প্রয়াস ব্যর্থ হয়।

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে জার্মান নিউ-গিনি কোম্পানি নামে এক বণিক সম্প্রদায় এখানে আসিয়া ব্যবসার পত্তন করে। তারা আসিয়া এ দ্বীপের একাংশের নাম দিয়াছিল কাইজার ইউলহেল্‌ম দ্বীপ। জার্মানরা এখানে বহু বন্দর তৈয়ারি করে, বহু নদীকে জাহাজ-চলাচলের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলে। কিন্তু ম্যালেরিয়ার দৌরাত্ম্যে তারা টিকিতে পারিল না—সে সব বন্দরও লোপ পাইতেছে। সে বন্দরগুলির মধ্যে ফিন্‌শ হাভেন আজ জলহীন ; বার্লিন হাভেন এবং পটস্‌ডাম হাভেন এখনও মুক্তার উৎসরূপে বিরাজ করিতেছে। এসব অঞ্চলে তুলা, কফি ও তামাকের চাষ বেশ সমৃদ্ধ। কিন্তু মুশকিল এই যে, প্রয়োজনমতো কুলি পাওয়া যায় না। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে মলয় হইতে বহু কুলি আনা হয়—তখন এখানে জার্মানের সংখ্যা ছিল এক শতের কিছু বেশি। এদিকে শুধু মাডাঙ উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। এখানে তখন জার্মান অধিবাসীর সংখ্যা ছিল প্রায় তিন শত।

বাণিজ্য-ব্যবসায়ে জার্মানিকে সমৃদ্ধি সঞ্চয় করিতে দেখিয়া প্রতিবেশি অস্ট্রেলিয়ানদের অস্বস্তি এবং হিংসার অন্ত রহিল না। কিন্তু য়ুরোপীয়ান শক্তি বলিয়াই অস্ট্রেলিয়া কোনো দিন প্রকাশ্যে জার্মানির বিরুদ্ধে বিরোধ ঘোষণা করে নাই।

জার্মান মহাযুদ্ধের অবসানে তাই এসব স্থানে অস্ট্রেলিয়ানরা দাবি বসাইল। আর সে-দাবি অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া লিগ অফ নেশন্‌স জার্মান-আধকৃত নিউ-গিনিটুকু অস্ট্রেলিয়ার হাতে তুলিয়া দিয়াছে। ব্রিটিশ নিউ-গিনি অস্ট্রেলিয়ান কমনওয়েল্‌থের হাতে গিয়াছে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে।

নিউ-গিনিতে সোনা পাওয়া যায়, পূর্বে বলিয়াছি। তাছাড়া তামা এবং আরও বহু ধাতু মেলে। পেট্রোল এবং কয়লাও এখানে প্রচুর মিলিতেছে। এখানকার বুনো অসভ্য জাতি সেসব সামগ্রীর দাম বোঝে না। কাজেই এ-দ্বীপটিকে পূর্ণভাবে ভোগ করিবার জন্য স্বাধীন ও শক্তিমান জাতির লোভ ষোল আনা। প্রকৃতির বুকে পুঞ্জিত এ সম্পদ পাইতে হইলে দেশীয় লোকজনের কায়িক পরিশ্রম অপরিহার্যভাবে প্রয়োজন। তাই এখানকার বুনো অসভ্য জাতিকে মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য স্কুল-কলেজ ও কল-কারখানা নির্মাণে শ্বেতাঙ্গ সভ্য জাতির আজ আর এতটুকু কৃপণতা নাই। বন-জঙ্গল এবং নদী-জলার অজস্রতার জন্য দ্বীপটির বহু স্থান এখনও রীতিমত দুরধিগম্য রহিয়াছে। এখানকার লালোকি গিরিপ্রপাত নাকি নায়েগ্রার চেয়েও বিরাট ও বিশালতর!

এখানকার যতটুকু লোক-লোচনের অন্তর্গত হইয়াছে, তাহা হইতে সকলে আশা করেন, এই সব অনধিকৃত বন-গিরি-উপত্যকাদি যদি কোনো দিন মনুষ্য-লোকের আয়ত্তাধীন হয়, তাহা হইলে নিউ-গিনি হইতে যে সম্পদ মিলিবে, সে-সম্পদের বিনিময়ে দু-একটা মহাদেশ ক্রয় করা হয়তো অসম্ভব হইবে না! এখানকার সোনা ও তামার খনির সম্পদের কথা ছাড়িয়া দিলেও পাপুয়া হইতে প্রতি বৎসর নানা দেশে যে গাছ চালান যায়, তার দাম প্রায় পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড।

লক্ষ্মীর এই ভাণ্ডারটির জন্য জাপান যদি আজ নিউ-গিনির দিকে লোলুপ হস্ত প্রসারিত করে, তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই! ধার-করা শিক্ষা-সভ্যতার মোহে অসভ্য নিউ-গিনির দিকে আমরা হয়তো তাচ্ছিল্যভরে তাকাইতে জানি না। এই অসভ্য বুনো জাতির বসতি নিউ-গিনি দ্বীপের বুকে কী অমূল্য সম্পদ-সম্ভার পুঞ্জিত আছে, সে পরিচয় পাইলে শ্রদ্ধা-বিস্ময়ের সীমা থাকিবে না! আদিমজাতির জন্য দুঃখ হয়! হায় রে, ঘরে লক্ষ্মী বসিয়া আছেন, অথচ সে-লক্ষ্মীর পানে চাহিতে জানে না! এ-দ্বীপের মাটিতে কী শুধু সম্পদ আছে! এই নিউ-গিনির চারিদিকে সাগর রত্নাকররূপে বিদ্যমান। এখানকার সাগর-বক্ষে মণিমুক্তা-প্রবালের যে তোশাখানা সঞ্চিত আছে, কোন্ ভাগ্যধর জাতি সে তোশাখানা অধিকার করিবে, কে জানে?

মাসিক বসুমতী ● শ্রাবণ ১৩৪৯ (১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ)



নানাদেশীয় লোকের শববিষয়ক ব্যবহার

নানাদেশীয় লোকেরা যে প্রকারে মৃত শরীরের শেষ ক্রিয়া করে সে অগ্রাহ্য নহে, যেহেতুক এমন দুই জাতি নাই যে যাহারদের শববিষয়ক ক্রিয়াতে বৈলক্ষণ্য নাই।

ইংগ্লন্ডীয়েরা এবং সকল খ্রিস্টিয়ানেরা শব মৃত্তিকার মধ্যে পোঁতে। আমেরিকীয়েরা ইংগ্লন্ড হইতে উঠিয়া গিয়া আমেরিকাতে অনেক কালাবধি বসতি করিয়াছে ও স্বতন্ত্র রাজ্য হইয়াছে, তাহারাও আপন পূর্ব-পুরুষেরদের ব্যবহার ত্যাগ করে নাই। কিন্তু তাহারদের প্রধান অধ্যক্ষ হেনরি লারন্স সাহেব আপন মৃত শরীর আপনার আজ্ঞায় দগ্ধ করাইলেন ; এই ব্যবহার সর্বসাধারণ নহে, একবার মাত্র হইয়াছিল।

হিন্দুস্থানে হিন্দু লোকেরা আপনারদের শব দাহ করে এবং মুসলমানেরা পোঁতে। ব্রহ্মা দেশীয়েরদের মধ্যে দাহ ব্যবহার আছে, দুষ্ট লোকেরদের ও ঘৃণ্য রোগার্ত জনেরদের শরীর পোঁতে এই ব্যবহার তাহারদের অসম্ভ্রমসূচক।

কাফ্রিরদের মধ্যে কবর দেওয়া কেবল রাজার উপযুক্ত, অন্য অন্য শব নির্দয়তারূপে বনে পশুরদের নিকটে ক্ষেপ করা যায়। এই বিষয়ে তাহারদের অত্যন্ত অসভ্য অনবধান আছে। যেহেতুক তাহারা মরিবার প্রথম চিহ্ন দেখিয়া আপন মিত্রেরদের শরীর বনে নিক্ষেপ করে। তাহারা ভাবে যে যদি কোনো ব্যক্তি ঘরে মরে তবে অশেষ কাল পর্যন্ত সেখানে দুর্ভাগ্য হইবে ; অতএব তাহারদের কিছুমাত্র চরম ক্রিয়া নাই।

নব-হলান্ডের লোকেরা আপনারদের মিত্র লোকের শব মহাবৃক্ষের কোটরের মধ্যে দণ্ডায়মান করিয়া রাখে এবং শবের মস্তক ও অস্থি শ্বেত কিংবা রক্ত বর্ণ করে।

দক্ষিণামেরিকাতে অরণকো নদীর তীরস্থ লোকেরা রজ্জুদ্বারা শব বান্ধিয়া জলের

মধ্যে নিক্ষেপ করে, ও রজ্জু তীরস্থ বৃক্ষে বান্ধিয়া রাখে, তাহাতে মৎস্যেরা চব্বিশ ঘণ্টায় ওই শবের সমুদায় মাংস খাইয়া যায় এবং অবশিষ্ট অস্থি তাহারা ঘরে আনিয়া রক্ষা করে।

তত্রস্থ অন্য এক অসভ্য জাতিরা ওই অস্থি ধূলিবৎ চূর্ণ করিয়া ধর্ম ক্রিয়া জ্ঞানে খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে মিশ্রিত করে, সেখানে মক্সো নামে জাতির আশ্চর্য ব্যবহার আছে; তাহারা জনারের আটার সহিত ওই চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পিষ্টক করে এবং তাহারা মিত্রতা করিবার কালে ওই গৃহজাত পিষ্টক ভোজন করে; সে সকল হইতে পরম মিত্রতার এক চিহ্ন।

মৃত লোকেরদিগকে রাখিতে সকল হইতে অপকৃষ্ট রীতি আফ্রিকা দেশের কঙ্গা নদীর তীরে আছে। তাহারা ছয় সাত বৎসর পর্যন্ত মৃত শরীর কবরে দেয় না, কিন্তু গন্ধ নির্গত না হওনের কারণ বস্ত্রের দ্বারা বেষ্টন করে; এবং তাহারা আপনারদের অর্থানুসারে ওই বেষ্টনের বস্ত্র বাড়ায়; যদি কোনো ভাগ্যবান লোক মরে তবে তাহার শরীরে এত বস্ত্র জড়ায় যে বস্ত্র জড়াইতে জড়াইতে এক ঘরে সে শব ধরে না, পরে অন্য ঘরে লইয়া রাখে। সেখানেও ওই রূপে বস্ত্র জড়াইতে জড়াইতে ধরে না, তাহাতে অন্য ঘরে লইয়া যায়; এই রূপ ছয় ঘর পর্যন্ত রাখিয়া পরে তাহাকে কবরে দেয়।

গ্বিয়ানা দেশেতে ইহা হইতেও কু-ব্যবহার চলে; যখন তাহাদের মধ্যে কোনো অধ্যক্ষ মরে তখন তাহার স্ত্রীরা ত্রিশ দিন পর্যন্ত সে শবত্যাগ করে না, সে শবের নিকটে তাহারদের সর্বদা বসিয়া থাকিবার আবশ্যকত্ব। সে শরীরের দুর্গন্ধ লক্ষ লক্ষ মক্ষিকাদিগকে আকর্ষণ করে তথাপি তাহারা এমন সর্বদা তাহার নিকটে থাকে যে এক মক্ষিকাও বসিতে পারে না। ওই ত্রিশ দিনের পরে ওই শবকে কবরে দেওয়া যায় ও তাহার সহিত সহবাসার্থে এক স্ত্রীকে তাহার সহিত কবরে দেয়।

পিরু দেশের পর্বতীয় লোকেরা মৃত লোককে দুর্গের উপরে রাখে তাহার উপরে কিছু আবরণ করে না। পূর্বকালে ফ্রিজিয়া দেশীয়দের মধ্যে অধ্যাপক মরিলে তাহার শব এই বোধ করিয়া কোনো উচ্চ স্তম্ভের উপরে রাখে, যে সে মরণান্তেও লোকেরদিগকে উপদেশ দেয়। পারসি দেশীয় লোকেরা এই মতো জ্ঞান করে যে যদি কোনো সত্য মুসলমান অবিশ্বাসী লোকের মধ্যে মরে, তবে কবরের দূতেরা এমন মন্দ সভার মধ্যে থাকিতে দিবে না, কিন্তু আকাশ পথ দ্বারা আনিয়া অবশ্য বিশ্বাসী লোকেদের দেশে তাহাকে লইয়া রাখিবে।

প্রাচীন এক পথিক মুসলমান অনেক দিবস পর্যন্ত সিংহল দ্বীপে গিয়াছিল; সে লিখিয়াছে যে যখন কোনো রাজা মরে তখন তাহার শব গাড়ির উপরে এমত রাখে, যে তাহার মস্তক গাড়ি হইতে মৃত্তিকা পর্যন্ত ঝুলিয়া পড়ে এবং সেই মস্তকে ধূলি নিক্ষেপ করিতে করিতে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ স্ত্রীলোকেরা যায়। তিন দিন এইরূপ করিয়া পরে সে

শরীরে চন্দন ও কর্পূর ও কেশর এই তিন দ্রব্য পূর্ণ করিয়া রক্ষা করে, পরে সেই শরীর দগ্ধ করে এবং তাহার ভস্ম আকাশে উড়াইয়া দেয়।

সরকাসিয়া দেশে এক জাতীয়েরা এইমতো আপনারদের অধ্যক্ষেরদের শব রক্ষা করিয়া রাখে। তাহারা মৃত শরীর সিন্দুকের মধ্যে রাখে এবং তাহার চক্ষুর সমস্থানে সিন্দুকে ছিদ্র করে যেন মৃত শরীর তাহার দ্বারা স্বর্গ দেখিতে পায় ; পরে ওই সিন্দুক বৃক্ষের ডালে বন্ধ করিয়া রাখে। মধুমক্ষিকাসমূহ ওই ছিদ্রদ্বারা মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মধু ও মোম দিয়া সে শরীরকে আবরণ করে, এবং লোকেরা উপযুক্ত সময়ে সেই মধু তাহা হইতে লইয়া বাজারে বিক্রয় করে।

দিগ্‌দর্শন ● জানুয়ারি ১৮২০



পরিশিষ্ট

কালানুক্রমিক প্রবন্ধপঞ্জি

নানাদেশীয় লোকের শববিষয়ক ব্যবহার
দিগ্‌দর্শন; ১৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড; জানুয়ারি ১৮২০; পৃষ্ঠা ১৭-২১
সম্পাদক : জন ক্লার্ক মার্শম্যান

ডোকো জাতির বিবরণ
বিবিধার্থ-সংগ্রহ; ১ম খণ্ড, ৭ম সংখ্যা; বৈশাখ ১৭৭৪ শকাব্দ, পৃষ্ঠা ১১১-১১২
সম্পাদক : রাজেন্দ্রলাল মিত্র

ভেদ নামক অরণ্যের বন্য মানুষ
সত্যার্ণব; ২ কাণ্ড, ১১ সংখ্যা; মে ১৮৫২; পৃষ্ঠা ১২৯-১৩০
সম্পাদক : রেভারেন্ড জেমস লঙ

বুশমান জাতির বিবরণ
সুলভ পত্রিকা; ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা; কার্তিক ১২৬০; পৃষ্ঠা ৬০-৬২
সম্পাদক : দ্বারিকানাথ রায়

আদিম মনুষ্য
বঙ্গদর্শন; চতুর্থ খণ্ড; ভাদ্র ১২৮২; পৃষ্ঠা ২০৫-২০৮
সম্পাদক : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সাঁওতাল জাতির বিবরণ ॥ রামব্রহ্ম সান্যাল
সখা; ষষ্ঠ ভাগ, প্রথম সংখ্যা; জানুয়ারি ১৮৮৮; পৃষ্ঠা ১২-১৩
সম্পাদক : অন্নদাচরণ সেন

ব্যাঘ্র-পূজা ॥ শরৎচন্দ্র মিত্র
ভারতী, আষাঢ় ১৩০০; পৃষ্ঠা ১৭৭-১৮৭
সম্পাদক : স্বর্ণকুমারী দেবী

সিংভূমের কোলজাতি ॥ গিরিবালা দেবী
ভারতী, ভাদ্র ১৩০০; পৃষ্ঠা ২৮৮-২৯৯
সম্পাদক : স্বর্ণকুমারী দেবী

নীলগিবির টোডা জাতি ॥ স্বর্ণকুমারী দেবী
ভারতী; উনবিংশ খণ্ড; মাঘ ১৩০২; পৃষ্ঠা ৫৭৫-৫৮২
সম্পাদক : হিরন্ময়ী দেবী ও সরলা দেবী

চুলকাটা মিশমি ॥ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
প্রদীপ; প্রথম ভাগ, ৫ম সংখ্যা; বৈশাখ ১৩০৫; পৃষ্ঠা ১৫৬-১৫৮
সম্পাদক : রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

খাসিয়া জাতি ॥ হেমন্তকুমারী চৌধুরী
অন্তঃপুর; ৪র্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা; জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮; পৃষ্ঠা ১১৩-১১৬
সম্পাদক : হেমন্তকুমারী চৌধুরী

আন্ডামানি ॥ গিরিজাকুমার ঘোষ
প্রবাসী; ১ম ভাগ, ৫ম সংখ্যা; ভাদ্র ১৩০৮; পৃষ্ঠা ১৮৯-১৯৪
সম্পাদক : রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

কুকিদিগের বিবরণ ॥ কেদারনাথ মজুমদার
নব্যভারত; বিংশ খণ্ড, ২য় সংখ্যা; জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯; পৃষ্ঠা ৬৬-৭১
সম্পাদক : দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী

চাকমাদিগের ভাষা-তথ্য ॥ সতীশচন্দ্র ঘোষ
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা; ৪র্থ সংখ্যা; সন ১৩১৩; পৃষ্ঠা ২৩৭-২৪৭
সম্পাদক . নগেন্দ্রনাথ বসু

চাকমাজাতির সংস্কার কর্ম ॥ সতীশচন্দ্র ঘোষ
প্রবাসী; ৭ম ভাগ, ৮ম সংখ্যা; অগ্রহায়ণ ১৩১৪; পৃষ্ঠা ৪৫৪-৪৬৪
সম্পাদক . রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

মিশমি জাতি ॥ মুদ্রাবাক্ষস
প্রবাসী; ৭ম ভাগ, ১১শ সংখ্যা; ফাল্গুন ১৩১৪; পৃষ্ঠা ৬৩৫-৬৩৯
সম্পাদক : রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

আসামের নাগা জাতি ॥ মুদ্রারাক্ষস
প্রবাসী; ৭ম ভাগ, ১২শ সংখ্যা; চৈত্র ১৩১৪; পৃষ্ঠা ৭১৮-৭২২
সম্পাদক : বামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

সাঁওতালি গান ॥ সরসীলাল সরকার
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা; ষোড়শ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা; সন ১৩১৬; পৃষ্ঠা ২৪৯-২৫২
সম্পাদক : নগেন্দ্রনাথ বসু

সাঁওতালগণের বিবরণ ॥ প্রভাসচন্দ্র রায়
বঙ্গীয-সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশন; ভাগলপুর; ১৩১৮, পৃষ্ঠা ১৯০-১৯৮
রামকমল সিংহ প্রকাশিত

মুন্ডা জাতি ॥ শরৎচন্দ্র রায়
বাণী; ৪র্থ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা; আষাঢ় ১৩১৮; পৃষ্ঠা ১৩১ ১৩৬
সম্পাদক : অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ

ছোটোনাগপুরের ওরাওঁ জাতি ॥ শরৎচন্দ্র রায়
প্রবাসী; ১৩ ভাগ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা; বৈশাখ ১৩২০; পৃষ্ঠা ৮৮-৯২
১৩ ভাগ, ১ম খণ্ড; ৩য় সংখ্যা; আষাঢ় ১৩২০; পৃষ্ঠা ২৯৪-২৯৯
১৩ ভাগ, ১ম খণ্ড; ৪র্থ সংখ্যা; শ্রাবণ ১৩২০; পৃষ্ঠা ৪৬৬-৪৭০
সম্পাদক : রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

হাজং জাতির বিবরণ ॥ দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র সিংহ শর্ম্মণঃ
সৌরভ; ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৌষ ১৩২০; পৃষ্ঠা ৯৩-৯৭
সম্পাদক : কেদারনাথ মজুমদার

ভারতে অনার্যদিগের মধ্যে বিবাহপদ্ধতি
ভারতী; ৩৭শ বর্ষ, দশম সংখ্যা, মাঘ ১৩২০; পৃষ্ঠা ১১৩৭-১১৪২
সম্পাদক : স্বর্ণকুমারী দেবী

গারো পল্লিতে একদিন
সৌরভ, ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, চৈত্র ১৩২০; পৃষ্ঠা ২০৪-২০৮
সম্পাদক : কেদারনাথ মজুমদার

ওরাওঁদের ঐতিহ্য ॥ শরৎচন্দ্র রায়
প্রবাসী; ১৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা; কার্তিক ১৩২১; পৃষ্ঠা ২০-২৪
সম্পাদক : রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

ছোটোনাগপুরি হো ॥ পরমেশপ্রসন্ন রায়
সৌরভ; ৩য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২২; পৃষ্ঠা ২০৮-২১৩
সম্পাদক : কেদারনাথ মজুমদার

তিপ্‌রা বা তিপারা জাতি ॥ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
ভারতী; ৪১শ বর্ষ, নবম সংখ্যা; পৌষ ১৩২৪; পৃষ্ঠা ৮০৩-৮১২
সম্পাদক : সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

কুকি ॥ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
ভারতী; ৪১শ বর্ষ, দশম সংখ্যা; মাঘ ১৩২৪; পৃষ্ঠা ৯৪৫-৯৫৫
সম্পাদক : সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

রাভাজাতির বিবরণ ॥ গোপালচন্দ্র নিয়োগী
সৌরভ; ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩২৪; পৃষ্ঠা ১১৯-১২১
সম্পাদক : কেদারনাথ মজুমদার

ত্রিপুরা রাজ্যের কতিপয় জাতি ॥ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
ভারতী; ৪১শ বর্ষ, একাদশ সংখ্যা; ফাল্গুন ১৩২৪; পৃষ্ঠা ১০১৫-১০২৬
সম্পাদক : সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতে মানবের প্রাচীনত্ব ও ন্যূনাধিক চারি লক্ষ বৎসর পূর্বের কয়েকটি প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন ॥ পঞ্চানন মিত্র
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা; ৩য় সংখ্যা; সন ১৩২৬; পৃষ্ঠা ১৮৭-১৯৫
সম্পাদক : খগেন্দ্রনাথ মিত্র

পাহাড়ি জাতির মধ্যে অগ্ন্যুৎপাদনের উপায় ॥ সরসীলাল সরকার
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা; ৩য় সংখ্যা; সন ১৩২৬; পৃষ্ঠা ১৯৬
সম্পাদক : খগেন্দ্রনাথ মিত্র

ওড়িষ্যার আদিম অধিবাসী॥ ভূপতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
সাহিত্য; ৩০শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা; কার্তিক ১৩২৭; পৃষ্ঠা ৪৫৯-৪৬৮
সম্পাদক : সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

পাহাড়ি জাতির খাদ্যের উপকরণ॥ সরসীলাল সরকার
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা; ২য় সংখ্যা; সন ১৩২৮; পৃষ্ঠা ৭১-৭৪
সম্পাদক : খগেন্দ্রনাথ মিত্র

সাঁওতাল পুরাণ ॥ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
মানসী ও মর্মবাণী; ১৪শ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা; বৈশাখ ১৩২৯, পৃষ্ঠা ১৯৩-১৯৯
সম্পাদক : জগদিন্দ্রনাথ রায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

জাতি-বিজ্ঞান ॥ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
ভারতবর্ষ; ১০ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩২৯; পৃষ্ঠা ২৭৫-২৮২
সম্পাদক : জলধর সেন

ওরাওঁদের 'বানগাড়ি ও খলিহান পূজা এবং নওয়াখানী' ॥ যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
ভারতবর্ষ; ১০ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা; কার্তিক ১৩২৯; পৃষ্ঠা ৬৯৬-৬৯৮
সম্পাদক : জলধর সেন

সাঁওতালদের পূজা-পদ্ধতি ॥ রণেন্দ্রবিজয় দাস
শান্তিনিকেতন; ৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা; ভাদ্র ১৩৩১; পৃষ্ঠা ১৪৭-১৪৯
সম্পাদক : প্রমথনাথ বিশী

লেপচা জাতির কথা ॥ নলিনীকান্ত মজুমদার
মানসী ও মর্মবাণী; ১৬শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা; মাঘ ১৩৩১, পৃষ্ঠা ৫৬৫-৫৬৮
সম্পাদক : জগদিন্দ্রনাথ রায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

সাঁওতাল-জীবন ॥ বিভূতিভূষণ গুপ্ত
প্রবাসী; ২৫শ ভাগ, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা; জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২; পৃষ্ঠা ২৬২-২৬৭
সম্পাদক : রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

সাঁওতালদের গ্রামে ॥ প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়
প্রবাসী; ২৫শ ভাগ, ১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা; ভাদ্র ১৩৩২; পৃষ্ঠা ৬৪১-৬৪৪
সম্পাদক : রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

আর্য ও অনার্য শিল্প ॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বঙ্গবাণী ; ৫ম বর্ষ, প্রথমার্ধ, ২য় সংখ্যা; চৈত্র ১৩৩২; পৃষ্ঠা ১৭২-১৮১
সম্পাদক · বিজয়চন্দ্র মজুমদার

গারোদের কথা ॥ হরিপদ রায়
প্রবাসী, ২৬শ ভাগ, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা; জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩; পৃষ্ঠা ২৮৪-২৮৯
সম্পাদক : রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

অতিকায় প্রত্নমানব ॥ অবিনাশচন্দ্র দাস
বঙ্গবাণী; ৫ম বর্ষ, প্রথমার্ধ, ৫ম সংখ্যা; আষাঢ় ১৩৩৩; পৃষ্ঠা ৫৮৪-৫৮৮
সম্পাদক · বিজয়চন্দ্র মজুমদার

নাগারাজ্যে কয়েক বৎসর ॥ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার
সৌরভ; ১৪শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা; শ্রাবণ ১৩৩৩; পৃষ্ঠা ১১৩-১১৫
নরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রকাশিত

নাগারাজ্যের অভিজ্ঞতা ॥ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার
সৌরভ; ১৪শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৩৩; পৃষ্ঠা ১৪৭-১৫০
নরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রকাশিত

উত্তর-পূর্ব সীমান্তে ॥ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রবাসী, ২৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৩৩; পৃষ্ঠা ৯০-৯৬
সম্পাদক · রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

মানব-বিজ্ঞান ॥ চিত্তরঞ্জন রায়
ভারতবর্ষ; ১৪শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা, পৌষ ১৩৩৩; পৃষ্ঠা ১০৫-১০৮
সম্পাদক জলধর সেন

সাঁওতালি ভাষায় সংস্কৃত ও প্রাদেশিক ভাষার প্রভাব ॥ সত্যেশচন্দ্র গুপ্ত
ভারতবর্ষ, ১৪শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা; মাঘ ১৩৩৩; পৃষ্ঠা ২৩২-২৩৪
সম্পাদক : জলধর সেন

দিনাজপুরে সাঁওতাল ॥ নরেন্দ্রনাথ রায়
প্রবাসী, ২৭শ ভাগ, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা; পৌষ ১৩৩৪; পৃষ্ঠা ৩৪১-৩৪২
সম্পাদক : রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

ময়ূরভঞ্জের পার্বত্যজাতি ॥ ফণীন্দ্রনাথ বসু
প্রবাসী; ২৮শ ভাগ, ২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা; চৈত্র ১৩৩৫, পৃষ্ঠা ৮২৬-৮২৯
সম্পাদক : রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

হালামদের কথা ॥ নলিনীকুমার ভদ্র
প্রবাসী; ৩০শ ভাগ, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা; শ্রাবণ ১৩৩৭; পৃষ্ঠা ৫৭৩-৫৭৭
সম্পাদক : রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

আসামের কুকি জাতি ॥ লালতুদাই রায়
প্রবাসী; ৩০শ ভাগ, ১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা; ভাদ্র ১৩৩৭; পৃষ্ঠা ৮৫৪-৮৫৫
সম্পাদক : রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

আসামের কুকি জাতি ॥ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সোমদ্দার
প্রবাসী; ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা; আশ্বিন ১৩৩৭; পৃষ্ঠা ৮৫৪-৮৫৫
সম্পাদক : রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

বাংলার আদিম জাতি ও সভ্যতা (বাংলাদিশম) ॥ হরিদাস পালিত
কায়স্থ-সমাজ; ১২শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা; চৈত্র ১৩৩৮; পৃষ্ঠা ৫৫১-৫৫৭
সম্পাদক : উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী

বাংলার ইতিহাসের কয়েকটি গোড়ার কথা ॥ প্রবোধচন্দ্র সেন
বিচিত্রা; ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় খণ্ড, চৈত্র ১৩৩৯; পৃষ্ঠা ৪১৩-৪১৯
সম্পাদক : উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সিন্টেংদের দেশে ॥ নলিনীকুমার ভদ্র
প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০; পৃষ্ঠা ২১১-২১৮
সম্পাদক : রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

বাঙালির জাতি-বিশ্লেষণ ॥ বিরজাশঙ্কর গুহ
প্রবাসী; জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০; পৃষ্ঠা ২৪৫-২৫৩
সম্পাদক : রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

জুয়াঙ্গ জাতি ॥ নির্মলকুমার বসু
প্রবাসী; আশ্বিন ১৩৪০; পৃষ্ঠা ৮০৪-৮০৯
সম্পাদক : রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

ধ্বংসোন্মুখ মুন্ডাজাতি ॥ মোহাম্মদ মোদাব্বের
মাসিক মোহাম্মদী; ৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা; কার্তিক ১৩৪০; পৃষ্ঠা ৩৮-৪০
সম্পাদক : মোহাম্মদ আকরম খাঁ

নীলগিরিব পাহাড়িয়া জাতি ॥ মোহাম্মদ মোদাব্বের
মাসিক মোহাম্মদী; ৭ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা; পৌষ ১৩৪০; পৃষ্ঠা ১৮৬-১৮৮
সম্পাদক : মোহাম্মদ আকরম খাঁ

আদ্য বাঙ্গালী জাতি—মারাং-বুরু মানব ॥ হরিদাস পালিত
উদয়ন; প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড, একাদশ সংখ্যা; ফাল্গুন ১৩৪০; পৃষ্ঠা ১২৯৭-১৩০২
সম্পাদক ও পরিচালক : অনিলকুমার দে

গৌড় জাতি ॥ সত্যকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
প্রবাসী; অগ্রহায়ণ ১৩৪১, পৃষ্ঠা ২১০-২১৬
সম্পাদক : রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

ছোটোনাগপুরে সাহিত্য-সেবার উপাদান ॥ শরৎচন্দ্র রায়
প্রবাসী; মাঘ ১৩৪১; পৃষ্ঠা ৪৬৩-৪৭০
সম্পাদক : রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

প্রস্তর যুগের মানুষ ঃ বুশম্যান ॥ সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী
বঙ্গশ্রী ; ৫ম বর্ষ, ৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা; ভাদ্র ১৩৪৪; পৃষ্ঠা ২২২-২২৪
সম্পাদক : সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য

ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে প্রাচীনকালের মানব ॥ নির্মলকুমার বসু
প্রবাসী ; আশ্বিন ১৩৪৭; পৃষ্ঠা ৭৪৪-৭৪৯
সম্পাদক : রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

পাপুয়া
মাসিক বসুমতী; ২১ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা; শ্রাবণ ১৩৪৯; পৃষ্ঠা ৫১০-৫১৮
সম্পাদক : সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বাংলাদেশের আদিম অধিবাসী ॥ নলিনীকান্ত ভট্টশালী
সোনার বাংলা; শারদীয়া সংখ্যা; সন ১৩৫২; পৃষ্ঠা ৮০-৮২
সম্পাদক : নলিনীকিশোর গুহ

কোল-জাতির সংস্কৃতি ॥ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
বিশ্বভারতী পত্রিকা; পঞ্চম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা; কার্তিক-পৌষ ১৩৫৩; পৃষ্ঠা ৮৮-১০৯
সম্পাদক : রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাঁওতালি গান ॥ সন্তোষচন্দ্র মজুমদার
বিশ্বভারতী পত্রিকা; পঞ্চম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা; কার্তিক-পৌষ ১৩৫৩; পৃষ্ঠা ১১০-১২০
সম্পাদক : রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর